ব্যাংকিং এখন যখন তখন

ইসলামী ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং

- বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে ২৪ ঘণ্টা ঝুঁকিমুক্ত ব্যাংকিং
- অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্টসহ ক্লিয়ারিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য
- ইসলামী ব্যাংকের যে কোন অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিক টাকা স্থানান্তর
- বিনা খরচে মোবাইল ও ওয়্যাইম্যাক্স রিচার্জ
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও টিকেট ক্রয়
- অনলাইনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- বৈদেশিক লেনদেনের ব্যয় বিবরণী
- চেক রিকুইজিশন দেওয়া
- যে কোন ব্যাংকের হিসাবে BEFTN দিয়ে টাকা পাঠানো

লগ ইন করুন -ibblportal.islamibankbd.com

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

ইসলামী ব্যাংক কলসেন্টার সেন্টার ১৩৩১০৯০ অথবা ১৬২৫৯

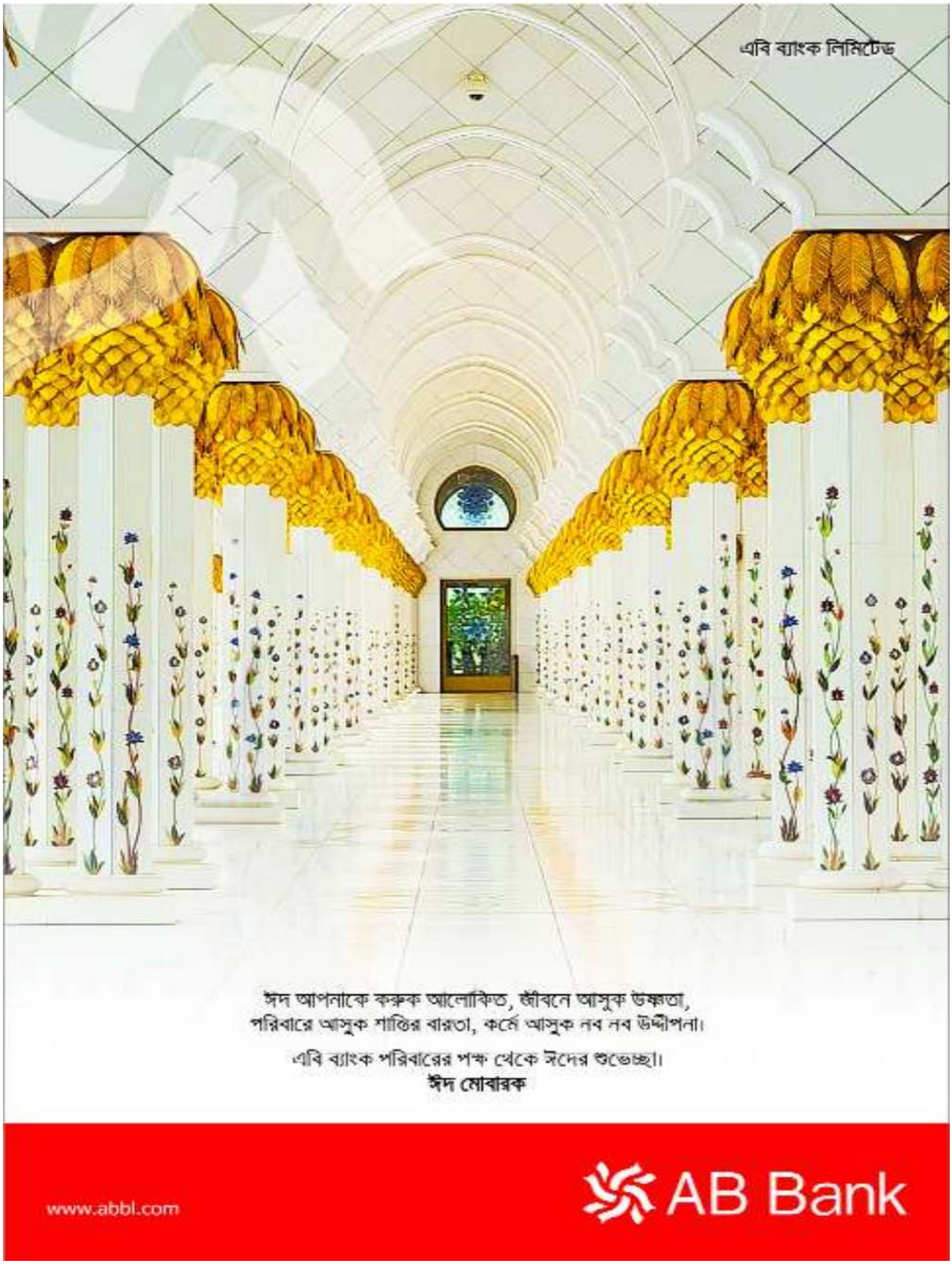
এবি ব্যাংক লিমিটেড
ঈদ আপনাকে করুক আলোকিত, জীবনে আসুক উষ্ণতা,
পরিবারে আসুক শান্তির বারতা, কর্মে আসুক নব নব উদ্দীপনা।
এবি ব্যাংক পরিবারের পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা।
ঈদ মোবারক
www.abbl.com
AB Bank

দেশ-বিদেশ ওয়ার্কার্সের মধ্যে প্রতিদিন

যায়যায়দিন

১৯৮৫ থেকে

ঈদ সংখ্যা ২০১৫

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
সাঈদ হোসেন চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ

সাহিত্য সম্পাদক
সালাম সালেহ উদদীন

সম্পাদনা সহযোগী
আতাউর রহমান

প্রচ্ছদ
শতাব্দী জাহিদ

অলঙ্করণ
রাজিব রায়
অরণ্য আবির
হায়দার আহমেদ

গ্রাফিক্স
শিবশংকর দেবনাথ

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
মো. ইব্রাহীম খলিল স্বপন
মো. ইদ্রিছ আলী মিয়া
নূরে আলম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
বাহ্‌লুল কবীর লিটন

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. বিল্‌লাস হোসেন
মো. আজিজুল হক

মূল্য : ১৫০ টাকা

ঈদ শুভেচ্ছা

বর্ষা ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি এবার ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে যাচ্ছে। শ্রাবণ শুরু হওয়াতে এবারের ঈদের দিনের পরিবেশ হয়তো বা বৃষ্টিমুখর থাকবে। ঈদ সারা বিশ্বের মুসলমানের জীবনে এক তাৎপর্যময় আনন্দঘন দিন। পবিত্র ঈদের আগে আমাদের মাঝে রমজান আসে রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও মহান আল্লাহর নির্দেশমতো পবিত্র রোজা পালন করেন। রোজা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। সিয়ামের সর্বপ্রথম শিক্ষা ভোগস্পৃহা নিয়ন্ত্রণ করে দেহমনকে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সুবহে সাদিকের আগমুহূর্ত থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ত্যাগ ও সংযম প্রদর্শন করা। আর রমজান শেষেই আসে ঈদ। ঈদ তাই চিরসবুজের, চিরতারুণ্যের। ঈদ মানেই আনন্দ, যেন বাঁধভাঙা জোয়ার।

সেই আনন্দকে বরণের জন্যই বাংলার মুসলমান মাসব্যাপী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঈদকে কেন্দ্র করে ইদানীং গ্রামীণ জীবনেও লেগেছে নগর সংস্কৃতির ছোঁয়া। ঈদের আপ্যায়নেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলে উৎসবের ধরন ও আমেজ বদলে গেছে। ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে ঈদ উৎসবে।

ঈদুল ফিতরের আনন্দকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে এবারো *যায়যায়দিন* প্রতি বছরের মতো বর্ধিত কলেবরে ঈদ ম্যাগাজিন পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। নানা দিক থেকে বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় সেরা এই ম্যাগাজিন। দেশের স্বনামধন্য লেখক, কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ভরপুর এবারের ঈদ ম্যাগাজিন। এতে রয়েছে বিশেষ রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, ফ্যাশন, রূপচর্চা, রান্নাবান্না, খেলাধুলাসহ নানা আকর্ষণীয় বিষয়। এ বিশেষ সংখ্যাটি যদি পাঠককে আকৃষ্ট করে তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। এবারের ঈদে বিগত দিনের হতাশা, গ্লানি মুছে যাক। নতুন দিনের প্রত্যাশায় জেগে উঠুক সবাই।

যায়যায়দিনের সব লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, হকার, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাই ঈদ শুভেচ্ছা।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক : সাঈদ হোসেন চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ
প্রকাশক কর্তৃক এইচআরসি মিডিয়া ভবন, লাভ রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে প্রকাশিত
ও যায়যায়দিন প্রিন্টার্স লিমিটেড থেকে মুদ্রিত

পিএবিএক্স : ৮৮৭ ০২০৮-১২ ফ্যাক্স : ৮৮৭ ০২০২ রিপোর্টিং : ৮৮৭ ০২১৪ বিজ্ঞাপন : ৮৮৭-০২২৩ ফ্যাক্স : ৮৮৭-০২০১
সার্কুলেশন : ৮৮৭-০২২৪ E-mail : country_jjd@yahoo.com, jajadi@jjdbd.com Website : www.jjdin.com

electra

ঈদ মুবারক

৫০,০০০/-

পর্যন্ত নগদ ছাড়!!!

ইলেক্ট্রা ফ্রিজ, ডীপ ফ্রিজার, ওয়াশিং মেশিন, ও মাইক্রোওয়েভ ওভেন পণ্য ক্রয় করার সাথে সাথেই পাবেন

১টি ম্যাজিক কার্ড

* এই সুযোগ ৩১ জুলাই ২০১৫ ইং পর্যন্ত।

electra INTERNATIONAL

উপহার সমূহ		
নগদ ছাড়	ইলেক্ট্রা মাইক্রোওয়েভ ওভেন	ইলেক্ট্রা রাইস্ কুকার
ইলেক্ট্রা আয়রণ	ইলেক্ট্রা এয়ার কুলার	ইলেক্ট্রা দই মেকার

* শর্ত প্রযোজ্য

নগদ ও সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়

শোরুম সমূহ : ঢাকা- ২৭, ৬০, ৭৮, ৯৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম মার্কেট, ফোন : ৯৫৫০২০৭, ৯৫৬৩৪৮৯, ৯৫৫১৭৬৭, ৯৫৬২৭২৬, উত্তরা : ৮৯৫৮৬৯২, ৫৮৯৫২০৪৪, মহাখালী : ৯৮৫৭৫৬৯, বিজয় সরণী : ৮১৫৪৮৩৫, রামপুরা : ৮৩১৪৩৪১, শেওড়াপাড়া: ৯১০১৭২৭, শ্যামলী : ৯১২৭৫৪৬, মিরপুর-১: ৯০০৮৬৯০, মিরপুর-১০: ৯০২৩৩০৩, গাছপথ: ৯১৩৯২৫৮, এ্যালিফ্যান্ট রোড : ৯৬৭৭৩৩৮, নয়া পল্টন (ভি আই পি টাওয়ার) : ৮৩১৭৩৩৭, লালবাগ : ৯৬৭৭২৫৯, খোলাইপাড় :৭৪৪৯৩২২, খোলাইপাড় : (ডিসকাউন্ট সপ):৭৪৫১৯১৩, জিনজিরা : ৭৭৭৩০৬৮, গাজীপুর: ০১৮১৩-৯২৮২২৮, সাভার: ৭৭৪২১৪৬, টাংগাইল : ০৯২১-৬২২৪০, ময়মনসিংহ : ০৯১- ৬১১৯১, ভৈরব : ৯৪৭১৩২২, কুমিল্লা: ০৮১-৬৪৬৩৬, সিলেট: ০৮২১-৭১৯২৬০, মৌলভী বাজার: ০৮৬১-৬৩৫৭০, চট্টগ্রাম-১: ০৩১-৬২৬৯২৪, চট্টগ্রাম-২: ০৩১-৭৪১২০১, কক্সবাজার : ০৩৪১-৫২০১৬, খুলনা-১ : ০৪১-৭২১৫৫১, খুলনা-২ : ০৪১-৭২২৮৫৮, রাজশাহী-১: ০৭২১-৭৭৬১৮৬, রাজশাহী-২: ০৭২১-৭৭১৬০১, নাটোর : ০৭৭১-৬৬৫৫২, পাবনা : ০৭৩১-৬৪৮৭৫, বগুড়া: ০৫১-৬২৫৩৩ , নওগাঁ: ০৭৪১-৮১১৭৫, অমপুরহাট : ০৫৭১-৫১৩৪২, গোবিন্দগঞ্জ: ০৫৪২৩-৭৫৩৯৫। বিরামপুর: ০৫৩২২-৫৬০৯৩, দিনাজপুর: ০৫৩১- ৬৬৩৫০, রংপুর : ০৫২১-৬২৬১০, সৈয়দপুর: ০৫৫২৬-৭২৭৪৮, চুয়াডাংগা : ০৭৬১-৬২৯০২, মাদারীপুর : ০৬৬১-৬২৬৪৭, নারায়ণগঞ্জ : ৭৬৩৩৬৭৫, বি-বাড়িয়া : ০৮৫১-৫২৫৮৯, চাঁদপুর : ০৮৪১-৬৩২১৯, বরিশাল : ০৪৩১-৬১২৭৯, পটুয়াখালী : ০৪৪১-৬২০০০,ভোলা : ০৪৯১-৬২৫৫৮, রাজবাড়ী : ০৬৪১-৬৬৬৬৮, মাগুরা : ০৪৮৮-৬২৬২২, সাতক্ষীরা : ০৪৭১-৬৪৬২৪। এছাড়া অনুমোদিত ডিলারগনের নিকট পাওয়া যাবে।

সেলস্ এন্ড মার্কেটিং অফিস : ফোন : ৯৫৮২০৭০, ৯৫৮২৫৯৬, ৯৫৬৬০০৪, ই-মেইল : electra@sazawa.com

সূচি

বিশেষ রচনা

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী * চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটি সাহচর্যের কাহিনী – ৩৬
জোবায়ের আলী জুয়েল * পলাশী যুদ্ধের খলনায়করা – ৩৩১
ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক * স্পেনের ইতিহাসের করুণ কাহিনী – ৩৩৪

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

কামাল লোহানী * রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাতকাহন – ১৫
অজয় রায় * বাংলাদেশ ও রাজনীতি – ২২
রণেশ মৈত্র * ইসলামী জঙ্গিবাদের ক্রমবর্ধমান হুমকি – ২৭
শামসুজ্জামান খান * বাঙালির উৎসব – ১১
হায়দার আকবর খান রনো * স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম – ৩০
তারাপদ আচার্য্য * নারীর অগ্রযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দ – ১৯৮
মাহমুদুল বাসার * বাঙালি মুসলমানের দ্বিমুখী যাত্রা – ২৭৬
ড. রাশিদ আসকারী * গুন্টার গ্রাস ও তার টিন ড্রাম – ২৪৬
মো. রহমত উল্লাহ্ * জয় বাংলা মানে কী? – ৩১১
জহিরুল হক * নারী ও তার বিধাতা পুরুষ – ৩২২

উপন্যাস

বেগম জাহান আরা * পরম্পরা – ৬৩
আতা সরকার * নীল সাহেবের গোলাম – ১১০
সারোয়ার কবীর * কন্যার নাম মিলেনিয়াম – ২০৬
হাবিব আনিসুর রহমান * চাপ – ১৫৮
সালাম সালেহ উদদীন * ব্যর্থ দিন ব্যর্থ রাত – ২৫৪

গল্প

হাসনাত আবদুল হাই * তাহেরার চাকরি – ৫৪
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ * অন্তর্দ্রোহ – ১৪৬
সেলিনা হোসেন * স্বপ্নপূরণ – ৯৮
ইকবাল আজিজ * জন্মের রহস্য – ১৩৭
আফরোজা পারভীন * আবার ফুটবে আলো – ২২৪
সরকার মাসুদ * মাকিদ, সুব্রত ও ইন্দ্রাণীর গল্প – ১৭৫
শহীদ খান * ভালো থেকো – ২২৭
অনুপ সাহা * ফেরে নাই – ১৭৯
দিলরুবা আহমেদ * অথচ একা – ১৮৯

ঈদ মুবারক
www.primebank.com.bd
প্রাইম ব্যাংক

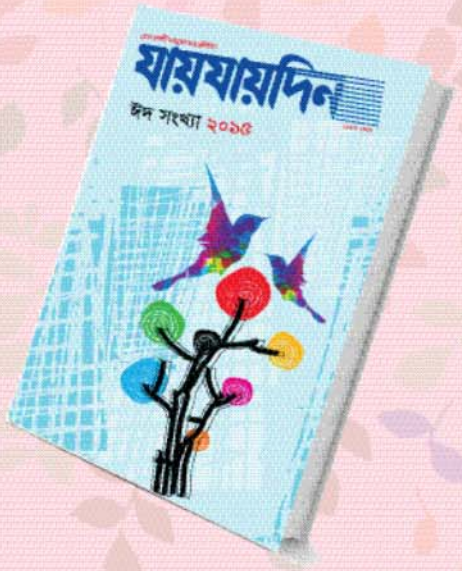

গল্প
নূর কামরুন নাহার * দম্পতি – ২৭৮
স্বপ্না রেজা * নীরব দহন – ২৩০
সমীর আহমেদ * বাউল – ১৮৬
শাকির সবুর * শেষ স্টেশন – ১৮২
নাসিম জাহান * অতঃপর নাইওর – ১৪৩
আসাদুজ্জামান * অসমাপ্ত দুপুর – ৩২৮
মিল্টন বিশ্বাস * নদী, নীল ও বুনোহাঁসের গল্প – ২৮৬
জয়দীপ দে * নিপুণ – ১৪০
হোসনে আরা মণি * সাইন বোর্ড – ৩২৫

অনুবাদ গল্প
মূল : জয়শ্রী চ্যাটার্জী অনুবাদ : – ১৭২
মোবারক হোসেন খান * গজল গায়ক
মূল : লু স্যুন ভাষান্তর : মনির তালুকদার * পুরনো বাড়ি – ২৩৭

কবিতাগুচ্ছ – ৫০-৫২
আল মাহমুদ, মহাদেব সাহা, রফিক আজাদ, মাকিদ হায়দার, হাসান হাফিজ, ফারুক মুহাম্মদ

কবিতাগুচ্ছ – ১০৪-১০৮
সুজাউদ্দিন কায়সার, দুলাল সরকার, চঞ্চল শাহরিয়ার, সৌম্য সালেক, ফারুক মাহমুদ, কামাল মাহমুদ, মাহমুদুজ্জামান জামী, রেজাউদ্দিন স্টালিন, শাফিকুর রাহী, তোফায়েল তফাজ্জল

কবিতাগুচ্ছ – ৯৬
রোকেয়া ইসলাম, শাশ্বত হাসান, আমিনুল ইসলাম, মুস্তাক মুহাম্মদ

কবিতাগুচ্ছ – ১৯৪-১৯৬
শিহাব সরকার, রাহমান ওয়াহিদ, মিলন সব্যসাচী, সমর চক্রবর্তী, রনি অধিকারী, দ্বিত্ব শুভ্রা, সালাউদ্দিন খোকা

কবিতাগুচ্ছ – ৩০৬-৩১০
সুজন হাজারী, মামুন মুস্তাফা, বদরুল হায়দার, ইদ্রিস সরকার, রজত কান্তি বর্মণ, নাহার ফরিদ খান, পদ্মনাভ অধিকারী, নীহার মোশারফ, নির্মল চক্রবর্তী, তাহমিনা কোরাইশী, মানস বিশ্বাস, মিজানুর রহমান বেলাল, এমরান হাসান

জনতা ব্যাংক স্পীডি ফরেন রেমিট্যান্স পেমেন্ট সিস্টেম

প্রবাসে বুকিং দেয়া মাত্রই দেশে তাৎক্ষণিক পরিশোধ...

বুকিং দেয়ার ১ ঘন্টায় আপনার আপনজনের কাছে অর্থ পৌছানো আমাদের দায়িত্ব।
বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ও দেশের অগ্রগতিতে শরীক হউন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয়: ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৬৬৪৪২, ৯৫৬৬৪৪৩
স্পিডি রেমিটেন্স সেল : ৯৫১৫৩০৪-৫, ৯৫১৩৯৪৫
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৪৪

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
A committed partner in progress
jbceftoperation@janataremitt.com.bd

E-mail: id-obd@janatabank-bd.com SWIFT: JANBBDDH Website: www.janatabank-bd.com

Earth Vision

ব্যক্তিত্ব
মমতাজ আলী খান * সাধক শিল্পী ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম – ২০২
অপূর্ব কুমার কুণ্ডু * যাত্রার যাত্রাপথে নির্ভীক যাত্রী মিলন কান্তি দে – ২৩৩

মুক্তিযুদ্ধ
জাহিদ রহমান * মুক্তিযুদ্ধে মাগুরার 'আকবরবাহিনী' – ২৮২

যুদ্ধস্মৃতি
মুজিবুর রহমান * যে স্মৃতি শুধুই যন্ত্রণার ভারী পাথর বুকের ওপর – ৪২

নৃ-গোষ্ঠী
ড. হারুন রশীদ * সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী গারো নৃ- গোষ্ঠী – ২১৫

ভ্রমণ
সালেহ আহমেদ * হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো – ৩১৬

প্রকৃতি
মুকিত মজুমদার বাবু * পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর – ৪৫

কবিতাগুচ্ছ – ২৪২-২৪৪
জাফরুল আহসান, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, সোহরাব পাশা, প্রবীর চন্দ, আসলাম সানী, গোলাম কিবরিয়া পিনু, মিজান মনির, মাসুদ অর্ণব

রসনা
তাসলিমা হক * মজাদার ঈদ রেসিপি – ৩০২

রূপচর্চা
শাজিয়া তাইয়্যেবা * ঈদের সাজগোজ – ২৯৬

ঈদ ফ্যাশন
তাইসির আদীব নূর * ঈদ ফ্যাশনে রঙের বাহার – ২৮৯

খেলা
শামসুজ্জামান শামস * ক্রিকেটে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও নানা চক্রান্ত – ৩৪৬

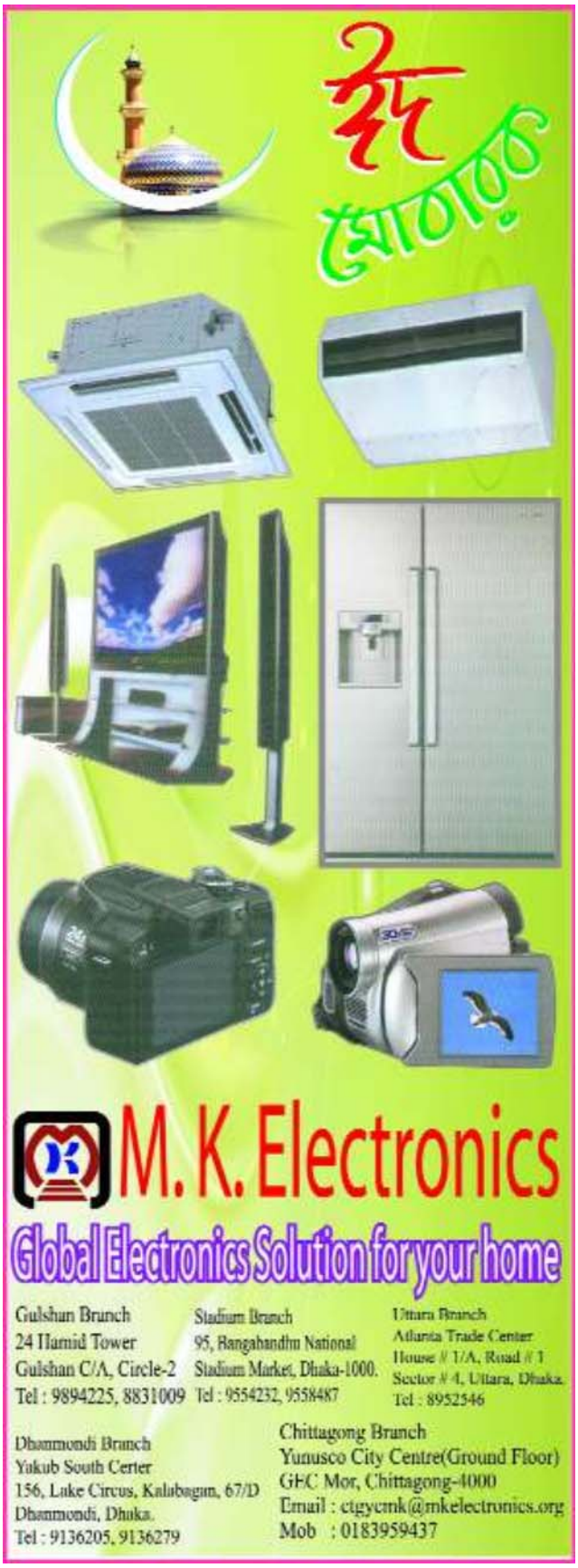

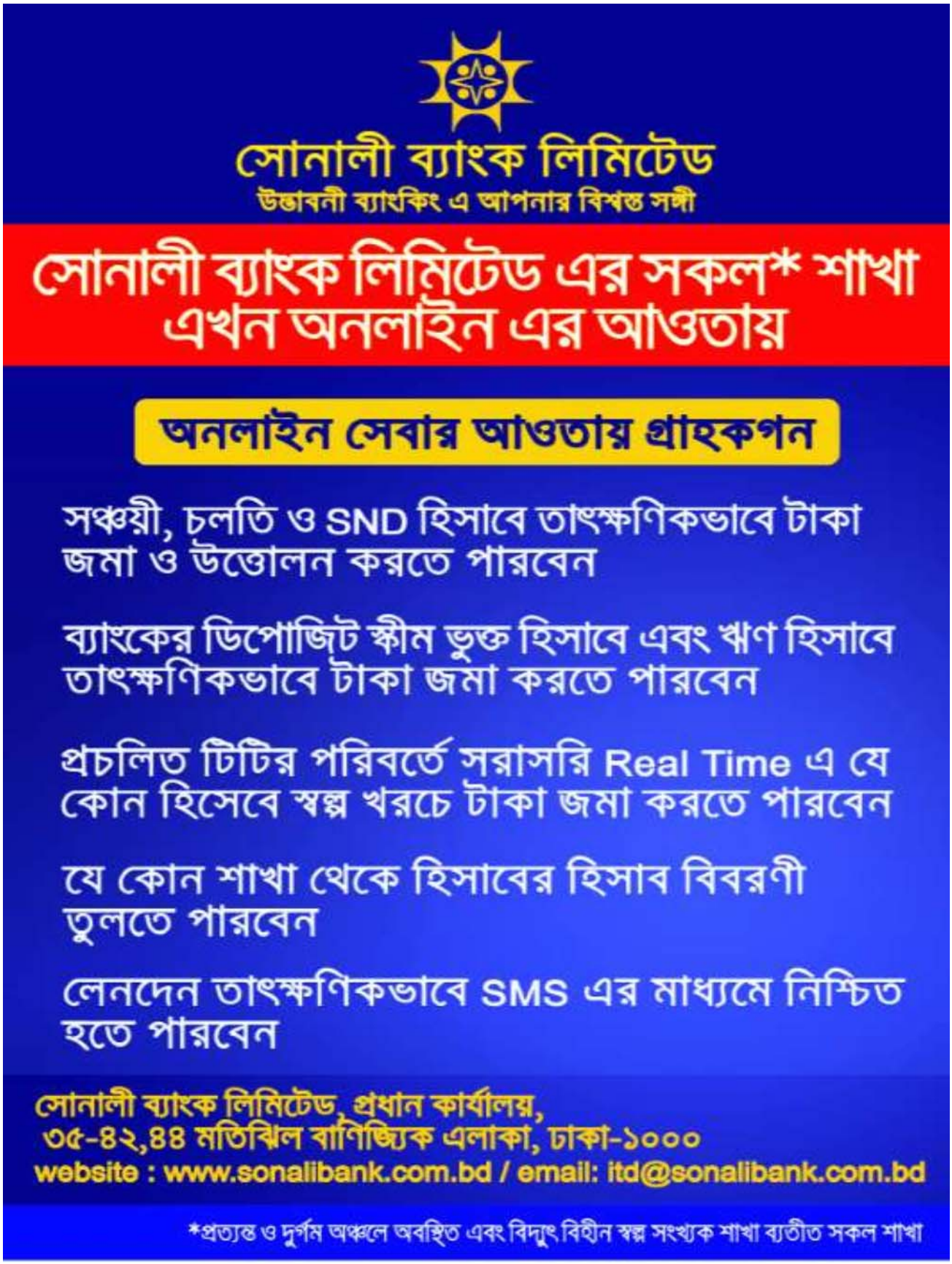
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল* শাখা এখন অনলাইন এর আওতায়
অনলাইন সেবার আওতায় গ্রাহকগন
সঞ্চয়ী, চলতি ও SND হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারবেন
ব্যাংকের ডিপোজিট স্কীম ভুক্ত হিসাবে এবং ঋণ হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা জমা করতে পারবেন
প্রচলিত টিটির পরিবর্তে সরাসরি Real Time এ যে কোন হিসেবে স্বল্প খরচে টাকা জমা করতে পারবেন
যে কোন শাখা থেকে হিসাবের হিসাব বিবরণী তুলতে পারবেন
লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে SMS এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারবেন
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,
৩৫-৪২,৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
website : www.sonalibank.com.bd / email: itd@sonalibank.com.bd
*প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত এবং বিদ্যুৎ বিহীন স্বল্প সংখ্যক শাখা ব্যতীত সকল শাখা

প্রবন্ধ

বাঙালির উৎসব

শামসুজ্জামান খান

বাংলাদেশকে বলা হয় 'বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ। এ থেকে এ কথা কিন্তু বোঝায় না যে বাংলাদেশে উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। তা নয় মোটেই। কারণ উৎসব আর পার্বণের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। উৎসব সর্বজনীন অর্থাৎ সবাই মিলে উদযাপন করার একটি বিষয়। সেদিক থেকে দেখলে উৎসব চরিত্রগতভাবে সেক্যুলার। উৎসবে ধর্ম সম্পৃক্ততা নেই এমন নয়– তবে তার দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য। এক. ধর্মীয় উৎসব হলে হাতে ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতি বা করণক্রিয়া থাকতেই পারে। যেমন মুসলিম বাঙালির ঈদ উৎসব এবং হিন্দু বাঙালির দুর্গাপূজা। এসব ধর্মীয় উৎসব আবার সর্বজনীন। এতে ধর্মীয় করণক্রিয়াটুকু কেন্দ্রীয় বিষয়, কিন্তু এর আনুষঙ্গিকতাও আছে। এবং মজার ব্যাপার বৃহৎ উৎসবে সামাজিক ও আন্তঃধর্ম সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণগত চাপও এতটা বৃদ্ধি পায় যে উৎসবে কেন্দ্রীয় বিষয় আর মুখ্য ও আধিপত্যবাদী অবস্থানে থাকে না। ঢাকার

এফএসআইবিএল
ফার্স্ট পে
শিওরক্যাশ

সবার জন্যে সবসময়

টাকা পাঠাই ফোনে ফোনে

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর মোবাইল ব্যাংকিং সেবা "এফএসআইবিএল ফার্স্ট পে শিওরক্যাশ" এর মাধ্যমে টাকা পৌঁছে যাবে নিমিষেই।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা সমূহ

- ফ্রি একাউন্ট
- টাকা জমা
- টাকা উঠানো
- টাকা পাঠানো
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ফি প্রদান
- ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট
- কেনাকাটা

"ফ্রি" একাউন্ট খুলুন

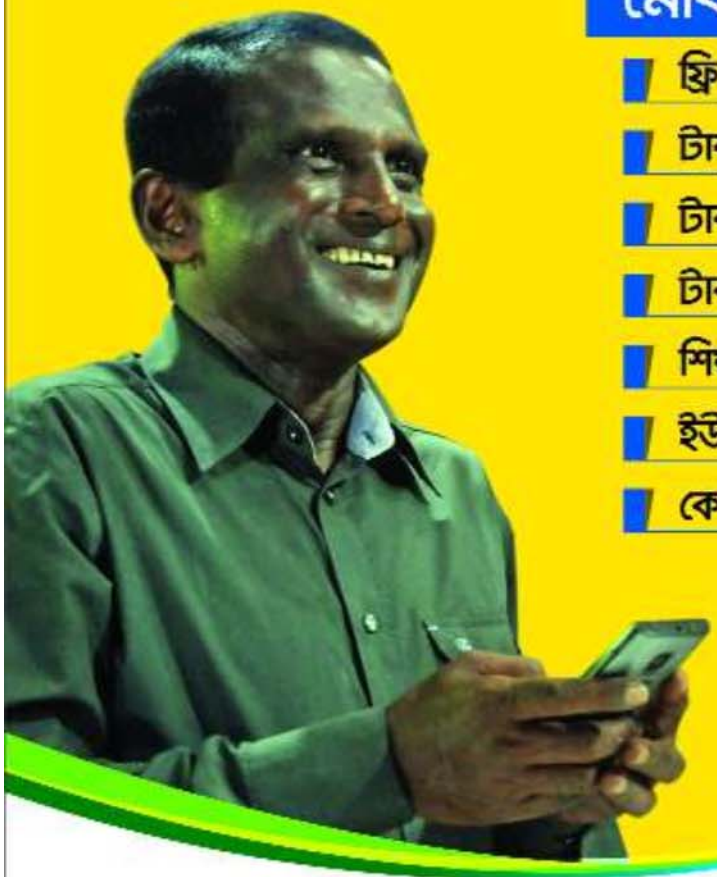

আপনার মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট খোলার জন্য আজই আমাদের মনোনীত এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

+8801977716257
mfs@fsiblbd.com
www.fsiblbd.com

FSIB ISLAMI BANK

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتي اسلامي بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

বাঙালি মুসলমানের ঈদ উৎসব এবং কলকাতার বাঙালি হিন্দুর সর্বজনীন দুর্গাপূজায় এমনটি যে ঘটে গেছে, সাম্প্রতিককালের ইতিহাস তার সাক্ষী। এ জন্য পার্বণ কিন্তু মূলতই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা করণক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এর মধ্যে সাধারণ সামাজিক বা আন্তঃসম্প্রদায়গত কোনো সম্পৃক্তির চাপ থাকে না। পার্বণ ছোট, সীমাবদ্ধ ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ। এর রূপান্তর বা সামাজিক সম্প্রসারণ নেই। কারণ পার্বণ সর্বজনীন নয়– বহুলাংশে ধর্ম সম্প্রদায়ের পারিবারিক অনুষ্ঠান। পারিবারিক এ পার্বণ আবার পরিবারের সবাই সর্বক্ষেত্রে মিলিতভাবে করে এমনও নয়। পরিবারের নিষ্ঠাবান বয়স্ক ধার্মিকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পার্বণ উদযাপন করে থাকেন। গোটা পরিবারের বিশেষ করে তরুণদের অংশগ্রহণ বা থাকায় তাই বহু পার্বণের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কোনো কোনো উৎসবের ভেতরগত অন্তঃসারের মধ্যে সামাজিক সংহতি বা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমবেতভাবে উদযাপনের উপাদান থাকায় তার বিপুল বিস্তার এবং গুণমানগত উন্নয়ন ঘটেছে। এর নানারকম চমৎকারিত্ব, শক্তিমত্তা ও সামাজিক সংহতির উদাহরণ পেশ করা যায়। একটু আগেই ঈদ উৎসব এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বা সেক্যুলাররূপ পরিগ্রহ করেছে তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আর একটু ইতিহাস অনুরাগী বা অনুসন্ধানপ্রবণ মনের অধিকারী হলে তো কথাই নেই। ইতিহাস বিশ্লেষণ করেই নানা উৎসবের লক্ষণ, উদ্দেশ্য, রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং ধর্মীয় উপাদানের প্রতি নিস্পৃহ এবং সমাজ সংহতি ও মানবিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রয়াস লক্ষ্য করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদান ছেঁটে ফেলে তাকে পরিশীলিত এবং সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে নবরূপে বিন্যস্ত করার প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়।

এবার বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাচীন ও দু'একটি নবীন উৎসবের ইতিহাস চর্চা আমাদের ওপরের বক্তব্যকে স্পষ্ট করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কৃষি সমাজের বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলের প্রাচীন পার্বণ বা পারিবারিক উৎসব ছিল 'আমানী'। আমানী কথাটির অর্থ হলো 'অন্ন পার্বণ।' এটি ছিল পারিবারিক অনুষ্ঠান। একে পার্বণও বলা হতো। তবে এতে ধর্মীয় অন্তঃসার তেমন ছিল না। জাদুবিশ্বাসজাত ও উপাদান ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। আড়ম্বরহীন এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা পার্বণ স্থানিক অনুষ্ঠান হলেও ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে এ অনুষ্ঠান উদযাপিত হতো। এ অনুষ্ঠানটি ছিল এ রকম : চৈত্র সংক্রান্তির দিনের শেষে বা দিনগত রাতে কৃষাণী গৃহকর্ত্রী এক ঘটি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ক চাল ছেড়ে দিয়ে সারা রাত ভিজতে দিতেন এবং তার মধ্যে একটি আমের কচি ডাল গুঁজে দিতেন। নববর্ষের ভোরে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে গৃহকর্ত্রী সবাইকে সেই ভেজা চাল খেতে দিতেন। অন্যদিকে ঘটিতে পুঁতে রাখা আমের কচি পাতাওয়ালা ডালটি বের করে তা দিয়ে ঘটির পানি বাড়ির সবার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন। লোকবিশ্বাস ছিল এতে সারা বছর বাড়ির সবার মঙ্গল হবে। গৃহে ও তাদের পরিপার্শ্বে এবং বিশ্বজগতে ফিরে আসবে সুখ ও শান্তি। এ অনুষ্ঠানটির এখন প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের প্রভাব যে আমাদের বাংলা নববর্ষে বা ১ বৈশাখ উদযাপনে একেবারে পড়েনি তা বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অনুষ্ঠানের মঙ্গল শোভাযাত্রায় এর অন্তঃসারকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং জাদুবিশ্বাসজগৎ এ অনুষ্ঠানকে এখন সামাজিক শ্রেয়োচেতনা এবং অমঙ্গলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শক্তিকে মিছিলের দ্রোহচেতনা এবং পূর্বকালের লোক ও জাদুবিশ্বাসজাত অমঙ্গলের প্রতীক প্রাণীর প্রতিকৃতি এবং মুখোশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তা সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক উপাদানকে উদ্ভাবনাময় এবং সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রের অপশক্তিকে চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সদাসতর্ক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিচ্ছে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসাধারণ। অন্যদিকে ধনীর দুলালদের পান্তা-ইলিশের ভোজন উৎসব শুধু ঐতিহ্যের বিকৃতি নয়, প্রাচীন লোক-উৎসবের গভীর তাৎপর্য ও মানবিক প্রত্যাশাকে বুঝতে না পারার অজ্ঞতাও। আর তাই তা ইতিহাস ও সমাজ চেতনাকে উপেক্ষা করে প্রাচীন মানুষের ঐতিহাসিক বোধ ও মঙ্গলকামনায় মস্করা করার নামান্তর।

নবান্নও বাঙালির প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব ছিল। কেউ কেউ বলেন, আগে অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ হতো। অগ্রহায়ণ ফসলের মাস। তাই তখন নবান্ন উৎসব করে নববর্ষ পালন করা হতো। এ ছিল কৃষকের ফসল প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হৈমন্তিক অনুষ্ঠান। তবে মূলে ছিল হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠান। পূর্ব-পুরুষের পারলৌকিক শান্তি কামনায় নতুন ফসলের পায়েস-ভাত এবং নানা ব্যঞ্জন নদী তীরে এবং পাখপাখালির জন্য নিবেদন করা হতো। এ ছিল এক প্রাচীন আচার। লোকবিশ্বাস ছিল, এতে মৃত পূর্বপুরুষরা খুশি হন এবং তাদের আত্মা শান্তি পায়। এখন মুসলমানরা এ উৎসবের পুরনো ক্রিয়াকরণ এবং বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে ঐতিহ্যিক উৎসবকে নব আঙ্গিক ও ভিন্নতর তাৎপর্যে বিন্যস্ত করেছে।

বাংলাদেশে উৎসব নতুন ধরন ও নব তাৎপর্য লাভ করেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসার নানা প্রতীকী অর্থ ও উদ্ভাবনাময় ব্যঞ্জনা। বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব। জাতীয় সংহতি ও ঐতিহ্যের বিস্তার ও নবায়নে উৎসবের গুরুত্ব তাই অসামান্য। আর ঈদ উৎসব ও দুর্গোৎসব বিশাল আর্থ-সামাজিক বিষয়কে আত্মস্থ করে নতুন এবং বহুমাত্রিক তাৎপর্য লাভ করেছে।

শিল্প ঋণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং জগতে নতুন ধারা উন্মোচনে

আপনাদের পাশে

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

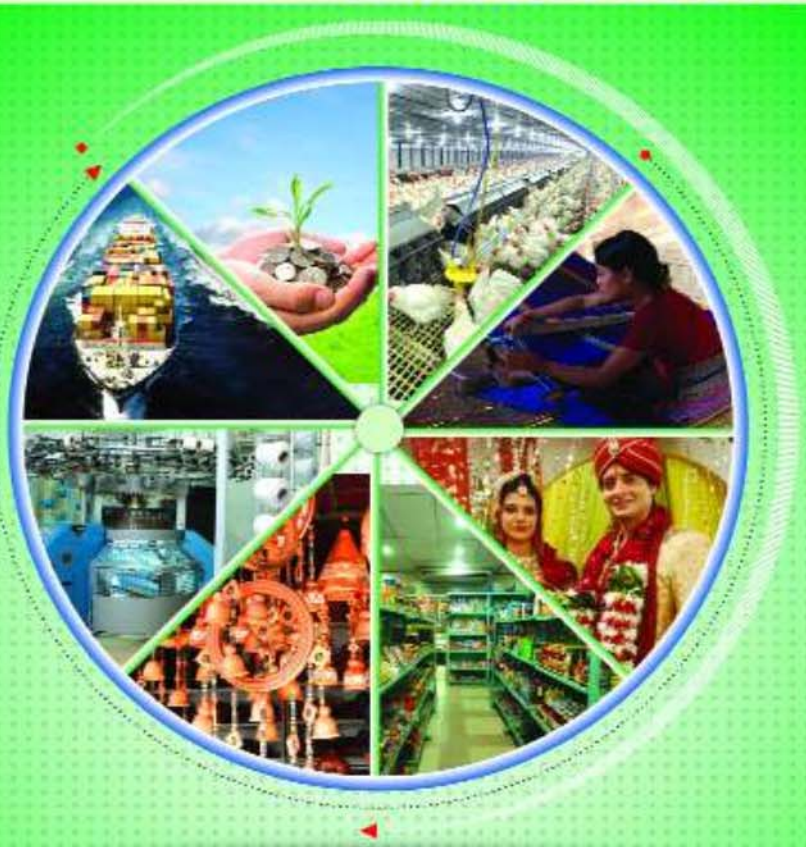

সঞ্চয় স্কীম সমূহ

- ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সঞ্চয় স্কীম (DBSS)
- শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম (SSS)
- চিকিৎসা সঞ্চয় স্কীম (CSS)
- বিবাহ সঞ্চয় স্কীম (MSS)
- অবসর বিনিয়োগ স্কীম (ISR)
- মাসিক আয় স্কীম (MIS)
- ডাবল বেনিফিট স্কীম (DBS)
- জুনিয়র গোল্ডেন স্কীম (JSS)
- বিডিবিএল স্টুডেন্ট সেভিংস একাউন্ট
- গ্রীন গোল্ডেন ডিপোজিট

ঋণ স্কীম সমূহ

- মেয়াদি ঋণ
- এস.এমই ঋণ (নারী উদ্যোক্তা) ও অন্যান্য
- ক্যাশ ক্রেডিট
- চলতি মূলধন ঋণ
- ব্যক্তিগত ঋণ
- ডোপাপণ্য ঋণ
- গৃহ নির্মাণ মূণায়ন ঋণ
- গৃহ নির্মাণ (আবাসিক/বাণিজ্যিক) ঋণ
- আমদানি ও রপ্তানি ঋণ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ অফিসে যোগাযোগ করুন

BDBL

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BANGLADESH DEVELOPMENT BANK LIMITED

A STATE-OWNED SPECIALIZED COMMERCIAL BANK

www.bdbl.com.bd

প্রবন্ধ

রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাতকাহন

কামাল লোহানী

শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কমরেড মণি সিং, শেখ মুজিবুর রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইলা মিত্র প্রমুখ, এদের নামোল্লেখ না করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এরা সবাই ছিলেন প্রপঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়। মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আন্তর্জাতিক পার্টি। কিন্তু এ দেশের বা পূর্ব বাংলার অথবা পূর্ব পাকিস্তানেই প্রচলিত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী ও বিরোধীদলীয় চরিত্র নিয়ে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৪৯ সালে ২৩ জুন গঠিত হয়েছিল ঢাকার স্বামীবাগে কাজী বশিরের বাড়ি রোজ গার্ডেনে। মুসলিম লীগবিরোধী প্রায় তিনশ রাজনৈতিক নেতাকর্মী ছিলেন এই দলে। সম্ভবত আতাউর রহমান খান প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। মুসলিম লীগের বিদ্রোহী সদস্য এমনকি প্রগতিশীল মতের ও দু'চারজন এ দলে যোগ দিয়েছিলেন। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি করা হয়েছিল আসাম সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে। কারণ আসাম সরকার তাকে আসাম থেকে বিতাড়িত করেছিল, তার বাড়িও বাংলায় টাঙ্গাইলের সন্তোষে। তিনি সে দেশে গিয়েছিলেন 'বঙ্গাল

WE'RE always LISTENING
ONE Bank Contact Center
• Accounts Services
• Cards Services & Statement Request
• Retail Deposits & Loan Products Inquiries
• Mobile Financial Services
• SME, NRB & Remittance Inquiries
• Customer Query Request & Feedback
Call us: 16269 or 09666716269
& +8809666716269 (from overseas)
24/7
Click www.onebank.com.bd Call 16269 Visit to our branches
ONE Bank
LIMITED

খেদা আন্দোলন' ও 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য। তিনি এই আন্দোলনের সফলকাম হয়েছিলেন। যাই হোক, মওলানা ভাসানী তো প্রতিবাদী এবং লড়াই সংগ্রামের মানুষ। তাই পূর্ব বাংলায় এসেও সন্তোষের জমিদারদের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন তেমনি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের দুঃশাসনের প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি।

যাহোক, রোজ গার্ডেনের প্রতিনিধি সম্মেলনে যে কমিটি গঠিত হলো মওলানা ভাসানী সভাপতি এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক হলেন। শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠক হিসেবে পারদর্শী প্রখর প্রতিভাদীপ্ত ছিলেন, তাকে এবং খন্দকার মোশতাককে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছিলেন। সম্ভবত রফিকুল ইসলাম ছিলেন তৃতীয় জন হিসেবে, তবে তাকে পরে অর্থ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

রোজ গার্ডেনে বসে যখন ২৩ জুন সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল, খন্দকার মুশতাক আহমদ সামনেই বসেছিলেন তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে তার নাম দ্বিতীয় নাম্বারে দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'মুজিব তো জেলে, আপনি তাকে এক নাম্বার রাখলেন আর আমি আপনার সামনে বসা আমাকে দেখতে পেলেন না।' মওলানা ভাসানী স্বভাবসুলভ ধমকের সুরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হতে পারে মুজিবের মতো, ও তো একজন দক্ষ সংগঠক। সবচেয়ে বড় কথা মুজিবর জেলে, তার নাম তো আগেই থাকবে।' শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মওলানা ভাসানী এমনি ভাবতেন এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভেবেই মুজিবকে স্নেহ করতেন। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি আন্দোলন ও ধর্মঘটের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। তখনকার মুসলিম লীগবিরোধী রাজনীতিতে কারো মুক্তির দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই প্রথমে রাখা হতো এবং আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকালে শেখ মুজিব জেলে থাকলেও মওলানা ভাসানী তাকে তো জেনেশুনেই তার ওপর সাংগঠনিক পারদর্শিতাকেও গুরুত্ব দিয়ে নতুন সংগঠন গড়ে তোলার জন্যও তাকে প্রয়োজন, সে কারণেই শেখ মুজিবের নাম এক নাম্বারে রেখেছিলেন।

১৯৪৯ সালে ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলায় বিরোধী রাজনীতি সৃষ্টির জন্য। তবে জনগণের মধ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটির নাম রাখা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম শব্দটাকে বাদ দেয়া কৌশলগত কারণে বলে আওয়ামী অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার জনসাধারণের মধ্যে পাকিস্তানি জাতিসত্তা গড়ে তোলার কষ্টচেষ্টা প্রথম থেকেই চলছিল। বাংলার আপামর জনসাধারণ সবই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের তাদের সমর্থন দিক না কেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে রাজনীতির কৌশল খাটিয়ে তাদের ইপ্সিত পাকিস্তান প্রাপ্তিতেই মহানন্দে ছিল। কিন্তু তারা যে অঞ্চল পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্দু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানি অঞ্চল হিসেবে পেয়েছিল, তার মধ্যে ফারাক ছিল ভাষা, সাংস্কৃতিক, সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানও পূর্ব বাংলা অন্যান্য অঞ্চল এবং রাজধানী থেকে হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

পাকিস্তানের ৭ কোটির মধ্যে ৪ কোটিই পূর্ব বাংলার জনবসতি ছিল। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, নতুন রাষ্ট্রের সবটাই পশ্চিমা রাজনৈতিক নেতাদের কাউলি করা মনে হচ্ছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষকে উপেক্ষা করে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, সংগ্রামের অতীত বর্তমান কোনো কিছুই না ভেবে এক বিদেশি 'পরগাছা' ভাষা উর্দু আমাদের ওপর চাপানোর কৌশল হিসেবে খ্যাতিমান আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়া উদ্দিন আহমদের আগবাড়িয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হেদায়েত করেন। ইতোমধ্যে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত ডাক ব্যবহার নতুন সংযোজন হিসেবে ইংরেজি ভাষা উর্দু ব্যবহার করে ডাকটিকেট, পোস্টকার্ড মানিঅর্ডার, ইনভেলফ ইত্যাদি প্রচার হতে থাকল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করায় মানুষের মনে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, দেখলাম ছেদ পড়েছে। বাংলাভাষা পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে বাদ দেয়ার কৌশল শুরু করেছিল পশ্চিমাগোষ্ঠী। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি একটি দেশের জন্য অপরিহার্য এবং এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ থেকে চক্রান্তের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা পর্বে পূর্ব পাকিস্তান বা মাশরেকি পাকিস্তানে পরিণত হয়েছিলাম। ফলে পাকিস্তানের পশ্চিমা মুসলিম লীগ যারা শাসকে পরিণত হলো এক কলমের খোঁচায় তারা আমাদের উপেক্ষা অবহেলা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে দক্ষিণ ভারতের বংশোদ্ভূত নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পশ্চিমা কালচারে নিজেকে লাগিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে কায়েদে আজম নামধারণ করে বাংলাকে অস্বীকার করে তাকে দেয়া আন্তরিক সংবর্ধনা সভায় ডাকার তখনকার বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দানের ওপর সমাবেশে বলেই দিলেন উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।...বাংলার সংস্কৃতির ওপর ন্যক্কারজনক হামলা কুৎসিত এবং ভয়াবহ আকারে দেখা দিল পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী উজিরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পরে নূরুল আমিনের আমলে। নাজিমুদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেছিলেন, কেন্দ্রে যে কোনো বৈঠকে গেলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার কথা জোর দিয়ে বলবেন। কিন্তু সে কথা বেমালুম ভুলে গেলেন, এবং জিন্নাহ সাহেবের তোষামোদি ও পক্ষাপাতিত্ব করার গোপন চক্রান্ত পাকিস্তানপন্থী বা বাংলাবিরোধীদের সমর্থন করায় একটি বিরাট প্রমোশন পেয়ে গেলেন। পূর্ব বাংলার উজিরে আলা থেকে পাকিস্তানের উজিরে আজম। কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা খাজা পরিবারের সমান হলেও তিনি ছিলেন ঢাকা থেকে কলকাতার উর্দু জবানে অভ্যস্ত বেশি। বাড়িতে খোট্টাইয়া উর্দু ব্যবহার করতেন তবে বাইরে গেলে চোশত উর্দু প্রধান ব্যবহার করে বড় হয়েছেন। তা না হলে তারই ছোটভাই খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে পারেন 'ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেউ নন।' ১৯৬৭ সালে একথা প্রকাশ্যে বলে বাংলার ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তারই বড়ভাই নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানি নয়া সংস্কৃতি নির্মাণে অর্থাৎ তাহজিব ও তমদ্দুনকে উর্দু ভিত্তিতে পার করাতে চাইবেন না তো আর কী চাইবেন। এমন বিশ্বাসঘাতক প্রতিশ্রুতি গিলে খাওয়া পাকিস্তানি উজিরে আজম তখনো পূর্ববঙ্গ সফরে এসেই পল্টন ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই পুনঃঘোষণা করেছিলেন। ছাত্ররা তো ক্ষেপে গিয়ে প্রতিবাদও করলেন এবং সচেতন গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদিক রাজনীতিমনস্ক মানুষ পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন খাজা সাহেবের ডিগবাজি খাওয়াতে।

বঙ্গসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নয় কেবল এই অঞ্চলের অধিকার সচেতনতা মানুষকে সামান্য হলেও চিন্তিত ও বিব্রত করে তুলেছিল বলেই উল্লিখিত এই রাজনীতিবিদদের মুসলিম লীগীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েই প্রতিষ্ঠা করলেন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'। কিন্তু এদের বক্তব্য বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষা। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যকে রূপান্তরিত করার চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াতে হবে, এটাই ছিল মুসলিম লীগ রাজনীতি বিরোধিতার ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের প্রধান। আসামে বঙ্গাল খেদা আন্দোলন ও লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসাম সরকারের বহিষ্কারাদেশে পূর্ব বাংলার তার পিতৃভিটায় এসেছিলেন। টাঙ্গাইল সন্তোষ জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে মুসলিম লীগ বিরোধিতার ছাউনিতে ঢুকে পড়লেন। পূর্ব বাংলার প্রদেশে তখন পাকিস্তানি কায়দায় রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ

করে বিরোধী রাজনীতির পতন এলো এই আওয়ামী মুসলমান লীগের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন মওলানা ভাসানীই। সংগ্রামের মধ্যদিয়েই আওয়ামী মুসলিম লীগ ছড়িয়ে গেল সবখানে। মানুষ আওয়ামী লীগ বলতে পাগল। কারণ তারা চাইছিলেন দমন-পীড়নের হাতিয়ার যে মুসলিম লীগ তারা সাধারণত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছিল না। এরই মধ্যে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ধর্মঘট এবং লিয়াকত আলী খানের মূলনীতি রিপোর্টবিরোধী আন্দোলন তরুণ সচেতন ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। এসব মুসলিম লীগ পরিকল্পনায় বাংলার মানুষকে কদর করা হয়নি। ফলে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চমধ্যবিত্তের সন্তানরা এসব সরকারি নিপীড়নে ক্ষুব্ধ হলেন এবং প্রতিবাদ জানাতে একত্রিত হলেন। এ ছিল ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সাল। মাঝখানে ১৯৫০ সাল। বাংলার নিগৃহীত গরিব কৃষক শ্রেণি যারা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রাণ দিচ্ছিলেন নানা স্থানে সংগ্রামে-বিদ্রোহে, তাদের ওপর ব্রিটিশের পর মুসলিম লীগ সরকারের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর দমন-পীড়ন নেমে এলো। এই সময় কৃষক শ্রেণি তাদের শ্রমের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তেভাগা আন্দোলন-তেকুটির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। প্রাণ দিয়েছেন অনেকেই দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, খুলনাতে। জমিদার, জোতদাতাদের প্রভুত্ব খাটিয়ে মেহনতি কৃষক শ্রেণির অধিকারকে উপেক্ষা করেছিল। লড়তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন বহুজন। কিন্তু এমন কৃষক নেতা-সংগঠক ও কর্মী-অসংখ্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা আর মামলায় কারাদণ্ড ভোগ ১০, ১২ যাবজ্জীবন কত রকম। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বেশিরভাগই ছিলেন ইলা মিত্রের নাচোল বিদ্রোহের বীর সৈনিকরা। ওদের ওপর চলছিল নিদারুণ অত্যাচার। এই না দেখে রাজনৈতিক নেতারা যারা স্বল্পমেয়াদি কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন, তারা বিদ্রোহ করলেন কয়েদিদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। গুলি চালিয়েছিলেন ইংরেজ জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মি. বিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা এক ভদ্রলোক ছিলেন রাজশাহী জেলার পুলিশ সুপার। রাজশাহী জেলার খাপড়া ওয়ার্ডে নির্মম রাজবন্দি হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ সুপার তার বাহিনী নিয়ে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়েছিলেন বিদ্রোহী কয়েদিদের রাজনৈতিক 'আন্দোলন'কে ঠেকাতে। কিন্তু জেলের ভেতরে গিয়ে খাপড়া ওয়ার্ডে যে নাটকীয়-পৈশাচিক হত্যা ও রক্তের প্লাবন লক্ষ্য করলেন, তাতে পুলিশ সুপারের মতন কড়া নিয়ম মানা ব্যক্তিটিও ক্ষিপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎই জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং পুলিশ বাহিনীকে হুকুম দিলেন চলে যাওয়ার জন্য। ... এ কিন্তু পাকিস্তান আমল ছিল। সেই সরকারের এমপি হয়েও তিনি সেদিন যে আইনি বিধান মানতে পেরেছিলেন। বিল সাহেব তা পারেননি। গোলাকৃতি প্রায় খাপড়া ওয়ার্ডের বিশাল বিশাল ২১টি জানালায় জেলপুলিশ রাইফেল বসিয়ে এন্তার গুলি চালিয়ে সাতজন কমিউনিস্ট নেতাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তীকালেও কিছু হয়নি।

নাচোল বিদ্রোহের কথা বলছিলাম, সেই এলাকার আদিবাসী সাঁওতাল কৃষকদের তেকুষ্টির লড়াই তখন চলছিল, অন্যান্য জায়গার মতন। নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় কমিউনিস্ট পার্টি ওম্যান ক্ষীণাঙ্গী নারী পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে ইলা মিত্র।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের জোতদার মিত্র বাড়ির ছেলে কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। চলে এসেছিলেন গ্রামাঞ্চলে। জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে লড়াকু কৃষকদের। ইলা মিত্র দেখলেন তার শ্বশুর জোতদার হলেও তার উঠোনটা সব কৃষকের অবাধ চলাচলের জায়গা। রাতে সবাই কাজ সেরে চলে আসেন ওইখানে। বসেন, কথা বলেন, পালাগান জুড়ে দেন। এ এক ব্যতিক্রমী জমিদার বাড়ি। এমনিভাবেই কৃষকনেতা অনিমেষ লাহিড়ী আর আজহার আলীর যোগাযোগ হলো। ইলা মিত্র যুচিকের বোন, স্তালিননন্দিনী কাজে লেগে গেলেন। ওদের লেখাপড়া শেখান। বাবার গল্প বলেন আর এক হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন। ইলা মিত্রের ভয়-ডর ছিল না। তিনি রাত-বিরাতে গ্রামে গ্রামে সাঁওতাল পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়ে লোকজনকে লেখাপড়া শেখানো এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি নিয়ে আলাপ করতেন। এমন করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে ছিলেন ইলা মিত্র, হয়ে গেলেন রানীমা। শব্দটা তার পছন্দ ছিল না তবু গ্রহণ করলেন ওটাই বোঝাতে 'রাজা-রানী' কেউ নয়রে, মানুষ ছাড়া। ওরা জবাব দিতেন তু হামাদের রানীমা।... নাচোল বিদ্রোহ করলেন কৃষকরা। মাতলা মাঝির বাড়ি ছিল ওদের জমায়েতের জায়গা। সিদ্ধান্তের পর যখন চূড়ান্ত হতো, যুদ্ধে যাবো। তখন পার্টি ঠিক করে দিয়েছিল, কি করলে সবাই খবর পাবেন। খবর পেলে ছুটে আসবেন, সংগ্রামের ডাক এসেছে ভেবে, কেন্দুয়া-মাসোরা গ্রামের প্রান্তে ছিল এক লম্বা তালগাছ, তাতে বাঁধা ছিল 'ক্যানাস্তারা টিল' সাথে ছিল দড়ি বাঁধা। কোন বিপদ এলে বা মিটিং কিংবা আক্রমণ মোকাবেলার জন্য ওই দড়ি ধরে টান দিলেই আশপাশের সব লেবাসের মেয়ে-মরদ সবাই এসে ওই তালতলায় একত্রিত হতেন। সবাই উপস্থিত বিপদ বা সংকট সমস্যা নিয়ে আলাপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। সেই মতন অ্যাকশন হতো।

এমনি একদিন চোখে পড়ল, গ্রামের পুলিশ আসছে। খবরে সবাই তালতলায় জমা হলেন। পুলিশকে আমন্ত্রণ করে, দারোগাসহ কজনকে মেরে ফেলল। পরিস্থিতিতে গ্রামময় পুলিশ-মিলিটারির বেপরোয়া অত্যাচার-নির্যাতন চলতে থাকল। সে যে কী নির্মম নৃশংস, অবর্ণনীয়, তার সীমা নেই। বাবাকে বেঁধে রেখে যুবতী কন্যাকে কিংবা স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ, এ তো ছিল নিত্য ঘটনা। তারপর পুরুষ-নারী উভয়কেই গ্রেপ্তার করে ফেলে রেখেছিল জেলখানায়। যারা বাইরে ছিলেন তাদের জমিদারদের পোঁধরা, ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর লাঠিয়াল, গুপ্তচর নানা ধরনের গুজব রটিয়ে পারিবারিক জীবনেও দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল। এর বহু উদাহরণ আছে। দুটো দৃষ্টান্ত হলেই পাঠক বুঝতে পারবেন কেমন ছিল সে অত্যাচার-মিথ্যাচার। তেভাগার সংগ্রামকালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন আজহার হোসেন। পুষ্টদেহে বলিষ্ঠ যৌবন ছিল অনাহারের, সাহসের অসম্ভব ওজন তার। আজহার গ্রেপ্তার হলেন। অত্যাচার থানা পুলিশ যে কিভাবে করেছিল তার বর্ণনা দিয়েছিলেন, মনশক্তি ছিল বলে শুনেছিলাম। এই বলিষ্ঠ সংগঠককে গ্রেপ্তারের পর চরম নির্যাতন চালিয়ে হাত ভেঙে দিয়েছিল। শরীর তো ক্ষতবিক্ষতই। তবু তারই জেল হলো ১০ বছর। জমিদারের ফড়িয়া বাহিনীর এক চশমখোর আজহার ভাইয়ের স্ত্রীর পেছনে লাগল। বানিয়ে বলতে থাকল, ওর তো যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। শরীরটাকে খেতলে দিয়েছেন। আর জেল থেকে বের হতে পারবে না। জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করবে কেন? নিত্যদিন গ্রাম্যবালা নববধূকে এমন বলতে থাকলে, মন তার ঠিক থাকে কী করে? একদিন ওই টাউট-জমিদারের লাঠিয়ালের কথা বিশ্বাস করে স্বামীহারা বছর বছর থাকার আশঙ্কায় ওকেই বিয়ে করা সাব্যস্ত করে। এ তো গেল নিম্নবিত্ত গরিব ঘরের কৃষকের মেয়ের কাহিনী। পরে আজহার ভাই ছাড়া পেয়ে ওই গ্রামেরই এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিলেন। তাজ্জব ঘটনা, নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত আজহার হোসেন কিছুই করতে পারেন না। এমনকি প্রাতঃক্রিয়াতেও তাকে সাহায্য করতে হয়। ভদ্রমহিলা তার যা কিছু প্রয়োজন সবই করে দেন। বাকি সময়টা অন্যবাড়িতে কাজ করে কিংবা ধান ভেসে দিন গুজরান করেন। ভদ্রমহিলার সামান্য জমি ছিল, যার উৎপাদিত ফসল কিছুটা সহযোগিতা করছিল সংসার টানতে। তাও গ্রাস করেছিল জবরদস্তি। ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করেননি, পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে তাকে বেঁচে তো থাকতে হবে। শেষদিন পর্যন্ত ভাবী আজহার ভাইয়ের সেবা করে গেছেন। ... এটাই ছিল সামাজিক বৈষম্য এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বসৃষ্টির কৌশল। একে যদি সংস্কৃতি বলি বা বলতে তো হবেই তাই এতকাল বহু ঘরেই প্রত্যক্ষ করেছি। আবার ছাত্রজীবনে এমন ঘটনার কথা শুনে যাকে শ্রদ্ধা করতাম, তাকে ঘেন্না করতেও শিখেছিলাম। আমাদের একজন শ্রমিক কমরেড, দুরন্ত কর্মী সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পার্টিকে সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার মাঝেমধ্যেই পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করত ফলে অনেকে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন, বাদ বাকি সবাই চলে যেতেন আন্ডার গ্রাউন্ডে, আত্মগোপনে। শ্রমিক নেতার সুন্দরী স্ত্রী পার্টি কমরেডদের সহায়তায় সংসার চালাতেন, কেউ অসম্মান করতে সাহস করতেন না। কিন্তু অনেক বেশি স্নেহাস্পদ ও পার্টির বহু পুরনো সিমপ্যাথইজার তাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেছিল। ওই সাহায্যের সুযোগ। আমরাও ওই ভদ্রলোককে সমীহ করতাম। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। চাঁদা দিতেন রীতিমতন। কিন্তু একি করলেন? আমরা সবাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ তার ওপর।

সম্ভবত পার্টি এ সংকট নিরসন করেছিলেন এবং তাকে আস্থা ও বিশ্বাস থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। এমনি ধরনের আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই, সে হলো দেশের সবসময়ের বড় রাজনৈতিক দল। তার সাধারণ সম্পাদক গেলেন জেলে। স্ত্রী অসম্ভব সুন্দরী অধ্যাপিকা। দলের অন্য এক শীর্ষস্থানীয় নেতা সৌন্দর্যের ঈর্ষান্বিত ছিলেন। পদের লোভ নেই তাই তিনি সম্পাদকের স্ত্রীর কাছে মাঝেমধ্যেই মিথ্যাচার করেন এবং ভোগের ভেতর সম্পাদককে বৈরী মানসিকতার খবর দিয়ে বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত করতে থাকেন। এমনিভাবে ভদ্রলোক দীর্ঘদিন কারাবাস করায় অধ্যাপিকা তাকে ছেড়ে একজন পাঞ্জাবি অধ্যাপককে বিয়ে করে পশ্চিমে চলে যান। এদিকে ভদ্রলোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে রাজনীতিই ছেড়ে দেন।

এমন বহু ঘটনাই ঘটেছে অতীতে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিক এর অংশটা এতই স্বচ্ছ ছিল যে, এ নিয়ে কোনো বিরোধ বিতর্ক দলের তেমন কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি। যেমন সাহস দেখিয়েছেন তেমন সহিষ্ণুতার প্রমাণও রেখেছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সহিংসতা ও হিংস্রতার নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো– মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জেনারেল মঞ্জুর এবং কর্নেল তাহেরকে হত্যা। তাই হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন দেশের রিপ্যাট্রিয়েট আর্ম অফিসার হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ– এই ধারণা সাধারণ মানুষেরও। পদমর্যাদা এবং ক্ষমতালিপ্সা ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই ওই হত্যাকাণ্ডগুলো একটার পর একটা ঘটায় সত্যিই তো ভাগ্য খুলে গিয়েছিল ক্ষমতা জবর দখলের। কিন্তু এরশাদের স্বৈরশাসনের টাকা দশ বছর এ দেশের মানুষ যে দুর্বিসহ জীবনযাপন করেছে রাজনৈতিকভাবে এবং সন্ত্রাসের যে রাজত্ব সে সময় কায়েম হয়েছিল তা কেবল জামায়াতি হিংস্রতার সঙ্গেই তুলনা করা যায়। মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে ছাত্র হত্যা, গণতন্ত্রকামী যুবক নূর হোসেনকে গুলি করে হত্যা ইত্যাকার পৈশাচিকতা পাকিস্তানি হায়েনাদেরও হার মানায়। পাঠক মনে আছে নিশ্চয়ই, কিভাবে পাকিস্তানিরা আসাদকে হত্যা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ইউক্যালিপটাস এভিনিউ (বর্তমান জহির রায়হান সরণি)। মওলানা ভাসানী হাট হরতালের ডাক দিয়েছিলেন উনসত্তরের জানুয়ারিতে। ঢাকার শিবপুরের সন্নিকটে হাতিরদিয়া হাট হরতালের সংগঠক আসাদুজ্জামান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের নেতা; আহতাবস্থায় ঢাকা এসেছিলেন হরতালের খবর সংবাদপত্রে দেয়ার জন্য। যখন শুনলেন হলে যে ২০ জানুয়ারি ছাত্রবিক্ষোভ হবে। আসাদ দায়িত্বশীল সংগঠক হিসেবে ঢাকাতেই থেকে গেলেন। তারপরের ইতিহাস আমাদের সবার জানা। ওয়েস্ট অ্যান্ড স্কুলের ছাত্র মতিয়ার কিশোর, তাকেও হত্যা করল এরশাদের পুলিশ নির্মমভাবে। ২৪ জানুয়ারি তাই ফুঁসে উঠেছিল বাংলাদেশ বিশেষ এমন অগ্নিগর্ভ রাজধানী ঢাকা দেখিনি কেউই। প্রশাসনও প্রত্যক্ষ করেনি এমনটি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সেদিন সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারপতি পালিয়ে জনরোষ থেকে বেঁচে ছিল। জনগণ তাই তো পাকিস্তানি দখলদারকে মর্মান্তিক পরিচিতিই চেয়েছিলেন, তারই প্রকাশ বিস্ফোরণ ঘটল উনসত্তরে।

কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল ও নিরঙ্কুশ বিজয় পূর্বে এবং পশ্চিমে জাতীয় পরিষদ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলো বটে এবারে শুরু হলো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেরই অংশ– বাঙালিরা যেন ক্ষমতাসনে বসতে না পারে। বিজয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আশ্বাস দিল সামরিক জান্তার প্রধান আইয়ুব খানকে গদিচ্যুত করে আসা জেনারেল ইয়াহিয়া– ইউ উইল বি দি নেক্সট প্রাইমমিনিস্টার। কিন্তু পাঞ্জাবি যে চক্রান্ত চলছিল, তা সক্রিয় হয়ে উঠল এবং ঢাকায় জাতীয় অধিবেশন ডাকায় বাতিল করিয়ে দিল ওই চক্র। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার প্রবল রুদ্ররোষ ফেটে পড়ল রাজপথে, বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। আগুনে যেন ঘি পড়ল। জ্বলে উঠল সারাদেশ এমনকি পশ্চিমের কিছু অঞ্চল শুধু নয় সচেতন প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও রুখে দাঁড়ালেন। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠতেই জনগণ নেমে পড়লেন ময়দানে। বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন এই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে লাখো লোকের সমাবেশে। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে। এসবের উদ্দেশ্য এক ছিল? জনগণ বুঝতে পেরে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগান দিয়েছিল। ... পূর্ব বাংলায় এমন একটি পরিস্থিতি যখন অগ্নিগর্ব হয়ে গড়ে উঠল তখন কুচক্রী ক্ষমতাপ্রত্যাশী রাজনৈতিক মহল সামরিকজান্তাকে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল প্রাণপণ। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা সংঘবদ্ধতা, সাহস স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে এক এক প্রধান প্রতিরোধ গড়ে তুলল। গণজাগরণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিল। ... বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ৩২ নাম্বারের বাড়ি থেকে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল তাজউদ্দীন আহমদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ওপর। তিনি নানা বাধা প্রতিবন্ধকতা উতরে মুক্তিযুদ্ধকে সমন্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং প্রবাসী সরকার গঠন করলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হয়ে চক্রান্তের জাল বিছাতে থাকলেন। আর মার্কিনিরা তাকে সাহায্য করল সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রয়োগে মার্কিনি আক্রমণ পরিচালনার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশেষে আমরা বিজয়ী হলাম নানা চড়াইউতরাই পেরিয়ে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। দেশ পাকিস্তান মুক্ত হলো। তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা ২২ ডিসেম্বর ঢাকা এলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা চলল। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২। তিনি পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটেন গেলেন। সেখান থেকে নয়াদিল্লি হয়ে ঢাকা পৌঁছলেন, কলকাতা এবং আগরতলা যেতে পারলেন না। পরে কলকাতা গেলেন বটে কিন্তু আগরতলা আর যেতে পারলেন না। সেই খন্দকার মোশতাকই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেন ভাড়াটিয়া সেনা অফিসারদের দিয়ে। ওরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু একবার ভেবে দেখল না, এমন জনপ্রিয় অভিসংবাদিত নেতাকে মারলে দেশটা কঠিন দুর্যোগে পড়বে, একথা বিন্দুমাত্র ভাবল না। নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে অন্ধ হয়ে দেশের সর্বনাশ করে ফেলল।

তারপর থেকে দেশে ক্যু, পাল্টা ক্যু, হত্যা আর তার মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতা দখল চলতে থাকল। এমনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ঘটনাবলি দেশের জনগণের ইপ্সিত স্বপ্নকে আবার কেড়ে নিল সেই সামরিক বাহিনী। ফলে জিয়া ক্ষমতায় এলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এক মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রশাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়ে জামায়াতপন্থীদের ছাড় দিতে শুরু করলেন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে দেশত্যাগী জামায়াতের আমির গোলাম আযমকে ঢাকা আসার সুযোগ করে দিল। শুরু হলো জামায়াত পুনর্বাসন। একে একে জামায়াতি ক্যাডার নেতা, আলবদর সবাই দিনে দিনে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। পত্তন করল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির জিয়ার আমলে। কিন্তু ডালপালা বিস্তার করল জিয়ার স্ত্রী খালেদার জামানায়। এমনকি খুনি জামায়াতিদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিল ওই জামায়াত প্রধান নিজামী এবং উপপ্রধান আল মুজাহিদের গাড়িতে, মন্ত্রী বানিয়ে। হায়রে স্বদেশ, যার জন্য লাখো মানুষ নির্বিচারে হত্যা হলো যাদের হাতে, যারা এই রাষ্ট্রেরই জন্মের বিরোধিতা করেছিল, আজো করে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে, তারাই হলো এদেশের 'ভাগ্যনিয়ন্তা' ওই বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার বদৌলতে, নিজ স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে।

এ দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েছে। দল-উপদল, দলছুট– নানা ধরনের রাজনীতি কষা মানুষের মনে হয় ব্যবসাই ছিল দলবদল, সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতায় থেকে অথবা না থেকেও নানাধরনের অপকর্ম ও দর্নীতির মামলা থেকে বাঁচার জন্য এদল থেকে ওদলে যোগ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলে আশ্রয় নেয়া এ দেশের রাজনৈতিক ধারাকে প্রচণ্ডভাবে কলুষিত করেছে। দেশের বহু খ্যাতিমান রাজনীতিক বার বার দলবদলের রাজনীতি করে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তারা আজও দলে আছেন, জোরেসোরে কথা বলেন। কিন্তু

একজনকে 'সাবাসী' দিতে হয়। তিনি হলেন এরশাদ। কত রকম ভানুমতির খেলই দেখাচ্ছেন। ভদ্রলোক পাকিস্তানে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালে তার সে সময়ে সেনাবাহিনীতে থাকার ইতিহাস কলঙ্কিত, তবুও তিনি বঙ্গবন্ধুর আশ্রয় পেয়েছিলেন বলে দেশের সেবাহিনীতে বহাল তবিয়তে ছিলেন এবং চক্রান্তের মাধ্যমে জিয়াহত্যার পর ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার স্টাইলে দেশে প্রশাসন চালাতে শুরু করেছিলেন, তিনি ক্ষমতার কার্যকলাপের কারণে ঘৃণিত হয়েছিলেন। শুধু কি তাই– দেশে-বিদেশে অর্থ ও নারী কেলেঙ্কারির জন্য ঘটনা সচিত্র ছাপাও হয়েছে। এসব ঘটনা লোকমুখেও ছিল। বাংলার মানুষ অবশেষে একদিন বিস্ফোরণ ঘটাল এবং নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে গদিচ্যুত হলেন বটে কিন্তু রাজনীতির কি বিচিত্র খেলা, কিছুদিন পরেই এরশাদ আবার রাজনীতির ময়দানে নিজের দল জাতীয় পার্টি নিয়েই ফিরে এলেন। মামলাকে মুলোর মতন ঝুলিয়ে একবার বিএনপি আবার আওয়ামীরা তার গণসমর্থন আদায় করতে থাকলেন। এই খেলার সময় ভদ্রলোক কত ধরনের হ্যাঁ আর নার খেলা দেখাতে দেখাতে নিজ জাতীয় পার্টির বিতর্কিত আদর্শহীন রাজনীতিই বজায় রেখে চলেছেন। তার গৃহবিবাদ, দলীয় বিবাদেও পরিণত হয়েছে বার বার। এবার তিনি মহাজোটে থেকেও 'অভূতপূর্ব বিরোধী দল' মেনেছেন। দলীয় কোন্দলে নানা কলা-ছলা দেখানোর পর তার প্রথম স্ত্রী রওশন এরশাদ সুযোগ পেয়ে গেলেন বিরোধীদলীয় নেত্রী হওয়ার। এর পেছনে 'বিরোধী দল' হিসেবে বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা কাটানোর একটা কৌশল মহাজোটের ছিল। আবার বিরোধী দলের সহমর্মী হিসেবে এই বিরোধী দলের নেতা কজন মন্ত্রীও হয়েছেন। কী অদ্ভুত অঙ্ক। এখন কিন্তু বিএনপির বিরোধী দল হিসেবে তকমাটা আনুষ্ঠানিকভাবে কেটে গেছে। বিশেষ করে তিন মাস খালেদা জিয়া যে স্বঘোষিত অবরোধ চালালেন এবং নামে হরতাল ডেকে জামায়াতের সমর্থনে পেট্রলবোমা কী নির্মমভাবে মানুষ পুড়িয়ে মারলেন, সে কথা এত সহজে ভুলতে পারবে এ দেশের জনগণ? তাছাড়া নির্বাচনে অংশ না নেয়ার মতন সিদ্ধান্ত কার বা কাদের নির্দেশে বা পরামর্শে গ্রহণ করেছিলেন, তা যে কত বড় ভুল হয়েছিল, আজ খালেদা জিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। কিন্তু তিনি তো জামায়াতের অর্থায়নে লন্ডনে পলাতক জীবনযাপনকারী সন্তান তারেক জিয়ার পরামর্শে বোধহয় বাংলাদেশে পলিটিক্স করছেন। বছরের পর বছর পলাতক আসামি তারেক জিয়ার সঙ্গে ইতিপূর্বে মালয়েশিয়াতেও দেখা করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি এবং বিএনপির ভূমিকা পর্যালোচনা করে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য খালেদা এবং তারেক ওমরাহ হজ পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। সেখানে আলোচনা হবে মায়ে বেটায়। হয়তো সৌদি বাদশাহর বুদ্ধি পরামর্শও পাবেন। যাকগে সেসব। দেশে ফিরে এসে খালেদা কী করেন আর কী বলেন, তার ওপরই ফলাফল প্রকাশিত হবে। মুশকিলটা হলো বিএনপিকে দল হিসেবে দাঁড় করাতে পারছেন না কারণ তার সব ঘনিষ্ঠজন নেতাকর্মী, দেশবাসী সবাই চাইছেন জামায়াতকে ছেড়ে রাজনীতি করুক বিএনপি। সে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সামনা-সামনি তারেকের সাথে কথা না বললে তো হবে না। কারণ তারেককেই দলের উত্তরসূরি মনে করেন খালেদা। না হলে জিয়া থাকবে না আর তাদের প্রতিপত্তিও খয়ে যাবে। তাই খালেদা জিয়া আর লণ্ডনে পালিয়ে থাকা তারেক জিয়ার ওমরাহ করার তারিখটা একই সময়ে। ওদের মধ্যে শলা-পরামর্শ খুবই দরকার কারণ জামায়াত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিলে দল ঠেকানো যাবে না। বর্তমান মহাজোট সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্তে যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার শুরু হয়েছে, প্রায় ৪৪ বছর পর। যে সরকারই যখন এসেছে, তারা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছেন এ ব্যাপারটা। অবশেষে হাসিনা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের হোতা খুনি, ধর্ষক, লুটেরাদের গ্রেপ্তার করে অভিযোগ গঠনের জন্য দীর্ঘ তদন্ত এবং বিচারের ব্যবস্থা নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। খবরের কাগজে খবর বেরুতে শুরু করল অমুককে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে। এমন সংবাদ বের হলে, কে বাসায় বসে থাকবে? হলোও তাই, বাচ্চু রাজাকারকে গ্রেপ্তার করা হবে সংবাদটা বের হতেই সে পালিয়ে গেল'। কোথায় গেল তার হদিস মিলল না। ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় বাচ্চুর ফাঁসি দেয়া হলো বাচ্চু তো দেশেই নেই। রায় ঘোষিত হলেও জনগণ কিন্তু খুশি হতে পারলেন না। দ্বিতীয়, যে লোকটি বিগত ৪০ বছর কসাই, জল্লাদ নামে পরিচিত হয়ে এসেছে, তার হলো যাবজ্জীবন। রায়ের প্রতিবাদে সমাবেশ করল কজন ব্লগার ও সংস্কৃতি কর্মী। তাদের উদ্যোগে সৃষ্টি হলো, সে এক অনন্য সাধারণ প্রতিবাদ সমাবেশ। ক্রমে সারা শাহবাগ চত্বরটা সাধারণ প্রতিবাদী মানুষে জনসমুদ্রে পরিণত হলো। সৃষ্টি হলো গণজাগরণ মঞ্চ। দিনরাত প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করলেন বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশু পর্যন্ত। এ এক অভাবিতপূর্ব জমায়েত। লোকে লোকারণ্য। জাগছে সবাই গানে, নাটকে বক্তৃতায়, স্লোগানে। সে কি ঘৃণার বিস্ফোরণ কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবি সবার। আপিলে ফাঁসি হয়ে গেল। জনতার এ বিজয় মানুষের প্রবল ঘৃণার বিস্ফোরণে প্রমাণ করে দিল। মানুষ কী চায়। কিন্তু এর পর থেকেই ব্লগারদের হত্যা শুরু হয়ে গেল। মুক্তমনের মানুষ যে কথাগুলো বলছিলেন, লিখছিলেন সবাই গ্রহণ করে এই আন্দোলনে ছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখা গেল, হেফাজত নামে এক ধর্মভিত্তিক সংগঠনের আবির্ভাব। তারা ঢাকায় সমাবেশ করতে চাইল, সরকার দিল না অনুমতি কিন্তু পরে দেখা গেল অনুমতি পেয়ে গেছে। হাজার হাজার মাদ্রাসার নাবালক 'তালেবে এলেম'দের টেনে আনা ঢাকা শহরে। জমায়েত ঘটাল এবং এর মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা ছিল ঢাকা শহরে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো এবং ক্রমে প্রশাসন দখল করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তাঘাটে প্রচুর ভাংচুর করতে শুরু করে। সরকার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হেফাজতের জমায়েতকে পুলিশি আক্রমণে ধ্বংস করে দিল। এই ঘটনার সময় ছিল রাত আড়াইটা। পুলিশ হামলায় কেউ আহত-নিহত হবে না এটা কল্পনাতীত। তবু বলব, 'যেভাবে হেফাজতকে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তা অসাধারণ। কিন্তু হঠাৎ করে ভোরবেলা ফোন পেলাম, 'গণজাগরণ মঞ্চকে নিশ্চিহ্ন করে উচ্ছেদ সম্পন্ন করেছে। এখানে নাকি পুলিশ করেনি করেছে করপোরেশন। সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে করপোরেশনের এ কাজ করার সাহস কোত্থেকে। পরে প্রমাণিত হলো, মহাজোট সরকার এখন আর গণজাগরণ মঞ্চ চাইছে না। তাই জামায়াত আর হেফাজতকে খুশি করতে মঞ্চ উচ্ছেদ হলো। দেখা গেল, সরকার সমর্থক বিএনপি-হেফাজত বিরোধীরাও ক্রমেই মঞ্চে আসা বন্ধ করে দিলেন অথচ তাদের অনেকেই কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। মঞ্চ দু'তিন টুকরো হয়ে গেল। একটি– সবাই বলেন মূল অংশ সজাগ ও সক্রিয় রইল আন্দোলন। এখনো রায় ঘোষণার দিন হলেই জমায়েত করেন।

মহাজোট সরকার এত বড় একটি মহান কাজ দীর্ঘদিন অবহেলিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এবং ফাঁসির রায় কার্যকর করে; তারা কেন ঢিমে তেতালায় কেন চলছেন, এটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সরকার আইনের শুদ্ধপথে চলতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব করছেন, যা জনগণের মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, তবে কি সরকার জামায়াতের সমর্থন পাওয়ার জন্যই এমন করছে? ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়েছে ৫ জানুয়ারি ১৫৪ জন বিনা ভোটে নির্বাচিত, এটাও তো হাস্যকর।

লোকে যদি ভোটই না পেতেন, তবে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়া উচিত। অল্পসংখ্যক ভোট না পেলে একজনকে নির্বাচিত বলে ধরা হবে না। যারা ভোট ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন, তারা নির্বাচন হলে আদৌ জিতবার মতন কিংবা গ্রহণযোগ্য সম্মানীয় সংখ্যক ভোট পেতেন কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার।

বর্তমান এই সরকার ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই অবস্থায়ই থাকবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু সরকার কিংবা দল কি খবর রাখেন, কোন সদস্য তার এলাকায় কী করছেন? দলে অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘদিনের কর্মী সংগঠকদের কি কোনো স্থান আছে, না তাদের পরামর্শ নেয়া হচ্ছে, নাকি কোটারি তৈরি করে নিজেদের আখের গোছানোর কাজ করছেন।... আওয়ামী লীগ বড় দল।

স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতিপত্তি থাকবে। তাই বলে মহাজোট সরকারকে 'আওয়ামী লীগ সরকার' বলা কি ঠিক। যখন জোট বেঁধেছেন তখন অন্যদেরও সম্মান করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী থেকে সবাই আওয়ামী লীগ সরকার বলতেই ভালোবাসেন। কিন্তু বলা উচিত মহাজোট বা ১৪ দলীয় সরকার। যদি নাই বলবেন তবে জোটবদ্ধ হলেন কেন? জোট বেঁধেছিলেন ছোট ছোট দল ১৩টিকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু মহাজোট করলেন এরশাদকে সাথে পাওয়ার পর। মহাজোটের পার্টনার এরশাদ কখন কী বলেন, শুনতে কি পান?

দলের ভেতরে, জোটগামী দলগুলো কে কী যে বলেন, সে কথাও খেয়াল করা উচিত। ছি-ছি রাজনীতি শেখার কথা বলার মতন ধৃষ্টতা আমার নেই কিন্তু সাদা চোখে যা দেখি এবং সংবাদপত্রে, টিভিতে যা শুনতে-পড়তে পাই, তা কি আদৌ উপাদেয়? অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনভাবে প্রকাশ্যে আসে কেন? যে মন্ত্রী যে মন্ত্রকের দায়িত্বে তিনি সেই সংক্রান্ত কথা বলবেন, এটাই রীতি কিন্তু এখন দেখছি যে মন্ত্রী যা খুশি নিজের হোক আর পরের হোক বলে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু সরকারের দলের যেমন একজন মুখপাত্র বা সাধারণ সম্পাদক কথা বলবেন, তেমনি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একজন ব্রিফ করেন। তারপর সবাই সব বিষয়ে বলাটা শোভন নয়। সমালোচনামূলক কথা হলে তো কথাই নেই। জটিল না, এটা কৃতিত্ব কিনা?

সুরঞ্জিত বাবু তো রসস্থলে হেসে হেসে অনেক কথা বলেন, যা মহাজোটের বৈঠকে আলোচিত হওয়া উচিত। নিজ দল বা অন্যদল যারই হোক তার কথা ও কাজের প্রতিবাদ প্রকাশ্যে করলে কি সরকারের স্বচ্ছতা প্রমাণ হয়? না বাবু, তা হয় না। এতে সরকারের ঐক্যবদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' শিরোনামটা এতই, বিস্তৃত যে একটা বই লিখে ফেলা যায়। শুধু ছাত্র বন্ধুদের সম্পর্কে বলি, টেন্ডারবাজি, ভূমি গ্রাস, চাঁদা তোলা, ভর্তিবাণিজ্য, পুলিশের সাথে সন্ধি করে সুবিধা আদায় তো আছেই। নিজেদের সঙ্গে দল সৃষ্টি করে একদল আকের দলকে স্বার্থোদ্ধারে হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না, এদের যেভাবেই হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এদের কাজে লামাগ দিতে হবে। না হলে এরা এবং এদের মতন আরো কিছুর অপকর্ম আপনাদের সফলতাকে খর্ব করছে এবং সরকারের বদনাম করছে। কারণ ছাত্রলীগ হলেও এর অপপ্রভাব দলের ওপর গিয়ে পড়ে।

জনগণের দাবি, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' বলে বার বার মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জামায়াতের মতন সংগঠন, ধর্মাশ্রয়ী তাদের তো বাংলাদেশের ৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী রাজনীতিই করতে পারার কথা নয়। কিন্তু এখনো তারা 'হরতাল' ডাকে। বিবৃতি দেয়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। ওরা ওদের ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ কোনোদিনও বন্ধ করবে না। যদি না দলকেই নিষিদ্ধ করা হয়।

রিট আছে বলে হয়তো অজুহাত দেখাবেন মহাজোট, কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যেন জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় এবং এর যত অর্থকরী প্রতিষ্ঠান আছে সেসব যেন সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এর অর্থ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তা দিতে পারেন। এই ব্যবস্থা নেয়ার আগেই নিজেদের দল, অঙ্গসংগঠন এবং মহাজোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে কৌশলে এরা না ঢুকে পড়তে পারে, সেদিকেও সতর্ক-সচেতন থাকতে হবে। এরা কিন্তু রাষ্ট্রীয় চারস্তম্ভের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুড়ো আঙুল দেখান হিন্দুজনগোষ্ঠী ও আদিবাসী এমন কি বাউল সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারছে না। এদের ধন-সম্পদ বিশেষ করে বাড়িঘর দখল করে এদের নিঃস্ব করে ছাড়ছে। সেদিকে সরকারি প্রশাসন যেমন তেমনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং দল-সংগঠনকে লক্ষ্য রাখতে হবে আজও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকারের আমলে এদের উচ্ছেদ করে লুটপাট করছে। হত্যা তো নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মন্দির ভাঙা, বিগ্রহ ধ্বংস করা এবং বিগ্রহের অলঙ্কার ছিনতাই চলছে নিরন্তর। কেউ কেউ দরদ দেখিয়ে উপদ্রুত এলাকায় যাচ্ছেন একবার সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য। তারপর...। কিছু নয়, আজও পর্যন্ত কোথাও প্রতিরোধ ব্রিগেড বা কমিটি করতে পেরেছেন বলে শুনিনি। ওদের দমন করার জন্য প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সাথে আইনি বিধানেও শাস্তির বিধান থাকতে হবে। আইন আছে কি? কিন্তু প্রয়োগ তো নেই।

সবশেষে একটি অনুরোধ সরকারের কাছে, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কারণ আপনার হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না, হয়ও না। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হয়েছি– অভিনন্দন। অভিনন্দন আপনার মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার ঘোষণায়। রাষ্ট্রে অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে, দেশবরেণ্য শ্রদ্ধেয় জনদের নাম সেগুলোর সাথে যুক্ত করতে ভুলবেন না।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশ ও রাজনীতি

অজয় রায়

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ-১৯৭১ সালের কালরাত্রির সূচনা থেকেই। সেদিন মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতক ছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের সমর্থিত এক ঐতিহাসিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ অর্জন করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ব্যাপারটা অবশ্য সহজ হয়নি। সেদিনের সংগ্রাম যে বাংলাদেশের বাংলাভাষীসহ সব বাংলাদেশি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এ বিষয়টি বিশ্ববাসী তথা জাতিসংঘের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার পথে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের চাপিয়ে দেয়া শাসনের ধরন যে ছিল উপনিবেশিক ধরনের এবং বাংলাদেশের বাঙালিদের সংগ্রাম যে বিশ্বব্যাপী চলমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ, নাইজেরিয়ার অংশ বায়াফ্রার জনগোষ্ঠীর মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম নয় বিশ্ববাসীকে সেটা বোঝানো সহজ হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত ৩০ লাখ দেশবাসীর আত্মত্যাগ এবং ২ লক্ষাধিক মা-বোনের আত্মদানের বিনিময়ে যে স্বদেশ সেদিন দেশবাসী অর্জন করেছে তা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্ববাসীর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরও পাকিস্তানি শাসকবর্গের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্য অল্পসংখ্যক দেশদ্রোহীদের সামনে রেখে যে আন্দোলন চালানোর চেষ্টা হয়েছে তা ফলপ্রসূ হয়নি। তারপরও পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। হাস্যকর হলেও পাকিস্তানে আশ্রয়

গ্রহণকারীদের অন্যতম মাহমুদ আলীকে একের পর এক মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে।

এটা সত্য কথা বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। বিষয়টি এ সময়কালের ইতিহাসে অন্যতম বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও কোরিয়ান উপদ্বীপও বিভক্ত হয়েছে ঠিক, কিন্তু সে দেশের বিভক্তির প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। সেখানে বিভক্তির ব্যাপারটি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল সেসব দেশের জনসাধারণের ওপর। তারা কোনোদিনই মন থেকে তা মেনে নেয়নি। সে কারণেই বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলে দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের ঘটনাটি যখন সংঘটিত হলো তখন পূর্ব জার্মানির জনসাধারণের মনে ওই পুনরেকত্রীকরণের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে সৃষ্টি হলো না তার কারণ যেমন পূর্ব জার্মানির তৎকালীন শাসক দলের নানা ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিহিত ছিল, তেমনি তার আরেকটি কারণ ছিল জার্মানির বিভক্তির বিষয়টি জনমনে কোনো সময়ই সমর্থন পায়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক সে রকম ছিল না। নানা কারণের ফলে উপমহাদেশের বিভক্তি অন্তত পক্ষে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের, বিশেষত বাংলার মুসলমান জনসাধারণের সমর্থনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল সেদিন। অন্যদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন নিশ্চিত হয়ে গেল তখন প্রধানত বাংলার অমুসলিম জনগণের দাবির ফলে সেদিন বাংলা ভাগ হয়ে জন্ম হয়েছিল পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের। বাংলার এ পরিবর্তিত রাজনৈতিক সীমানার মধ্যেই সেদিন বিভাগোত্তর বাংলার পটভূমিতে বাংলাদেশের বাঙালিদের বর্তমান জাতিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বাংলাভাষী বাঙালির বিকাশ কালের সূচনা অবশ্য নিঃসন্দেহে কম করেও হাজার বছর আগে, কাল হিসেবে চর্যাপদের সূচনাকালে। বাংলাভাষী বাঙালি আমরাও অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালাভাষী বাঙালিরাও এই ঐতিহ্যের অধিকারী। আবার আরেক বিচারে আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালাভাষীদের একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতি হিসেবে বেড়ে ওঠার কাল মাত্র চল্লিশ বছর অর্থাৎ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকে।

কত বিচিত্র পথেই না পরিচালিত হয়েছে আমাদের জাতিগঠন প্রক্রিয়া। আমরা জানি নানা উপাদানের সংশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সংহত হয় যে কোনো জনগোষ্ঠীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো। এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো একটি উপাদানকে নির্দিষ্ট করে মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। সেটা করতে যাওয়াও ঠিক নয়। তা যদি করতে যাওয়া হয় তাহলে আর যাই হোক সে প্রচেষ্টা ইতিহাসসম্মত হয় না। ইতিহাস কখনো সরল রেখায় অগ্রসর হয় না। তার গতি সব সময়ই বঙ্কিম। বস্তুত বিশ্বের কোনোকিছুর গতিপথই সরল রৈখিক নয়। সব বস্তুর গতিপথই বঙ্কিম, ঢেউয়ের মতো। উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই তা এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

আমাদের ইতিহাসের গতিধারা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে অর্থাৎ এক পর্যায়ে তা যেমন পাকিস্তান দাবির সমর্থনে প্রধানত উঠতি মধ্যবিত্ত বিপুলভাবে সমাবিষ্ট হয়ে ওই দাবিকে অনিবার্যতা দিয়েছে, তেমনি এই একই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিজেদের বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য আবার অনিবার্য করে তুলেছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তারপরও অবশ্য দেশের ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে এবং কোন ধারায় প্রবাহিত হবে তা বর্তমানে মূলত নির্ভর করেছে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশের মাত্রা এবং তার ধরনের ওপর। গত চল্লিশ বছরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পর শুধু রাজনীতির গতিধারাই নয়, সমগ্র দেশের গতিধারা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ভর করেছে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ওপর।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের তুলনায় আজ অর্থাৎ চল্লিশ বছর পর আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ কোন মাত্রায় এসে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে সঠিক কোনো জরিপ চালানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই বিষয়ে যদি কেউ আগ্রহী হয়ে কোনো জরিপ কাজ চালান তাহলে সামগ্রিক জাতীয় বিকাশ এই সময়কালে কোন ধারায় পরিচালিত হয়েছে তা বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। সাধারণভাবে রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনার মতো শহরগুলো এই সময়কালে যে মাত্রায় এবং যেভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে তার দিকে তাকালে আমরা হয়তো অবস্থা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারব। শুধু নগরায়ণের ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। এই সময়কালে যে মাত্রায় নগরাঞ্চলে আবাসন সমূহ গড়ে উঠেছে তা ভাবতে গেলে অবাকই হতে হয়। মনে হয় এ দেশের ক্রমে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত যেন হঠাৎ কোনো আলাদিনের প্রদীপের সন্ধান পেয়ে গেছে। প্রদীপ ঘষে যে দৈত্য তাদের সেবায় আবির্ভূত হয়েছে সে যেন ক্রমাগত একের পর এক নগর পত্তন করে চলেছে। তার আগ্রাসনের সামনে সবুজ-শ্যামল গ্রামবাংলা প্রান্তে অপসৃত হয়ে কোনোক্রমে নিজেকে আড়াল করে আত্মরক্ষা করতে চাইছে আজকাল। শুধু এক কালের মহকুমা শহর অর্থাৎ আজকের জিলা শহর নয়, এমনকি উপজিলা কেন্দ্র পর্যন্ত আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষা দৈত্যের কার্যক্রমের সাক্ষ্য দেখতে পাই আমরা। নিঃসন্দেহে যারা আজ এভাবে এবং এত দ্রুতলয়ে স্ফীত হয়ে উঠল তাদের ধনাগমনের উপায় কী সে বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকলে বাংলাদেশের বর্তমান গতি-প্রকৃতি অনুধাবন অথবা ভবিষ্যতে তা কোন ধারায় প্রবাহিত তা অনুমান করা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে অনুমাননির্ভর সাধারণ কিছু মন্তব্য করার আগে গত চল্লিশ বছরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পর সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের দৃশ্যত যে পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে সাধারণ দু-একটি মন্তব্য করে নিতে চাই।

বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামে এই সময়কালে যদি যাওয়া যায় তাহলে চল্লিশ বছর আগের চেয়ে আজকের যে পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়বে তা হলো শিক্ষা বিশেষত নারী শিক্ষার বিস্তারের বিষয়টি। আগের তুলনায় বেশি করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার যেমন সাধিত হয়েছে, তেমনি মেয়েরা অনেক বেশি বিদ্যালয়মুখী হয়েছে আজকাল। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও আগের তুলনায় অবস্থার উন্নতি হয়েছে আজকাল। যার ফলে দেশের মানুষের গড় আয়ু যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মোট জনগোষ্ঠীর মাঝে আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে তরুণের সংখ্যা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যসেবার অধিকতর বিস্তৃতি নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এই সঙ্গে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া দরকার। গত চল্লিশ বছরে এ দেশ থেকে যে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসে কাজের জন্য গেছেন তাদের পাঠানো অর্থ গ্রামাঞ্চলে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া এনজিওদের কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রামবাসীর দারিদ্র্যবিমোচন না হোক, তাদের দুর্দশা কিছুটা হলেও লাঘব করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও সচ্ছল মধ্যবিত্তের সংখ্যা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যা ছিল সেই তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে।

আরো একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। তা হলো তৈরি পোশাক শিল্পে তরুণী মেয়েদের অধিকসংখ্যায় নিয়োগ নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের সূচনা করেছে। মৌলবাদীদের পক্ষে দাপট দেখিয়ে পর্দার নামে আজ থেকে মেয়েদের পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সহজ নয়। তাছাড়া আজ মেয়েরা অনেক পরিবারেই রোজগারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন।

গত চল্লিশ বছরে পূর্বোক্ত যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে তার কম-বেশি প্রভাব রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পড়বে তা স্বাভাবিক। এ বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলার আগে আরো একটি বিষয় আলাপ করে নেয়া দরকার। সূচনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশের বিষয়টি উল্লেখ

করেছি। এটাও বলতে চেষ্টা করেছি গত চল্লিশ বছরে সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুকে যদি উল্লেখ করতে হয় তাহলে তা হলো উপরোক্ত ঘটনাটি। আর মধ্যবিত্তের এই বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণি শুধু যে আগের তুলনায় অনেক বেশি লক্ষণীয়ভাবে সামনে এসেছে তাই নয়, তাদের ভেতর থেকে কেউ কেউ উপরে উঠে শুধু ধনিক শ্রেণিতেই উন্নীত হননি, ধনিকদের মধ্যেও বড় ধনিকের কাতারে স্থান নির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। শুধু তৈরি পোশাক নয়, ওষুধ, চামড়াজাত সামগ্রী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ রপ্তানি করে এবং এসব ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বড় ধনিকরা।

এক কথায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাংলাদেশের পুঁজিবাদী ধারায় বিকাশের মাত্রা আগের তুলনায় যথেষ্ট দ্রুতগতিতে সাধিত হয়েছে, আরো সুস্পষ্টভাবে বললে বেশ দ্রুতগতিতে একদল লোক ধনাঢ্য হয়ে ওঠে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য তথা কিছু পরিমাণে শিল্পে নিজেদের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হলো দেশের ধনিক ও মধ্যবিত্তদের বিকাশের ধরন প্রসঙ্গ।

মধ্যবিত্তের তথা ধনিক শ্রেণির দ্রুত বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যা কাজ করেছে তা হলো রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলা ছিল কলকাতার এবং তৎসংলগ্ন শিল্প তথা ব্যবসার পশ্চাৎভূমি। প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল এ দেশ।

রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশের প্রশ্ন ধরলে বাংলার রাজনৈতিক সীমান্ত যখন আজকের বাংলাদেশের আকার পরিগ্রহ করেনি, যখন বর্তমান ভূখণ্ড ব্রিটিশ ভারতীয় বাংলার অন্তর্গত ছিল এবং বাংলা তখন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অংশ তখন ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমগ্র উপমহাদেশীয় ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ক্রমে বিকাশ লাভ করে। সেই ধারারই অন্যতম অংশ ছিল তৎকালীন বাংলার ও তার ভেতরে বিকাশমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। সেদিন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের বাংলা তথা বাঙালিরা সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামে সংযোজন করেছিল এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু তারপরও এটা সত্য যে সেদিনের সেই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম তথা তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ বিশেষত বিকাশমান শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তকে নিজেদের ধারায় অঙ্গীভূত করে নিতে পারেনি। তার ফল যা হওয়ার তা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাংলার মুসলমান জনসাধারণ বিশেষত তাদের ছাত্র-যুবসমাজ পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আবার এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে বর্তমান বাঙালি জাতীয়তাবাদকে।

এখানে মনে রাখা দরকার ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এ দেশের মানুষ জাতীয়তাবাদের যে ধারাকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং এর আগে ঐব্যবদ্ধ বাংলায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা প্রচলিত ছিল তার বৈশিষ্ট্য সবটা এক নয়। মাঝখানে ১৯৪৭ সালের উপমহাদেশ তথা বাংলার বিভক্তি একটি বড় ছেদ ঘটিয়েছে উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। এই প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলা যায় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ব্রিটিশ শাসনবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শামিল করার সম্ভাবনা থাকলেও তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। বিশেষত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের কতক সীমাবদ্ধতার জন্য ঐক্যের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে সর্বশেষ বড় মাপের চেষ্টা হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে প্রবর্তিত বেঙ্গল প্যাক্টের সময়। তার অকাল মৃত্যুর পর সেই ধারা আর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের পটভূমিতে এ দেশের জনগোষ্ঠী যখন নতুন করে জাতীয়তাবাদের সন্ধান শুরু করল তখন তা যে আগের নিখিল ভারতের পটভূমিতে বিকাশমান ধারার চেয়ে পৃথক হবে তা বলা বাহুল্য।

এই কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলছি কারণ আমরা যখন আমাদের আত্মপরিচয়ের ঠিকানা খুঁজতে চাই তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় চর্যাপদসহ হাজার বছর আগের বাংলা ও বাঙালির জীবন ধারা, তাদের কৃতির দিকে। কিন্তু এ কৃতিরই অংশ অষ্টাদশ শতক ও তার পরবর্তী বাঙালির নবজাগরণ বা বাংলার রেনেসাঁ বলে যে অধ্যায়কে অভিহিত করা হয় সে পর্ব থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্বের সবকিছুর সঙ্গে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালি ইতোপূর্বেকার বাঙালি জাগরণের পুরোধাদের মতো ঠিক সমান আবেগ নিয়ে একাত্ম অনুভব করার ক্ষেত্রে ইতস্তত এখনো অনুভব করে। আর এই ইতস্ততার সঙ্গত কারণ নেই তাও নয়। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। বাংলা ও বাঙালির এই দুই মহাপুরুষের হাত ধরে আমরা অবশ্য আবার বাঙালির ঐতিহাসিক সংশ্লেষণধর্মী ঐতিহ্যের স্রোতধারায় রাষ্ট্রীয় সীমানার পার্থক্য অটুট রেখেই সমতালে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করতে পারি সংশ্লেষণধর্মিতার নতুন অধ্যায়। নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উভয় বাংলার বাংলাভাষীরা যে কালক্রমে এদিকেই এগোচ্ছে তাতে আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর পূর্বোক্ত লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে নিজের কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর স্বাভাবিকভাবে দেশবাসীর মনে সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা যার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে সেই নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যে সংগঠনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে সেই আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন ছিল বলতে গেলে সর্বব্যাপক। তার পাশাপাশি যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল সেই ঐক্যও তখন পর্যন্ত অটুট ছিল। তবে তখনই প্রধানত তরুণ সমাজের অনেকের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নানা ঝোঁকের সৃষ্টিও যে হতে শুরু করেছিল তা বোঝা যাচ্ছিল।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। দেশবাসী তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। মুক্তিযুদ্ধের সময় কালে প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নামে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজে-কর্মে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে আইনসঙ্গতভাবে কাজ করার অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। দেশে ফিরে তারা আইনসঙ্গত হিসেবে কাজ গুছিয়ে নিতে শুরু করে। পাশাপাশি বামধারায় জাতীয়তাবাদী সংগঠন ন্যাপ (মুজাফ্ফর) দেশে এসে নিজেদের সংগঠন গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু এলেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি আহ্বান জানালেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসার। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করে ন্যাপ নিজের ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী দলের যে অবস্থান সে রকম অবস্থান গ্রহণ করে নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনের সিদ্ধান্ত নিল। এর আগে অবশ্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পর যেসব দল ও শক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের সবার সমবায় সূচনায় জাতীয় সরকারের আহ্বান জানানো হয়েছিল ন্যাপের পক্ষ থেকে। যুদ্ধ বিপর্যস্ত দেশকে গুছিয়ে তুলে সংবিধান প্রণয়নের পর নির্বাচিত সরকার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুরোমাত্রায় প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছিল তখন। কিন্তু সেদিকে আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত করেননি।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বঙ্গবন্ধু পদত্যাগ করার পর আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টরি পার্টির সভায় তাকে সংসদীয় নেতা তথা প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত করা হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং দ্রুততম সময়ে প্রণীত হয় সংবিধান।

নিঃসন্দেহে সে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি অর্থাৎ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই চার মূলনীতির ভিত্তির ওপর প্রণীত সংবিধান সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে সব বিচারেই।

তবে আজ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকালে প্রথমেই যে কথাটা বলতে ইচ্ছে করে তা হলো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি অর্থাৎ সংবিধানে যে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি বিধৃত হয়েছিল তার সমর্থনে জনমতকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রস্তুত না করে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রীর চার মূলনীতি বিশেষত সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করাটা ঠিক হয়েছিল কিনা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দল ও শক্তি যদি একত্রে কিছুদিন সহমতের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে জনমতকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নতুন দিনের নতুন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারত তাহলে পরে যে জটিলতাগুলো দেখা দিয়েছে তা হয়তো এতটা নাও হতে পারত। এ সময় আরো একটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ঘটে দেশে। তাহলে শিল্প ব্যবসাগুলো জাতীয়করণ সংক্রান্ত সরকারের ঘোষণা। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপসহ মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সব শক্তি দ্বারা এ ঘোষণা জোরেশোরে সমর্থিত হয়েছিল। কিন্তু আজ পেছনে ফিরে তাকালে এ ক্ষেত্রেও মনে হয় জাতীয়করণ কার্যকর করার জন্য যে দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসক ও কর্মীরা প্রয়োজন তা গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্রুত প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োজিত প্রশাসকরা দু-হাতে লুটপাট করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে নিন্দিত এবং সমালোচিত হয়েছে সরকার। একই সঙ্গে স্বাধীনতার আগে কয়টি বাঙালি পাট, বস্ত্রকল তৈরি হয়েছিল সেগুলো জাতীয়করণ করাও ঠিক হয়েছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লাখ টাকা নির্দিষ্ট করাটাও নিঃসন্দেহে সমীচীন হয়নি। বাঙালি পুঁজিপতিদের যুক্তিসঙ্গত বিকাশে সহায়তা প্রদান করে সদ্যস্বাধীন দেশের সরকার যে বাঙালি ধনিকদের বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে এটাই ছিল উদীয়মান বাঙালি ধনিকদের কাছে অভিপ্রেত। বস্তুত, এভাবে জাতীয় ধনিক শ্রেণির বিকাশে সাহায্য করা এবং তারা যাতে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ভূমিকা না নেয় সেজন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের এই ভূমিকাই কাম্য। এ অবস্থানের অনুপস্থিতিতে আর দেশীয় পুঁজির সামনে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করে পরজীবী ধাঁচের ব্যবসায়ী হিসেবে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেয়া ছাড়া পথ খোলা থাকেনি তখন। অবশ্যই তখন দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং কমিউনিস্ট ও তাদের মিত্ররা যেভাবে অধনবাদী বিকাশের পথে পুঁজিবাদী বিকাশের যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পা রাখার স্বপ্নে বিভোর তখন তাদের পক্ষে অন্যভাবে চিন্তা করাটাও ছিল কঠিন। নবগঠিত সরকারও এ ধারণা দ্বারাই কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিল।

তার ওপর স্বাধীনতা উত্তরকালের সূচনাতেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ যুবক ছাত্রদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধনের জন্য হটকারি পথে অগ্রসর হওয়ার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য মাত্রায় দেখা দিল। এই ঝোঁকের প্রতিফলন আমরা দেখি জাসদ গঠন ও তাদের তৎকালীন কার্যক্রমের মধ্যে। অপরদিকে নিজেদের চীনপন্থী বলে দাবি করেন এমন কিছু উগ্র গোষ্ঠীও সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারায় অগ্রসর হলো। আর তা করতে গিয়ে কেউ কেউ পাকিস্তানের সহায়তা চাইতেও ইতস্তত করেনি সেদিন। আর তার সঙ্গে ছিল ইসলামপন্থী দলগুলোর হটকারি কার্যক্রম। আর এ সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতিদের মধ্যপ্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য দুনিয়াতে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।

একদিকে এসব শক্তি, অন্যদিকে দেশের মধ্যে জাসদের হটকারি কার্যক্রম আর তার সঙ্গে শাসক দল আওয়ামী লীগের মধ্যে নানা টানাপড়েন পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছিল। তার ওপর দলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ (প্রচার ছিল বেশি) এবং সর্বোপরি খাদ্য সংকট ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে দুর্ভিক্ষে যখন পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে উঠল সেই অবস্থায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এবং তাড়াহুড়া করে বাকশাল গঠনের এক পর্যায়ে সপরিবার হত্যা হলো বঙ্গবন্ধুকে এবং তার

কিছুদিনের মধ্যে জেলের মধ্যে নিহত হলেন জাতীয় চার নেতা।

আর এভাবে বাংলাদেশে সাধিত হলো এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। বস্তুত, এ রকম একটি অভ্যুত্থানের আশঙ্কা যে আগাগোড়াই ছিল সে বিষয়ে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যত কথাই বলা হোক না কেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব সচেতনতা ও তা যাতে সাধিত না হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদের কথা বলতে পারব না, তবে কমিউনিস্ট এবং ন্যাপের মধ্যে নেতৃত্বের পর্যায়ে পূর্বোক্ত প্রশ্নে সেরূপ সচেতনতা দেখিনি। অনুরূপ প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও কোনো সচেতনতার লক্ষণ দেখতে পাইনি।

একদিকে পূর্বোক্ত প্রশ্নে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং কর্মী বা মধ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে অসাদুপায়ে অর্থ রোজগারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ক্ষমতাসীন সংগঠনকে পরিণত করেছিল সংকট মোকাবিলায় এক জনসমষ্টিতে। এই অবস্থায় বাকশাল ছিল কোনো উপায়ে শেষ রক্ষার চেষ্টা। এই পদক্ষেপ সম্পর্কে বস্তুত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মতৈক্য ছিল না। তার ওপর সংগঠনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা খোন্দকার মোশতাকের মতো চক্রান্তকারীরা তো ছিলই।

তার পরের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পুনর্ব্যক্ত করে লাভ নেই। তা আমরা সবাই জানি। খন্দকার মোশতাকের স্বল্পকালীন শাসন, তারপর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান এবং তার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল, তারপর জাসদের উদ্যোগে সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানের নামে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি সেনা শাসন প্রতিষ্ঠা। তার পরে চক্রান্তের মাধ্যম জিয়াউর রহমানের হত্যা ও এরশাদের ক্ষমতা দখল। সেই সেনা শাসনের অপসারণে অবশ্য গণআন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য তার মধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে নয় বছর।

এই সময়কার অবশ্য ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রথমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং এরশাদ সাহেবের আমলে তার নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি গঠন করা হয়েছে। উভয় দলের উৎসই সেনা নেতৃত্বের একাংশ সমর্থিত চক্রান্ত। তবে এ সময়ই জিয়াউর রহমান সাহেবের আহ্বানে জাতীয়তার প্রশ্নে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন। বিষয়টি জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলের। পশ্চিম বাংলার বাঙলাভাষী বাঙালিদের থেকে নিজেদের পার্থক্য টানার জন্যই বিষয়টি সামনে আনা হয়। স্বাভাবিকভাবে এখানে পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয় ধর্মীয় উপাদনকে। এভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে মতবাদ চালু করা হয় তার মধ্যে প্রভাব থেকে যায় দ্বিজাতিতত্ত্বের।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাজনীতিতে যেমন দক্ষিণপন্থী ধারায় বিএনপি তথা জাতীয় পার্টি গড়ে ওঠে, তেমনি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সমাজ গঠনের মধ্যে যে পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছিল পূর্বোক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ ছিল তারই প্রতিফলন। এমনকি বঙ্গবন্ধুর খুনিরাও প্রকাশ্যে পার্টি নামে সংগঠন গড়ে তুলে রাজনীতির অঙ্গে সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। তাছাড়া জামাত-ই-ইসলামী ক্রমান্বয়ে নিজ নামে অর্থাৎ জামাত-ই-ইসলামীর নামে সংগঠন গড়ে তুলে রাজনীতিতে পদার্পণ করে। নিজ নামে রাজনীতিতে পদার্পণে প্রথমে ইতস্ততা ছিল তাদের। প্রথমে অন্য নাম এবং তার পরে জামাত-ই-ইসলামীর নামে তারা তাদের কাজকর্ম শুরু করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রথমে পাকিস্তান পরে অন্য দেশকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর এক পর্যায়ে গোলাম আযম বাংলাদেশে আসেন। তার বিরুদ্ধে জাহানারা ইমামের গণআদালত অনুষ্ঠানের মধ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সামনে আসে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে প্রধানত, সামরিক শাসনের ছায়াতলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের স্লোগানের আড়ালে চরম দক্ষিণপন্থীসহ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ছিল মুসলিম লীগ আমলের দ্বিজাতিতত্ত্বেরই রকমফের। একদিকে ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর জোর দিয়ে, এমনকি এক পর্যায়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে তারা যেমন নিজেদের প্রভাব দৃঢ়মূল করতে চেয়েছে তেমনি একই ধারায় অন্ধভারত বিরোধীতাকে পুঁজি করে নিজেদের রাজনীতি পরিচালনা করতে চেয়েছে সব সময়।

এরশাদের শাসনামলে তার নেতৃত্বাধীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে বিএনপির সহযোগিতা ছিল একই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। তা না হলে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি উভয়েই মূলত একই ধারার রাজনৈতিক দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিএনপি-জামায়াতের ২০ দলীয় জোটের বিরুদ্ধে এরশাদের সঙ্গে একযোগে কোনো কোনো পদক্ষেপ নেয়ার প্রশ্ন এলে তা হবে সাময়িক মৈত্রী। 'তবে তাতে প্রাধান্য থাকতে হবে অন্যদের', জাতীয় পার্টির নয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যা এবং তার আগে সদ্যগঠিত জাসদের নেতৃত্বে সরকারবিরোধী আন্দোলনের অভিঘাত নিঃসন্দেহে পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকাটি পালন করে। উগ্র বামপন্থী আন্দোলন যে বাস্তবে কিভাবে এবং হয়তো বা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে ১৯৭৫-এর পরবর্তী জাসদের ভূমিকা তার একটি দৃষ্টান্ত। পরে ৭ নভেম্বর পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতার মধ্য তারা নিঃসন্দেহে আজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। একই কথা খাটে আজকের ওয়ার্কার্স পার্টি সম্পর্কেও। তারাও এক সময়কার হটকারি অবস্থান পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ধারায় যেভাবে ফিরে এসেছেন তা ধন্যবাদযোগ্য।

কমিউনিস্ট পার্টিও যে ধারার কথা বলা হচ্ছে, সেই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তবে এখনো তারা জাতীয় আন্দোলনে তাদের সঠিক অবস্থানটি কি হবে সে বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত এবং নিজেদের অতীত অবস্থানের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া বামপন্থী শিবিরে আরো কিছু ক্ষুদ্র শক্তি আছে। সামগ্রিকভাবে বললে বামপন্থীদের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা নিঃসন্দেহে জাতীয় রাজনীতিতে স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মতো শক্তির অধিকারী নয়। এ ছাড়া গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতিরই আজ সমাজ প্রগতির দাবি। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতি আজকের পর্যায়ে তাদের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়েও তারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, পূর্বোক্ত ধাঁচের ইতস্ততা উপমহাদেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। এখন পর্যন্ত এ দেশের কমিউনিস্টরা সে প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

পরিশেষে বলতে হয়, আওয়ামী লীগ সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে তা দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। সাফল্যও অর্জিত হয়েছে এই আন্দোলন।

স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষিত সচ্ছল মধ্যবিত্ত তথা বুর্জোয়াদের বিকাশ যে মাত্রায় হয়েছে তা বহুল পরিমাণে আওয়ামী লীগের প্রতিফলিত। বস্তুত এই দেশের সীমারেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাধিত হয়েছে পূর্বোক্ত শ্রেণিসমূহের বিকাশ। সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুকুল্য তাদের বিকাশে সাহায্য করেছে বিশেষভাবে।

ফলে এসবের প্রভাব আওয়ামী লীগের ওপর যদি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রতিফলিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই দলের বর্তমান সমস্যা হলো একদিকে সংগঠনের উপরে পূর্বোক্ত শ্রেণিসমূহের প্রভাব অপরদিকে এই সংগঠনের অতীত ঐতিহ্য যা দলের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণিসমূহের প্রভাবের সফঙ্গ ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ফলে তাদের বর্তমান ভূমিকা প্রায় সব প্রশ্নে টানাপড়েন পরিলক্ষিত হয়। এখানে সমস্যা হলো গণতান্ত্রিক ধারায় অপর জাতীয়তাবাদী শক্তির অভাব।

প্রবন্ধ

ইসলামী জঙ্গিবাদীদের ক্রমবর্ধমান হুমকি

রণেশ মৈত্র

আজ বিশ্বে বহু স্থানে ইসলামী জঙ্গিবাদীরা নানাজনকে শুধু হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ২৭ জুনের খবরে দেখা যায়, পৃথিবীর তিনটি মহাদেশেই তারা অগণিত মানুষকে মসজিদে পবিত্র রমজান মাসে বোমা মেরে নামাজ আদায়রত অবস্থায় হত্যা করে চলেছে। ফ্রান্সে একজনের গলা কাটা লাশও উদ্ধার হয়েছে, ফলে ফ্রান্সজুড়ে এক ধরনের জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। একটি হত্যার ফলেই তারা এতটা তৎপর। আর আমরা? এতগুলো প্রকাশ্য হুমকি-হত্যালীলা সত্ত্বেও তালিকা প্রকাশ তো আজ নস্যি।

তিউনিসিয়ায় (আফ্রিকা) মসজিদগুলোতে বোমা মেরে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে অসংখ্য নামাজরত মুসল্লিকে এই পবিত্র রমজান মাসে হত্যা– তাও আবার ইসলামের নামে বিশ্বে ইসলামী রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যে।

পরিণতিস্বরূপ সে দেশের সরকার ৫০টি মসজিদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাবিধানের লক্ষ্যে।

আফগানিস্তান-পাকিস্তানেও যে কত শত মসজিদে এ যাবৎ জঙ্গি লাদেনবাহিনী ওই একই পন্থায় হত্যালীলা-ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এবং প্রতিদিনই চালিয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ইরাকের বাগদাদ নগরী একই শক্তির আঘাতে আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

অন্যদিকে দেশ-বিদেশের কোটি কোটি

স্বাধীনচেতা সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বাংলাদেশে তাদের সমমনা বিশিষ্টজনদের নাস্তিক আখ্যায় আখ্যায়িত করে কতিপয় জঙ্গি নামক কাপুরুষ 'ইসলাম' ধর্মের স্বঘোষিত ঠিকাদার সেজে একের পর এক প্রকাশ্য দিবালোকে অথবা হাজার হাজার নরনারীর জমায়েতস্থলে পুলিশের এক বা একাধিক গ্রুপের উপস্থিতিতে নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে দেখে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। এ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাংলাদেশেও বেড়েই চলেছে পুলিশ বা সরকারকে এ খুনীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করতে বিন্দুমাত্র তৎপর বলে মনে না হওয়ায়। এ জাতীয় হত্যালীলার শুরু বছর তিন-চারেক আগে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে। এরপর এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে একের পর এক। আজতক (২৭.০৬.১৫) শেষ হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে সিলেটে– যেখানে নিজ বাড়ির কাছেই সকালবেলায় তার কর্মস্থল পূবালী ব্যাংকে যাবার পথে চাপাতির আঘাতে নির্মমভাবে খুন হন।

তার অল্প কিছু দিন আগে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে বইমেলায় নিজের লেখা দুটি বই প্রকাশের জন্য আমেরিকা থেকে ছুটে এসে খুনের শিকারে পরিণত হন সুলেখক মুক্তমনা দেশপ্রেমিক অভিজিৎ রায় এবং একই সঙ্গে আহত হলেন তারই সঙ্গে আসা তার স্ত্রী। এর পরপরই খুন হলেন ওয়াশিকুর রহমান বাবু। এরা সবাই নাস্তিক বলে ওই খুনিদের দ্বারা চিহ্নিত ও প্রচারিত এবং তা নেহায়েত উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাতে ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশের মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। খুনিরা তাদের এ অপচেষ্টায় যে আংশিকভাবে সফল হয়েছে তা তো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আরো বেশি করে স্পষ্ট সরকার ও পুলিশের আসামিদের ধরা ও বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তা ও নিঃস্পৃহতা। তারা কোথাও একটি আসামিও খুঁজে পাচ্ছে না। একটি ক্ষেত্রে তো দুজন প্রত্যক্ষদর্শী দুজন আসামিকে ঘটনাস্থল থেকে পাকড়াও করে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে পুলিশে হস্তান্তর করেছে বলে পত্রিকায় খবর বেরুলো। তার পরও কেন পুলিশ পারছে না তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করে বাকিদের গ্রেপ্তার করতে? কেন আমাদের রক্তে-ঘামে অর্জিত টাকায় পোষা গোয়েন্দা বাহিনীও কারো কোনো সন্ধান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে? বস্তুতই কি এগুলো তাদের ব্যর্থতা নাকি ওপরের হুকুম না থাকাজনিত নিষ্ক্রিয়তা ও নিঃস্পৃহতা।

এ ঘটনাবলিজনিত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শেষ হতে না হতেই নেহায়েত অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল আরো উদ্বেগজনক খবর। আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামক সুপরিচিত কুখ্যাত সন্ত্রাসী জঙ্গিবাহিনী হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে দেশের দশজন বরেণ্য ব্যক্তিকে। কী দুঃসাহস। দিনে দিনে বর্তমান সরকারের শাসনকালের মধ্যে তারা কতই না পুষ্টি অর্জন করেছে, কতই না সংগঠিত হয়েছে, কতই না হাত পাকিয়েছে আর কতই না তৎপর হয়েছে। সে তুলনায় পুলিশ? গোয়েন্দা? সরকার?

এর আগে খুন হওয়া ব্যক্তিদের কারো সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ছিল আদর্শিক সহমর্মিতা-ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে সবাই উদ্দীপ্ত থাকার কারণে। তাই নেহায়েতই আপনজনদের হারিয়ে এবং সেই খুনগুলোর কিনারা না হওয়াতে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন থাকাকালেই এ দশজনের হত্যার হুমকি।

এদের মধ্যে আমার সর্বাধিক পরিচিত বাল্যবন্ধু এইচ টি ইমাম। যখন আমরা উভয়েই পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ইন্টারমিডিয়েট আর্টসের ছাত্রই শুধু ছিলাম না– একই সঙ্গে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পাবনা জেলা কমিটির নেতৃত্বেও ছিলাম। দীর্ঘদিন অবশ্য তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ইমাম ছিলেন একজন সিএসপি অফিসার। একসময় নওগাঁর এসডিও, পরবর্তীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের (বা পার্বত্য চট্টগ্রাম) জেলা প্রশাসক থাকাকালে ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সম্ভবত এটাই তার অপরাধ।

সুলেখক ও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জাফর ইকবালের লেখাগুলোর আমি অত্যন্ত ভক্ত, পাঠক। দুঃখের বিষয় তার সঙ্গে আজও পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তিনিও খুনিদের ভাষায় 'নাস্তিক'। তাই অন্যতম টার্গেট। তার একটি মূল্যবান লেখা ২২.০৫.১৫ প্রায় সব কটি সংবাদপত্রে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রিয় অনন্ত...' শিরোনামে। বার বার পড়েছি লেখাটা। যেমন ভালো লেগেছে তেমনই শঙ্কিতবোধ করেছি লেখাটি পড়ে তাতে দেয়া তার তথ্যগুলো জানতে পেরে।

আর একজন আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি অধ্যাপক কাবেরী গায়েন। ব্যক্তিগত পরিচয় কোনো দিন ঘটেছে কি না মনে নেই তবে আমার ছেলে প্রবীর, মেয়ে মধুমিতা, জামাই সুব্রত শংকর ধরদের সঙ্গে তার তো প্রায় বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে শুনেছি। এখন ওই ছেলে-মেয়ে-জামাই বহুদিন যাবৎ বিদেশে। কিন্তু কাবেরী গায়েনের অসংখ্য লেখা পড়েছি প্রথম আলোর পাতায়। তার লেখারও আমি অত্যন্ত ভক্ত। নীতি ও আদর্শনিষ্ঠতার কারণেই কাবেরীকে ঘাতকদের টার্গেটে পরিণত হতে হলো। বেদনা রাখার জায়গা আসলেই খুঁজে পাই না। এ ছাড়া সামান্য ঘণ্টা দুয়েকের জন্য পরিচয় ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে একটি হল ঘরে। সম্ভবত ২০০৭ সালে। ওই

প্রথম এবং আজতক এটাই তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। তবে তাকে আমি শ্রদ্ধার চোখেই দেখি, যদিও তার প্রশাসনিক বেশকিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি যা মৌলিক কোনো কিছু নয়।

ইমরান এইচ সরকার? না আজও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের নবপ্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের আজ যতটা সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তার জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখি যে তার মাঝে ওইসব প্রশ্নে দ্বিধাহীন চিত্তে ঐকমত্য পোষণ করি। দিনে দিনে তার ও তার সহকর্মীদের সক্রিয়তা বাংলাদেশের মানুষের বহুবিধ স্বার্থের প্রশ্নে দেখবার আশা পোষণ করি। তার এ অপরাধ খুনিরা সইবে কেন? খুনিরা কারা? প্রতিটি খুনের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তারা তাদের পরিচয় উল্লেখ করে দিব্যি নির্ভয়ে বলছে, 'আমরাই খুনি– আমরা টার্গেট খুন করেছি– আমরা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম'। পত্রিকাগুলোয়ও এ তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। পুলিশও জানছে। কিন্তু জানার পরই না– কোনো তৎপরতা আদৌ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আজতক না।

কেন? সত্যিই এটা বুঝতে অনেকেরই কষ্ট হয়। কিন্তু ২২.০৫.১৫ তারিখে প্রকাশিত লেখায় অধ্যাপক জাফর ইকবাল তা বেশ সহজ ভাষায় স্পষ্ট করেই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন :

"২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজীব হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিশ ওই হত্যাকারীদের দ্রুত ধরে ফেলেছিল। সম্ভবত সে কারণে অনেক দিন এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রায় দীর্ঘ দুই বছরের বিরতি দিয়ে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা হয়েছিল। তার হত্যাকাণ্ড চলাকালে খুব কাছে বসে থাকা পুলিশ বাহিনীর এক ধরনের নির্লিপ্ত ভূমিকাটি আমাদের সবাইকে খুব বিস্মিত করেছিল। আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। আমি সেই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি পুলিশ চাইলে যে কোনো অপরাধীকে ধরে ফেলতে পারে। অভিজিতের হত্যাকারীদের কিন্তু এখনো ধরা হয়নি। শুধু তাই নয়, আমরা আবিষ্কার করলাম সরকার অভিজিৎ থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকছে। ধর্মান্ধ মানুষই হোক আর মুক্তচিন্তার মানুষই হোক সবার দায়িত্ব কিন্তু সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু এক বিচিত্র কারণে সরকারের ধারণা হয়েছে অভিজিতের মতো মুক্তচিন্তার মানুষের জন্য সহমর্মিতা দেখালে যারা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে তাদের হাতে একটা সুযোগ তুলে দেয়া হবে। সরকার ধর্ম নিয়ে কারো হাতে কোনো সুযোগ তুলে দেবে না বলে পণ করেছে। এর ফলে জঙ্গিদের সাহস বেড়েছে। অভিজিৎকে হত্যা করার এক মাসের মধ্যে তারা ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে হত্যা করেছে। এবারে পুলিশ নির্লিপ্ত কিন্তু দুই সাহসী পথচারী দুই হত্যাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। এতদিন আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি হেফাজতে ইসলাম থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যে ৮৪ জন ব্লগারের নাম দেয়া হয়েছে, এ সরকার তাদের পরিত্যাগ করেছে। এ রাষ্ট্রের কাছে তারা এ দেশের অধিবাসী নয়, তাদের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা অভিশপ্ত ব্লগার। এ বিষয়ে আমাদের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় সেটুকুও নিরসন করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনন্তকে হারালাম। এখন আমরা সবাই জানি এই অভিশপ্ত ব্লগারদের একজন একজন করে হত্যা করা হলেও সরকার একটুকুও বিচলিত হবে না।'

কিন্তু জাফর ইকবাল যে বিষয়টি হয়তো বা জেনে শুনেই উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন তা হলো ওই জঙ্গি খুনিদেরও একটা আদর্শ আছে এবং যে আদর্শ পালনে তারা নিষ্ঠাবান। সে আদর্শটি হলো বাংলাদেশটাকে পুনরায় ১৯৪৭-এর আগস্ট-পরবর্তী সময়ের মতো একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। তা সে যে নামেই হোক না কেন। হতে পারে কথাটি তারা আরো কিছুকাল পরে তুলবে এবং বলবে তারা চায় বাংলাদেশের নাম হবে ইসলামী রিপাবলিক অব বাংলাদেশ যেমন ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।

হত্যাকারীরা আরো সচেতন– কারা এর প্রকৃত বিরোধিতা করবেন। তারা অভিজ্ঞতা নিয়েছে একাত্তরে তাদের পরাজয় থেকে। তাই এবারে প্রথম থেকেই গণহারে নয়। ধরিয়ে ধরিয়ে এক এক করে খুন করতে করতে দেশবাসীর গা সওয়া হয়ে আসবে এবং তখন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ লালনকারী তাবৎ বুদ্ধিজীবীকে সাবাড় করবে– ওই মতাবলম্বী রাজনীতিক-পেশাজীবী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক, সাংবাদিক নারী-পুরুষ কেউই বাদ যাবেন না।

সরকার যদি প্রকৃতই হেফাজত, জামায়াত ও আনসারুল্লাহ বাংলাসহ সব জঙ্গি প্রতিষ্ঠান ও দলের সবার গোপন অতীত করেও থাকে (এবং করেছে বলেই জামায়াত, হেফাজত প্রভৃতি আজও বেআইনি ঘোষিত হচ্ছে না) তবু তারা রেহাই একদিন পাবে। ওই জঙ্গিরাই যা সেদিন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড চার্জ করেও পারেনি– তা তারা একদিন ঠিকই নিষ্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে। তারই প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে দশজনের তালিকা পেলাম। সামনে আছে আরো– আছে অগণন।

হুঁশ কি আমাদের ফিরবে? সরকার ও পুলিশ কি বসবে নড়েচড়ে? যুবসমাজ কি তাদের জরুরি দায়িত্ব পালনে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন এক মুক্তিযুদ্ধের অবতারণা ঘটাবে। শত্রুপক্ষ তৈরি– এ কথাটা মনে রাখতে যেন ভুল না করি।

প্রবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম

হায়দার আকবর খান রনো

১৯৪৭ সালে বাংলার যে জনগণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান করার জন্য বিপুল উৎসাহভরে রায় দিয়েছিল, মাত্র ২৪ বছর পর সেই দেশের জনগণই অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তান ভেঙে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য। কোনো বিদেশি পর্যবেক্ষকের কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হতে পারে।

১৯৭১ সালে যে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ, ১৯৪৭ সালে যুবক বয়সে তিনিই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। শেখ মুজিব ছাড়াও আর যেসব রাজনৈতিক নেতা পাকিস্তানের ২৪ বছরে আমাদের দেশের জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারা হলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ব্রিটিশ আমলে তারা সবাই ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা। একমাত্র ভাসানী বাদে

তাদের কারো ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের রেকর্ড নেই। ভাসানী ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। তবে কৃষকের পক্ষ নিয়ে জমিদার ও ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রাম ও কারাবরণ করার ঐতিহ্য তার ছিল। আবার ভাসানীই সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করেছেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী বরাবরই বাংলার মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তাকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, যারা একদিন পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার ছিল, ২৪ বছর পর তাদেরই সন্তানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল। এমনটি কেমন করে হলো? ২৪ বছরে আমাদের দেশে কিভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। ইতিহাসের চলার পথ বড় জটিল। তার মধ্যে ওঠানামা যেমন আছে, তেমনি থাকে একই ঘটনার মধ্যে বহু বিপরীতমুখী উপাদান। পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে শুধু ধর্মীয় প্রভাব দেখলে, দেখাটা সম্পূর্ণ হবে না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ কোনো ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, বরং তিনি প্রকাশ্যেই ধর্মীয় আচার-আচরণকে অবজ্ঞা করতেন। তিনি পাশ্চাত্যের চালচলনের অনুসারী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার অধিকাংশ জমিদার, উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী এবং তুলনামূলক বড় ব্যবসায়ী ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণি পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণির লাভ দেখতে পেয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি শ্রেণিগুলোর কোনো লাভ হয়নি, তবে অতি দ্রুত গড়ে উঠেছিল এক নতুন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই উঠতি মধ্যবিত্তের সঙ্গে অবাঙালি বুর্জোয়ার স্বার্থের সংঘাত শুরু হয় পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেই। তখন থেকেই এ দেশে বাঙালি জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৯৪৭ সালেই, অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির বছরই এই চেতনার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সদ্য গঠিত পাকিস্তান সরকার যে চিঠির খাম ও পোস্টকার্ড ছাপায়, তাতে ইংরেজি ও উর্দুতে লেখা ছিল; বাংলায় নয়। তখনই এর প্রতিবাদ ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তখনই, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালেই ভাষা কমিটি গঠিত হয়েছিল তদানীন্তন মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে। বছর গড়িয়ে ১৯৪৮ সাল এসে গেল। মার্চ মাসে জিন্নাহ সাহেব আসবেন ঢাকায়। পূর্ব বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ভাষা কমিটির সঙ্গে বসলেন। ১৪ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ভাষা কমিটির নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন, জিন্নাহ্‌র অবস্থানকালে কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনা তাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটেনি। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে জিন্নাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহ্‌র সামনেই তখন কয়েকজন ছাত্র প্রতিবাদ করে এবং বাংলা ভাষার দাবি জানায়। এ ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে ছাত্র, তার নাম আবদুল মতিন। পরবর্তীকালে তারই নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠে। এই সংগ্রাম কমিটিই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ছাত্র মতিন তখনো পর্যন্ত কোনো ছাত্র সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। পরে জেলখানায় তিনি কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য।

পাকিস্তান আমলের প্রায় শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। প্রথমে এই দাবি তোলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই প্রাদেশিক আইনসভায় বাজেট বিতর্কের সময় ভাসানী কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্কের প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং প্রদেশের জন্য অধিকতর অধিকারের দাবি উত্থাপন করেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন করাচিতে বসবাস করছিলেন, তখন তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রদান করেন। ওই সময়কালে ফজলুল হক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুপচাপ ছিলেন এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকরি করছিলেন। ১৯৫৮ সালের আগ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি না হলেও পার্টিকে কার্যত আত্মগোপনে থেকে কাজ করতে হয়েছে। ১৯৪৯ সালেই প্রথম কার্যকর বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রায় একই সময়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দলে যোগদান করেন। ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এই দলটি পূর্ব বাংলাভিত্তিক ছিল, সারা পাকিস্তানভিত্তিক ছিল না।

এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৯ সালেও নবগঠিত দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। ভাসানী নিজেও মুসলিম লীগ করতেন এবং নতুন দলটিও গঠন করলেন মুসলিম লীগের বিদ্রোহী অংশকে নিয়ে। ভাসানী দেশবাসীর কাছে বললেন, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আর জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না। তাই 'জনগণের মুসলিম লীগ' গঠন করতে হবে আর সেটাই হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী মানে জনগণ। এই শব্দটিও উর্দু, বাংলা নয়। বেশ কয়েকবছর পরে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে যখন পরিস্থিতি অনেকখানি বদলে গেছে, তখনই মওলানা ভাসানী দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথম দিকে আপত্তি করলেও পরে মেনে নেন। এভাবে ভাসানীর নেতৃত্বে এই দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা ঘটে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে ১৯৫২ সালে। ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। গুলি হয়। কয়েকজন শহীদ হন। এ ঘটনা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের ভিত নড়ে ওঠে। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি একটি মাইলফলক এবং দিকপরিবর্তনকারী ঘটনা। এর ফল পাওয়া গেল ১৯৫৪-এর নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালে ফজলুল হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী নেতৃত্বে গড়ে ওঠে যুক্তফ্রন্ট। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। ২২৩টি আসনের মধ্যে তারা পায় মাত্র ৯টি। যুক্তফ্রন্টের একটি ২১ দফা কর্মসূচি ছিল যার মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি ভালোভাবেই স্থান পেয়েছিল। এখানে একটি মগার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেই সময় আমাদের দেশে যেসব ধর্মীয় পীর (মুসলমানদের ধর্মীয় গুরু) ছিলেন তারা যুক্তভাবে একটি ধর্মীয় ডিক্রি (ফতোয়া) জারি করেছিলেন। বলেছিলেন, যেসব মুসলমান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেবে, তাদের মুসলমানিত্ব থাকবে না, অতএব তাদের সঙ্গে তাদের 'বিবি'দের (স্ত্রী) আপনা থেকেই তালাক (ডিভোর্স) হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য যে, নির্বাচনের ফল থেকে দেখা যায়, জনগণ বা এমনকি ওই পীরের অনুসারীরাও পীরের কথাকে পাত্তা দেয়নি। বাংলাদেশের জনগণের ওপর ধর্মীয় প্রভাব কতখানি, তা বিচার করার সময় এই ঘটনাটি মনে রাখা আবশ্যক।

১৯৫৪-এর নির্বাচন প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা দরকার। যুক্তফ্রন্টের ২৪ দফা কর্মসূচিতে অনেক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দাবির পাশাপাশি কোরআন সুন্নাহ্‌র উল্লেখও ছিল। এই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে নেজাম-ই-ইসলামের মতো সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল দলও ছিল। এই যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে, হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং ২১ দফা কর্মসূচি রচনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল বিরাট, যদিও পার্টিকে তখন আত্মগোপনে থেকেই কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের প্রবল বিরোধিতার কারণে কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি ১০টি আসনে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তখন মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। অমুসলিম এলাকায় পার্টি ৪টি আসনে

বিজয়ী হয়। ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার কারণে হিন্দু পরিবার থেকে আসা কয়েক হাজার পার্টি সভ্য ও সমর্থক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই রকম পরিস্থিতিতে পার্টি প্রধানত আওয়ামী লীগের ভিতরে থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নামেই বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই এ দেশের জনগণের জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে প্রায় উপনিবেশ হিসেবে বিবেচনা করত। তাদের এই শাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য তারা হিন্দু বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতার কৌশল গ্রহণ করে। এ দেশের জনগণ তাই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করতে গিয়েই পর্যায়ক্রমে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। নতুন করে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচনের বিল পাস হওয়া ছিল আরেকটি বড় বিজয়। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানও ছিল আরো একটি বিজয়। কিন্তু এই সময়কালে পর পর বিজয়ের পাশাপাশি বেশ বড় রকমের ব্যর্থতা ও পশ্চাদপসরণের ঘটনাও আছে। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে জনগণের সংগ্রাম মাঝেমধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার দুই মাসের বেশি টেকেনি। ১৯৩৫ সালে ভেঙে দেয় এবং বৎসরাধিককাল ধরে চলে কেন্দ্রীয় শাসন। এই সময় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন চলে। তবে এর ফল দাঁড়ায় ঠিক বিপরীতে। পূর্ব বাংলার জনগণের মনে পাকিস্তানের কেন্দ্রের প্রতি বিক্ষোভ ও ঘৃণা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সময়কালেই আবার কেন্দ্রের শাসকরা যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয় এবং অনেককেই কিনে নিতে সমর্থ হয়। একপর্যায়ে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী উভয়ই কেন্দ্রের মুসলিম লীগ প্রভাবাধীন মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের যে প্রথম সংবিধান রচিত হয়েছিল, তাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমান সমান ধরে নেয়া হয়েছিল, যদিও পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ ছিল পূর্ব বাংলার। মওলানা ভাসানী এই সংবিধানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকিও দিয়েছিলেন। এই প্রথম বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কথা প্রকাশ্যে উঠল।

কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপন থাকলেও এবং বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মী কারা অন্তরালে থাকলেও, এই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কম ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করত প্রধানত আওয়ামী লীগের ভিতরে থেকে আত্মপরিচয় গোপন করে। ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল প্রধান। তবে পঞ্চাশের দশকেও কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবেনি। আবার একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৮ সালে কলকাতার সংগ্রেসে যে সারা পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল (যারা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড সাজ্জাদ জহির) তারও কোনো কার্যকারিতা ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটিই প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করে যেত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল ক্ষীণ। ১৯৫৬ সালে এক গোপন সম্মেলনের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কমিউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। এখানে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ও চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে

পূর্ব-পাকিস্তানকে প্রায় স্বতন্ত্র দেশ বিবেচনা করেই পার্টি কাজ করছে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচি নিয়ে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত করতে পার্টি প্রস্তুত ছিল না।

এদিকে ১৯৫৭ সালে গণতান্ত্রিক শিবিরে বড় রকমের ভাঙন সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের শাসক প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা সোহরাওয়ার্দীকে হাত করে নিলেন। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের ছিল মাত্র ১৩ জন। ইসকান্দার মির্জার আশীর্বাদে মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়েই সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি ঘোষণা দিলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আর দরকার নেই। কারণ তার মতে সংবিধান অনুযায়ী ৯৮% স্বায়ত্তশাসন ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটে, বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তীতে সেনটো) এসব মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক চুক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। এমনকি সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের সময় তিনি ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিয়ে মিসরের বিরোধিতা করলেন। এসব প্রশ্নে তখন তাকে শেখ মুজিবুর রহমান পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। ভাবতে অবাক লাগে, যে শেখ মুজিব ১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করেছিলেন, দশ বছর পর তিনিই স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে ছয় দফা দাবি পেশ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার মানে বাঙালি জাতীয় চেতনার আরো উচ্চতর বিকাশ ঘটতে আরো দশ বছর লেগেছিল। আর ঠিক সেই উচ্চতর বিকাশের স্তরেই শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই, জাতি তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

১৯৫৬-৫৭ সালে বুর্জোয়া নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে স্বায়ত্তশাসন তথা জাতীয় আন্দোলন তখনকার মতো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ চরমে ওঠে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ নেয়ার কারণে এই পর্যায়ে ভাসানী তারই হাতে গড়া আওয়ামী লীগ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলে পরিণত হলো। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার জাতীয়তাবাদী চরিত্র অর্জন করেছিল। সে অনেক পরের কথা।

১৯৫৭ সালে ভাষানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি সামনে রেখে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। নাম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সংক্ষেপে ঘঅচ বা ন্যাপ। কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাপে যোগদান করলেন এবং অনেকেই শীর্ষস্থানীয় পদ দখল করলেন। বস্তুত ন্যাপে কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল প্রায় একচ্ছত্র। ভাসানী কমিউনিস্টদের খুবই সহযোগিতা করতেন। ১৯৫৭ সালে ভাষানী রংপুরের ফুলছড়ি ঘাটে কৃষক সম্মেলন সংগঠন। এতেও কমিউনিস্টরা দলে দলে যোগদান করেন। ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে যোগদান করেছিলেন পশ্চিম-পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আবদুল গাফ্ফর খান, বেলুচ গান্ধী বলে পরিচিত আবদুস সামাদ আচাকজাই, সিন্ধুর গান্ধী বলে পরিচিত জিএম সঈদ, পাঞ্জাবের প্রগতিশীল নেতা মিয়া ইফতেকার উদ্দিন। ফলে ভাসানীর এই নতুন দল ন্যাপ সারা পাকিস্তানভিত্তিক চরিত্র অর্জন করল। এতদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাদে কোনো দলই সারা পাকিস্তানভিত্তিক একক কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল না। ন্যাপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারে সোচ্চার থাকলেও, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবতে পারেনি। যদিও ভাসানী ইতোপূর্বে বিচ্ছিন্নতার হুমকি দিয়েছিলেন, ন্যাপ গঠনের পর থেকে তিনি পাকিস্তানভিত্তিক প্রগতিশীল পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতিদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হলো। ঠিক এ অবস্থায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি হলো। সূচনা হলো আরেক নতুন অধ্যায়ের।

আয়ুবের সামরিক শাসনের প্রথম সাড়ে তিনবছর দেশে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। ভাসানী জেলখানায়। ফজলুল হক অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। সোহরাওয়ার্দী ওকালতি করছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের চাকরি করছেন। অন্যদিকে জেলখানা ভরে গেছে কমিউনিস্ট ও ন্যাপ কর্মীদের দ্বারা। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে। শুধু কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে থেকে গোপনে কিছু তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই তিন বছরে তারা 'শিখা' নামে একটি গোপন পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাও মাত্র তিন সংখ্যা। হাতে লিখে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা। আটক রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর অকথ্য দৈহিক নির্যাতনও চলে। বেত্রাঘাত, ইলেট্রিক শক ইত্যাদি ছিল দৈহিক নির্যাতনের সাধারণ রূপ। এই অবস্থার মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র কর্মীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখত এবং সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। ছাত্র ইউনিয়নের কোনো সাংগঠনিক কাঠামো না থাকলেও গোপন ছাত্র ইউনিয়নের রিক্রুট করার কাজ চলছিল। এভাবে প্রধানত ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের প্রচেষ্টায় ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সামরিক শাসনকে অগ্রাহ্য করে ছাত্ররা সভা করে, মিছিল বের করে। রাস্তায় পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গুলি গ্রেপ্তার নির্যাতন উপেক্ষা করে '৬২-এর ছাত্র আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৬২-এর সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আমাদের দেশের ইতিহাসে আরেকটি মাইল ফলক। আইয়ুব সরকার আন্দোলনের মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। আইয়ুব সরকার একটি সংবিধান ঘোষণা করে। যদিও এই সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না, যদিও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা ছিল, তবুও এই সংবিধানের ফলে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার কিছুটা সুযোগ উপস্থিত হলো। ৬২-এর আন্দোলনের চাপে রাজবন্দিরাও মুক্তি লাভ করলেন।

'৬২-এর আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে দিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছাত্র ইউনিয়ন দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠনে পরিণত হলো। এই সময় একঝাঁক তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। তাদের এক অংশ শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এবারই কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে থেকেও গণভিত্তিক সম্পন্ন পার্টিতে রূপান্তরিত হলো। তরুণদের আগমনের ফলে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতি দেশের প্রায় সব থানাতেই গড়ে উঠল এবং তা বেশ জঙ্গিরূপ ধারণ করল। এতদিন পর্যন্ত শ্রমিক অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর আফতাব আলী ও ফয়েজ আহমদ নামে দুই ব্যক্তির প্রভাব ছিল। এরা দুজনেই ছিলেন সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট। এবার শ্রমিক আন্দোলনেও নতুন ধারা সৃষ্টি হলো। পুরাতন নেতৃত্বকে হঠিয়ে দিয়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল শিল্প এলাকায়, চা-বাগান, রেলওয়ে ও পরিবহনে, বিদ্যুৎ শিল্পে এবং হোয়াইট কলারদের মধ্যে। '৬২-এর আন্দোলন দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে ষাটের দশক হয়ে উঠেছিল সংগ্রাম ও বিদ্রোহে ভরপুর এক উত্তাল দশক। ষাটের দশকেই সবচেয়ে বেশি করে সামনে আসে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীন করার চিন্তা-ভাবনাও প্রকাশ্যে-অপ্রকাশে আলোচিত হতে থাকে। তবে এই সময়কালের দুটি ঘটনা সাময়িকভাবে হলেও আন্দোলনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৬৪ সালে দেশে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সরকার এ দাঙ্গায় সরাসরি মদদ জুগিয়েছিল। কিন্তু এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রুখে দাঁড়ায়। সবকটি জনপ্রিয় দৈনিক একযোগে একই সম্পাদকীয় লেখে, যার শিরোনাম ছিল 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও।' ভাসানী দাঙ্গার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। শেখ মুজিবকে আহ্বায়ক করে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিও গঠিত হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভাসানী-মুজিবসহ সব রাজনৈতিক নেতা ও দল সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানায়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের

লজ্জাজনক পরাজয় হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়। এই অবস্থায় আইয়ুবকে উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতারা লাহোরে এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। এতে ভাসানী ও ন্যাপ বাদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বিরোধী দলকে ডাকা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিব ওই সম্মেলনে যোগদান করলেও, সম্মেলনের শেষ দিন বেরিয়ে এসে লাহোরেই এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পেশ করলেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। তিনি বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে আমার বনল না, '৬৫-এর যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল, তাই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থে আমি ছয় দফা পেশ করছি।' ছয় দফায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য দুই স্টেট ব্যাংক ও দুই মুদ্রা, বহির্বাণিজ্যের ওপর পূর্ব-পাকিস্তানে জমা হওয়ায় এবং পাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা ইত্যাদি ছয় দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্পষ্টতই পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি এ দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রচার শুরু করলে তাতে বিপুল সাড়া পড়ে। কিছুদিন পর শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতারা গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৭ সালে সরকার একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করল। সেনাবাহিনীর কয়েকজন নন-কমিশনড অফিসার নাকি ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছেন। শুরু হলো বহুল আলোচিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিছুদিন পর শেখ মুজিবকেও এই মামলায় আসামি করা হয়। এখন জানা গেছে, কিছু সেনা অফিসার একরম চিন্তা করলেও, বস্তুত ভারত সরকারের এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না, আর তাতে শেখ মুজিবের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। আগরতলা মামলার খবর প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হতে থাকে। আইয়ুব সরকার ভেবেছিল, এতে জনমতকে ভারতবিরোধী করে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু না, আগরতলা মামলা ছয় দফা, শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার জনগণকে শুধু সরকারবিরোধী নয়, পাকিস্তানবিরোধীও করে তোলে।

সমসাময়িককালে আরেকটি বড় ঘটনা হলো কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভক্তি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তির প্রভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হলো ১৯৬৬ সালে। এক অংশ মস্কোপন্থী ও অন্য অংশ চীনপন্থী বলে পরিচিত হলো। ভাসানী চীনপন্থীদের প্রতি তার আশীর্বাদ রাখলেন। ফলে ন্যাপেও বিভক্তি এলো। সেদিন ষাটের দশকের নবাগত তরুণ কমিউনিস্টদের মধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্যের চর্চাও তেমন ছিল না। তবু তরুণ কমরেডরা ধরে নিয়েছিলেন, মস্কোপন্থীরা সংশোধনবাদী আর চীনপন্থীরা বিপ্লবী। ১৯৬৭ সালে তথাকথিত চীনপন্থী পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রথম কংগ্রেস স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা গঠনের লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্টদের অন্য অংশ ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই স্বাধীনতার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে দুই বিপরীতমুখী কমিউনিস্টদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। এদিকে আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে জাতির মুক্তি সনদ বলে ঘোষণা করে। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহযোগী ন্যাপের অংশ আওয়ামী লীগের সহযোগী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এখানেও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। আওয়ামী লীগ স্লোগান তুলল 'জয় বাংলা'। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত কমিউস্টি পার্টি ও তার সহযোগী ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের একাংশ স্লোগান দিল 'দুই পাকিস্তানের এক আওয়াজ, কায়েম গণরাজ।' এদিকে পিকিংপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানী ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের আওয়াজ ছিল 'শ্রমিক-কৃষক অস্ত্রধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো।' তারা 'জয় বাংলার' স্লোগানের পাল্টা 'জয় সর্বহারা' স্লোগান দিত। এই স্লোগান-পাল্টা স্লোগান নিয়ে তখন প্রায়ই সংঘর্ষ হতো।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বাড়িতে যে ঘটনা ঘটল এবং পরে নকশাল নামে যে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটল, তার প্রভাব এসে পড়ল আমাদের দেন। চীনের পার্টি চারু মজুমদারকে পূর্ণ সমর্থন দান করল। ফলে তথাকথিত চীনপন্থী কমিউনিস্টদের বড় অংশ নকশাল হয়ে গেল। চারু মজুমদারের লাইন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন, গণযুদ্ধের পথ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংশোধনবাদ-বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৬৮-৭০ সালের মধ্যে কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় একাংশ আওয়ামী লীগের প্রবাসী সরকারকে মেনে নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করে। তারা যুদ্ধচলাকালে দেশের মধ্যে ১৪টি সশস্ত্র ঘাঁটি এলাকা গঠন করেছিল। এই অংশই স্বাধীনতা উত্তরকালে ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে। অন্য অংশ পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থনের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা জাতীয় যুদ্ধের প্রশ্ন নির্লিপ্ত থেকে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে 'কৃষি বিপ্লব' করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কয়েকটি স্থানে সশস্ত্র ঘাঁটিও স্থাপন করেন। তারা একই সঙ্গে পাক-বাহিনী ও মুক্তি-বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধ লড়াই করার আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ করেন।

এবার '৭১ সালের দুই বছর আগে ফিরে আসি। ১৯৬৮-এর ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী গভর্নরের বাসভবন ঘেরাও করেন। ৫-৭ ডিসেম্বরে সারাদেশে হরতাল এবং ২৯ ডিসেম্বর গ্রামবাংলায় হাট হরতালের ডাক দেন। এর থেকেই সূত্রপাত হলো আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনের, যা অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। সম্মিলিত ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে আন্দোলনের নামে। এই ১১ দফার মধ্যে উপরোক্ত ছয় দফাসহ ব্যাংক বীমা ভারী শিল্প জাতীয়করণের এবং শ্রমিক কৃষকের মূল দাবিগুলো ছিল। অচিরেই ১১ দফা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নটি সবচেয়ে সামনে এসেছিল। আন্দোলন খুবই জঙ্গিরূপ ধারণ করে। কয়েক দফায় সাধারণ মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল করেছে। এই সময় শ্রমিকরা লাল পতাকা উড়িয়ে কারখানার দখল নিয়ে নেয়। তারা মিল কর্তৃপক্ষকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই আন্দোলন বাংলাদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ভূমিকম্পের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রামবাসী সরকারি তহসিল অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি অঞ্চলে গ্রামবাসী অত্যাচারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ফরাসি বিপ্লবের কায়দায় গণআদালতে বিচার করে প্রকাশ্যেই, তাদের জবাই করছে। শহরাঞ্চলে সরকারি মন্ত্রী, আগরতলা মামলার বিচার ও মুসলিম লীগ নেতাদের বাড়িতে আগুন ধরানো হয়েছে। অবস্থা এমনই দাঁড়ায়, দেশে প্রশাসন বলতে কিছুই ছিল না। ধনী ব্যক্তিরা তাড়াহুড়া করে দেশ ত্যাগ করতে থাকে। এ অবস্থায় সরকার ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। আইয়ুব খান গোল বৈঠক ডাকেন। ভাষানী ও ভুট্টো গোল টেবিল বয়কট করেন। শেখ মুজিব যোগদান করলেও পরে বেরিয়ে আসেন। অবশেষে ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হলো কিন্তু সামরিক শাসন দিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। তাই ইয়াহিয়া খান নতুন কৌশল নিলেন।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করে দিলেন ঘেরাও করে বলপূর্বক শ্রমিকরা যেসব চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে, তা মালিকদের মানতে হবে। তিনি নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করলেন, যা আগের মজুরির প্রায় দ্বিগুণ। তিনি শ্রমিক দলের মূল দাবিগুলো মেনে নিয়ে নতুন শ্রম আইন ঘোষণা করলেন। তিনি রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন না। বরং '৭০ সালে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিলেন। এতদিন পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমান ধরে নিয়ে যে নির্বাচনের প্রথা চালু ছিল তা বাতিল করে দিলেন। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের আসন সংখ্যা বেশি হলো। তিনি বললেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নতুন সংবিধান তৈরি করবে। তবে শর্ত দিলেন, এই সংবিধান পাকিস্তানের সংহতির এবং কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী হতে পারবে না। বাম-কমিউনিস্টরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালো এবং নির্বাচন বর্জনের ডাক দিল।

নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারে তাদের ওপর ভারতের চারু মজুমদারের প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, তখন ভাসানী ন্যাপের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্য ও নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন এই অতি বাম কমিউনিস্টরা। দলের নেতা ও কর্মীদের চাপে ভাসানীও নির্বাচন বর্জনের পক্ষে মত দিলেন। এই একটি বিরাট ভুল ও হঠকারী পদক্ষেপ ছিল। আবার অনেকে বলেন ভাসানী শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না গিয়ে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে একচেটিয়াভাবে জেতার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি দ্রুত সামনে চলে আসে।

নির্বাচনের ফলাফল খুবই চমকপ্রদ। আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের দুটি আসন বাদে সবকয়টি আসনে জয়লাভ করল। এতে পশ্চিম-পাকিস্তানের সংসদদের তোয়াক্কা না করেও শেখ মুজিব একাই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে পারেন এবং ছয় দফাভিত্তিক সংবিধান তৈরি করতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তার দল পিপলস পার্টি। ভুটো বললেন, শেখ মুজিব যদি তার সঙ্গে সমঝোতায় না এসে সংবিধান রচনা করতেন এবং সরকার গঠন করতেন, তবে পশ্চিম পাকিস্তান বিদ্রোহ করতেন। আর তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ছয় দফা পশ্চিম-পাকিস্তান মানবে না। এ অবস্থায় সামরিক শাসক ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলেন। এতে পূর্ব-পাকিস্তান বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। ১৯৭১-এর ১ মার্চ শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এমন অসহযোগ আর কখনো হয়নি। ৩ মার্চ ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালো। সেই পতাকা উড়লো সব সরকারি অফিসে, হাইকোর্টে এবং দেশের সব বাড়িতে। পূর্ব-পাকিস্তান কার্যত স্বাধীন। শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসগৃহ থেকে যেন দেশ চালাচ্ছেন। তার প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সরকারি কর্মচারী, বিচারপতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি নাগরিক।

ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো এলেন ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করতে। দিনের পর দিন আলোচনা চলল। এদিকে জনগণ ছয় দফার প্রশ্নে একফোটাও ছাড় দিতে রাজি নয়। জনগণের কোনো প্রকার সামরিক প্রস্তুতি না থাকলেও, স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা ছিল অবিচল। সেই সময় মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বিবিসির ভাষ্যকার মার্ক টালি বলেছিলেন, 'এ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কারণ, এ হচ্ছে দুই বন্দির মধ্যে আলোচনা, একজন জনতার হাতে বন্দি, অন্যজন সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি।' আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়নি। এমন সময় ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে এবং ঢাকার রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। সেনাবাহিনীর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়েই শুরু হলো স্বাধীনতার যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই ইতিহাস বলতে গেলে এই রচনা আরো দীর্ঘ হবে। তাই আপাতত সে কাহিনী বর্ণনা করছি না। ১৯৭১-এর যুদ্ধ আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এ ঘটনা সচক্ষে দেখা ও তাতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার নিজেকে আরো সৌভাগ্যবান মনে হয় এ কারণে যে, ঘটনাটি ঘটে এমন এক সময়ে যখন আমার জীবনে ছিল সবচেয়ে সুন্দর বয়সকাল, যৌবন-যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যুদ্ধ সম্পর্কে আমার গর্ব ও সেন্টিমেন্ট দুই আছে। তবে এতকাল পর আমার মনে হয় পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আমরা যুদ্ধে নামতে পারি-নি। আমি সামরিক বা টেকনিক্যাল প্রস্তুতির কথা বলছি না। জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য মতাদর্শের দিক দিয়ে জনগণকে পুরো প্রস্তুত করার কজটি বাকি ছিল। তাই '৭১-এর পরাজিত শত্রুরা এতকাল পরে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিশেষ করে আমাদের দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই মতাদর্শগত ভিত্তি এখনো যথেষ্ট সবল নয়। এর জন্য আমাদের নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে। ইতিহাসে দেখা যায় বেশকিছু ঘাটতি নিয়েও বিশেষ পরিস্থিতিতে বিজয় অর্জন করা যায়। সে ক্ষেত্রে বিজয়ের পরও ঘাটতি পূরণ করতে হয়। প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রামকে পরিপূর্ণ করার কাজটি এখন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমার দেশের জনগণের প্রতি আমার আস্থা আছে। এই সংগ্রামেও তারা বিজয়ী হবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

বিশেষ রচনা

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটি সাহচর্যের কাহিনী

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

দুজন ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে কিভাবে একটি ক্ষমতাসীন রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত এবং অন্য একটি রাজবংশ ক্ষমতাসীন হতে পারে? চাণক্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৮৩) ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০-২৯৮) মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ সখ্য প্রাচীন ভারতের নন্দ রাজবংশকে ধ্বংস করেছিল এবং মৌর্য রাজবংশকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। চাণক্যের সাহচর্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তার বিশালত্ব খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথের মন্তব্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। স্মিথের মতে 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের সেই বিজ্ঞানসম্মত সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যার জন্য মহাশক্তিধর মুঘলেরা ব্যাকুল ছিল এবং ব্রিটিশরা জীবনভর দীর্ঘশ্বাস ফেলত।' (Chandragupta Maurya had reached those scientific borders of India for which the Great Mughals yearned and the British sighed for their life.) এটি সচরাচর বলা হয় যে চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষক যেমনটি অ্যারিস্টটল ছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শিক্ষক। তবে অ্যারিস্টটল এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের অসুখী এমনকি তিক্ত সম্পর্কের তুলনায় চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সম্পর্ক ছিল আদর্শ ধরনের। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ

সম্পর্ক প্রায়ই ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তায় কাজে দিত। একই সঙ্গে এটি চাণক্যকে প্রাচ্যের একজন সামাজিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। সব কিছু মিলিয়ে নন্দ বংশকে ধ্বংস করে মৌর্য বংশকে সিংহাসনে আরোহণ করানো এবং চাণক্যকে একজন সামাজিক চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করানো সম্ভব হয়েছিল চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে সম্পর্কের কারণে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং চাণক্যের আশ্রয়দাতা। একই সঙ্গে এও স্মরণ রাখতে হবে যে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চাণক্যের সঙ্গে কিছু শর্তে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ওই প্রাথমিক শর্তগুলো তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে সম্পর্ক সেখানেই থেমে থাকেনি। এ সম্পর্ক এমনকি চাণক্যের অবসরে যাবার পরেও অব্যাহত ছিল। এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে অবসরে যাওয়ার পরেও চাণক্য জরুরি অবস্থার সময়ে রাজাকে পরামর্শ দিতেন। বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতে লোকপ্রসিদ্ধ সম্পর্কের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরিচিতি

চাণক্য : চাণক্যের আরো দুটি নাম আছে, একটি হচ্ছে কৌটিল্য আর অন্যটি বিষ্ণুগুপ্ত। তবে একাডেমিক ক্ষেত্রে তিনি কৌটিল্য নামেই সমধিক খ্যাত। চাণক্যকে প্রায়ই পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এ ছাড়া কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চাণক্য নামটি অধিক জনপ্রিয়। ভারতের রাজধানী দিল্লির বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলো যে এলাকায় অবস্থিত, চাণক্যের নামানুসারে সে এলাকাটি 'চাণক্যপুরী' নামে পরিচিত।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক ড. রাধাকান্ত শ্যামাশাস্ত্রী বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ শ্লোক, চব্বিশ অধ্যায় থেকে চাণক্য পণ্ডিতের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। দৈবক্রমে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন থেকে পঞ্চাশ শতক বছর আগে এবং প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানাজানি হওয়ার ২ হাজার ৭০০ বছর আগে করা হয়েছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের অবগত করায় যে–

'(প্রথম) মহাপদ্ম এবং তারপর তার পুত্রগণ-সংখ্যায় শুধু নয়জন-শতবছরব্যাপী বিশ্বের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কৌটিল্য নামের একজন ব্রাহ্মণ এই নন্দদের নিধন করবেন। তাদের মৃত্যুর পর, মৌর্যগণ পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। কৌটিল্য নিজে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাবেন। তার (চন্দ্রগুপ্তের) পুত্র হবেন বিন্দুসার এবং তার পুত্র হবেন অশোকবর্ধন।'

চাণক্যের পিতা 'চাণক' ছিলেন মগধ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 'শাকতার'-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাদের মধ্যে ছিল পারিবারিক সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সূত্রে শাকতারের কন্যা সুভাষিণীর সঙ্গে চাণক্যের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজদরবারের আর একজন প্রভাবশালী সদস্য 'রাক্ষস'-এর প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে 'শাকতার' তার রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়েছিলেন। এক রাতে 'শাকতারকে' রাজা ধন নন্দ তালাবদ্ধ করে রাখে। চাণক্যের পরিবারের সঙ্গে রাজা ধন নন্দের শত্রুতা শুরু হয় যখন 'চাণক' প্রকাশ্যে রাজার কুশাসনের সমালোচনা করতে থাকেন। এরপর 'চাণককে' রাজা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাজদণ্ডে 'চাণক'-এর মৃত্যুর পর মগধের সাবেক মন্ত্রী কাত্যায়ন তক্ষশীলার (বর্তমান পাকিস্তানের লাহোর) আচার্য পুণ্ডরিকাক্ষের কাছে চাণক্যকে প্রেরণ করেন। চাণক্য তক্ষশীলায় তার শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং সেখানেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কয়েক বছর পরে তিনি পাটলীপুত্রে (বর্তমান ভারতের বিহারের রাজধানী পাটনা) তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেন তার মা মৃত। তিনি আরো জানতে পারেন যে রাক্ষসের ক্রমবর্ধমান কুকর্মের ফলে নন্দ রাজত্বের প্রশাসনব্যবস্থা আরো খারাপের দিকে নিপতিত হয়েছে। নন্দ রাজবংশের প্রভাবশালী মন্ত্রী রাক্ষস মৃত শাকতারের কন্যা সুভাষিণীকে তার রক্ষিতা করে রেখেছিলেন। এ সময় যখন চাণক্য উপদেশ দেয়ার জন্য রাজদরবারে যান তখন তাকে অপমান করে বন্দি করে রাখা হয়। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন নন্দ বংশের একজন সেনাপতি। তিনিও নন্দ রাজার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বন্দিদশা থেকে চাণক্যকে মুক্ত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। চন্দ্রগুপ্ত নামটি প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থ ও গ্রিক বিবরণে Sandracottus বা Sandrokyptos বা Androcottus প্রভৃতি নামে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন পিপ্‌ফালিভান গোত্রের মৌর্য ক্ষত্রিয়ের বংশধর। তিনি রাজকীয় পিতা-মাতার আশীর্বাদধন্য ছিলেন না এবং তার রাজবংশীয় কোনো যোগসূত্র ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের পিতা ছিলেন মৌর্য গোত্রের প্রধান এবং তিনি যুদ্ধে নিহত হন। তার সন্তানসম্ভবা বিধবা মাতা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে আশ্রয় নেন এবং একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। এ পুত্রটি গ্রামের রাখাল বালক এবং শিকারিদের সঙ্গে লালিত-পালিত হতে থাকেন।

ইতিহাসবিদদের মতে প্রথম জীবনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজা হওয়ার জন্য ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। 'মহাবংশ টিকা' অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ রাজবংশের বিরুদ্ধে একটি অসফল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তার জন্য নন্দদের ক্ষমতা ছিল ভয়ানক সেহেতু তিনি মগধ থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। পালানোর পরে তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলার কুটিরে কিছুকাল আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্লুটার্ক বলেন, 'নন্দদের উৎখাত করার জন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ সময় আলেকজান্ডারের শিবির পরিদর্শন করেন এবং সাহায্যের আবেদন করেন।' তবে চন্দ্রগুপ্ত ও আলেকজান্ডারের সাক্ষাৎ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে রুশ বিশেষজ্ঞ গ্রিগরি মাক্সিমোভিচ বোনগার্ড-লেভিন (১৯৩৮-২০০৮) তার গবেষণা গ্রন্থ Mauryan India-তে বলছেন, সে সময় ভয়ানক নন্দ বংশকে চ্যালেঞ্জ করার মতন চন্দ্রগুপ্তের যথেষ্টসংখ্যক বেতনভোগী সৈন্যদল ছিল না, সুতরাং তিনি (চন্দ্রগুপ্ত) মেসিডোনীয় রাজা আলেকজান্ডারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত লেভিন বলেন, যেহেতু চন্দ্রগুপ্ত নন্দবিরোধী একটি জোট গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি হয় গ্রিক সৈন্যদের এ জোটে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন অথবা আলেকজান্ডারের সৈন্যদের ধন নন্দের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। চূড়ান্তভাবে, প্রাক্-অনুমান করেছিলেন যে আলেকজান্ডারের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ভয়ানক নন্দদের সঙ্গে তার প্রথম বিরোধিতার পর। জাস্টিন এ ব্যাপারে লেভিনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং বলেন যে চন্দ্রগুপ্তকে এ সময় বিন্ধ্যাঞ্চলের পার্বত্য বনভূমিতে ভবঘুরের মতো ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাতে হয়েছে। জাস্টিন বলছেন, 'আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে ভারত তার কাঁধ থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে দাসত্ব ফেলে দেয় এবং তার (আলেকজান্ডারের) গভর্নরদের হত্যা করে। এই মুক্তির কর্তা ছিলেন সান্ড্রোকোট্টাস (চন্দ্রগুপ্ত)।' কালক্রমে চন্দ্রগুপ্ত দস্যুদের নিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেন। এ সেনাবাহিনীর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত ভয়ংকর নন্দদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং তাদের উৎখাত করে মৌর্যদের একটি নতুন রাজত্ব গড়ে তোলেন। প্লুটার্ক লিখেছেন, 'এবং সান্ড্রোকোট্টাস, যিনি পরে সিংহাসনে আরোহণ করে সেলুকাসকে ৫০০ হাতি দিয়েছিলেন এবং ৬,০০,০০০ সৈন্য দিয়ে সমস্ত ভারত আয়ত্তে নিয়েছিলেন।'

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে তথ্যের কিছু উৎস

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সম্পর্কের ব্যাপারে বিস্তৃত মতবাদ বিদ্যমান আছে। এসব মতবাদ কেন্দ্র করে অনেক গবেষণাকর্মও রচিত হয়েছে। টমাস আর ট্রাউটম্যান (১৯৭১) প্রাচীনকালের চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত কথা সম্পর্কে চার ধরনের বিবরণ চিহ্নিত করেছেন। নিম্নের সারণিতে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে–

লৌকিক কাহিনীর বিবরণ	টেক্সট্	মন্তব্য
বৌদ্ধ বিবরণ	মহাবংশ এবং এর ভাষ্য	পালি ভাষা
জৈন বিবরণ	বামশথাপ্পাকাসনী	হেমচন্দ্র কর্তৃক
পরিশিষ্ট পর্বে প্রাপ্ত	কাশ্মিরী বিবরণ	কথাশারিতসাগর
সোমদেব	বৃহৎ-কথা-মঞ্জরি	ক্ষেমেন্দ্র

বিশাখ দত্তের বিবরণ মুদ্রারাক্ষস বিশাখ দত্তের একটি সংস্কৃত নাটক উপরোল্লিখিত লৌকিক কাহিনীর বিবরণে যেসব সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান আছে

সেগুলো হচ্ছে–
১. রাজা ধন নন্দ চাণক্যকে অপমানিত করেন যা তাকে (চাণক্যকে) নন্দ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে।
২. নন্দ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন এক যোগ্য উত্তরসূরির অনুসন্ধান করছিলেন চাণক্য এবং এভাবে তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে পেয়ে যান।
৩. কিছু সহযোগীর সাহায্যে চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত দক্ষ ও গোপন কৌশল প্রয়োগ করে নন্দ সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।
বিভিন্ন আধুনিক বিবরণে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্পর্কে রূপকথার আকারে কাহিনী তৈরি করা হয়েছে এবং এভাবে এসব লৌকিক কাহিনী সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দেখা যায় নন্দ রাজা তার বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রগুপ্তকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, যিনি পরে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। চাণক্য ও মগধ রাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাত্যায়নের সাহায্যে নন্দকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন চন্দ্রগুপ্ত। চাণক্য পরে নন্দ রাজাকে হত্যা করেন। হরি রাম গুপ্তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে নন্দ রাজার সঙ্গে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। বিকে চতুর্বেদী তার 'চাণক্য' গ্রন্থে এবং অশ্বিন সাংহি 'চাণক্য শ্লোক' গ্রন্থে চাণক্যের জীবনী সম্পর্কে আধা-রূপকথার আকারে বিবরণী দিয়েছেন।
চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মূল উপদেষ্টা। চাণক্যের বুদ্ধি অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতেন। কিসতা জার্মানির বিসমার্কের মতো চাণক্যকে কখনো চন্দ্রগুপ্তের চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শত্রুকে পরাস্ত করতে এবং জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত জ্ঞানী রাজাকে তিনি উপদেশ দিতেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পরে গ্রিক আক্রমণকারীদের থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য তাদের ভারত জয় শুরু করেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারা দুজন গ্রিক শাসক, নিকেনার এবং ফিলিপকে হত্যা করেন। রাধা কুমুদ মুখার্জী লিখেছেন, 'গ্রিক শাসকদের হত্যাকাণ্ড সামান্য দুর্ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না।' (The assassinations of the Greek governors are not to be looked upon as mere accidents.) পাঞ্জাব ও সিন্ধুসহ পশ্চিম ভারতের অনেক এলাকা গ্রিকদের কাছ থেকে দখলে নেয়ার পরে এবং পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের গ্রিক উত্তরসূরি সেলুকাসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় পুরোটাই একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন এবং এখনো বিবেচিত হন ভারতের প্রথম একত্রীকারক এবং ভারতের আসল সম্রাট অথবা রাজা হিসেবে।

অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার

'অর্থশাস্ত্র' আবিষ্কার সম্ভবত সংস্কৃত সাহিত্যে সমগ্র কাজের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান এবং এটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গবেষণা সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। এটি একটি স্বীকৃত ব্যাপার যে চাণক্য তিনটি বই লিখেছিলেন– অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও চাণক্যনীতি। কিভাবে নেতা চিহ্নিত করা যায় এ সম্পর্কে চাণক্যের ধারণাগুলো একটি দেশের মানুষকে শাসন করার মতো তালিম দেয়ার ব্যাপারে একটি উত্তম দলিল হচ্ছে 'অর্থশাস্ত্র'। অর্থনীতি সম্পর্কে এটিকে প্রথম নিয়মবদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া এটি রাজনৈতিক চিন্তা ও সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে বিশ্বের প্রথম বইগুলোর অন্যতম। এ বইতে ৬০০০ প্রবাদ অথবা সূত্র আছে। এ বইটি ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। ওই বছর একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও মহীশূরের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারিক রুদ্রপত্তনম শ্যামাশাস্ত্রী তালপাতায় লিখিত পাণ্ডুলিপির স্তূপ থেকে অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি এর সংস্কৃত সংস্করণ নকল ও সম্পাদনা করে ১৯০৯ সালে প্রকাশ করেন। এরপর তিনি এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেন। এ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত শুধু বিভিন্ন পণ্ডিতের কাজে উল্লিখিত সূত্রের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে জানা গিয়েছিল। এ আবিষ্কার প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনে এবং বিশেষত সে সময়ের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা যে ভারতীয়রা গ্রিকদের কাছ থেকে প্রশাসন কলা শিখেছে তা পরিবর্তন করে ইতিহাস অধ্যয়নের গতি পাল্টিয়ে দেয়। ভারততত্ত্ববিদ এবং প্রাচ্যবিদদের দ্বারা বিশ্বব্যাপী এ আবিষ্কারের প্রশংসা হতে থাকে। যারা এ আবিষ্কারের প্রশংসা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভারততত্ত্ববিদ জেএফ ফ্লিট, জার্মান পণ্ডিত জুলিয়াস জোলি, অস্ট্রীয় প্রাচ্যবিদ মরিজ উইন্টারনিট্জ, ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদ ও তিব্বততত্ত্ববিদ এফডব্লিউ টমাস, ফরাসি প্রাচ্যবিদ পল পেলিয়ট, স্কটিশ ভারততত্ত্ববিদ এ বেরিডেইল কেইথ, সুইডিশ ভারততত্ত্ববিদ স্টেন কোনাউ, এবং অন্যরা। জেএফ ফ্লিট একটি চিঠিতে শ্যামাশাস্ত্রীকে লিখেন– We are, and shall always remain, under a great obligation to him for a most important addition to our means of studying the general history of ancient India. অর্থাৎ 'আমরা প্রাচীন ভারতের সাধারণ ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজনের জন্য তার প্রতি বিরাট দায়বদ্ধ আছি এবং সর্বদা থাকব।' নরেন্দ্রনাথ ল এ কাজটি সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে অন্যতম একজন ভারতীয়। ল চাণক্যের অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে 'দণ্ডনীতি (রাজনীতি) বিজ্ঞানটি মৌর্যদের লাভের জন্য আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত ৬০০০ শ্লোকে সূত্রবদ্ধ করেছেন।'

ড. জেএফ ফ্লিট শ্যামাশস্ত্রীর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন (২০ নভেম্বর, ১৯১৪)। তিনি অনুবাদকের মতামত উল্লেখ করে বলেছেন যে কৌটিল্য নামের একজন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন যার আসল নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত এবং চাণক্য ছিল তার পৈতৃক বা গোত্রজ নাম। ফ্লিট আরো বলেন যে চাণক্য নিজে অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসেবে তার বিষ্ণুগুপ্ত নামটি এক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। বস্তুত কৌটিল্য নামটি আরোপিত হয়েছিল চাণক্য সম্পর্কে। এর অর্থ হচ্ছে যে পরবর্তীকালের লেখকরা তাকে এ নামটি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক জ্যাকবি তার লেখায় শুধু চাণক্য নামটি ছাড়া অন্য কোনো নাম ব্যবহার করেননি। ড. জোলি ও ড. স্মিথ তাদের যৌথ কাজে নিম্নোক্তভাবে তিনটি নাম ব্যবহার করেছেন–
The recently discovered Arthasastra of Chanakya, alias Kautilya or Visnugupta is perhaps the most precious work in the whole range of Sanskrit literature.
অর্থাৎ সম্প্রতি আবিষ্কৃত চাণক্য ওরফে কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্তের অর্থশাস্ত্র সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি মূল্যবান কাজ।
চন্দ্রগুপ্তকে কতটুকু সাহায্য তিনি করেছিলেন সে দাবি সম্পর্কে চাণক্য বিনয়ী ছিলেন না। 'এই বিজ্ঞানটি চাণক্য কর্তৃক রচিত হয়েছিল, যিনি... দ্রুত বিজ্ঞানটির এবং অস্ত্রশাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং পৃথিবী জয় করেছিলেন যেটি নন্দ রাজাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।'

চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে মিলিত হয়েছিলেন?

ঘটনাটি ঘটেছিল অকস্মাৎ। একদিন চন্দ্রগুপ্ত যখন তার গ্রাম্য খেলার সাথীদের সঙ্গে একটি কৃত্রিম রাজদরবার সাজিয়ে খেলা করছিলেন তখন চাণক্য সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চাণক্য বালকটির জাঁকালো বদান্যতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভাবনা লক্ষ্য করে অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বালকটির পালক পিতা, যিনি ছিলেন একজন রাখাল, তার কাছ থেকে তাকে (বালকটিকে) ১০০০ কশাপন (মুদ্রা) দিয়ে কিনে নেন। চাণক্য এরপর কিশোর চন্দ্রগুপ্তকে তক্ষশীলায় নিয়ে আসেন। ভবিষ্যৎ রাজকীয় কর্তব্যের জন্য যথাযথভাবে পথপ্রদর্শন করার পবিত্র লক্ষ্যে তাকে মানববিদ্যা, শিল্পকলা, দেশ শাসনবিদ্যা এবং সামরিক বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। এভাবে বৌদ্ধ পরম্পরাগত মতবাদের সঙ্গে জাস্টিনের ধ্রুপদী বিবরণের সঙ্গে কিছু মিল আছে। জাস্টিন বলছেন, চন্দ্রগুপ্ত সামান্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ভাগ্যগুণে তিনি রাজকীয় মর্যাদায় উন্নীত হন। বৌদ্ধ টেক্সট্ ও ধ্রুপদী লেখকরা মৌর্য রাজবংশের বৈধ দলিলপত্রাদি অবলম্বন করে প্রণীত, আধুনিক ইতিহাসবিদরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রথম জীবনের ঐতিহাসিক বর্ণনা সৃষ্টি করার জন্য সাধারণত এসব সত্য ঘটনার ওপর নির্ভর করেন।

একজন বালক হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন তক্ষশীলায় এসেছিলেন, তখন সমস্ত উত্তর ভারতের অবস্থা এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে চন্দ্রগুপ্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন ৩২৬ খিস্টপূর্বে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে, যখন সম্পূর্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারত শক্তিশালী মেসিডোনীয় রাজার অধীনে ছিল যিনি অধীন এলাকাগুলোয় সৈন্যদল পদায়ন করেছিলেন। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ স্বৈরাচার ও অত্যাচারী শাসক নন্দ রাজা ধননন্দের অধীনে ছিল। ইতোমধ্যে অধীন রাজাদের একজন পোরুস গ্রিক সেনাপতি ইউডেমাস কর্তৃক নিহত হন। পোরুসের মৃত্যুর কারণে এ শূন্য অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ধন নন্দের অজনপ্রিয়তাকে নিপুণতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে এবং বিচক্ষণ কূটনীতি প্রয়োগ করে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমগ্র উত্তর ভারত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অঙ্গীকারের প্রতি চাণক্যের দৃঢ়তা এবং ভোজনালয়ের ঝগড়া

রাজার প্রাসাদে নন্দদের সঙ্গে চাণক্যের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল। এটি হয়েছিল নন্দ রাজবংশের একটি রাজকীয় অনুষ্ঠানের সময়। নন্দদের পূর্বপুরুষ এবং আত্মীয়দের একটি শ্রাদ্ধ (মৃতব্যক্তির স্মরণে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান)

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে চাণক্য, যার সঙ্গে কালক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, ছিল একজন গরিব ব্রাহ্মণ এবং তিনি নন্দ রাজাদের রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীর উপকণ্ঠে বাস করতেন। প্রতিবেশী কয়েকজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে যাওয়ার পথে চন্দ্রগুপ্ত দেখতে পান চাণক্য মুঞ্জা ঘাস উপড়ে ফেলছেন এবং সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে তার ভস্ম খেয়ে ফেলছেন কারণ এই ঘাসে তার (চাণক্যের) পা কেটে গিয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত এই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তার (চাণক্যের) সংকল্প, এবং রাজনীতিতে যে নিপুণতা তিনি দেখিয়েছিলেন, তা চন্দ্রগুপ্তকে এটি নিশ্চিত করতে পেরেছিল যে তিনি নন্দদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে যে লোক আশা করেছিলেন তা এর (চাণক্যের) মধ্যে পাওয়া যাবে।

তিনি (চন্দ্রগুপ্ত) তার পিতামহ মৌর্য ক্ষত্রিয়ের নির্দেশক কথা স্মরণ করেন, যিনি চাণক্য সম্পর্কে বলেছিলেন। এই মানুষটিকে কখনো তার শত্রু না করে যে কোনো মূল্যে বন্ধু বানাতে বলেছিলেন। এভাবে চাণক্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরে চন্দ্রগুপ্ত খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এবারে চাণক্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে বলেন, 'আমি চিরতরের জন্য আপনাকে আমার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার অনুরোধ জানাই, এবং কখনো আমার অজ্ঞতার কারণে কোনো কিছু করে ফেললেও আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না। সেটিই ছিল আমার পিতামহ, জ্যেষ্ঠ মৌর্যের মৃত্যু শয্যার ইচ্ছা।'

যাহোক, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন চাণক্য নন্দ রাজদরবারের দিকে এগিয়ে যান এবং ব্রাহ্মণ অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত সম্মানজনক আসনটিতে বসে পড়েন। গরম মস্তিষ্কের নন্দরা এই অনধিকার প্রবেশ দেখে এবং কোনো কিছু না জেনেই রাগান্বিত হয়ে চাণক্যকে বের করে দিতে বলেন। নন্দদের চাকরেরা চাণক্যের শিখা (চুলের টিকি) ধরে তাকে অতিথিদের হল থেকে বের করে দেন। এরপর ক্রোধান্বিত ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দদের বীজ সমূলে ধ্বংস করে একজন শূদ্রকে সিংহাসনে বসানোর প্রতিজ্ঞা করেন। চাণক্য এরপর বেরিয়ে যান এবং যখন তিনি চন্দ্রগুপ্তকে দেখেন তখন তিনি তাকে রাজা বানানোর প্রতিজ্ঞা করেন। তবে শর্ত দেন যে রাজা হওয়ার পর তাকে (চাণক্যকে) প্রধানমন্ত্রী বানানো হবে। অসন্তোষ, অপমান এবং ক্রোধের এই কাহিনীটি প্রাচীন ভারতের রাজা, রাজ্য এবং প্রজাদের সম্পর্কিত গ্রন্থ 'কথা-সরিত সাগর'-এ ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজা যোগ নন্দ তার মন্ত্রী শাকতলাকে অপমানিত করেছিলেন, এতে তিনি তার প্রভুকে ধ্বংস করার চিন্তা করেছিলেন। একদিন তিনি দেখতে পান একজন ব্রাহ্মণ 'দূর্বা ঘাস জাতীয় একটি গুল্ম মূল থেকে উৎপাটিত করার জন্য মাটি খুঁড়ছেন কারণ এটি তার 'পা'

বিদ্ধ করে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে। ব্রাহ্মণের এই দৃঢ় সংকল্প তার মনে দাগ কাটে এবং তিনি মন স্থির করেন যে নন্দদের ধ্বংস করতে একে প্রধান হাতিয়ার বানাতে হবে। রাজার পক্ষ থেকে তিনি নন্দদের পরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার জন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি এগিয়ে গিয়ে টেবিলের মাথায় বসে পড়েন, কিন্তু অন্য আর এক ব্রাহ্মণ সুবন্ধু এতে বাদ সাধেন। এই ব্রাহ্মণ রাজা যোগ নন্দের পৃষ্ঠপোষকতা পান। ফলে চাণক্যকে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তার আগে তিনি সাতদিনের মধ্যে নন্দদের হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, এবং শপথ নিলেন যে যে পর্যন্ত এই কাজটি সমাধা না হবে সে যাবৎ তিনি শিখা বাঁধবেন না।

শাকাতলা প্রদত্ত সুরক্ষা তিনি (চাণক্য) লাভ করেছিলেন। তিনি একটি জাদু রীতি পালন করেন ফলে যোগ নন্দ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। যোগ নন্দের মৃত্যুর পরে তার পুত্র হীরণ্য গুপ্তকে শাকাতলা হত্যা করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত এভাবে রাজা হিসেবে সিংহাসন আরোহণ করেন।

সাহচর্যের ব্যাপার

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রশিক্ষণ দেন এবং তাকে দিকনির্দেশনা দেন। আর তারা দুজন মিলে ধন নন্দকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। কোনো কোনো লেখক মৌর্য সাম্রাজ্যকে কৌটিল্য-মৌর্য রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই সংযুক্ত পদবাচ্যটি ব্যবহৃত হয় কারণ চাণক্য বা কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত এবং তার অর্থশাস্ত্র এবং মৌর্য রাজবংশ সবচেয়ে সম্ভাব্য ঐতিহাসিক সম্পর্ক উপস্থাপন করেছে। তবে চাণক্য আসলে চন্দ্রগুপ্তকে বিশাল সাম্রাজ্য দখল অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে কতটুকু সাহায্য করেছিলেন তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। এব্যাপারে আমরা কিছু উৎস উপকরণের বিবরণ বিশ্লেষণ করতে পারি মাত্র।

বিশাখ দত্ত কর্তৃক রচিত সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষস্ম (মন্ত্রির রাজমোহর) চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যেকার সম্পর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবহ উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। মুদ্রারাক্ষস্মের ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা যে কোনোভাবে সমকালীন ধ্রুপদী গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের উৎসগুলোর বিবরণ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে থাকে: নন্দ রাজাদের সহিংস শাসন, চন্দ্রগুপ্তের অন্যায় দখল এবং মৌর্য সাম্রাজ্য গঠন। অতি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এবং মিলিত হওয়ার জন্য উদ্ভাবন কুশলতার প্রচেষ্টা, মতভেদ এবং দণ্ড মুদ্রারাক্ষস্মের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র মুদ্রারাক্ষস্ম রাজনীতির ভিত্তিতে রচিত।

নাটকটির প্রথম পর্বে আমরা কিছু বিবরণ পাই যা চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যেকার সাহচর্যের সর্বোত্তম সাক্ষ্য বহন করে। এক জায়গায় বিশাখ দত্ত বলছেন,

'...কৌটিল্য: কুটিলমতি: সা এশা জেনা

[ক্রোধাগ্নি প্রসভামদাহি নন্দবংশ...'

(পৃ.৬) অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৌটিল্য যার ক্রোধাগ্নিতে নন্দ বংশ একদা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।]

মুদ্রারাক্ষস্মের আর এক জায়গায় চাণক্য বলছেন,

...

অর্থাৎ জনসমক্ষে ঘোষিত নন্দ বংশকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে আমি সেই কঠিন সাগরে পাড়ি দিয়েছি।

...

বলুন, কে চন্দ্রগুপ্তকে পরাস্ত করতে পারে আমি জীবিত থাকতে।

চন্দ্রগুপ্ত কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম দিকে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত নন্দ রাজশক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। এরপরে সংঘটিত যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত ধন নন্দের সেনাপতি ভদ্রশালাকে পরাস্ত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত সক্ষম হয়েছিলেন এর পরের কয়েকটি যুদ্ধে ভদ্রশালা এবং ধন নন্দকে পরাস্ত করতে যা শেষে প্রায় ৩২১ খিস্ট পূর্বাব্দের দিকে পাটলিপুত্র নগরী দখল এবং নন্দ সাম্রাজ্য জয় করার দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। আর এভাবেই উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষমতাশালী মৌর্য সাম্রাজ্য। এসময় চন্দ্রগুপ্তের বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর। শাক্ত, যবন (গ্রিক), কিরাট, কম্বোজ এবং বাহ্লিক সৈন্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা সেনাবাহিনী চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ সাম্রাজ্য জয় করতে সাহায্য করেছে। তাদের বিজয়ের পরে গড়ে ওঠা মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দাঁড়িয়েছিল পূর্বদিকে বাংলা ও আসাম হতে, পশ্চিমে, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান এবং ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের কিছু এলাকা হতে উত্তরে কাশ্মীর ও নেপাল এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

এমনকি নন্দ রাজবংশের পরাজিত হওয়ার পরেও চাণক্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। এই পর্যায়ে চাণক্যের লক্ষ্য ছিল নন্দ রাজবংশের মূল উৎপাটন করা এবং নিরঙ্কুশভাবে মৌর্য রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, নন্দ রাজবংশের পতনের পরেও রাক্ষস নামে তাদের এক মন্ত্রী নন্দদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছিল। রাক্ষসের লক্ষ্য ছিল নন্দ রাজবংশের প্রতি অনুগত থাকা এবং তাকে যে কোনো শত্রুতা থেকে রক্ষা করা।

চাণক্যের বুদ্ধি দ্বারা ক্ষমতাবান হওয়ার পরে, চন্দ্রগুপ্ত পার্বতকের সহায়তায় নন্দ রাজাকে পরাস্ত করেছিল। ইতোমধ্যে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার লক্ষ্যে রাক্ষস একজন বিষকন্যাকে নিয়োগ করেছিল। রাক্ষসের খারাপ বাসনা আগে থেকে অনুমান করে, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্য পার্বতককে হত্যা করতে সেই বিষকন্যাকে ভাড়া করে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে পার্বতককে হত্যা করার ব্যাপারে তার নিজের দোষ ঢাকতে চাণক্য প্রচার করে যে পার্বতক নিহত হয়েছে রাক্ষস কর্তৃক। কবে পার্বতককে সরিয়ে দেয়ার পরে পার্বতকের রাজ্যের অর্ধেকের দাবিদার তার পুত্র মলয়কেতুকে দমন করতে, চাণক্য শুরু করে কূটনীতির খেলা। চালাকি করে মলয়কেতুর মনের মধ্যে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া হলো, পার্বতক নিহত হয়েছে চাণক্যের ষড়যন্ত্রের কারণে। জীবন সম্পর্কে ভীত হয়ে মলয়কেতু নগরী ত্যাগ করল এবং অনেক দূরে তার শিবির স্থাপন করল। এভাবে চাণক্য তার নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করল রাক্ষসের ছাঁদফলকের মাধ্যমে। এমনকি পার্বতকের মৃত্যুর পরে, মৌর্য রাজবংশের জন্য নাগরিকদের আবেগ ধরে রাখার নিমিত্তে চাণক্য ঘোষণা করে যে রাজত্বের অর্ধেক অংশ যা পার্বতককে দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সেটি তার ভাই বৈরাচককে দেয়া হবে। এটিও প্রচার করা হলো যে চন্দ্রগুপ্ত এবং বেরাচক মধ্যরাতে নগরীতে প্রবেশ করবে। চাণক্যের নির্দেশনা অনুযায়ী বৈরাচককে পোশাক পরানো হয় চন্দ্রগুপ্তের মতো করে যা বিপুল পরিমাণে ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। রাজত্ব বিভাজনের নাটক এই সঙ্গে মঞ্চায়িত করা হয় মুকুট পরিয়ে বৈরাচককে রাজা সাজিয়ে। রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে, বৈরাচককে 'চিত্রলেখা' নামের একটি মাদি হাতির পিঠে চড়িয়ে নগরীতে প্রবেশের লক্ষ্যে কর্মব্যস্ত প্রস্তুতি শুরু হয়। তার গোপন চরের মাধমে রাক্ষস আগেভাগেই জানতে পারে যে চন্দ্রগুপ্ত মধ্যরাতে নগরীতে প্রবেশ করবে। চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার লক্ষ্যে রাক্ষস মঞ্চব্যবস্থাপক দারুবর্মকে আদেশ দেয় নগরীর প্রবেশ দ্বার তৈরি করার জন্য। প্রবেশ দ্বারটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এটি চন্দ্রগুপ্তের মাথায় ভেঙে পড়বে। একটি তীক্ষ্ণ তরবারিসহ গুপ্তহত্যাকারীকে একটি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এমনকি প্রবেশদ্বারটি ভেঙে পড়ার আগেই গুপ্ত হত্যাকারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য। এমনকি যদিও চন্দ্রগুপ্ত এই প্রচেষ্টায় কোনোরকমে বেঁচে যায় তাহলে শেষ চেষ্টা হিসেবে দারুবর্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তকে তরবারি দিয়ে হত্যা করার জন্য। গোপন এজেন্টের কাছ থেকে এসব তথ্য জানার পরে চাণক্য তৎপর হয়ে উঠলেন চন্দ্রগুপ্তকে বাঁচানোর জন্য। চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য এমনভাবে পোশাক পরিধান করেছিল যে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ধরার কোনো উপায় ছিল না। চাণক্যের নির্দেশ অনুসারে, বৈরাচককে মিছিলের সামনে দেয়া হলো, অন্য একটি হাতির পিঠে চড়ে চন্দ্রগুপ্ত বৈরাচককে অনুসরণ করছিল। যখন মিছিলটি প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে এসে উপনীত হলো তখন রাক্ষস কর্তৃক নিয়োজিত গুপ্তঘাতক (বারবারক) চন্দ্রগুপ্ত এবং বৈরাচকের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে ভুলবশত চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে বৈরাচককে হত্যা

করতে উদ্যত হলো। তবে এই ভ্রান্ত চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অন্য পক্ষে, এটি যদি সফল হতোও তাহলে চন্দ্রগুপ্তও নিহত হতো না।

এটি এমন হলো যে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে, অকস্মাৎ, তরবারির পরিবর্তে, প্রবেশদ্বারের একটি কাঠ টান লেগে খুলে পড়ে, ফলে প্রবেশদ্বারটি ভেঙে পড়ে। বিপদের ভয়ে হাতিটি দ্রুত দৌড়ে পালায়, ফলে বৈরাচক নিহত হলো না। প্রবেশদ্বারের ওপরে সবার অগোচরে লুকিয়ে থাকা দারুবর্ম তখন ভুলবশত চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে ভাগ্যাহত বৈরাচককে হত্যা করে। এই দুষ্কর্ম দেখে রাগান্বিত হয়ে উন্মত্ত জনতা পাথর নিক্ষেপ করে দারুবর্মকে হত্যা করে। চাণক্যের উচ্চাঙ্গের কূটনীতির কারসাজিতে বৈরাচকের মৃত্যুর দোষ গিয়ে আরোপিত হয় রাক্ষসের ওপর।

চন্দ্রগুপ্ত নগরীতে প্রবেশ করেন। এখানেও অভয় দত্ত নামের একজন চিকিৎসক তাকে (চন্দ্রগুপ্তকে) বিষ মিশ্রিত ওষুধ দিয়ে হত্যা করার জন্য রাক্ষস কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল। তবে চাণক্য আগে থেকে সন্দেহ করেছিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি বিষ মিশানো ওষুধ অভয় দত্তকে দিয়ে পান করান। এভাবে তার নিজের বিষ মিশানো ওষুধ সেবন করে চিকিৎসক অভয় দত্ত নিজেই মারা যান। মন্ত্রী রাক্ষস এর পরে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য আর একটি গোপন ষড়যন্ত্র করেন। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষের দেয়ালের গোপন কুঠুরিতে কয়েকজন গুপ্তঘাতককে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। রাক্ষস তাদের নিয়োজিত করেছিলেন গভীর রাতে চন্দ্রগুপ্ত যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন তাকে হত্যা করার জন্য। তবে এ ক্ষেত্রেও চন্দ্রগুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করার আগে বুদ্ধিমান চাণক্য সেখানে প্রবেশ করেন এবং রাক্ষসের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেন। তিনি একটি অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করেন, ভাতের ক্ষুদ্র কণা-এক সারি পিঁপড়ার মুখে দেখা যাচ্ছিল। চাণক্য বুঝতে পারেন যে, নিশ্চিতভাবেই শয়ন কক্ষের দেয়ালের মধ্যে কম পক্ষে একজন লুকিয়ে আছে। তিনি তখন শয়ন কক্ষে আগুন লাগিয়ে দেন। রাক্ষস কর্তৃক নিয়োজিত গুপ্তঘাতক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে হত্যা করার লক্ষ্যে রাক্ষসের কৌশল একটির পর একটি চাণক্যের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শত্রুর ছদ্মবেশে বন্ধু

এমনকি নন্দ রাজবংশের মূলোৎপাটনের পরেও চাণক্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। এটি নগরবাসীদের মধ্যে জানাজানি হয়েছিল যে নন্দ রাজবংশ ধ্বংসের পরে তাদের একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষস পর্বত-রাজার পুত্র মলয়কেতুর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। মলয়কেতুকে রাজত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাক্ষস। এছাড়া তিনি ম্লেচ্ছ (বর্বর) রাজাদের জড়ো করেছিলেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে যৌথভাবে আক্রমণ করা। রাক্ষসকে পরাভূত না করা পর্যন্ত চাণক্যের প্রতিজ্ঞা পূরণ হচ্ছিল না। সেহেতু চাণক্যের প্রতিজ্ঞা পূরণের লক্ষ্যে সমগ্র রাজত্বব্যাপী গোপন দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন ছদ্মবেশে তারা রাক্ষসের গতিময়তা/চলাচল ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিল। একই সঙ্গে তাদের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল যাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত।

এ সবকিছুই চাণক্যের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছিল। এসময়ে চাণক্য চিন্তা করেছিল যে নন্দ রাজবংশ পুনরায় স্থাপনের শেষ চেষ্টা নস্যাৎ করতে সফল হতে পারে যদি সে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শত্রুতার ভণিতা করতে পারে আর এভাবে নন্দদের শেষ অনুগত ব্যক্তি রাক্ষসকে ধাপ্পা দিতে পারেন। চাণক্যের ধারণা ছিল এর দ্বারা রাক্ষসের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। যেই চিন্তা সেই কাজ, চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যেকার ঝগড়ার ভণিতা শুরু হলো। তারা দুজনে এমনভাবে ঝগড়ার ভণিতা করছিল যে সবাই বিশ্বাস করছিল যে তারা আর পরস্পরের বন্ধু নয়। চাণক্য এছাড়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

মৌর্য রাজবংশের কারণে চাণক্যের মৃত্যু

তবে তার সহচর ও বন্ধু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং তার পুত্র বিন্দুসারের কল্যাণে চাণক্যের সক্রিয় তৎপরতা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ডেকে আনে। কাহিনীটি এরকম যে যখন বিন্দুসার যুবক ছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর অনুগামী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমান ভারতের কর্নাটক রাজ্যের শ্রাবণ বেলাগোলা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সেখানে কঠোর সংযমী তপস্বী হিসেবে কয়েক বছর তিনি জীবিত ছিলেন এবং জৈন ঐতিহ্য অনুসারে স্বেচ্ছা অনাহারের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেন। চাণক্য বিন্দুসারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

বিন্দুসারের আর একজন মন্ত্রী ছিলেন যার নাম ছিল সুবন্ধু, যিনি চাণক্যকে পছন্দ করতেন না। একদিন সে (সুবন্ধু) বিন্দুসারকে অবহিত করে যে তার জন্মদাত্রী 'মা'-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে চাণক্য। এ কথা শুনে বিন্দুসার চাণক্যের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন।

বিন্দুসারের এই ক্রোধের কথা চাণক্যকে অবহিত করা হলো। এসময়ে তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ। ফলে চাণক্য মনস্থির করেন এবং রাজদরবার ত্যাগ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। তবে তিনি এটিও অনুধাবন করতে পারেন যে তার জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। এভাবে, তিনি তার সব সম্পত্তি দরিদ্র, বিধবা এবং অনাথদের মধ্যে দান করে দেন এবং খাদ্য ও পানীয় থেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত হয়ে গোবরের স্তূপের ওপর উপবেসন করে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করেন।

ইতোমধ্যে ধাত্রীদের কাছ থেকে বিন্দুসার তার জন্ম কাহিনী পুরোপুরি জানতে পারেন। তিনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সুবন্ধুর ওপর রাগান্বিত হন এবং চাণক্যের কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে বলেন। তবে চাণক্যের মন নরম হয়নি। সুবন্ধু, এতকিছুর পরেও চাণক্যকে ঘৃণা করতেন, এবং এটি নিশ্চিত হতে চাইতেন যাতে চাণক্য নগরীতে আর কোনোদিন ফিরে না আসে। সুতরাং সে একটি ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী চাণক্যের অবস্থানের প্রান্তরে সুবন্ধুর নির্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর একটি নকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার অগোচরে সুবন্ধু একটি জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা গোবরের স্তূপের (যার ওপর চাণক্য বসে ছিলেন) ঢুকিয়ে দেন। বাতাসের সাহায্যে, গোবরের স্তূপে অতি দ্রুত আগুন জ্বলে ওঠে এবং মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাকারী সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা চাণক্য আগুনে পুড়ে মারা যান। চাণক্যের মূল দর্শন ছিল শেষ পয়সা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করা উচিত; এবং শত্রুকে ধ্বংস করা উচিত তার কোনো চিহ্ন না রেখে। (A debt should be paid off till the last penny; and enemy should be destroyed without trace.) ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, সুবন্ধু তার (চাণক্যের) প্রধান দর্শন অনুসরণ করেছিল, এবং কোনো চিহ্ন না রেখেই তাকে (চাণক্যকে) ধ্বংস করেছিল।

উপসংহার

চার হাজার বছরেরও বেশি সময় পরে, মহামতি অশোকসহ চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কীর্তিগুলো দক্ষিণ এশীয় এবং বিশ্ব ইতিহাসের কাহিনীগুলোর গবেষণার প্রধান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতে প্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাহচর্যের ফলে। তবে যেমনটি আমরা আমাদের অনুসন্ধানে দেখতে পেলাম, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শৈশব থেকে চাণক্য ছিল তার সহচর। এমনকি মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও চাণক্য তার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে কাজ করেছেন। চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তারা তাদের আত্ম-মর্যাদা সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিলেন। এছাড়া তারা এই হিসেবে একটি ন্যায়সঙ্গত কারণের জন্য সংগ্রাম করেছেন যে, তারা উভয়েই নন্দদের অন্যায় অবমাননার শিকার হয়েছিলেন। এখানে তাই এটিও বলা যায় যে তাদের উভয়ের একজন সাধারণ শত্রু ছিল। আর তারা হলো নন্দ বংশ। সুতরাং এক সাধারণ শত্রু দ্বারা অপমান ও হয়রানি হয়ে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বোপরি, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একে অন্যের জন্য কাজ করেছে।

যুদ্ধস্মৃতি

যে স্মৃতি শুধুই যন্ত্রণার ভারী পাথর বুকের ওপর

মুজিবুর রহমান

রাত সাড়ে ১১টা। ২৫ মার্চ। ১৯৭১ সন। ভয়াল কালো রাত্রি। রাজপথে নেমেছে শত শত ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ি। পশ্চিমা পাক-হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞে মেতেছিল পিলখানায়, পুলিশ লাইনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে, স্টাফ কোয়ার্টারে এবং গুণী-জ্ঞানী জনের বাড়িতে বাড়িতে। দেশের অসংখ্য প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে হত্যা করেছে ওই পিচাশ লুটেরা।

দেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান চলছিল মূলত: ৭ মার্চের ভাষণে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে স্নাতক (সম্মান) পাস করে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলাম। থাকতাম মহসিন হলে, পঞ্চম তলায়। ইউওটিসি (ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর) প্রশিক্ষণ ময়নামতি অঞ্চলে শেষ করে কয়েকদিন ধরে হলের বাইরে যেখানে-সেখানে রাত কাটাতাম। রাত সাড়ে ১১টায় হলে ঢুকলাম। দারোয়ান চাচা ছোট একটা চিরকুট দিল আমার হাতে :

'ভাইয়া, তোমাকে না পেয়ে ফিরে গেলাম। আমি এবং বাপ্পী ঘরে বসে আছি– শুধুই তোমার আসার প্রত্যাশায়। বাপ্পী বলছেন, ঢাকা এখন নিরাপদ নয়। চলো, আমরা ঢাকা ছেড়ে যশোরে চলে যাই। সেখানে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। অতি সহজে কলকাতায়

চলে যেতে পারব। বর্ডার সম্ভবত : খুলেই দিয়েছে। কোথাও বিদ্যুৎ নেই, বাসার টেলিফোন লাইনও কেটে দেয়া হয়েছে।' হলে এসেছিলাম ছোট একটি এলবাম নিতে– মায়ের ছবি ছিল এটাতে। পাকবাহিনী হলে ঢুকে পড়ল পাগলা কুত্তার মতো। হলের নিজ কক্ষে ঢোকা হল না– এলবামটিও নিতে পারি নাই। দ্রুত ছাদে উঠলাম। সে সময় আমি স্লিম ছিলাম। শরীর ছিল যেন ইস্পাতের স্প্রিং। বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস ২৭ দিন। আমি ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসী ছিলাম। হলের পেছন দিকে বাথরুমের পাইপ বেয়ে নিচে নামলাম– ক্রোলিং করে রেললাইন পার হয়ে বাকুশাহ মার্কেটে ঢুকে বলাকা সিনেমা হলের সামনে পৌঁছতেই ১০-১২ জন বিডিআর ভাইদের সঙ্গে দেখা হলো। সবাই সাধারণ পোশাকে ও নিরস্ত্র ছিল– তবে কয়েকজনের কাছে গ্রেনেড ও '৯ এমএম পিস্তল ছিল। সিদ্ধান্ত হলো ঢাকায় গেরিলা/কমান্ডো যুদ্ধ চালানো সম্ভব হবে না– সোয়ারিঘাট দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা গিয়ে ইস্পাহানি কলেজে রাত কাটাব। ইস্পাহানি কলেজে আমি ছাত্রজীবনে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করতাম। এরপর, সকাল হওয়ার আগেই সেখান থেকে আমরা নিজ নিজ জেলায় বা থানায় চলে যাব এবং প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলব। একজন বিডিআর অফিসার বললেন– বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আমরা এখন স্বাধীন– স্বাধীন দেশ 'বাংলাদেশ'-এর নাগরিক। আমরা এখন পাক-শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত। যুদ্ধ করে বিজয় আনতে হবে। বিডিআর সঙ্গীদের বললাম, মিতাদের কথা– বললাম, মিতা ও তার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। একজন বিডিআর আমার হাতে একটা গ্রেনেড গুঁজে দিয়ে বললেন, 'যাও, মিতাকে ও তার বাবাকে নিয়ে এসো– আমরা এখানেই বিচ্ছিন্নভাবে অপেক্ষা করছি।' ২ বছর আগে কক্সবাজারে সাগরে ভাটার টানে ডুবে যাচ্ছিল একটি মেয়ে। সবাই শুধুই হৈচৈ করছিল। আমি সাগরে ঝাঁপ দিয়ে তুলে এনেছিলাম মেয়েটিকে। তার বন্ধুরা তাকে উপুড় করে পেট থেকে পানি বের করার চেষ্টা করছিল এবং দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সে অজ্ঞান ছিল। তার মুখ দেখার সুযোগ হয় নাই আমার– শুধু পেছনের দিকটাই দেখেছিলাম। প্রায় ২ বছর পর ১৯৭০ সালের শেষের দিকে একদিন আমি রিকশায় পলাশীর মোড়ে ১০-১২ বয়সের এক ছেলেকে কয়েকজন সমবয়সী ছেলের সঙ্গে মারপিট করার সময় আমি ওই ছেলেটিকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে গেলাম। কলিং বেল চাপতেই দরজা খুললেন এক মধ্যবয়সী মহিলা। ছেলেকে সঙ্গে দেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোট' নিশ্চয়ই কোথাও মারপিট করছিল?' বললাম 'জী'। 'সে সকালে মিতার সঙ্গে রাগারাগি করে বাসা ছেড়ে চলে গেছে– নাস্তাও খায় নাই।' 'ছোট' এর মা আমাকে বসতে বলে 'ছোট' কে খাওয়া দিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তুমি কী কর?' বললাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।' তিনি একটি বেডরুমে ঢুকে বললেন, 'মিতা, ওঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এসেছে– 'ছোট' কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এক কাপ চা বানাও– বিস্কিট দাও– আর ফ্রিজ থেকে বের করে সন্দেশ দাও। ততক্ষণে আমি 'ছোট' কে খাইয়ে দেই– ওর মেজাজতো এখনো চটা'। কিছুক্ষণ পরই মিতা একটি ট্রে-তে চা, বিস্কিট, সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে আসল। সামনের সোফায় বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার নাম তো ইতোমধ্যেই জেনে ফেলেছেন। 'মিতা' আমার ডাক নাম। ভালো নাম ... ।' মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম– ভালো নাম জানার দরকার নেই। দুই অক্ষরের মিতা নামটিই ভারি সুন্দর এবং মনে রাখাও সহজ। আমার নাম জিজ্ঞাসা করল মিতা। বললাম, 'আমার নাম এক মহান ব্যক্তির নাম– একশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম।' মিতা বলল, 'বুঝেছি, ডাক নাম কি?' ব্যাট্রান্ড রাসেলের দর্শনে আমি খুব বিশ্বাসী– তাই, বন্ধুরা আমাকে 'রাসেল' বলেই ডাকে। 'সুন্দর নাম। শুনলাম, মাস্টার্সের শেষ বর্ষে পড়ছেন। কি বিষয়ে পড়ছেন?' 'ইংরেজি', উত্তরে বললাম। 'বাপরে বাপ! একেবারে 'রয়্যাল সাবজেক্ট' বলে সোফা থেকে উঠে মিতা চায়ের কাপ, পিরিচসহ ট্রেটি নিয়ে রান্না ঘরের দিকে যাওয়ার সময় বলছিল, 'বিস্কিট তো খেলেন না'– বললাম, 'সন্দেশ ছেড়ে কি আর বিস্কিট খাওয়া যায়?" তার ঘর থেকে মিতার মা বের হয়ে এসে বললেন, 'কলকাতার সন্দেশ খেলে তো পাগলই হয়ে যাবে।' 'তাই নাকি? তাহলে ওই সন্দেশ আমার খাবার দরকার নেই'– আমি বললাম। মিতা আবার বলল, সন্দেশ খাওয়ার পর চা খেলে কি চায়ের টেস্ট পাওয়া যায়? আমি মিতার উদ্দেশে বললাম, 'তোমার ইন্টারভিউতে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি।' মিতা রান্নাঘরের দিকে গেল। যাওয়ার সময় তার পেছন দিক দেখে মনে হলো কোথায় যেন আমি তাকে দেখেছি। নিজেকে একটু কম্পোজড করে নিলাম, আর মনে মনে নিজেকে গালি দিলাম, 'আমি একটা স্টুপিড।' মেয়ে মানুষ দেখলেই মনে হয় কোথায় যেন দেখেছি। ধ্যুৎ ছাই! বাদ দিলাম একথা– মেনে নিলাম, এটা আমার মনের বেরাম। মিতা আবারো রুমে গেল। এবারো তার পেছন দিক দেখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে মনে হলো– তাকে অবশ্যই কোথাও যেন দেখেছি– নিশ্চয় দেখেছি– এটা আমার ভ্রম হতে পারে না। আমি একটু গম্ভীর স্বরে মিতাকে তার নাম ধরে ডাকলাম। মিতা দৌড়ে আমার কাছে এলো। বললাম, 'বসো।' মিতা একটু অবাক হয়ে সামনের সোফায় বসলো। বললাম, 'আচ্ছা! মিতা, বলোত– তুমি কি কখনো কক্সবাজারে গেছ?' 'শুধু কি গেছি? ডুবেও গিয়েছিলাম সাগরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দুঃসাহসী ছাত্র সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে তুলে এনেছিল তীরে। তাকে এক নজর দেখার এবং ধন্যবাদ দেয়ার খুব ইচ্ছা আমার।' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল সে এক বিশাল ঘটনা– কতো হালকাভাবে। 'দেখো আমাকে, ভালোভাবে দেখ– আমি সেই দুঃসাহসী ছেলেটি।' মিতা লাফ দিয়ে উঠে 'মা' 'মা' করে চিৎকার শুরু করে দিল। তার মা দৌড়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে মিতা? এত চিৎকার করছ কেন?' ঠিক এ সময় মিতার বাপ্পীও এলেন বাসায়। মিতা সবকিছু খুলে বলল। সবাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন জীবনহীন মাটির মূর্তি। মিতা ও মিতার মায়ের চোখে জল ছলছল করছিল। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে চলে আসার জন্য অনুমতি চাইলাম। মিতার মা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, সময় পেলেই চলে এসো।' আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিতার বাপ্পী বললেন, 'যে দুঃসাহসী ছেলেটি আমার মেয়েকে, আমার কলিজার টুকরোকে সাগরের পেট থেকে উদ্ধার করেছে, আমরা তাকে ভুলতে চাই না, বাবা।' মিতার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হওয়াটা একেবারে অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য। এরপর, মিতা ক্লাস শেষে প্রায়ই আমার হলে এসে অতিথি কক্ষে বসে থাকত এবং আমাকে ডাকতে দারোয়ান পাঠাতো। কোনো দিন দেখা হতো– কোনো দিন হতো না। হলে না পেলে, পাবলিক লাইব্রেরিতে অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে আমাকে খুঁজতো। দেখা হলে আমাকে ছাড়তেই চাইতো না। যে কোনো একটি বই নিয়ে আশপাশে বসতো। বলতাম, 'এটা কি বই পড়ছ? তোমার মেডিকেল বই পড়।' ধ্যুৎ! ডাক্তারি বই পড়তে পড়তে কাঠ-খড়ি হয়ে গেছি– এখন একটু জ্ঞানের বই পড়ি। মাথায় তো জ্ঞানের 'গ' নেই। সন্ধ্যা হলেও মিতা একাই বাসায় চলে যেত। তখন মেয়েদের একাই চলাফেরায় কোনো বিড়ম্বনা ছিল না।
মিতার সঙ্গে শেষ দেখা ঐতিহাসিক ৭ মার্চে। আমাকে আগেই বলেছিল, সে লাইব্রেরির ছাদে থাকবে। আমি প্রথমে মঞ্চের কাছাকাছি ছিলাম– পরে আমি তার হাত নাড়া দেখতে পেয়ে লাইব্রেরির ছাদে উঠলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষে আমরা হেঁটে রাস্তা নিলাম তাদের বাসার দিকে। উত্তাল ঢাকা নগরী। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"– 'মিতা, যুদ্ধই আমাদের একমাত্র পথ', আমি বললাম। মিতা বললো, 'আহ! যদি ছেলে হতাম, তুমি আমি এক সঙ্গেই যুদ্ধে যেতাম। যুদ্ধে তোমার পারদর্শিতা আর তোমার কমান্ডো-স্টাইলের যুদ্ধ দেখতে পারতাম। আচ্ছা, ভাইয়া, বলতে ভুলে যাব, ঢাকার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তুমি প্রস্তুত থাকো– আমরা যে কোনো দিন তুমিসহ কলকাতা চলে যাব। আমি একটু রেগে গিয়ে বলেছিলাম, 'দেশকে এ অবস্থায় ছেড়ে কাপুরুষের মতো ইন্ডিয়ায় যেতে পারব না। যুদ্ধ এখানেই করব এবং মরতে হলে এখানেই মরব।' মিতা শান্তভাবে এবং দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'ভাইয়া, ভালো কথা– খুবই ভালো কথা– তোমার জায়গায়

আমি থাকলে আমিও একথাই বলতাম। তাহলে, শোন, মনোযোগ দিয়ে শোন– ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকলাম এবং তোমার জন্যই থাকলাম। আর হ্যাঁ, বাপ্পী আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমার মা ও ভাই 'ছোট' ২-৪ দিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছে। যদি ... যদি, তুমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাও, তা-হলে আমাকে ও বাপ্পীকে নিয়ে যাবে। আর না নিতে পারলে, শুধু জানাবে, আমরা নিজেরাই চলে যাব।' মিতা আর একটি কথাও বলেনি– আমার কোনো কথারও উত্তর দেয়নি। আমি জানি, মিতা খুব জেদি মেয়ে কিন্তু আমার ওপর তার বিশ্বাস ছিল আকাশের মতো বিশাল এবং হিমালয়-শৃঙ্গের মতো উঁচু। বাসার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো– মাটির নিচে তাকিয়ে থাকল অনেক্ষণ। দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল নাকের দু'পাশ বেয়ে। আমাকে কিছু না বলে সে চলে গেল ধীরে ধীরে সিঁড়ি হেঁটে দো-তলায় ঝড়ো হাওয়ায় বিধ্বস্ত এক পাখির মতো। আমিও ফিরে এলাম। ওপরে তাকিয়ে দেখলাম– সে আমাকে বিদায় দিল হাত নেড়ে নেড়ে। কে জানতো, এই দেখাই হবে আমাদের শেষ দেখা– হাত নেড়ে এই বিদায় হবে আমার কাছ থেকে তার শেষ বিদায়?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম– এক ইপিআর ভাই আমার হাতে একটা গ্রেনেড গুঁজে দিয়ে বললেন, 'যাও, মিতাকে ও তার বাবাকে নিয়ে এসো। কখনো ক্রোলিং করে, কখনো রোলিং করে, কখনো অস্বাভাবিক মানুষের মতো অভিনয় করে, কখনো দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে পৌঁছলাম মিতাদের বাসার খুব কাছে, এক ড্রেনে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম, বাসার সামনে একটি আর্মি-জিপ। জিপে বসা এক সেনা ড্রাইভার, কাঁধে তার একটি এসএমসি। তার কাছ থেকে অস্ত্রটি কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা ছিল আমার জন্য মাত্র ৩ মিনিটের কাজ। প্রস্তুতি নিতেই, ওপরে মিতার কণ্ঠে এক স্পষ্ট ও ঘৃণ্য প্রতিবাদ, 'বাস্টার্ড, ডন্ট্ কিল্ মাই ফাদার'- দো'তলায় আওয়াজ হলো– ঠ্যাস, ঠ্যাস। দো'তলার বারান্দার পানি পড়ার পাইপ দিয়ে রক্তের ফোয়ার গড়িয়ে পড়ছিল আমার গায়ের ওপর। রাগে-ক্ষোভে আমি যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ওপরে নিস্তব্ধ। ভাবলাম- মিতা ও তার বাপ্পী দু'জনকেই মেরে দিয়েছে। অপেক্ষা করলাম, পাক কুত্তারা জিপে উঠলেই জিপটি ধ্বংস করে দেব গ্রেনেড দিয়ে। দেখি, মাত্র ৩জন পাকসেনা মিতাকে টেনে-হেঁচড়ে জিপে উঠাচ্ছে, আর তার চোখ দুটি শুধু আমাকেই খুঁজছে। মিতা দেখে ফেলেছিল আমাকে– হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললো, 'ভাইয়া, ওদের শেষ করে দাও- ওরা বাপ্পীকে.....।' আর কিছু বলতে দেয়া হয়নি তাকে। জিপটির ভেতরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে মিতাও মারা যাবে। আমার হাতে মিতার মৃত্যু হবে– এমনটি ভাবাও ছিল আমার জন্য এক অসহ্য যন্ত্রণা। জিপটি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। কিছুই করতে পারলাম না, আমার সাহসিকতা, কমান্ডো ট্রেনিং, মিতার অটুট বিশ্বাস কিছুই কাজে আসলো না। নিজেকে সান্তনা দিলাম- ঐ কুত্তাদেরওতো মা-বোন আছে। মিতাকে ছেড়েওতো দিতে পারে- জানে বেঁচেওতো যেতে পারে সে। হয়তো আবারও কোনদিন দেখা হবে অলৌকিকভাবে। গ্রেনেডের পিন আগেই খুলেছিলাম। মনের আক্ষেপে ও ব্যর্থতায় গ্রেনেডটি অন্যদিকে ছুঁড়ে দিলাম। বিস্ফোরিত হলো ব্যর্থ হুংকারে।

ইপিআর বন্ধুদের কাছে ফিরে এলাম। সবাই মর্মাহত হলো। ভাবলাম আমার হাতে শুধু একটি ৯এমএম পিস্তল থাকলেও, জীপটি আগে ধ্বংস করে আমি ঐ পিশাচ-সেনাদেরকে সিঁড়িতে নামার সময় গুলি করে মারতাম পাখির মত। বাস্তব বড় নির্মম। একজন ইপিআর অফিসার বললেন, "বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বিজয় অর্জন করতে এখন স্বসস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। মিতার এই মর্মাত্মিক ঘটনার স্মৃতি বিজয়-যুদ্ধের জন্য তোমার অফুরন্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে"।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একটু বিচ্ছিন্নভাবে সোয়ারীঘাটে পৌঁছে গেলাম। বুড়িগঙ্গা নদী সাঁতরিয়ে পার হওয়ার সময় পানির নিচ দিয়ে ডুবে সাঁতার কেটে ওপারে যেতে হয়েছে- কারণ্ পাক সেনারা বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করছিল নদীর উপরে। আমরা জিঞ্জিরায় ইস্পাহানি কলেজে আশ্রয় নিলাম। সিদ্ধান্ত হলো সূর্যোদয়ের আগে সবাইকে এই কলেজ ভবন থেকে বিভিন্ন সময়ে বের হয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে হবে। সবাই আবেগপ্লুত হয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এক ইপিআর অফিসার ২০টি কার্তুজ সহ আমাকে ১টি ৯এমএম পিস্তল দিয়েছিলেন।

আমি সবার শেষে ঐ স্থান ত্যাগ করেছি এবং দিনাজপুরে পৌঁছেছি এপ্রিল মাসের ২ তারিখে বিকেল ২টায়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আমাকে ঢাকা ছাড়তে হলো মিতাকে ছাড়াই। দেশ-প্রেম ও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পাশাপাশি মিতার এই মর্মাত্মিক ঘটনার দুঃর্বিসহ স্মৃতি, ৯মাস যুদ্ধকালে, আমার অদম্য শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে সারাক্ষণ।

প্রকৃতি

পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

মুকিত মজুমদার বাবু

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি– চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ...’

কোনো অপূর্ণতা নেই প্রকৃতির। নেই কোনো অপ্রাপ্তি। এ দেশে আছে ছন্দ তুলে চপলা পায়ে ছুটে চলা পাহাড়ি ঝরনা, আছে সাগর পানে ধেয়ে চলা বহতা নদী, আছে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। আছে জলের বন রাতারগুল। আছে সাগরের কোলঘেঁষে জেগে ওঠা প্রায় শতাধিক দ্বীপ ও চরাঞ্চলের চোখ ধাধানো মনোরম সৌন্দর্য। আছে পাহাড়, আছে পাহাড়ের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য। বনাঞ্চল আছে, বন্যপ্রাণী আছে, আরো

আছে পৃথিবীখ্যাত বেঙ্গল টাইগার। আছে শিল্পির তুলিতে আঁকার চেয়েও সুন্দর আমাদের ৬৮ হাজার গ্রাম।
বাংলার অপরূপ দ্যুতিতে শুধু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বাউল, ছড়াকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক কিংবা গীতিকারই মুগ্ধ হননি; মুগ্ধ এ দেশের ১৬ কোটি মানুষ। মুগ্ধ বিশ্ব। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলার প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যসুধা মনের ক্ষুধা মেটায়নি– এমন কোনো ভিনদেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী নেই আমাদের! আমাদের আছে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয়, হাওর-বাঁওড়, পাহাড় ও সাগর। সেখানে আছে শাপলা-শালুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলজ উদ্ভিদসহ চোখ জুড়ানো সবুজের সমারহ। আছে বৈচিত্র্যময় মাছের প্রজাতি, যাদের জলকেলি আর নদীতে রঙ-বেরঙের পাল তোলা নৌকা, ঢেউয়ের রিনিক-ঝিনিক শব্দ ভালোলাগার পরশ বুলিয়ে দেয় মনের গহীনে, অন্তরের অন্তরস্থলে। তাই তো বাংলা হয়ে উঠেছে সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা।

দুই.
বাংলাদেশের একমাত্র প্রবালসমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্টমার্টিন। দ্বীপটিতে অধিকসংখ্যক নারিকেল গাছ থাকায় অনেকের কাছে নারিকেল জিঞ্জিরা নামেও পরিচিত। কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিন-সুলা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে নাফ নদীর মুখে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের অংশ হলো সেন্টমার্টিন। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ কিলোমিটার ও প্রস্থে প্রায় ২ কিলোমিটার। জিঞ্জিরা, ঢাকাশিন পাড়া, গলাছিড়া ও ছেড়াদিয়া এই ৪টি অংশ নিয়ে গঠিত সেন্টমার্টিন জোয়ারের সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ভাটায় পানি নেমে গেলে সম্পূর্ণ সেন্টমার্টিন একটি ভূখণ্ডে রূপ নেয়। এই দ্বীপে দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকানো যায় শুধু অপার সৌন্দর্যের হাতছানি। আকাশের নীল আর সমুদ্রের নীল মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। তীরে বাঁধা নৌকা, সারি সারি নারিকেল গাছ, জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা, ঢেউয়ের ছন্দে মৃদু বাতাসের স্পর্শ, পানির নিচের জীবন্ত প্রবাল আর বৈচিত্র্যময় মাছ ও প্রাণীর ছুটোছুটি সেন্টমার্টিনকে দিয়েছে আলাদা এক সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের টানে প্রতিবছর হাজার হাজার প্রকৃতিপ্রেমী ছুটে আসে এই স্বপ্নদ্বীপে। বালি, পাথর, প্রবাল কিংবা জীববৈচিত্র্যের সমন্বয়ে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটানো আর ভ্রমণপিপাসু মানুষের জন্য পৃথিবীর স্বর্গভূমি হলো সেন্টমার্টিন।
মৃত প্রবালের কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো দ্বীপের পুরোটাই সমতল। বিস্তীর্ণ সৈকতজুড়ে দেখা যায় এসব প্রবালের কঙ্কাল। সেন্টমার্টিন পাথুরে অঞ্চল, সৈকতভূমি, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি, কাদাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ইত্যাদি জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত। দ্বীপ ও দ্বীপসংলগ্ন সমুদ্র মিলিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাও অনেক। দ্বীপটিতে রয়েছে ১৫৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির স্থলজ গুপ্তবীজি উদ্ভিদ, প্রায় ৬৬ প্রজাতির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ২৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪ প্রজাতির উভচর, ২৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬৭ প্রজাতির স্থানীয় পাখি এবং ৫৩ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিসহ মোট ১২০ প্রজাতির পাখি ও ৪ প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ মোট ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেখা মেলে। দ্বীপের বালির মধ্যে দেখা যায় গোলাকার পাতাঅলা আইপোমিয়া লতা। প্রতিকূল পরিবেশে প্রথম প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টিকারী এই উদ্ভিদে ফানেল আকৃতির সাদা-বেগুনি ফুল দেখা যায়। বৃক্ষ জাতীয় গাছের মধ্যে অন্যতম হলো নারিকেল গাছ। আরো রয়েছে শিমুল, আম, সুপারি, বাবলা, করই ইত্যাদি। সেন্টমার্টিন দ্বীপের ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদ হলো কেয়া গাছ। ভাটার সময় পাথুরে প্রবালের মাঝে প্রাণের সাড়া দেয় কেওড়া গাছ। সৈকতের প্রান্তজুড়ে আরো দেখা যায় বেশ কিছু ঝাউ গাছ।
মানুষের অজ্ঞতা, হেঁয়ালীপনা, অসচেতনতার

কারণে দিন দিন বিনষ্ট হচ্ছে অনেক দর্শনীয় স্থান ও এর চারপাশের পরিবেশ। দর্শনীয় স্থানগুলোতে অতিরিক্ত পর্যটকের আগমন আনন্দের সংবাদের না হয়ে দুঃসংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটক প্রতিদিন জাহাজে করে যাতায়াত করছে। অবাধে দ্বীপটিতে গড়ে উঠেছে হোটেল-মোটেলসহ বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট। সেন্টমার্টিন প্রবালসমৃদ্ধ দ্বীপ হওয়ার কারণে ইট-পাথরের বহুতল ভবন নির্মাণ দ্বীপের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রবাল তোলা ও বিক্রি নিষেধ থাকলেও অবাধে তা বিক্রি হচ্ছে। মাছ ধরার নৌকার নোঙর প্রবালের ওপর ফেলার কারণে প্রবাল কলোনি ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দ্বীপটি। প্রতিবছর সেন্টমার্টিন থেকে অবৈধভাবে প্রায় ৩০ হাজার প্রবাল তোলা হচ্ছে। ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দ্বীপের সৌন্দর্য এবং স্বকীয়তা দুটিই আমরা ধ্বংস করছি। আবার পর্যটকদের অসচেতনতার কারণে চিপসের প্যাকেট, পানির বোতল, কোমলপানীর ক্যান ইত্যাদি যথেচ্ছ ফেলার কারণে বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে সৈকত ও সাগরের পানি। রাতে উচ্চস্বরে গান-বাজনা আর হৈ-হুল্লোড়ের কারণে ভয়ে অনেক প্রাণী দ্বীপের কাছ পর্যন্ত ঘেঁষছে না। বিশেষ করে বিশ্বের দুর্লভ প্রজাতির অলিভ রিডলে টার্টল (জলপাইরঙা কচ্ছপ) ভয়ে ডিম না পেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে তাদের বংশবিস্তার।

তিন.

কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। উত্তাল ঢেউ আর মোহনীয় বাতাসের পরশে ছুঁয়ে যায় সারা দেহ-মন। পায়ে এসে মাথা নত করা ঢেউগুলো অন্য রকম এক ভালোবাসার শিহরণ জাগায় হৃদয়ের ভেতর। ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাওয়া দূরের মাছধরা নৌকাগুলো দেখলে মনে হয় কোনো শিল্পীর আঁকা সুনিপুণ ছবি। আকাশ আর সাগরের এক রেখায় মিলন বিধাতার এক অনবদ্য সৃষ্টি। লবণাক্ত নীল জলের ফেনারাশি তীরে এসে বলে যায় কত কথা। সে কথা সেই বোঝে যে সাগরকে জানে, সাগরের ভাষা বোঝে।

দৃষ্টিনন্দন এই সমুদ্র সৈকতও পিছিয়ে নেই দূষণের কবল থেকে। প্রতিদিন হাজার হাজার সমুদ্রসুধা পান করতে আসা-যাওয়া মানুষ বিভিন্নভাবে সমুদ্র সৈকত ও সমুদ্রের পানিকে দূষিত করছে। সাগরে মাছধরা জেলেদের অসচেতনতা ও কুসংস্কারের কারণে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক মা কচ্ছপ। তারা কচ্ছপকে অপয়া মনে করে জালে আটকে গেলে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আবার মা কচ্ছপ ডাঙায় ডিম পাড়তে এলে অনেক সময় বেওয়ারিশ শিয়াল-কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ ছাড়া সমুদ্র সৈকতে চলাচলকারী মোটরসাইকেল, প্রাইভেট গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে কাঁকড়া, কচ্ছপসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী মারা যায়। ভ্রমণকারীরা হাতে থাকা খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে সমুদ্র সৈকতে। অনেক সময় পানি দূষণের কারণে শত শত কাঁকড়া-শামুক মরে যায় সৈকতজুড়ে। শামুকের দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয় পর্যটকসহ স্থানীয় লোকজনদের। তবে মাছধরার যান্ত্রিক নৌকা এবং মালবাহী জাহাজ থেকে ফেলা বর্জ্যের কারণে সাগর দূষিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

চার.

বন সুন্দরী সুন্দরবন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২ ভাগ এবং সমগ্র বনাঞ্চলের ৪৪ ভাগজুড়ে রয়েছে এই বনের অবস্থান। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনগুলোর মধ্যে সুন্দরবনই সবচেয়ে বড় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব মিলনস্থল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রত্যেক অর্থবছরে সুন্দরবন থেকে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয়। শুধু তাই নয়, এই বনের কাঠ, মধু, মোম, গোলপাতা, মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, চিংড়ির পোনা, বিভিন্ন প্রকার সম্পদের ওপর হাজার হাজার বাওয়ালি, মৌয়ালি ও জেলেদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পর্যটন শিল্প ও দেশের রাজস্ব খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই বন। প্রাকৃতিক ঢাল হয়ে রক্ষা করছে উপকূলে বসবাসরত মানুষদের, যার প্রমাণ আমরা সিডর ও আইলাতে পেয়েছি।

সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের পাশাপাশি দূষণে পিছিয়ে নেই সুন্দরবনও। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে সতর্কীকরণ অনেক বার্তা লেখা থাকলেও সেটা অনেক ক্ষেত্রেই মানেন না পর্যটকরা। ইচ্ছামতো যে কোনো এলাকায় তারা ঢুকে যায়। গাছের ডাল ভাঙে, পাতা ছেঁড়ে। নানা ধরনের বিকট শব্দ করে। পানির বোতল ফেলে এখানে-সেখানে। খাবার খেয়ে ঠোঙা ফেলে দেয় ইচ্ছামতো। এতে করে জীববৈচিত্র্যের প্রজননক্রিয়া ব্যাহত হয়। আবার যাদের সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা, যারা সুন্দরবন থেকে মধু, গোলপাতা, মাছ, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে জীবিকা-নির্বাহ করে তারাও পরিবেশের কথা মাথায় না রেখে নানাবিধ পরিবেশ বিধ্বংসী কাজ করে। যেভাবে মৌয়ালদের মধু সংগ্রহ করার কথা তারা সেভাবে করে না। গোলপাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় গাছ না বাঁচিয়ে সব পাতা কেটে নিয়ে এসেছে। আবার কাঠ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দিন দিন বিপন্ন হয়ে উঠছে সুন্দরবনের পরিবেশ। সুন্দরবনের সৌন্দর্য বেঙ্গল টাইগার মানুষের হাতে প্রাণ দিচ্ছে। প্রাণ দিচ্ছে প্রতিবছর অসংখ্য চিত্রা হরিণ। তবে গত বছরের ডিসেম্বরের ৯ তারিখে ওটি সাউদার্ন স্টার-৭ শ্যালা নদীতে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৪ লিটার ফার্নেস তেলবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়া ছিল পরিবেশের জন্য অশনি-সংকেত। এটাই ছিল সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। নৌপরিবহন অধিদপ্তর বন আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, জাতিসংঘের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি), ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিশনের কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে এখনো নৌপথ অব্যাহত রয়েছে। এসব নৌযান চলার শব্দ এবং হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করায় পশুপাখি একদিকে যেমন ভয়ে দূরে চলে যায় তেমনি তাদের প্রজননক্রিয়াও বিঘ্নিত হয়। রাতে নৌযানের সার্চ লাইটের আলোয় আকর্ষিত হয়ে বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ মারা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শ্বাসমূলীয় এই বনে এর আগেও ছোটখাটো জাহাজডুবিতে বর্জ্য তেল ছড়িয়ে পড়লেও এর মাত্রা ছিল কম। গত বছরের ডিসেম্বরে তেলবাহী জাহাজডুবির ফলে এ যাবৎকালের সবচেয়ে সর্বনাশা ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুন্দরবন। বনবিভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির জরিপ অনুযায়ী, সুন্দরবনের মংলা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার এলাকায় ৮ প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়, যা বিশ্বের সবচেয়ে কম স্থানে বেশি প্রজাতির ডলফিনের বিচরণ ক্ষেত্র। এ ছাড়া বেঙ্গল টাইগারসহ বিশ্বের মহাবিপন্ন ১২-১৫ প্রজাতির প্রাণী বনের এই এলাকায় বিচরণ করে। তেল ছড়িয়ে পড়ায় এসব প্রাণীদের জীবন আজ চরম বিপদাপন্ন।

সুন্দরবনের সুন্দরকে ধ্বংস করতে বনের অদূরে গড়ে উঠছে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র। সময় থাকতে সরকারের এখনো ভেবে দেখা উচিত, এই তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র বনের ওপর কতখানি খারাপ প্রভাব ফেলবে।

পাঁচ.

আমাদের মিষ্টি জলের হাওরগুলোও যেন যৌবনে আরেক সাগর। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। আকাশ আর জলের মিলনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ভাসমান গ্রাম। এক-একটি গ্রামকে মনে হয় এক-একটি দ্বীপ। মাঝে মাঝে করচ ও হিজল গাছ মহিষের মতো গলা ডুবিয়ে মাথা উঁচু করে থাকে। নতুন অতিথির কাছে বিস্তীর্ণ জলরাশির স্বচ্ছ পানির আঁধারকে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। এই সমুদ্ররূপী হাওরের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গে মাঝির কণ্ঠের সুরেলা গান, দল বেঁধে মাছের সাঁতার কাটা, লগি-বৈঠার শব্দ যে কোনো ভ্রমণপিপাসু মানুষকে মুগ্ধ করে। এই চিত্রের ঠিক বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে শুষ্ক মৌসুমে। হাওর পাড়ে দেখা যায় বিভিন্ন ঘাস ও নলখাগড়ার ঝোপ। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আশ্রয় ও প্রজননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ঝোপ-ঝাড়গুলো। মাঠের পর মাঠ সোনালি ধানের হাসির ঝিলিক। বাথানে গরু-মহিষ-ছাগল। ছোট ছোট বিলের গর্তে মাছ ধরার ব্যস্ততা নিয়ে দেশের

অপূর্ব দর্শনীয় ও জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ স্থান হাওর। মিষ্টি জলের ধু ধু এই সাগর সহজেই ঈন্দ্রজালের মতো মোহাবিষ্ট করে ভালোলাগার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় আরেক ধাপ।

বাংলার এই হাওরের গায়েও লেগেছে বৈরী জলবায়ু এবং মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডের বিষাক্ত আঁচড়। শুকনো মৌসুমে সেচ দিয়ে কাদা খুঁড়ে মাছ ধরার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি প্রজাতির মাছ। দখল হয়ে যাচ্ছে হাওরের অনেক জায়গা। ভরাট হয়ে যাচ্ছে হাওরের মাঝ দিয়ে বয়েচলা নদী। শুষ্ক মৌসুমে ধানের ক্ষেতে বিষাক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার দেয়ার কারণে হাওরের প্রতিবেশব্যবস্থায়ও সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষত।

ছয়.

দ্বীপের ভেতর নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের আরেক বিস্ময়। বঙ্গোপসাগরের কোলে সৈকত ও চরবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন সবুজের স্বর্গরাজ্য এই দ্বীপ। মূলত বল্লারচর, কমলার চর, চর ওসমান ও চর মুরি– এই ৪টি চর মিলিয়ে নিঝুম দ্বীপ; যার আয়তন প্রায় ১৪,০৫০ একর। বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ নীল জলরাশিতে একখণ্ড উজ্জ্বল সবুজের মনোহর স্থানকে ২০০১ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। উদ্ভিদ, প্রাণী আর মানুষের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ফসল হলো নিঝুম দ্বীপ।

দ্বীপটিতে রয়েছে বাইন, গেওয়া, কেওড়া ও কাঁকড়া গাছের সুবিশাল সারি। খোলা মাঠ যেন সবুজের গালিচা। দ্বীপের শরীরে শিরা-উপশিরার মতো স্বচ্ছ জলের সরু খাল। ঝাঁক বাঁধা মাছেরা প্রতিযোগিতা করে কে কার আগে যেতে পারে। এক পা এক পা করে নদীর কিনারে খাবারের খোঁজে এদিকে-সেদিক ঘুরে গাঙচিল। কাদা-জলে উল্লাস করে নানা জাতের হাঁস। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয় দেশি বক। পানকৌড়ি আর কাদাখোঁচা পাখির ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। আকাশের নীলে ডানা মেলে উড়ে কালা ও খয়রামাথা গাঙচিল। গাছের উঁচু মাথায় বসে থাকে ধলাপেট ও মেটেমাথা সিন্ধু ঈগল। খোলা মাঠে ইচ্ছামতো ছোটাছুটি করে চিত্রা হরিণের দল। কেউ ঘাস খায়। কেউবা দুষ্টুমি করে একে অন্যের সঙ্গে। আবার কেউবা জল খেতে নামে খালের কিনারে। মায়াবী হরিণের মায়ার টান অভাবনীয় এক মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দেয় দ্বীপটিতে ভ্রমণরত মানুষের মনে-প্রাণে। প্রকৃতি যে মানুষকে এতটা বিমোহিত করতে পারে তার বড় প্রমাণ নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপের নিস্তব্ধতা আজ শেষ হতে বসেছে। গোপনে গোপনে এই দ্বীপে হরিণ শিকার করা হয়। বৃক্ষ উজাড় করতে লোক ভাড়া করা হয় আবাদি জমি বাড়ানোর জন্য। দ্বীপের সৌন্দর্যে দিন দিন মলিনতার চাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সাত.

আমাদের আরো আছে রাতারগুলের স্বাদুপানির জলাবন। পৃথিবীর ২২টি স্বাদুপানির জলাবনের মধ্যে সিলেটের রাতারগুল একটি। বনের মোট আয়তন ৩,৩২৫ একর। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের সংরক্ষিত সমৃদ্ধ জলার বন হিসেবে ঘোষণা করে বনবিভাগ। বর্ষা মৌসুমেই রূপ-মাধুর্যে বনটি হয়ে ওঠে অনন্যা। ফিরে পায় অষ্টাদশী তরুণীর যৌবন। থৈ থৈ পানির সাগরে মানুষের অবাক বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা একখণ্ড সবুজ বন। ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় শুষ্ক মৌসুমে। পানি শুকিয়ে গেলেও বনের কিছু কিছু জায়গায় পানি থাকে। সেখানেই জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকে জলজপ্রাণী।

জলের বন বলে সাপের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া রয়েছে বেজি, বানর, গুইসাপ। পাখির মধ্যে রয়েছে সাদা বক, কানি বক, মাছরাঙা, টিয়া, বুলবুলি, পানকৌড়ি, ঘুঘু, চিলসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। শীতকালে চারপাশ মুখরিত করে রাখে স্থানীয় পাখিদের সঙ্গে পরিযায়ী পাখির দল। মাছের মধ্যে আছে আইড়, রুই, রিঠা, টেংরা, খলিশা, পাবদা, কালবাউশসহ বিভিন্ন জাত। রয়েছে শীতলপাটি বানানোর প্রধান উপকরণ মূর্তা গাছ।

প্রাকৃতিক এই জলের বনের সৌন্দর্যে কালি লেপন করছে মানুষ সচেতনতার অভাবে। বনের মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ হচ্ছে, যা কৃত্রিমতায় ভরে দেবে প্রকৃতিকে।

আট.

সবুজাভ আর হালকা কুয়াশার চাদরে ঘেরা সীমান্তের ওপারে ভারতীয় উঁচু-নিচু সুদৃশ্য পাহাড়চূড়া, এপারে ধলাই আর পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ নীল জলরাশির ভেতর দিয়ে নদীর তলদেশের অপূর্ব দৃশ্য, ডাউকি পাহাড়ে থেকে চপলা পায়ে নেচে নেচে ছুটে আসা জলপ্রপাত, দোলনায় দোল খাওয়া ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, সমতল ভূমির গাঢ় সবুজ পরিপাটি চা বাগান, খাসিয়া পল্লী, পানের বরজ, পাহাড়ের গায়ে সবুজে মোড়ানো গহীন বন, প্রকৃতির সুনসান নীরবতা আর রঙবাহারি নুড়িপাথরের এক অপূর্ব সমন্বয়...। মোহাবিষ্ট এই জায়গার বর্ণনা শুনে যে কেউ বলে দিতে পারে এটা আর কোথাও নয়, সিলেটের জাফলং। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অকল্পনীয় আঁধার বলে একে প্রকৃতিকন্যা হিসেবেই চেনে দেশ-বিদেশের প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। আকাশ আর পাহাড়ের মিতালী দেখে কেউ কেউ আবার জাফলংকে মেঘ-পাহাড়ের দেশ বলেও অভিহিত করেন। প্রকৃতি তার আপন স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা উজাড় করে সৃষ্টি করেছে এই প্রকৃতিকন্যাকে। রূপ, রস, গন্ধ কোনো কিছুই দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। প্রকৃতিকন্যার সুন্দরকে আরো সুন্দর করে তুলেছে ধলাই আর পিয়াইন নদী। স্বচ্ছ এই দুই নদীর জলে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ঝাঁক। ওপর থেকে তাকালে নদীর তলা পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় বিভিন্ন আকারের পাথরে এবড়ো থেবড়ো হয়ে আছে নদীর তলদেশ। ভোর থেকে সন্ধ্যাঅবধি জলের নিচে ডুব দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের পাথর তোলা সত্যি এক অন্যরকম দৃশ্য। নৌকায় করে ঘুরতে ঘুরতে আকণ্ঠক প্রকৃতিকন্যার সুধা পান করে কিছুতেই মন আর ঘরে ফিরতে চাইবে না। আকাশে হেলান দেয়া পাহাড়, বহতা নদী আর সবুজে মোড়ানো বৃক্ষরাজির গায়ে আজ মানবসৃষ্ট ক্ষত। সরকারি নিয়মনীতি অনেকাংশে উপেক্ষা করে যথেচ্ছ ক্রাশার মেশিনের কারণে ধুলো আর শব্দ দূষণে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস। দিনের বেলা গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে পথ চলতে হয়। পাথরের গুঁড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি। নদীর যত্রতত্র থেকে পাথর তোলায় হুমকির মুখে পড়ছে জলজ জীববৈচিত্র্য। এ ছাড়া ৩০-৩৫ ফুট গর্ত করে পাথর তোলায় দেখা দিচ্ছে ভূমিধসের আশঙ্কা। পিয়াইন নদীর নাব্য কমে যাওয়ার কারণে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের মানববসতি। তাদের জীবন-জীবিকায় নেমে আসে চরম বিপর্যয়। নিষিদ্ধ 'বোমা মেশিন'-এর সাহায্যে পাথর তোলার ফলে পরিবেশ বিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করছে। সব মিলিয়ে আমরা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতিকন্যাকে রক্তাক্ত করছি। যেখানে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে প্রকৃতিকন্যাকে সাজিয়ে তোলার কথা সেখানে আজ আমরা বিবর্ণতার ক্ষত সৃষ্টি করছি।

আমাদের সব আছে। কানায় কানায় ভরা নদীর মতো। সবকিছু থাকার পরও আমাদের শুধু নেই সচেতনতা। আমরা পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছি, বসতি গড়ছি, গাছ ও মাটি কেটে সবুজ পাহাড়কে করে তুলছি বিবর্ণ। আমরা নদী দূষণ করছি, শাসন করছি, ভরাট ও দখল করছি ছোট-বড় জলাশয়। আমরা হাওরের পানি সেচে এমনভাবে মাছ আহরণ করছি, যাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের জলজ জীববৈচিত্র্য। বনসুন্দরী সুন্দরবন থেকে গাছ, মাছ, মধু ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত আহরণ করছি, যার কারণে সুন্দরবন দিন দিন হারিয়ে ফেলছে রূপলাবণ্য। আমরা যত্রতত্র আইন অমান্য করে গড়ে তুলছি ইটভাটা, কার্বন নিঃসরণকারী কারখানা। দ্বীপগুলোর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছি, যার কারণে সৌন্দর্যের এই আঁধারগুলোয় অমানিশার কালো ছায়া নেমে আসছে। বঙ্গোপসাগরের নীল জল বিভিন্নভাবে বিষাক্ত করে জলজ জীববৈচিত্র্য বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছি। আরো নানাবিধ মানবসৃষ্ট কারণের সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররোষ। আইলা, সিডরের মাধ্যমে প্রকৃতিকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি। আগামী দিনগুলোতে এই প্রতিশোধের মাত্রা আরো কয়েকগুণ বেশি হয়ে ফিরে আসবে যদি আমরা এখনি সচেতন না হই। তাই বর্তমান সময়ের দাবিতে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সচেতনতা। এই সচেতনতাই দেখাতে পারে সুন্দর প্রকৃতিতে সুস্থ জীবনের স্বপ্ন।

র‍্যাব সদর দফতরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "এলিট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা" (টাইটেল স্পন্সর - পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স) অনুষ্ঠিত

র‍্যাব ও এটিএন বাংলার যৌথ উদ্যোগে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর সহযোগীতায় (Title Sponsor) র‍্যাব সদর দফতরের অফিসার্স এবং র‍্যাব পরিবারের সদস্যদের জন্য দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "এলিট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব এর মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন র‍্যাব এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) কর্নেল জিয়াউল আহসান, এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান ও পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম ইউসুফ আলী। আরও উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, এটিএন বাংলার পরিচালক মোঃ মনিরুল ইসলাম, এটিএন বাংলার উপদেষ্টা প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ কর্ণেল (অবঃ) মীর মোঃ মোতাহার হাসান, পপুলার লাইফের মানব সম্পদ ও জনসংযোগ বিভাগের উর্ধ্বতন নির্বাহী পরিচালক আলমগীর ফিরোজ রানা প্রমূখ। ছবিতে র‍্যাব এর মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) কর্নেল জিয়াউল আহসান এবং ড. মাহফুজুর রহমান এর নিকট থেকে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম ইউসুফ আলীকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম
পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

কবিতা

আদি সত্যের পাশে

আল মাহমুদ

আদি সত্যের পাশ দিয়ে একটি নদী বইছিল
আমি সামান্য মানুষ, নদীকে বললাম, থামো
আর দেখো, উতরোল জলস্রোতে
কাঁপতে কাঁপতে নিশ্চল সত্য
কত অনায়াসে ডুবে গেল।

নিমজ্জিত সত্যের ওপর এখন কালান্তক
ঢেউয়ের বুদবুদ। পাখি উড়ছে
কোয়াক কোয়াক করে ডাকছে।
একটি যাযাবর হাঁস। একটি মাঝি
পালের দড়িছড়া ঠিক করতে করতে
গাইল 'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

দেখলাম
বানের জল এমন ঘোলা যে,
হারিয়ে যাওয়া নাকফুলের হদিস করতে
আজ আর কেউ নদীতে নামবে না।

সাপ্তাহান্তিক দিনরাত্রি

রফিক আজাদ

সারা রাত রবীন্দ্র সঙ্গীত
সারা রাত অশ্রুভেজা চোখ
সারা রাত অপার্থিব শীত,
সারা রাত বিষণ্ন আলোক!

সারা দিন কর্মহীন; গ্লানি,
সারা দিন ম্রিয়মাণ রোদ,
সারা দিন হিরণ্ময় ম্লানই–
সারা দিন তিলক কামোদ!

সারা রাত স্নিগ্ধ মোমবাতি
সারা দিন স্মৃতিহীন তাঁতী।

কচিপাতার বুকের মধ্যে

মহাদেব সাহা

তোমার কণ্ঠস্বর মনে হয় যেন স্নিগ্ধ পাইনবীথি
তুমি অনন্তের মধ্যে যে এক উদাসীন গায়ক পাখি;
তোমার কণ্ঠে বনভূমির জঙ্গল বাতাসের শব্দ
তোমার বুকে রাত্রিদিন অনন্ত উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া।
তুমি যখন কথা বলো, মনে হয় গান গাইছে বাতাস
তোমার কণ্ঠে শুনতে পাই পুরনো দিনের গান;
হঠাৎ মন যেন কেমন করে ওঠে, তোমার কাছে ছুটে যাই,
আমার নিজের আর কোনো পরিচয় থাকে না;
এই হৃদয়ের ওপর পড়েছে অনেক বরফ, ঝরেছে পাতা
আমি তাই মুখ লুকিয়ে তোমার জন্য কাঁদি;
তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আমার বালকবেলা মনে পড়ে
আমি সেই কচিপাতার বুকের মধ্যে ফিরে যাই।

প্রিয়জনের সাথে ইফতার, আরো বেশি মজাদার
এনবিএল কার্ডে ইফতারে উপভোগ করুন ৫০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট

HOTEL SARINA	Moka Café & Bistro	The Mughal Kitchen	Spitfire BARBEQUE AND GRILL	KHAZANA MITHAI
১টা কিনলে ১টা ফ্রি	১টা কিনলে ১টা ফ্রি	২৫%	১৫%	২০% পর্যন্ত

এনবিএল কার্ডে কেনাকাটা, বাড়িয়ে দেবে ঈদের মজা
এনবিএল কার্ডে উপভোগ করুন ৬০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট

ARTISTI. ৩০%	Gulshan Shopping ৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৭%	PRIYO সর্বোচ্চ ২০%
৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	২০%	৩০%	৫%	৩০%
NEW ADDITIONS ৩০%	৩০%	Cartier ৭%	৭%	৫%	৩০%	৩০%	২০%
৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	২৫%	৩৫%	এছাড়াও আরো অনেক আউটলেটে আছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

শর্ত প্রযোজ্য

বিস্তারিত জানতে কল করুন আমাদের ২৪/৭ কল সেন্টারে:
+৮৮০২৭৯৯ ২৮৭২২২; +৮৮০২৭৯৩ ০৪৮৬৬৬; +৮৮০২ ৯৬৫০৮৩০

কার্ড ডিভিশন
সীমান্ত স্কয়ার ৬ তলা, ৮০ পিলখানা
রোড-২, ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা-১২০৫

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

কবিতা

কবিদের প্রতি নারীগণ

মাকিদ হায়দার

তিনি যেদিকে লইয়া যাইবে আমাকে
সেই দিকেই যাইবো।

ভাবিয়াছিলাম দিন আমার এমনি করিয়া হয়তো
কাটিয়া যাইবে
অথচ, তাহার সহিত না গিয়া যদি
অগ্নিকুণ্ডে
ঝাঁপ দিতাম তাহা হইলে পাইতাম
নিষ্কৃতি, নিস্তার।

তবুও গিয়াছিলাম তাহার সহিত।

পথিমধ্যে এক খঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ
তিনি একতারা না বাজাইয়া, আমাকে
অবলোকন করিলেন দুই, এক, মিনিট
বলিলেন,
দিন সমান যায় না আঁকাবাঁকা হইবেই।

যিনি আমাকে লইয়া যাইতেছিলেন
পথিমধ্যে তিনি ত্যাগ করিলেন,
মাত্র দুইটি শব্দ

মিথ্যুক কবিকে বিশ্বাস করিব না কোনদিন।

লুকিয়ে যে রেখেছিল ডানা

হাসান হাফিজ

নতুন কবিতাশব্দ অধরাই থেকে গেল
মগজে ঘূর্ণন, চিন্তা, পায়চারি ব্যর্থ হলো সব
ছুঁতে ছুঁতে উড়ে গেল, দুই ডানা কবে যে কখন
লুকিয়ে সে রেখেছিল, হয়নি ঠাহর

আমাকে এমন জব্দ করে তুমি কী পেয়েছ
জানো তা নিজেই। নদী থেকে স্রোত কেড়ে নিলে
বহতা শব্দের কোনো অর্থই থাকে না আর
থাকে শুধু ব্যথাতুর অন্ধকার, প্রেতায়িত শব্দঋণ
দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির বমন বন্ধ্যা বালিয়াড়ি
স্তব্ধতার কূল নাই শূন্যতার ছায়া বড়ো হয়
রক্তের আদিম নাচে না পাওয়া ঘুঙুর মুদ্রা
উচ্চকিত হতে থাকে, নিঃস্বতার উদযাপনও চলে
নতুন কবিতা শব্দ, জলছবি আঁকতে আঁকতে দ্রুত
পালিয়ে কী সুখ পেল, মোক্ষ হয়তো পেয়েছে কিছুটা
তাহলে এমনধারা মাঝপথে পরিত্যাগ করবে কেন,
এমন কথা তো নাই, ছিলও না, তাহলে কারণ?

ইতিহাস

ফারুক মুহাম্মদ

ওই যে, ওদিকটায় একটা ইতিহাস আছে। একটা ছোট
কুঁড়েঘরের ইতিহাস। এক মুঠো সুখের ইতিহাস...
সেই ইতিহাসে যোগ হলো উত্তাল বুড়িগঙ্গা তারপর।
বুড়িগঙ্গার ইতিহাসও পুরনো। জলের ইতিহাসও ভুলতে বসেছি।
শুকনো বালুচরের ইতিহাসও ভরাট হয়ে গেছে।
ইটের দেয়াল যদি ধসে পড়ে আবারও ইতিহাস হবে ঢাকা।

সময়মতো প্রয়োজন পূরণ হলেই
সহজ হয় জীবন
অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন
ফ্রি
"মাইক্যাশ" অ্যাকাউন্টটি খুলতে
যা সাথে লাগবে:
(১) মোবাইল ফোন
(২) এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
(৩) এক কপি ছবি সংবলিত আইডি-এর
মূল কপি এবং ফটোকপি
(জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স)
ডায়াল
*২২৫#
Send Money
পাওয়া যাচ্ছে:
airtel
রবি
Tel Talk
-নেটওয়ার্কে
MYCash
www.mycashmbl.com
16225

গল্প

তাহেরার চাকরি

হাসনাত আবদুল হাই

গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ছায়াঘন হয়ে এলে সন্ধ্যা জানায় আসছে। ঘরবাড়ির পেছনে কলাগাছ এখন গাঢ় সবুজ দেখায়। বাঁশঝাড় ঝাপসা হতে শুরু করেছে। আকাশ ঘন ধূসর রঙে ঢাকা। পাখ-পাখালি ডাকাডাকি করতে করতে বাসায় ফিরছে। থেকে থেকে অদূরে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। তারা স্বর উঁচু করে ডাকাডাকি করছে। সব কিছু মিলিয়ে সন্ধ্যা সশব্দে এগিয়ে আসছে এই গ্রামে। তারপর নামবে নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা।

সারা দিন মাঠে কাজ করে জব্বার বেশ কাহিল বোধ করছে। তার সারা গায়ে ঘাম। খড়ের ঘরের মাটির দাওয়ায় বসে সে আধছেঁড়া গামছা দিয়ে গা মুচছে। কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ছে নিচে উদোম গায়ে। তার বউ জহুরা এসে প্লাস্টিকের গ্লাসে পানি দিল খাওয়ার জন্য। জব্বার ঢক ঢক করে পানি খেয়ে গ্লাস ফেরত দিল। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা বড় শ্বাস ফেলে সে তার বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আজিজ মিয়া আইছিল?

না। জহুরা উত্তর দিয়ে গ্লাস হাতে ঘরের ভেতর ঢুকল।

জব্বার নিজের মনেই বলল, আসপে। সকালে কয়ি গ্যাছে।

আপনার ব্যাংকিং হোক বৈচিত্র্যময়!
বহুমুখী সেবায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক
মাসিক জমা ডিউিক বিবাহ সঞ্চয়
আল-আরাফাহ্ ডিপোজিট
মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব
সহজ সেবায় আল-আরাফাহ্
fastcash এটিএম কার্ড
মুদারাবা স্কুল স্টুডেন্ট (মাইনর) একাউন্ট
সৌর বিদ্যুৎ বিনিয়োগ প্রকল্প
আল-আরাফাহ্ গ্রীন ব্যাংকিং
আল-আরাফাহ্ এসএমই
মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প
কৃষক/ভূমিহীনদের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
পেনশনভোগী জমা প্রকল্প
মাসিক জমা ডিউিক হজ্ব একাউন্ট
আল-আরাফাহ্ মোমিনটস
শিল্পখাতে বিনিয়োগ
www.al-arafahbank.com
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর এক অনন্য সমন্বয়
Al-Arafah Islami Bank Limited

ঘরের ভেতর থেকে জহুরা প্রশ্ন করল, সে কি মাজেদার খবর আনবে? তার স্বরে ব্যগ্রতা আর আকুলতা।
আশা তো করতিছি। বললেও জব্বারকে খুব আস্বস্ত মনে হয় না। সে নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু বলে।
জহুরা ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করে, কী তা কও? কিছু না। জব্বার আর একটা বড় শ্বাস ফেলে।
আজিজ মিয়া আসে। বাইরে যখন ঘন অন্ধকার। অন্ধকার এতই নিকষ কালো যে কাছে থেকেও তার শরীর স্পষ্ট করে দেখা যায় না। প্রথমে একটা ছায়ার মতো মনে হয়, নিরেট কিছু না যেন। সে সাবধানে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। কুপির কাঁপা আলোয় তার মুখে আলো-ছায়ার বুনট তৈরি হয়। সেই ছায়া একটু কাঁপে। তার চোখ অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে, তীরের মতো ধারাল দৃষ্টি। মেঝেতে একটা পিঁড়িতে বসে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে। না, দেখার মতো নতুন কিছু নেই। এই ঘরে সে আগেও এসেছে। বাঁশের বেড়াটা একদিকে ঝুঁকে আছে। খড়ের চাল এক কোণে প্রায় ঝুলে পড়েছে। ফাঁকফোকর দিয়ে অন্ধকার ঢুকছে ঘরের ভেতর। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সে ডাকে রাতের স্তব্ধতা বিদ্ধ হচ্ছে। আজিজ মিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে সময় একটা শেয়ালের ডাক তাকে চমকে দিল। ডাকটা শোনা গেল খুব কাছ থেকে। গ্রামে এ ডাক নতুন কিছুই নয়, কিন্তু আজিজ মিয়া চমকে উঠল। সে বিরক্তির সঙ্গে বাইরে তাকাল আধভেজা দরজা দিয়ে। সেখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আজিজ মিয়ার কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা।
জব্বার আলাপ শুরু করল। আজিজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, মাজেদার কোনো খপর পাওয়া গেল? তার স্বরে উদ্বেগ।
না। এ্যাহোনো পাই নাই। কিন্তু তার খপর শিগগির পাবা। ভালো খপর। আজিজ মিয়া নড়েচড়ে উৎফুল্ল হয়ে বলে।
কিন্তু অনেক দিন তো হইল হে বিদেশে গ্যাছে। এতদিনেও খপর পাওয়া যায় না ক্যান? জব্বারের স্বরে অসন্তুষ্টি আর আশঙ্কা।
আজিজ মিয়া মোলায়েম করে হাসে। তারপর শান্ত স্বরে বলে, বিদেশ যাইতে সময় লাগে। অনেক দূর তো। সময় নেয়। বলে সে একটু থামে। তারপর বলে, বিদেশ পৌঁছানো হইল পয়লা ধাপ। আসল কাম হইল চাকরি জোগাড় করা। হেইড্যা সময় নেয়। তারপরই না একটা ঠিকানা পাওন যাইব। চিঠিপত্র হেই ঠিকানা থেইক্যা লেখা হইব। টাকাও পাঠাইব। এইসব কাম কি তাড়াতাড়ি হয়? সবুর কর জব্বার। মাজেদার খপর আইল বইলা। ঢলের লাহান টাকা আসন শুরু করব। তোমার এই বাড়ির চেহারাই বদলাইয়া যাইব। হে হে। বলে সে চুক চুক করে হাসে। তার খোশমেজাজে স্বস্তি আর অভয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জব্বার বলে, কত টাকা পাঠাইব হে?
আজিজ মিয়া বলে, সে তুমি ভাবতেও পারবা না। অনেক টাকা। সে তো যেখানে সেখানে চাকরি করব না। খুব বড়লোকের বাড়িতে থাকব। তারা অনেক টাকা বেতন দেয়। এহানকার মতো না। আজিজ মিয়ার মেজাজ বেশ ফুরফুরে।
জব্বার চুপ করে থাকে। তার চোখ ঘরের মেঝের দিকে। সেখানে কুপির আলো কাঁপছে থরথর করে। জব্বারের বুকের ভেতর কলিজাটা হঠাৎ লাফাতে থাকে। অনেক টাকা। সে বিভোর হয়ে থাকে।
আজিজ মিয়া তার মুখ জব্বারের কাছে এনে খুব মোলায়েম সুরে বলে, তাহেরার ব্যাপারে কিছু ঠিক করছ? সে বড় হইছে। মাশাল্লাহ, চেহারাডাও ভালা। তার ভবিষ্যৎ নিয়া ভাবা লাগে। ভাবছ কিছু?
জব্বার মাথা তুলে তাকায়। তারপর বলে, না। তাহেরার লাগি অহনও কিছু ভাবতাছি না। তবে ভালা জামাই পাইলে বিয়া দিমু। সংসারে খাওনের একটা পেট কমব।
আজিজ মিয়া জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, না, না। এই ভুলটা কইর না। আজকালকার বিয়ার মানে বোঝ তো? জামাই টাকা চাইব, সাইকেল দিতে হইব। যৌতুক দিতে গিয়া তোমারে ধারকর্জ করতে হইব। তা ছাড়া জামাই যদি পড়ে তালাক দিয়া দেয় তাইলে সে আবার তোমার ঘাড়ে আইসা পড়ব। না, না। এই ভুল কইর না।
তা হইলে কী করুম? তারে ঘরে বহাইয়া রাখতাম পারি না। আমি সামান্য মজুর। সংসারের বোঝা কমান লাগে।
আজিজ মিয়া হেসে বলে, কেডা কয় তাহেরারে ঘরে বহাইয়া খাওয়াইতে হইব। তারেও মাজেদার লাহান বিদেশে পাঠাও। সেও চাকরি পাইব। তোমারে টাকা পাঠাইব। দুই দুইটা মাইয়ার পাঠানো টাকায় তোমার সংসারের চেহারা বদলায়া যাইব। এই চালাঘরের জায়গায় উঠব দালান। তোমার দিনমজুরি করতে হইব না। দুই মাইয়ার পাঠানো টাকায় পায়ের উপর পা তুইলা দিন কাটাইবা।
জব্বার থতমত খেয়ে যায়। আজিজ মিয়ার কথা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে ওঠায় যেন। তার মাথা ঘুরতে থাকে। সে আস্তে আস্তে বলে, তাহেরা বিদেশে যাইব?
আজিজ মিয়া উৎফুল্ল হয়ে জব্বারের পিঠে হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দেয়। তারপর বলে, আমি পাঠানের ব্যবস্থা করব। ঠিক মাজেদারে যেমনে পাঠাইছি। তারপর হেসে বলে, তাহেরার চেহারা-সুরত ভালা। সে বিদেশে লগে লগেই চাকরি পাইব। এমন হইতে পারে দুই বোন একই জায়গায় থাকব। খুব আনন্দে থাকব তারা। তোমরাও সুখী হইবা। দুই বোনে মিলা অনেক টাকা পাঠাইব। এক বছরেই পাকা দালান উইঠা যাইব। মনে হইব খোয়াব দেখতাছ। কিন্তু খোয়াব না, হাচাই হইব। তুমি শুধু রাজি হও। আমি ব্যবস্থা করতাছি।
জব্বার চুপ করে থাকে। যেন কিছু ভাবছে সে। তাকে অন্যমনস্ক মনে হয়।
আজিজ মিয়া পকেট থেকে কয়েকটা ৫০০ টাকার নোট বার করে জব্বারের হাতে দিয়ে বলে, নাও।
জব্বার বলে, টাকা কিসের?
আজিজ মিয়া হেসে বলে, মনে কর তোমার তাহেরা বিদেশ থেইকা পাঠাইছে।
জব্বার তার হাতে ৫০০ টাকার নোটগুলোর দিকে তাকায়। তার যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সে হতভম্বের মতো হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজিজ মিয়া তার ঘাড় চাপড়ে বলে, কী মিয়া, কী বুঝতাছ? এই তো শুরু। আরো টাকা আসন শুরু করব। দালানে থাকবা। হুঁ। দালান। আয়েশ ফুর্তি করবা। লোকে তাজ্জব হইয়া যাইব।
আজিজ মিয়া চলে যাওয়ার পর জব্বার মাজেদাকে হাতের টাকা দেখায়। তারপর বলে, আজিজ মিয়া ভালা মানুষ। তাহেরা বিদেশে গিয়া চাকরি পাওনের আগেই আগাম টাকা দিয়া গেল। এমন ভালা মানুষ হয় না। আল্লাহ তার ভালা করুক।
তাহেরাও বিদেশে যাইব? মাজেদা বুঝতে না পেরে বলে।
হ, হ। কইতাছি কী এতক্ষণ? তাহেরাও বিদেশ যাইব। আজিজ মিয়া কইয়া গেল। বিদেশে বড়লোকের বাড়িতে চাকরি করব। টাকা পাডাইব মাসে মাসে দুই বোনে। আমাদের অবস্থা ফিরা যাইব।
কিন্তু আমরা তো মাজেদার খবরই পাইতাছি না অহন পর্যন্ত। তার খবর না পাওন তক দেরি করন যায় না? মাজেদা আমতা আমতা করে বলে।
তার আর দরকার কী? আজিজ মিয়া কইয়া গেল সব ঠিকঠাক আছে। চাকরি পাইলেই মাজেদা চিঠি পাঠাইব। লগে লগে টাকা। আজিজ মিয়া সব জানে। না জাইনা হুইনা কথা কয় না। আর এই যে আগাম টাকা? এইডা দেইখাও কি বিশ্বাস হয় না? তুমি যে কেমন মানুষ!
মাজেদা বিড়বিড় করে। বলে, তাহেরা অহনও ছোড। আর একটু বড় হইয়া নিক। তখন দেখা যাইব।
জব্বারের মেজাজ হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। সে মাজেদাকে চুপ করতে বলে ধমকের স্বরে।
তারপর বলে, ঘরে মাইয়া থাকার কী যন্ত্রণা তার তুমি কী বুঝবা? বাপ হইলে টের পাইতা। একটা তো না, দুই-দুইডা মাইয়া বিয়াইছ। বলে জব্বার বিরক্তির সঙ্গে ঘর থেকে হুঁকো হাতে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে তার তামাক খাওয়ার শব্দ মেশে।
তাহেরা জলিলকে বলে তার বাপ তাকে দূরে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। জলিলের বাবা আজিজ মিয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। সব কিছু এখন প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। সে বিদেশে গিয়ে চাকরি করবে।
জলিল বিলের পাশে ডাঙায় দাঁড়িয়ে শালুক ফুল

মুদারাবা
মাসিক আমানত
প্র ক ল্প

শরীয়াহ সম্মত পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ...!

প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার যে কোন অংক আমানত রেখে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের টাকা আর নিশ্চিত করুন ইসলামী শরীয়াহ্ সম্মত পরিকল্পিত ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

প্রক্ষেপিত হিসাবে

মেয়াদ	মাসিক আমানত ৳৫০০	মাসিক আমানত ৳১,০০০	মাসিক আমানত ৳২,০০০	মাসিক আমানত ৳৫,০০০	মাসিক আমানত ৳১০,০০০	মাসিক আমানত ৳২৫,০০০	মাসিক আমানত ৳৫০,০০০
৫ বছর	৳২০,৯০০	৳৪১,৮০০	৳৮৩,৬০০	৳২,০৯,০০০	৳৪,১৮,০০০	৳১০,৪৫,০০০	৳২০,৯০,০০০
৬ বছর	৳২৪,৯০৫	৳৪৯,৮১০	৳৯,৫৬,৪২০	৳২,৯১,০৫০	৳৫,৮২,১০০	৳১৯,৫৫,২৫০	৳২৪,৯০,৫০০
৮ বছর	৳৩৪,০৩৪	৳৬,৪৮,০৬৮	৳১২,৯৬,৯৩৬	৳৭,৪০,৩৪০	৳১৪,৮০,৬৮০	৳৩৭,০১,৭০০	৳৩৪,০৩,৪০০
১০ বছর	৳১,০৪,৪২৩	৳২,০৮,৮৪৬	৳৪,১৭,৬৯২	৳১০,৪৪,২৩০	৳২০,৮৮,৪৬০	৳৫২,২১,১৫০	৳১,০৪,৪২,৩০০

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক
লি মি ট ড

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

* শর্ত প্রযোজ্য

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন www.shahjalalbank.com.bd

ছিঁড়ে বিচিগুলো খাচ্ছিল। তাহেরার কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল। হুঁশ ফিরে এলে সে বলল, তোমার বড় বোন মাজেদার মতো? বাপজানের চোখ তোমার ওপরও পড়ছে?

হ। আমার বোনের মতো আমিও বিদেশে যামু গিয়া। কী করুম এখানে থাইকা? তাহেরার স্বর দৃঢ়। একটু যেন বেপরোয়া।

তা হইলে আমাদের কী হইব? আমাদের পিরিতের? প্রায় ছেলেমানুষের মতো কথাগুলো বলে জলিল।

জলিলের কথায় চটে যায় তাহেরা। সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, পিরিতের টান থাকলে তাড়াতাড়ি কিছু কর। পিরিত শুধু মুখের কথা কইয়া রাখলে চলব না।

কিন্তু, কিন্তু আমার আব্বা... জলিল তোতলাতে থাকে। মুখের কথা শেষ হয় না।

তোমার আব্বারে কইয়া আমার লগে পিরিত করছ? যদি না কইরা থাহ, তা হইলে তোমার বাপের কথা ভাববা ক্যান? তারে ডরাইবা ক্যান? তিনি মত দিলে ভালা, না দিলেও তুমি আমারে বিয়া করবা। তারপর একটু থেমে বলে, যদি আমার লগে সত্যি সত্যি পিরিত কইরা থাহ, তা হইলে তাই করবা। আছে সেই সাহস? তাহেরা কঠিন স্বরে বলে।

আমার এ্যাহোনো বিয়ার বয়স হয় নাই। বাপে রাজি হইব না। তা ছাড়া তোমার লগে শাদির কথা হুনলে খুন কইরা ফেলাইব। জলিল অপরাধীর মতো বলে।

তাহেরা বিদ্রূপের স্বরে বলে, শাদির বয়স হয় নাই, কিন্তু পিরিতের বয়স হইছে। তাই না? গরিবের মাইয়ার লগে পিরিত করণ যায়, তারে শাদি করণ যায় না। হাচা কতা কও না ক্যান? জলিল বলে, গরিব-বড়লোকের কথা হইতাছে না। বয়সের কথা কইতাছি।

কথা ঘুরাইও না। বয়স না, গরিব হওনের লাগি তুমি এমন ভাবতাছ। পিরিতের সময় আমি গরিবের মাইয়া এই কথা ভাব নাই ক্যান? তাহেরা রুষ্ট স্বরে বলে। তারপর একটু থেমে বলে, তুমি সত্যি সত্যি আমার লগে পিরিত করলে বাপের কথা ভাবতা না। পিরিত মানুষরে অন্ধ কইরা দেয়। তোমারে করে নাই। তুমি হিসাব-নিকাশ ঠিকই মনে রাখছ।

জলিল ব্যস্ত হয়ে বলে, আমারে ভুল বুইঝ না। আমি হাচাই তোমারে ভালোবাসি। এর মধ্যে মিথ্যা নাই।

তয় শাদি করতে বাধা কই? তাহেরা জলিলের দিকে তাকায়।

বাপজান রাজি হইব না।

না হইলে না হইল। আমরা পলায়া গিয়া বিয়া করুম।

পলায়া গিয়া! জলিল ঢোক গেলে। তারপর মটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

হ। পলায়া গিয়া। পিরিত কইরা অনেকে এমুন কইরা শাদি করে। শোনো নাই?

জলিল আতঙ্কিত স্বরে বলে, বাপজান মাইরা ফেলাইব।

বাপজান, বাপজান! তুমি কেমুন মরদ পোলা? তোমার সাহস নাই?

জলিল তাহেরাকে শান্ত করার জন্য বলে, তা হইলে বাপজানরে কইয়া দেখতে পারি।

বাপরে কইবা তুমি? হুইনা তিনি খুশি হইয়া কইবেন, হ, তাহেরারে শাদি কর। তুমি কি পাগল হইছ, না ইচ্ছা কইরা পাগল সাজতাছ? তা হইলে কী করতে কও তুমি? জলিল তাহেরার পথ আটকে রেখে বলে। তাহেরা বিল থেকে তোলা শালুকের বোঝা দুই হাতে নিয়ে বাড়ি যেতে উদ্যত হয়।

আমারে নিয়া পলায়া শাদি করা ছাড়া তোমার আর কোনো রাস্তা নাই। এইডা যদি বুইঝা না থাক তা হইলে তোমার কোনো বুদ্ধি হয় নাই। পলায়া শাদি করলে...। জলিল কথা শেষ করতে পারে না।

তাহেরা বিদ্রূপের স্বরে বলে, বাপ মাইরা ফালাইব। তাই না? থাহো তোমার বাপরে নিয়া। আমার পথ ছাড় বাড়ি যামু।

পুলিশ উত্তরার একটা বাড়ি রেইড করে। গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়েছিল তারা। একটা বাড়ির নিচ তলায় এক ঘরে দশজন অল্পবয়সী

মেয়েকে রাখা হয়েছে। সবাই গ্রাম থেকে এসেছে। তাদের আনা হয়েছে মাইক্রোবাসে করে রাতের অন্ধকারে। পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার আগেই দালাল ভেগে গেছে, ধরা পড়েছে দারোয়ান। পুলিশ পাচার করার উদ্দেশ্যে শহরে আনা মেয়েদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রশ্নের আগেই মেয়েরা কাঁদতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে একদল সাংবাদিক এসে যায়। তারা মেয়েদের সম্পর্কে জানতে চায়। হাতে রাখা নোটবইতে দ্রুত লেখে। কেউ কেউ ফটো তোলে। মেয়েরা হাত সামনে দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। সাংবাদিকরা আরো একটা নারী পাচার সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে থাকে। একটা এনজিও থেকে দুজন মহিলা আসেন। তারা আইনি পরামর্শ দেবেন বলে জানান। পুলিশের সঙ্গে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলাপ হয় তাদের। যেসব মেয়ে গ্রামে ফিরে যেতে চায় তারা তাদের পাঠানোর দায়িত্ব নেবেন বলে জানান। যারা ঢাকায় থেকে চাকরি করবে তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। শোনার পর বেশির ভাগ মেয়েই গ্রামে ফিরে যেতে চায়। কিছু মেয়ে শহরে থেকে চাকরি করার পক্ষে মত দেয়। এনজিওর মহিলারা পুলিশের কাছে বন্ড দিয়ে মেয়েদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

পোস্টম্যান যখন জব্বারকে চিঠি এবং মানি অর্ডার দেয় তখন সে অবাক হয়। কে পাঠাল? সে পড়তে পারে না। গ্রামের স্কুলশিক্ষক তাকে চিঠিটা পড়ে শোনালেন। চিঠি তাহেরা লিখেছে। নিজে না, অন্য একজনকে দিয়ে। সে ঢাকায় ভালো আছে বলে জানিয়েছে। চাকরি করছে। চাকরির টাকা থেকে কিছু টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছে।

তাহেরা চাকরি করে? কী চাকরি? জব্বার জানতে চায়। শিক্ষক জব্বারকে বলেন তাহেরা গার্মেন্টে চাকরি পেয়েছে। জব্বার শিক্ষককে বলে, গার্মেন্টে চাকরি কি বিদেশে বড়লোকের বাড়িতে চাকরির চেয়ে ভালো?

হ্যাঁ ভালো।

ক্যান ভালো?

শিক্ষক বলেন, এজন্য ভালো যে দেশে থেকেই চাকরি করছে। ছুটিছাঁটায় বাড়িতে আসতে পারবে।

জব্বার বলে, ভালো বেতন দেয়?

শিক্ষক বলেন, সবাই দেয় না।

জব্বার বলে, তা হইলে?

শিক্ষক বলেন, ভালো বেতনের জন্য তারা মাঝে মাঝে আন্দোলন করে।

জব্বার বলে, আন্দোলন! সেটা আবার কী?

শিক্ষক বলেন, দাবি-দাওয়া নিয়ে দেনদরবার করে। সরকারের লগে কথা কয়।

জব্বার বলে, তাতে লাভ হয়?

শিক্ষক বলেন, কিছু তো হয়ই।

জব্বার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সে হাতের মুঠোয় ধরা টাকার দিকে তাকায়। তার মুখে ধীরে হাসি ফুটে ওঠে।

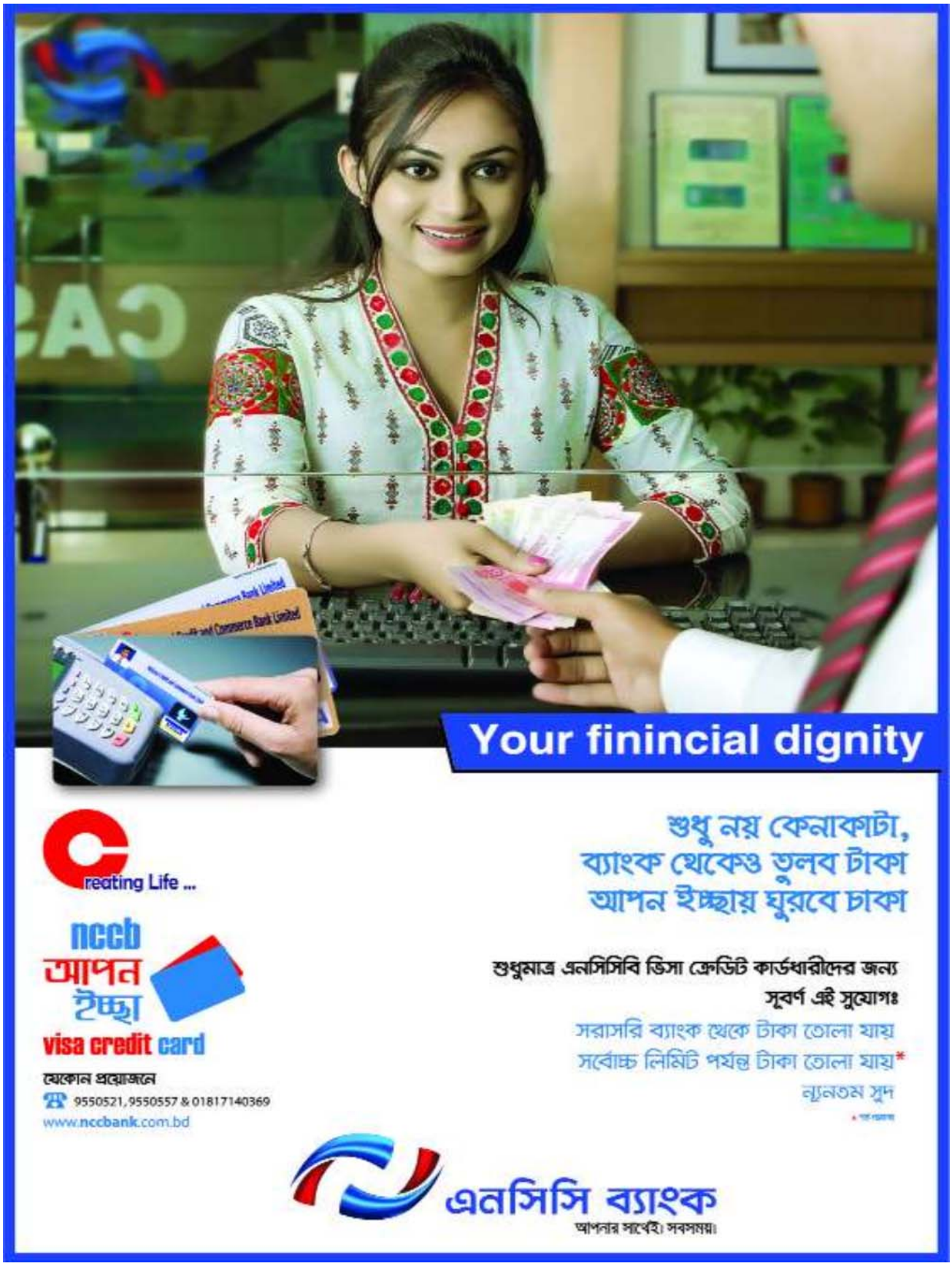
Your finincial dignity
শুধু নয় কেনাকাটা,
ব্যাংক থেকেও তুলব টাকা
আপন ইচ্ছায় ঘুরবে চাকা
শুধুমাত্র এনসিসিবি ভিসা ক্রেডিট কার্ডধারীদের জন্য
সুবর্ণ এই সুযোগঃ
সরাসরি ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যায়
সর্বোচ্চ লিমিট পর্যন্ত টাকা তোলা যায়*
ন্যূনতম সুদ
Creating Life ...
nccb
আপন
ইচ্ছা
visa credit card
যেকোন প্রয়োজনে
9550521, 9550557 & 01817140369
www.nccbank.com.bd
এনসিসি ব্যাংক
আপনার সাথেই। সবসময়।

WALTON

আমাদের পণ্য

বেশি দামে কম স্পেসের নিম্নমানের ফ্রিজ কেন কিনবেন?

যেখানে দেশেই তৈরি হচ্ছে আপনার চাহিদা অনুযায়ী অধিক স্পেস সর্বোচ্চমান এবং সম্পূর্ণ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ফ্রিজ।

রমজান ও ঈদ্ উপলক্ষে ওয়ালটন ফ্রিজের দাম কমলো!

সর্বোচ্চমানের চ্যালেঞ্জ নিয়ে
৫ বছরের ওয়ারেন্টিসহ
৬ মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিতো থাকছেই

একমাত্র ওয়ালটন পণ্যই সর্বোচ্চ সুবিধায়

৩ বছর পর্যন্ত

সহজ কিস্তিতে সকল ওয়ালটন প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে

Eco-friendly
CFC এবং HCFC মুক্ত
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ওয়ালটন ফ্রিজ ব্যবহার করুন

ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007 Certified Company

Helpline 16267

waltonbd.com

WALTON

A ZAMAN COMPANY

ব্র্যাণ্ডের বাড়ী
থুঁটির ছড়াছড়ি

এবার ঈদে পাচ্ছেন

উপহার আর উপহার
সাথে অভাবনীয় মূল্যছাড়!!

বেস্ট ইলেক্ট্রনিক্স থেকে পণ্য কিনে জিতে নিন এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো –ওভেনসহ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ মূল্য ছাড়। এছাড়াও ঈদ উপলক্ষ্যে প্রতিটি পণ্য ক্রয়ের সাথে বেস্ট ইলেকট্রনিক্স দিচ্ছে আপনাকে একটি আর্কষনীয় আলীবাবা জগ সেট।*

আরো পাচ্ছেন* ঃ

১২ মাসের কিস্তি সুবিধা / ফ্রি ইন্সটলেশন / ২৪ ঘন্টা আফটার সেলস্ সার্ভিস / ৯০ দিনে ০% ইন্টারেস্ট

Our EMI Partners: Standard Chartered, zip, 0%

*শর্ত প্রযোজ্য

২০ টিরও অধিক বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের পণ্য সুলভ মূল্যে এবং সহজ কিস্তিতে বিক্রয় হয়।

facebook.com/bestelectronicsltd

09606 111 777

কর্পোরেট অফিস: বেস্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, টিটি সেন্টার (লেভেল ৯।১), ৯৩/৯ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০
ফোন: ১৮৮ ০২ ৯৫৫৩০৯৮-৩৪, ফ্যাক্স: ১৮৮ ০২ ৯৫৫৩০৩৪, ওয়েবসাইট: www.bestelectronicsltd.com

bestelectronics
Global Electronics Brandshop

[গল্প শুরুর আগে সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘এক পুরুষ’ গল্পের ঝাল একটু খেতে হবে। নইলে জমবে না মোতি আর গুল বাহাদুরের প্রজন্ম সমাচার তথা পরম্পরার গল্প। এ গল্প শেষের সময় লেখক বলেন, ‘বইখানা তিন পুরুষ-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই ‘তিন পুরুষ’ লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে ‘যোগাযোগ’ নাম দিলেন তখন যার কৃপায় ‘মূক বাচাল হয়’ তারই কৃপায় এস্থলে ‘বাচাল মূক হলো’।’

আমি মূঢ়। অর্বাচীন। গুল মোতির গোপন প্রেমকাহিনী শুধু শুনলামই না, লেখার স্পর্ধাও হলো। বীর মুক্তিযোদ্ধা গুলের প্রজন্মধারার জন্য কেমন এক গর্ব এবং মায়ার টানে তুলে নিলাম লেখনী। হতেও তো পারত এমন।

প্রমিত বাংলার বাংলা বানানই লিখতে চাই আমি। মিশ্রণও ঘটেছে। তাই ধাক্কা লাগবে চোখে এবং সংস্কারে। কিছু করার নেই। বাংলার আধুনিক বানান এমনই সরল। মনে গভীর বিশ্বাস, প্রমিত বাংলা বানান একসময় এরকমটাই হবে। সেদিন আমি থাকব না।]

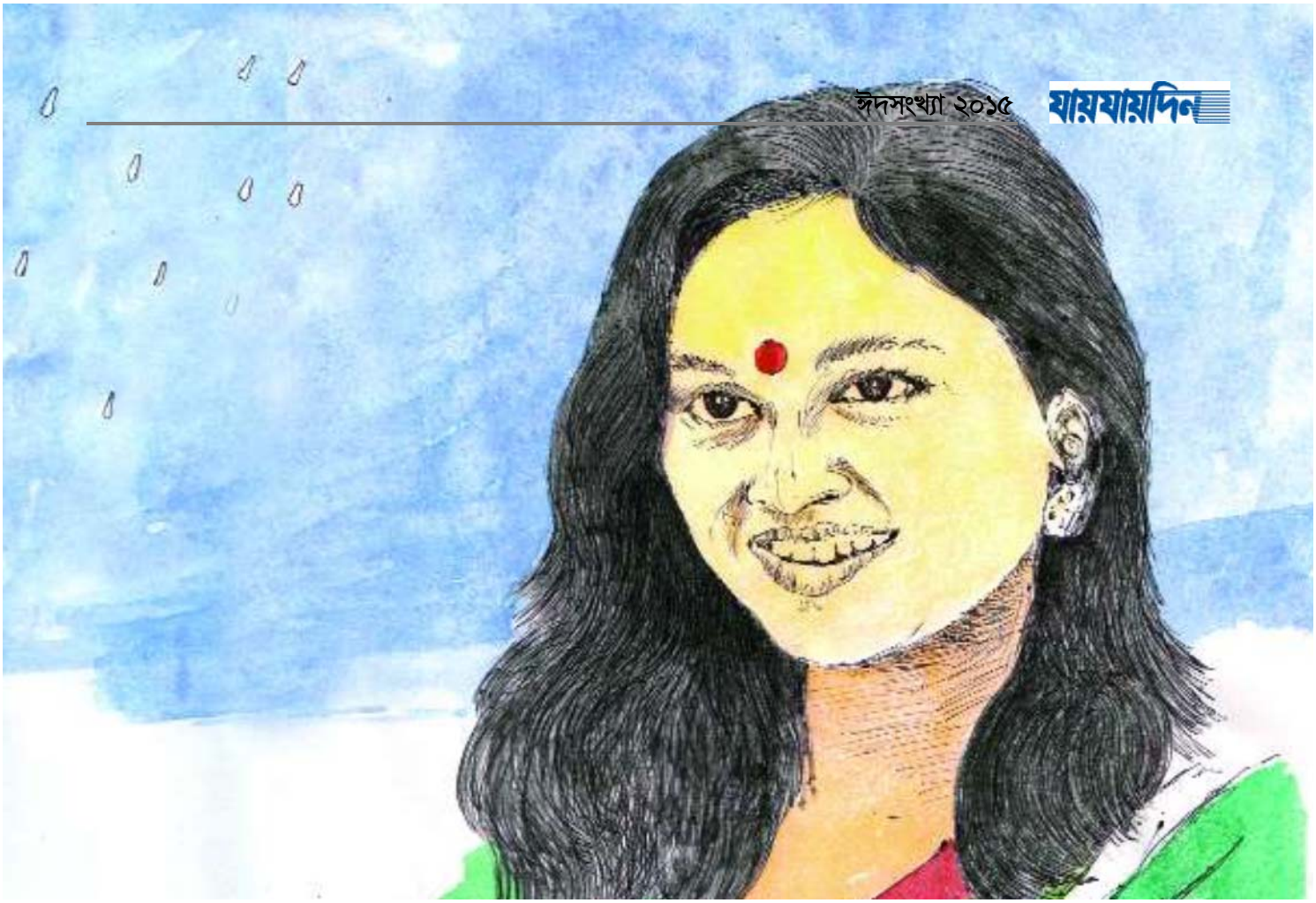

উপন্যাস

পরম্পরা

বেগম জাহান আরা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে।
সিপাহি বিদ্রোহ মাঠে মারা গেছে। হেরে সবাই পালিয়ে গেছে দিগ্‌বিদিক। যারা মরার তারা তো গেছেই। যারা জীবিত, তাদেরও মরণদশা। ব্রিটিশের হাত থেকে পালানো তো অত সহজ নয়। তাই এখানে ওখানে প্রায়ই ধরা পড়ে দশ-বিশ জন। কামানের গোলা নষ্ট করার মতো বোকা জাতি ওরা নয়। তাই বিদ্রোহীদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। গাছে গাছে লাশ ঝোলে। পচে খুলে খুলে পড়ে মানবদেহের রঙিলা দালানের মাটি। যে মাটিকে ব্রিটিশমুক্ত করতে চেয়েছিল দেশপ্রেমিকের দল, তারাই মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে খসে খসে পড়ছে জন্মমাটির ওপর। ব্রিটিশের কাছে ওরা অপরাধী। আমাদের চোখে ওরা অতি মহান। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক।
গুল বাহাদুর সফলভাবে পালিয়ে এলো বর্ধমানের কাছে। গদরের তেজি সেপাই এখন পলাতক এবং ছদ্মবেশী। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে নামাবলি গায়ে দিয়ে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সেজেছে। চিকনকালা গ্রামের বাগদিরাই তাকে সাহায্য করেছে সব রকমভাবে। সে বেঁচে আছে কিন্তু শান্তি নেই জীবনে। মনে মনে মুণ্ডপাত করে ব্রিটিশের। দিবাস্বপ্নও দেখে সুদিনের। মারাত্মক আত্মপীড়নে ছটফট করে।
বাগদিপাড়ায় পরিচয় হয়ে যায় কয়েকজনের সঙ্গে। পরিচয় হয় দামোদরের তীরে আশ্রয় নেয়া

পূবালী লীজ ফাইন্যান্সিং স্কীম-এর আওতায়
বাস্তবায়ন করুন আপনার সৃজনশীল উদ্যম

আমাদের লীজ ফাইন্যান্সিং এর সেবাসমূহ :

- ক্যাপিটাল মেশিনারি
- ডিজিটাল কালার ল্যাব
- সিএনজি রিফুয়েলিং মেশিনারি
- মেডিকেল ইকুইপমেন্ট
- সোলার প্যানেল
- এয়ারকন্ডিশনার
- গ্যাস জেনারেটর
- টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট
- লিফ্ট
- ভিওআইপি ইকুইপমেন্ট
- কার, বাস, মিনিবাস
- কম্পিউটার
- এলিভেটর/এসক্যালেটর
- অফিস ইকুইপমেন্ট

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

www.pubalibangla.com

sareaid/pbl/14

গদর পলাতক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। নাম ঘোষাল। সুখ দুঃখের কথাও কিছু হয় তার সঙ্গে। বিষাদে বেদনায় অপমানে হতাশায় গুল বাহাদুর আক্রান্ত হলেও প্রকৃতি এবং জীবন আবার তাকে দেয় নতুন পরিবেশ ও চমক। একদিন চিকনকালা গ্রামে অতর্কিত প্রচণ্ড ঝড়ে অকস্মাৎ তার জীবনের এক বাতায়ন খুলে যায়। উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে দাঁড়ায় মিছার মা। ওটা তার আসল নাম নয়। তবে মেয়েটি নিজেই তার নাম নিয়ে কৌতুক করে। চমৎকৃত হয় গুল।

হত আদর্শ হত হৃদয় হত কর্ম হত আশার জীবনে প্রাকৃতিক ঝড়-বৃষ্টির সুবাদে একটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নেয় গনি মিয়া, আনন্দি, মিছার মা ওরফে মোতি, একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা এবং গুল। বাইরে ধুলোবালির প্রলয় নাচন, গাছপালার আছাড়িপিছাড়ি, ভূতও বুঝি হার মানে। মাটির দেয়ালের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বিজলি চমকের আলো আসছে ঘরে। সব কটা প্রাণীকে তখন পলকের জন্য হলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারপরই মৃত্যুপুরীর মতো তমসা।

গুল তেইশ বছরের সুঠাম নবীন যুবা। একটু আগেই ঝড়ের অতর্কিত আক্রমণে লহমার মধ্যে চতুর্দিকে গাছগাছালি উল্টে ভেঙে, কাকপক্ষি গাছ থেকে পড়ে মরে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটল, তা দেখে গুল উল্লসিত হয়ে বলেছিল, 'শাবাশ শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ। বিলকুল বেখবর এসে বেএক্তিয়ার করে দিল সবাইকে। তার মনে নিশ্চয় এমন ধরনের আক্রমণের একটা হাউস ছিল। প্রকৃতি যেন তারই প্রতিফলন দেখিয়ে দিল।

গদর (মিউটিনি) যুদ্ধে পরাজিত দিল্লি পলাতক ছদ্মবেশী গুলের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে দাউ দাউ করে। দিল্লি ছাড়লেও ক্রোধ তাকে ছাড়েনি ক্ষণেকের জন্যও। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঝড় তাণ্ডবের দাপটে তার মনের আগুন কেমন করে যেন কোমল ধারার ঝর্ণা হয়ে গেল। রমণীর মোহন সৌন্দর্য তাকে বেএক্তিয়ার করে দিল হঠাৎ। বিজলির ক্ষণিক আলোয় সে দেখল অন্ধকারে আশ্রয় নেয়া এক মহিলাকে। গুলের মুখে তার বর্ণনা হলো :

'দিল্লি শহরে বিস্তর খাপসুরত রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কি মেয়ের ড্যাবডেবে চোখ, খানদানি পাঠান মেয়ের ধনুকের মতো জোড়া ভুরু, নিকষি কুলিন ইরানি তন্বঙ্গির দোলায়িত দেহসৌষ্ঠব, এমনকি প্রায় অমিশ্র আর্যকন্যা ব্রাহ্মণকুমারীর সরল বুদ্ধিদীপ্ত শান্ত সৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন। কিন্তু আজ যে রমণী তার সামনে আধা আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাবণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছয়শ' বছরের মিশ্রণের সওগাত। এর গায়ের রং এ দেশের কচি বাঁশপাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গেছে পাঠান মোগলের কিঞ্চিত তাঁবা-হলুদের রং। চুল ইরানিদের মতো কালো হয়ে গিয়ে যেন নীলের ঝিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আঁটসাঁট গড়নে। সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয়, এর দেহ তৈরি হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে কোনো জায়গায় এক চিমটি ফালতু চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ির আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে, দিল্লির তন্বঙ্গি তার ইজের বন্ধ কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।'

মরণ হলো গদরের সেপাই গুল বাহাদুরের। আদর্শ উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা ব্যর্থতা পলায়নের গ্লানি, ছদ্মবেশের অসহায়ত্ব ভেদ করে হঠাৎ জেগে ওঠে প্রাণরসে পরিপূর্ণ এক উতল জীবন। যে জীবনের অনুভূতির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। ঝড়ের সময় মাটির ঘরে প্রবেশের আগে গনি মিয়ার বেধড়ক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল গুল বাহাদুর ওই মেয়েটিরই গায়ে। ভাগ্য ভালো যে, তখন তাল সামলাতে না পেরে জাবড়ে ধরেছিল তার দুটি হাঁটু, উর্ধাঙ্গ নয়। নারীবর্জিত বা নারীসঙ্গবিহীন জীবনে সেই হয়তো তার প্রথম নারীস্পর্শের শিহরণ। পাঁচশ' দু-আসপা অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়ার মনসবদার গুল বাহাদুর নারী চোখে দেখলেও ঘোড়ার স্পর্শ আর ঘোড়ার খবরদারিই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান জীবন উন্নতি ও মর্যাদার উৎস। রাজানুকূল্যের গৌরব। অন্যদিকে তাকাবার বা ভাববার ফুরসত ছিল না। মনও ছিল না। হয়তো ভেবেছিল, হাজার অশ্বের মানসবদারির অতীত সুখস্মৃতি, গদরের পরাজয় আর বাংলা মুলুকে বর্তমানের সাদামাটা সহায়সম্বলহীন মর্যাদাহীন হতমান জীবন উল্টেপাল্টে এভাবেই কেটে যাবে। কিন্তু বাংলা মুলুকে চিকনকালা গ্রামের এক ঝড়ের উথালপাথাল নটরাজ নৃত্য এমন করে তার জীবনরসের সাগরকে উথলে দেবে, তা ছিল গুলের স্বপ্নের ওপারে।

এক মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসে গুল। কোথায় বিলেত, কোথায় দিল্লি, কোথায় সেই বাঙালি বাবু রাজা রামমোহন রায়ের দরখাস্ত নিয়ে বিলেত যাওয়া, নানা সাহেব লছমি বাই-এর গায়েব হওয়ার কথা, নাদির শাহ কর্তৃক লাঞ্ছিত পদদলিত বাদশাহ মুহম্মদ শাহের চরম দুর্ভাগ্যের কথা, সব ছবি হয়ে ঝটিতে দেখা দিল গুলের স্মৃতির আয়নায়। চকিতে তাকায় নিজের দিকে। দাড়ি-গোঁফের বাহার নেই। বাহারি চাপকান আর কেতাদুরস্ত ইজের নেই। মুখে নেই হিন্দুস্থানি ভাষা। তবু আকাশে আছে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী এবং তার সাথী নক্ষত্রেরা। গুলের পরনে এখন আছে ধুতি আর উত্তরীয়। মুখে আছে স্থানীয় নিম্নবর্গের বাংলা ভাষা। প্রমিত বাংলা নয়।

গুলের মনে পড়ে বাহাদুর শাহের কথা। ভালো কবিতা লিখতে পারতেন বাদশাহ। তবে সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি গালিব ও জওকের তুলনায় তার কবিতার মান অনেক খাটো। তা সত্ত্বেও তার কবিতায় এমন একটা সরল সহৃদয়তার ব্যঞ্জনা থাকত, যা বিদগ্ধ জনের কানে ধরা পড়ত। এটা আবার জওক কিংবা গালিবের কবিতায় ছিল না। আবার জওক ও গালিবের মধ্যে লড়াই চলত হামেশা। মজার বিষয় হলো, তারা একে অন্যের প্রশংসা করতেন। কিন্তু উভয়ের কবিতায় কাব্যরসের চিকন কাজ যেমন করে ধরতে পারতেন বাহাদুর শাহ, ওরা কেউ কারোটা তেমন করে ধরতে পারতেন না। অর্থাৎ বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের এবং তাবৎ উর্দু সাহিত্য জগতের সবচেয়ে 'বঢ়িয়া সমঝদার'। গুল বাহাদুর কবি নয়। সমঝদারও নয়। তবু জওক ও গালিবের তেতো-মিঠে সম্পর্কের গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগত তার। লোকে বলে, জওকের চেয়ে গালিব উঁচু মানের কবি। তবে সে ব্যাপারে কোনো অহমিকা ছিল না গালিবের। সরোবরের মতো স্ফটিক স্বচ্ছ ছিল তার হৃদয়। কবিতার রানী সদা প্রফুল্ল বদনে বসে থাকত সেই হৃদপক্ষের সুবাসিত সিংহাসনে।

একবার নাকি এক কবি সম্মেলনে জওকের কোনো কবিতার দুই ছত্র শুনেই তাকে সর্বসমক্ষে বার বার কুর্নিশ করতে করতে গালিব বলেছিলেন, 'আপনার কবিতার ছত্র দুটি আমাকে বখশিশ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেব।'

মনে মনে হাসে গুল বাহাদুর। কবিদের লড়াই বা প্রশংসা, তাদের কাব্যের চিকন কাজ বা দিল উজাড় করে কাব্যপ্রীতির গুণগান করার কিছুই বোঝে না গুল। তবে একটা ব্যাপারে ইংরেজবিদ্বেষ তাকে ক্ষিপ্ত করে। তা হলো; গদর আমলের ইংরেজরা বাহাদুর শাহের কাব্যপ্রেমকে নিয়ে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ঠাট্টা-মশকরা করেছে, তার জন্য শত সহস্র ইংরেজের মুণ্ড ছিন্ন করে সে মনে মনে। আপন মনে বলে, বেনিয়ার গুষ্টি শোষণ-নির্যাতন আর চুরিটাই জানিস তোরা। ওই রকম পঙ্কিল হৃদয়ে কাব্য তো দূরের কথা, কুকুরও বসবে না। তোরা বড় বাথরুম করে পানিও ঢালিস না। খবিশ। গান্দা আদমি সব।

বৃষ্টি নামল ঝরঝরিয়ে। বড় বড় ফোঁটায়। বেশ তেজের সঙ্গে। চিন্তার জাল ছিন্ন হয় গুলের। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাকায় মেয়েটির দিকে। ও তো দিল্লি শহরের আদব তমিজ শেখা মেয়ে নয়। কিংবা নয় শহরের শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত লাজুক মেয়ে। চিকনকালা গ্রামের উদার আকাশ এবং ধু-ধু ক্ষরপ্রান্তর দেখে বড় হয়েছে। দেখেছে শিমুল পলাশ মহুয়ার অনাবিল পুষ্পস্তবক। কোথাও কোনো জটিলতা নেই। তেমনি তারও সহজ সরল মন। নিজেকে প্রকাশের জন্য তাকে কথা খুঁজে আনতে হয় না।

সড় সড় করে বলে ফেলে নিজের কথা। একদৃষ্টে তার দিকে গুলের চাওয়া দেখে মেয়েটি বলল, 'কী দেখছ গোঁসাই?' বৈষ্ণবদের এমন নামে ডাকাই রেওয়াজ।

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই 'আকাশ থেকে কক্কড় করে নামল শুকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি'। উত্তর না পেয়ে মেয়েটি মাটিতে বসে দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মুখের দিকে আবার তাকাল।

গুল দেখা মেয়েটির ভঙ্গি। চিবুক যে জোড়া হাঁটুর ওপর রাখবে তার উপায় নেই। 'মাঝখানে সুবি-

পুল মৃন্ময় মর্মবিগ্রহ যুগল'। সৈনিক গুলের সংযমের তারগুলো রিন রিন করে ওঠে। মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে, গোঁসাই তোমার বয়স কত?
–কোন বয়স? পাল্টা প্রশ্ন করে গুল।
মেয়েটি হেসে ফেলে। বলে, সে আবার কী? বয়স আবার কত রকমের হয়?
–অনেক রকমের হয়। তবে আমার বয়স তেইশ। নামাবলি গায়ে থাকায় বৈষ্ণব সাজের গুল বাহাদুরের বয়সটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি মেয়েটি।
খলখল করে হেসে ওঠে মেয়েটি। বলে, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাসুল, তোমার বয়স মোটে তেইশ? আমারই তো এক কুড়ি হয় হয়।
নামাবলির অন্তরালে গদরের মুসলমান সেপাই চমকে ওঠে। ভাবে, এ মেয়ে তো মনে হয় মুসলমান। জানতে চাইল, তোমার নাম কী?
হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম। লোকে বলে, মিছার মা। কেউ বলে মিঠার মা।
অবাক হয় গুল বাহাদুর। বলে, এটা আবার কারো নাম হয় নাকি?
ঘরের মধ্যে গনি ছিল। একই গ্রামের মানুষ। জান পেহচান তো আছেই। সে বলল, ওর নাম মোতি। ও মিছে কথা বলছে। নাম তার মিছার মা-ও না, মিঠার মা-ও না।
কথায় পারদর্শী মোতি। তেড়ে ওঠে গনির কথায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আঞ্চলিক ভাষায় দিব্যি ঝঙ্কার করে কথা বলতে লাগল সে। শিবুর ছেলে আনন্দিকেও চিনল মোতি। শিবুকে তো চেনেই। বলল আরো কত কথা। গুল জানতে পারল, ঝড়ে আশ্রয় নেয়া মাটির ঘরবাড়িটা তারই। বিয়ের অল্পকাল পরে সোয়ামি মারা যায় মোতির। এ জগৎ-সংসারে সে একা। এক্কেবারে একা। শুনতে শুনতে ঘোর লাগে গুলের।
বাইরে আসমানফাটা বর্ষা নেমেছে। বন্ধ হয়েছে পাগলা ঝড়ের চৌষট্টি কলার মাতামাতি। ডাগর দুটো চোখ মেলে বৃষ্টির দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে মোতি।
হঠাৎ হেসে বলে, দেখেছ গোঁসাই, লোকে যে আমাকে পাগলি বলে, তো ঠিকই বলে। তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছো এ বাড়িতে, আর আমি একবারও জিজ্ঞেস করছি না, তোমার সেবার কী হবে?
সপ্রতিভ গুল তাড়াতাড়ি বলে, চিন্তা করো না মিছার মা। গরুর গাড়িতে চিঁড়ে-মুড়ি আছে।
–সে কি আর আছে গোঁসাই? তোমার গাড়ি গরু সব তো লুটোপুটি খেয়ে পড়ে আছে।
–তাহলে তুমি কিছু দিও, খেয়ে নেব।
–সে কি গো? তুমি জাত মান না? চোখ কপালে ওঠে মোতির।
–আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ।
–বুঝেছি। স্মৃতির তাক থেকে তুলে আনল কিছু তথ্য। বলল, যারা খুব উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না।
–কোথায় পেলে এসব কথা?
–আমার বাপের বাড়ির পাশের গায়ে ভয়ঙ্কর জাত বামুনেরা থাকত। বাবা বলত, তাদের কেউ কেউ নাকি জাত মানত না। বাবার হাতে সাজা তামাক খেত।
–আমি তো দেখলাম, ডোমরাও জাত মানে না। শিবুর কথাই ধর। ও বলেছিল, ডোমের জাত যায় না। তাই ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে তারা ভাবে না।
হেসে ওঠে মোতি। বলে, ভালো বলেছ গোঁসাই। ডোমের চেয়ে নিচু জাত আর তো নেই। ওর জাত গেলে থাকে 'মানুষ জাত'।
চমকে ওঠে গুল। এ কথাটা তার মনে আসেনি তো। জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি চলে গেলে তবেই মানুষ 'মানুষ' হয়? এ সাধারণ সত্যটা মোতি বোঝে। অথচ তার মাথায় আসেনি কখনো। উঁচু হলেও জাতপাত মানামানি থাকে না। নিচু হলেও না। বলল, আচ্ছা মিছার মা, এ জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা কি ভালো?
–কী জানি, ভালো না মন্দ। তবে আমাদের পীর সাহেবকে দেখেছি জায়গা বেজায়গায় দাওয়াত খেয়ে বেড়ান। এত খেতেও পারে ওরা। তারপর গড়গড়িয়ে হেসে বলে, নিত্য এমন 'আড়াইকুড়ি' দাওয়াতের সিকিটাক খেলেও মিছার বাপের পাশে গিয়ে শুতে হতো।
বৃষ্টি থেমে গেছে। শোনা যায় পানি গড়িয়ে যাওয়ার জোর সড় সড়ে শব্দ। গুল এবার নিজের আস্তানায় আনন্দিকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করল। ভাবভঙ্গিতে সে কথা বুঝতে পেরে মোতি বলল, ও আশা ছেড়ে দাও গোঁসাই। দুই গাঁয়ের মাঝখানে যে খোয়াই, বৃষ্টির পানিতে তার স্রোত। যে তোড়ে বয়, তাতে হাতিও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
–ভয় দেখাচ্ছ মিছার মা? তবে আমি তো হাতি নই। নাও ভাসতে পারি। সাঁতার জানি।
–তুমি তো জানো না ওই পানিতে কত শত দহ। একটাতে মজে গেলে বিনা মেহন্নতে এক ঝটকায় পৌঁছে যাবে বহুদূরে। তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। মোতি হাসে। বাহাদুরও হাসে। চিড়ে মুড়ি মোয়া নাড়ু যা ছিল তা দিয়ে মোতি গোঁসাই ঠাকুরের খাবার সাজিয়ে দিলো। বিপদ-বিপত্তির দিনে সেই খাবারই অমৃত জ্ঞানে খেয়ে নিলো গুল। তারপর জানতে চাইলো, তুমি কিছু খাবে না? সবই বুঝি দিয়ে দিলে?
–আমি তো দিনের বেলায় খাই না।
–সে কি? তামাম বছর রোজা রাখো নাকি?
–ঐ দুই ঈদের ছয়টা দিন বাদ দিয়ে আর কি! তবু দেখো না গতরখানা।
ছাড়পত্র পেয়ে এবার ভালো করেই গুল মোতির 'গতরখানা'র দিকে কিঞ্চিত সন্ধানির দৃষ্টি ফেললো। ভালো লাগলো। খুব খুশি হলো গুল। যদিও অনেকবারই সে গোয়েন্দা দৃষ্টিতে মোতির দেহখানার আনাচ-কানাচ দেখার চেষ্টা করেছে ছাড়পত্র ছাড়াই। কিন্তু বাগ্দি ডোম জাতের মেয়েরা এমনভাবে পেঁচিয়ে কাপড় পরে যে ব্লাউজবিহীন দেহের আকর্ষণীয় মুক্তাঞ্চল প্রায় চোখেই পড়ে না। তার ওপর হাঁটু মুড়ে গল্প করছে মোতি।
গুল বললো, দেহের ওজন মাপার জন্য ওপরওয়ালা তো আর দাঁড়িপাল্লা নিয়ে সর্গে বসে থাকেন না। সুতরাং...
–হক কথা। শোনো তাহলে আমাদের একখানা মুর্শিদী গান। বলেই গান ধরলো মোতি।
'দিপ নাই শলিতা নাই, জলে শখের বাতি
কইও গিয়া মুর্শিদের ঠাঁই।
জলে দিবা জলে রাতি কইয়ো গিয়া ও ভাই...'
ঘুরেফিরে ছেড়ে ধরে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ আপনমনে গানটি গাইলো মোতি। মিষ্টি গলা। কান্না ভর ভর সুর। ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মতো সহজ সুরটুকু যেন সুদূর আকাশ থেকে নেমে আসছে। হৃদয়ের উৎস থেকে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে ঝির ঝির বৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে পড়ছে। দেখা যায় না। বোঝা যায়। শোনা যায় জলনূপুরের হালকা অথচ স্পষ্ট রিনিঝিনি। গুলের চোখ বন্ধ।
গান শেষ হলে চোখ খুলে মোতি বললো, বুঝলে কিছু গোঁসাই?
–একটু বুঝিয়ে বলো তো।
–এতে আবার বোঝাবার কি আছে?
–যদিও ভাবটা বুঝতে পারি কিছু, কিন্তু ভাষা তো তেমন বুঝি না।
–মানে, গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহব্বত দরদের তেল নেই ভেতরে, তবু দেহের বাতি জলছে। তা আমার বেলায় আবার খামোখা দিনের বেলায়ও জলে। তাইতো বলেছিলাম, গতরটার পানে চেয়ে দেখো।
অর্থ তো আগেই বুঝেছিল গুল। মোতির ব্যাখ্যা শুনে ধক ধক করে ওঠে বুকের ভেতর। মোতির এই সুন্দর দেহের ভেতর হিয়া নেই, মায়া নেই, কামনা বাসনা নেই, এটা একেবারে অসম্ভব কথা। দেহের ভেতর সুন্দর হিয়ার প্রদীপ জালাবার লোক নেই আসলে। সেটা কি মোতি বোঝে? বুঝেই কি সে এই গান শোনালো তাকে? কি বলতে চায় তাকে মোতি।
প্রশ্নগুলো দোলাচল এবং আবেগপুষ্ট হৃদয় কোঠায় তালা দিয়ে গুল বললো, সবই ওপরওয়ালার ইচ্ছে। তবে নিজের দেহকে তাচ্ছিল্য করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তার বাড়াবাড়িও করতে নেই। মিরাবাই-এর একটা ভজন শুনবে?
–তুমি গাইতে পারো গোঁসাই?
–ঐ আর কি। শোনো তাহলে, 'নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল জন্তু আছে ঢের
কামিনি তাজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।'
গদ গদ কণ্ঠে মোতি বলে, আহা-হা, আহা-হা, ভারি মধুর তো গানখানি। আমি কখনও শুনিনি।
গুল মনে মনে বলে, বেওয়াকুফ মেয়ে না হলে এমন কথা বলে? বাংলা মুলুকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় কোনো এক চিকনকালা গ্রামের বান্দি মেয়ে এমন ভজন শুনবে কি করে? ভাবালুতা আর ভক্তিরসের মধ্যে হঠাৎ একটা ডুব দিলো গুল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো হুশ করে। পাছে সংযমের বাঁধে বড়ো রকম ফাটল ধরে যায়, এই

ভয়ে সে আত্মঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, আজ তবে চলি মিছার মা।

সুর কেটে গেলে তা সুদারার নিষাদ থেকে পঞ্চমে আসবে না তারার গান্ধারে যাবে, সেটা কিন্তু বাদক তখুনি জানতে পারে না। মোতিরও তাই হলো। ঝড় জলের মধ্যে তার ঘরে গনিকে রেখে যেতে গুলের আপত্তি নেই, আপত্তি দেখা দিলো তার থাকাতে। বাকপটু মোতি ছেড়ে কথা বললো না।

কিছু মান-অভিমান এবং মৃদু তর্ক-বিতর্ক হলো দু'জনের মধ্যে। মোতির অহং এবং বিশ্লেষণের কাছে হেরে গেলো গুল। অপ্রস্তুত হলো বেশ। তা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লো গুল। মোতির সঙ্গ তার ভালো লাগছিল খুব। কিন্তু নিজেকে কতোটা শক্ত রাখতে পারবে, না পারলে কি হবে, এসব চিন্তা স্পষ্ট করে গুলের মাথায় আসেনি। একজন সোমথ রূপবান পুরুষ, ঝড় জলের দোহাই মেনে এক অতি আকর্ষণীয় যুবতীর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাবে তা কি করে হয়? এই চিন্তা ছিল তার অন্তর্গত সংস্কারে।

পথে বের হয়ে বুঝলো, মিছার মার কথা মিছে নয়। যেখানে হাঁটু জল দেখা যায়, সেখানেও প্রবল স্রোতের তোড়। দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর। এগোলো আরো। পথের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি নামলো আবার। মেঘের ঘনো চাদরে চাঁদ ঢাকা। নিকষ অন্ধকার চারদিকে। বারবার মনে পড়লো মোতির বারন। কি হতো না বেরিয়ে পড়লে? ও মেয়ে তো মেয়ে নয়, স্ফটিকের তলোয়ার। বড় শক্ত ধাতুর জিনিস। হাতে তুলে না দিলে, ধরার কায়দা বাতলে না দিলে সেটা ছোঁয় কার সাধ্য? অন্ধকার, বৃষ্টি, জলের তোড় একেবারে অচল করে দিলো গুলের যাত্রা। একটা ঢিবির ওপর আশ্রয় নিলো সে। বেশ ভালোই বুঝলো, এখানেই থাকতে হবে সারারাত। মোতির মুখটা মনে পড়লো গুলের। কি করছে সে এখন? রোজা ক্লান্ত শরীরে খেয়ে দেয়ে নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। এমন মনি মানিক্য, চিকনকালা গ্রামের আঁধারে ঢাকা, ভাবাই যায় না। মাঝে মাঝে ওপরওয়ালা বড় অবিচার করে ফেলে। তবে সেই মহাজনের হিসাব তো কেউ বোঝে না। সেইটে রক্ষা। বসে বসেই ঢুলুনি এসেছিল। স্বপ্নে দেখলো, মোতি শুয়ে আচে তার কোলে। প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইছে। উড়ে যাচ্ছে তার শাড়ির আঁচল বার বার। বুকের বিপুল মৃন্ময় মর্ম বিগ্রহ যুগল খোলা। আঁচল টানছেও না মোতি। অসহ্য আবেগে থর থর করে কাঁপে গুল। দুরন্ত যৌবনে মত্ত ভরপুর পুরুষ আর কি করতে পারে? মাতাল সময় তাকে বেহুঁশপ্রায় করে দিলো। এমন সময় দুটো ব্যাং তার কোলে পড়লো লাফিয়ে। চমকে উঠে ঝপ করে পড়ে গেলো সে ঢিবি থেকে। তবে স্বপ্নে এসেছিল মোতি? তাই বা মন্দ কি? গুল খুব খুশি তাতেও। স্বপ্নচ্যুত শরীরের বেহাল দশা হলো পানিতে ডুবড়ে। দিন গড়িয়ে যায় চিত্ত চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে পড়ে বৈষ্ণব গুল। নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে চাঁদ সূর্যের আনাগোনা দেখে। মিথিল সময় কাটে না সহজে। ধীরমন্থর জীবনযাত্রা। আশা নেই, উদ্দেশ্য নেই। ছেঁচড়ে ছেঁছড়ে কেটে যায় সন্ধ্যে সকাল। বর্ষাকাল। প্রায় প্রায় মেঘের পরে মেঘ জমে ওঠে কি উল্লাসে। দেড় মাস হয়ে গেলো তবু মোতির দেখা নেই। মেয়েটা বড় বেরহম। তার ঘরে তো সে একবার গিয়েছিল। হোক না আকস্মিক ঝড়ের তাড়া খেয়ে। তার দাওয়ায় মোতিও তো একদিন আসতে পারতো! হয়তো ভেবেছে, মুসলমান হয়ে বৈষ্ণবের ঘরে যাওয়া ঠিক না। হায় নির্বোধ ললনা! গুলের দিল যে টুটা ফুটা করে দিয়েছে সে, এটাও বোঝে না?

মোতি এলো সেদিনই। অভিমানে গর গর করছে। কথা বলছে না ভালো করে।

গুল প্রশ্ন করলো, হলো কি তোমার? রাগ করেছো?

–না, অভিমান করেছি।

–ও একই হলো। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না, বৃষ্টি আসবে এখনি।

অমনি ধপ করে ছোট্ট দাওয়ার ওপর মাটিতে

বসে পড়লো মোতি। বললো, রাগ আর অভিমান কখনই এক নয় গোঁসাই।

–ঘরে চলো মোতি। বৃষ্টি এলো বলে। কথা হবে পরে।

খিল খিল করে হেসে মোতি বাড়িয়ে দিলো দুই বাহুলতা। ব্লাউজবিহীন দারুণ দেহের ওপর একহারা আঁচল ফেলা। মৃন্ময় বিগ্রহ যুগল কাঁপছে হাসির দমকে। বললো, হাত ধরে তোলো। তাহলে ঘরে যাবো।

বিশ্রি বিপদে পড়ে গুল। সাত্বিক বৈষ্ণব সে। এমন নাগিনী কামিনীর বাহুলতা ধরে তুললে তো বুকে জাপটে ধরতে ইচ্ছে করবে।

মোতি বলে, কি হলো গোঁসাই? ধরো, টানো আমাকে। তবে তো উঠবো। ঘরে যাবো।

যারপরনাই বেচায়েন গুল বলে, দেহেরবানি করো মোতি। উঠে এসো নিজে নিজে। দিল্লির খানদানি সমাজে 'মেহেরবানি' শব্দের যে অর্থ, তা বোঝে না মোতি। কিন্তু গুলের অসহায় মুখ দেখে এটুকু বুঝলো যে, গুল হেরে গেছে। এই না হলে পুরুষ! নামাবলি গায়ে দেয়া বৈষ্ণব! নারীর বাহু ধরলে যার সংযমের তালা বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার ভয়।

দারুণ কৌতুকে জলপ্রপাতের মতো উচ্ছ্বাসে হাসিতে ভেঙে পড়ে মোতি। তারপর নিজেই উঠে গুলের ঘরে যায়। খিচুড়ি আর আলুর দম রেধেছে গুল। আনন্দ বেশ পছন্দ করে খাবারটা। ঘরে এসে মোতি আচমকাই বেশ উঁচু গলায় গান ধরলো। সে গানে গুরু মুর্শিদ নিয়ে যে কথাগুলো আছে, তার মানে বুঝতে কষ্ট হলো না গুলের। তবু প্রশ্ন করলো, গরুর ওপর 'অভিমান' করাটা কি?

–অভিমান মানে অভিমান। মুখ ঘুরিয়ে থাকা। নিজেকে কষ্ট দেয়া।

–তার কারণ? রাগ নয় কেন?

–রাগ তো ভালো নয় গোঁসাই। রাগ হলে তো কিছু একটা ক্ষতি করতে হয়।

–তার মানে?

–ধরো তোমার রাধা আলুর দমে আমি একটু ছাই দিয়ে দিলাম। নষ্ট করলাম খাওয়া। এটা হলো রাগ। সে কি ভালো হয় গোঁসাই, বলো দেখি!

–এসব কথার অর্থ কি মিছার মা? কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

–তুমি দেখি মস্করা ফস্করা এক্কেবারে বোঝো না। একটা আস্ত মেড়ে তুমি।

মুহূর্তে গদরের সেপাই-এর হাত উঠে গেলো মোচে তা দেয়ার জন্য। কিন্তু মোচ তো নেই আর। বললো, তুমি খুব সাহসী মেয়ে মোতি।

–সাহসের কি দেখলে? মেড়েকে মেড়ে বলবো না? তবে আমি চাই, তুমি মেড়েই থাকো।

–তাতে তোমার লাভ?

–সেটাও বোঝোনি ঠাকুর?

–ঠিক আছে। এবার বলো, তোমার গান তুমি কাকে শোনালে?

–তোমাকে, মুর্শিদকে, আর কাকে?

–তোমার মুর্শিদ কে?

–এতো কথা শুধোচ্ছে যে বড়? হিংসে হচ্ছে নাকি?

মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কথা। বলতে চেয়েছিল, গদরের সেপাইরা যুদ্ধ জানে। হিংসে জানে না। মেয়ে মানুষের ওপর দিয়ে পিছলে যায় দৃষ্টি। ঘরে বসে রসালাপের অবসর তাদের হয় না। তবে আজ সে দহে পড়ে আছে। হাতি দহে পড়লে চামচিকেও তাকে লাথি মারে। তাই আজ মোতি তাকে যা নয় তাই বলে যাচ্ছে অনায়াসে। সামলে নিয়ে গুল বলে, আমি শুধু তোমার মুর্শিদের কথা জানতে চেয়েছি।

মোতি হেসে বলে, আডছে একজন। কিন্তু সে বড্ড বুড়ো। সব রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

–ছি মোতি। গুরুকে নিয়ে এমন স্করা কি করতে আছে? গুল টানটান হয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে। সামনেই বসলো মোতি। বললো, মস্করা নয় গোঁসাই। এই শরীরটাই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহব্বত দিয়ে, সে তো গানেই

আছে। আর আমার শরীরটা? সে বুঝি কিছু নয়? গুরু আমার সব আশা পূর্ণ করবে না?
শিউরে ওঠে গুল বাহাদুর। এ কেমন আগুনমুখো মেয়েরে বাবা? কোনো কথাই বাধে না মুখে? বলে, তোমার কথা হেঁয়ালিতে ভরা। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয়, তবে সেটাও গুরু পূর্ণ করবেন নাকি?
নিশ্চিন্ত জবাব দেয় মোতি, নিজেই জানি না কি চাই। কখনো মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে ইচ্ছে করে, কখনো স্বামী পেতে ইচ্ছে করে। কখনো পেতে ইচ্ছে করে নাগর। যেমন তোমাদের রাধা পেয়েছিল কেষ্টকে। রসের সাগরে সুবো শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর মিশে যাবে ওর শরীরে।
–যাক, রাধা হলে আর কোনো বদনাম হবে না। কেষ্টর সঙ্গে তার সম্পর্ক হালাল।
–ছোহ। বদনাম। ডপকি ছুঁড়ি। নিকে করি না। একলা পড়ে থাকি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে আর বাড়বে কি? মরার গোরের ওপর এক মণ মাটিও যা, শ মনও তাই।
গুল বাহাদুর ভাবে, কি ধুন্দুমার ধরনের সব কথা বলে যায় কি অনায়াসে! তবে মেয়েটা বদ্ধ পাগল। আর এর দিলটা একেবারে সাদা। ভেতর বাহির দুইই সাফ। বলে, এসব খেয়ালি পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও, না মিছার মা? কিন্তু যেখানে সেখানে এসব কথা বলো না।
মনে হলো না মোতি কিছু শুনেছে। বললো, একটা কথা শুধাবো গোঁসাই?
গুল হেসে বলে, নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিছুটি লুকোবার নেই।
–তোমার বিয়েসাদি হয়নি?
– না।
–কারোতে মজোনি?
–লক্ষ্মৌর এক বাইজিকে বড়ো ভালো লেগেছিল। যেমন নাচতো তেমনি গাইতো। আর তেমনি ছিল চেহারা।
–তারপর কি হলো? কৌতূহল উছলে ওঠে মোতির।
–কিছুই হলো না। অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লাম, তারপর চলে এলাম এখানে। এই চিকনকালা গ্রামে।
–ও, কোনো কেলেঙ্কারি করে ভেক নাওনি? থমকে যায় গুল। বাংলা মুলুকে বোষ্টমদের বুঝি এমনই ভাবা হয়? যদিও গুল বোষ্টম নয়, তবু নামাবলি গায়ে দেয়া গদরের পরাজিত সেপাই-এর দিলে কোথায় যেন আঘাত লাগে। বলে, সব বোষ্টমরা পাষণ্ড, এমনটা ভাবো কেন?
–রাগো কেন গোঁসাই? আমাদের অনেক মুসলমান পীর দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চারদিকে আগুন জালিয়ে রাখেন? সত্যি দেখোনি?
দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে কতোবার গেছে গুল বাহাদুর। সেখানকার ব্যাপার-স্যাপারই
আলাদা। ফুল, আতর, মোমবাতি, আগরবাতি আর দোয়া-দরুদ পাঠে মাজার গম গম করে। ভক্তি আর ভালোবাসায় বিচলিত হয়ে থাকে আগত মানুষেরা। বলে, আগুন জালানোটা কি মোতি?
-বুছলে না? আমার মতো গোটা দশেক ডপকি ছুঁড়ির মধ্যে বসে পিরেরা ভাবখানা করেন, হেরো হেরো, আগুন আমাকে ছোঁয় না।
-তারপর?
-তার আর পর কি? বিস্তর ঘি গলেও যায়। পির-ফকিরদের সম্বন্ধে মোতির এমন মোটা দাগের কথায় বড়ো অসম্মান লাগে গুলের। কিন্তু সে যে ভেকধারি বৈষ্ণব। বলতেও পারে না কিছু। বলে, সতি করে বলো তো মোতি, তোমার মতলবখানা কি? এতো সব উটকো কথা বলছোই বা কেনো?
ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে গুলকে দেখে মোতি। সুন্দর সুপুরুষ, বলশালী দেহ। শাল গাছের ডালের মতো শক্তপুষ্ট দুটি হাত। চোখ দুটোতে প্রাণরসের বিচ্ছুরণ। চওড়া বুকের ছাতিতে নামাবলি ঠিক মানাচ্ছে না। কেমন রাজা গজা ভাব মানুষটার।
-কি দেখছো মোতি?
-ছোট জাত বলে কি গুরুকে দেখতেও পাবো না?
-ছি ছি মোতি। আমার ধর্মে জাত টাতের বিচার নেই। সবাই মানুষ। সবাই স্রষ্টার তৈরি পুতুল। চোখে চোখে তাকাতে পারে না গুল। মোতির চোখ থেকে আড়াল করে মুখ।
-মুখ ফিরিও না গোঁসাই। সত্যি কথাটা বলি। আমি ভেবেছিলাম, কোনো নষ্টামি করে তুমি বেরিয়ে এসেছো। বৈষ্ণবের সাজ নিয়েছো, সে থাক। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, মোতি থামলো।
গুলের মনে হলো, মগজের ভেতর ঠন ঠন করে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। তবু ভালো লাগছে শুনতে। বলে, কেনো? বলে যাও।
-ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হবো। এই আমার শরীর। এই আমার দিল। এগুলো যখন কোনো কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙেই দেখি কি হয়? তা আর হলো না। তুমি বড়ো সরল, বড়ো সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।
-এটা মিছে কথা মোতি। আমার সঙ্গে বনলো কি না, সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে তোমার সবই ভালো। তোমার বুদ্ধি যুক্তি বাকপটুতা- সব সবই ভালো। হলফ করে বলছি।
-এবার তোমাকে শেষ প্রশ্ন করি ঠাকুর। সংসারে তোমার মন বসেনি কেনো, সেইটা আমাকে বলো, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে গুলের। অপরিচয়ের মানুষের কাছাকাছি আসতে দুচার বছর লেগে যেতেও পারে। মাত্র দুটি দিনে মোতির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা কয়েক বছরেও অনেকের হয় না। যাদুকরি মেয়েটার মধ্যে কি আছে? চিকনকালা গ্রামে ঝড়-জলের রাতে যে দহে সে পড়েছিলো, আজ মেঘ ভরভর আকাশের ধূসর মায়াময় ছায়ার কিচন দহ তার চেয়ে অনেক দড়ো মনে হচ্ছে। বলে, সংসারে আমার রাতভর অরুচি হয়নি মোতি। আসলে আনন্দির বাবা শিবুর মতো আমি গদরের সেপাই। তোমার সামির যা হওয়ার কথা ছিলো, লড়াইয়ে হেরে গা ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি। দুশমন যাতে চিনতে না পারে। আমি মুসলমান। (লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী এখানে কলম বন্ধ করেছেন) কিন্তু প্রকৃতির গতি থামলো না। হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। ঝোড়ো দমকা একটা হাওয়ায় দড়াম করে দরজা একবার বন্ধ হলো একবার খুলে গেলো। অন্ধকার ঘরে মোতি ছিটকে পড়লো গুলের বুকে। এবার মানুষও ভবিষ্যতে ধাবিত হওয়ার অনিবার্য গতিকে পারলোনা থামাতে। তারপর কি হলো? কি হলো তারপর :
গদরযুদ্ধের প্রায় পোনে এক শতাব্দী পর মুজতবা আলীর কলমে আসে গুলবাহাদুর এবং চিকনকালা গ্রামের আনুসঙ্গিক অনেক কিছু। গল্পটা আমি পড়ি আরও অর্ধ শতাব্দী পর। তখন থেকেই মোতি আর গুলের জন্য আমার মায়া। এতো অফুরন্ত প্রাণরস নিয়ে ওরা পড়ে থাকবে চোখের আড়ালে? মুজতবা আলীর মতো আমার ওপর কোনে গুরুর কৃপা নেই যে, তার জন্য আমি বাচাল হবো বা মুক্ত হবো। গুটি গুটি পায়ে মোতি আমার কাছে কতোবার এসেছে তার সীমা নেই। বলছে, আমি তোমাকে শোনাবো প্রজন্মের কাহিনী অবশেষে একদিন বলতে চাইলাম তার কথা। সে তার হাঁটু মুড়ে বসে দুইদিন তিনরাত ধরে বলে গেলো। কোথায় লাগে শাহারজাদি আর দুনিয়ার জাদির কাহিনী। রূপকথা না হয়েও রূপকথার মতো আকর্ষণ সে কাহিনীর। জানি না আমি কতোটা বলতে পারবো।

দুই ॥
চিকনাকালা গ্রামের নতুন দম্পতি গুলবাহাদুর আর মোতি। গুল বাহাদুরের কাছে লুকোনো ছিলো আকারে ছোটো একখানা কোরান শরিফ। সেইটে ছুঁয়ে, আল্লাহ রসুলকে সাক্ষী মেনে, ঘরের মধ্যেই তারা বিয়ে করে। কিন্তু গুলের পরিচয় প্রকাশে তখনও প্রবল বাধা। দুশমন ইংরেজের দাপট তখন খুব বেশি। গদরের যুদ্ধে জিতে তাদের যেনো মিং গজিয়েছে। গুলের গজালো পাখনা। জিবন রসে ডুবে রইলো সুবা শাম। কিন্তু সে আর কয়দিন?
মোতি আসে গুলের দাওয়ায়। রাতে থাকতে পারে না। শিবুর ছেলে আনন্দি এদকি ওদিক খেলতে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই গুল ভেঙে ভেঙে দেখে মোতির শরীর এবং দিল। বিস্ময়ের শেষ থাকে না গুলের। বাংলা মুলুকে বাগ্দি সমাজের সাধারণ এক মেয়ে মোতির এতো ঐশ্বর্য কেমন করে হলো? এযে সাগরের মতো বিশাল আর অতল!
মোতি তো সুবা শাম রসের সাগরে ডুবে থাকতেই চেয়েছিলো। শরীর দিল ভেঙে দেখতে চেয়েছিলো। সে যে এমন করে ঘটে যাবে, তা ছিলো কল্পনাতিত। লজ্জায় ব্রিড়ায় সে উপবাসী

থাকার মেয়ে নয়। মনের কথা অকপটে বলতে তার শরম লাগেনি। গুলকে সে চেয়েছে। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে এক টানে পরনের শাড়ি খুলে ছুড়ে ফেলে। সুযোগ বুঝে জীবন মাঝে গুলের ঘরে আসে, নদির মোহন হয়ে। মোতি ছলকে ওঠে কালচে পাথরে খোদাই করা শরীর। আর এক টানে খোলে গুলের নামাবলি। রাজ্যের আদিমতায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকে দুজন। থৈ থৈ করে সাগর। ঝর ঝর করে ঝরে বৃষ্টি। উদ্যাম-উল্লাসে নেচে নেচে পড়ে ঝরনার ধারা। ঘর ভরে ওঠে সুগন্ধে। মাটির দেয়াল ছেয়ে যায় কুজ্ঞকুসুমলতায়। ব্যবিলনের শূন্য উদ্যানও কিছু নয় তার কাছে।

কখনও গুল ডাকে, মিছার মা।

আর কোনো কথা খুঁজে পায় না তারা।

আবার ডাকে, মোতি। আমার জান।

-উম। সে তো তোমার দিলের ঘরে বন্দি এখন। গুল বোঝে, মোতি ঝাঁপ দিয়েছে ভলোবাসার সাগরে। দ্বিধাহীন চিত্তে সে ক্রমশ ডুবে যাবে। দহের পাকে পাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ডুবতেই থাকবে। মরলেও বুঝি টের পাবে না। এমন জীবন মোতির অচেনা নয়। কিন্তু পানিতে ঝাঁপ দিলেই তো গোসল হয় না। ডোবার মতো পানির গভীরতা চাই। নাকানি-চোবানি খাওয়ার মতো দহ চাই। দহের নিচে মুক্তো থাকা চাই। মরণের মতো সুখ থাকা চাই। মোতির মতো দিলওয়ালা মেয়ে নাহলে যে কেউ মরতেও পারবে না।

মোতি ডাকে, আমার দিল।

-সে তো এখন সাগরের জলে মিশে গেছে। দহের পাকে পাকে ঘুরছে।

-আমার সুখ। আমার কেষ্ট ঠাকুর।

-আমার দুনিয়া। গুলের কথা জড়িয়ে যায়। অধর সংগ্রামে বাক স্ফুরণের পথ পায় না। গুল ভেবে পায় না, এতো প্রাণ তৃষ্ণা তার কোথায় লুকিয়ে ছিলো? মোতিকে তার খুব ভালো লেগেছিলো। কিন্তু ভালোবাসার সময় তো পায়নি। বুঝতে পারেনি বিধবা মেয়েটার সত্যিকার পরিচয়। হিসেবে করে উঠতে পারেনি দিল্লির খানদানি মানুষ গুল ওকে ভালোবাসতে পারবে কি না? হঠাৎই অসময়ে ভালোবাসার হাত ধরে উপচে এলো ভালোবাসা। বোঝার আগেই ডুবে গেলো গুল অসাধারণ আনন্দের বিশাল আমিসে। বুক ফেটে যেতে চাই লো। নিঃশ্বাস বন্ধ হতে চাইলো। তবু মোতিকে বুকে চেপেই জাপটে ধরলো প্রেমের মরণকে। মনে ভাবে, ভালোবাসা বুঝি এমনই। অঙ্ক কষে নয়, অজান্তেই হয়ে যায়। বসন্ত সমিরণের মতো নয়, দমকা বাতাসের মতো। আছড়ে গড়ে যায়।

লুকিয়ে চুরিয়ে মাস দুয়েক কেটে গেলো। মোতির কোনো ভাবনা নেই। সে তার ছাগলের বাচ্চা নিয়ে গুলের দাওয়ায় আসে। রাঁধে বাড়ে। গুলকে আনন্দিকে খাওয়ায়। আনন্দি খেলতে গেলে সুযোগ বুঝে মোতি বুঝি ঝরে ডুব দেয়। গুলের দহে। গুল তাকে আঁচড়ে থামচে চোটে চুষে খেয়ে বিপ্রস্ত করে দেয়। কখনও বাড়াবাড়িই করে দুরন্ত পুরুষ। মোতি বলে, কি হচ্ছে এসব গোঁসাই?

-ভালোবাসা যে খেতেও হয় মিছার মা। সে কথা তো মাত্রই জানলাম।

-তুমি কি আমার বাচ্চা? খল খল করে হাসে মোতি।

কথা বলতে পারে না গুল। মুখ তখন ভর্তি অন্য কিছুতে।

-মনে হয় তুমি এসেছো আমার পেটে বাচ্চা হয়ে। শুনছো গোঁসাই?

চমকে ওঠে গুল। বলে কি মোতি? কেমন এক ভয় তেড়ে আসে। কি হবে এখন? এবার যে সংসার করতে হবে। নিরাপত্তাই নেই তো আয় রোজগার হবে কি করে? নামাবলি গায়ে দিয়ে তো তার আর আনন্দির খাওয়া পরাই চলবে না। গাঁয়ের প্রান্তে দুজন ইংরেজ সেপাইকে দেখছে কাল। গুর গুর করে উঠেছে বুকের ভেতর। ভেবেছিলো, বলবে মোতিকে কথাটা। কিন্তু সব হারিয়ে যায় মোতি কাছে এলে।

সমুদ্র স্নান শেষে শুয়ে থাকে দুজন পাশাপাশি। কাপড় পড়ে আছে পাশেই। কেউ সেটা তুল গা ঢাকার চেষ্টা করছে না। মোতি বলে, বাচ্চার কথা শুনে ভয় পেলে?

-ভয় নয় মিছার মা, চিন্তায় পড়লাম।

-চিন্তা করো না। ঐ তো ওপরে বসে থাকে একজন। সে ঠিক রক্ষা করবে আমাদের। মোতির শরীরে হাত বুলায় গুল। বুকের মৃণ্ময় বিগ্রহ ভেঙে ভেঙে দেয় বার বার। উঠে বসে একটু পর। দেখতে থাকে মোতির দেহবাতি। কি অপরূপ দেহের ভাঁজগুলো। দেহ বাতিই বটে। জ্বলে সত্যি সত্যি।

আবার শুয়ে পড়ে মোতিকে বুকে জড়িয়ে। বড়ো একটা শ্বাস ফেলে গুল। খুব স্পর্শকাতর মেয়ে মোতি। বলে কি হয়েছে গোঁসাই? খুলে বলো। চেপে রেখো না।

-তিন চারদিন আগে গ্রামের প্রান্তে দুজন ইংরেজ সেপাই দেখেছি।

-আমাদের কি তাতে ঠাকুর?

-জানি না, ধূর্ত ইংরেজ সুদূর বাংলা মুলুকে কেনো পাঠালো সেপাই। নিশ্চয় গদরের পলাতক সেপাইদের খোঁজেই পাঠিয়েছে।

চনমন করে উঠে বসে মোতি। গদরের কথা সে জেনেছে গুলের কাছ থেকেই। তবে কি সত্যি ওরা গুপ্তচর? গুলকে ধরতে এসেছে? বলে, তুমি ওদের চেনো ঠাকুর?

-একজন একজন করে ইংরেজদের সেপাইকে চেনা তো সম্ভব নয়। তবে ওদের জাতকে চিনি আমি। হাড়ে মজ্জায় কমবখত শয়তানের ঝাড়ের যে কাউকে দেখলেই চেনা যায়।

-আমি বলি কি, চরো আমরা পালিয়ে যাই। এখান থেকে।

-কোথায় যাবো? ভারতবর্ষের সবখানে ওদের জাল বিছানো মাকড়াসার মতো।

-বলেছিলে দিল্লির অনেক উত্তরে হিমালয় পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোনে দুটি দেশ আছে। নেপাল এবং ভুটান। তারই কোথাও যাওয়া যায় না? হেসে ওঠে গুল। বলে যাবে না কেনো? তবে সে পথও তো নিরাপদ নয়। কথাটা তো আমিও ভেবেছি। ভারতের একটা ম্যাপও জোগাড় করেছি। কিন্তু...

-কি? কিন্তু কি? বলো গোঁসাই। থামলে কেনো?

-তুমি যে মা হবে, সেটা সামলাই কি ভাবে?

-ভেবো না ঠাকুর। ঐ ওপরে যে আছে, সেই রক্ষা করবে।

-আমরা তো আর সাভাবিক মানুষের মতো গাড়ি ঘোড়া চড়ে দিনের আলোতে পথ চলতে পারবো না। যেতে হয়ে পায়দলে। এই কষ্টে তোমার পেটের খুদে ঠাকুরের যদি কিছু হয়?

-ওপর ওয়ালা চাইলে তাই হবে। আমাদের কিছু করার নেই।

-এমন কথা বলো না জান। কাতরে ওঠে গুল। বলে, এমনও তো করা যায় যে, তুমি রইলে এই গাঁয়ে। আমি চলে গেলাম নেপাল। পরে তুমি এলে বাচ্চা নিয়ে! কেমন হয়?

- না না গোঁসাই, সে হবে না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেনা না আমি। আর এও জানি তুমিও পারবে না থাকতে আমাকে ছেড়ে।

-মানছি মিছার মা। কিন্তু...

-কোনো কিন্তু নয়। তুমি চাও তো আমি ভেষজ ওষুধ খেয়ে নেবো।

-কি হবে তাতে?

-আমার পেট খালি হয়ে যাবে।

-বলো কি? কোথায় পাও এমন কথা?

-আমাদের গাঁয়ে এমন তো আকছারই হয়।

-সে যে সর্বনেশে কাজ। পাপের কাজ, মিছার মা।

-এও তো সেই ওপর ওয়ালারই ইচ্ছে বলো! তার ইচ্ছে ছাড়া এ জগতি কিছু কি হয়?

এমন দস্যি নির্বিকার মেয়ের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করা যায়? যুক্তি আর বিশ্বাস দুই হাতে ধরে রাখে মোতি। কোনদিকে পা ফেলতে দেরি হয় না।

আসমানের দিকে তাকিয়ে গুল। গুলকে চুপ দেখে মোতি বলে, আমার কথা শোনো গোঁসাই, তুমি থাকলেই সব থাকবে আমার।

-কি করে বলো এসব কথা জান? ভয় লাগে না?

-ঠিকই বলি ঠাকুর। এতে ভয়ের কি আছে? আমাদের গাঁয়ে বছর বিয়োনি এক বৌ ছিলো। কতক বাচ্চা মরতো, কতক বাঁচতো। সেও ঐ ওপরওয়ালার ওপরই ছেড়ে দিতো। বলতো, আমার মানুষ আছে তো সব আছে। আমিও তাই বলি। তুমি থাকলে আমার সব থাকবে।

এমন জীবন এবং জীবন দর্শনের কথা গুল জানে না। শোনেও নি কখনও। বলে, ওপরওয়ালার প্রতি এত বিশ্বাস তোমার?

-ওমা, সে আবার কি কথা? ঐ তাকে বিশ্বাস না করে যাবে কোথায়? তুমি কি জানতে যে দিল্লি ছেড়ে চিকনকালা গ্রামে এসে পড়বে? বলো? বলো?

-না, তা জানতাম না। এক্কেবারে হক কথা।

-জানতে কি যে, মিছার মাকে তুমি নিকে করবে? যদি না ঐ তার ইচ্ছে হতো?

- জানতাম না। কিন্তু তুমি 'নিকে' শব্দটা ছাড়ো। বলো বিয়ে।

-বেশ। এবার বলো, কোন ঘটনা তুমি বিশ্বাস করছো না!
-সবই করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি।
-তা হলে আর কষ্ট কেনো মনে?
-আনন্দিকে কোথায় রাখবো?
-কোথায় আবার? আমাদের সঙ্গেই যাবে।
-ভেবে বলছো মিছার মা?
- ও-ই তো আমাদের প্রথম বাচ্চা গোঁসাই। ওকে ফেলে যাওয়ার কথা কেমন করে ভাবি? অবাক নয় দিশেহারা আমাদের প্রথম বাচ্চা যেনো মুক্ত আকাশ। সেখানে জায়গার অভাব নেই। খাওয়া পরা থাকা কোনটারই ব্যবস্থা নেই, তবু আনন্দি থাকবে সঙ্গে। এতো মনের জোর যে কোথায় পায় মোতি? শূন্যের মধ্যেও পূর্ণতায় ডগমগ করে কিভাবে? ওপর ওয়ালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ কি এর কারণ? এর কি তবে অবতার যোগ আছে? বিশ্বাসের অবস্তু দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করেছেন স্রষ্টা?
বহু কাঠখড় পুড়িয়ে, অনাহার-অর্ধাহারে দেহ শুকিয়ে তিন মাস পর গুল, মোতি আর আনন্দি এসে পৌঁছে কলকাতার উপকণ্ঠে। গঙ্গার ধারের এক গ্রাম জনপদে। তিন মাসে গুলের দাড়ি-গোঁফ-চুল ঝাপড়া আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে। পেছনে রীতিমতো ঝুঁটি বাঁধতে হয় চুলে। দাড়ি-গোঁফে আলুথালু গুলকে এখন সন্ন্যাসির মতোই লাগে। আর ছদ্মবেশ নয় আসল বেশই তার ছদ্মবেশ হয়েছে। আনন্দি বেশ আছে। দিনের শেষে মোয়া-মুড়কি নাড়ু-বাতাসা তার জুটেই যেত। মোতি হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন রূপসী। ছয় মাসে পা দিল। মা হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট বোঝা যায়।
যেখানেই যায়, দু'দশ দিন থাকে। হয় কোনো মন্দির বা কোনো বড় গাছের তলায় পাতালতা দিয়ে একটুখানি ছাতার মতো করে নেয়। সকাল হতেই একটা চটের ব্যাগের ওপর গুল বাহাদুর বসে যায় চোখ বন্ধ করে। পাশেই ঘুরঘুর করে আনন্দি। গাঁয়ের লোক নতুন সাধু দেখে কাছে আসে। কথা বলতে চায়। গুল কথা বলার চেয়ে চুপ করেই থাকে বেশি। মাঝে মাঝে চিকনকালা গ্রামের বাগদিপাড়ার ভাষায় জানতে চায়, কারো কোনো সমস্যা আছে কি না?
বাংলা মুলুকে গ্রামগঞ্জ জনপদে শত সহস্র দুঃখ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত জীবন মানুষের। উদগ্রীব হয়ে ওঠে সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য। কেউ বলে, ঠাকুর আমার গোহালে মড়ক লেগেছে। তিনটি গরু মরে গেছে এম মাসে। কেউ বলে, আমার একটা পুত্রসন্তান না হলে তো আর বংশ থাকে না। কেউ বলে, আমার বৌ মৃতবতসা। বাচ্চা বাঁচে না তার। কেউ বলে, আমার ছোট ব্যবসায় আয়উন্নতি নেই মোটে। এর থেকে রেহাই চাই। চাই অনেক ধনদৌলত। কারো বাতের ব্যথা, কারো পিঠের ব্যথা, কারো বুকে-পেটে ব্যথা। আরো কত কী!
সবার সমস্যা শুনে একটা কাগজে তাদের নাম এবং সমস্যার সংকেত এঁকে রাখে। কেউ একদিন, কেউ দু'দিন পর এসে নিয়ে যায় বিধান। গুল মানুষগুলোকে মন্ত্রও দেয়। তার অর্থ মোটামুটি : মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করব, অসুখ হলে যতটা সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা নেব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব– এরকম। সঙ্গে একটা মন্ত্র, সেটা সবার জন্য। স্রষ্টাকে স্মরণ করার মন্ত্র। মন-দেহ চাঙ্গা থাকবে। ছোট ছেলেমেয়ে এলে ঝাড়-ফুঁকও করত। দুর্দিনে দুর্বিপাকে গুল মনে মনে সাধক হয়ে উঠেছিল। দোয়াদরুদ পড়ে পানি পড়াও দিত মাঝে মাঝে।
সকালে মোতিও বের হয় যেত গৃহস্থ বাড়িগুলোর দিকে। কারো উঠোন ঝাড়ু দেয়া, কারো ঢেঁকিতে পাড় দেয়া, কারো দাওয়া লেপে দেয়া, ইত্যাদি টুকটাক কাজ করত। টাকাপয়সা কমই জুটত। তবে চাল-ডাল ভালোই পেত। কখনো শাড়ি-গামছাও।
পড়ন্ত বিকেলে মোতি ফিরে আসত ক্লান্ত হয়ে। গুলের টাকাপয়সা তুলে গুছিয়ে রাখত। তারপর মাটির হাঁড়িতে রান্না করত ভাত আর আলু বা ডাল সেদ্ধ। গুলের চরণে টাকাপয়সা ছাড়াও

পড়ত বাতাসা, কদমা, কলাটা-মুলোটা। পরদিন সকাল-দুপুর ওতেই চলত আনন্দির।
বড্ড ভালো ছেলে আনন্দি। ওর খাবার থেকে সে কিছু তুলে রাখত মা-বাবার জন্য। মোতি ওকে শিখিয়েছে 'বাবা মা' ডাকতে। তোতা পাখির মতো ঠোঁটে তুলে নিয়েছেও শব্দ দুটো। কী মিষ্টি করে ডাকে দুজনকে। একদিন বলে, মা, একটা থলেতে একটু একটু করে কদমা, বাতাসা জমিয়ে রাখি?
–কেন রে বাবা? তোর বুঝি দুপুরে খুব খিদে পায়?
–না মা। আমার খেলার সাথী আসছে, তার জন্য।
মোতির দু'চোখে ধারা নামে। হেসে কেঁদে আনন্দিকে জুড়িয়ে ধরে। বলে, ওরে আমার জান, তুই এত কথা ভাবতে জানিস?
হুঁ-উ-মা। জান মা, বাবা রোজ একটা করে টাকা টিনের কৌটোয় তুলে রাখে। বলে, তোর খেলার সাথীর জন্য টাকা জমাতে হবে আনন্দি।
–ওমা, শোনো কথা! তাই বুঝি? আমাকে তো কিছু বলেনি গোঁসাই!
–আমাকেও না করেছিল বলতে। তো আমি যে বলে দিলাম?
–ঠিক আছে বাবা, আমি কিছু শুনিনি। হলো তো?
–তাহলে একটা কাপড়ের থলে সেলাই করে দিও মা। আমি খাবার জমিয়ে রাখব।
জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ল মোতির মুখ থেকে। বলল, যে আসছে, সে কি তোর কদমা বাতাসা খেতে পারবে রে পাগল?
গড়গড় করে দিন কাটে। দেখতে দেখতে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, কখনো জেলেদের নৌকায় এগিয়ে যায় তারা দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকার দিকে। ওদিক দিয়েই যেতে হবে হিমালয়। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। চারদিকে পাহাড় দেখা যায়। মোতির এখন আট মাস চলছে। এতকাল সে খুব সাহসের সঙ্গে ছিল। এখন বুঝতে পারছে, একটা আশ্রয় দরকার। যে আসছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বেশ বুঝতে পারে সে, গুল খুব গুটিয়ে গেছে। কিছুটা দিশেহারাও। থামে তারা এক গ্রামে। গ্রামের নাম ঘুম। বেশ লোকজন আছে। এখানে এসে মোতি কাজ বা আয়রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তিন দিন হয়ে গেল। কাছেই মন্দির। রোজ সন্ধেবেলা সেখানে আরতি হয়। বেশ অনেক লোক আসে। প্রসাদ দেয়া হয় সবাইকে। মোতি আর আনন্দি সেই প্রসাদ নিয়ে গাছের গুহার কাছে আসে। চোখ বন্ধ করে বসে থাকে গুল। মোতি ডাকে, গোঁসাই ঘুমালে?
–না আনন্দির মা। এখন কি ঘুমের সময়?
–প্রদীপ জ্বালনি কেন?
–তেল বাঁচানোর জন্য। নিপাট জবাব গুলের।
বুক ফেটে যায় মোতির। কী মানুষ কী হয়েছে। মোতির বিচারে রাজা হলেও যে কম হতো, আজ সে কথা বলে ভিখারির মতো। কিন্তু প্রকাশ করে না কোনো দুর্বলতা। বলে, জানো ঠাকুর, আজ এক বাঙালি মহিলার সঙ্গে দেখা হলো। মন্দিরে সে অনেক টাকা দান করেছে আজ। আমি আর আনন্দি পেয়েছি পাঁচ টাকা করে।
–মিছার মা, কাল থেকে আমি জঙ্গলে কাঠ কাটতে বের হব।
–দোহাই লাগে ঠাকুর, আঁতকে উঠে মোতি বলে, তাহলে আমি মাথা ঠুকে মরব।
–তুমিই বল, এই ভেকধারী জীবন কি কোনো জীবন হলো?
–আর তো কটা দিন। এ রাজ্যটা ছেড়ে আগে যাই। তারপর দেখা যাবে।
–তোমার কষ্ট আর আমি সইতে পারি না মিছার মা। আর ছেলেটার কষ্টই কি কম?
–আমার কোনো কষ্ট নেই বাবা। মার সঙ্গে মন্দিরের প্রসাদ আনতে আমার খুব ভালো লাগে। দেখ, আজ কত্ত প্রসাদ পেয়েছি।
শালপাতা আর কলাপাতায় জড়াজড়ি করে আনা খাবারগুলো সে গুলকে দেখায়।
–তুই পেট ভরে খা বাবা। গুলের দু'চোখ থেকে

নদী ঝরে।
ভয়ানক ঝাপড়া বটগাছের ছায়া মিশমিশে আঁধার তৈরি করেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। প্রথম রাতে ঘুমিয়ে আছে। মধ্যরাতে উঠে আসবে আকাশে। শরতের মেঘমুক্ত আকাশে ঝলমল করবে। গাছে দুটো হুতোম প্যাঁচা আছে। চাঁদের আলো দেখলেই ওরা ডেকে ওঠে, হু দু দু দু হু দু দু দু। ভাবখানা এই, এমন গাঢ় আঁধার রাতে চাঁদের বেলেল্লাপনা কি ভালো লাগে? কী জ্বালা! কী জ্বালা।
মোতি আনন্দিকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুম নেই গুলের চোখে। এক একবার মনে হয়, এদের ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? কেন যাবে? তার আর উত্তর খুঁজে পায় না। গদর যুদ্ধের পরাজিত সৈনিকের পলাতক জীবন। এর চেয়ে আর কী ভালো হবে? মাঝে মাঝে মনে হয়, বিষ খাবে। ঠিক তখনই বুকের ভেতর ঝড় ওঠে উথালপাথাল। ভাবে, মোতির কী হবে? কী হবে তার বাচ্চাটার? কী আশ্চর্য জীবন তার। বেঁচে সুখ নেই। পালাতে পারে না। মরতে চাইলে সহস্র চিন্তা।
ধীরে ধীরে উঠে বসে গুল। চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে মোতির মুখে। কী অসাধারণ সরল একটা মুখ। তার মতো এক অধম মানুষের সঙ্গে ভেলা ভাসিয়েছে অকূল দরিয়ায়। বেশ ঠাণ্ডা বাইরে। মোতির পরনে পাতলা একটা শাড়ি। পেঁচিয়ে গা ঢেকেছে। আসন্ন মায়ের ভরভরন্ত শরীর তাতে পুরো ঢাকা যায়নি। উপচে পড়ে দেহের ঢেউ। তার অন্য আধছেঁড়া শাড়ি ভাঁজ করে আনন্দির গায়ে দিয়েছে। আহা! কী মায়া মেয়েটার মনে! ভালোবাসায় আবেগে বেসামাল হয়ে পড়ে গুল। নিজের গায়ের ফতুয়া খুলে জড়িয়ে দিতে চায় মোতির দেহ। ঘুম ভেঙে যায় মোতির। দেখে, তার রাজা বসে আছে। আদুল গায়ে।
মোতি কিছু বলার আগেই গুল ফিসফিস করে বলে, কোনো কথা নয় জান। ঘুমোও। তাই কি আর হয়? মোতি কি এমন বিধান মেনে নেয়ার মেয়ে? রফা একটা করতেই হয়। বুকে বুক দিয়ে একজন মানুষ হয়ে যায় তারা। কিছু নেই, তবু কি উছলে পড়া সুখ। তেলের প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। কিন্তু চাঁদের আলোর বন্যা কে রোধ করবে?
গুল বলে, জান, কী হবে এরপর, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।
–যে ভেবে পাবে, সে তো চাঁদের ওপরের আসমানে বসে আছে ঠাকুর। তুমি কিছু ভেব না।
–আমরা তো বড় মানুষ। দু'দিন কম খেয়ে বা না খেয়ে বাঁচতে পারব। কিন্তু বাচ্চাটা বাঁচবে কিভাবে?
–বাচ্চার জন্য তোমার দুধেল গাই আছে না?
–মশকরা করো না মিছার মা।
–মশকরা নয় ঠাকুর। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ। দেখই না।
–ওতে হবে তো? গুল মোতির বুকে বার বার হাত দিয়ে দেখল দুধেল গাইকে। বলল, শক্ত কেন?
–সেই যে বলেছিলাম না, তুমি একটা মেড়া?
–মেড়ার কী হলো এতে?
–তোমার বাচ্চার জন্য দুধ জমছে যে! শক্ত তো হবেই। মাঝে মাঝে একটু দুধ গড়িয়ে পড়ে আজকাল। আমি জানি, এটাই ভালো। হয়তো একটু আগেই আসবে বাচ্চাটা।
–একটু দেখাবে আমাকে দুধেল গাইর শরীর? কলকল করে ওঠে মোতি। বলে কী মানুষটা? চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে মোতির গায়। অপলক দৃষ্টিতে গুল দেখে তার একান্ত নিজের রমণীকে। এমন ঢেউভাঙা দেহ গুল দেখেনি কখনো। স্বপ্নেও ভাবেনি এমন পাওয়ার কথা। আস্তে আস্তে মোতির শাড়ির বাঁধন খোলে গুল। বাচ্চাটা এমন টুঁশাটুঁশি করছে, সাদা চোখেই দেখা যায়। তার কোলের মধ্যে আদুল গায়ে তারই রমণী। এর সবটুকুই তার। মোতি কোনো বাধা দেয় না। এ যে তারই মানুষ। ওর সবটুকুই তার। গুলের কাছে তার কোনো লজ্জা নেই। আদিম তো রক্তেই আছে। সে কি আর কাউকে ছেড়ে কথা কয়?
নাকি মানে কিছু?
পরদিন মন্দিরের দুয়ারে তার ওপরওয়ালা চোখ দিয়ে বসেছিল। কখন মোতি আসবে। সেটাই ছিল প্রতীক্ষা।
দানশীল বাঙালি মহিলা এলো মন্দিরে। ষাটোর্ধ্ব বয়স। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। সিঁথিতে সিঁদুর লেপটে দেয়া। পাট ভাঙা সাদা সিল্কের শাড়ি। মাথায় আঁচল তোলা। গায়ে একটা শাল। মা হব হব ভাবের মোতিকে দেখে মায়া হয় মহিলার। বলে, তুমি কে গো? নতুন দেখছি এ মন্দিরে?
–হ্যাঁ মাইজি, আমি এখানে নতুন এসেছি।
–কোথায় থাক বাছা?
–ওই বটগাছের কোটরে।
–সে কী? তোমার শরীরের এ অবস্থায় ওখানে থাক কেন? কেউ নেই তোমার?
–আছে মাইজি। স্বামী আছে, ছেলে আছে।
–কী করে তোমার স্বামী?
–ও সাধু হয়ে গেছে। কিছু করে না। শুধু ধ্যান করে।
–তোমার চলে কী করে?
–মন্দিরের পেসাদ খেয়ে মাইজি।
–সে তো শুধু সন্ধেবেলা? দিনে কী খাবে?
–মাথা নিচু করে মোতি। টপটপ করে চোখ থেকে পানি ঝরে পড়ে।
–তার মানে দিনে কিছু খাও না? বাচ্চাটা মরে যাবে তো বাছা। মতির কান্না বেড়ে যায়।
–ঘরের কাজ পেলে করবে? মহিলা আবার প্রশ্ন করে।
–করব মাইজি।
–কী কী কাজ পার?
–ঘর-গেরস্থির তামাম কাজই পারি।
–তাহলে করছ না কেন মেয়ে? ভগবান, এ যে দেখি আজব মেয়ে।
–কোথায় পাব কাজ মাইজি? চোখের পানি মোছে মোতি।
–আমার বাড়িতে কাজ করবে?
–জরুর করব মাইজি।
–মোতি রানী বাহাদুর। স্বামীর নাম রাজা গুলাব বাহাদুর। ছেলের নাম আনন্দি বাহাদুর। হেসে ফেলে মহিলা। তা বাহাদুরের দেশ কোথায়?
–আসল দেশ রাজপুতানায়। লেকিন ওর জন্ম বর্ধমানে। ওখানেই বড় হয়েছে।
–আর তোমার দেশ?
–বর্ধমানে। চিকনকালা গ্রামে।
–তা দেশ ভুঁই ছেড়ে এই পাহাড়ের দেশে এলে কেন?
–রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা হলো।
–দর্গা! দুর্গা! এমন মানুষও আছে সংসারে।
–ও খুব ভালো মানুষ মাইজি। আমাকে বহুত পেয়ার করে।
–সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এমন মেয়েটার কী দুর্দশা করেছে!
–না মাইজি, রাজার কসুর নেই। এ আমারই বদনসিব মাইজি।
–তোমার কথায় অনেক মুসলমানি শব্দ আছে। শিখলে কোথায়?
–আমার শাশুড়ির কাছে। লখনৌতে থাকত।
–তোমাদের দেখি জগাখিচুড়ি সব। মনে মনে বলে, আমার মতোই কতকটা।
–সবই নসিব মাইজি।
–তবে তোমার মুখের কথা খুব সুন্দর মোতি। চল, আমার বাড়ি দেখে আসবে। কাল সকালে এসো। কথাবার্তা হবে।
পরদিন সকালে মোতি গেল মাইজির বাড়ি। মাইজির নাম যমুনা। স্বামীর নাম শিবরাজ জং। ভালোবেসে বিয়ে করে তারা। যমুনা কলকাতার এক জাঁদরেল ব্রাহ্মণের মেয়ে। শিবরাজ উড়িষ্যার মানুষ। আসানসোল কোলিয়ারিতে কাজ করত। কলকাতায় তার ভাইয়ের ছোট ব্যবসা ছিল। সেই সুবাদে দেখা। মা-বাবা মেনে নিল না বিয়েটা। অগত্যা দেশ ছেড়ে যমুনা স্বামীর হাত ধরে চলে আসে এখানে। স্বামী শিব জং চা বাগানে কাজ নিয়েছিল। সেই থেকে তাদের এ অঞ্চলে থাকা। প্রায় চল্লিশ বছর তো হলোই। পাঁচ ছেলেমেয়ের কেউই বাঁচেনি। আঁতুড়েই মারা যায় সবাই। নিঃসন্তান দম্পতি টোনাটুনির মতো বাস করে। দুই জোড়া ছাগল আর একটা ময়না আছে পোষ্য। আগে ছাগল-গরু অনেক ছিল। ভেড়াও ছিল। কমতে কমতে এই দাঁড়িয়েছে। বেশ বড় বাড়ি। পশুদের ঘর এবং তাদের দেখাশোনার জন্য উঠোনের পশ্চিম কোনায় দুটো ঘর। সবই পড়ে আছে। খাঁ খাঁ করে বাড়ি। শিব জং হাঁপানিতে ভুগছে। তাই সহজে বের হয় না বাড়ি থেকে। বাড়ির প্রশস্ত উঠোনে রোদ এলে সেখানে এসে বসে। দুটো চেয়ার এবং একটা ছোট টেবিল পাতাই থাকে। দুজনে বসে কখনো চা খায় এখানে। চা বাগানের এক কুলি মেয়ে এক বেলা কাজ করে দিত। এখন সে অসুস্থ। এ বয়সে যমুনা মাইজি আর পেরে ওঠে না। সে দিনে-রাতের একজন কাজের লোক খুঁজছিল। মোতিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। কতকাল

থেকেই তো ছাগল-গরু আর ময়নাদের সঙ্গে বসবাস। মেয়েটার বাচ্চা হলে মানুষের কান্না শোনা যাবে আবার বাড়িতে। নিজেদের কেউ তো রইল না। বিধাতার এমন বিধান যে কেন? বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বের হয় যমুনার। তবে কি মা-বাবার অভিশাপ? থাক। ভেবে কাজ নেই। মোতি কাজ পেল। থাকার জায়গা পেল। ছাগল আর ছাগলের বাচ্চা পেয়ে খুশি হলো যারপরনাই। গুল প্রথমে এমন ব্যবস্থাপনায় নাখোশ ছিল। কিন্তু উপায়ও ছিল না। মোতি অন্তত একটা ভালো আশ্রয়ে বাচ্চার মা হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, একেই খুব বড় ভাগ্য বলে মেনে নিল। আসলে মোতির কথাই ঠিক। মানুষ ভেবে কিছুই করতে পারে না। ওই ওপরওয়ালা দাবার ঘুঁটিতে চাল না দিলে থমকে থাকে সব। কেউ নড়ে না। কিছু হয় না কারো।

যমুনা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। এতই লক্ষ্মী মেয়ে মোতি, যা ভাবা যায়নি। রান্না-বাড়া, ঝাড়া-মোছা, পশু-পাখির দেখাশোনা, যমুনা মাইজির পায়ে রাতে শর্ষের তেল মালিশ করা, শিব জং বাবার পিঠে হেরিকেন জ্বালিয়ে সেঁক দেয়া– সব নিপুণ হাতে করে যায়। বলতে হয় না। দেখতে হয় না। বাড়িটার শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। বাড়ি হয়ে উঠেছে সত্যিকার বাড়ি।

অবসর সময়ে যমুনা তাকে উলকাঁটার কাজ শেখায়। কী বুদ্ধি মোতির। চটপট শিখে ফেলেছে। যমুনা মাইজির পুরনো উল দিয়ে ছোট একটা সোয়েটারও বুনে ফেলে। যমুনা অবাক হয় দেখে।

গুল সন্ধ্যে না হলে বাড়ি থেকে বের হয় না। এ অঞ্চলে সাহেব-সুবোর চলাচল বেশি দেখে সে আতঙ্কিত মনে মনে। মোতি বুঝতে পারে বিষয়টা। কিন্তু করার যে কিছু নেই। কোথায় যাবে তারা? বদমায়েশ ইংরেজদের পাল যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কত জায়গায়, কে তার হিসাব রাখে? গদর শেষ হলে কী হবে, ওদের বদামি তো শেষ হয় না!

ওপরওয়ালার হিসাবে তো কথা নেই। তাই দশম মাসে পুরো দিন পার হওয়ার পর ঘোর শীতকালে মোতির কোলে এলো সুবাস বাহাদুর। ছেলে তো নয়, আস্ত একটা বড় গোলাপফুল। চোখ জুড়িয়ে যায় ছেলে দেখলে। মনে হয় তুলতুলে টুকটুকে গা থেকে সুবাস বেরোবে এখনই।

যমুনা মাইজি ব্যাকুল-ব্যস্ত সব সময়। ঘরের কোনায় কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে মোতির যত্ন-আত্তি এবং সুবাস বাহাদুরের দেখাশোনায় কাটে সারাটা দিন। বাচ্চাটা কাঁদলে তার মনে আনন্দ ধরে না। কোলে নিয়ে দোলাবে, ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করবে, মায়ের কোলে দেবে দুধ খাওয়ার জন্য।

মোতি অবাক হয়। এদের কি জাতপাত নেই? হাজার হলেও বামুনের মেয়ে। সবই কি ভুলে গেছে? আর ভুলে গেছে বলেই হয়তো এমন খাঁটি মানুষ হতে পেরেছে। সেও তো ভুলেছে জাতপাত। দিব্যি আছে এখানে। কেন যে মানুষ জাতপাতের কথা বলে? ভালোবাসাই সব জীবনে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসলে সবই সোনা।

মোতি বলে মাইজি, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কাল থেকে আমি সব কাজই করব।

–বলিস কী বাছা? চার দিনের বাচ্চা ফেলে তুই করবি কাজ?

–হ্যাঁ মাইজি। গুল তো ঘরেই থাকে। ও দেখবে বাচ্চাকে। বাবা হলে কাজ করতে হবে না?

খুশিতে চকবক করে ওঠে তার ডাগর দুটি চোখ। ঠিক আছে মোতি। দুটো সপ্তা না গেলে তোকে কোনো কাজ করতে দেব না। তোর শিব জং বাবাও এ কথা বলেছে। বুঝেছিস তো?

কোথা থেকে কী হলো, কেউ জানে না। এমন একটা আশ্রয়ের কথা মোতি বা গুল স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এখন অন্য কোথাও যেতে চাইলেও সম্ভব নয়। বর্ধমানের তুলনায় বড্ড শীত এখানে। সকালে রাতে হাড়কাঁপানো শীত। গুলের কাছেই মোতি শুনেছে, নেপালে খুব শীত। তবুও গুলের একান্ত ইচ্ছা নেপালে যাওয়ার। কী আছে সেখানে তাদের কপালে কে জানে?

আনন্দ এখন শিব জং বাবার হাতের লাঠি। তাকে ছাড়া জং বাবা একটুও চলতে পারে না। জং বাবা তাকে বলেছে, সে যেন কোনো দিন তাকে ছেড়ে না যায়। জং বাবাকে আনন্দি ডাকে দাদু বলে। যমুনা মাইজিকে বলে দাদুমা। দাদু তার মোটা মোটা পুরনো গরম কাপড় তাকে পরতে দেয়। দুই দিন আগে জুতো-মোজা কিনে দিয়েছে। খুব খুশি আনন্দি।

গুলও খুশি। কিন্তু সে যেন কেমন গুটিয়েই থাকে। শুধু সুবাসের কাছে এলে তার আনন্দ উপচে পড়ে। পাশে আনন্দি থাকলে সুবাসের বিপদ বাড়ে। কোলে নিতে চায় দুজনই। সুবাস বেচারা বোঝে না আদরের আদিখ্যেতা। সে গলা ফাটিয়ে জানায় প্রতিবাদ। সঙ্গে সঙ্গে মাইজির গলা, কী হলোরে মোতি?

–দাদু সোনা কাঁদে কেন?

সংসারের এই সুখ কেউ পায়নি কোনো দিন। মোতির বিয়ে হলেও স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করা হয়নি। গুলের তো ঘোড়াবরদারের জীবন ছিল। কিভাবে সে দিল্লিতে এসেছিল, সে কথা মনেই পড়েনি। কোন দিন সংসার হবে, জানেনি বা ভাবেনি তাও। যমুনা মাইজির সব ছিল। তবু সংসারে স্বামী-সন্তানের কোলাহলময় সুখ তার হয়নি। জন্মের এতিম আনন্দিই কি ভেবেছিল যে, সে দাদু, দাদুমা, গুল বাবা, মোতি মা এবং পুতুল সোনা ভাইকে নিয়ে এমন গুলজার একটা জীবন পাবে?

ছাগল আর মেষের বাহিনী হয়ে গেছে। আর একদার শক্ত জোয়ান এক হাজার আর্শসেনার মনসবদার গুল হয়েছে তাদের খবরদার।

অদৃষ্টের পরিহারে গুল হাসে। মোতি কাঁদে। মানুষটা তার রাজা হলেই মানাত ভালো। কিন্তু ওই ওপরওয়ালা এমন পেঁচিয়ে চাল দিয়েছে যে, বাঁধা পড়ে গেছে গুল জীবনের কাছে। দুই বছরের শেষ দিকে আরো একবার মা হয়েছে মোতি। রাজকন্যার মতো সন্তান চাঁদনি। নাম রেখেছে যমুনা মাইজি। তিনটে সন্তান আর মোতির প্রগাঢ় ভালোবাসা ছেড়ে মরতেও পারবে না সে এখন।

যমুনা মা আর শিব জং বাবা পশুবাহিনী দান করে দিয়েছে গুলকে। মাঝে মাঝে ছাগল-মেষ বিক্রি করে টাকা জমায় গুল। স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য এখান থেকে তাকে চলে যেতেই হবে। সে জন্য টাকা চাই। তবে আগামী বছর সে একাই প্রথমবার যাবে নেপালে। কাঠমান্ডু, পোখারা, অন্নপূর্ণা গিরি শ্রেণির উত্তরে মাছাপুছা উপত্যকা, ইত্যাদি জায়গা অজ্ঞাতবাসের জন্য কেমন তা দেখে না এলেই চলছে না।

মোতির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার জো নেই। কান্নায় নদী হয়ে যায় ও। মা হয়ে ও খুব কাঁদতে শিখেছে। বাচ্চা কাঁদলে সেও কাঁদে। বাচ্চা হাসলে সেও হাসে। তার ভালোবাসায় আধখানা বলে কিছু নেই। যাকে যা দেবে, সবটুকু দেবে। গুল তার জীবন। তাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। তার কথা, বাঁচলে সবাই বাঁচব, মরলে সবাই মরব, গুল যুক্তি দেখায়, সে তো কখনো হয় না মিছার মা।

–কে বলেছে হয় না?

–তোমার ওপরওয়ালা বড্ড হিসাবি যে!

–অত কথা আমি জানি না। শুনতেও চাই না।

–চিকনকালা গ্রামে বেড়াতে যাবে?

চমকে ওঠে মোতি। বলে, তার মানে কি গোঁসাই?

–আমি আর পারছি না মিছার মা। আমার সাতাশ বছরের শক্তমক্ত শরীর, উদ্ধত যৌবন, বাঁধভাঙা প্রতিশোধের আগুন, দেশের কোনো কাজে লাগবে না, এটা সহ্য হয় কিভাবে বল?

–কে বলেছে কাজে লাগছে না? আমাদের সোনার সংসার হয়েছে, সে কি এমনি? তুমি কি ভাবছ, আবার গদরের আয়োজন হবে?

–তার বিন্দুমাত্র আশা নেই। দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন যারা দেখত, তাদের সবই শেষ হয়ে গেছে নিষ্ঠুর ঘাতক ইংরেজদের ছোবলে।

–তাহলে কোথায় যাবে? কেন যাবে ঠাকুর?

–জানি না। আমি জানি না মিছার মা। ছটফট করে ওঠে গুল।

–আমাদের সবাইকে ফেলে যেতে পারবে?

–তাও জানি না জান। আর প্রশ্ন করো না।

কী এক অজানা আকর্ষণে গুল ছুটে যেতে চায় সব বাঁধন ফেলে। সেটা যে কী, তা বোঝে না গুলও। নির্ঘুম রাত কেটে যায় কখনো। মোতি তো নদী। কেঁদে অশ্রুর স্রোতে ভাসে সারা রাত। কখনো ভোরের দিকে শরীরের তারে বেজে ওঠে মোহন সুর। মোহনা হয়ে যায় ভালোবাসাভরা দুটি দেহ। হারিয়ে যায় দুজন সময়ের দহে।

দিন তো যাবেই। অবাধ্য দুরন্ত সূর্যটা সকাল হলে নেচে নেচে আকাশের গায়ে উঠবে। সন্ধ্যে হলে এলিয়ে পড়ে ডুব দেবে রহস্যে ভরা আঁধার রাতের গভীরে। কী আশ্চর্য বিশ্বপ্রকৃতি। তার কিছুই এসে যায় না।

ফুল ফোটে। পাতা ঝরে। পাখি গায়। গাছের গা

ভরে ফল ঝুমঝুম করে। পশু-পাখি ডিম দেয়, বাচ্চা দেয়। মানুষও কি কম যায়? ঘরে ঘরে বাচ্চা জন্মে, মরেও। গুলও বাবা হলো তৃতীয়বার। এবারো কন্যা। নাম মোহর। বাবার দেয়া নাম।

মোতির সংসার বড় হয়েছে। আনন্দিকে নিয়ে চার ছেলে মেয়ে এবং পনরো জোড়া ছাগল-ভেড়া নিয়ে গুলের রীতিমতো গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হলো না। নিশ্চিন্ত আশ্রয় তাকে স্বস্তি দিল না।

দিশাহারা বোধ করে মোতি। এতকাল সে জানত, দুঃখ-কষ্ট সংগ্রাম মানুষকে দাবড়ায় সাফল্যের দিকে। কিন্তু সুখ-স্বস্তি-নিরাপত্তাও যে মানুষকে পতনের দিকে দাবড়ায়, তা জানা ছিল না মোতির। গুলের কষ্টটা সে বুঝতে চেষ্টা করে। গদর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানির চেয়ে ছদ্মবেশে থাকার হীনতায় সে অস্থির হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু কিছু যে করার নেই, এটা কেন বোঝে না গুল?

যমুনা মাইজি আর শিব জং বাবা দুজনেরই বয়স বেড়েছে আরও ছয় বছর। জং বাবার শরীর বেশ খারাপ। গত শীতে হাঁপানি এত বাড়ল যে মনো হলো আর বাঁচানো যাবে না। যমুনা মাইজি আর মোতির অক্লান্ত সেবাযত্নে ফিরে গেল যম।

ডাক্তারও ছিল ধন্বন্তরী। খাস ইংরেজ ডাক্তার। গুলের কাছে যম হয়ে দেখা দিল এই ডাক্তার। এ যে সেই ডাক্তার! তার নামও তো হেস্টিংস ছিল। গুলের বাহিনীর এক সৈন্য দুর্ঘটনায় পড়েছিল।

সবাই বলল, মরে গেছে। হেস্টিংস বলল, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সৈনিকের বুকে এমনভাবে চাপ দিতে শুরু করল, যেন ভেঙেই ফেলবে বুকের খাঁচা। মিনিট দুই পরই মৃত সৈনিক শ্বাস নিল। চোখ মেলল। তবে বুকের একটা হাড় ভেঙে গেছিল। সেটা মেরামতও হলো হাসপাতালের চিকিৎসায়। সবটুকু দেখেছে গুল। তাকে চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়।

এই ডাক্তারকে ডাকতে হলো মোহরের জন্য। এগারো মাসের মোহর। তুলোর মতো শরীর। জ্বরে চোখমুখ লাল। খায় না। চোখ খোলে না। ভাঙা ভাঙা আর্তস্বরে মাঝে মাঝে কাঁদে। কোথায় যে তার কষ্ট বোঝা যায় না। মোতিও কাঁদছে সারাক্ষণ।

জং বাবা ডাক্তার হেস্টিংসকে ডাকলেন। দেখেশুনে ডাক্তার বলল, হাম উঠছে ওর। কোনো ওষুধ তো দেয়া যাবে না। উঠে যাক সবটুকু। ভয়ের কিছু নেই। তবে ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগে ভালো হলো মোহর। কে বলবে, অসুখ হয়েছিল ওর? খলখল করে হাসে মায়ের মতো। খুব মজা পায় গুল তা দেখে।

মোতি বলে, ডাক্তারবাবু বাড্ডা ভালো গোঁসাই।

–কী যে বল, ওরা কখনো ভালো হয়?

–এ তোমার রাগের কথা গো!

মোতির কথাবার্তা আরো সুন্দর হয়েছে যমুনা মাইজির কাছে থেকে। বলে, ইংরেজদের ওপর তোমার রাগ এখনো যায়নি?

–কী করে যাবে মোতি? গুলও এখন খুব ভালো বাংলা বলে। তার মতে, ওরা এ দেশের শত্রু। আমাদের কোনো উপকার হতেই পারে না ওদের দারা।

–আমাদের মোহর যে ভালো হয়ে উঠল, সেটার প্রশংসা করবে না?

–নিশ্চয় করব। এটা ওর পেশা। রোগী দেখে। টাকা পায়। আর...

–আর কী বল? থামলে কেন?

–নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি করে। খুঁজে বেড়ায় গদর যুদ্ধের পরাজিত সৈনিকদের।

–তোমার যেমন কথা গোঁসাই। হাসে মোতি।

–তোমাকে বলা হয়নি, গত সপ্তায় দুজন ছদ্মবেশীকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। এখনতক লাপাত্তা।

বজ্রপাত হলে যেমন মানুষ চমকে ওঠে, তেমনি

চমকে উঠল মোতি। মুখে একটা অস্ফুট আর্তনাদ। বলে, কার কাছে শুনলে এমন খবর গোঁসাই?

–এসব খবর হাওয়ায় ওড়ে মিছার মা। তাই ভাবছি...

–কী ভাবছ? চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করে মোতি।

–বোধহয় এবার আমাকে এই আস্তানা ছেড়ে পালাতেই হবে।

–হায়রে আমার কপাল! কী করব এখন আমি?

–সত্যি কপাল মোতি। যা বলি, মন দিয়ে শোনো। প্রথমে আমি একা যাই কাঠমান্ডু। এই ধর তিন মাস পর আবার আসব। অন্তত দেখেশুনে তো আসি!

মোতি ততক্ষণে নদী হয়ে গেছে। বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। চারটে বাচ্চা নিয়ে সে বাঁচবে কী করে গুলকে ছেড়ে?

–আনন্দি ভেড়া-ছাগলের পাল দেখেশুনে রাখতে পারবে। তুমি ভেব না মোতি। ঠিক তিন মাস পর আমি তোমার কাছে আসব। বোঝাতে চেষ্টা করে গুল।

–আমি গুনব কেমন করে নব্বই দিন? চোখ মোছে মোতি।

–চাঁদের হিসেবে। ধর আর তিন দিন পর পূর্ণিমা। তিনটে পূর্ণিমা তো গুনতে পারবে?

–কোথায় থাকবে, কী খাবে, এসব তো বললে না গোঁসাই।

–তুমি একটা পাগল মিছার মা। পথে বের হলে কেউ কি না খেয়ে থাকে? তোমার ওপরওয়ালা আছে না? তা ছাড়া, আমি তো কিছু টাকাকড়িও সঙ্গে নেব। ঠিক কি না বল?

–আমার ওপরওয়ালা অন্ধ হয়ে গেছে গোঁসাই। না হলে ঠিক দেখতে পেত, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না।

–কেঁদ না জান। মন শক্ত কর। একবার যদি ধরা পড়ি খচ্চর ইংরেজদের হাতে, তাহলে নির্ঘাত ফাঁসি।

–না না না, ওসব কথা বলো না গো। প্রাণটা বের হয়ে যাবে এখনই। এমন সময় মোহর ডেকে ওঠে, বা-বা-বা। মানে, বাবা। হাত পাতে গুল। ঝাঁপিয়ে বাবার কোলে আসে মোহর। সঙ্গে ভুবন ভোলানো হাসি। যেন বলতে চায়, ভয় কী বাবা? আমি ব্যস্ত রাখব মাকে।

তিন

তৃতীয় পূর্ণিমার আগের দিন ফিরে এলো গুল। যমুনা মাইজি এবং জং বাবা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। তাদের শরীরের যে অবস্থা! গুল আর মোতি ছাড়া তারা বাঁচার কথা ভাবতেই পারে না। তবে একটা কথা তারা বুঝতে পারে না যে, গুল কেন নেপালে গেল? কী করল সেখানে তিনটে মাস?

ইংরেজের বাগানে কাজ করেছে জং বাবা। তার রুটিরুজির দাতা ইংরেজ তার কাছে শুধু প্রভু নয়, মহা ভালোমানুষ। আর গুলের চোখে ইংরেজ হলো মহা শয়তান। এই একটা কারণে গুল বলতেই পারেনি যে, এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর সশস্ত্র সংগ্রামে সেও জড়িত ছিল ঘনিষ্ঠভাবে। বলতে পারেনি যে সে গদর যুদ্ধের পলাতক সৈনিক।

মোতি লেখাপড়া না জানলেও খুব বুদ্ধি তার। এসব সূক্ষ্ম বিষয় সে বেশ বোঝে। গুল শিক্ষিত মানুষ। মোতিকে নিয়ে তার কোনো বিপদ নেই। বরং স্বস্তি আছে। হিন্দু পরিবারে মানিয়ে নিয়েছে মোতি আচারে আচরণে। কথায় কথায় 'ও হরি' এবং 'দুর্গা দুর্গা' বলাটাও রপ্ত করেছে।

দেখাদেখি বাচ্চারাও বলে। আনন্দির সমস্যা নেই। সে তো শিবু মোড়লের ছেলে। হিন্দুয়ানি চালচলন, বোলচাল তার দেখা এবং শোনা। মোতি আর গুল কোনো দিন নিজেদের ধর্মের ঝাঁপি খোলেনি। কাজেই আনন্দি জানতে পারেনি কিছুই।

ছাগল-মেষের খবরদারির কাজটা এখন আনন্দি করতে পারে। পাহাড়ের ঢালে ঘুরে বেড়াতে ভালোও লাগে তার।

রাতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেলে মোতি প্রশ্ন করে,

কেমন দেখলে সব গোঁসাই?
–মাচ্ছাপুচ্ছা এলাকাটা ভালো লেগেছে। কিন্তু ওই শালা ইংরেজদের আস্তানা আছে ওখানে। যেন জগতের সব ভালো জায়গা ওদের বাপের কেনা। যখন খুশি যাবে।
–আয়রোজগারের কোনো পথ পেলে ওখানে?
–একেবারেই না।
–তাহলে?
–জানি না জান। মাথায় কিছু আসে না আর।

শীতকালটা ভালোই কাটল। বসন্তের প্রাক্কালে জং বাবার এমন ঠাণ্ডা লাগল যে শক্ত নিউমোনিয়া হয়ে গেল। ডাক্তার ওষুধপথ্য সেবা কিছুই কাজে লাগল না। জং বাবাকে নিয়ে তবে ছাড়ল যমরাজ।
সংসারে খুব একটা উলটপালট কিছু হলো না। চুপচাপ বয়সী মানুষটা কী অবাক পদ্ধতিতে নিয়ে গেল ভরা সংসারের যাবতীয় কোলাহল। কেউ কাঁদে না। কেউ হাসে না। বাচ্চারা শোরগোল তুলে ছোটাছুটি করে না। যমুনা মা বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। চরম অবসাদ নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে মরার মতো। সংসারের হাল আরো শক্ত করে ধরে মোতি।
শ্রাদ্ধ শান্তির অনুষ্ঠান শেষ হলো। মোতি বলল, মাইজি, এবার একটু শক্ত হও। কথা বল আমাদের সঙ্গে।
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে যমুনা। কথা বলে না যেন জন্মবোবা। মোহর এসে যমুনা দাদুর হাত ধরে টান দেয়। বলে, দাদুমা, আমার ঘরে চল। আমার পুতুলের জন্মদিন আজ। এসো, এসো না!
অতটুকু শিশুর কি অবিনাশী প্রাণশক্তি! যমুনা মায়ের চোখের তারা নড়ল। চাইল সে মোহরের দিকে। ঝটিতে ওকে বুকের মধ্যে টেনে হুহু করে কাঁদে যমুনা। গোলে গেল পাষাণ। মোতিও বাঁচল কাঁদতে পেরে।
জং বাবার জন্য কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারো। ঘরেই প্রায় থাকত গুটিসুটি মেরে। কিন্তু মনে হচ্ছে, বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।
পরিবারের লোকসংখ্যা কমে গেছে এক্কেবারে। মোতির বুদ্ধি আছে। হৃদয় আছে। ভাষা আছে। সেও যেন শক্ত কিছুর সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ব্যথায়।
বুদ্ধিটা যমুনা মাইজির। একদিন মোতিকে ডেকে বলল, ভাবছি, সবাই মিলে কলকাতায় চলে যাব। কী বলিস তুই?
আকাশ থেকে পড়ে মোতি। কলকাতা যে অনেক বড় শহর। অনেক লোক। অনেক ইংরেজ থাকে ওই শহরে। গুলের কাছেই এসব কথা শুনেছে সে। ভেজা ভেজা কণ্ঠে মোতি বলে, এখানকার ঘরগৃহস্থির কী হবে মাইজি?
সব বেচে দিয়ে চলে যাব। তোর ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। লেখাপড়া শেখাতে হবে না?
–এখানে ইশকুল নেই মা?
–কী যে বলিস পাগলি? কলকাতার তুলনায় ঘুম তো একটা গ্রাম। এখানে থাকলে তোর ছেলেমেয়ে রাখালগিরি ছাড়া আর কী করবে? বল? এটা কি কোনো জীবন হলো?
–জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগে মা।
–কলকাতা আরো ভালো লাগবে বাছা! শেষ জীবনে তোদের জন্য কিছু করে যেতে চাই।
–তুমিই তো বাঁচিয়ে রেখেছ মা। নইলে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে। মোতির চোখে টলমল করে অশ্রুবিন্দু।
–আমারও সময় শেষ হয়ে এসেছে। তড়িঘড়ি না করলে তোরা পথে বসবি মোতি। প্রতিবেশীরাই এ বাড়ি থেকে উৎখাত করবে তোদের।
–তোমার জামাইর সঙ্গে কথাটা পাড়ি তবে আজ। সে তো আবার গদরের সেপাই মানুষ। যেমন ভালো, তেমন গোঁ।
–কী বললি মোতি? বাহাদুর সেপাই? বলিসনি তো কোনো দিন?
মোতির মনে হলো, একটা বিকট চিৎকার দিয়ে মাটির নিচে ঢুকে যায়। কী মারাত্মক সর্বনাশা কথা সে বলে ফেলেছে। তবু শেষ রক্ষার চেষ্টায় বলে, ওই গোঁ দেখেই আমি ওকে সেপাই গোঁসাই এসব বলি মা।
–তাই বল। সেপাই হলে আর বেঁধে রাখতে পারতিস? গদরের যুদ্ধে মরে ভূত হয়ে যেত। কী সাহস আর কী দেশঅন্তপ্রাণ ওদের? দেশের মানুষ কত সম্মান করে ওদের!
–তুমি কেমন করে জান মা এসব কথা? বুক দুরু দুরু করে, তবু কথা বলে।
–খবরের কাগজে পড়েছি। তোর জং বাবা এসে গল্প করত। বলত, মুক্তিপাগল ছেলেগুলোকে ইংরেজ বজ্জাতরা গালাগাল না দিয়ে কথা বলে না। আরো বলত, ওদের চাকরি না করলে পাল্টা গাল দিতাম।
চকচক করে ওঠে মোতির চোখ। জং বাবা তাহলে গদরের সেপাইদের পক্ষের লোক ছিল? বলে, গদরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেক সেপাই পালিয়ে গেছে, তাই না মা?
–হ্যাঁ। জং বলত, একটাকেও যদি পেতাম তাহলে ঘরে এনে দুধকলা দিয়ে পুষতাম। আহা! ওরাই বাতি জ্বালাতে চেয়েছিল দেশে। গদরের প্রতিটি সেপাই ছিল এক একটা বাতিঘর।
–মোতির বুকটা বুঝি ফেটেই যাবে আনন্দে। একটু সামলে নিয়ে বলে, ফেরারি সেপাইগুলো কোথায় গেল মা?
–সবাই কি আর পালাতে পেরেছে? অমানুষ ইংরেজরা ধরতে পারলেই গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতো। তখনকার ইংরেজ শাসকরা কি পশু ছিলো বল?
মোতির মনে হচ্ছে, সে একজন রানি। গদরের এক বাতিঘর তারই প্রিয় মানুষ। তার স্বামী। তার সন্তানদের বাবা। এই ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে বাতিঘরের ইতিহাস জানাতে হবে। গদর যুদ্ধের পরাজয়কে ডিঙিয়ে যেতে হবে ওদের। প্রতিশোধ নিতে হবে অপমানের। পিতার বাতিঘর কাঁধে নিতে হবে। স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যায় মোতি। শাসক-শোষকের কোনো জাতধর্ম নেই। ওদের ব্যাপক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই গদরের যুদ্ধ। অন্যায়ের প্রতি ন্যায়ের যুদ্ধ।

**

এতো দিনের সংসার তুলে নিয়ে যাওয়া কি আর সহজ কথা? কতকটা উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার মতো। যমুনা মা কোথায় যাবে সেটা জানে, উদ্বাস্তুরা তা জানে না। এইটুকুই পার্থক্য।
কাজের শেষ নেই। গোছাগাছির অন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে মোতির সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় যমুনা মা। কোনো এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে মোতি প্রশ্ন করে, কোলকাতায় তোমার কে কে আছে মা?
-এক সময় সবাই ছিলো। বাবা-মা ভাই সব। কেউ নেই এখন, বাবা মা তো কবেই গেছেন। ভাইও গেছেন গতো বছর।
- তুমি জানলে কী করে গো?
-লোকজন এ মুলুকে আসা-যাওয়া করে। তোর জংবাবাই নানাখবর আনতো। এখন সে পথও বন্ধ।
– আচ্ছা মা, কখনও মা-বাবাকে দেখতে ইচ্ছে হয়নি তোমার?
–কী যে বলিস মোতি? হবে না? শতো শতোবার মনে হয়েছে।
– তা একবারও কেনো যাওনি মা? বাবার ইচ্ছে ছিলো না?
–নারে, জং আসলে দেবদূতের মতো মানুষ ছিলো। ও বলেছে আমাকে যেতে। আমিই যাইনি। আসলে কি জানিস? সম্পর্ক যতো কাছের হয়, অভিমান ততো শক্ত হয়।
–তারচেয়ে রাগই ভালো ছিলো তোমার মাইজি।
–দূর রাগ আবার ভালো হয় নাকি? হাসে যমুনা মা।
–হ্যাঁ গো মা, হ্যাঁ। রাগ হলে ঝগড়া হয়। দিল সাফ হয়ে যায়। মিটে যায় সব।
–বড়ো দামি কথা বলেছিস রে মোতি। ভাগ্যিস শেষ বয়সে তুই এসেছিলি কাছে। জীবনটা ভরিয়ে দিয়েছিস তোরা। সবই মা দুর্গার শিলা।
–আচ্ছা মা, তোমার ঘরের লক্ষি ঠাকুর নিতে হবে তো সঙ্গে, তাই না?
যমুনা বোঝে যে কাজ পড়ে আছে বলে মোতি উসখুস করছে। বলে, হ্যাঁ নিতে হবে। তোর বাবার ঘরে একটা চামড়ার মাঝারি ব্যাগ আছে, ওতে মুড়িয়ে নে।
–আমি নেবো? একটু ইতস্তত ভাব দেখা দেয় মোতির মধ্যে।তুই কি নতুন করে জাতপাত ছোঁয়াছুঁতের কথা ভাবছিস? পাগলি।
–মাফ করো মা, কথা বলিনি। তুমি তো দেবি। সে কি আমি এতো দিন বুঝিনি? যমুনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে মোতি।
–থাক বাছা। আসলে জং-এর ঘর না করলে কোনোদিন হয়তো বুঝতাম না যে ভালোবাসা একটা পরশ পাথর। যে পায়, তার সবটাই সোনা হয়ে যায়। হারাবার ভয় চলে যায়।
–তুমি খুব ভাগ্যবতী গো মাইজি।
–বলছিস মোতি? তাহলে ঘরটা আমাদের শূন্য

রইলো কেনো? জং- কে কতোবার বলেছি, আর একটা বিয়ে করো। সন্তান আসুক তোমার ঘরে। তো বলতো, দুর্গার যদি তেমন ইচ্ছে থাকতো, তাহলে তোমার সন্তানই বাঁচতো।
–আর বলো না মা। দুঃখ করো না আর। ঐ বড়োজন দুক্ষু সুখ বোঝে না। পাগলা গোসাই। বুকটা আমার ফেটে যায় গো। কে বোঝে ওপরওয়ালার খেলা? দিন নেই, রাত নেই, কিসের মধ্যে কী দিয়ে ঘন্ট রাঁধে আকাশের ওপরে বসে। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয়, তেড়ে গিয়ে ঝগড়া করি ঐ তার সাথে। ওপরে হাত তুলে আকাশ দেখায়।
মোতির কথা বলার ধরন দেখে হাসে যমুনা মা। এমন সময় ছুটে আসে মোহর। কোলে যমুনার লক্ষি ঠাকুর। বলে, ঠাকুর নেবে না দাদু মা?
-ওরে আমার সোনা। নেবোই তো। নেবোই তো। মাকে দিয়ে দে এখন।
-আমাকে একটা ঠাকুর কিনে দেবে দাদু মা?
-নিশ্চয়ই দেবো দাদু।
-মনে মনে ভাবে মোতি, ঠাকুর নেহাত বোবা। নইলে কি শাস্তি হতো মোহরের কে জানে? ওতো অবুঝ। শাস্তিটা মা-বাবার ওপরই পড়তো। মোহরের হাত থেকে ঠাকুর নিয়ে চলে যায় মোতি। গন্ধমাদন পর্বতটা মাথায় নেয়ার চিন্তায় সে কাহিল। সব বিক্রি-বাট্টা করেও অজস্র টুকিটাকি জিনিস ছড়িয়ে আছে বাড়িময়। দুঃখে তার প্রাণ যায় এসব ছেড়ে যেতে।
গুলবাহাদুর আত্মসমর্পণ করেছে পরিস্থিতির কাছে। পুরনো ব্যথার মতো মাঝে মাঝে পলাতক এবং ছদ্মবেশী জীবনের গ্লানিটা উঁকি মারে মনের গহনে। তবে ধরা পড়ার ভয়টা যায়নি এখনো। চুলের জটাজুট তাই রেখে দিয়েছে যত্ন করে।
একটা ব্যাপারে গুলের অশান্তি আর নেই। তার ধারণা ছিলো, জং বাবা ইংরেজদের পছন্দ করে। মোতির কাছে জেনেছে যে, জং বাবা গদরের পক্ষেরই লোক ছিলেন। তারপর থেকে যমুনা মাইজির সংসারের প্রতি তার মায়া এবং আনুগত্য বেড়ে গেছে বহুগুণ। বুঝতে পেরেছে, বুকে আগুন নিয়েই মানুষ বাঁচে। ছটফট করলে লাভ নেই। রক্ষা পাওয়া যায় না অনলের দাহ থেকে। এটাই নিয়ম সংসারের। এর বাইরে কেউ যেতে পারে না।
যমুনা মা ভেবেছিলো, কোলকাতায় চন্দন নগরের পোড়ো বাড়িটা সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়ার পর মোতি মা হবে। কিন্তু মানুষ ভাবলেই কি তা হয়? সব ভাবনার মহাসম্রাট না ভাবলে তো কিছুই হবে না। সংসার তুলে নিয়ে যেতেও যে এতো সময় লাগবে তা কেউই ভাবেনি। কিন্তু এখন যে মোতির আট মাস চলছে। সে মেয়েও এমন অহল্যা! পাষাণ হয়েই থাকে। কোনো কথাই বলে না। একদিন ওকে ডেকে যমুনা মা বলে, আর তিনটে মাস এখানেই থেকে যাই, কি বলিস মোতি?
অবাক হয়ে মোতি বলে, মাইজি, সব কাজ এখন শেষ। যে কোনোদিনই যেতে পারি আমরা।
–নিজের কথা ভেবেছিস একবারও?
-মোতরি কিছু হবে না মা। এই অবস্থায় সুবাসকে নিয়ে কতো দিন খেয়ে না খেয়ে হেঁটেছি। গরিবের গতর শক্ত হয় মা।
-ওসব কথা থাক। তোর কথা এখন আমাকে ভাবতে দে।
-তার মানে ঐ বড়ো সামানটার বাঁধন কেটে সব জিনিসপত্র আবার বের করতে হবে?
- তাই তো হবে। নইলে শোয়া খাওয়া হবে কী করে?
– তোমার পায়ে পড়ি মাইজি, এমন করে বলো না। আমি ঠিক ঠিক যেতে পারবো দেখে নিও। প্রয়োজনে আনন্দি বাবা আমাকে ঘাড়েও নেবে। তাই হলো। চলে এলো সবাই চন্দন নগরের বাড়িতে। কয়েক বছরে মোতি মা হলো আরও দুবার। দুটোই ছেলে। রাজা আর বাদশা। যমুনা মা বেশ অথর্ব হয়েছেন। কাজের অন্ত নেই মোতির। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। হৈহৈ করে বাড়ি ফেরে। দাদু মা-এর কাছে কল কল করে গল্প বলে।
গুল আবার ছাগল গরুর বাহিনী গড়ে তুলেছে। দেশের পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। ইংরেজ রেললাইন বসাচ্ছে। সারাদেশ শুধু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে না ওরা, দেশের যেখানে যে সম্পদ তাতে বিষদাঁত বসাচ্ছে। মাটির রস পর্যন্ত চুষে খাচ্ছে। গুল খবর রাখে মোটামুটি। বাংলাদেশে ধানের বদলে নীল চাষ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তুলোর চাষে মরছে কৃষককুল। মধ্য ভারতের শস্য নিয়ে যাচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ের ইংল্যান্ডে।
দুর্ভিক্ষ শুরু হলো উপমহাদেশে। যে যেমন খরা তেমনি আকাল। কিন্তু জমির খাজনা নিতে ছাড়েনি ইংরেজ শোষকরা। বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষের জমিতে নিরাপদে বাঁচতে দিচ্ছে না কৃষকদের। জমি ঘর শস্য– এমনকি ঘরের খোড়ো ছাদ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে খাজনা দেয়ার জন্য। ক্রমে হালের বলদ লাঙল সব বেচে নিঃস্ব কৃষককুল শুধুমাত্র নিদারুণ অনাহারের কারণে স্রেফ না খেতে পেয়ে মরছে হাজার হাজার লাখ লাখ।
গদরের যুদ্ধের পর ইংরেজ বুঝেছে, এ দেশ আর পায়ের নিচে রাখা যাবে না। ছাড়তে হবে এই সম্পদের দেশ। তাই যতো পারে কামড়ে খামচে নিতে চায়। তাতে এ দেশের লোক বাঁচুক আর মরুক।
পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়সেও গুল মনে মনে তরপায়। দাঁতে দাঁত পিষে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজের সাত গুষ্টিকে। মনে মনে দশানন হয়ে এক এক গ্রাসে দশটা ইংরেজের মাথা চিবোয়। আবার নিজেই ঠাণ্ডা হয়। তার যে কিচ্ছু করার নেই। ছেলেমেয়েদের বলে, লেখাপড়া শিখে সামান্য কিছু করে কর্মে খাস। ভুলেও ইংরেজের চাকরি করবি না। ওরা এই সোনার দেশটা ছাড়খার করছে। পারলে একটাকে খুন করে মারিস।
মোতি ঠাণ্ডা করে গুলকে। বলে, যমুনা মা জন্মান্তর বিশ্বাস করে আমিও করি গোসাই। তুমিই বলো, আমাদের কি জন্মান্তর হয়নি?
অবাক হয়ে গুল তাকায় মোতির দিকে। ভাবে, এসব দর্শন কোথায় থেকে পায়ও?

***

–১৯৪৬ সাল। গদর যুদ্ধের ৯১ বছর এবং পলাশীর যুদ্ধের ১৯১ বছর পর।
–প্রতাপশালী ইংরেজ রাজার রাজ্যপাট ভেঙে পড়েছে। বিপুল হর্ম্যরাজি ভেঙে পড়ার সময় দরদালান যেমন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে খুলে খুলে পড়তে থাকে, তেমনি অবস্থা এখন ইংরেজের। চারদিকে রব, বেনিয়ার জাত ভারত ছাড়ো। এ দেশ আমাদের।
বিরাট উপমহাদেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় ইংরেজ আর কয়টা? পেটের দায়ে দেশের মানুষ ওদের দাসত্ব করেছে। ওদের দেয়া দণ্ড হাতে নিয়ে দেশজ ভাইবোনদের ওপর তা প্রয়োগ করেছে। হুকুম তামিল করে ভালো থাকতে চেয়েছে সুবিধাবাদী কিছু লোক। লাভবান হয়েছে ইংরেজ। সেই দাসখত দেয়া লোকগুলোও ক্ষেপে উঠেছে। চোখ গরম করে কর্কশ কণ্ঠে বলছে, দূর হও ইংরেজ। কুইট ইন্ডিয়া।
সব বোঝে শের বাহাদুর। আনন্দি বাহাদুরের ছেলে। গুলের পৌত্র। বোঝে আতর বাহাদুরও। সুবাস বাহাদুরের ছেলে। গুলের পৌত্র। দুজনেই উকিল পেশায়। দাদু দাদি কাউকে ওরা চোখে দেখেনি। গল্প শুনেছে বাবা মা-চাচা ফুফুদের কাছে। চাঁদনি আর মোহর ফুফুর কথা তাদের আবছা মনে পড়ে। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে মুর্শিদাবাদে। ওখানেই থাকে তারা। রাজা আর বাদশা বাহাদুরের নামই শুনেছে দুই ভাই।
তাদের জন্মের আগেই গঙ্গার বুকে কালবৈশাখীর ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে মারা যায় দুজনেই। পরিবারের এই দু'জন ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে রাখতো আনন্দি আর সুবাস বাহাদুর। পরিবারের যতো গল্প তাদের কাছেই শোনা।
তবে ১৯৪৩ সাল তারা দেখেছে। সে ছিলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দুর্ভিক্ষ তারই থকথকে ঘা। শের আর আতর দুজনেই সদা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী হয়েছে। গান্ধিজির তৈরি মেনু, মানে ছয় পয়সায় জীবন বাঁচানোর মতো মোটামুটি সুষম খাবারে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে। অভ্যস্ত হয়েছিলো সংসারের বৌ বাচ্চারাও।
কোলকাতার পথে পথে ভুখানাঙা রুগ্ণ মানুষের মিছিল। ডাস্টবিনে কুকুর কামড়াকামড়ি করে হাড্ডি খায়। কঙ্কালসার মানুষেরা 'একটু ফ্যান, একটু ফ্যান' বলে কাঁদে। লক্ষ লক্ষ লোক পথে-প্রান্তরে মরে পড়ে থাকে। দুঃসহ সেই স্মৃতি। সহ্য হতে চায়নি শের আর আতর বাহাদুরের।
স্বেচ্ছাসেবার অর্পিত কাজ শেষে বাড়ি ফিরে কোনোদিন ডুকরে ডুকরে কাঁদতো দুভাই। প্রাণ খুলে গাল দিতো ইংরেজ শোষকদের। বৌ-বাচ্চা নিয়ে খেতে বসে কতোদিন ফাঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে তারা। কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে প্রচুর জনসেবা করেও বুকের ক্ষত সারে না। একি

এলো তাদের ভাগ্যে?
তবুও জীবন। সময় কেটে গেছে। ১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ আগস্টে যথাক্রমে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে এটম বোমা ফাটালো মিত্রশক্তি। সে কি ভয়াবহ মারণযজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ লোক, পশু-পাখি সব শেষ হলো কয়েক মিনিটের মধ্যে। যুদ্ধ শেষ হলো সেইদিনই। এমন অতর্কিত বীভৎস মৃত্যুর নমুনা পৃথিবী আগে দেখেনি কখনও।
সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার পর পৃথিবী নামক গ্রহ ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরছে দিন-মাস-বছর। ঘুরছে মানুষ। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তুঙ্গে উঠে গেলো। কুচক্রী শোষক ইংরেজরা খুব ভালো করে বুঝলো, ভারত তাদের ছাড়তে হবে অতিদ্রুত। তাই
বিষদাঁতের শেষ কামড় দেয়ার ফন্দি করল। কাজটা শুরু করেছিল তারা আগেই। এবার জোরেশোরে। দেশের শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রিয় মানুষের মনে ছড়িয়ে দিল সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য বীজাণু। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা ভাই ভাই ছিল, তাদের চেহারা বদলে গেল। সাম্প্রদায়িকতার বিষে নীল হয়ে গেল মন এবং বুদ্ধি। প্রতিবেশী ভাই বন্ধু প্রিয়জনদের মনে হলো শত্রু। যাদের জন্য একদা জান দিয়ে দেয়া যেত, তাদের জান নেয়ার জন্য হয়ে উঠল হিংস্র। জীব-জানোয়ারের মতো শুরু করল দাঙ্গা। গান্ধী নোয়াখালী এলেন শান্তি আর মিলনের দূত হিসেবে। কিন্তু মানুষ যে শান্তি-ভালোবাসা সব ভুলে গেছে। শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন গান্ধীজি। ভারত ভাগের প্রবল বিপক্ষে তিনি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা চান। ওদিকে ব্রিটিশরাজ বলেই দিল, ভারত স্বাধীন হবে, তবে এটা দেশ হিসেবে নয়, তিন দেশের ফেডারেশন হিসেবে। হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত এবং করদ রাজাদের ভারত হিসেবে দেশকে স্বাধীনতা দেবে তারা। কী দুঃসাহস? কাদের দেশ ভাগ করে বিদেশি বেনিয়ারা? তবু তাই হতে চলল। ক্ষমতা যে তাদের হাতে।
সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সুবিধাবাদীরা খুশি হলো। ধর্মটর্ম নয়। ওরা চায় ক্ষমতা। মুসলিম ভারত তথা পাকিস্তান এবং হিন্দু ভারতের নেতারা মনে মনে তৈরি ছিল নেতৃত্ব নেয়ার জন্য। রাজা হওয়ার লোভ নিশ্চয় ছিল তাদের। আর কি রোধ করা যায় অখণ্ড ভারতের মানচিত্র? দুই ভাগে মূলত ভাগ হলেও ভারত খণ্ডবিখণ্ড হলো চার ভাগে। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হাজার মাইল ব্যবধান সত্ত্বেও তৈরি হলো বিভক্ত পাকিস্তান, তৈরি হলো হিন্দুস্থান এবং মুক্তি পেল করদ রাজ্যগুলো। গুল বাহাদুর দিল্লির লোক হলেও মোতি ছিল খাস বাঙালি। বর্ধমানের চিকনকালা গ্রামের বাগদিপাড়ার মৃন্ময় বিগ্রহ। তার ওপর কলকাতায় তাদের বাস তিন পুরুষ যাবৎ। মনেপ্রাণে বাংলার মানুষ হয়েছে বাহাদুর পরিবারের মানুষেরা। তাদের অঞ্চল হিন্দুস্থান হলে মনের কোথায় যেন চিনচিনে ব্যথা বিঁধতে লাগল। কোথায় ব্যথা, কিসের ব্যথা, কেন ব্যথা বিশ্লেষণ করতে পারল না।
সারাটা রমজান মাস রোজা রাখে দুই ভাই। পুজোর মণ্ডপে যেতেও বাধা নেই তাদের। পুজো দেখে। প্রসাদ খায়। প্রসাদ নিয়ে আসে বাড়িতে। ঈদের দিনে তাদের বাড়িতে প্রতিবেশী হিন্দু বন্ধুরা আসে। সেমাই-পোলাও খায়। কী সহজ সম্পর্ক ছিল মানুষে মানুষে। দেশভাগের ঘোষণায় সব থমকে গেল। যে ধর্ম ছিল ঘরের ব্যাপার, একান্ত নিজের অনুভব, সেই ধর্ম রামগড়ুরের মতো বিশাল খ্যাংড়া ডানা মেলে পরিচিত আপন মানুষদের মমতা ও মানবতায় ভরা মন ঢেকে দিল প্রগাঢ় অন্ধকার দিয়ে। মানুষ ভুলে গেল তাদের মানব পরিচয়।

পাঁচ
দেশ ভাগ হলো ১৯৪৭ সালের ২৭ রমজানের রাতে, ১৪ আগস্ট। ১৫ আগস্ট। ধূর্ত শেয়াল লর্ড মাউন্টব্যাটেন লাফিয়ে লাফিয়ে দুই দেশে গিয়ে

দুই দেশের ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। মানুষ ফেটে পড়ে উল্লাসে। একদিকের স্লোগান– পাকিস্তান জিন্দাবাদ; অন্যদিকে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। মাটিঘেঁষা সাধারণ মানুষকে শোনানো হলো, মুসলিম ভাইয়েরা, হিন্দু ভাইয়েরা, তোমাদের দুঃখের দিন শেষ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ হলো, যেখানে সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধিতে বাস করবে মুসলমান ও হিন্দুরা।
এত বড় মুনাফেকির কিছুই বোঝেনি আমজনতা। কিন্তু কদিন পরই বুঝল যুগযুগান্তের প্রতিবেশীরা মাটির বাঁধন ছিঁড়ে যখন নিজ নিজ ধর্মের দেশে আসা-যাওয়া শুরু করল। ক্ষোভে ফেটে পড়ল সরল মানুষগুলো। যারা এত বড় ঘটনা ঘটাল শুধু ক্ষমতার লোভে, দেশপ্রধান হওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, তাদের তো পেল না নাগালের মধ্যে। অক্ষম আক্রোশে নিজেদের মধ্যেই শুরু করল দাঙ্গা। হিন্দু কেন মুসলমান প্রতিবেশীকে মারছে, মুসলমান কেন হিন্দুকে মারছে, তার কোনো কারণ না জেনেই দাঙ্গায় নৃশংসভাবে প্রাণ হারাল নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতা। ভারত আর পাকিস্তানের ভদ্রবেশী চরম সাম্প্রদায়িক তথাকথিত আলোকিত শিক্ষিত নেতারা সবই তো জানত। তারা দেখল চেয়ে চেয়ে আত্মঘাতী মারণযজ্ঞ, নইলে যে লাট সাহেব হওয়া যেত না। মানবতার এমন নিকৃষ্ট অবমাননা ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের এমন হীনম্যহীন চেহারা, ক্ষমতাপিপাসুদের এমন পাষণ্ড লোভ, কাতরতা সইতে পারেননি গান্ধীজি। তার দামও দিতে হয়েছে তাকে প্রাণের বিনিময়ে।
সারাটা ছেচল্লিশ সাল আন্দোলন আর দাঙ্গায় কাহিল ছিল কলকাতা। একদিকে 'বন্দে মাতরম', অন্যদিকে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'আল্লাহু আকবার' স্লোগানে ভারী হলো আকাশ বাতাস। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কলকাতার মুসলমানদের কণ্ঠ। উলুধ্বনি আর 'বন্দে মাতরম' স্লোগানে কলকাতার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।
লোকে বলাবলি করতে শুরু করল, এবার চলে যেতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে। ভালো করে কিছু বোঝার আগে দুটো দিন কেটে গেল। নতুন ঘোষণা শোনা গেল পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র নিয়ে। সূক্ষ্ম হিসাবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং দিনাজপুর নাকি হিন্দুস্থানেই পড়েছে। কান্নার রোল উঠল ওইসব অঞ্চলের মুসলমানদের ঘরে ঘরে। কোথায় গেল ঈদ পালন? সবাই শোকের মধ্যেই ঈদ পালন করল। আবার শোনা গেল, মালদহের একটা উপজেলা পাবে পাকিস্তান। দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চল এবং সিলেটের করিমগঞ্জ উপজেলা পাবে হিন্দুস্থান। মুর্শিদাবাদ পুরোটাই থাকবে হিন্দুস্থানের। পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রে বড় আলুর মতো বসে আছে ত্রিপুরা করদ রাজ্য। সেটা তো স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপটা হলো পোকায় খাওয়া কাগজের মতো। কাটা খাওয়া এক ভূখণ্ড। শিক্ষিত বুদ্ধিমান শের এবং আতর ম্যাপ নিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখে। কংগ্রেসের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলে, বোঝই তো, নেতাদের কাজ ওসব। আমরা বুঝেই বা কী করব?
সত্যি কথাই তো! শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, প্রাজ্ঞ নেতা সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দিন, আবুল হাশিম এরাও তো নেতা। আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় লোকজন আছে। ওরা তো সব বুঝত। তো ভোন্দা গাজির মতো থাকল কেন। দেশ ভাগ এবং মানচিত্রের সীমানা নিয়ে যথাসময়ে যদি মাথাই না ঘামায়, তাহলে আর নেতাগিরি করা কেন? শের বলে ওঠে, ভণ্ড সব।
কেমন ঘোরের মধ্যে দিন কাটায় দুই ভাই। মুর্শিদাবাদ হিন্দুস্থান হলো জানার পর থেকে ফুপু চাঁদনি আর মোহরের খোঁজখবর নেয়া শুরু করে তারা। পেয়েও যায়। বহরমপুরেই আছে দুজনের পরিবার। খুব নাকি কান্নাকাটি করছে। হিন্দু প্রতিবেশীরা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরামর্শ

দিচ্ছে। বলেছে, ঘরবাড়ি বিক্রি না করলে বিনিময় করে চলে যাও রাজশাহীর দিকে। এমনকি পার্টিও ঠিক করে দিতে চেয়েছে। এরই মধ্যে বেচাকেনা বিনিময় শুরু হয়েছে চন্দননগরের দিকেও।

এত সাধের খাদি প্রতিষ্ঠানের কী হবে? গান্ধীজির আদর্শে অসহযোগ আন্দোলনের ফল হিসেবে বাড়িতে চরকা বসিয়েছিল দুই ভাই। দু-একজন করে বউ-ঝি আসতে আসতে এখন বিশ-বাইশ জন আসে। কাজ করে। সুতা কাটে। কাপড় বোনে। দুই পয়সা আয়ও করে। ওদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আছে, বাগদি-ডোম তথা গান্ধীজির ভাষায় 'হরিজন'ও আছে। এদের ফেলে যাওয়া মানে চরকাঘর বন্ধ করে দেয়া। তুলে দেয়া খাদি প্রতিষ্ঠান।

হায় হায় করে ওঠে শের আর আতর। গান্ধীজি হিন্দুসমাজের ছোঁয়া-ছুঁত মানতেন না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধারাল করাতকে পারলেন না জয় করতে। সেই মহামানব যা পারেননি, সাধারণ মানুষ তা পারবে কী করে? তাদের খাদি আশ্রমে অধিকাংশই হিন্দু কর্মী। গান্ধীর ভক্ত। সেই তারাও মুসলমান কর্মীদের চরকাঘরে আসতে নিষেধ করে দিল। থমথমে হয়ে উঠল তাদের এলাকা। মনে ভয়। বুকে চাপ চাপ বেদনা।

কেউ কেউ চলে এলো পার্ক সার্কাস এলাকায়। বলতে গেলে মুসলমান অঞ্চল ওটা। দলবলে মিলেমিশে থাকতে পারবে, এই ভরসা। শের আর আতর চরকাঘর খোলা রেখে বাপ দাদার বাড়ি তালাবদ্ধ করে উঠে এলো পার্ক সার্কাসে। বাগানওয়ালা একটা মাঝারি বাড়ি বাবা কাকারা অনেক আগে কিনে ভাড়া দিয়েছিল। অনেক বা এবং বেশ খোলামেলা বাগানে অনেক ফলের গাছ। দাদু দাদির নিজের হাতে লাগানো। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, জামরুল, ফলসা, করমচা, কামরাঙা সফেদা, আতা, পেয়ারা, জাম্বুরা, জলপাই এবং নারকেল গাছে অজস্র ফল হয়। কখনো কেউ এসে ফল নিয়েও গেছে। না হলে পাড়া-প্রতিবেশীরাই খায়। কখনো ভাড়াটিয়ারা গরজ করে অনেক আম দিয়ে আসত। বিশেষ করে বাগানের গোপালভোগ আর লেংড়া আমের কোনো তুলনা ছিল না। দাঙ্গার পর হিন্দু ভাড়াটিয়ারা চলে গেছে এলাকা ছেড়ে। কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছে বাড়ি, বাগান সব। সেখানেই উঠল পরিবার-পরিজনসহ দুই ভাই।

মনে কোনো শান্তি নেই। ওকালতি করতে যায় কোর্টে। কিন্তু পসার কমে গেছে। উকিল ঠিক করতেও লোকে এখন হিন্দু-মুসলমান বাছে। মন ভেঙে যায় দুজনের। ভাবে, এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে এক দেশে মিলেমিশে থাকা কি আদৌ সম্ভব হতো?

১৯৪৮ সালে গান্ধীজির মৃত্যুটা ছিল তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। দেশভাগের পর এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন তা ভাবেনি কেউ। তা ছাড়া এমন নেতাকে যে দেশে প্রাণ দিতে হয় ঘাতকের গুলিতে, সে দেশের মাটিতে আর কিসের ভরসা? হিন্দু ভারতে হিন্দুরাও তাহলে হিন্দুর শত্রু হতে পারে। মুসলমান তো কোন ছার?

খবর পাওয়া গেল, চন্দননগরের বাড়িটা ওপার থেকে আসা উদ্বাস্তু হিন্দুরা দখল করেছে। দুই ভাই অনেক দৌড়াদৌড়ি, দেনদরবার করল। কিছুই হলো না। ওরা বলে দিল, পাকিস্তানে গিয়ে তোমরাও হিন্দুদের বাড়িঘর দখল কর। এ দেশ আমাদের। ভাগো এখান থেকে। অপমানে হতাশায় প্রাণ ধারণই মুশকিল হলো তাদের। দেশভাগের পর মানুষগুলোর হলো কী?

মরিয়া হয়ে ঢাকায় গেল আতর বাহাদুর। শেরকে রেখে গেল পরিবারের দেখাশোনার জন্য। কলকাতায় দাঙ্গার আতঙ্ক তখনো কাটেনি। এদিক-ওদিক ছিটেফোঁটা খুন-খারাবি, জ্বালাও-পোড়াও কিছু না কিছু ঘটেই থাকে।

ঢাকায় ঘরবাড়ি কেনাবেচার চেয়ে বিনিময়ের কথাই শুনল আতর। দেখতেও গেল বাড়ি। সবই পুরান ঢাকার বাড়ি। ছোট ছোট ঘর। ছোট চাপা রাস্তা। পানি-কাদায় বেশ নোংরা।

কান্না চেপে রাখতে পারে না আতর। চন্দননগরের বাড়ি তো বেদখল হয়েছেই, ওখানকার খাট-পালঙ্ক-চৌকি, আলমারি, চেয়ার-টেবিলও বেদখল। কিছুই আনতে দেয়নি দখলদাররা। সেই দুঃখ হজম করার আগে বাড়ি বদলের এই নমুনা? পার্ক সার্কাসসংলগ্ন বাড়ি ছেড়ে পুরান ঢাকার এমন কবুতরের খোপ মার্কা বাড়ি? বাগান তো দূরের কথা, আলো হাওয়াই ভেতরে যায় না ভালো করে।

মোহর আর চাঁদনি ফুপুর পরিবারও বিনিময়ের পার্টি দেখেছে। রাজশাহী কোর্টের দিকে হড়গ্রামে তারা যাবে। ফুপাতো ভাইয়েরা জানিয়েছে, যা ছেড়ে আসবে তার দুই আনাও পাবে না। শহর ছেড়ে গ্রামে আসতে হবে। বিদ্যুৎ নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশ খারাপ। ভালোর মধ্যে এই যে কিছু জমিজমা এবং ছোট একটা আমবাগান পাবে।

একটা বড় দমকা ঝড়ে জীবনের পাতা দুমড়ে কুঁচকে ছিঁড়ে উড়ে গেল। দেশত্যাগ উদ্বাস্তু ছাড়া এ ব্যথা কেউ বুঝবে না। কিন্তু তাই বলে এমন অসম বিনিময় কী করে মানা যায়? আনন্দির প্রজন্ম চলে গেছে আসামে সেই কবে। যোগাযোগ নেই গুলের পরিবারের সঙ্গে। তবে পরিবারের গল্পে তারা আছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না আতর। ফিরে গেল কলকাতায়।

কী আশ্চর্য! আর সেই মনের শান্তিটা নেই কেন? কেন মনে হচ্ছে, নিজ দেশে পরবাসী? সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই মানুষ। তবু সবই যেন অপরিচিত। অনেক রাত পর্যন্ত দুই ভাই কথাবার্তা বলে। সবটাই ভবিষ্যৎকে নিয়ে। কোথায় যাবে, কী করবে, এসব কথা। এখানে তো আয়-রোজগার কমেই যাচ্ছে। নতুন দেশেই বা কেমন হবে পেশাগত জীবন? সবচেয়ে বড় কথা, তারা আর কদিন? কোথায় রেখে যাবে তাদের ছেলেমেয়ে? কোন দেশে? কোন নাগরিক পরিচয়ে? চিন্তায় চিন্তায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারা বোঝেনি। কিন্তু বর্তমানের অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধে এখন যে দশ দিক অন্ধকার। অনেক ভেবে তারা ঠিক করল, দুই ছেলে আর দুই মেয়েকে তারা ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করে রেখে আসবে। নতুন প্রজন্ম নতুন দেশে জীবনের পত্তন তো করুক।

দেখাদেখি আরো কিছু পরিবার এই পথে এলো। ওপারের হিন্দুরা হিসাবি। বুদ্ধিমানও। ওরা তো প্রথম থেকেই প্রজন্ম পাঠাতে শুরু করেছে কলকাতায়। দুই দেশে দুই পা দিয়েও শান্তি হলো না দুই ভাইয়ের। উৎকণ্ঠা অবিরাম ঘিরে রাখে। দেশভাগ এমন করে পরিবারকেও ভাগ করে ফেলবে, এই আশ্চর্য বাস্তবতার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। কারো সঙ্গে এসব নিয়ে কথাও বলা যায় না। কারো ওপর কারো আস্থা নেই। সহমর্মিতা নেই। শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাসে মন মুষড়ে মুচড়ে থাকে।

চার

কপাল খারাপ না হলে ১৯৫৪ সালেই কেন বিনময় হবে? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। একবার দাঙ্গাও হয়েছে ঢাকাতেই। প্রতিবেশী হিন্দু বন্ধু-স্বজনদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে মুসলমানরা। পূর্ব পাকিস্তানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। শের এবং আতর দেশভাগের পর সাত বছরেই দ্রুত বুড়ো হয়ে গেছে। এলোমেলো পরিস্থিতিতে জীবন সংগ্রামের তেজ ম্রিয়মাণ হয়েছে ভয়ানক পরিমাণে।

শেরপত্নী রমিসা আর আতরপত্নী দিলারা প্রায় বোবাই হয়ে গেছে। দিশাহারা হতাশ চেহারা। বুড়ো বটগাছগুলো নতুন দেশের মাটিতে যুতমতো প্রাণরস পেল না। সারাক্ষণ নস্টালজিয়া। ফেলে আসা দিনের কথা। দেশের কথা।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা বেশ মানিয়ে নিয়েছে। কী করে যেন বুঝে নিয়েছে তারা যে বিকল্প নেই। মন কাঁদে না কি ফেলে আসা মাটির জন্য? বাপ দাদার ভিটের জন্য? পরিস্থিতিই ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, নদী বাঁক নিলে হঠাৎ করেই ভেসে যায় জনপদ। আবার সেখানে চর ওঠে। গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। কেমন লাগে ওদের? বুঝতে চেষ্টা করে প্রায় সমবয়সী চার ভাইবোন। আকাশ বড়। তারপর মলয়। বোন অজন্তা আর ইলোরা ছোট।

পূর্ব পাকিস্তানে চার ভাইবোনের নাম নিয়েও টিপ্পনি কাটত নবাবপুরের প্রতিবেশীরা। প্রকাশ্যেই বলত, নামগুলো বদলে ফেল তোমরা। আরবি নাম রাখ।

আকাশ যুক্তি দেখায়, বাংলা নামে দোষ কোথায়? তোমরা তো বাংলাতেই কথা বলছ সব সময়!

ঢ্যাঙা গোছের এক যুবক বলে, কেন আসমান আকরাম আসগারি আফসারি নামগুলো কি এতই খারাপ? আকাশ বলে, না না, তা হবে কেন? তা ছাড়া আমার নামের মানেই তো আসমান। তবে আমার কিন্তু তোমাদের নামগুলো বেশ ভালো

লাগে। আর অজন্তা ইলোরা তো জায়গার নাম, তাই না?
–তো বদলে ফেল সবার নাম। মদিনা, সাফা, মিনা, মুজদালিফা এসবও নাম হতে পারে।
–বোঝই তো ভাই, বাবা কাকারা নাম রেখেছেন, আমরা ফেলে দিই কেমন করে? তা ছাড়া নাম বদলের তরিকাও তো বেশ ঝামেলার, না?
–ও বাবা! চাচাকে তোমরা কাকা বল? মাসি পিসিও বল নাকি? স্পষ্ট বিদ্রূপ ঢ্যাঙা যুবকের কণ্ঠে। নাম আবুবকর। বকর বলে ডাকে লোকজন। আকাশ বিরক্ত হয় মনে মনে। ওকে বকরি বলে ডাকতে ইচ্ছেও হয়। কিন্তু কিছু বলে না। ধর্মের সঙ্গে, পাকিস্তান নামক দেশের সঙ্গে, বাংলা ভাষা যে বৈরী সেটা তো জেনেছে বাহান্নার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন প্রসঙ্গে। কিন্তু সে যে এমন বিদঘুটে ব্যাপার, তা বুঝতে পারেনি। আগে ছিল ঘটি আর বাঙাল ভাষার ফারাক। কিন্তু এগুলো আবার কী ফাজলামি? কাকে বলবে এসব কথা?
পুরান ঢাকার প্রতিবেশীরা বলে, তোমাদের বাংলায় হিন্দুয়ানি গন্ধ। কথাটার মানেই বোঝেনি আকাশ। ভাষায় আবার ধর্মের গন্ধ থাকে নাকি? মলয়ও অসহায়বোধ করে। বাংলা ভাষায় ধর্মগন্ধ থাকে, কথাটা কখনো শোনেনি আগে। পাড়াতেই মাঝবয়সী এক অধ্যাপক থাকতেন। মান্যগণ্য করত সবাই। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তার ছোট সংসার। পিঠেপিঠি ভাইবোন জসিম আর রাহেলা। দুজনই স্কুলে পড়ে। লক্ষ্মী তো বটেই, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। পঞ্চাশ দশকে ঢাকায় দাঙ্গার সময় অধ্যাপক চারজন হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সাহসী মানুষ। মানবতায় বিশ্বাসী। উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতি তার অশেষ মমতা। আকাশরা চার ভাইবোন তাকে ডাকত সামাদ চাচা বলে। শের এবং আতরের সঙ্গে সামাদ চাচার বন্ধুত্ব হয়েছে ঢাকায় আসার পর। দাঙ্গায় আক্রান্ত মহিম কাকা ছিলেন আর এক সুহৃদ। তিনি ছিলেন সামাদ চাচার জানে জিগরি দোস্ত। সুতরাং শের এবং আতরেও বন্ধু হয়ে গেলেন। দেশ ফেলে, সামাদ ভাইকে ফেলে তিনি যেতে চান না ওপারে। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী মানুষটা শুধু নিরাকার ঈশ্বরই মানতেন না, মানব-ঈশ্বর ছিল তার আরাধ্য। স্কুলের ইংলিশ টিচার ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা ছিল তার সন্তানসম। মহিম কাকা আর সামাদ চাচা নাম ধরে ডাকাডাকি করতেন। সমবয়সী ছিলেন। দাঙ্গার কটা দিন সামাদ চাচার বিছানায় ঘুমাতেন মহিম কাকা। নিরাপদে কেটে গেল সংকট। ছোঁয়াছুঁত ছি না। কিংবা ছিল না পাতের বিচার। একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া চলত। গরুর মাংসটা খেতেন না। পাশেই বসে মাছ দিয়ে খেতেন, সংস্কার নয়, অনভ্যাস। ছোট থেকে খাইনি তো। কাকিটাও ছিলেন খুব ভালো মানুষ। কী করে যে পরকে এত ভালোবাসতেন। আকাশদের চার ভাইবোনই যখন তখন কাকির কাছে আবদার করত নারকেল নাড়ু আর খাগড়া খাওয়ার জন্য। নিঃসন্তান কাকি অবসর সময়ে বিস্তর নাড়ু আর খাগড়া বানিয়ে রাখতেন ওদের জন্য। কখনো মোয়া-মুড়কিও।
এ দুটি আলোকিত পরিবারের সঙ্গে আকাশদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। নতুন দেশের অবান্ধব পরিবেশে আঁটসাঁট জীবনের দখিন দুয়ার হলো মহিম কাকা আর সামাদ চাচা।
১৯৫৬ সালে আবার আন্দোলন উদ্বেল হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বাহান্ন সালের পর থেকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার দাবি তো আর থামেনি। বেড়েইছে প্রতি বছর। প্রতি ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দিবস পালন করা হয়। যে বাংলা ভাষা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না, যে ভষা ছিল জন্মের সহজাত বুলি, সেই ভাষাকেই আঁকড়ে ধরল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আজনমতা। সম্প্রদায়গত দ্বিজাতিত্বকে ছাপিয়ে ভাষিক পরিচিতির প্রশ্ন এলো। এক নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, 'মা মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা' সমার্থক বিষয়। বাংলাভাষী আলোকিত মানুষেরা হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছিলেন সেই কথা। কারণ তিনটে বিষয়ই মানুষ পায় জন্মসূত্রে। কোনোটাকেই ছাড়া অসম্ভব। জন্মসূত্রে মানুষ ধর্মটাও পায়। সেটা গায়ে মনে মগজে লেপ্টে থাকে।
সামাদ চাচা গপ্পী মানুষ। সময় পেলে শের আর আতরের সঙ্গে বসে অনেক গল্প করেন। শেরপত্নী রমিসাই প্রথমে পর্দা ভাঙলেন সামাদ চাচার সামনে। সামাদ চাচা ভাবী ডাকে অবাক করা আন্তরিকতায়। মনে হয়, সত্যিকার ভাবী-দেওর। তারপর আতরপত্নী দিলারাও এলেন সামনে। সামাদ চাচি রুকসানা তো বরাবরই শের-আতরকে বড় ভাই আর মেজ ভাই বলে ডাকতেন। পর্দা করেনইনি কোনো দিন। কোনো কোনো দিন শুক্রবারের সকালটা এমন জমে উঠত যে জুমার আজান হয়ে যেত। সেদিন বাবা কাকারা নামাজ পড়ে এসে একসঙ্গেই দুপুরের খাবার খেতেন। বাদ যেতেন না মহিম কাকাকাকিও। তা সে ঘরে যা-ই থাক, সেটাই রান্না করত মা কাকিরা। আলু ভর্তা, বেগুন ভাজা, লালশাক বা পুঁইশাক দিয়ে ডালকেই মনে হতো অমৃত। মাটিতে মাদুর বিছিয়ে কাঁসার থালা গ্লাসে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল তখন। ঝকঝকে থালাবাসনের জেল্লায় আলোকিত হয়ে যেত ঘর মন খাওয়া।
আকাশ আর মলয় বড় হয়েছে। বুদ্ধিও বেশ ভালো। উদ্বাস্তু পরিবারের কষ্ট আর সংগ্রাম টের পায় হাড়ে হাড়ে। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যেতে ইচ্ছা হয়। টগবগ করে ফোটে রক্ত। কিন্তু যায় না। বাবা কাকারা কিছু বলে না। মা কাকিরা কেঁদেকেটে বাধা দেয়। বলে, তোদের কিছু হয়ে গেলে ভেসে যাবে পরিবার।
একদিন সন্ধ্যেবেলা সামাদ চাচা এসে আকাশের কাছে জানতে চাইলেন, মলয় কোথায়। তিনি জানালেন, দিনভর ধরপাকড় হয়েছে। মিছিল থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েদের ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে সেপাইরা। জেলখানায় জায়গা নেই বলে দূরদূরান্তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বহু ছেলেমেয়েকে। ওরা হেঁটে, বাসে, রিকশায় কোনোমতে ঢাকা পৌঁছেছে। অভুক্ত তো ছিলই। শের এবং আতর উৎকণ্ঠিত হলেন। তাই তো, মলয় তো বাড়িতে নেই! গেল কোথায় তাহলে? হুড়মুড় করে মলয় ঢুকল ঘরে। বিধ্বস্ত মলিন চেহারা। শের জানতে চাইলেন, ছিলি কোথায়?
–প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসের জন্য। হঠাৎ দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়িমরি করে দৌড়াচ্ছে। পেছনে পুলিশও। টপাটপ ধরছে ওরা ছেলেমেয়েদের। টেনেহিঁচড়ে তুলছে ট্রাকে। কিছু বোঝার আগে আমাকেও নিয়ে গেল টেনে।
–তুই বললি না যে, তুই ছাত্র নোস। আকাশ বলে মলয়কে।
–তুই কী ভাবছিস দাদা? আমি কতবার বলেছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সে এক মহা ধুন্ধুমার অবস্থা। দাঁড়ানোর জায়গা নেই। কে কার গায়ে পড়ছে, খবর নেই।
–তারপর?
–তার আর পর কী? হুড়হুড় করে ট্রাক চালিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল, তাও বুঝলাম না। একসময় রাস্তার ধারে নামিয়ে দিল গাড়িভরা ছেলেমেয়েদের। যেন ভাগাড়ে এনে আবর্জনা ঢালছে।
–ভারী আশ্চর্যের কথা তো?
–শোন না দাদা, এরই মধ্যে এক অবাঙালি পুলিশ আমার নাম মলয় শুনে বলল, 'ইয়ে কেয়া গান্দা নাম হ্যায়? মাসুম নেই কিউ? মনে হলো, ঘুষি মেরে ভর্তা করে দিই ওর নাকমুখ।
কে আর কী বলবে? মলয় ফিরে এসেছে, এতেই সবাই খুশি। আকাশ একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করে। ওখানে অবাঙালি সহকর্মীও আছে। তারা তো বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে রীতিমতো ঠাট্টা মশকরা করে। বলে, বাংলা তো হিন্দু আদমিদের ভাষা। উর্দু কত মিষ্টি ভাষা! খানদানি ভাষা! এক সহকর্মী আকাশকে মাঝে মাঝেই বলে, আকাশ তো হিন্দু নাম হ্যায়। 'আসমান' কিতনা শানদার নাম হ্যায়। আওর দেখ, তোমাদের বাংলা নাম আমাদের ভালোই লাগে না। মুসলমানদের জন্য আরবি নামই সহি। ওরা বুঝতেই চায় না যে, এটা ওর ডাকনাম। ভালো নাম, মানে দাপ্তরিক নামটা আরবি নাম। মনসুর বাহাদুর। তাতেও শান্তি নেই ওদের।
বাংলা নামের কথা শুনতে শুনতে আকাশ বলেছে একদিন, তোমার 'কিয়ামত' নামটাও তো আমার ভালো লাগে না। তো কী হলো? নাম তো কেউ নিজে রাখে না। বাবা মা রেখে দেয়। ইচ্ছা হলে বা কেউ বললে তুমিও তাই নাম বদল করতে পারও না!
ওইটুকু কথার জের ধরে রীতিমতো মন কষাকষি হলো কিয়ামতের সঙ্গে। অথচ সহকর্মী হিসেবে আকাশ ওকে বেশ পছন্দ করত। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই অফিসে পাকিস্তানপন্থী আর বাংলাপন্থী দল গড়ে উঠল। একই দেশ

হয়েও শুধু ভাষার কারণে কেমন এক বিজাতীয় সম্পর্ক সৃষ্টি হলো বাংলাভাষী আর উর্দুভাষীর মধ্যে। দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে দ্বিভাষীতত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। কষ্ট পায় আকাশ মনে মনে। অফিসের বস তো পাকিস্তানি। তাই উর্দুভাষীরা এবং সুবিধাবাদীরা জোট বাঁধে একদিকে।

চলে যায় দিন তবু। পাকিস্তানের দুই অংশের দূরত্ব শুধু মানচিত্রের ভোগোলিক অবস্থানে থাকল না, দূরত্ব বেড়েই চলল দুই প্রান্তের মানুষের মধ্যেও। রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি বোঝে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভাষার ঝগড়াটা স্পষ্টই বোঝে। ষাটের দশকে অজন্তা ইলোরার বিয়ের কথাবার্তায় প্রধান একটা শর্ত সৃষ্টি হলো শের আর আতর তথা বাহাদুর পরিবারের। তা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারের বর নেয়া যাবে না। সামাদ সাহেব এবং মহিম সাহেবেরও একমত। ওদের সঙ্গে শুধু ধর্ম ছাড়া আর কোনো কিছুতেই মিল হবে না বাংলাভাষী পরিবারের, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। মিল হবে না খাওয়া-দাওয়ার সংস্কৃতিতেও। ওদের পছন্দ রুটি। বাঙালিদের পছন্দ ভাত। ওদের পছন্দ মাংস। এদের পছন্দ মাছ।

একই শর্ত ছেলেদের ব্যাপারেও। পশ্চিম পাকিস্তানের বউ ঘরে আনা যাবে না। মলয়ের সঙ্গে করাচির মেয়ে সেলিমার বন্ধুত্ব হয় সহকর্মী হিসেবে। তাকেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বলতেই হয় সেলিমাকে যে, বন্ধুত্বটা আর গড়াবে না। খুব সুন্দর মিষ্টি একটা মেয়েকে কথাটা বলতে গিয়ে বুক ভেঙে যায় মলয়ের। কিন্তু প্রধানত শুধু ভাষার কারণে দুই প্রান্তিকের পাকিস্তান নামক দেশটা যতটা বৈরী সম্পর্কে এসেছিল, সেখানেই শেষ হয়নি। দুই প্রান্তের মানুষের সুকুমার সম্পর্কও জটিল হতে থাকল। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমে উপনিবেশ করে তুলতে চাইল পশ্চিম পাকিস্তান। সুযোগ-সুবিধা, চাকরি-বাকরি, রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড– সব ক্ষেত্রেই বাংলাভাষীদের বঞ্চিত করা হতে লাগল। শোষিত-বঞ্চিত বাংলাভাষী ক্রমে হয়ে উঠল ক্ষুব্ধ এবং অধিকারসচেতন। সংক্ষুব্ধ ষাটের দশকের শেষ দিকে মলয় আর সেলিমার পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ধ্বংস হয়ে গেল। নিজের অক্ষমতায় কষ্টে যাতনায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় মলয়। সেলিমা চলে গেল করাচি। শূন্যহৃদয় মলয় ভাবে, এ কী পাকিস্তান পেলাম আমরা? এ দেশে মানবিক ভালোবাসা প্রশ্নবিদ্ধ কেন? কেন এখানে একই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষিক বিভেদ আর ক্ষমতার নির্লজ্জ হানাহানি? কী হবে এরপর? একসঙ্গে বাস করতে পারবে তো তারা? শুধু ধর্মের বাঁধনে সম্পর্ক টিকে থাকবে তো দুই খণ্ড পাকিস্তানের?

বেচারা সেলিমা! কী প্রবল উৎসাহে বাংলা শিখছিল একটু একটু করে। ওর বাবা ইসমাইল পাঠান ছিলেন আমলা এবং উন্নাসিক। বাঙাল মুলুক তার ভালো লাগত না। মেয়েটা একেবারে উল্টো। বাংলাদেশ তার ভালো লাগত। এখানকার মিষ্টি এবং রবীন্দ্র-নজরুল প্রাঞ্জলিক গান তার ভালো লাগত। আর ভালো লাগত দুর্দান্ত যুবক মলয়কে। তাদের দুজনের বিয়ে হতে পারে না, এটা মানত না সেলিমা। ওর কথা হলো, ভালোবাসা দেশকালের গণ্ডি মানে না। কখনো ধর্মেরও না। তা ছাড়া ভাষা আলাদা হলেও তাদের ধর্ম এবং নাগরিকত্ব অভিন্ন। তাই বাধা থাকার কথা নয়।

কথাটা মলয়ও স্বীকার করে। তবু কোথায় একটা 'কিন্তু' জেগে উঠেছে। ঠিক বোঝাতে পারে না মলয় সেলিমাকে। এক ধর্ম, এক দেশ হওয়া সত্ত্বেও আত্মিক সম্পর্ক নির্মাণ করা যাচ্ছে না। সেটা কি শুধু ভাষার কারণে? তাহলে বিশ্বাসের ঘরে সন্দেহের ছায়া গাঢ় হচ্ছে কেন ক্রমে? সেটা কি রাজনৈতিক? বুঝতে পারে না মলয়। সেলিমা বাবার অমতে থেকে যেতে চেয়েছিল ঢাকায়। কিন্তু পাঠান সেটা চাইত না। তাই সম্পর্কের সুর পড়ে যেত বার বার। বেসুরো হয়ে উঠত প্রেমের গান। হারিয়ে যেত ছন্দ। সেটা ভালোই লাগত না মলয়ের। তা ছাড়া পাঠানের মতো কট্টর এক

পাকিস্তানি তার শ্বশুর হবে, এটাও পছন্দ না তার। ফলে ভালোবাসার জমিনে উপ্ত প্রেমের চারাগাছটা পুষ্টই হতে পারল না। দেশের পরিস্থিতি ক্রমে দুই শিবিরে বিভক্ত হলো। পাঠান চতুর আমলা। বদলি নিয়ে চলে গেলেন কোয়েটা। মলয় দেখা করে এলো সেলিমার সঙ্গে। মেয়েটা বড্ড কাঁদছিল। হঠাৎ বলে বসল, তুমি চলে এসো কোয়েটায়।

–তা কী করে হয় সেলিমা? বেদনার্ত মলয়ের কণ্ঠ বুজে এলো।

–তুমি আমাকে ভালোবাসা না?

–বাসি। খুব ভালোবাসি সেলিমা।

–তাহলে আমাকে রেখে দিচ্ছ না কেন? আমি থাকতে চাই এই দেশে।

–জানি। সব বুঝি। বিশ্রী রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আর্থনীতিক ঝড়ে আমরাও আক্রান্ত বিশ্রীভাবে। তুমিও শান্তি পাবে না এর মধ্যে সেলি। বুঝতে পার না, মানুষগুলো বদলে গেছে এবং যাচ্ছে।

-আমি তো বদলাইনি মলয়। সেলিমা হাল ছাড়তে চায় না।

–তোমার আমার দেশিক ধারণায় হয়তো অভিন্ন পাকিস্তানই আছে। কিন্তু মন ভেঙে গেছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের।

–আমি থোড়া থোড়া বুঝতে পারি, কিন্তু মানতে পারি না।

–মনে করতে হবে, দুই প্রান্তের দুই পাকিস্তান খণ্ডে প্রথম থেকেই অনৈক্যের যে রাজনীতি শুরু হয়েছিল, আমরা তার বলি।

–না না মলয়, অমন করে বলো না। মোহাব্বাত কখনো মরে না।

–মানছি তোমার কথা। আমারও খুব কষ্ট হয় সেলিমা। ইচ্ছা হয় সব বাধা ভেঙেচুরে দুজন চলে যাই কোনো অজানা দেশে।

কিন্তু হয়নি কিছুই। সেলিমা চলে গেল বাবার সঙ্গে। জীবনের প্রথম ভালোবাসা উড়ে গেল পশ্চিম প্রান্তের পাকিস্তানে। সঙ্গে চলে গেল মলয়ের হৃদয়টা।

দুঃসহ সময় কেটেছে দু-তিন মাস। সেলিমা চিঠি লিখত ইংরেজিতে। মলয় উত্তর দিত ইংরেজিতে। নিজেদের মাতৃভাষায় তো প্রেমালাপও করত না ওরা! অথচ কাছাকাছি থাকার সময় এসব কথা মনে জাগেনি একবারও।

পাঠান সবই জানত। তাই দেশে ফিরে কয়েক মাসের মধ্যেই বিয়ে দেয় সেলিমার। একটা কার্ড মলয়কেও পাঠিয়েছিল পাঠান। নিমন্ত্রণ নয়, যেন কোর্টের একটা রায়। সম্পর্ক শেষ করে দেয়ার আদালতি পরোয়ানা। কিন্তু সম্পর্ক কি এতই সহজ? বন্ধনহীন গ্রন্থিই যে সবচেয়ে শক্ত। তাই সেলিমার কথা ভুলতে পারেনি মলয়। সযত্নে এবং গোপনে তুলে রেখে দিয়েছে হৃদয়ের মধ্যখানে।

বয়সী লোকেরা, বিশেষ করে শিক্ষিত সচেতন মানুষরা যুবসমাজের রাজনৈতিক আবেগ এবং ক্ষোভ দেখে শঙ্কিত হন। কী আছে ভাগ্যে কে জানে? উদ্বাস্তু পরিবারগুলো ভয়ও পায়। দেশ ছেড়ে এসে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে নিয়েছিল যে দেশকে, সেখানেও শান্তি পাচ্ছে না। সামাদ সাহেব বিমর্ষই থাকেন আজকাল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক আরো খারাপ হলো। দুই প্রান্তিকের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস-অসুয়া ক্রমেই প্রকট হতে লাগল। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই– স্লোগানের পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে 'শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা চাই', তারপর 'জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চাই' হলো। আর বাংলা ভাষার দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের গায়ে বিছুটি লাগে। দেশি ভাইদের মধ্যে বিশ্রী একটা সম্পর্ক। শের আর আতর ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে মর্মবেদনায় শেষ বয়সে এ কোন দেশে জীবন যাপন করতে হচ্ছে তাদের? ভাইকে ভাই বলা যায় না কেন? ধর্মের নামে দেশ, এমন হবে কেন?

বিপর্যয় ঘটল সামাদ সাহেবের পরিবারে। ১৯৬৬ সালের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় সম্পৃক্ত ব্যক্তি সন্দেহে অ্যারেস্ট করেছে সামাদ সাহেবের

জামাই মেজর শামসুকে। তার তো ওই এক মেয়ে রাহেলা। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বড় ভাই জসিমের বন্ধু শামসুকে। জসিম আর শামসু একই সঙ্গে আর্মিতে চান্স পায়। এ চাকরিটা বাড়ির কেউ পছন্দ করত না। তবু ঘটে গেছে বিয়েটা। মনকাড়া ছেলে শামসু। খুব ভালো ছিল রাহেলা। সুখে ছিল। হঠাৎ উলট-পালট হয়ে যায় সব।

আসন্ন মাতৃত্বের ভারে কাতর রাহেলা ছুটে আসে বাবার বাড়িতে। পুরো দুটো মাস কী দৌড়াদৌড়ি সবার! শামসুর খবর পাওয়ার আগেই রাহেলার কোলে এসেছে ফুটফুটে মেয়ে কুসুম। জন্মেই কাঁদে মেয়ে। কাঁদে মা রাহেলা। কাঁদে কুসুমের নানি রুকসানা। শিশু কাঁদে জীবনের বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য। রাহেলা কাঁদে প্রিয় মানুষ শামসুর জন্য। রুকসানা কাঁদে রাহেলার অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে। শামসু যে আর ফিরবে না, তা জানানো হয়নি রাহেলাকে। বুকটা কারবালা হয়ে গেছে রুকসানার। আহাজারি করারও উপায় নেই।

চারদিকে বলাবলি, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্য থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার পরিকল্পনাসংক্রান্ত কাজকর্ম। এর মধ্যে নানা রকম রং লাগাল রাজনীতিবিদরা। এত শত বোঝেনি আকাশ আর মলয়। এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় তাদের সামাদ চাচার সঙ্গে। শের বাহাদুর এবং আতর বাহাদুর কেমন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে সব ব্যাপারে। কিচ্ছু ভালো লাগে না তাদের। কোনো আশা নেই। ভরসা নেই। দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই। আগে দেখেছে হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি। এখন দেখছে মুসলমান-মুসলমানে হানাহানি। দুটো আলাদা দেশ হলেও কথা ছিল। হচ্ছে কী এসব?

চোখে দেখেও কিছুতেই তারা মানতে পারে না বাস্তবতা। কে চেয়েছিল এমন স্বাধীনতা? সব দোষ চাপায় তারা বেনিয়া কুটিল লুটেরা শয়তান ওই ব্রিটিশদের ওপর। কোনো না কোনো ধর্ম তো আছেই মানুষের। বেনিয়াদেরও আছে। কিন্তু সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র বদ্ধ চিন্তাকে উস্কে দিয়ে পারস্পরিক মারামারি-কাটাকাটির হিংস্র হীনতা শেখাল তো তারাই। শুরু করেছিল সেই গদরের যুদ্ধের সময় থেকে। তাদের পূর্বপুরুষ গুল বাহাদুর বলতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিকে তারা ভয় করত। বেনিয়ারা বুঝতে পেরেছিল, হিন্দু-মুসলমানকে সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্ট দিয়ে ভাগ করতে না পারলে তাদের শাসন-শোষণ ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। তাই-ই হলো। হায়রে অর্বাচীন মানুষ! বুকে হাত বুলায় আতর। তা দেখে কাঁদে শের। বড় কষ্ট হয় ওদের।

তাদের পূর্বপুরুষ গুল বাহাদুর ছিলেন পরাজিত গদর-সেপাই। পালাতে হয়েছিল জন্মভূমি ছেড়ে। সেই সুদূর দিল্লি থেকে একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রান্তিক এক গ্রামে এসেও শান্তি পাননি এক দিনের জন্য। তিনি তো তবু দেশেই ছিলেন। তারা এসে পড়ছে পূর্ব বাংলায়। পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায়। দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু দুটি দেশ তবু। এতকাল জানত যে, মাটির বিভাজন দেখা যায় ভৌগোলিক মানচিত্রে। এখন বুঝতে পারে, ভৌগোলিক রেখা কোটি কোটি মানুষের বুকের ভেতরও কেটে বিভক্ত করে দিয়েছে। মানচিত্রের কালো রেখা দেখা যায়। মানুষের মনের কাটা দাগ দেখা যায় না। তবু ক্ষরণ অহর্নিশি। তীব্র ব্যথার যাতনায় নিঃশব্দে কাতরায় উদ্বাস্তু শের এবং আতর। এই কষ্টের উত্তরাধিকারিত্বে অংশীদার হয়ে পড়েছে উদ্বাস্তু পরিবারের সবাই। সুখ নেই কারো মনে। সময়ের কাঁধে চেপে তবু জীবন চলেই যায়।

আকাশ আর মলয় বেশ বুঝতে পারে বাবা-কাকার মানসিক অবস্থা। কিন্তু কিছুই করার নেই। পারিবারিকভাবে দেখে-শুনে ১৯৫৮ সালে অজন্তা ইলোরার বিয়ে দেয়া হয়। তার পর সপ্তায় দেশে জারি হয় সামরিক শাসন। কেমন একটা ভয় ভয় ভাব চারদিকে। কিন্তু কিছুই থেমেও নেই। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে বন্ধ নেই। অজন্তা ইলোরা জামাই দুজনই সরকারি কলেজের শিক্ষক। ওরাও উদ্বাস্তু। মুর্শিদাবাদ থেকে সহায়সম্পদ বিনিময় করে রাজশাহীর বানেশ্বরে এসেছে দেশভাগের প্রথম দিকেই। এই ভালো। সমব্যথি সম্পর্কের বোঝাপড়া সহজ হবে ভেবে দুই পক্ষই খুশি। দুই বছর বাদে আকাশ আর মলয়ের ঘরেও বউ এলো। এরা ভূমিকন্যা। উদ্বাস্তু নয়। ওদের কিছু আত্মীয়স্বজন কলকাতায় থেকে গেছে।

১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ দেখাল আর এক তেলেসমাতি। ওই যুদ্ধ তাদের জন্য অভিশাপ। ভোলা যায় না সে কথা। বাড়ির উঠোনে বাঙ্কার খোঁড়া হলো, সাইরেন বাজলে সবাই যেন আশ্রয় নিতে পারে। ভয় পেলেন মহিম কাকা। চলে যেতে চাইলেন ভারতে। চমকে ওঠেন সামাদ চাচা। কিন্তু কাচের বাসনে চিড় ধরলে তা আর বন্ধ করা যায় না। ক্রমে তা বাড়ে। কাকা সত্যি চলে গেলেন। দুর্ঘটনার মতো সত্যি বিষয়টা। কাকি তো নাচার। যেতেই হলো স্বামীর সঙ্গে। হুগলির এক মুসলমান পরিবার এলো কাকার বাড়ি। যুদ্ধের বছর বেশকিছু হিন্দু পরিবার নতুন সিদ্ধান্ত নিল। বিনিময় করল জন্মভূমির সহায়সম্পদ-পরিচয়। যুদ্ধ সবাইকে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে দিল আর একবার। ওপারেও ঘটল একই ঘটনা।

আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বের গর্ভে জন্ম দুটি দেশেরই। সাম্প্রদায়িকতার রক্ত প্রবাহিত দুটি দেশেই। অসাম্প্রদায়িকতার শুদ্ধ সাত্ত্বিক তত্ত্ব যে যতই আওড়াক, জন্মসূত্রে পাওয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম, সম্প্রদায়ের গন্ধ দেশ দুটোর গা থেকে যাবে না কোনো দিন। মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার মতো ধর্মও যে জন্মসূত্রে পাওয়া। রক্তে বয়ে চলে সেই গন্ধ। তা বাদ দেয়ার কথা না বলে বরং সম্প্রীতি সৌজন্য বন্ধুত্ব এবং সহিষ্ণুতার কথা বলা উচিত। পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত নির্মাণের চেষ্টা করা উচিত। নইলে আত্মপ্রতারণাই সার হবে। তাতে আর যাই হোক, মানবিক সম্পর্কের মনন তৈরি হবে না।

যুদ্ধের ডামাডোল তো থামল তিন সপ্তা পরই। তরতর করে ১৯৬৬ সাল পেরিয়ে এসে গেল ১৯৬৯ সাল। গণআন্দোলনের এমন রূপ আকাশ আর মলয় কখনো দেখেনি। বাপরে বাপ! রাজপথে সে কী উত্তাল জনসমুদ্র। মাঝে মাঝে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। মানুষ আর মানুষ। স্লোগান আর স্লোগান। সবাই ক্ষুব্ধ। ১৪৪ ধারা, কারফিউ কিছুই মানছে না আমজনতা। ক্ষোভে-ক্রোধে-বঞ্চনায় উত্তপ্ত জীবনে মৃত্যুভয়ও নেই। এ বছরের শুরুতেই মারা গেল শের আর আতর। দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে দিশাহারা হয়ে পড়ে আকাশ আর মলয়। এই তো সেদিনই দুজনের ঘর আলো করে দুজন পৌত্র-পৌত্রি এলে শের আর আতরের কী আনন্দ। এতদিনে ভূমিজ পুত্র-কন্যা এলো ঘরে। এদের উদ্বাস্তু বলবে না কেউ। এরা এ দেশে জন্মসূত্রে নাগরিক পরিচয় পাবে। বড় হলো সংসার। সকাল-সন্ধ্যে বাড়িটা গমগম করে কথায়-কান্নায়। জীবন-জোয়ারে ভরে উঠল সংসার। হঠাৎই উল্কাপাত হলো দুটো। চল্লিশ দিন আগে-পরে চলে গেল দুই ভাই। ভয়ংকর শূন্যতা পরিবারে নেমে এলো। আকাশ কেঁদে কেটে একটা কথাই বলছে বার বার, আমাদের পূর্বপুরুষ গুল বাহাদুর আর অসাধারণ নারী মোতি রানীর গল্প বলার আর কেউ রইল না। মলয় বলে, তা কেন হবে দাদা? আমরাই বলব মুক্তিযোদ্ধা গুল বাহাদুর আর মোতি রানীর গল্প। আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবে বংশ গৌরব। আমাদের বংশধরদের তৈরি করে যাব। বাতিঘর হবে ওরাই।

কিন্তু জীবনের গল্প কি শেষ হয় এত সহজে? আকাশ আর মলয়ের ছেলেমেয়ে জ্বালিয়ে রাখল বংশপ্রদীপ। ঢাকায় শিক্ষিত মেয়েদের বউ করে এনেছিল শের আর আতর। বেশ ভালো বউরা। আকাশের ছেলে সাহস আর মলয়ের মেয়ে ঝুমকো কেঁদে-কেটে হেসে-খেলে বড় হতে লাগল। কিসের উদ্বাস্তু আর কিসের ভূমিসন্তান, কিছুই বোঝে না ওরা। তবে দাদুদের জন্য মন খারাপ করে মাঝে মাঝে। বাপ-মাদের আদর-আহ্লাদে দুটি বছর কাটতে না কাটতেই আরো দুজন সদস্য বাড়ল বাড়ির। দাদুরা থাকলে কতই খুশি হতেন জীবনের চারাগাছ দেখে! সাহস খুশি বোন মল্লিকাকে পেয়ে। আর ঝুমকো খুশি পুতুলের মতো ছোট ভাই সাগরকে পেয়ে। একান্নবর্তী পরিবার আবার জমে উঠতে লাগল। নদীর যেমন সুখ-দুঃখ নেই, বয়ে চলাতেই তার আনন্দ। দিবানিশি ছলাত ছল আছড়ে পড়াই কাজ দুই পাড়ে। সংসার জীবনও তেমনি। গড়িয়ে চলে। ধাক্কা লাগে না। জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয় বটে, কিন্তু নদীর মতো নিরাসক্ত নির্বিকার বয়ে যাওয়া কি সম্ভব হয় মানুষের? নদী যেমন বাঁক নেয়, উথলে ওঠে বন্যায়, ভেঙেচুরে দেয় জনপদ; মানুষের জীবনেও তেমনি বাঁক আছে, স্খলন, পতন আছে, আবার গড়ে নেয়াও আছে। মনে হয় নদীকে প্রয়াস পেতে হয় না। সে চলে আপন গতিতে। অথচ মানুষের

জীবনের বাঁক, স্খলন, পতন, গড়ন সবই অতিকষ্টের। দিল্লি, চিকনকালা গ্রাম, দার্জিলিং, কলকাতা, পূর্ব পাকিস্তান কোনো ঠাঁই-ই সহজ ছিল না প্রপিতামহ গুল বাহাদুর আর মোতি রানীর বংশধরদের। শের আর আতর যখন বিনময় করে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল, তখন লোকে উদ্বাস্তু নাম দিয়ে নিচু নজরেই দেখেছে। সিপাহি বিদ্রোহের পরাজিত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান তারা, তা কেউ জানে না। লেখাপড়া শিখে কোনোমতে মাথা উঁচু করছিল দুই ভাই। বোনদের বিয়ে ভালোই হয়েছে। অজন্তা ইলোরাও গ্র্যাজুয়েট হয়েছে বিয়ের পর। দুজনই তাদের স্বামী-সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখছিল। সারদায় এক প্রাইমারি স্কুলে ওরা চাকরিও করত। ভূমিজ পুত্র-কন্যা, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের নিয়ে আকাশ আর মলয় ভেবেছিল জীবনের প্রতিকূল মেঘ এবার সরে যাবে। কিন্তু আবার ঝড়ের পূর্ভাভাস দেখা দেয়। সত্তরের নির্বাচন ডঙ্কা বাজিয়ে দিল। এবার ভাষা নয়, পাকিস্তানের
ভূগোল দুই টুকরো হয়ে যাওয়ার আন্দোলন। আসলে দেশের ভূগোল কেটে দিলে কি মানুষের মনও কেটে যায়? বোঝে না ওরা কেউ। ওরা যে এখনো জন্মভূমিকে ভালোবাসে। মন উড়ে যায় মাঝে মাঝে কাটা মানচিত্র ডিঙিয়ে।
মলয় ভাবে, সত্যিই তারা উদ্বাস্তু। এ দেশের মানুষ আর মাটির ভাষা তারা ঠিক বুঝতে পারে না। ভূগোল ভাগ হয়ে গেলে কী হবে, আর এই ভাগ হওয়ার প্রক্রিয়াই বা কী, তার কোনো ধারণা নেই তার। কিন্তু একটু একটু করে বুঝতে পারছে, ভারত দুই খণ্ড (করদ রাজ্য হিসাব করলে আসলে তিন খণ্ড) হয়ে যাওয়ার পর বেশকিছু অ-বাংলাভাষী জনসংখ্যা পুরান ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। তেইশ বছরে তারা জমিজায়গার দখলও বাগিয়েছে কিছু। লোকে বলে, ওসব বেশির ভাগই হিন্দুদের জায়গা, নয় তো সরকারের পতিত জায়গা। মলয়দের পরিবার এসেছে চুয়ান্ন সালে। তারা কিছুই দেখেনি। জানেও না ভালো করে। এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারাই বলে, ওরা অ-বাঙালি উদ্বাস্তু হয়েই আছে। পূর্ব পাকিস্তানকে কখনো পূর্ব বাংলা বলে না। ভালোও বাসে না বাংলার মাটি পানি মানুষ আবহাওয়া। কেমন যো পরগাছা ভাব।
উনসত্তরের আন্দোলনে ওরা কেউ মিছিলে যায় না। কেমন এক ভয় আর রাগে ফুঁসতে থাকে। বলতেও পারে না কিছু। এত বেশি হলো আন্দোলন যে আকাশ আর মলয় মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিত। বানেশ্বরে বোনদের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায় দুই ভাই। অজন্তা ইলোরা জানাল, তারা ভালো আছে। ওদেরও দুটো করে বাচ্চা। অজন্তার দুই মেয়ে, মেঘ আর বৃষ্টি। ইলোরার দুই ছেলে এক মেয়ে, আনন্দ নন্দন আর নূপুর।
অজন্তার স্বামী মনসুর নাটোর সরকারি কলেজে চাকরি পেয়েছে। বানেশ্বর থেকে রোজ বাসে যাতায়াত করে। ইলোরার স্বামী হাসান সারদা ক্যাডেট কলেজে চাকরি পেয়েছে। গুল বাহাদুর আর মোতি রানীর প্রজন্ম পরিবার উদ্বাস্তু থেকে ভূমিজ সদস্যের স্বাদ পাচ্ছে। বাচ্চারা তো জন্মসূত্রেই পূর্ব পাকিস্তানি তথা পূর্ব বাংলার উত্তরাধিকার। অর্থবিত্ত নয়, স্বস্তির জীবন চেয়েছিল তারা। সেটা পেয়েছে। আকাশ আর মলয় তাতেই খুশি। দুঃখ একটাই, বোনেরা চাকরি আর সংসার নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে ঢাকায় আসতেই পারে না। তবে চিঠিপত্র লেখে। বাচ্চারাও কাঁচা আঁকাবাঁকা লেখায় মামাদের চিঠি লেখে। বুক ঠাণ্ডা হয়ে যায় দুই ভাইয়ের। ঢাকায় দুই ভাইয়ের চারজন ছেলেমেয়ে, রাজশাহীতে দুই বোনের পাঁচ ছেলেমেয়ে গুল বাহাদুর আর মোতি রানীর সলতে জ্বালিয়ে রেখেছে।
ফুপু চাঁদনি আর মোহর দেশত্যাগের বুকভাঙা দুঃখ নিয়ে মারাই গেল সামান্য জ্বরে। কে জানে হয়তো ম্যানেনজাইনিস হয়েছিল। ফুপারা চলে গেল বহরমপুরে তাদের বাবা মায়ের কাছে। নিজস্ব ভিটায়। মোহর ফুপু ছিলেন নিঃসন্তান। চাঁদনি ফুপুর দুই ছেলে কাশেম আর জসিম থেকে গেল হড়গ্রামে। বিনিময়ের বাড়ি আর বাগানই তাদের সম্পদ। কষ্টেই দিন চলে। যোগাযোগ রাখে অজন্তা ইলোরার সঙ্গে। মৌসুমে বাগানের ফলমূল নিয়ে দেখা করতে আসে। ঢাকা পর্যন্ত আসা হয় না কাশেম আর জসিমের।
গুল বাহাদুরের জোয়ান তাগড়া নাতিরা লেখাপড়া চাকরি-বাকরি কিছুই করে না। বাগানের আয় আর বাড়িসংলগ্ন বেশকিছু জায়গায় সবজি চাষ করে যা পায়। গদরের সেপাই বীর মুক্তিযোদ্ধার বংশধর এমন পান্তাভাত, ভাবাই যায় না। আকাশ আর মলয় বহুবার বলেছে, সব বিক্রি করে ঢাকায় আয়। ছোটখাটো ব্যবসা শুরু কর। চার ভাই একসঙ্গে একই এলাকায় থাকাটাও একটা জোরের ব্যাপার। ওরা শুনতে চায় না। কেমন এক হীনমন্যতায় ভোগে। লেখাপড়া এগিয়ে নেয়নি। চাকরি পাবে না কোথাও। দোকানদার হওয়ার চেয়ে হড়গ্রামই ভালো। তা ছাড়া ওরা ওপরে উঠবেই বা কী করে? এলাকার অতিসাধারণ মেয়েদের বিয়ে করেছে। ওরাও পাসটাস করা নয়। কোনোমতে প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছে। সে দৃষ্টিতে বিচার করলে আকাশ আর মলয় ঢাকায় নব্য শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন কাটায়। আত্মীয়তার মধ্যে কেমন এক শ্রেণিসচেতনতার দাগ পড়ল। দেখা যায় না। বোঝা যায়।
আকাশ সবকিছুই গ্রহণ করে সহজে। বেশি চিন্তাভাবনা করে না কিছু নিয়ে। কিন্তু মলয় বেশ মননশীল। সে বুঝতে পারে সম্পর্কের শ্রেণিরেখা। এক জীবনে কত রকম দাগ আঁচড় আর রেখা যে ওঠে! যে বোঝে, কষ্টটা তারই। একজন খবর দিল, কাশেম আর জসিম সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মিল নেই দুই ভাইয়ের। শুধু তাই নয়, কাশেম নাকি বাংলা মদও খেতে শিখেছে। ঝগড়ার কারণ সেটাই। জসিম এটা মানতে পারে না। প্রচণ্ড কষ্ট পায় মলয়। উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি আর অবহেলা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ ছিল, লেখাপড়া করে নিজেকে গড়ে তোলা। তবে তো মাথা উঁচু করে বাঁচবে।
উনসত্তরের গোর্কি দেশটাকে ছেনে পিষে ভর্তা করে দিয়েছিল। দক্ষিণের উপকূল অঞ্চলে কিয়ামত হয়ে গেল এক রাতের মধ্যে। সংবাদপত্রাদির পাতায় চোখ রাখা যায় না। মানুষ গবাদিপশু মরে পড়ে আছে পোকামাকড়ের মতো। বয়সীরা বলল, আল্লাহর গজব পড়েছে। মলয় ক্ষিপ্ত হয়ে যায় কথাটা শুনলেই। সান্ত্বনা পাওয়ার আরো তো কথা আছে! সেটা যে কী তাও সে জানে না। মনে মনে গুমরে মরে। কেন এমন হলো তাদের দেশে? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়। হেলিকপ্টারে উড়ে উড়ে দেখলেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ধরন। দেশ-বিদেশ থেকে ত্রাণ এলো বেশুমার। ত্রাণকর্মে সম্পৃক্ত কিছু মানুষ ফায়দা লুটল বেধড়ক। মলয় কষ্টে মরে যায়। ভাবে, সৎ মানুষেরা সবাই কি তার মতো যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে? আকাশ খুব সৎ মানুষ। কিন্তু তার তো এত মাথাব্যথা নেই।
দিন তবু কেটে যায়। থেমে থাকে না রাজনীতি। থেমে থাকে না দুর্নীতি। একটাই জ্বালা, তা হলো, যখন তখন বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়। উদ্বাস্তু পরিবারের ভূমিজ সন্তানদের তো আগলে রাখতেই হবে। দুই ভাই অনেক কষ্ট করে বাড়িটার কিছু সংস্কার করেছে। দোতলায় সেমিপাকা চারটে ঘরও হয়েছে গত বছর। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। ওদের পড়ালেখার ঘর চাই। শোয়ার ঘরও চাই। কী মায়া দুই ভাইয়ের এই বাড়িটার জন্য। বাপ দাদার ভিটে তো নেই, এটাই হবে তাদের ছেলেমেয়েদের পূর্বপুরুষের ভিটে। তাদের বাস্তুভূমি। বাবা চাচা শের আর আতরের কত স্মৃতি এই বাড়িতে। তাদের লাগানো কত গাছ পেছনের বাগানে এখন ফলবান। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা গাছে প্রচুর ফল হয়। আগে কেউ ফলন্ত গাছের দিকে ফিরেও তাকাত না। এখন নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা ঢিল ছোড়ে ফল পাড়ার জন্য। বাগানের সীমানা দেয়ালটা বেশ নিচু। সহজেই ভেতরে এসে ফল পাড়া যায়। বাড়ির সীমানা দেয়াল বেশ উঁচু। শিউলি আর কনকচাঁপা গাছ দুটো ছিলই। অজস্র ফুল ফোটে এখনো। শের আর আতর উঠোনের পূর্ব পাশের সীমানাপ্রাচীরের কাছে একটা নিমগাছ আর একটা বেলগাছ লাগিয়েছিলেন। এ দুটো গাছই খুব টেকসই। খুব একটা ঝাপড়াও হয় না। আঙিনার কোনায় ইঁদারা। তার কাছাকাছি একটা কুলগাছ। আপনিই হয়েছে। কুলগুলোর জাত বেশ ভালো। সন্ধ্যেবেলা এবং কখনো চাঁদনি রাতে প্রশস্ত উঠোনে সবাই বসে। গল্পগুজব করে। নিমফুল ফুটলে ভারী মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে। কুলগাছের পাশের লেবুগাছটা এ বছরই মরে গেল। মলয়ের বউ সুমি কদিন ধরেই বলছে নার্সারি থেকে একটা কলমের গাছ আনতে। মলয় ভাবে, কত অল্পেই মানুষ সুখ-শান্তি খুঁটে তুলতে পারে। এ কথাটাই জানে না অধিকাংশ লোক।
বলা নেই কওয়া নেই, একদিন কাশেম এসে

উপস্থিত হলো ঢাকায়। আকাশ আর মলয় বাড়িতেই ছিল। ভরসন্ধ্যে তখন। নিজের ফুপাতো ভাই, কিন্তু চিনতে পারে না। হাতে দু-তিনটে পোঁটলা এবং চটের বাজারের ব্যাগ। বাড়ির ফলমূল এনেছে।
দরজা খুলে দেয় মলয়। বলে, কে আপনি?
–আমি কাশেম রে। হড়গ্রামে থেকে এসেছি। তোদের ভাই।
–ব্যস। আর বলতে হয় না কিছু। খুলে যায় সম্পর্কের ঝাঁপি। সমাদর করে নিয়ে যায় বাড়ির ভেতর। ডাকাডাকি শুরু করে মলয়। দাদা, দেখে যা কে এসেছে। ভাবী তোমরাও এসো।
আকাশ হড়বড় করে বসার ঘরে আসতেই বুকে জড়িয়ে ধরে কাশেম। বলে, ভাই আমি কাশেম। গুল বাহাদুরের নাতি।
কী আনন্দ বাড়িতে। হেসে কেঁদে কাটে কিছু সময়। ছেলেমেয়েরা এসে টানাটানি করে পোঁটলা ব্যাগ নিয়ে গেল রান্নাঘরে। বড় বউ, মানে আকাশের বউ নাসিমা চটপট চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হলো। ছোট বউ সুমি পোঁটলার জিনিসপত্র ঢেলে ফেলে বড় বড় দুটো ডালিতে। পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙা, আমড়া, খোসা ছাড়ানো নারকেল, মুড়ির মোয়া, খই, খেজুরের গুড়, তালের গুড় এবং তিলের খাজা।
সাহস, মল্লিকা, ঝুমকো, সাগর খুশিতে হাততালি দেয়। চটপট তুলে নেয় যার যা পছন্দ। সবচেয়ে আদর হলো পেয়ারা আর তিলের খাজার। চার ভাইবোন বলতে গেলে শিশু। যতটা কলকল খলখল করল, ততটা খেতে পারল না। ছোট বউ খাজার প্যাকেট খুলে দিল। নরম মচমচে মিষ্টি জিনিস। খুব পছন্দ তাদের।
ভাইপো-ভাইঝিদের কোলেবুকে তুলে আদরের সীমা রাখল না কাশেম। ছোট দুটোকে এমনভাবে লোফালুফি করল যে ভয়ে ওরা কেঁদেই দিল। তাও কি ছাড়ে ওদের চাচা!
বিশাল চেহারা। চমৎকার। চমৎকার স্বাস্থ্য। চেহারায় গুল বাহাদুরের ছাপ আর চিকনকালা গ্রামের মোতি রানীর বর্ণ। আকাশ মলয় আর কাশেম যে আত্মীয়, এটা না বললেও বোঝা যায়।
অনেক গল্প করে তারা রাতে। মলয়ের মনে একটা কথা খচখচ করে। শেষে না জিজ্ঞাসা করে আর পারে না। বলে, কাশেম দাদা, তুমি নাকি বাংলা মদ খেতে শিখেছ? মলয়ের কথা এরকমই কাটা কাটা।
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কাশেম। বলল, এটাও শুনেছ তোমরা?
–হ্যাঁ। কিন্তু হাসছ কেন এমন করে?
–ঘটনাটা হাসি এবং দুঃখেরও ভাই।
–লোকে বলে, যা রটে তা কিছু বটে।
আকাশ বলে, বাদ দে তো মলয়। কীসব প্রশ্ন করছিস?
–নারে আকাশ, ও ঠিকই করছে। সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ থাকা ভালো না।
যাই হোক, জানা গেল সব। ছোট ভাই জসিম চায়নি সম্পত্তি ভাগ করতে। চেয়েছিল জসিমের বউ মরিয়ম। বাপের বাড়ির জমিজিরাত কিছু পেয়েছিল সে। তার ইচ্ছা হলো, সেগুলো বিক্রি করে বাড়ি সংস্কার করবে এবং দোতলা করবে। কিন্তু পুরো বাড়ি নয়। শুধু তাদের অংশটুকু। তো বাড়ি ভাগেরও প্রশ্ন ওঠে। জসিমের ঘোর আপত্তি তাতে। ছোট বউ তখন তার বখাটে ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তি করে একটা নিন্দে রটায়। ছোট এলাকার লোকজন মানুষ তো ডোবার মাছ। আফিমের গোলা টুপ করে গিলে খায়। ওরাও, মানে পাড়ার লোকজন বিষ খেল। ক্রমে দুই বউয়ের মধ্যে মন কষাকষি। ফলমূল নিয়ে কাড়াকাড়ি। অযথাই। কাশেমের বউ কাকবন্ধ্যা। একটা ছেলের জন্ম দিয়ে ছুটি নিয়েছে। সেই ছেলে মানে তপন লেখাপড়ায় ভালো। খেলাধুলায় ভালো। সেটাও একটা রাগ ছোট বউয়ের। জসিমের দুটি ছেলে আঁতুড়েই মারা যায়। আর হলো না কেউ। খালিই রইল ঘর।
প্রথমে উঠোনে সীমানা দিতে হলো বাঁশের হ্যাচার (বাঁশকে একদিকে কেটে দা দিয়ে ছোট

ছোট করে ফাটায়, কাটে না, তাতে সমান একটা ফাটা ফাটা বাঁশের পাতার মতো হয়) বেড়া দিয়ে। ক্রমে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ফাটতে শুরু করে। খাওয়া-দাওয়া, তরকারি লেনদেন তো আগেই বন্ধ হয়েছিল। প্রাণের ভাই পর হয়ে গেল। প্রবাদ আছে না, চন্দনের সুগন্ধি গাছে বিষাক্ত নাগিণী থাকলে সাবধান হতেই হয় মানুষকে। চন্দন কাঠ তখন কিনতে হয়। গাছ থেকে ডাল কাটা সম্ভব হয় না। মনটা হাহাকার করে ছোট ভাইটার জন্য। তখনই মনে হলো, আমার আরো দুটি ছোট ভাই তো আছে ঢাকায়। চোখ ছল ছল ছল করে ওঠে তিন ভাইয়ের। শের আতর থাকলে হয়তো কপাল ঠুকে কাঁদত। প্রজন্মের হীনমন্যতায়।
মলয় বলে, থাক দাদা আমাদের সঙ্গে। বছরটা তো কদিন পরই শেষ হবে। দেখাই যাক না, একাত্তর সালটা কেমন যায়। এবার যাব হড়গ্রামে। যদি মিটমাট সম্ভব হয়। একবার চেষ্টা তো করতে হয়।
কাশেম বলে, তা আর হবে না ভাই। মাটি ফেটে দহ তৈরি হয়েছে। সবই কপাল।

ছয়

আকাশ আর মলয় ভাগ্যবান। নাসিমা আর সুমি তাদের সংসারে যেন অনিঃশেষ শান্তির বাতাস। দুই জায়ের সমঝোতা খুবই ভালো। সংসারের সবকিছু করে যায় মিলেমিশে। ভাসুর কাশেমকে তারা বড় ভাই হিসেবে গ্রহণ করা। ভাসুর তো বউমাদের (উত্তরবঙ্গে ছোট ভাইয়ের বউদের বউমা বলে সম্বোধন করার রীতি) সংসার দেখে দারুণ খুশি অথচ তারা দুই ভাই মিলেমিশে থাকতে পারল না। শুধু বউদের জন্যই। কষ্ট হয় তার। কেন ওরা বোঝে না ভালোবাসা মমতা হলো স্রষ্টার তৈরি দখিনা বাতাস আর বেহেশতি নহরের পানির মতো। সবাই তুলে নিয়ে মনপ্রাণ ভরাতে পারে। এ সম্পদের সীমা নেই, শেষ নেই।
–ভাইজান, ডাকল নাসিমা।
–বড় বউমা?
–চা হয়ে গেছে।
–আমাকে একা কেন মা? আকাশ মলয় কোথায়?
–সবাইকে দেব। আপনি বারান্দায় এলে সবাইকে পাবেন।
–ওরা নামাজ পড়তে যায় না মা?
–মাঝে মাঝে যায়। অনেক রাতে ঘুমায় তো!
–চায়ের আসর শেষ হতেই সুমি নাশতা তৈরি করে ফেলে। আলু-বেগুনের মাখামাখা তরকারি আর রুটি হলো রুটিন নাশতা। বন্ধের দিন কোনো সময় পরোটা বা লুচি আর ডিম ভাজি। সুজির হালুয়া বা ফিরনিও থাকে মাঝে মাঝে। টেবিলে মৌসুমি ফল কখনো থাকে। কখনো বা আলু-বেগুনের তরকারিটা থাকেই। সবারই পছন্দ।
কাজের একটা মেয়ে আছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। ঢাকায় ওদের ডাকে বুয়া বলে। নামধাম লাগে না। রাজশাহীতে বলে 'বেটি'। এক বেলা কাজ করে বুয়া। কিছু বলতে হয় না। নিজের কাজ দেখে বুঝে করে যায়। বয়স বোঝা যায় না। মাথায় ঘোমটা তো থাকেই, নাকে কাপড় দিয়ে রাখে বাড়ির কর্তাদের সামনে এলে। হড়গ্রামে তাদের বেটিও নাক ঢাকে তার সামনে এলে। এ জন্যই হয়তো নাকে লজ্জা লাগার প্রবাদটা তৈরি হয়েছে।
এমন আনন্দঘন পরিবেশ ছেড়ে যেতে মন না চাইলেও যেতে হবে কাশেমকে। অনেক দিন হলো সংসার ছেড়ে এসেছে। বউটা তাগিদ দিচ্ছে। কিছু খিরসাপাত ধান লাগানো হয়েছিল। সেটাও কাটা-মাড়াই করতে হবে। পোলাওয়ের জন্য খিরসাপাত চাল সারা বছরই ঘরে থাকে। শুধু যে উৎসবের জন্য তা নয়, মাঝে মাঝেই ভালো-মন্দ রান্নার প্রয়োজন হয়। পোলাও রান্না করলে চারদিক ম ম করে খোশবুতে। কিছুটা সঙ্গে এনেছিল ঢাকায়। বউমারা রান্না করল। এই

আতপ চালে পায়েস এবং খেজুর গুড় দিয়ে খিরও চমৎকার হয়। যাই হোক, ধান-চাল ঘরে উঠলে গৃহস্থের আনন্দের শেষ থাকে না।
ঢাকা রাজশাহীর দূরত্ব যাই হোক, যাওয়া-অসায় সময় লাগে প্রায় ৯-১০ ঘণ্টা। বাসে করে আরিচা, সেখান থেকে জাহাজে নদী পার হতে জীবনটা ত্যানা ত্যানা হয়ে যায়। জাহাজে গাড়ি নামা-ওঠায় কম করে দু-তিন ঘণ্টা। নদীর ওপর তিন ঘণ্টা। আরিচা থেকে নগরবাড়ীর পথে উজানে যেতে হয়। তাই সময় বেশি লাগে। আসার পথে আধঘণ্টা কম লাগে সময়। তারপর নগরবাড়ী থেকে আবার যাত্রা। যদি সময়মতো ফেরি-জাহাজ না পাওয়া যায়, তাহলে কষ্ট বাড়ে যাত্রীদের। কিছু করার নেই। জাহাজে সব রকম খাবার পাওয়া যায়। নদী পাড়ের দুই ঘাটেই গরম ভাত আর টাটকা মাছের ঝোল। অমৃত মনে করে খায় শত শত যাত্রী। কাশেমের খুব পছন্দ। ওর ধারণা, নদীর পানিতে রান্না বলেই ভাত-তরকারির এত স্বাদ। এমনকি প্রায় পানির মতো ডালেরও স্বাদ জবর।
বউমারা গুছিয়ে খাবার দিয়েছে কাশেমকে। পরোটা, সেদ্ধ ডিম, কষানো মাংস আর ডিমের হালুয়া। কোনো কারণই শুনল না কেউ। বাড়ি পৌঁছাতে রাত আটটা হয়ে গেল। বাপরে বাপ! ধকল বলে ধকল। কিন্তু কাশেমের বাড়িতে আলো নেই কেন? ধক করে ওঠে বুকের ভেতর। গলা ঝেড়ে কাশে। বউ বেরিয়ে এলো। স্বামীকে দেখে সে হাউমাউ করে কেঁদে বলে, এতদিনে এলে?
–কী হয়েছে বড় বউ?
–বরিন্দে ধান কাটা নিয়ে মারামারি হয়। জখম হয় জসিম। ওর একটা পা কেটে ফেলতে হয়েছে। ওরা সবাই রাজশাহীতে। মেডিকেলে অপারেশনও হয়েছে।
পাথর হয়ে গেছে কাশেম। জসিম তার একমাত্র ছোট ভাই। কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে ঝুম মেরে থাকে কাশেম।
বউ বলে, কালই তোমাকে রাজশাহী সদর হাসপাতাল যেতে হবে।
–না বউ, এখনই যাব আমি।
–খাওয়া-দাওয়া করে যাও। রাতে থাকতে হবে ওখানে। মরিয়মটা যে একা একা কী করছে?
–তপন কোথায় বউ?
–সেও তো তিন দিন হলো চাচার কাছে হাসপাতালে আছে। এবার কাঁদে কাশেম। মনে পড়ে মায়ের কথা, পানি কাটলে দুই ভাগ হয় না। তাই তো! আপন ভাই কোনো দিন পর হতে পারে? চোখের পানিতে কষ্টে ডোবাটা ভরে গেল। মনেই হলো না তাদের মধ্যে মন কষাকষি হয়েছে। চোখ মুছে বলে, বউ আমি আসি।
–একটু কিছু খাবে না?
–খিদে নেই। অনেক খাবার দিয়েছিলে বউমারা। এখনো আছে ব্যাগে। বের করে খেয়ে নিও। নষ্ট করো না। তপনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। সে একটু বিশ্রাম নিতে পারবে।
রাস্তাঘাট ভালো না। বাস বন্ধ হয়ে যায় নয়টার আগেই। তবু তাকে যেতে হবে সদর হাসপাতালে। কিছুটা রিকশায় কিছুটা হেঁটে কাশেম হাসপাতালে পৌঁছাল রাত সাড়ে দশটায়।
ওয়ার্ডের বেড়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে জসিম। বাম পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাটা। রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা। পাশে মরিয়ম আর তপন। কী অসহায় একটা পরিবেশ! ভাইকে দেখে জসিম ফুঁপিয়ে ওঠে শিশুর মতো। ভাইয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে কাশেম। দুই চোখে তার শ্রাবণের ধারা।
জসিম বলে, মাফ করে দে দাদা।
–অমন করে বলিস না জসি। তুই আমার জানের জান ভাই না? আমার কাছে তোর কোনো অপরাধ নেই সোনা ভাই। মরিয়ম উপুড় হয়ে পড়ে কাশেমের পায়ে। বলে, আমার পাপেই এমন হলো বড়দা। কী হবে এখন? ও বাঁচবে তো দাদা। আমাকে মাফ করেন বড়দা।
–ওঠ বউমা। এখন কান্নার সময় নয়। একটু সামলে নিলেই ওকে আমি ঢাকায় নিয়ে যাবে।
–সে যে অনেক টাকার ব্যাপার দাদা! ভেজা লাল চোখে তাকায় মরিয়ম। বলে, পাটা তো আর ফিরে পাবে না! আবার কাঁদে সবাই মিলে। কী হলো এসব?
তপন বাড়ি এসে বলে মাকে সব ঘটনা। বলে না শুধু শিরিনার কথা। কোনো পরমানুষ এত প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন। সেবা যে শুধু হাতে বা কাজে নয়, মনেরও ব্যাপার, তা বোঝা যায় শিরিনাকে দেখলে।
শ্যামলা মেয়ে শিরিনা। মুখে তার কচি কলাপাতার পেলবতা। প্রসন্ন মুখে মায়াভরা বিষণ্ন দুটি চোখ। রোগা শরীর। কাজের ফাঁকে চাচির সঙ্গে বসে বসে গল্প করত। ঘড়ি দেখে ছুটে যেত দায়িত্ব পালনের কাজে। ওয়ার্ডের সবাই তাকে ডাকে সিস্টার বলে। চাচি ডাকে শিরিনা বলে। চাচা বলে, মা শিরি। ডাকাডাকি নেই কেবল তপন আর শিরিনার মধ্যে। ওরা আপনি সম্বোধনে কথা বলে।
মাত্র চার দিনের পরিচয়। কিন্তু তপনের মনে হয় যেন কত জনমের চেনা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবি। এই তো সেদিন, হয়তো বা মাত্র পূর্বজনমেরই কথা, তারা খেলে বেড়াত গাঁয়ের খোলা মাঠে। কখনো জমির আলে। বৈশাখ এলে মহুয়া গাছের তলায় ফল কুড়িয়ে খাওয়া। বর্ষায় পানি সিঙাড়া সংগ্রহ করা। গাছে উঠে কদম ফুল পাড়া। বৃষ্টি এলে দৌড়ে ছাতিম গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া। তারপর কচুপাতা মাথায় দিয়ে দৌড়ে বাড়ি যাওয়া।
মা ডাকে, কী রে ভাত কটা খেয়ে নে, বসে আছিস কেন?
চমকে ওঠে তপন। সে কি জাতিস্মর হয়ে যাচ্ছে? এত সব সুখস্মৃতি আসছে কোথা থেকে তার মনে? বলে, এই তো খাচ্ছি মা।
প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয় তপনকে। কখনো বাড়ি আসে কাশেম। বাড়ি আসতে চায় না মরিয়ম চাচির। তবু আসতে হয়। গোসল করা, কাপড় বদল করা, চাচার কাপড়-চোপড় ধোয়া এবং কিছু নিয়ে যাওয়ার কাজগুলো করার আর কেউ নেই। চাচির গরু বর্গা দেয়া। মাঝে মাঝে দুধ নিয়ে আসে হরু ঘোষ। লাভ একটাই, প্রতি কোরবানি ঈদে দুটো বাছুর দিয়ে যায়। একটা বিক্রি করে দেয় চাচা, আর একটা কোরবানি দেয়া হয়। দুচার দিন যে দুধ দিয়ে গেছে হরু ঘোষ, তা দিয়ে মা খির দুধ চিতই বানিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
চাচা এখন বসে খেতে পারে। চিতই খেতে খেতে সেদিন তপনকে বললো, ভাবির হাতে যাদু আছে তপু। কি যে ভালো হয়েছে খেতে! তাই না, বল?
- জানি না চাচা। আমি তো খাইনি।
– মানে কিরে তপু?
– মা সব কটাই তোমাদের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।
– তা বলে তুই একটা পিঠাও খাবি না?
– মা বলেছে, দুধ তো বেশি না। পিঠাও কটা মাত্র। তুমি নাকি খুব ভালোবাসো দুধ চিতই।
তপন হাসে চাচার দিকে চেয়ে।
- দাদাকে দেয় তো খেতে?
– ভালোই বলেছো চাচা। বাবা একদিন খেতে চেয়েছিল। তো মা বললো, এতে তোমার হক নেই গো তপুর বাবা। হাপুস নয়নে কাঁদে চাচা। বলে, বুঝেছি। আমিই বলেছিলাম একদিন যে, আমার নিজ কোনো জিনিসে তোমার হক নেই দাদা। কথা শেষে পিঠার বাটি সরিয়ে রেখে চাচা আবার কাঁদে। হায়রে! এমন ইমানদার দাদা ভাবিকে সে কষ্ট দিয়েছে? মরিয়মকে দায়ী করে না জসিম। এটা তো তারই দোষ।
শিরিন এলো ডিউটিকে। বললো, কাঁদছেন কেনো চাচা? খাবারটাও শেষ করেননি?
– আর খাবো না মা। এই ছেলেটা কষ্ট করে বয়ে আনে খাবার। আমার ভাবি কষ্ট করে সব রান্না করে। আর ওরা না খেয়ে সবটুকু পাঠিয়ে দেয় আমার জন্য।
হাসে শিরিন। বলে, আমরাও তাই করি চাচা। আপনি খুবই অসুস্থ এখন। ভালো করে খেতে হবে না?
– না না, সে কথা নয় মা।
– থাক না চাচা। তপন বলে, পরে হবে কথা। পিঠা রেখে দিই। পরে খেয়ে নিও।
– ওটা তুই খাবি তপু।
– আমার কি শরীর খারাপ? আমি তো সবই খাচ্ছি চাচা।
– ইমও তো খাই। তাহলে ফেলে দিস। আমি খাবো না সাফ কথা। শিরিন বুঝতে পারে, কোথাও একটা মান অভিমানের ঘটনা আছে। বলে, চাচা, অসুস্থ থাকলে রাগ করতে নেই চাচা।
– রাগ করিনি মা। দাদা ভাবি এমন কি তপুও আমাকে কাঁদাতে চায়। দোষ আমারই। সেটা জানি।
– কি হচ্ছে চাচা? উনি কি ভাবছেন বলতো?
– আমাকে শিরিনা বলে ডাকতে পারেন। তবে আমি কিছুই ভাবছি না। এদেশের মেয়ে না? মান

অভিমান অপমান সবই দেখেছি।
– ঠিক আছে। আমাকেও তাহলে তপন বলে ডাকতে হবে। এই যে, এই যে, তাই যে আর চলবে না।
হঠাৎ একটা সুগন্ধি বাতাস বয়ে গেলো। উড়ে গেলো মান অভিমান, সঙ্কোচের জড়তা আর দূরত্ব। হাসি ফুটলো সবার মুখে।
– এবার আমি একটা অনুরোধ করি মা?
– অনুরোধ কেনো চাচা? আদেশ করেন, শিরিনা বলে।
– আমার সামনে তোমরা দুজন পিঠা দুটো খাও। আমি তো খেয়েই নিয়েছি দুটো।
মুখটা মলিন হলো শিরিনার। চুপ করে শুনলো। মাথা নেমে গেলো মাটির দিকে। দুচোখে অশ্রুর ধারা।
– কি হলো মা শিরি? তোমাদের বুঝি খেতে নেই রোগীর জিনিস?
চোখে-মুখে শিরিনা বলে, না চাচা তা নয়। তা নয়। ছি ছি কি বলেন?
– তবে?
– আমাকে ভালোমন্দ খাওয়ার জন্য কেউ অনুরোধ আদেশ কিছুই করে না। বাবা মা নেই আমার। মনে মনে বলে, থাকি মামা-মামির অপমান আর গঞ্জনার মধ্যে।
– যাক ওসব কথা মা। এখন একটু খাও তো। তারপর কথা শুনবো। তপন বলে, কোথায় থাকেন আপনি? সেটাই তো জানা হয়নি এখনও।
– মামার বাড়ি। কাদিরগঞ্জের শেষ মাথায়।
– নাচালে। ট্রেনে যেতে হয়। তবে সেখানে কেউ নেই এখন।
একমাস দুদিন পর চাচা বাড়ি ফিরলো। হাসপাতালে থাকার সময় আকাশ আর মলয় চাচা ঢাকা থেকে এসেছিলো একবার। তবে খোঁজ খবর রেখেছে। টাকাও দিয়েছে। ঢাকায় চিকিৎসার জন্য গেলে আকাশ চাচাদের বাসায় থাকার কথাও পাকা। গুল বাহাদুরের দিল তো বইছে ওদের হৃদস্পন্দনে। মানুষকে তো ভালোবাসেই, আত্মীয়-স্বজনকেও জানটা খুলে দিতে চায়। মুক্তিযোদ্ধা গুলের পরিবারে জসিম নিজেকে এই প্রথম বেমানান মনে করলো। প্রজন্মের ভাটির টান যতোই থাকুক, যেমনই থাকুক, উৎস তো একই। মরিয়মও বুঝতে পারছে নিজের হীনমন্যতা। একতার সন্ধি যে কতো স্বস্তিদায়ক! এতো বড়ো বিপদে কি হতো নইলে!
মলয় চাচাও শিরিনাকে খুব পছন্দ করলো। যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি মায়াবতি। আকাশ চাচা তো সন্ন্যাসি। ভালোমন্দ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই। রাগঝাল নেই। কোনো কিছুর জন্য বায়নাক্কা নেই। নিরামিষ গোছের মানুষ। আজকাল দাদা পরদাদার কথা বলে। বীর মুক্তিযোদ্ধা গুল বাহাদুরকে নিয়ে কিছু লেখতে চায়। লেখতে চায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়েও। এরা দেশের হীরক সন্তান। এঁদের কথা জাগিয়ে রাখতে হবে প্রজন্মের মনে। স্বাধীনতার জন্য ওঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন সেই প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। ওঁদের কথা বাতিঘরের মতো। যার ভেতরে জ্বলবে অনির্বাণ শিখা। অনির্বাণ জীবন কাহিনী। এমন যে নিরামিষ চাচা, সেও পছন্দ করলো শিরিনাকে। বলেই ফেললো, বড্ড ভালো মেয়ে রে। ওর কথা আর কাজ দেখলে প্রাণজুড়িয়ে যায়। কথায় কথায় শিরিনা বলেছে, ঢাকায় চান্স পেলে নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নেবে। কিন্তু তার যা কপাল! তপন ঢাকায় যাবে ফিজিক্যাল এডুকেশনে ট্রেনিং নিতে। এই ট্রেনিং থাকলে হড়গ্রামের হাই স্কুলে খেলার শিক্ষকের চাকরিটা পাবে। আইএ পাস করে এই স্পোর্টসের জন্যই পড়াটা হয়নি আর। আজ জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, কাল বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা নিয়ে ছুটে বেড়াতো। আসল কথা, দেশ ঘাট ফেলে এসে উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে বাবা চাচার কষ্ট তাকেও তো স্পর্শ করেছিল। তেমন কিছু বুঝিয়ে বলতে পারতো না। কিন্তু অব্যক্ত কষ্ট তাকে অস্থির করে রাখতো। ভালো লাগতো না কিছু। এপারে এসে স্কুলে পড়তেই ভালো লাগতো না তার। বাবা মা হয়তো না বুঝেই বকতো পড়ার জন্য। তারা নিজেরাও তো কিছু করতে পারেনি। ছেঁড়া কাগজের মতো হয়ে গেলো সোনার সংসার। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই বুঝতে পারছে তপন। ভেবেই রেখেছে, ঢাকায় এলে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে বিএ-টা পাস করবে। বাবা চাচারই শুধু উদ্বাস্তু নয়, সেও তো তাই। ছোটো বেলায় এসেছে এদেশে কিন্তু তার প্রজন্ম তো এদেশের মাটিতে জন্ম নেবে। তারা হবে ভূমি পুত্র। সেজন্য তৈরি হতে হবে তাবে।
নাচোলের সাঁওতাল পাড়ার মেয়ে শিরিনার জীবন কাহিনী তাকে পরিণত করেছে। শিরিনের মা ছিল সাঁওতাল বংশোদ্ভূত। কৃষ্ণকলিকে ভালোবেসে বিয়ে করে বরিন্দের এক যুবক। উদ্ধত দাঙ্গাবাজ পুরুষ সিরাজ। পরের জমির ধান কেটে নিতো গায়ের জোরে। তারপর পলাতক দুতিন মাস। একবার সাঁওতাল পাড়ায় আশ্রয় নেয়। দেখা হয় কষ্টি পাথরের খোদাই করা মূর্তি মানচু-র সঙ্গে। চুম্বক নারী মানচু। কাটা কাটা কথা বলে। অন্যায়কে অন্যায় বলে মুখের ওপর। স্কটিকের মতো স্বচ্ছ দুচোখে তাকায়। কালো মানুষের ভিড়ে অবাক করা কালো মানিক। প্রেমে পড়ে গেলো দাঙ্গাবাজ পলাতক সিরাজ।
প্রেম হলো। বিয়ে হলো। শিরিনার জন্ম হলো। নামটা শখ করে দিয়েছিলো সিরাজ। জীবনের স্বাদে ঘ্রাণে রঙে রসে সিরাজ যখন বিভোর, তখন একদিন শেষে রাতে তাকে ধরে নিয়ে গেলো পুলিশ। সে নাকি খুনের আসামি। ধান কেটে নেয়ার দাঙ্গায় খুন করেছে দুজনকে। বিচার হলো সিরাজের। সাজা হলো সারাজীবন সশ্রম কারাদণ্ড। শিরিনার বয়স তখন আট মাস। কেঁদে কেটে মানচু পাগলের মতো হয়ে গেলো। নিবে গেলো কালো মানিকের চোখের আলো। তবু বিধির দয়া হলো না। বড়ই পাষাণ প্রাণ তাঁর। কবে কখন যক্ষা হয়েছিল কে জানে? সিরাজের ফুসফুসে সেই ক্ষয় রোগ জেগে উঠলো চরম রোষে। তিন বছর যেতে না যেতেই মারা গেল সে। শোক-দুঃখ বিরহ তাপে আধমরা মানচুও দুদিনের জ্বরে বিদায় নিলো পরের বছর।
সিরাজের বাবা মানুচুকে মেনে নেয়নি কোনোদিন। একমাত্র ছেলের একমাত্র কন্যা শিরিনার মুখও দেখেনি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় জাফর আলি উন্মাদ হয়ে উঠলো শিরিনাকে দেখার জন্য। শিরিনা এখন হাসপাতালের নার্স। মামা রাজশাহীতে এনে জুনিয়র গার্লস মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিল ভাগ্নিকে। পাস করার পর আর পড়ানো সম্ভব হয়নি। বাড়িতেই থাকতো। ধীরে ধীরে ঘরের কাজ শিখলো। সংসারের যাবতীয় কাজের হাল চাপিয়ে দিলো মামি তার ওপর। শাসন পেষণ কটু ভাষণ আর খুনি বাবার খোঁটায় শিরিনা অস্থির হলেও মুখ বুজে সব সহ্য করতো। কারণ, যাওয়ার তো কোনো জায়গা নেই। দাদুর কোনো খবরই সে জানতো না। শুধু জানতো, তিনকুলে কেউ নেই তার।
মামি ওর বিয়ে ঠিক করলো এক মাঝবয়সী জেলের সঙ্গে। সাহেব বাজারে দোকান নিয়ে ভালো আয় রোজগার করে। তিনটে ছেলেমেয়ে এবং বউ আছে। তাতে কি? পয়সা আছে দ্বিতীয় বৌ রাখার। দেখতে এলো প্রথম বৌ-কে নিয়ে। সে পছন্দ করলে তবে বিয়ে হবে। শিরিনার বয়স তখন ষোলো সতেরো হবে। প্রথম দর্শনেই বৌটি বললো, টম্ মা, খুনির মেয়েটা খুশশুন্দর তো! মাথা বিগড়ে গেলো শিরিনার। বললো, আমার বাবা খুনি না। অন্যেরা খুন করে দোষ দিয়েছে বাবাকে।
– বাপ্পুরে। বিষ তো জবর। আগে চলো তো ঘরে, তারপর সুজা বানাবোহিনি। খাটাশ মেয়ে কতি কারা!
ইলামিত্রের সাগরেদ নাচোলের সাওতাল মেয়েরা। সাগরেদ ছিলো মানচুও। তেজি মেয়ে ছিলো। কিছু তো পাবেই শিরিনাও। সে বললো, আমি বিয়ে করবো না। যেনো বোমা ফাটলো ঘরে।
বড্ড শাস্তি দিয়েছিলো সেদিন মামি। লোকজন চলে যাওয়ার পর ঝাঁটা লাঠি যা পেলো হাতের সামনে, তাই দিয়ে মেয়েটাকে নির্দয়ের মতো মারলো। রক্তাক্ত শিরিনার জ্বর এলো রাতে। মামার সাধ্য নেই ডাকিনি বৌকে বলে কিছু খাবার দেয় তাকে। পাড়া পড়শিও জানলো ঘটনাটা। এতোবড়ো পৃথিবীর দশ দিকের বাতায়ন বন্ধ শিরিনার সামনে। কি করবে সে? সব যে অন্ধকার! শুধুই ভাবে, একটা মেথরানির কাজ পেলেও সে করবে। এই দৈত্যকূপে আলো নেই। বাতাস নেই। প্রাণ নেই। শুধু নরকের তাপ। কান্না ছাড়া একটা দিনও কাটেনা তার। তবু আশা, একদিন সে বের হতে পারবে এখান থেকে।
কিভাবে যে তার নার্সের চাকরিটা হলো, তা জানে না মামি। মামাই অনেক চেষ্টা করে অন্যের সাহায্যে ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে। শিরিনা চেয়েছিলো,

নার্সদের কোয়ার্টারে থাকবে। তাতে মামির আপত্তি। কারণ্ ওর বেতনের টাকাটা নিতে হবে। আর বাড়ির দাসীবৃত্তিটাও চালাতে হবে। সে ব্যবস্থাই চলছে এখনো। তবে রোগীরা সন্তুষ্ট হয়ে কিছু দেয়। সেই টাকাটা জমা রাখে শিরিনা। কোনো দিন চার আনার বাদাম ভাজাও কিনে খায় না। হাসপাতালে আসে আয় হেঁটে হেঁটে। রোদ বৃষ্টি মাথায় পড়ে আশীর্বাদের মতো। তার ভালো লাগে হাঁটতে।

শিরিনার যে একটা মন আছে, সে যে কাউকে ভালোবাসতে পারবে, এসব মনেও আসেনি কখনো। সে যে নারী, তার হৃদয়ের ভেতর যে একটা স্তব্ধ অথৈ সরোবর আছে, সেটা বোঝার অবকাশই পায়নি কখনো। তপন এলো সূর্যের ছটা নিয়ে। কী চমৎকার যুবক! এক মাসের পরিচয়কে মনে হয় যুগযুগান্তের চেনা। কত রোগী আসে, কত রোগী যায়। আসে যায় কতরকম রোগীর সঙ্গী। তপন একেবারে অন্য রকম। জসিম চাচার সঙ্গে সেও চলে গেল। সব শূন্য হয়ে গেল শিরিনার। তপনের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে কি না, জানে না শিরিনা। খাঁ খাঁ করে মন। মামা-মামির বাসায় তার পরিচিত কেউ আসতে পারবে না। তাই বলেওনি ওকে বেড়াতে আসার কথা। তপনও তো বলেনি তাকে যেতে? তবে কি তার কষ্ট একদেশিক? জ্বলে যায় বুক।

তপনই কি ভালো আছে? শিরিনাকে না দেখলে যে এত কষ্ট হবে, সেটা তো বুঝতেই পারেনি সে। ওর কষ্টের কথা যেটুকু শুনেছে, তাতেই বুক ফেটে গেছে তার। ওই দৈত্যগুহা থেকে কেমন করে শিরিনাকে বাঁচানো যায়, সেটা ভেবেছে কত রকম করে! ঘনিষ্ঠ আলাপ তো হলোই না। এমনকি আপনি সম্বোধন থেকে তুমিতেও আসেনি তারা। শিরিনারও কি কষ্ট হচ্ছে তার জন্য? বড্ড জানতে ইচ্ছা হয় তপনের। ওর বাসায় তো যাওয়া যাবে না। বিপদই বটে।

জসিম চাচা ঢাকা যাবে নকল পা লাগাতে। সব ঠিক করেছে আকাশ আর মলয় চাচা। নতুন বছরের শুরুতেই যাত্রা। তপনও ভর্তি হয়েছে ফিজিক্যাল এডুকেশনে পড়ার জন্য। সেও যাবে ঢাকায়।

শিরিনা নার্সিং পড়তে চেয়েছিল ঢাকায়। ওকি যেতে পারবে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একদিন হাজির হলো হাসপাতালে। কপাল মন্দ। দেখা হলো না। সহকর্মীরা বলল, ও ছুটি নিয়েছে এক সপ্তা। ওর দাদুর খুব অসুখ। দেখতে গেছে। কে এক আত্মীয় এসে মুচলেকা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে।

খুশি হয় তপন। যাক, অভাগিনীর তাহলে দরদি কেউ আছে। অনেক কষ্টে শিরিনার দাদুর ঠিকানা সংগ্রহ করে হাসপাতাল থেকেই। যে ওকে নিয়ে গেছে, তাকেই ঠিকানা দিতে হয়েছে। ঢাকায় যাওয়ার আগে দেখা করবেই তপন ওর সঙ্গে। মরিয়া হয়ে উঠল সে। অবশেষে অনেক ভেবে একদিন শিরিনার দাদুর বাড়ি যায় তপন। একটা মাত্র স্টেশন। রাজশাহী থেকে ট্রেন ছাড়লে একটা স্টেশন পার করে পরের স্টেশনেই নামা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা। হেঁটে যেতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। পথের দুই ধারে বাবলা গাছের সারি। গাছভর্তি কাঁটা। তার মাঝে ছোট ছোট হলুদ দৃষ্টিনন্দন ফুল। ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রজাপতি আর ছোট্ট পাখিদের সে কী নাচন। মাঠভরা রবিশস্যের চাষ। নানা রকম ডাল, শর্ষে আর পেঁয়াজ, রসুন লাগানো হয়েছে। শর্ষে ফুলের হালকা মিষ্টি ঘ্রাণে মৌমাছি পাগল হয়ে ঘুরছে। এ জন্য এই এলাকা শর্ষে ফুলের মধুর জন্য বিখ্যাত। মাঝে মাঝে কুন্দ ফুলের গাছ, পাতাগুলো কাঁঠালপাতার মতো। গোল গোল কাঁটাওয়ালা ফল আর বেগুনি ফুলে ভরা ধুতরা গাছ। ভেরেণ্ডা, তারা বলে ভ্যাল্লা, সেই গাছ। গাঁধলা গাছ। কাঁটাভরা গাছে পাতলা পাপড়িওয়ালা হলুদ ফুলের হাসি। ঠিক যেন তাদের দেশের গাঁ। গাঁধলার বিচি সংগ্রহ করে ছোটবেলায় কত দুষ্টুমি করেছে সে। সবাই বলত ছররা। শর্ষেদানার মতো ছোট ছোট কালো বিচি।

কারো গায়ে মারলে চিটবিটিয়ে উঠত। এই গাছের কাণ্ড ডাঁটার মতো রান্না করেও খেতেই দেখেছে সে। কোনো কোনো জমির সীমানা দেয়া আছে স্থলকলমির ডাল দিয়ে। তাতেও ফুল ফুঠে আছে অজস্র। কলমিশাকের মতো বড় বড় পাতা। বাবার সঙ্গে ধান কাটার সময় জমিজমা, নাম না জানা গাছ, ফুল দেখেছে সে। বাবা সবগুলোর নাম বলত। তাল-খেজুরের গাছও কম নয়। নারকেল গাছ বেশ কম। মনটা ফুরফুরে হয়ে যায় তপনের।

সামনেই একটা পাকা বাড়ি। যেন নিঝুম দেশে এক রাজবাড়ি। দূর থেকে তপনকে দেখে ছুটে আসে শিরিনা। বলে, তুমি? এখানে? কেমন করে?

–খুঁজতে খুঁজতে এলাম। দুজনেই হাসে।

–ভেতরে চলেন।

–ভাষা বদলে গেল কেন? ঠিকই ছিল তো!

–মানে?

–তুমি থেকে আপনি হয়ে গেল কি না, তাই বলছি।

–তাই বুঝি? এ মা ছি ছি! কী যে করি না। লজ্জায় মুখ ঢাকে শিরিনা।

–ভালোই তো। লজ্জার কী আছে? বন্ধুর সঙ্গে 'আপনি' 'তিনি' মানায় না।

–আমরা বন্ধু হলাম কবে?

–এই তো এখনই। তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গে।

–কেমন করে যে হয়ে গেল এমন?

–বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ারই বিষয়। অঙ্ক কষে হয় ন।

–এমন সুন্দর করে কথা বলেন না?

–ভুল হলো আবার রিনা। তপন চোখে চোখ রেখে বলে।

রিন রিন করে উঠল শিরিনার সহস্র ধমনি। কেউ তো কোনো দিন তাকে এমন আদর করে ডাকেনি। চোখের সাগরে ঢেউ জাগে। উপচে পড়ে বাঁধ ভেঙে। কাউকে আর কিছু বলতে হলো না। কিউপিড স্বয়ং পুষ্পবৃষ্টি করল দুজনের মাথায়। অভিষেক হলো সম্পর্কের।

–তোমাকে খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে রিনা। মুগ্ধ তপন বলে, এত সুন্দর তোমার লম্বা চুল! দেখা হয়নি আগে।

–করি তো নার্সগিরি। আঁটসাঁট করে বেঁধে রাখতে হয় চুল।

–চুরি ছাড়া সব কাজই ভালো। যাক, বল দাদু কেমন আছেন?

–বয়স হয়েছে তো! বুকে কাশি জমে গিয়েছিল। তার সঙ্গে জ্বর। এখন ভালো। চল, দাদুর সঙ্গে দেখা করবে।

–দাদু কিছু মনে করবে না তো?

–একেবারে না। আমি তোমার গল্প করেছি।

–তোমার দাদুর রাগ পড়েছে রিনা?

–রক্তের সম্পর্ক যে তপু। কতক্ষণ আর থাকে? এই গ্রামে এমন মানুষ ঘাস ধান আর লতায় পাতায় মিশে এতকাল থাকল কিভাবে, সেটা মেলাতে পারছিলাম না। ছেলেকে ক্ষমা করেননি। অথচ আমাকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, ভুল হয়ে গেছে দাদু। ছেলেটাও ছিল জেদি আর অভিমানী।

–এখন পেরেছ সব মেনে নিতে?

–দাদুর পূর্বপুরুষের গল্প শুনে আমি তো দিশাহ-ারা। তার বংশের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা গদরের যুদ্ধে প্রাণ হারান। সেই সেপাইয়ের বংশধর দিল্লি থেকে পালিয়ে আসে বর্ধমানের গোলাপবাগে। সেখান থেকে চুরুলিয়া, আসানসোল, কোলিয়ারি, ঝাড়খণ্ডে পাহাড়ে, মেঘালয়ের বনাঞ্চলে, কোথায় না?

অবশেষে এই অজগাঁয়ে।

চমকে ওঠে তপন। এরাও তবে গদর যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধার বংশধর? কোথায় যেন জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক আবিষ্কার করল তপন। এই সাঁওতালকন্যা তাদেরই ঘরানার? মনে সংশয় ছিল কোনো সম্পর্কে জড়ানো নিয়ে। যে যত কথাই বলুক, ঘরানা বোধহয় একটা ব্যাপারই। সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সামনে চলে আসে সেটা।

সব শোনার পর শরতের মেঘের মতো উড়ে গেল আভিজাত্যের গোপন গুমর।
রিনার দাদুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় তপন। বনেদি চেহারার ছাপ স্পষ্ট। কত যে গল্প দাদুর ভাণ্ডারে। সব শোনা গল্প। পবিত্র সম্পদের মতো সাজিয়ে রেখেছেন হৃদয়ের গহনে। সেগুলো খুলে মেলে দেখেন একা থাকলে। আর মনের মতো মানুষ পেলে গল্পের ঝাঁপি খোলেন। বাড়িভরা মানুষ, কেউ তো আপনার নয়। কাউকে কিছু বলতেও ইচ্ছা হতো না। প্রজারাই দেখাশোনা করে। ছেলের শোকে মাও চলে গেছেন। একমাত্র পুত্র খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলের ভেতর মারা গেলে লাশটা নিতে যান দাদু। যে ছেলের নামও মুখে নেননি কোনো দিন, সে ছেলের মৃতদেহ দাফন করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কবরের ওপর। ছোট একটা সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল। সময় লেগেছিল সেরে উঠতে। মনে মনে বার বার ধিক্কার দিয়েছেন নিজেকে। ছি! নিজের সন্তানকে কেউ বর্জন করে? কেউ কেউ বলেছে, সিরাজ খুনটা করেনি। ভুল সাজা হয়েছে। তখনো মনে হয়নি শিরিনার কথা। মনে পড়েনি একমাত্র পুত্রের একমাত্র বংশধরের কথা। শিরিনা তো মেনেই নিয়েছিল তার সর্বাত্মক এতিমত্ব। ভেবে নিয়েছিল, জীবনটা এভাবেই চলে যাবে। কিন্তু মানুষ যখন তার শেষ ভাবনা ভেবে রাখে, ওপরওয়ালা তখন হাসেন। তাঁর তুনে তো নিয়ত তীর জন্ম নেয়। কাকে কোনটা দিয়ে মারবেন, কাকে কোনটা বিঁধিয়ে টেনে তুলবেন সেটাও থাকে ঠিক করা। তাই তো শিরিনার কাছে একটা চিঠি আসে একদিন। তাতে লেখা, প্রিয় শিরি, তোমাকে দেখার জন্য প্রাণটা আটকে আছে। রাগ নয়। তর্ক নয়। একবার এসো। এটা রক্তের ডাক। ইতি– দাদু।
প্রথমবাবর সাড়া দেয়নি শিরিনা। দাদু তার নাম জানে, এতে অবাক হয়েছিল খুব, তারপর চিঠি এবং দূত। চিঠিতে লেখা, তোমার শরীরে তো আমার রক্ত প্রবাহিত। আমি তো আছি তোমার মধ্যেই। চাইলে মুছতে পারবে না। আর যদি চেয়েই বসি রক্তের ঋণ ফেরত? ধরে নাও তাই। সে কারণেও সামনে এসে দাঁড়াও একবার। ক্ষমা চাইবার সুযোগ দাও। ইতি– শয্যাশায়ী দাদু।
বরফ গলল। শিরিনা চাইল, মামি জানুক তারও কেউ আছে। একটু অহঙ্কারও হলো মনে। একাত্তর সালটা এলোই পাগলা হাওয়া মাথায় নিয়ে। শিরিনা ফিরে এসেছে দাদুর বাড়ি থেকে। এবার মামা মামি একটু অন্য নজরে দেখে তাকে। তপনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। দাদুবাড়ির স্মৃতিটুকু সুগন্ধের মতো মিশে আছে মনে। যখনই মনে হয় দাদুর কথা, তখনই খুশি হয়ে ওঠে মন। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে যেতে বলেছিলেন দাদু। ব্যাপারটা অসম্ভবও নয়। সকালে গিয়ে বিকালে ফেরত আসও যায়। কিন্তু দাদুর কাছে গেলেই তো থাকতে ইচ্ছা হবে দু-চার দিন। সেটা সম্ভব নয়। চাকরিটা তার জন্য অনিবার্য। যদিও দাদু বলেছেন, তার কাছে থেকে যেতে। তা-ও সম্ভব নয়। দাদু বলেছিলেন, ঢাকায় নার্সিং ট্রেনিংয়ে পাঠানো এবং তার ব্যয়ভার বহনও করবেন। কিন্তু তার তো দেরি আছে। খোঁজখবর নেয়া হয়েছে। মার্চ মাসে শুরু হবে কোর্স।
তপন চলে গেছে ঢাকায়। মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়েছে। থাকে পুরান ঢাকার চাচাদের বাড়িতে। সপ্তায় একটা করে চিঠি লেখে দুজনই। বছরটা দুই কদম চলার আগেই এসে গেল ফেব্রুয়ারি মাস। ভাষা আন্দোলনের মাস। রাজশাহী সদর হাসপাতালের গাইনি ডাক্তার ছিলেন করাচির মানুষ। তিনি ভালো সার্জনও। সুদর্শন। মিষ্টভাষী। চটপটে। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থেকে খটমট বাংলা বলতে পারতেন। কখনো ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলতে দেখেনি শিরিনা। অন্তত তার চাকরির তিনটে বছরে তো না। কিন্তু একাত্তরের ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে বললেন শিরিনাকে, হ্যালো ডটার, তুমি এতদিনেও কেন একটু উর্দু বলতে শিখলে না?
–সুযোগ পাইনি স্যার। বিনয়নম্র উত্তর।
–আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মুজাহিদের সঙ্গে মাঝে মাঝে উর্দুতে কথা বলতে পার। ভাষা তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার, না?
–আমি যে কিছুই জানি না স্যার। মনে মনে বলে, মুজাহিদ একটা খচ্চর। বাঙালিদের বলে বোঙ্গালি, মাছছিখোর। যেন সেটাই একটা অপরাধ।
–আমিও জানতাম না, চেষ্টা করে শিখেছি। ও হ্যাঁ, আমি ছুটিতে যাচ্ছি করাচিতে।
- কবে আসবেন স্যার?
- মাসখানেক পর।
- এবার কি ম্যাডাম আর বাচ্চাদের সঙ্গে আনবেন?
হাসেন ডা. কিসমত সরফরাজ। প্রতিবারই বলেন যে, ফ্যামিলি আনবেন বাংলাদেশে। কিন্তু আনেন না। ১০ বছর এরকম করেই কাটালেন। বছরে বড় ছুটি একবার নেন। আর মাঝে দুই-একবার সপ্তাখানেকের জন্য করাচি যান। কাজপাগল মানুষ। সময় ভরিয়ে রাখেন কাজে। বললেন, এবার আনবো না। শুনছি, কি যেন ঝামেলা আছে সামনে।
শিরিনা ওসব বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। তপন চিঠিতে জানিয়েছে, ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গরম। কেন গরম, কি হবে তাতে, তপনের তাতে কি যায়-আসে, বোঝে না শিরিনা। এর মধ্যে একবার দাদুর বাসায় গিয়েছিল শিরিনা। দাদু খোঁজ-খবর রাখেন দেশের। কাগজ পড়েন, রেডিও শোনেন। বলেছিলেন, দু-তিন মাসের মধ্যে দেশে বড় রকম কিছু ঘটতে পারে। অসুবিধা দেখলে চলে আসিস আমার গ্রামের আস্তানায়। ভোটে আওয়ামী লীগ জিতেছে। সেটা মেনে নিতে চায় না পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল। মানে ভুট্টোর দল।
কি ঝামেলা? কিসের জন্য গরম আবহাওয়া? কিসের অসুবিধার কথা ভাবছেন দাদু? ভোটে তো জিতেবেই একপক্ষ। তা নিয়ে কার অসুবিধা? এমা-মামি একেবারেই নির্বিকার। কাদিরগঞ্জ ছাড়িয়ে রেললাইনের ওপারে অনেক উদ্বাস্তুর বাস। মুর্শিদাবাদ আর মালদহ থেকেই মূলত এসেছে ওরা। জন্মভূমি, জীবনের অর্জিত সম্পদ ফেলে আসা মানুষগুলো এখনো গুছিয়ে-গাছিয়ে বসার চেষ্টায় নাকাল। একটুতেই ওদের ভয় হয়। ওরাও যেন কি সব বলাবলি করে! রাজশাহী স্টেশনের কাছে এক মিষ্টির দোকান দিয়েছে উদ্বাস্তু ঝুম্মন মিয়া। কেনা-বেচা সূত্রেই মামার সঙ্গে পরিচয়। একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, শরিফ ভাই, রেডিও খোলেন তো গো। আমাদের নেতা শেখ মুজিবুরের ভাষণ আছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। শোনা দরকার।
মামা বলেন, তুমি হলে আদার বেপারি। বন্দরের জাহাজ নিয়ে ভাবনা কেন?
- সবাই বলছে, নেতা নাকি স্বাধীন বাংলার ঘোষণা দেবেন।
- কি যে বলো না ঝুম্মন মিয়া? কোথা থেকে কি শোনো? ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের গল্প হলো না? স্বাধীন শব্দটার মানে বোঝো?
- না না শরিফ ভাই, যা রটে তা কিছু বটে। খোলেন না ভাই রেডিওটা। আমরা নিজের কানেই শুনি। অনুরোধটা আবেদন হয়ে যায়। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি এলো শিরিনা। ঝুম্মনের কথা শুনে সে বলল– মামা, হাসপাতালেও শুনে এলাম একই কথা।
খন খন করে মাঝি বললেন, তোকে আর তাল মেলাতে হবে না ওদের সঙ্গে। ঘরে যা। ঝুম্মন আছে, দেখতে পাস না?
সত্যি দেখেনি সে। রোগা হ্যাংলা কালোপানা একটা মানুষ মামার সামনে মোড়ায় বসে আছে। বৌ-মারা যাওয়ার পর এই ঝুম্মনই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? যতটা মনে পড়ে, ঝুম্মনই ছিল তার নাম। মিষ্টি বানানোর কারিগর। ময়রা। তার বাবাও এই পেশায় পারদর্শী ছিল। তার দোকানের অমৃতি খুবই বিখ্যাত। আয়-রোজগার ভালো। বহরমপুর থেকে এপারে এসেছে পঞ্চান্ন সালে। মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে বলে উদ্বাস্তুপাড়ায় সবাই তাকে চেনে। ইর্ষাও করে। একেই তার বর হিসেবে পছন্দ করতে চায় তার মামি? দেশে আর লোক নেই? দৌড়ে ঘরে ঢোকে শিরিনা। ভাবতে থাকে, আর কটা দিন। এ মাসের শেষ সপ্তায়ই তার কোর্স শুরু হবে। একবার বেরোতে পারলে আর কোনোদিন সে মামা-মামির সংসারে আসবে না।
শুরু হলো ৭ মার্চে নেতার ভাষণ। কি জলদগম্ভির কণ্ঠ! নেতার মুখের শব্দগুলো যেন গোলার মতো। একটু পরপর লাখো লোকের উল্লাস শোনা যায়। সব কথা বোঝার সাধ্য কি মামা বা ঝুম্মনের আছে? শিরিনাও বোঝেনি। মামি তো শোনেইনি।
- কি বুঝলেন শরিফ ভাই? 'দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বো ইনশা-আল্লাহ' মানে কি ভাই? আমরা কি স্বাধীন নই?
- আমিও বুঝিনি মিয়া। আমরা তো স্বাধীন

পাকিস্তানের মানুষ। আবার কোন স্বাধীনতার কথা বলল নেতা?
- 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে ... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' কথাগুলানের মানে কি শরিফ ভাই?
- আমিও তো বুঝতে পারছি না রে ভাই।
- ঘর পোড়া গরু কিনা, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। কোথায় যাব এবার? হায় আল্লাহ। কি যে আছে কপালে।
- আরে নাহ্, কোনো ভয় নাই। এত ভেবো না তো ঝুম্মন।
- সত্যি যুদ্ধ-টুদ্ধ লাগবে নাকি আবার ভাই?
- হা হা হা, কার সঙ্গে যুদ্ধ? এতই সহজ কথা যুদ্ধ?
- লোকজন বলে, ভুট্টোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে।
- কি বলছ? ভুট্টো কে? ইয়াহিয়া খান হলো দেশের রাজা।
- ভুট্টো নাকি তাকে নাচায়? ইয়াহিয়া তো মদ খেয়ে চার হয়ে থাকে। আরো কি কি সব অশ্লীল কথা ভুট্টো যা বলে, সে নাকি তাই শোনে?
- এত কথা তুমি পাও কোথা থেকে ঝুম্মন?
- দোকানে কতো রকম মানুষ আসে। বসে। খায়। নানান কথা বলে। তাই শুনতে পাই। ওরা আরো বলে, 'বাংলাদেশ ডিক্লেয়ার দিলেই কাম হয়ে যেত একবারে। আমি তো ভয়ে মরি শরিফ ভাই।
- আমি তো কিছুই জানি না। শুনিও না। শরীরটাও জুতের না। বাইরে তো যাইই না।
- নেতাগোছের দু–চারজন লোক কাল বলাবলি করছিল, তারা গা-ঢাকা দেবে। নিজের বাড়ি নিরাপদ নয়। তাদের এক বন্ধুকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মেরেছে দুদিন আগে।
- মানে? কে মারল? কেন মারল?
- জানি না শরিফ ভাই। আজ যাইগা, ভাষণ তো শুনলাম।
ঘরে থেকে শিরিনা সব শুনছিল। তার চিন্তা হচ্ছে তপনকে নিয়ে। যে হুজুগে ছেলে। নিশ্চয় ভাষণ শুনতে গেছে রেসকোর্সের মাঠে। তবে চাচা ওকে খুব দেখে-শুনে রাখে। কেমন এক ভয়ে গুঁড় গুঁড় করে ওঠে বুকের ভেতর। চাকরির সুবাদে শিরিনাও কিছু কিছু কথা শুনেছে। কানে তোলেনি। তপনের একটা চিঠি পেলে ভালো হতো। পাওয়া যেত আসল খবর।
পরদিনই দাদু লোক পাঠালেন শিরিনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আগেই বলেছিলেন দাদু, নার্সিং কোর্সে যাওয়ার আগে তার কাছে থাকতে হবে সপ্তাখানেক। তার তো দেরি আছে এখনো। শিরিনা দোনো-মনো করছিল। এখানে না থাকলে তপনের চিঠি তার হাতে পড়বে না, সেটা তার জানা। মামা মামি ঝুম্মনের কথা শোনার পর গুটিয়ে গেছে ভয়ে। বিনা যুদ্ধে পাকিস্তান পেয়ে ভালোই তো ছিল। কিসের জন্য আবার যুদ্ধ হবে, বুঝেই পায় না শরিফ।
শিরিনা চলে আসে দাদুর বাড়ি। এখানে তো কোনো খবরই নেই। ট্রানজিস্টার থাকে দাদুর ঘরে। মাঝে-মধ্যে খবর শোনা হতো। এখন নিয়মিত খবর শোনেন দাদু। নতুন কিছু নয়, একই কথা। ভুট্টোর সঙ্গে আপসের আলাপ-আলোচনা চলছে। হঠাৎ হঠাৎ দৈনিক পত্রিকা কিনে আনান দাদু। উল্টে পাল্টে দেখে শিরিনাও। স্কুল-কলেজ কি বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকায়?
কদিন পর তপন এলো রাজশাহীতে। মা-বাবা-চাচার সঙ্গে দেখা করাই উদ্দেশ্য। নতুন কাঠের পা নিয়ে চাচা এখনো চলতে পারে না ভালো করে। মলয় চাচা তপনকে বলে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরতে। এর আগে শিরিনাকে একবার দেখতে যেতে হয়। বসন্তের হাওয়া বইছে প্রকৃতিতে। শিমুল মাদার গাছে রক্তমুখী কলি। পাতা ঝরা গাছে ফলগুলো অলক্ত শোভায় হাসলো বলে। শিরিনা আকাশ থেকে পড়ল তপনকে দেখে। এটাই তো চাইছিল সে। মনের ভেতর পাখা মেলল সহস্র প্রজাপতি। দাদুও খুশি হলেন। যতটা সম্ভব ঢাকার কথা বলল তপন। কোনোটাই ভালো খবর নয়। পুরনো ঢাকায় চাচাদের বাড়ির আশপাশে পর্যাপ্ত অচেনা মানুষ এসেছে। কিন্তু এই সময় এমন আজ গায়ে দাদুর বাড়িতেই বা এত লোকজন এলো কোথা থেকে? দাদু বললেন যে, ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়দের তিনিই একত্রিত করেছেন। সবাই মিলে ৭ মার্চের ভাষণও শুনেছেন।
শিরিনা চুপ করে তপনকে বলল, দাদুর হেরেমে লোকজন থাকবে না, তা কি মানায়? ভাষণ শোনা-টোনা ছল।
- কি যে বল শিরিনা? হেরেম শব্দটা খাটে না এখানে।
- খাটে খাটে। রাজার মতো জীবন-যাপন, চারদিকে লোক-লস্কর, হাঁকে ডাকে চলেন, তার জীবন ...
- কি তার? বলে শিরিনা।
- নারীবর্জিত হয় কি করে এমন শানদার জীবন, বলো?
- সংসার ধর্ম সম্ভব না হলে যে পরকীয়াও থাকবে না, সেটা ভাবছো কেন?
- তুমি খুব দুষ্টু হয়েছ শিরিনা। উনি তোমার গুরুজন। ভালো বাসেন খুব।
- সেটা কি অস্বীকার করেছি?
এমন সময় ডাক শোনা গেলো, কই গো দাদু? চমকে ওঠে দুজন। দুই মাঝবয়সী মহিলা দাদুর দুহাত ধরে এনে বসালো বারান্দার ইজিচেয়ারে।
- আমরাই তো যাচ্ছিলাম দাদু, তপন বলে।
- না না ঠিক আছে। আমি নিজেই আসতে চাইলাম খোলা বারান্দায়। ওই দেখ রাধাচূড়া গাছটা ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে গেছে। শিরিনা গিয়ে দাদুর মাথায় হাত রাখে। বলে, চুল আঁচড়াওনি কেন দাদু? শুধু রাধাচূড়া দেখলেই হবে?
- চুল থাকলে তো আঁচড়ানোর কথা রে দাদু!
- যা আছে তাই আঁচড়ে দিচ্ছি। থামো একটা চিরুনি নিয়ে আসি। মহিলা দুজন চলে গেল। তাদের আগে দেখেনি রিনা। এবারই দেখছে। ওরা নাকি পাড়াতুতো শ্যালিকা। বেশ হাসি-মশকারাও করেন দাদু ওদের সঙ্গে।
এবারের ৩-৪ দিন দাদু অনেক কথা বলেছেন শিরিনাকে। দাদুর দর্শনে নারীবর্জিত জীবন কোনো জীবনই নয়। তাহলে তো আদি মানব আদমও থাকতে পারতো একা। শিরিনা হেসে বলেছে, এতদিন পর এসব কথা কেন দাদু? তুমি হলে এ গায়ের রাজা। একদার গদরযুদ্ধে শহীদ যোদ্ধার বংশধর। তোমার একখানা হেরেম থাকলেও আমার বলার কিছু থাকতো না।
- নারে দাদু, হেরেম একটু বেশি হয়ে যায়। তবে সেবা-যত্নের জন্য দু-একজন থাকতেই হয়। গান্ধিরাও ছিল। একাধিক নিশি সঙ্গী। হাসছিস কেন? বলবি নাকি কিছু?
- না দাদু। তোমার কথা বলেই বিশ্বাস করছি। তবে বয়স হলে মেয়েরাও যদি এমন সব পেতে চাইতো? তোমরা কি মানতে?
- তোরাই তো পারিস না ভিতুর দল। দাদুর হাসি আর থামে না। বলেন, এখন আমি নিঃসঙ্কোচ। আমার প্রয়োজন সেবা। আর ওদের প্রয়োজন আশ্রয় এবং সঙ্গ। এতে কোনো অন্যায় তো নেই।
- পরকীয়া অন্যায় নয় দাদু?
- একেবারেই নয়। তাহলে লাইলি-মজনু, ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনীর এত মাহাত্ম্য কেন?
–কী বলছ দাদু?
–ঘটনা তো সত্যি। লাইলি, জুলেখা দুজনই ছিল বিবাহিত। তবু তাদের ভালোবাসাকে কত উঁচুতে তুলে রেখেছি আমরা। আদর্শের মোড়কে ঢেকে রেখেছি বাস্তবতা। তবে ওদের ছিল নিখাদ ঐশী প্রেম।
–মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে। এমন করে ভাবিনি তো কোনো দিন দাদু।
–আসল কথা হলো, ভালোবাসার কোনো ধর্মাধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই। পবিত্রতাই বড় কথা। গভীরতাই সাত্ত্বিকতা।
–প্লিজ দাদু, আর এসব আলোচনা নয়। মাথা ঘুরে যাচ্ছে। হাহা করে হাসেন দাদু। বলেন, তোর বোধ হয় আর ঢাকায় পড়তে যাওয়া হবে না রে।
–কেন দাদু? কেন?
–দেশের পরিস্থিতি ভালো না। বড় ধরনের কিছু একটা হবে। হবেই হবে।
–তুমি জান কিভাবে?
–মন বলছে। অনেক রাতে রেডিওতে বহু কথা শুনছি। তপন এসেছে। ওকেও আর যেতে দিস না ঢাকায়।
–কী যে বল না দাদু? গদর যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক গুল বাহাদুরের বংশধর ও। যুদ্ধ ওর রক্তে নাচে। ও তো কালই যেতে চায় ঢাকায়।
ঘর থেকে চিরুনি নিয়ে রিনা এলো। দাদু চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছেন। রিনা ডাকে, দাদু, ঘুমোলে?
–না রে, এমনি চোখ বন্ধ করেছি।
–তপন কোথায় গেল?
–হয়তো বাথরুমে।

–তা চা দিবি কখন?
–তোমার সেই তাড়া, চা নাশতা আনছেন। সাজানো হয়ে গেছে। এলেন বলে। হাসে শিরিনা।
–খুব রেগে আছিস ওদের ওপর না? ওরা বড় অসহায় রে। চা নাশতা এলো। লক্ষ্য করে শিরিনা, মহিলা দুজন বেশ সুন্দরও। বিষাদমাখা মুখ।

ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে ঘোরে তপন। দুটো শার্ট, দুটো গেঞ্জি, একটা জিন্সের প্যান্ট, ছোট একটা তোয়ালে, শেভিং এবং দাঁত মাজার সরঞ্জাম ওতেই বেশ ধরে যায়। পাশের পকেটে একটা ছোট পানির বোতল আর অন্য পকেটে ছোট একটি চিরুনি। তেল বোধ হয় দেখেইনি তপন। সামান্য কোঁকড়া মোটা মোটা চুল। একবার ব্যাকব্রাশ করলে ঠিক থাকে অনেকক্ষণ। যেন হেয়ার স্প্রে দিয়ে সেট করা।
দাদুর খনন করা দিঘিটায় তপন গেছে আজ ঝাঁপাই পিটতে। সঙ্গে গেছে রিনা। সাঁতার-টাঁতার জানে না রিনা। পানিকে তার খুব ভয়। তপন দাপিয়ে সাঁতার কাটছে। মুগ্ধ হয়ে দেখে রিনা। অসাধারণ সুঠাম শরীর। মাঝে মাঝে বলছে, আমার পিঠে এসো রিনা। সাঁতার কাটার একটু স্বাদ তো পাবে।
আঁতকে ওঠে রিনা। বলে, না না কিছুতেই না। মরেই যাব ভয়ে।
–আমি মরতে দিলে তো? এসো প্লিজ। এসো না! দৌড়ে পালায় রিনা।
মনে মনে ভাবে তপন, কাল তাকে যেতেই হবে ঢাকায়। নইলে চাচারা খুব চিন্তা করবেন। অথচ ঢাকা যাওয়ার আগে মা-বাবার সঙ্গেও দেখা করা জরুরি।
দুপুরে ঢাকা যাওয়ার কথা বলতেই দাদু চমকে ওঠেন। বলেন, ভেবেছিলাম শিরিনাকে নার্সিং কোর্সে পাঠাব তোমার সঙ্গেই। কিন্তু সে তো বাইশ তারিখে যেতে চেয়েছিল।
–ক্লাস শুরু হবে কবে দাদু?
–চব্বিশ তারিখ থেকে। রিনা বলে।
–আসলে রিনা কোর্সে জয়েন করতে পারবে কি না, কে জানে? দাদু বলেন, কাল আমাদের গ্রামের মজনু এসেছে ঢাকা থেকে। রাতে দেখা করে গেছে।
–মজনু কে দাদু?
–এ গাঁয়েরই ছেলে। পড়ে ঢাকা কলেজে। হোস্টেলে থাকে। তো ছেলেরা সবাই নাকি বাসায় চলে গেছে।
–কেন?
–বলতে পারে না কেউ। কিন্তু সবাই কেমন এক আতঙ্কে থাকে। রেডিওর খবরেও নতুন কিছু নেই।
–রোজই শুনছি, আলোচনা চলছে। সমাধান হবে তাড়াতাড়ি। তপন বলে, কিসের আলোচনা আর কিসের সমাধান দাদু, আপনি বুঝতে পারছেন কিছু?
–না দাদু ভাই, কিছুই বুঝি না। সব অনুমান।
–আচ্ছা দাদু, কালই আমি ঢাকায় চলে যাই না তপনের সঙ্গে? রিনা বলে, না হলে একা একাই যেতে হবে। পারব তো?
–ঢাকায় থাকবি কোথায়?
দমে যায় রিনা। তাই তো! হোস্টেলে কি এক সপ্তা আগে গিয়ে ওঠা যায়? নতুন জায়গার চেনে না কিছুই। তপনও চুপ থাকে। সহস্রবার বলতে চাইল, আমাদের বাসায়; কিন্তু বলতে পারে না।
পরদিন তপন রাজশাহী গেল। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে ঢাকায় যাবে। কাঠের পা নিয়ে কাশেম চাচা ভালোই চলাফেরা করছেন।
সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে রোজই মলয় খোঁজ করে তপনের। ঢাকায় যুবকদের দাপাদাপি দেখে এক একবার মনে হয়, তপন যেন ঢাকায় না আসে। আকাশেরও তাই মনে হয়। স্কুল-কলেজ বলতে গেলে বন্ধই হয়ে যাচ্ছে। যাক না কয়েকটা দিন। আলোচনা একটা ঘাটে এসে লাগুক। কী যে হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
মলয় বলে, আচ্ছা আকাশ দাদা, মার্চ মাসটা এত

লম্বা কেন?
–তুই কি ছোট হয়ে যাচ্ছিস মলয়? আকাশ বলে, পাড়ার লোকজন বেশি করে চাল ডাল তেল নুন কিনে রাখছে দেখছি।
–যা ভালো বোঝ, তাই কর। আমি তো ভাবতেই পারছি না কিছু।
আঠারো মার্চের পিচগলা গরমে তপন এলো ঢাকায়। চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই গরমে তাপে প্রাণ আইঢাই সবার। কপাল ভালো যে সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছেই ফেরি জাহাজ পেয়েছিল। মলয় চাচা বলল, তোরা পারিসও ভালো ট্রেনে এলে তো পুড়তে হয় না রোদে।
–নদী পারাপারের ব্যবস্থাটা ভালো লাগে না চাচা। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে জগন্নাথগঞ্জে নামিয়ে দেয় জাহাজ। তারপর সে কী দৌড়াদৌড়ি। কিসের রিজারভেশন আর কিসের কী? কে যে কোন বগিতে উঠে পড়ছে তার ঠিক নেই। ট্রেনটা একটু এগিয়ে যায় ঘাটের দিকে বটে, কিন্তু প্লাটফরম নেই। বয়স্ক মানুষেরা কী কষ্ট করে যে ট্রেনে ওঠে। তাও কি মালপত্র কম কারো? কুলি যাত্রী আর মালপত্রসহ মানুষের ঠেলাঠেলি চেঁচামেচিতে দিশাহারা হতে হয়। তার চেয়ে বাস ভালো চাচা।
তপনের লম্বা বক্তৃতায় মলয় হাসে। বলে, বেশ বলেছিস। এখন যা গোসল সেরে খেয়ে বিশ্রাম নে। সন্ধ্যেবেলা বাইরে থাকবি না একেবারে। বুঝলি?
ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। আলোচনার পর আলোচনা চলছে প্রতি রাতে। রুদ্ধদ্বার আলোচনায় কী এত কথা হয়? রাত এগারোটার খবরে সবই তো চর্বিত চর্বণ প্রসঙ্গ। মানুষের মুখে মুখে তিনটে নাম– ইয়াহিয়া, মুজিব, ভুট্টো। জীবনপ্রবাহে জন্ম মৃত্যু বিয়ে কিছুই আটকে থাকে না। পাশের বাড়িতে দুটো বিয়ের তারিখ পড়েছে পঁচিশে মার্চ দুপুরে। যাওয়া হবে রাতে। একই বাড়িতে দুই মেয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। রিমি আর ঝিমি বদরুন্নেসা কলেজে পড়ে। ওদের বাবা রেলওয়ে হাসপাতালে চাকরি করে। দেড় বছরের ব্যবধানে দুই মেয়ের জন্ম। অনেক কষ্টে অনেক স্বপ্ন নিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছে মেয়েদের। লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে রিমি আর ঝিমি। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসতে শুরু করেছে। খালা মামা চাচা ফুপুরা এসেছে। গম গম করে বাড়ি। মলয় আর আকাশও গা লাগিয়ে সহায়তা দেয় সলি-মুল্লাহকে। ওরা ডাকে সলিম ভাই বলে।
আটচল্লিশ সালেই সলিম ভাই নদীয়া থেকে চলে আসে ঢাকায়। বিনিময়ের সম্পত্তির মধ্যে পাকা বাড়িটাই তার লাভ ছিল। সামনে থেকে দেখতে মনে হয় ছোট বাড়ি। ভেতরে অনেক খোলামেলা। প্রশস্ত উঠোন, উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ির সীমানা। পুব-উত্তর কোনায় অতিথিশালা। চারটা টানা ঘর এবং পাকা বাথরুম। পাতকুয়ো এবং টিউবওয়েল দুটোই আছে। সংসার বড়ই ছিল। বাবা, দুই মা, সে, তার বউ আর ছোট তিনটে ভাইবোন।
আগে কেমন ছিল সংসারের হালচাল, তা জানে না আকাশরা। তারা তো ভালো দেখেনি কোনো দিন। দুই বউয়ের খিটিমিটি লেগেই থাকত। বড় বউয়ের বড় ছেলে সলিমুল্লাহ। বাকি তিনটে ছোট মায়ের সন্তান। সুয়োরানী দেখতে সুন্দর এবং খুব সোজা সরল। দুয়োরানী খুব সাধারণ চেহারার মেয়ে কিন্তু চালাকিতে সেরা। সলিমের চেহারা শুধু মায়ের মতো নয়, স্বভাবেও সরল এবং মিশুক।
দুয়োরানীর ইচ্ছা, সলিমের দুই মেয়েকে সাদামাটাভাবে পরের ঘরে পাঠানো। বাবা ঢাকায় এসে কোনো কাজই করেনি। হাঁপানি তো ছিলই, পায়ে গোদ নামায় কাহিল হয়ে পড়ে। সলিমুল্লাহই টেনে রেখেছে সংসারটা। ছোট মাকে সে সম্মান করে। কিন্তু স্যাকরার বাড়ি গিয়ে রিমিঝিমির গয়নার পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার বিষয়টা মেনে নিতে পারল না। কারণ বরপক্ষকে কথা দিয়েছে, প্রত্যেক মেয়েকে আট ভরি করে সোনার গয়না দেবে।

স্যাকরা নিয়ে এলো মোট আট ভরির গয়না। কারণটা স্যাকরাই বলল। ওদিকে বরপক্ষ বাড়িতে খবর গিয়েছে যে, মেয়েদের গয়নায় ফাঁকি দিচ্ছে সলিম। সুয়োরানী প্রতিবাদ করে বরপক্ষের কাছে। ডাকা হয় স্যাকরাকে। সে বলে, দুই মেয়ের জন্য মোট আট ভরি সোনার গয়না গড়া হয়েছে। সে রকমই অর্ডার ছিল।
প্রবাদ আছে, লাখ কথা না হলে একটা বিয়ে হয় না। অতো দূর যেতে হলো না। মেয়ের বাবা মিথ্যেবাদী, এই অপবাদে ভেঙে গেলো বিয়ে। আকাশ মলয় এবং সলিমুল্লা বারবার বলার চেষ্টা করলো যে, একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে, সেটা ঠিক করে নেয়া যাবে।
বরপক্ষ বলে, কথাটা আগেই জানাতে পারতেন আপনারা। সলিম বলে, আমরা নিজেরাই তো জানি না ঘটনাটা।
- এ রকমই বলে সবাই। বরপক্ষের এক মুরব্বি বললো।
- আপনারা বিশ্বাস করেন, আমি যা বলেছি তাই হবে। আবার গয়না গড়াতে দেবো আমি।
- আজ কতো তারিখ বলেন তো? বাইশে মার্চ। দুদিন পর বিয়ে। আর আপনি বলেছেন, গয়না গড়িয়ে দেবেন?
- বিয়ের সময় না পারলেও পরে দেবো। আমাকে অন্তত এটুকু বিশ্বাস করেন। অপমানে সলিমের গলা ভারী হয়ে যায়।
- বিয়ে হয়ে গেলে বাকি জিনিস আর পাওয়া যায়? বরপক্ষের হুদা চৌধুরী আরও কঠিন কণ্ঠে কথা বলে।
এমন সময় আকাশ আর মলয় আসে। সংক্ষেপে শোনে ঘটনাটা। বলে, আমরা জামিন রইলাম চৌধুরী ভাই। বিয়েটা হয়ে যাক। গয়না আমরা দেবোই দেবো।
- ভেঙে যাওয়া জিনিস কি আর জোড়া লাগে ভাই? বাড়িতে কতো লোকজন এসেছে। তাদের কাছে কি বলবো?
- যা সত্যি তাই বলবেন।
- মান সম্মান সব গেলো আমাদের।
মলয় বলে, এটাকে একটা দুর্ঘটনার মতো মনে করেন চৌধুরী ভাই। আমরা তো বলছি...
- মানী লোকের দুঃখ বুঝবেন না আপনারা।
- মান সম্মান তো আমাদেরও কিছু আছে ভাই, না?
- আছে নাকি? তাহলে এমনটা হতে পারে? মিথ্যে দিয়ে সম্পর্ক শুরু?
- কপাল আমাদের খুব ভালো চৌধুরী ভাই। মলয়ের কণ্ঠে রূঢ়তা।
- তার মানে?
- মানে এই যে, আপনাদের মতো লোভী পরিবারে বিয়েটা হচ্ছে না আমাদের মেয়েদের।
- বা বা বা বা! চোরের আবার বড়ো গলা? তারপর আর কথা হয়নি। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মলয় বের করে দেয় চৌধুরীকে।
সলিমুল্লা বলে, এটা কি করলে ভাই?
- ঠিকই করেছি।
- আমি যে মেয়ের বাবা রে ভাই। কেঁদে ফেলে সলিম।
- তো কি হয়েছে? দাদা চুপ করে কেনো? কিছু তো বলো?
- রিএ্যাকশনটা ঠিক হয়েছে। কিন্তু এ্যাকশানটা কি ঠিক হলো?
- দুটোই ঠিক আছে দাদা। বেয়াদব লোককে মাঝে মাঝে শিক্ষা দিতে হয়।
মেয়ের বাড়িতেও কান্নাকাটি পড়ে গেলো। সলিমুল্লা ছোটো মাকে ডেকে বললো, কেনো এমন করলেন মা?
- তোমার আরও দুটো বোন আছে, তাদের জন্যও তো কিছু সঞ্চয় রাখতে হবে সলিম। দুয়োরানীর ঠাণ্ডা হিসেবি উত্তর।
- সেটা তো নিশ্চয় আমার মাথায় আছে মা।
- তোমার ওপর যেনো তখন চাপ না পড়ে, সে জন্যই ...
- আমার ভালো ভাবতে গিয়ে এতো বড়ো অঘটন ঘটালেন?
সুয়োরানী বললো, তুই যে এতো নিচ তা ভাবতে পারিনি দুয়ো। আমাকে তো জ্বালিয়েছিস চিরকাল। এবার পুতিন দুটোকেও কাঁদালি? সময় তো কারো জন্য বসে থাকে না। দুঃখ আর অপমানের গাঢ় রাত কেটে সূর্য উঠলো আবার। আত্মীয় স্বজন যে বার বাড়ি ফিরে যেতে চায়। সলিমুল্লা বললো, রাজনৈতিক আলোচনা শেষে দেশে একটা সমঝোতা আসুক, তারপর যেও তোমরা।
চব্বিশে মার্চে রিনা আসতে চাইলো ঢাকায়। দাদু আটকে দিলেন। বললেন, কালকে নাকি ফায়সালা একটা হবেই হবে। সেটা জেনেই ঢাকা যাস দাদু। আবারও বাধা।
কি বিশ্রি সময়। তপনের সঙ্গেই শুধু নয়, তার মামা মামি হাসপাতালের নার্স বন্ধু, কারো সঙ্গেই নেই কোনো যোগাযোগ। দাদুর বিশাল বাড়িতে বন্ধু লোকজন থাকা সত্ত্বেও কেমন খাঁ খাঁ করে শোরগোলের অভাবে।
ঢাকার বাড়িতেও ভীতিকর নীরবতা। কোথায় কি হচ্ছে কেউ জানে না। রেডিওর স্বাভাবিক প্রোগ্রামও হয় না। খবর আর ধারণকৃত অনুষ্ঠান বাজে। খবর তো চর্বিত চর্বন।
পঁচিশে মার্চে সবাই সন্ধ্যে থেকে রেডিওর কাছে বসে আছে। আজ শেষ হবে আলোচনা। ঘোষণা আসবে একটা কিছু। মলয় সন্ধ্যের পর বাড়ি এসে বললো, চারদিকে কেমন যেনো থমথমে ভাব। রাস্তা বেশ নির্জন। দারুণ ঝড়ের পূর্বাভাস মনে হচ্ছে।
মলয় এসে বসে পড়লো রেডিওর সামনে। তপনও আছে। সবার মনেই দারুণ অস্থিরতা। অজানা ভবিষ্যতের নিকষ কালো দৈত্যটা রাতের সময়কে কষে জড়িয়ে ধরেছে। কি বিশ্রি প্রতীক্ষা!
রাতে খাওয়ার ডাক এলো। দুই বৌ টেবিল সাজিয়েছে। পটোল ভাজা, ঝিঙে দিয়ে বুটের ডাল আর শোলমাছের তরকারি। বাচ্চাদের জন্য দুপুরের বেঁচে যাওয়া মাংসের তরকারি আছে। মাছ মোটেই খেতে চায় না ওরা। মাংস না থাকলে ওদের জন্য ডিম রান্না করতে হয়।
গুলবাহাদুরের রক্ত আছে না গায়ে? দিল্লিতে মাসের পর মাস মাংস আর ঘনো অড়হড়ের ডাল দিয়ে রুটি খেতেই ভালোবাসতো সে। কখনও সখনও ভাতও খেতো। তবে পছন্দ ছিলো রুটি। বংশধররা ভাতই ভালোবাসে। খাবার টেবিলে কতো খাজুরে গল্প হতো রোজ। আজ গল্প কথা কোনোটাকেই ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না।
ঠিক রাত এগারোটা। কিন্তু একি? রেডিওর সব শব্দ স্তব্ধ কেনো? ঘোষণার কি হলো? অস্থিরতায় হৃদপিণ্ড বের হয়ে আসতে চায়। কি করবে তারা? অগত্যা সাড়ে এগারোটায় শুয়ে পড়ে সাবাই।
আধো ঘুম ভাঙলো প্রচণ্ড শব্দে। মনে হলো উড়ে পুড়ে যাচ্ছে ঢাকা শহর। কারো কান্না বিলাপ চিৎকার কিছুই শোনা যায় না। শুধুই গোলাগুলির নিকট শব্দ। মনে হয় এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে শিরিনার জীবনের ওপর দিয়ে। কতো চেষ্টা করলো সে, তবু শেষ রক্ষা হলো না।
প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদনও করা হয়েছিলো। তার উত্তর কি এসেছিলো, সেটা কেউ জানে না তারা। সবই কপাল! জেল গেটে বসে থাকতে থাকতে রাত প্রায় ফুরিয়ে এলো। এতোক্ষণ নিশ্চয় সব চুকে বুকে গেছে। বুক চেপে আসছে। বেশ কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। সুখের আয়ু শেষ হয়ে গেলো তার। ভোর হলেই লাশটা তাকে দেয়া হবে। সেটা নিয়ে চলে যাবে নাচোলে। দাদু এখনও বেঁচে। নিশ্চয় তিনিও জেগে আছেন। তপনের ফাঁসির রায় শোনার পর থেকে বলতে গেলে তিনি বিছানা নিয়েছেন। জগৎ শূন্য হয়ে গেছে তাঁর। বোবা হয়ে গেছে শিরিনা। কি হচ্ছে, কি ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। তবু তাকেই আসতে হয়েছে রাজশাহী জেলের দরোজায়। নির্ঘুম দুটি চোখে অশ্রু নেই শিরিনার। পেটের ভেতর বাচ্চাটা আজ বড্ড বেশি লাফালাফি করছে। ও কি বুঝতে পারছে কিছু? ভাবনা চিন্তাও দানা বাঁধছে না। শূন্যতায় ডুবে গেছে অস্তিত্ব। তপনের এই পরিণতি স্বপ্নেও ভাবা যায় না। তবু তাই হলো। অবিশ্বাস্য। তবু বাস্তব।
দাদু কতোবার জানতে চেয়েছেন, কি করে এসব হলো? কি জবাব দেবে রিনা? সে নিজেই কি জানে ভালো করে? পঁচিশে মার্চে বেইমান পাকিস্তান সেনাদের গোলাগুলির কালরাতে তপনের পরিবার বেঁচে যায়। তারপর কারফিউয়ের সময় রক্ত আর মৃতদেহ ডিঙিয়ে ওরা আশ্রয় নেয় কামরাঙ্গীর চরে। সেখানেও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় হায়েনারা। এলাকা ঘিরে নির্বিচার গুলি আর আগুন চারদিকে। অসহায় অসতর্ক অবস্থায় পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের সামনে খুলে গিয়েছিলো মৃত্যুর উদ্ধত করাল সিংহদুয়ার। সেই একমাত্র পথে চলে গেলো হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। পালাতে চেষ্টা করেছিলো মলয় আকাশ এবং কিশোর কয়েকজন। কিন্তু মলয় ছাড়া কেউ পারেনি পালাতে। তপনের পুরো পরিবারই চলে গেলো সেই মৃত্যুগুহায়।

সাক্ষীহীন সেই নৃশংস ইতিহাসের কথাও প্রচার হয়ে গেলো। কিভাবে কেমন করে কোন পথে কাদের সঙ্গে তপন আর মলয় সীমান্ত পার হয়ে ওপারে পৌঁছেছিলো, সেটা বলতে পারেনি ওরা কোনোদিন। ওরা একসঙ্গেও ছিলো না। দেখা হলো আগরতলায়। সম্বিৎ ফিরে আসতেই ওরা বুঝতে পারলো যে শুধু নিজেদের প্রাণটুকু নিয়ে ওরা পলাতক হয়েছে। তখন অনুতাপে শোকে বেদনায় প্রাণটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিলো মলয়ের। তপন ফিরে যেতে চাইলো ঢাকায়। মলয় বললো, তুই থাক, আমি যাই। খুঁজে পেলে নিয়ে আসি ওদের। মলয় গিয়ে আর ফিরলো না। কোথায় গেলো, কি হলো, ওদের খুঁজে পেলো কি না, কিছুই জানা গেলো না। মাঝে মাঝে শিরিনার কথা মনে হয়েছে তপনের। কিন্তু খোঁজ নেয়ার পথ ছিলো না। কদিন কাটলো হতাশা ক্ষোভ আর বিভ্রান্তিতে। তারপর জ্বলে ওঠে জীবন গুলবাহাদুরের প্রজন্ম বসে থাকতে পারে? আগুন লাগে রক্তে। ঠিক করে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে। চলে যায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। মাসখানেকের মধ্যেই শরণার্থী শিবিরে এসে পৌঁছুলো বহু মানুষ। দাদু কিছুতেই শিরিনাকে থাকতে দিলেন না গ্রামে। শিরিনা চায় না দাদুকে একা রেখে যেতে। দাদু বোঝান। বলেন, গদর যুদ্ধের হারুপার্টির একমাত্র বংশধর তুই। তোকে বাঁচতেই হবে।

- আমি একা বেঁচে থাকতে চাই না দাদু।

- বোকার মতো কথা বলিস না রিনা। ও হ্যাঁ, কে যেনো এসে বললো, ওপারের শরণার্থী শিবিরে তপনকে দেখা গেছে। রক্ত ছলকে ওঠে শিরিনার অসংখ্য ধমনিতে। বলে, আর কাউকে দেখা যায় নি?

- না।

- তা মানে?

তুই ওপারে গিয়ে তপনের দেখা পেলে তোর 'মানে'-র উত্তর হয়তো পাবি।

- কোথায় আছে তপন?

- ত্রিপুরা সীমান্তে শিগগিরই যাবে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে।

- মানে?

- কি মানে মানে করছিস ভাই? গুলবাহাদুরের প্রজন্ম বসে বসে দয়ার অন্ন খাবে? তা কি হতে পারে? ও তো যুদ্ধে যাবেই। দুচোখ জ্বলে ওঠে শিরিনার। বলে, আমিও যুদ্ধে যাবো দাদু।

- যা, আমি তো যেতেই বলছি। আহত সেনাদের সেবাটা তো করতে পারবি!

সত্যিই সপ্তা দুয়েকের মধ্যে শিরিনা পদ্মা পার হয়ে পৌঁছে গেলো মুর্শিদাবাদ। তারপর জানা অজানা সঙ্গী-সাথিদের এক বড়োসড়ো পলাতক বাহিনীর সঙ্গে একসময় হাজির হয়ে গেলো শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু তপন কোথায়? কোন শিবিরে? শিরিনা তো একেবারেই একা। বেশ অসহায় লাগে তার। তবে দলে বলে এদিক এদিক যায়। কোথাও কোথাও নামও লেখাতে হলো। না হলে যে থাকা-খাওয়া হবে না। জীবনটাকে যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে!

মাসখানেক চলে গেল শুধু প্রাণটাকে পাহারা দিয়ে। একটুও ভালো লাগে না তার। এদিকে শিবিরগুলো ভরে উঠছে লোকে। মহিলা এবং শিশুরা শুধু খেতে পেলেই খুশি। শুধুই বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। পুরুষেরা এমনকি কিশোর ছেলেরাও ফুটে টগবগ করে। তাদের ইচ্ছা যুদ্ধে যাবে। প্রশিক্ষণে চলে যাচ্ছে।

ছয় মাসের মাথায় একদিন সেবা ক্যাম্পে দেখা পেল সে আহত তপনের। পায়ের পাতার দুটো আঙুলে অপারেশন হয়েছে। স্প্লিন্টার ঢুকে গিয়েছিল। নগ্নপদ সৈন্য ওরা। বিপদ তো হবেই। কাতরাচ্ছে শুয়ে শুয়ে। শিরিনা তখন আহত যোদ্ধাদের জন্য রীতিমতো সেবিকা। মাথা ঢেকে শুয়ে ছিল তপন। গায়ে বেজায় জ্বর।

বেদনানাশক দুটো বড়ি নিয়ে গিয়ে শিরিনা রোগীকে বলল, শুনছেন, উঠে বড়ি দুটো খেয়ে নিন দেখি।

মাথার কাপড় সরিয়ে তপনের চক্ষু স্থির। বলে, শিরিনা তুমি? স্থান-কাল পরিবেশ ভুলে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল কিছুক্ষণ। তার পরের দিনগুলোয় কত কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। কত দিন চলবে যুদ্ধ, কবে তারা দেশে যেতে পারবে, এসব কথার কোনো উত্তর কেউ জানে না। তবু দুজন দুজনকে ফিরে পেয়েছে এই আনন্দে ওরা আশায় বুক বাঁধে। জীবনের স্বপ্ন বোধ হয় এমনি বেয়াড়াই হয়! চরম অনিশ্চয়তা আর অনিরাপত্তার মধ্যেও রংধনু রং ছড়ায়।

অপারেশনে যাওয়ার সময় মৃত্যু মাথায় নিয়ে যায় তপন। ফিরে এসেই যে শিরিনার সঙ্গে দেখা হয়, তা নয়। নিজের নিজের ক্যাম্পে সবারই অনেক কাজ। জীবন-মৃত্যু এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা কানে আসে তার। শিক্ষিত সচেতন ছেলে তপন। গায়ে গতরে যুদ্ধ করেই তার শান্তি হয় না। যুদ্ধের ব্যাপারটা সে বুঝতে চায় ভালো করে। শুনতে পায় অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে মতান্তর এবং মনোমালিন্য আছে। বিশেষ করে খন্দকার মোশতাককে নিয়ে যে অসন্তোষ তার মধ্যে শুনেছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নাম। এও শুনেছে যে, শেখ মণিও নাকি ভিন্নমত পোষণ করেন দলীয় রাজনীতিতে। তারও প্রতিপক্ষ তাজউদ্দীন। রাজশাহী কলেজে তপনের সিনিয়র ছিল মিনার। ছাত্র ইউনিয়ন করত। সে এখন মুক্তিযোদ্ধা। তারা একই সেক্টরে কাজ করছে। রাজনৈতিক সচেতনতা তার অনেক বেশি। চালাকও জবর। মাঝে মাঝে হুটহাট কলকাতায় যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও গিয়েছে। ফলে তার যোগাযোগ বেড়েছে এবং নানান খবরাখবরের সূত্র বেড়েছে।

মিনারের বয়ানে তপন যা শোনে, তাতে ধান্দা লেগে যায়। এতটুকু দেশ, তার আবার যুদ্ধমগ্ন। এরই মধ্যে দলাদলি, রেষারেষি, ক্ষমতার স্বপ্ন, ইত্যাদি শুনতে তার ভালো লাগে না একটুও। তপন তো যুদ্ধে যোগ দিয়ে অন্য কিছুই ভাবে না দেশের স্বাধীনতা ছাড়া। কিন্তু যুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা খুব সেয়ানা। বামপন্থী ডানপন্থী উঠতিপন্থী কেউ কম যায় না। আতিনেতা এবং পাতিনেতারা নাকি কলকাতায় বেশ আরাম-আয়েশে থাকে। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে শলাপরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে। শুনেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তপনের।

শিরিনা সব গল্পই শোনে তপনের মুখ থেকে। কেমন এক ধরনের ভয়ে গুড়গুড় করে বুকের ভেতর। দেশপ্রেমের মধ্যে স্বার্থগন্ধ থাকে কী করে? সেও বিশ্বাস করতে চায় না ওসব গালগল্প। বলে, মিনারের সঙ্গে এসব গল্প শেয়ার না করাই ভালো। তপনের জবাব হচ্ছে, মিনার বলে, শুনতে দোষ কী? এই তো গত সপ্তায় শুনলাম, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও মতান্তর। মিনার বলল, কর্নেল তাহের আর মেজর জিয়া চান গেরিলা যুদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত এবং পরাজিত করতে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী চান রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করতে।

–আচ্ছা তপু, আমাদের উদ্দেশ্য তো দেশকে স্বাধীন করা, তাই না?

– একদম ঠিক। সেটা সবাই চায়।

–তাহলে এত পথ কেন?

–অন্যদিকে কোনো বাহিনীর অন্তর্গত না হয়েও কাদের সিদ্দিকী দারুণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে টাঙ্গাইলে।

–তুমি যে মুজিববাহিনীর নাম বললে, তারা কোথায় যুদ্ধ করছে?

–তারা খুব অ্যাকটিভ নয়। ভারতের আশ্রয়ে এখনো ট্রেনিং নিচ্ছে।

–ভারতের আশ্রয়েই তো সবকিছু এখন পর্যন্ত। তাই না?

–সেটাই তো কর্নেল তাহেরের পয়েন্ট। তার মত হলো, ধীরে ধীরে ভারতীয় সৈন্যের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের হেডকোয়ার্টারগুলো বাংলাদেশের মাটিতে নিয়ে যাওয়া, মানে নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে যুদ্ধটাকে।

–এটা তো ভালো প্ল্যানই তপু।

–কিন্তু ওসমানী তা চাইছেন না। জিয়া সমর্থন দিয়েছেন তাহেরকে। মিনার তাতেই খুশি।

–দেখ, আমি তো ভালো করে এসব বুঝি না। তবু মনে হয়, সংকটকালে এমন মতান্তর ভালো না। মিনারের সব কথা হয়তো ঠিকও না।

–মিনার কিন্তু আজেবাজে কথা বলার মানুষ না। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমরা যোদ্ধা। কমান্ডার যা হুকুম করবেন, সেটাই করতে হবে। আমি কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া কিছু বুঝতে চাই না। শত্রু খতম করাই টার্গেট।

–তোমাদের কমান্ডার কে?

–কর্নেল তাহের। তার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশংসা করে মিনার। ওর মত হলো, ভারতীয় আশ্রয়ে আলাদা নামের দল করে আলাদা সেনা প্রশিক্ষণ নিয়ে কতদূর যেতে পারব আমরা? তবে...

–কী তবে? থামলে কেন? বল?

–মানে কী, এই শ্রেণিসংগ্রামের কথা আমি ভালো

করে বুঝতে পারি না।
–সেটা আবার কী তপু?
–সে অনেক কঠিন কঠিন কথা। আন্তর্জাতিক সংযোগ, সমাজতন্ত্র, সর্বহারা, রাশিয়ার গল্প, আরো কত কী? পড়ার জন্য কিছু বইও দেয়।
–তুমি পড় না?
–পড়ি, পড়ি। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি।
–তাহলে বোঝ না কেন?
–আরে পাগল, বোঝা তো এত সহজ নয়। আস্তে আস্তে ভেতরের দর্শন বুঝতে চেষ্টা করছি। বড় কঠিন রাস্তা রিনা।
–তোমার অবশ্য সময় কম। আমাকে দিও তো দু-একটা বই। পড়তে চাই।
–নিশ্চয় দেব। আমাদের দুজনের পথ যে অভিন্ন হতে হবে রিনা।
–চাচাদের খবর কিছু পেলে?
–এখনো না। প্রবল বন্যায় খড়কুটোর মতো মানুষগুলো কোথায় যে ভেসে গেল! বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে তপন।
মনটা বিষণ্ন হয় শিরিনারও। ভাবে, এও কি সম্ভব? এতগুলো মানুষ কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে? নিশ্চয় কোথাও না কোথাও ওরা গোপনে গোপনে বেঁচে আছে।
শিরিনার ধারণা সত্যি হয়নি। কারোই কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি আর। দেশে ফিরে মামা-মামীর খোঁজ পেয়েছিল। কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। একাত্তরের তিরিশে ডিসেম্বর দেশে ফিরে সরাসরি সেই যে দাদুর কাছে এলো তো এলোই। কয়েক মাস কেটে গেল।
দাদুর শরীরটা খুবই খারাপ। ভয়ে দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থেকেছেন নয়টা মাস। কপাল ভালো, হানাদার বাহিনী ওদিকটা মাড়ায়নি। সে জন্য প্রশংসার দাবিদার পাশের গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মুনশি বেলাল। অপ্রত্যক্ষভাবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়েছেন। আসলে দেশের জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ এত জোরদার হতে পারত না। মুক্তিযুদ্ধটা তাই দেশের জনগণের যুদ্ধ ছিল।
ব্যতিক্রম হলো রাজাকাররা। তাদের সামলাতেন মুনশি বেলাল। দাদুই গল্প করেছেন।
সব মনে পড়ছে ছবির মতো। মাটিতে একটা কম্বল বিছিয়ে বসে বসে ভাবছে তপনের কথা। কত স্বপ্ন ছিল তার স্বাধীন দেশে বাঁচার। আশা ছিল, দেশ গড়ার কাজ করবে, সংসার হবে, গুল বাহাদুরের বংশপ্রদীপ তৈরি করবে এবং আরো কত কথা। দেশ স্বাধীন হলে দেশেই ফিরল তারা। সোজা নাচোলে দাদুর বাড়ি। সেখানেই বিয়ে হলো তাদের অনাড়ম্বরভাবে। দাদু সেটাই চাইলেন।
শিরিনার সুখ উপচে ওঠে। স্বাধীন দেশে তপনের মতো সাহসী মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সংসার করতে হলে তো আয়-রোজগার লাগবে। শিরিনা রাজশাহী সদর হাসপাতালে তার নার্সিং পেশায় ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু তপন কী করবে? তাগড়া তরুণ ছেলে কিছু করার জন্য টগবগ করে। বসে বসে একটুও ভালো লাগছে না তার। তবে দাদুর লাইব্রেরিতে বহু বই ছিল বলে রক্ষা। বিশ শতকের বিপ্লবীদের কাহিনী পড়ত মনোযোগ দিয়ে। ভাবত, কী কষ্ট, কী ত্যাগ তারা করেছেন। তবে কষ্ট লাগত তার একটা ব্যাপারে। তা হলো, গদরের যুদ্ধও যেমন সুসংগঠিত ছিল না, মুক্তিযুদ্ধও প্রায় তেমনই। গদরের যুদ্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধও কিছুটা তা-ই। একদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা, অন্যদিকে দেশের ভেতর গড়ে ওঠা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। একদিকে ভারতীয় ভূমিতে আশ্রয়-প্রশ্রয়, প্রশিক্ষণের প্রতি নির্ভরতা; অন্যদিকে ভারতীয় ভূমিতে না গিয়েই নিজস্ব শক্তিতে যুদ্ধ করা। তৃতীয় দিকে মুজিববাহিনী গড়ে তোলা। ত্রিধারার মুক্তিযুদ্ধ শেষে এক মোহনায় মিলবে তো?
দাদুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা হয় তপনের। শিরিনা কখনো শোনে, কখনো শোনে না। দাদু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের কটা মাসে তপন খুব পরিণত

হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে পারে। দেশপ্রেম ওর বুকে সহস্র দেওয়ালি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শিরিনাও বুঝতে পারে তপনের পরিবর্তন। কিন্তু মানুষ চিনতে পারল না এখনো!
এমন করে
ফেঁসে গেল সহকারীর ষড়যন্ত্রে? স্রেফ খুনি নাম হলো তার? দক্ষিণ বাংলার কোনো এক দ্বীপের রাজাকার যুদ্ধের সময় বহুজনের ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। স্বাধীনতার পর দেশের এলাকা ছেড়ে নাচোলে এসে বসত করল। প্রচার দিল যে, সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ঘরবাড়ি হারিয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু পাপ কি চাপা থাকে? বছর দুতিনের মধ্যে প্রকাশ হয়ে গেল যে, সে দক্ষিণ এলাকার লোক। বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষাই শনাক্ত করিয়ে দিল ওলিউল্লাহকে।
মুক্তিযোদ্ধারা সবাই কি আর ঢাকায় যেতে পেরেছে? চায়ওনি অনেকে। পদ পদবি চাকরি বাড়ি গাড়ি সম্মান দাপট আর ক'জনার ভাগ্যে জুটেছে? মানে জোটাতে পেরেছে ক'জন? সেটা নিয়ে তপন বা শিরিনার কোনো আপসোস ছিল না। তপন গ্রামের স্কুলেই একটা চাকরি পেয়ে যায়। শহরেও যেতে চায়নি সে।
কোথা থেকে যে মিনার এলো? প্রথম প্রথম ভালোই লাগত শিরিনার। কিন্তু লক্ষ্য করল, ওরা গল্প করার সময় শিরিনা এলেই গল্প থামিয়ে দিত। জানতেও চেয়েছে তপনের কাছে যে, কি এমন গল্প তারা করে?
ক্রমে আরো দুজন সহযোদ্ধা এসে জুটল গ্রামে। দাদুও সন্ধিৎসু হলেন, এরা কারা?
তপন বলল, সহযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় একই সেক্টরে যুদ্ধ করেছে তারা।
– এখন কি করছে ওরা? দাদু জানতে চান, কোথায় ছিল এতদিন?
–নিজেদের এলাকায় ছিল। তেমন কোনো কাজ পায়নি। হতাশায় ভোগে। অবশেষে নিজেরাই এক ধরনের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।
– সেটা কি রকম কাজ তপু?
-রাজাকার শনাক্ত করে তাদের হত্যা করা।
– সে কি দাদু? এসব তো বিপজ্জনক কাজ!
– সে তো বটেই দাদু।
– তা সব ছেড়ে এখানে, এই গ্রামে কেন?
– আচ্ছা দাদু, তুমি ওলিউল্লাহকে কতদিন থেকে চেন? চমকে ওঠেন দাদু। তবে কি কানাঘুষার কথাই ঠিক? বলেন, আমি কি গাঁয়ের সবাইকে চিনি রে ভাই?
– কথা ঘুরিও না দাদু। সত্যি করে বল। শিরিন-ার কাছে শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের পরে ঐ লোক এখানে এসে ঘরবাড়ি করেছে। আর কথাটা বলেছ তুমিই।
– আমি আর জানব কোথা থেকে বল? ঐ জেলেপাড়ার চাচা, মানে কছিমদ্দি বলেছিল একদিন।
– কছিমদ্দি চাচা জানল কোথা থেকে?
– ও তো ছেলে বুড়া সবারই চাচা। তাই যে যেখান থেকে যে খবরই পায় কছিমদ্দিকে বলে।
ক্রমে ক্রমে তপনের বন্ধুরা একটা প্ল্যানের ছক এঁকেই ফেলে। মিনার বলেছিল, চুয়াত্তরের বন্যাটা যাক। তো বন্যা গিয়ে দুর্ভিক্ষ এলো। মিনার বলল, একটা রয়ে সয়ে কাজ করতে হবে তপু। শিকার তো হাতের নাগালেই আছে।
– পাখি যদি পালায়? তপন বলে, তখন কিন্তু অনুতাপের সীমা থাকবে না। মিনার স্বস্তি পাচ্ছে না দেশের পরিস্থিতি দেখে। পঁচাত্তরে বাকশাল গঠন করে গেল। হায় হায় করে ওঠে মিনার। তপনকে বলে, বুঝলি কিছু?
– বিষয়টা আমারও ভালো লাগছে না মিনার। নেতা এটা কি করলেন?
– সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কি এত সহজ ফর্মুলা তপু? নেতা কিন্তু এরই মধ্যে বহু প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে ফেলেছেন।
– তুই তো ঢাকায় যাস। মেলামেশাও করিস বড় বড় মাথার সঙ্গে। বলিস না কেন কথাগুলো?
– জানিস তপন, একদিন মতিঝিলে 'বাংলার বাণী'তে গিয়ে মনি ভাই-এর সঙ্গে দেখা

করলাম। সঙ্গী সাথী স্তাবকদের নিয়ে পরিবেষ্টিত মনি ভাইয়ের সঙ্গে কথাই বলতে পারলাম না। হাতের বাইরে চলে যাবে রে সব কিছু। বন্যার পানির মতো সমস্যাগুলো হু হু করে বাড়ল। মিশমিশে কালো জটিলতা। সাহসি আত্মপ্রত্যয়ী নেতা একাই অভিযাত্রী পর্বত চূড়ায় যেতে পারবেন ভেবেছিলেন। হলো না সেটা।

হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেই গেল পঁচাত্তরের পুনের আগস্টে। দলের অর্বাচীন এবং ক্ষমতালোভীদের জন্যই বলতে গেলে সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন দেশের শ্রেষ্ঠ এবং অবিসংবাদিত নেতা। বাইরের কোনো শত্রু তো এমন জঘন্য বীভৎস কাজ করেনি! সবাই ছিল ঘরশত্রু বিভীষণ। দুদিন ভাত খায়নি মিনার। দাদু বলেছিলেন, সিরাজ উদ দৌলার যুদ্ধ ছিল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। গদরের যুদ্ধ ছিল, ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য। মুক্তিযুদ্ধ ছিল স্বাধিকারের জন্য। এটাও এক রকম দেশকে শোষকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। সিরাজ উদ দৌলা হেরেছিলেন বিশ্বাসঘাতকের জন্য। গদরের সৈনিকরা হেরেছিল প্রতিপক্ষের পরাক্রম শক্তি পরিমাপ করতে না পারার জন্য। আর আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েও রক্তাক্ত হচ্ছি আত্মকলহের জন্য। ক্ষমতার লোভের জন্য। দেশপ্রেমের মধ্যে যে ত্যাগ, ন্যায়পরতা দূরদৃষ্টি পারস্পরিক সমঝোতা এবং কল্যাণপরতা, তা আদৌ বুঝতে না পারার জন্য।

শিরিনা একদিন বলল, বাংলাদেশে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করল পাকিস্তান, তার ক্ষতিপূরণ চাওয়া যায় না দাদু?

– নিশ্চয়ই যায়। সমর্থন দেয় তপন। বলে, ওসব কথা ভাবার সময়ই ছিল না নেতাদের। এখনো কি কেউ ভাবে?

দাদু চুপ করে যান। এসব আগুনপারা প্রজন্মের কাছে মুখ খুললেও বিপদ। কথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি করছ আজকাল, খুলে বল তো দাদু!

– বলব দাদু, বলব। সময়ে সব জানাবো। তপন মুখ টিপে হাসে।

– মিনার ছেলেটা ভালোই। কিন্তু অন্য দুটো ছেলেকে আমার তেমন ভালো লাগে না।

– তুমি ভুল বুঝছো দাদু। ওরা মনেপ্রাণে ডেডিকেটেড।

– ডেডিকেশনটা কিসের জন্য? সেটাই তো জানতে চাইছি ভাই।

বলা আর হয়নি। পরদিনই দুই ছেলেসহ ওলিউল্লাহর গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেল মসজিদের পাশে। তারপর লাপাত্তা চারজনই। শিরিনা তখনো জানে না যে সে মা হতে যাচ্ছে। ধরাও পড়ে গেল দুজন, তপন আর মিনার। বাকি দুজন কোথায় যে উধাও হলো! কেউ কেউ বলল, সীমান্ত পার হয়ে পালিয়েছে। হবেও বা।

এগারো

হঠাৎ পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল জেলে। একটু বুঝি তন্দ্রা এসেছিল শিরিনার। চমকে ওঠে সে ঘণ্টার আওয়াজে। এতদিন পাগলা ঘণ্টার কথা শুনেই এসেছে। আজ প্রথম শুনল। তার সঙ্গে হৈ হট্টগোল আর দৌড়াদৌড়ি। শোনা গেল দুজন রাজবন্দি পালিয়েছে প্রাচীর টপকে।

রাত তখন তিনটে। উদভ্রান্তের মতো উঠে সে একজন সিপাইকে জিজ্ঞেস করল, ফাঁসি কি হয়ে গেছে? বিরক্ত হয়ে সেপাইটা বলল, কিসের ফাঁসি? কার ফাঁসি?

– আজকে দুটো ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল না?

– সে তো ভোর চারটেয়। তবে যা কাণ্ড ঘটেছে, আজ ফাঁসিটাসি হবে বলে মনে হয় না।

গুটি গুটি হেঁটে জেলের প্রাচীরঘেঁষা দোকানের কাছে এলো শিরিনা। সশ্রম কারাদণ্ডের আসামিদের হাতের কাজে ঠাসা দোকান। বাঁশের কুলো, ডালা, বেঁতের মোড়া, ধামা, কাঠা, বিছানার চাদর, সুজনি, পাটের দড়ি, ছিকে, কাঠের হাতা এবং আরো কত কি! আগেও দেখেছে সে জেলখানার দোকান। ভাবত, হয়তো তপন এবং মিনারের হাতের কোনো কাজও আছে দোকানে! ওরা রাজবন্দি নয়। দণ্ডপ্রাপ্তও নয়। বিচারই চলেছে চারমাস ধরে। জামিনও হয়নি তাদের। সে প্রায় দেখা করতে আসত তপনের সঙ্গে। তপনই বলেছে, তারা সেলে বন্দি থাকে। কাজ-কর্ম নেই, কারো সঙ্গে কথা নেই, দেখা সাক্ষাৎ নেই, দুঃসহ সময় পাথরের মতো চেপে বসে থাকে বুকের ওপর। নিকষ আঁধার রাতে নিঃশব্দে কাঁদে আর শুধুই ভাবে তার সন্তানের কথা।

ভেবেছিল কিছুই বলবে না ওলিউল্লাহর পরিবারের খুনের কথা। কিন্তু শিরিনার সম্মানের জন্যই একদিন বলে তপন, খুনটা সে করেনি। মিনারও না। পলাতক দুজনই খুনি। কিন্তু ওদের পিস্তল পাওয়া যায় তপন আর মিনারের কাছে। সেটাও দুর্ঘটনা। শিরিনার একটাই সান্ত্বনা যে, তার সন্তানকে কেউ খুনির সন্তান বলতে পারবে না। গুল বাহাদুরের প্রজন্মকে কেউ খুনি বলতেও পারবে না। বিনা অপরাধে তপন দণ্ড পাচ্ছে। মনে হলে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পরিস্থিতির কাছে মানুষ কত অসহায়! কিছুতেই কিছু করতে পারে না সে।

উকিলের পর উকিল নিয়োগ করেছে শিরিনা। এদের দুজনকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। ফকির দরবেশ সাধু সন্ন্যাসির কাছেও দৌড়াদৌড়ি করেছে শিরিনা। যদি কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়! যদি তপন নির্দোষ প্রমাণিত হয়! সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে তার।

সন্ধ্যাবেলায় শেষ দেখা হয় তপনের সঙ্গে। কেউ কথা বলতে পারেনি। কাঁদতেও পারেনি। জন্ম জন্মান্তরের মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম, খুন না করেও ফাঁসির আসামি হয়েছে। আজ কিছু বলার নেই তার। ছেলে না মেয়ে হবে, জানে না কেউ। মনে মনে প্রার্থনা করে তপন, বাচ্চাটা যেন গুলবাহাদুরের বংশ বিস্তার করে। দেখা করার শেষ সময়ে তপন বলে, দুঃখ থেকে গেল রিনা। না রাজাকার, না বেইমান, কাউকেই মারতে পারলাম না। ছুটে এলো একটা সেপাই, হ্যালো শুনছেন, এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছেন?

– না তো!

– আপনি কে? কি করেন এখানে? কর্কশ কণ্ঠ পুলিশের।

– স্বামীর লাশ নিতে এসেছি। সন্ধ্যা থেকেই আছি।

উত্তর না দিয়ে দৌড়ে চলে গেল সেপাই। দোকানের পেছনে ইট বিছিয়ে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। চটের বিশ্রি নোংরা পর্দা ঝুলছে চারদিকেই। হঠাৎ মনে হলো, দুলে উঠল পর্দা। নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে ওখানে। খুশি হয় শিরিনা। যাক, ধরতে পারেনি সেপাইরা। ওরা যেন পালাতে পারে সেই প্রার্থনা করে মনেপ্রাণে। পাগলা ঘণ্টা তখনো বাজছে পাগলের মতোই। দুহাত তুলে মনে মনে বলে, হে দয়াময় অলমাইটি, ওদের রক্ষা কর।

সত্যি লুকিয়ে ছিল দুজন হ্যাংলা পাতলা মানুষ। সুযোগ বুঝে এক সময় দৌড় দিল পদ্মার বাঁধের দিকে। ভয়ে বুক কাঁপে শিরিনার। ধরা পড়ে যাবে না তো! আহা! বাঁচুক ওরা ওদের সন্তানদের জন্য। সে জানেও না ওরা কারা? বিবাহিত কি না? তবু বাঁচুক।

ক্লান্তিতে শরীর খুলে খুলে যেতে চাইছে। কিন্তু তবু তাকে বসে থাকতে হবে। তার সন্তানের মৃত পিতাকে নিয়ে যেতে হবে তাকেই। এ কেমন ভাগ্য তার? যখন মনে হলো যে, দুঃখের রাত শেষ হয়েছে। এবার নতুন সূর্য উঠবে তার জীবনে। ফুলে ফসলে প্রেমে সোহাগে চাপা পড়ে যাবে

পেছনের যাবতীয় বেদনা যাতনা বঞ্চনা আর হাহাকার। তখনই গাঢ় মেঘে ঢেকে গেল সব স্বপ্ন। কেমন করে মানুষ করবে সে তপনের একমাত্র বংশধরকে? দাদুর শরীরের যা অবস্থা! আর ভাবতে পারে না শিরিনা।

তপনের বাবার পরিবারের সবাই বেঁচে আছে। রাজশাহী পুলিশ লাইনসে গোলাগুলির পরদিনই তারা চলে যায় মুর্শিদাবাদ। কিছু হেঁটে কিছু নৌকায় পথ পাড়ি দিয়েছিল তারা। বলতে গেলে ওই এলাকার প্রায় সবাই প্রাণে বেঁচে গেছে। জনশূন্য গ্রামটা ইচ্ছামতো তছনছ করেছিল হানাদার পাকিস্তানি সেনারা। খবর পাওয়া গিয়েছিল নাটোরের আত্মীয়দেরও। শুধু হাওয়া হয়ে গেল মলয় আর আকাশ চাচাদের পরিবার-পরিজন। শিরিনার এখনো বিশ্বাস, ওরা বেঁচে আছে। সবাই না হোক, কেউ কেউ তো আছে। কিন্তু কোথায়?

পাগলা ঘণ্টা থেমে থেমে বাজছে। হাতের রেডিয়াম দেয়া ঘড়িতে দেখল শিরিনা। চারটা বেজে পাঁচ মিনিট। ধক করে উঠল বুকের ভেতর। তপন কি আর নেই? আহা! বুক চিরে একটা আর্তধ্বনি বের হয়। মনে মনে বলে বিধাতা! তোমার কাছে কোনো নালিশ নেই। ঝগড়া আছে। কেন এমন করে ছক সাজাও তুমি? কেন মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে এমন নির্বিকারে খেলতে ভালোবাস তুমি? আমরা কি তোমাকে ভালোবাসিনি? তোমার উপাসনা

করিনি? জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মবিধান মানিনি? জপ করিনি তোমার 'রাহমানুর রহিম' নাম?
তপন খুব সততার সঙ্গে জীবন যাপন করত। ওর মনটা ছিল স্ফটিকের মতো। বুদ্ধি ছিল একটু বেশি। সবকিছু বুঝতে চাইত এবং পারত। সে চেয়েছিল নিয়মিত সেনাবাহিনীর দলে নাম লেখাতে। তা হয়নি। অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় উপ্ত হওয়া দলাদলি খুব দ্রুত বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। পরিণতিও দেখেছে তারা। দাদু বলতেন, কাকও তো কাকের মাংস খায় না। তোমরা কেমন মুক্তিযুদ্ধ করলে দাদু? নিজেরা নিজেরাই মারামারি করছ। মুক্তিযোদ্ধাই মারছে অন্য মুক্তিযোদ্ধাকে? দলমতের মতান্তরকে মিটিয়ে ফেলতে না পারলে দেশটা গড়বে কিভাবে? গদরের যোদ্ধারা কিন্তু সহযোদ্ধাদের খুব ভালোবাসত। লজ্জায় কষ্টে কথা বলতে পারত না মুক্তিযোদ্ধা তপন। বলতে পারত না যে, সেও গুটিকয় স্বার্থবাজ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করতে চায়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য গোটা কয় ইভিল মারা গেলে দেশ, জাতি এবং জনপদের মঙ্গলই হবে। এমনকি নেতার ঘাতকদের মদদদাতা এবং জেলে চার নেতাকে হত্যার দায়ে খুনি খন্দকার মোশতাককেও তারা হত্যা করতে চেয়েছিল। হয়তো কোনো দিনই সুযোগ পেত না মহৎ কাজগুলো করার। তবে মনে মনে তো নিত্যই হত্যা করত পুরো টিমকে। যে হুকুম দিয়েছে, যে গুলি করেছে, যে জেলার সুযোগ করে দিয়েছে, সবাইকে মনে মনে জীবন্ত কবর দিত তপন। ওলিউল্লাহ তো ওই পাপীদের তুলনায় চুনোপুঁটি।
ওলিউল্লাহর নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় তপনরা জানতে পেরেছিল। সে ছিল বাগেরহাটের বাসিন্দা। মসজিদের ইমাম এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তার এলাকায় যত হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, জ্বালানো-পোড়ানো হয়েছে, সবটাতে তার প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল। ছিল ফকির, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থার মানুষ। কয় মাসের মধ্যে হয়ে উঠল ধনবান। টাকা আর সোনায় ভরে উঠল ভাণ্ডার। তার কাছে হিন্দু-মুসলমানের ফারাক ছিল না। যাকে সামনে পেত তাকেই হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার হুকুম দিত কীটাণুকীট রাজাকারদের। বলত, ওরা সবাই মুক্তি। মানে মুক্তিযোদ্ধা। মূর্খ জালিম সৈন্যদের কাছে 'মুক্তি' শব্দটা ছিল আতঙ্কের প্রতীক। ওদের শত্রুর নাম। যুদ্ধক্ষেত্রে তো শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এভাবে কিশোর তরুণদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় ওলির গ্রামে। তাই দেশ স্বাধীন হলে সে গাঢাকা দেয়। ধীরে ধীরে চলে আসে দক্ষিণ থেকে উত্তরের জনপদে। ভেবেছিল, তাকে কেউ চিনবে না। ভাষাই তার পরিচয় প্রকাশ করেছিল। মৃত্যু তো পাওনা হয়ে গিয়েছিল ওলিউল্লাহর। তপন মরেনি ঠিকই, কিন্তু চেয়েছিল তো!
এতসব কথা দাদুকে জানাতে পারেনি তপন। শিরিনাকে বলত বিড়বিড় করে। রাগে ক্ষোভে ঘৃণায় তপুর কণ্ঠস্বরে শিসধ্বনি বের হতো। ভয় পেত শিরিনা। বলত, তাই কি তুমি সংসারের মানুষ বাড়াতে চাও না?
–ঠিক তাই রিনা। আমি হয়তো বাঁচতে পারব না টার্গেট অর্জন করতে গেলে। শুধু শুধ সন্তানকে এতিম করে যাব কেন?
–ভুল ভাবছ তপু। তোমার এই তেজ শৌর্য পৌরুষ দেশপ্রেম তো রেখে যেতে হবে পৃথিবীতে। গুল বাহাদুরের রক্তের পরম্পরা শেষ করে দেবে, এটা কেমন কথা বল?
–আমার অভাবে আমার সন্তান তুমি একা একা বড় করে তুলতে পারবে?
–প্রয়োজনে পারতেই হবে আমাকে। জড়িয়ে ধরে তপুকে। কেঁদে নদী হয়ে যায়।
সব মনে আছে শিরিনার। তাই তো হতে যাচ্ছে ঘটনাটা। তার সন্তান তো বাবার মুখই দেখতে পাবে না। পেটের ওপর হাত দিয়ে আদর করে বাচ্চাকে। আহা, দুটো মাস আগে যদি হতো বাচ্চাটা! তপন দেখে যেতে পারত ওর বংশধরকে। প্রথম দিকে না চাইলেও, পরে খুবই খুশি হয়েছিল। বলত, কেমন করে মানুষ মায়ের জাতিকে নির্যাতন করে, তা তার বুদ্ধিতে আসে না। এ জাতি না থাকলে পৃথিবী থমকে যেত। বন্ধ হয়ে যেত সভ্যতার ধারা। স্তব্ধ হয়ে যেত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। বংশপরম্পরার অভাবে পোকামাকড় আর পশুপাখিতে পূর্ণ হয়ে যেত এই গ্রহ।
কেমন করে যেন বলত তপন, সবটুকু বুঝত না ঠিক তখনই। কিন্তু আবেগে আনন্দে গৌরবে তার মাতৃত্বকে অনুভব করতে শিখল শিরিনা। কত রাতে একা একা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছে সে ভবিষ্যতের সন্তানের কথা ভেবে। তার এবং তপনের ফসল তার জঠরে। কিন্তু মায়ের দেহমজ্জা, রক্ত ইচ্ছা স্বপ্ন আনন্দ আদর্শের সবটুকু নিয়ে তিল তিল করে বাড়ছে তাদের সন্তান। এক ঐশী মমতার লালনে নীরবে পুষ্ট হচ্ছে বাচ্চাটার দেহ। সত্যি তো, মা ছাড়া কে পারে এক দেহের মধ্যে দুটো মাথা, দুটো হৃৎপিণ্ড, দুটো কলিজা, চারটে চোখ, চারটে কান, চারটে হাত, চারটে পা অনায়াসে গড়ে তুলতে? তবে সন্তানের জন্ম নিয়ে তার ভয় আছে মনে। তবু সন্তান যে প্রাণের প্রাণ। দেহের গোপনতম, পবিত্রতম, স্পর্শকাতরতম স্থান বিদীর্ণ করে এবং প্রাণঘাতী ব্যথা দিয়ে যে আসবে পৃথিবীতে। সেই তো নাড়িছেঁড়া ধন। কলিজার টুকরো। তার চেয়ে প্রিয় আর কী হতে পারে মায়ের কাছে?
কোনো এক নির্জন দুপুরে হবু সন্তানের কথা ভাবতে ভাবতে সে কিছু লিখেছিল। তা দেখতেও দিয়েছিল তপনকে। খুব প্রশংসা করেছিল সে। প্রায় সবটুকুই মনে আছে তার। কারণ নিজের লেখাটা ব্যাগে রাখে এবং বার বার পড়ে। সময় কাটানোর অভাবে আবার কাগজটা বের করে পড়ে সে। লেখাটার শিরোনাম 'মা'। "কাঁদতে কাঁদতেই শিশুর মুখ থেকে একসময় উচ্চারিত হয় 'ম্ মা'। জননীর বুকে তখন দুলে ওঠে সাত সাগরের ঢেউ। আনন্দে খুশিতে বুকে জড়িয়ে ধরেন তার বাচ্চাকে। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার মায়ের ক্ষেত্রেও হয়েছে এই রকম। একটা 'মা' ডাক দুলিয়ে দেয় দোস্ত দুশমন সবাইকে। ভুলিয়ে দেয় জীবনের যত জ্বালা, ব্যথা-বেদনা, হতাশা, দুঃখকে। নইলে নিরন্ন মা কি ভালোবাসতে পারত আত্মজকে? সন্তান যে মায়ের আত্মার ফুল। কস্তুরী কুসুম। গন্ধে শোভায় অতুল। শরীরের ভেতর থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠে সন্তান। মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নগুলো পাপড়ি হয়ে জড়িয়ে যায় আত্মজের দেহে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, ধমনির রক্ত, ফুসফুসের বাতাস, পাকস্থলীর খাবার, সুখের ঘুম, দুঃখের অশ্রু, প্রতিদিনের প্রতীক্ষা, প্রতিক্ষণের জীবন থেকে দিয়ে দিয়ে একটি বাচ্চা তৈরি করেন মা। মায়ের প্রকৃতিই এরকম।
ঘটনাটা লৌকিক, কিন্তু অদৃশ্য। প্রায় অলৌকিক। ঘটনাটা বিজ্ঞান সমর্থিত, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একে ছুঁতে পারে না। পুরো প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু ঐশ্বরিক। আর সবটুকু ঘটে মায়ের দেহের ভেতর। তাই তো 'মা' মানে জগৎ।
আমার ধারণায় বাকসর্বস্ব মানুষ জীবনে যত শব্দ উচ্চারণ করে, তার মধ্যে 'মা' শব্দটা সবচেয়ে প্রিয়। ছোটবেলায় তো বটেই, বড় হয়েও 'মা' ডাক, 'মা' শব্দ আমাদের ভরিয়ে রাখে। আনন্দে আবেগে, রোগে শোকে নিজের অজান্তে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে 'মা' ডাক। শৈশবের ভালো-মন্দে মাকে জড়িয়ে না নিলে বাচ্চারা শান্তি পায় না। আপদে বিপদে অপরাধে অসহায় বোধ করলে তারা আশ্রয় খোঁজে মায়ের কাছে। ভালো-মন্দ বিচার না করে সন্তানকে বুকে তুলে নেন মা। ঢেকে রাখেন আঁচল দিয়ে। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মায়ের একই রূপ। সন্তানের জন্য প্রাণটা ছিঁড়ে দিতে পারেন না (অবশ্যই ব্যতিক্রম ছাড়া)। বাংলাদেশের মায়েরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু এবং ত্যাগী। জীবসত্তার যে ছয়টি রিপু আছে তাও অস্বীকার করতে পারেন মা। হয়তো একটি মাত্র সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছেন, অথবা কোনো কারণে হয়ে গেছেন একা, তখন তিনি সন্তানটিকে বড় করে তোলার সাধনায় ডুবে যান। ভুলে যান নিজের সুখ বা ভোগের কথা। ভাবেন আয়-রোজগারের কথা। কাজও করেন। সন্তানের লেখাপড়া, দেখাশোনা, খাওয়ানো-পরানো, উপদেশ-পরামর্শ দেয়াকে মনে করেন জীবনের ধর্মকর্ম সব। আত্মজের সুন্দর নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থাকেন মা। কাজটা মা-ই পারেন। মা-ই পারেন বাবা-মা দুজনের ভূমিকা পালন করতে। এটা তার প্রকৃতি তো বটেই, ক্ষমতাও। একজন নারীর স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া হার মানে মাতৃসত্তার কাছে। ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই।
মায়ের প্রকৃতিটা এমনই যে সন্তানের অসুখ ভুল ঘুম আসে না তার। খিদে পায় না। ক্লান্তি আসে না সেবাযত্নের সময়। সমস্ত পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ বর্ণ পানসে হয়ে যায় মায়ের কাছে। সন্তানের রোগা মুখটা ঢেকে দেয় আলোকিত পৃথিবীকে। মায়ের মনে একটাই চিন্তা তখন, তা হলো, বাচ্চার আরোগ্য। অশ্রুভেজা চোখে দিনরাত

প্রার্থনার শব্দ সেই মহান স্রষ্টার উদ্দেশে। লোকে বলে, মায়ের দোয়াকে যমও ভয় পায়। সত্যিই তো। মা যে মনে করেন, সন্তানের বাঁচা-মরার ওপর নির্ভর করে তার জীবন-মরণ।
এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোথায় পাওয়া যাবে?
এখন তো বিজ্ঞান আমাদের 'ক্লোন' শিশুর কথা শোনাচ্ছে। বহু বিচিত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লোন শিশুর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি-মা তো সেই আদিকাল থেকেই নিজের দেহ থেকে আর একটা দেহ তৈরি করে আসছে। একবার নয়, অনেকবার। বিজ্ঞান বলে, বাবারও অবদান আছে। অবশ্যই। কিন্তু তার সঙ্গে পেটের ভেতর ক্লোন শিশু গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া এবং কষ্ট, তা কিন্তু মায়ের একারই। বার বার একই প্রক্রিয়া। একই কষ্ট। ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের ভালোবাসা কেমন করে যে খণ্ড খণ্ড হয়ে জড়িয়ে রাখে সন্তানদের। সবই তার কস্তূরী কুসুম। মায়ের শরীরের অংশ সবাই। প্রযুক্তি নয়, প্রকৃতির দানে তৈরি করা 'ক্লোন' শিশু। এমন যে মা, এমন যে মাতৃসত্তা, তাকে কেমন করে অসম্মান করা সম্ভব? এ একটি কথা কিছুটা বুঝতে পারলে নারী নির্যাতন উধাও হয়ে যাবে। হতেই হবে।
আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, মা না থাকলে মানব সভ্যতার ধারা বন্ধ হয়ে যেত। মহাকালকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারে হয়তো মানুষের অরুচি হতো। কারণ বংশ বিস্তারই যদি না থাকে, প্রজন্মের স্বপ্নই যদি না থাকে, তাহলে কার জন্য কাজ করা?
বন্ধ্যা নারীকে মাতৃত্ব দেয়ার গবেষণা এখন তুঙ্গে। কারণ তো সেই বংশ বিস্তার। প্রকৃতির ক্লোন হোক আর প্রযুক্তির ক্লোন হোক নারীকে আমরা মাতৃরূপে দেখতে পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হই। মা যে মানবজমিন। মানবশস্য উৎপাদনের একমাত্র জমিন। এমন অপরিহার্য মানবসত্তাই যে আমাদের পরম শ্রদ্ধার মা।
প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে 'মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য' নামক একটা রচনা থাকে। সেই রচনায় থাকে শুধু উপদেশ আর নীতিকথা। এ রচনা পড়লে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। এক, বিষয়টাকে বোধগম্য করা উচিত আরো সহজ ভাষায়। দুই, মা সম্পর্কে স্বতন্ত্র রচনা রাখা যায়। সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই, মাধ্যমিক পর্যায়েও রাখা উচিত। শিশুদের বোঝানো উচিত, মা হলো নারী জাতির প্রতীক। তাই কন্যা, ভগিনী, জায়া, জননী– সব পর্যায়েই তাদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা যেন থাকে। এও ঠিক যে, মাকেও নিজের মাতৃসত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শরীরের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা দিয়ে যে শিশুকে তিনি বড় করছেন তিল তিল করে, মনের সব সাধ-আহ্লাদ স্বপ্ন দিয়ে যে জীবসত্তাকে প্রতিমুহূর্তে সমৃদ্ধ করছেন, তার জন্য আরো অনেক অনেক কিছু করতেই হবে সারাটা জীবন ধরে। জন্ম দিলেই কিংবা দেহের মধ্যে ধারণ করলেই যে মা হওয়া যায় না, এ কথাটাও বুঝতে হবে মাকে।"
বুকের গভীর থেকে বড় একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে শিরিনার। সে হয়তো মা হবে, হয়তো প্রাণঢালা যত্নে তাকে বড় করে তোলার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে বাবার দুঃখ ভোলাবে কী দিয়ে? পেটের ভেতর বেশ আলোড়ন তুলে নড়াচড়া করে বাচ্চাটা। এখন বেশ ব্যথা পায় রিনা। হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করে। বলে, কষ্ট দিও না সোনা। আমি তো মরেই আছি। শুধু তোমার জন্যই এখন বাঁচতে হবে।
কী আশ্চর্য! ফরসা হয়ে এলো প্রায়। শুকতারাটা অশ্বত্থগাছের ঝাপড়া ডালপাতার ঠিক ওপরে জ্বলজ্বল করছে। কী হলো তপনের, কিছুই জানতে পারছে না। একটু যদি কাঁদতে পারত শিরিনা! কান্নায় ভেতরে ভেতরে গুঁড়িয়ে গলে গলে যাচ্ছে, অথচ অশ্রু নেই চোখে। সারা রাতেও এক ফোঁটা অশ্রু ঝরল না পাষাণ দুটি নয়নে।

আজানের শব্দ ভেসে এলো। তার মানে নামাজের সময় হয়ে গেছে। কাক ডেকে উঠল। কী বিশ্রী কর্কশ ডাক! আবার আজান হলো কাছের কোনো মসজিদ থেকে। আগেরটা নিশ্চয় শিয়া মসজিদের আজান। ওরা তো সুন্নি মসজিদের আজান থেকে দশ-পনের মিনিট আগেই আজান দেয়। পাখিরা জেগে গেছে। রাত কেটে যাচ্ছে, এই আনন্দে ওরা মহানন্দে কিচিরমিচির করে। মনে হয় সূর্যের আগমনকে স্বাগত জানায়। জীবনে এই প্রথম শিরিনা উদাত্ত প্রকৃতির মাঝে খোলা আকাশের নিচে ব্রাহ্মমুহূর্ত দেখল। রাতও নেই, সূর্যও নেই, ঘোর ঘোর আলো। আবছা হলেও দেখা যায় সবকিছু।
–এই যে মা, তুমি কি শিরিনা? ভরাট কাতর গলার প্রশ্নে চমকে ওঠে রিনা।
–কে আপনি? আমার নাম জানলেন কিভাবে? পাল্টা প্রশ্ন করে সে।
–আমি কাশেম। হড়গ্রামের কাশেম। তোমাদের চাচা।
–আপনি কাশেম চাচা? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে রিনা, কেন এসেছেন এখানে?
–তুমি যে কারণে এসেছ মা, আমিও সেই কারণে এসেছি। বয়স্ক দশাসই মানুষটার গলার স্বর ভেঙে যায়। পকেটের রুমাল বের করে চোখ মোছে।
–কখন এসেছেন চাচা?
–কাল রাত দশটায়। বসে ছিলাম পদ্মার বাঁধের বেঞ্চে।
–জানলেন কিভাবে?
–আমি সব জানিরে মা। বংশের প্রাণ যে প্রাণের ভেতর বাজে। ভাবছিলাম, লাশটা নিয়ে যাব হড়গ্রামে।
–না না চাচা। আমি ওকে নিয়ে যাব নাচোলে দাদুর বাড়ি। বাচ্চাটা অন্তত বাবার কবর দেখতে পাবে। দুটি পায়ে পড়ি চাচা, অমন কথা বলবেন না।
–বাচ্চা কোথায় মা? রেখে এসেছ বুঝি?
–এখনো আসেনি পৃথিবীতে। আসবে দুই মাস পর।
–আহ-হারে! দুই হাতে মুখ ঢাকে কাশেম চাচা। বলে, ওকে আগলে রাখনি কেন মা?
–গদরের যুদ্ধ তাহলে হতো না চাচা। মুক্তিপাগল সংগ্রামী যারা, তারা যে বিশ্বমায়ের সন্তান। এক ছোট্ট মায়ের আঁচল তাদের বেঁধে রাখতে পারে না।
–এত সুন্দর কথা শিখলে কোথায় লক্ষ্মী মেয়ে?
–আমার পূর্বপুরুষও যে গদর যুদ্ধের পরাজিত পলাতক সৈন্য চাচা। তারই প্রজন্ম মানে আমার দাদু এক অজগাঁয়ে কী হতাশায় জীবনপাত করেছেন, তা আমি দেখেছি। দেখছি এখনো গদর যুদ্ধের সেপাইরাও মাকে কাঁদিয়ে মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিঃশব্দে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন চাচা। কার জন্য এই কান্না, তা বুঝতে পারে না শিরিনা। পরাজিত নিগৃহীত পূর্বপুরুষের জন্য? তপনের জন্য? তপনের আগামী শিশুর জন্য?
পুব আকাশটা লাল হয়ে গেছে। উষা বিছিয়ে দিয়েছে কোমল লালচে গালিচা। হিরণ্ময় আলোর ছটায় নির্মিত মুকুট মাথায় দিয়ে উঠে আসবে সূর্য ওই পথে। এতক্ষণ আশ্বত্থগাছের পাতাগুলোকে মনে হচ্ছিল কালো। এখন বোঝা যায় সেগুলোর ঘন সবুজ রং।
তার একটু দূরেই একটা শিরিষ গাছ। ছোট ছোট পাতায় ছাওয়া পুরো গাছ। পাখিগুলো উড়ে গেল ফরফরিয়ে।
কাশেম চাচার কাছে এই প্রথম জানতে পারল শিরিনা যে, ওপারে যাওয়ার সময় নৌকা ডুবে পদ্মায় তলিয়ে গেছে সবাই। মুক্তিযুদ্ধের বছরে আগাম বন্যা এসেছিল। পদ্মার পানিও বেশ ফুলেফেঁপে উঠেছিল বর্ষার আগেই। তবে ঝড়-ঝাপটায় ডোবেনি নৌক।
রোজ রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট নৌকা বোঝাই মানুষ পদ্মা পার হয়ে চলে যেত ওপারে। কারো নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে

আচমকা ভেঙে খুলে যায় নৌকার পাটাতন। জোয়ান পুরুষ দু-চার জন বেঁচেছিল। পরিবারের বউ-ঝি-বাচ্চাদের বাঁচাতে গিয়েই মরতে হলো মলয় আর আকাশকে। তপন শুনলে খুবই কষ্ট পেত। যাক, ওকে আর শুনতে হলো না এসব কথা, মরে বাঁচল সে।

–আচ্ছা মা, প্রাণভিক্ষার আবেদন কি নাকচ হয়ে গিয়েছে?

–জানি না চাচা। জেলারের সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। দেখলাম দুজন হাফ প্যান্ট পরা কয়েদি জেলারের মোটা উদোম গা ডলাডলি করছে।

–আর্মিতে ব্যাটম্যান পায়, এরা পায় কয়েদি। ব্যাপার একই। রকম আলাদা। নাম আলাদা। জান তো মা, কয়েদিদের ক্রীতদাস মনে করে ওরা। রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, জুতা পালিশ করা, ঘর পরিষ্কার করা, বাগানের কাজ করা, বাচ্চাদের দেখাশোনা করা– কী না করে ওরা!

–শুনে কষ্ট লাগছে চাচা।

–যাক ওসব কথা। প্রাণভিক্ষার জবাব পাওয়া গেল কি না, তা তো জানতে হবে মা।

–এখন আর জেনে কী হবে চাচা! আজই অপেক্ষার শেষ দিন ছিল। কিন্তু কিছুই জানায়নি কেউ।

–তার মানে ক্ষমার চিঠি আসেনি। চাচা চোখ মোছে আবার। একটু থেমে বলে, নাটক সিনেমায় দেখেছি, গলায় ফাঁস পরানোর পরও ক্ষমার বার্তা আসে।

–তখন কী হয় চাচা? দুই চোখ আগ্রহে জ্বলে ওঠে শিরিনার।

–ফাঁসিটা আর হয় না। বেঁচে যায় মানুষ।

বুকের ভেতর আশাজাগানিয়া একটা বোমা ফাটে। কেঁপে ওঠে শিরিনা। ইস! তেমন কিছু একটা যদি হয়। ওগো স্রষ্টা, তুমি চাইলে কী না হয়? দয়া কর প্রভু। বাঁচিয়ে দাও তপনকে। ওর আয়ু বাড়িয়ে দাও বিশ্বপ্রভু। বদলে আমার আয়ু থেকে কিছুটা দিয়ে দাও ওকে। তুমি তো সবই পার মালিক!

দুজন সেপাই এসে দাঁড়ায় সামনে। সূর্যের আলো তখন শিরিষ গাছের পাতায় পাতায় ঝিলিমিলি খেলছে।

সেপাইদের হাতে তপনের কাপড়-চোপড়। একটা ছোট ব্যাগ এবং খুঁটিনাটি কীসব। শিরিনা যেন অন্ধ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছে না কিছু। চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।

–লাশটা দেবেন না আমাদের? চাচা ভাঙা ভাঙা স্বরে জানতে চায়। একজন সেপাই বলে, জেলার সাহেব ডেকেছেন। আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে। যেন একদলা তীব্র বিষ নেমে গেল গলা দিয়ে পেটের ভেতর। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শিরিনা।

জ্ঞান ফিরতেই মনে হলো খসখসে পুরনো কাঠের এক বেঞ্চে শুয়ে আছে সে। চোখ মেলে বুঝতে পারল, গাছতলা তো নয় এটা! তবে কোথায়? কে-ই বা আনল তাকে এখানে? কেন আনল? গলা চিরে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, আমি কোথায়?

–আপনি জেলারের ঘরলাগা বারান্দায়, এক সেপাই বলে।

–এখানে কেন? আমার স্বামীর লাশ কোথায়? চাচা নিয়ে গেছে? ধড়মড় করে উঠে বসতে চায় শিরিনা।

চাচা এসে দাঁড়ায় সামনে। বলে, উঠ না মা। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। আমিই তোমাকে এনেছি এখানে।

–তপুর লাশ কই চাচা? প্লিজ আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। আমার জন্য না হোক, তপুর সন্তানের জন্য ওকে আমার কাছে দিন চাচা। কথা তো নয়, আর্তনাদ।

–হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন চাচা। বলেন, শান্ত হও মা। খবরটা তো শুনবে।

–কী খবর আর শুনব চাচা? খবর তো আমি জানি। উঠে দাঁড়ায় রিনা।

উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নেই। ও যেন রিনা নয়, অন্য কেউ। একজন সেপাই এলো তপুর ডায়েরিটা নিয়ে। বলল, সরি, এটা ঘরের কোনায় ছিল। দেখতে পাইনি আগে।

–ওসব রেখে দিন আপনারা। চাই না, কিছু চাই না। আমি শুধু মৃত তপুকে চাই। কোথায় তার লাশ? ওর ব্যথার জায়গাগুলো আমি চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেব। জিব দিয়ে চেটে তুলব ফাঁসের নীল নীল দাগ।

–কী বলছেন ম্যাডাম? কার লাশ? কোথায় লাশ?

–বুঝতে পারছেন না? কাল রাতে যার গলায় ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আমি তার কথা বলছি। সে আমার স্বামী। আমার সন্তানের বাবা।

–কই, কাল রাতে জেলের ভেতর কোনো ফাঁসি হয়নি তো? সেপাই অবাক।

–মানেটা কী? চাচা কোথায় গেল?

–জেলারের ঘরে কীসব কাগজে সই সাবুদ দিচ্ছেন।

–মনে করেছেন লাশটা দেবেন না? মিথ্যা লাশ পাওয়ার কথায় সই নেয়া হচ্ছে কাগজে? আর চাচা সেটা করছে?

এমন সময় চাচা এলো। শিরিনা প্রায় অপ্রকিতিস্থের মতো বলল, লাশ হাতে না পেয়েই সই করে দিলেন চাচা?

–কী বলছো বাবা? শান্ত হও, কথা বলি।

–কেমন করে বলছেন কথাটা চাচা? আমি লাশটা চাই। আমার তপুকে না নিয়ে আমি যাব না এখান থেকে।

–লাশ নয় রে মা, তপুই আসবে এখনই।

–তার মানে? কী বলছেন এসব?

–কাল রাতে প্রাণভিক্ষা মঞ্জুরের চিঠি এসেছিল। চাচা চোখ মোছে, বলে, সব ওই ওপরওয়ালার ইচ্ছা। সব তাঁর অলৌকিক লীলা। শিরিনার মনে হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে কথা বলছে চাচা। কানে যাচ্ছে শব্দ, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে না সে। এও কি সম্ভব? তপু অক্ষত আছে? বাচ্চাটা তাকে বাবা বলে ডাকবে একদিন? তারা বাঁচবে একসঙ্গে? তপুর ফাঁসিটা হয়নি!

তপু এসে দাঁড়াল। স্বপ্নে যেমন ছায়া ছায়া মানুষ দেখা যায় ঠিক তেমনি এক ছায়ামানুষ। রোগা শরীর। মলিন মুখে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। অযত্নে লালিত রুক্ষ চুল। চোখের পলক পড়ে না রিনার। স্থির দৃষ্টি। ভাষা নেই সে চোখে।

–আমাকে চিনতে পারছ না রিনা? আমি তোমার তপু। বেঁচে আছি।

শরীরের ভেতর একটা শরীর নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় সারা রাত জেগে থাকার ক্লান্তিতে ভারী দুই চোখ। সে ঠিক দেখছে তো? তপুই তো? একটু আগেই চাচা বলেছে যে তপু আসবে। তবু বিশ্বাস হতে চায় না। বুকের ভেতর প্রচণ্ড তোলপাড় হচ্ছে। অলৌকিক প্রাপ্তির দমবন্ধ করা বাস্তবতায় অনুভবশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ হয়ে আসছে শরীর, চারদিক অন্ধকার মনে হচ্ছে কেন? চোখ বন্ধ করে রিনা।

সঙ্গে সঙ্গে তপু ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে। ডাকে, রিনা দেখ আমাকে। আমাদের সন্তানের জন্য ফিরে এসেছি ফাঁসির দড়ি ফেলে। রিনা, কথা বল সোনা।

সুখের কষ্টে চেতনা বিশ্বাসঘাতকতা করল। তপুর বুকে মাথা রেখে জ্ঞান হারাল রিনা।

কবিতা

জীবনপ্রবাহ

রোকেয়া ইসলাম

পুরুষের পৃষ্ঠ আর নারীর বক্ষ হতে
অবতীর্ণ এক মহাযুদ্ধ ক্ষেত্রে
অবুঝ সহোদর সহোদরারাই প্রতিপক্ষ
শক্তির পরীক্ষা শুধু বেঁচে থাকার জন্য
অদৃশ্য মায়ালোকে
সেই থেকে সংগ্রামের কাল শুরু
সুতীব্র বেদনায় মাতৃজরায়ু ছিঁড়ে
গ্রহান্তর থেকে অচেনা পৃথিবী পৃষ্ঠে
নির্ধারিত পরিক্রমায় মানুষজীবন একান্ত অকাম্য
দীর্ঘ পথে কতশত অজানা বন্দর পেরিয়ে
অনায়াস পৌঁছে যায় ঠিকানাহীন দীপপুঞ্জে
প্রতিদিনের গঞ্জে ভিন্ন বাণিজ্য
দেউলিয়া বণিক কর আধিক্যে হারায় বসতভিটা
রেয়াত মেলে না সুদ-আসল মিলে জামানত সর্বস্বান্ত
তাহলে এক যাপনে মানুষ কী খোঁজে কাকে খোঁজে
কেনইবা বার বার অন্ধকারে তার অন্বেষণ
পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে সমুদ্রে অরণ্যে
নিজের সাথে যুদ্ধ দুঃষহ প্রতীক্ষা

মহানাদের পরিসমাপ্তি কি অন্যজীবন আরেক গ্রহে?

দাঁতাল স্তব্ধতা

আমিনুল ইসলাম

সবকথা থেমে আছে ব্যর্থ শান্তি প্রক্রিয়ার মতো
আমাকে ছিঁড়ছে দাঁতাল স্তব্ধতা
নীরবতার টমাহক লেগে ধসে পড়ছে
প্রকল্পিত বাগানবাড়ি
অদ্ভুত শোকে পায়রারা উড়ে যাচ্ছে দুপাশে মেলে
শরণার্থীর পায়ের মতো ভয়ার্ত ডানা
আগুনে পুড়ছে আমার না-বলার কথার লাইব্রেরি
উচ্চারিত অতীতের আর্কাইভ যার তাকে
সাজানো ছিল চুম্বনের শব্দ, মধুসম্ভাষণের সিডি
এবং মুগ্ধ প্রতিশ্রুতি ধারণ করে রাখা
পিচ্ছিল সেলুলয়েডের এক বান্ডিল ফিতা।

আমার সবকথা প্রস্তুত ছিল ভালোবাসার মঞ্চে যৌথ
ঘোষণা হওয়ার মুগ্ধ প্রতীক্ষায়
তারা পড়ে আছে বারান্দায় আহত বলাকার মতো
তাদের ডানায় বিদ্ধ হচ্ছে নীরবতার বুলেট
অথচ আর্তধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না
তারা স্বপক্ষীয় ফায়ারে বিদ্ধ সৈনিকের মতো হতবাক।

মধুজল

শাশ্বত হাসান

আমি খুঁড়ি না মাটির জল।

আমি কখনো করিনি জোছনায় অবগাহন
খুঁড়ি না মাটির জল
ইচ্ছে করে জল পাহাড় ঘুরে বেড়াই
আমি তৃষ্ণা পাগল।

ছোট ছোট ঘুম আসে
তবু বলি আমি উজ্জীবিত।

আমি বেড়াই মধুজল সুখ ভেবে
কিশোর বোঝে না কিছু
কিশোর এখন বৃদ্ধ পাগল
খুঁজে বেড়ায় তৃষ্ণা জল।

আসলে আমি এবং কিশোর তৃষ্ণা পাগল
হৃদয়ের বহুমাত্রিক বলিদান দিতে দিতে
জোছনা পাগল।
কখনো ধরিনি জোছনার শেকড়।

আমি বেড়াই মধুজল ভেবে।

দীর্ঘশ্বাস

মুস্তাক মুহাম্মদ

কপোতাক্ষ আমার শৈশবের নদ
যার শীতল জলধারায় জুড়িয়ে তনু-মন
কপোতের স্বচ্ছ চোখের মতো পানি
দেখেনি কোথাও– ঘুরেছি যত খরস্রোতার কূলে।
মধুও একদিন ফিরেছিল যার স্নেহ-ছায়া-কুলে।

গ্রীষ্মের দুপুরে হাঁপাতে এসে পড়েছি দলবেঁধে
ডুবিয়ে ডুবিয়ে লাল চোখ– যা দেখে
দাদুর ছোটবেলাকার গল্পের কামোট ভয় পেত।
ঠোঁটের উপরে নরম লোমে তলানি পড়ে
যেন পানির জীব-নুনতাবেলি, নয়না, বোয়ালের সহবাসী।

কপোতাক্ষ, আমার বৃদ্ধ বয়সের বদ্ধ কুয়ো
যার পাড়ে কল-কারখানা-দখলদারের রাঙানো চোখে।
পানিতে কচুরিপানা-তলানি জমে অথর্ব,
পানির দুর্গন্ধে এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস!!

জমিতে বিনিয়োগ
মানেই সর্বোত্তম
বিনিয়োগ

আর মাত্র কয়েকটি জমি...

ঢাকার অদূরে
আশুলিয়া ও
সিংগাইরে
নিষ্কণ্টক এবং এখনই বাড়ী
করার উপযোগী রেডি জমি
৮০% পর্যন্ত ঋণ ও
দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি সুবিধায়
বিক্রয় চলছে...

ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে
সাশ্রয়ী মূল্যে শেল্‌টেক্‌-এর
অ্যাপার্টমেন্ট
বিক্রয় চলছে . . .

ধানমন্ডি (২২০৫ - ২২৩৫ বর্গফুট)
বনানী (২২৪৫ বর্গফুট)
বসুন্ধরা (১৬৪০ বর্গফুট)
মতিঝিল (৮৯৫-১১৯০ বর্গফুট)
সিদ্ধেশ্বরী (১৩৩৫-২০৬০ বর্গফুট)
মগবাজার (১৪৭০-১৬৭৫ বর্গফুট)
চামেলীবাগ (১৩৬৫-১৫৬৫ বর্গফুট)
উত্তরা (৮০৫/১৬০০ বর্গফুট)
বাসাবো (১১৭০/১১৮৫ বর্গফুট)
মিরপুর (৯৬৫-১৭১০ বর্গফুট)
কাঁঠাল বাগান (১১৮০-১২৩০ বর্গফুট)

শেল্‌টেক্‌ SHELTECH Since 1988

ISO

01713-091704, 01713-091705, 01713-091706, 01713-091708
01713-091710, 01713-091717, 01713-091720, 01713-091721
01713-091724, 01713-091726, 01713-091728, 01713-091747

গল্প

স্বপ্নপূরণ

সেলিনা হোসেন

বেগম যখন মা নূরবানুর গর্ভে, তখন ওর মায়ের তালাক হয়। নূরবানু চাচার বাড়িতে ফিরে আসে। তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। ছোটবেলা বাবা-মা হারিয়েছিল। অথচ নূরবানুর শ্বশুর খুব শখ করে তাকে ছেলের বউ করে নিয়ে এসেছিল। বলতো, মা আমার লক্ষ্মী। ওকে দিয়ে আমার সংসারে ফুল ফুটবে। কিন্তু ফুল ফুটল না, ছাই। মারা গেলেন নূরবানুর শ্বশুর। যতোদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ততোদিন নূরবানুর ভালো দিন কেটেছে। শাশুড়ি মাঝে মধ্যে গালমন্দ করেছেন। কিন্তু শ্বশুরের কারণে বেশিদূর এগোতে পারেনি। স্বামীও। রাতের অন্ধকারে বিছানায় খোঁটা দিয়েছে।

কী একটা বিয়ে করেছি যে এক টাকা যৌতুক পাইনি। যৌতুক না পেলে কি আয় উন্নতি হয়? আমি তো একটা মেয়ে। কে আমার জন্য যৌতুক দেবে। নূরবানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমার বাপে তো খুঁজে খুঁজে গর্তে ঢুকেছে। কপালে না থাকলে কার সাধ্য দুই কদম আগায়। নূরবানু চুপ করে থাকে। ও জানে, ওর বাবার বাড়ি নেই। ওর জন্য যৌতুক দেয়ার কেউ নেই। একমাত্র ভরসা ওর শ্বশুর। বাবার আদর দিয়ে ওকে আগলে রেখেছে। ও তাই চুপ করে থাকে। কারো সাথে বাগবিতণ্ডায় যায় না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর সরাসরি শুরু হলো অত্যাচার। মারধর। কখনো কখনো খেতেও দিত না।

ঈদ মোবারক
minister
ফ্রিজ
৫০০০ টাকা দাম কমলো
minister
৭ বছর গ্যারান্টি
আমার পণ্য, আমার দেশ
গড়ব বাংলাদেশ
Minister Hi-Tech Park
01971-700700

শাশুড়িও মাঝেমধ্যে বলেন, এতিম মাইয়ার আবার বিয়ার শখ কেন?
বিয়ের শখ? নূরবানু বলতে পারেনি যে বিয়ে কি তা ওর হাড়ে হাড়ে বোঝা হয়ে গেছে। বিয়ে নিয়ে মেয়েদের কি শখ থাকতে পারে?
স্বামী এসে চুলের মুঠি ধরে বলেছিল, বাপের বাড়ি যা।
আমার পেটে তোমার সন্তান–
সন্তান জন্ম দিবি তুই, পালবিও তুই। আমার কোনো দায় নেই।
এ আবার কেমন কথা?
যা বলার বলছি। যা বোঝার বুঝে নে। আমি রাঙামাটি চলে যাবো।
এই খেপুপাড়া ছেড়ে রাঙামাটি?
হ্যাঁ, সরকার ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। জমি দেবে, রেশন দেবে বলেছে।
শুনেছি ওইটা তো পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। বাঘ ভালুকও থাকতে পারে।
তোকে এত ভাবতে হবে না। আমি ওখানে যাওয়ার জন্য মন ঠিক করেছি। যাবোই।
ওখানকার লোকজনের কথা তুমি বুঝতে পারবে না।
তোর কি, হারামজাদি। তোকে তো আমি সঙ্গে নেবো না।
তাহলে কাকে নেবে?
আবার বিয়ে করবো।
যৌতুক নিয়ে?
সে রকমই তো হওয়া উচিত।
নূরবানু আর কথা বলে না। ওর ভীষণ কান্না পায়।
কিন্তু এই পাষণ্ডের সামনে কাঁদতেও চায় না। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ওর চাচার বাসায়।
এই বাড়িতেই বেগমের জন্ম। এখানেই ও বড় হতে থাকে। বড় হয়ে উঠাটা খুব আনন্দের ছিল না। বুঝতে শেখার পর থেকেই দেখেছে অবহেলা কত তীব্র। মায়ের বিয়ে হলে মা অন্য বাড়িতে চলে যায়।
ওর বাবা বিয়ে রাঙামাটি চলে গেছে। একদিন ফুপু এসে বলে, বেগমকে আমি নিয়ে যাবো। ও আমার কাছেই থাকবে।
ফুপু ওকে বাড়িতে নিয়ে যাবে শুনে ও খুব উৎফুল্ল হয়। দুটো জামা যা ছিল তা পোটলা বেঁধে তৈরি হয়। ফুপুর গলা জড়িয়ে ধরে বলে আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন ফুপু?
স্কুল? চোখ গোলগোল করে তাকায় ওর ফুপু, বাঁকা হাসি হেসে বলে গরিবের ঘোড়া রোগ ভালো না। চল।
বেগমের মন খারাপ হয়। তারপরও মনে মনে আশা রাখে যে ফুপুকে রাজি করিয়ে স্কুলে ভর্তি হবে। ফুপু যখন ওকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় ওকে আদর যত্নে রাখবে। মায়ের চাচার বাড়িতে তো ওর আদর-যত্ন ছিল না। এই কষ্ট ও মন থেকে তাড়াতে পারে না।
ফুপুর বাড়িতে আসার পর দু'চারদিন ভালোই কাটে। তারপর একদিন গ্রামের এক মুরুব্বির বাড়িতে কাজ করতে পাঠায়। বলে, আমি আর কতোদিন তোর ভাত-কাপড় টানবো। নিজেরই নিজে জোগাড় করে খা।
সাত বছরের বেগমের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন দূর হয়ে যায়। ওকে বিষণ্নতা পেয়ে বসে। ওর নিজের কাছেই ওর শৈশব হারিয়ে যায়।
পরের বাড়িতে কাজ করে ভাত জোগাড় করে, সেই ভাত খেয়ে বড় হতে থাকে ও। দিন গড়িয়ে যায়। বয়সের চেয়ে মনের দিক থেকেই ও বেশি বড় হতে থাকে। যে বয়সে ওর যে ভাবনা থাকার কথা নয়, সেটিই থাকে ওর মধ্যে।
একদিন বাড়ির গৃহিণী বলে, মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী। স্কুলে পড়াতে পারলে বেশ ভালোভাবে পাস করতে পারতো।
ও শুনে চুপচাপ থাকে, যা হওয়ার নয়, সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি ভাবনার দরকার নেই। একদিন রান্নার সময় চুলা থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে বাম হাতের অনেকখানি পুড়ে যায়। প্রায় পুরোটাই। চিকিৎসা তেমন হলো না। আস্তে আস্তে ঘা শুকালো। ফুপাতো বোন মনি মাঝেমধ্যে এটা ওটা খাবার দিয়ে যেতো। বলতো বেগু দুটো চিতই পিঠা আমি তোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম, এই কলাপাতার মধ্যে একটুখানি গুড় আছে খা। এই যে পানি। আহারে তোর কত কষ্ট!
চেতনে-অচেতনে ও মনির কথা শুনতো। ফুপু এসে ওষুধ খাওয়াতো, আর ভাতের থালা বিছানার পাশে রাখতে রাখতে বলতো, তোকে বাড়িতে এনে আমার জ্বালাই বেড়েছে রে বেগম। সংসারে এত কাজ করে আবার রোগীর সেবা করা যায়। মাগো মা, কী যে হবে। পোড়া হাত কি আর সারবে? লুলা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? জীবনভর পরের সংসারেই খাটাখাটনি করতে হবে। বেগম নেতিয়ে পড়ে থাকে। এতো কথা ও শুনতে পায় না। একটা শাড়ির ওপর রাখা ওর বাম হাতখানায় কখনো পিঁপড়ে উঠে আসে। ও স্বপ্ন দেখে যে, মা এসে কাছে বসেছে। বলছে, বেগুরে, আমি এসেছি। তোর আর কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু মা আসে না। ওর কষ্টও কমে না। যন্ত্রণার তীব্রতায় কখনো ওর জ্ঞান হারিয়ে যায়।
এতো কিছুর মধ্যদিয়ে ও সুস্থ হতে থাকে। মনি ওর পোড়া হাতে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। সমবয়সী বোনটির দিকে তাকিয়ে একটু স্বস্তি হয়। একটুখানি ভালো লাগা জন্মায়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।
ভালো হয়ে আবার কাজে যায় ও। মনির বিয়ে হয়ে গেছে। ও শ্বশুড়বাড়িতে থাকে। মাঝেমধ্যে মায়ের কাছে বেড়াতে এলে বলে, তোর বিয়ের জন্য ছেলে দেখছি রে। পাই না। সবাই যৌতুক চায়। তাছাড়া তোর হাতটা পোড়া থাক মনি এসব কথা বলি না। বিয়ে হলে হবে, না হলে দরকার নাই। ছোটবেলা থেকে তো নিজের ভাত নিজে জোগাড় করি। এখন তো বড় হয়েছি। হাত একটা পুড়েছে তো কি হয়েছে, গায়ে তো শক্তি আছে। দেখবি ঠিকই চালিয়ে যেতে পারব।
মনি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হেসে বলে, তোর কথা শুনে আমিও সাহস পাইরে বেগু। মা পারবে না। আমি তোর জন্য একটা ছেলে জোগাড় করবো।
বছর গড়িয়ে যায়। মনি আসা-যাওয়া করে। বেগমের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলে, কিছুই করতে পারিনি।
বেগমও হাসে। বলে, আমর দুঃখ নাই। এই পোড়া হাত নিয়ে সংসারের জ্বালা সহ্য করার চেয়ে ভালোই তো আছি। পেট ভরে ভাত খাই।
মনি নিশ্চুপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না ও যে কথাগুলো বলে তা দুঃখের, না সুখের।
একদিন বেগমের ফুপু একটি এতিম ছেলেকে খুঁজে পায়। যে বাড়িতে ও কাজ করে তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ও তেমন কোনো কাজ করে না। ঘোরাফেরা করে টুকটাক কিছু করে। সংসার চালানোর জন্য কিছু করবে এমন চিন্তা ওর মধ্যে নাই। বিয়ের দিন ফুপু বললো, ছেলেটা একটা উড়নচণ্ডী। তাতে কি, তবু তো তোর বিয়েটা হলো। মেয়েদের বিয়ের দরকার হয় রে। যা, ছেলেটার সঙ্গে ঘর কর। বেশি শয়তানি করলে আবার আমার কাছে আসিস। আমারও তো বয়স হলো। বড় দুঃখের জীবন কাটল। বেগম ভেবে দেখলো, ওর ফুপু যখন কথা শুরু করে, তখন একসঙ্গে অনেক কথা বলে। আসলে ফুপু কথা বলতে ভালোবাসে, কিন্তু ওর কথা বলতে ভালো লাগে না। এতিম ছেলে জালালের সঙ্গে পূর্বতুলতেলী গ্রামে সংসারের আশা-নিরাশার দিন ওকে ভাবায় না, ওর ভালোই লাগে। নিজের পোড়া হাতের জন্য বরং একধরনের অপরাধবোধ ওকে কুঁকড়ে রাখে।
বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় একটি ছেলে হয়। ও জন্মের পরপরই মারা যায়।
আবার গর্ভবতী হয়। বাচ্চা পেটে থাকার চার মাসের মাথায় জালাল ওকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বলেও যায় না যে আর দেখা হবে না, ও আর ফিরে আসবে না। বেগমের মনে হয় দুঃখ আর ওর ভেতরে কাজ করে না। দুঃখও করতে চায় না। পেটের সন্তানটির জন্য চিন্তা হয়। প্রথম সন্তানটি মরে গেছে, এবারেরটি বাঁচতে তো। আপন মনেই হাসে ও। জীবনের বাঁচা-মরার আর শোকতাপ করে লাভ কী? কারণ খেয়ে না খেয়ে কোনো মতে দিন কাটানো। পেটের ছেলের নড়াচড়া অনুভব করা আর রোজগারের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ওকে নাড়া দেয় না। কাঁথা সেলাই করে কিছু উপার্জনের কাজে নামে।
এর মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আরেকটি ছেলে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ওর গায়ের গন্ধ টেনে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। স্বপ্ন দেখে, ও কাজ করছে। ভালোই রোজগার হচ্ছে। ছেলেটি স্কুলে যাচ্ছে। পড়ালেখা শিখে ও একদিন বিদ্বান হবে। স্বপ্ন ওকে ঘোরের ভিতর

www.aiub.edu

Eid
mubarak

AMERICAN INTERNATIONAL UNIVERSITY-
B A N G L A D E S H

AIUB

83/B, Kemal Ataturk Avenue, Banani,
Phone: 58815387, 9897387, 9894229
Ext. 100, 199

টেনে রাখে। ওর ভালোই লাগে মজাও পায়। ছেলেটির ছয় মাসের ওপর বয়স হলে ওকে চাচাতো বোনের কাছে রেখে অন্যের বাসায় কাজে যা। এভাবেই চলছিল দিন। এর মধ্যে ছেলের বয়স ছয় হলে ওকে স্কুলে ভর্তি করে বেগম। তার খুবই ইচ্ছা যে, ছেলেটি লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু দু'বছরের মাথায় দেখা যায় যে ছেলেটি ঠিক মতো লেখাপড়া শিখতে পারছে না। বেগম স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে।

স্যার, আমার ছেলেটাকে আপনারা দেখেন? আমরা তো ক্লাসে দেখছি। তুমি ওর জন্য বাড়িতে একজন শিক্ষক রাখো।

আমি গরিব মানুষ, কেমন করে শিক্ষক রাখবো স্যার? আপনাদের পায়ে পড়ি। ওকে আপনারা একটু দেখেন।

অনুনয়-বিনয় কাজ হয় না। ছেলে পাস করতে পারে না। বেগম ওকে অন্য একটি স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেয়। ওখানে ও নানা কিছু শিখে লেখাপড়ায় এগুতে থাকে। বেগম খানিকটুকু স্বস্তি পায়। অন্য সময় ওর মন খারাপ হয়ে থাকে। লোকের কাছে শুনতে পায় ওর স্বামী বাড়ি ফিরে এসেছে। আরেকটি বিয়ে করেছে। ও চাচাতো বোনের সামনে চেঁচিয়ে বলে, পুরুষ মানুষের বৌয়ের অভাব হয় না। মাতারিরা বেটাদের জন্য হা করে বসে থাকে।

তারপর দু'জনে অকারণে হাসে।

তখন স্কুল থেকে ফিরে আসে বেলাল।

বেগম কে কোলে টেনে নেয়।

বাজান আমার কোলে বসো। আজ সব পড়া পেরেছো তো?

হ্যাঁ, মা, সব অঙ্ক রাইট হয়েছে।

সাবাস, সোনামানিক আমার।

ছেলেটিকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে তোলে ও। তারপর এক থালা গুড়-মুড়ি এনে দেয়। সঙ্গে একটি বিঁচিকলা।

বেলাল মুড়ি চিবুতে চিবুতে বরে, স্কুলের ফুটবল দলে খেলার জন্য স্যার আমাকে বলেছে। এরপর দেখবে আমি অনেক গোল করতে পারবো। আমার স্কুল জিতবে। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বেগম। ভাবে, স্বপ্ন বোধহয় এভাবে কাছে আসে। বেঁচে থাকাটা মোটেই খারাপ নয়। ওর ইচ্ছে হয় ও যেন অনেকদিন বেঁচে থাকে।

ওই বছরে ওর কাজের একটা সুযোগ আসে। কেয়ার বাংলাদেশ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নিয়ে আসে গ্রামে। অন্য অনেকের মতো ও নিজেও কাজের আশায় ওদের অফিসে যায়। ভয় ছিল, পোড়া হাত দেখলে ওরা হয়তো ওকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে। সে জন্য হাত লুকিয়ে রাখে শাড়ির আঁচলে।

কাজের জন্য মানুষের সংখ্যা দেখে ওরা লটারির আয়োজন করে। লটারিতে যে জিতবে সে কাজ পাবে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে বেগম। এই বুঝি বাদ পড়ে যায়, এমন আশঙ্কা বারবার ওকে শঙ্কিত করে। শেষ পর্যন্ত লটারিতে ওর নাম ওঠে। কাগজটা হাতে নিয়ে ওর খুশির সীমা নেই।

বারবারই ভাবে, এবার হয়তো ছেলেটার জন্য বাড়িতে একটা মাস্টার রাখতে পারবে। ছেলে ওর পড়ালেখা শিখে অনেক বড় হবে। স্বপ্ন ওকে পেয়ে বসে। বাড়ি ফিরে চাচাতো বোন নূরীকে বলে, আল্লাহ আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। বুঝি আমার দিন এবার ফিরবে।

সাবধানে থাকিস। কে আবার কোনখান দিয়ে লাগবে কে জানে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ওদের পরিচিত ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার খলিলুর বাড়িতে আসে। পান খেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, তুমি যে লটারিতে কাজ পেয়েছো সে জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। এজন্য তুমি আমাকে দুই হাজার টাকা দেবে।

বেগমের চোখ কপালে ওঠে, দুই হাজার টাকা আমি কি দুই হাজার টাকার মানুষ?

এত কিছু বুঝি না, টাকা চেয়েছি আমাকে টাকা দিতে হবে। নইলে–

নইলে কি বলেন?

তোমার কাজ পাওয়া ছুটিয়ে দেবো।

কী করবেন আমায়?

ওদেরকে তোমার পোড়া হাতের কথা বেল দেবো। বলবো, তুমি মাটি কাটার কাজ করতে পারবে না।

আপনার যা খুশি তাই করেন। আমি গরিব মানুষ। আমার টাকা দেয়ার সাধ্য নেই।

খলিলুর উঠে যেতে যেতে বলে, না দিলে ভালো হবে না কিন্তু। এখনো ভেবে দেখো।

লোকটি চলে যায়। বিমর্ষ হয়ে যায় বেগম। নূরী বলে, দেখেছিস বলেছিলাম না। এটা যে কোথায় গিয়ে গড়াবে আল্লাহই জানে। মানুষ এতো খারাপ হতে পারে। বেগম জেদি কণ্ঠে বলে, আমি টাকা দেবো না। টাকা তো আমার নেই। আমার যদি থাকতো তাও দিতাম না। ও কেন আমার কাছে অন্যায়ভাবে টাকা চাইবে? লোভী, শয়তান একটা।

খলিলুর জেদাজেদি করেও বশে আনতে পারে না বেগমকে। বেগমের সাফ কথা, আপনাকে আমি কেন টাকা দেবো?

খলিলুর ক্ষিপ্ত হয়ে কেয়ার অফিসে যেয়ে বেগমের পোড়া হাতের কথা বেল দেয়। বলে, ওকে কাজ দিলে ও করতে পারবে না। ওতো একটা লুলা মহিলা।

অফিসে ডাক পড়ে বেগমের।

ওর সোজা কথা, হ্যাঁ ছোটবেলায় আমার হাত পুড়ে গিয়েছিল। তাতে আমার কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। ছোটবেলা থেকে আমি কাজ করেই তো আয় করি। আপনারা আমাকে কাজ দিয়ে দেখেন।

অফিসের সবাই ওর মনোবলের প্রশংসা করে। কেউ কেউ বলে, এমন মানুষকেই সাপোর্ট দেয়া উচিত, যারা সহজে ভেঙে পড়ে না। লড়াইটা চালিয়ে যেতে চায়।

কাজের শুরুতে অন্য নারীরা বলে, তুমি তো মাটি কাটতে পারবে না। তুমি ঝুড়ি তোলার কাজ কর। বেগম ওদের কথা মেনে নেয়। প্রথম প্রথম মাটিভরা ঝুড়ি তোলার কাজ করে। কোনো অসুবিধা হয় না। কেয়ার বাংলাদেশ রাস্তা বানানোর কাজ করছে। বেশ বড় আকারের কাজ চলছে। মনভরে কাজ করে। সবাই ওকে সহযোগিতা করে। একদিন ও নিজেই বলে, আমি এবার মাটি কাটার কাজ করবো।

একজন বলে, পারবেন?

পারবো, খুব পারবো। কোদায় দেন আমাকে।

বেগম কোদাল নিয়ে মাটিতে কোপ দিলে ওর মনে হয় ও পারে। পরপর কয়েকটি কোপ দিলে চাকা চাক মাটি উঠে আসে। সবাই অবাক হয়ে ওর দিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, আপনি আমাদের তাজ্জব করেছেন।

বেগম কারো দিকে তাকায় না। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, আমি পারি।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ হাততালি দিতে দিতে বলে, আপনার পোড়া হাতে আমাদের হাতের মতোই শক্তি আছে।

নিজের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ফিরে পায় বেগম। নিয়মিত মাটি কাটার কাজ করে। নিজের পোড়া হাতের জন্য ওর আর কোনো লজ্জা নাই। এক সময় রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যায়। এখন তো আর বসে থাকার মানুষ ও নয়। যোগ দেয় ফসল প্রকল্প সংগঠনে। বীজ নিয়ে বাড়ির আশেপাশে চাষ করে সবজি। সবুজ হয়ে ওঠা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ছেলেটাকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠাবে। ভালো একটা স্কুলে পড়লে ও আরো ভালো রিজাল্ট করবে।

খাঁচাভর্তি পুঁইশাক কেটে পাইকারের হাতে তুলে দেয়ার সময় দেখতে পায় বই হাতে ছুটে আসছে কিশোর বেলাল।

দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে, মা, মাগো আমার দেয়া তিন গোলে আমাদের স্কুল গরগাঁও স্কুলকে হারিয়েছে। সবাই আমাকে কাঁধে নিয়ে মাঠে ঘুরিয়েছে। হেড স্যার অনেক আদর করেছেন। মাগো, তোমার পায়ে ধরে সালাম করি।

বেগম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাইকার বলে, অনেক কষ্ট করেছেন। এখন আপনার সুদিন এসেছে। যেমন ছেলে পড়েছেন, তেমনি মাচান ভরা সবজি গজিয়েছে।

এর চেয়ে বড় খুশি আর কি হতে পারে বেলালের মা।

বেগমের চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ে। বেলাল হাত দিয়ে পানি মুছে দিয়ে বলে, কাঁদে না মা। আমি আছি না আপনার জন্য।

বেগম পুঁইশাক বিক্রির টাকা দিয়ে সেদিন ছেলের জন্য ডিম আর কৈ মাছ কেনে। ভাত খেতে বসে বেলাল এতকিছু দেখে অবাক। মা তো ওকে একটা তরকারির বেশি খেতেই দিতে পারে না। ও গদগদ কণ্ঠে বলে, মা আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো। ডাক্তার হয়ে তোমার পোড়া হাতটা আমি ঠিক করে দেবো।

তাহলে বলবো পোড়া হাত নিয়ে আমার আর দুঃখ নাই। পোড়া হাত নিয়েই তোকে আমি ডাক্তার বানাতে পেরেছি। আমি হেরে যাইনি।

ঢাকার অতি সন্নিকটে
গাবতলী থেকে কয়েক মিনিটের পথ

সাভার লেক সিটি

প্রজেক্ট অফিস

প্রকল্পের বর্তমান চিত্র

প্রকল্পের প্রবেশ পথ

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরাই প্রথম .....
মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নুন্যতম মুল্যে প্লট বরাদ্দ দিচ্ছি।

আপনার ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে আমরা সদা প্রতিজ্ঞ ঢাকার অতিসন্নিকটে খরা মুক্ত আবাসন প্রকল্প

কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০/- টাকায় সাব-কবলা দলিল আর
২৪ কিস্তি শেষে আপনার প্লটটি বুঝে নিন (D-ব্লক এর জন্য)

প্লট প্রতি বুকিং মানি মাত্র = ৫০,০০০/- (৩,৪,৫ কাঠা)

৩ কাঠার প্লট এর সর্বসাকুল্যে মাসিক কিস্তি = ৭০৮৩/-
দিয়ে ঢাকার বুকে প্লটের মালিক হোন।

TEAM 12

TEAM 12 Properties Limited

কর্পোরেট অফিস ঃ
বাড়ী # ৪৬৩, (২য় তলা), রোড # ৩১,
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২১৬।

হট লাইন ঃ
০১৬১৭ ৪৪৪ ০০৩ ০১৬১৭ ৪৪৪ ০০৪
০২ ৮৮৭২০৫২

www.team12.group.com

সুখী হও, সুখ পাও ঘৃণা নিয়ে

সুজাউদ্দিন কায়সার

ঘৃণা কি সহজে মোছে? বরং ঘৃণা আরো বেশি হয়
রাগ ও কষ্টের দোলে দোল খায় বিরক্তি মিশায়ে
ঘৃণা কি গর্বিত রূপ? সারা বেলা দর্পিত রোদ্দুর!
কষ্ট ও সুন্দর অবিমিশ্র ছোপ দেখি সারাক্ষণ

বৃষ্টি ধুয়ে গেলে ঘৃণা জেগে ওঠে পতনের সুখে
আবরণে ছিল যে মনে-মনে বোঝা যায় সহজে

ঘৃণা হয় অগ্নিজ্বলা, প্রাণের বাতাসে ফুঁসে ওঠে
থাকে বিদ্বেষের মোহে যত রিক্ততার আগুন
মিলনের অন্ধকূপে ঘৃণার সুন্দর ক্ষত করে
ঘৃণা কি আজন্ম মোহ? বরং ঘৃণা জন্ম দেয় ঘৃণা!

কবিতা

রবীন্দ্রনাথের গান

দুলাল সরকার

তুমি না থাকলেও তোমার গান থাকবে বাঙালির
হৃদয় জুড়ে অটুট– এরকম বিশ্বাসেই তুমি একসময়
পদ্মার বালুচরে ঘুরতে ঘুরতে ভবতারিণী হারিয়ে ফেললে;

তারপর যখন মৃত্যুর ওপার থেকে ছোটকি বললে
আমি কিংবা বউঠাকরুন কেউ না থাকার পিছনে
তোমার চিত্তের চিরন্তন হাহাকারটুকুই দায়ী–
তখন মনে হল আর কেউ না জানুক আমি জানি
রক্ত তোলপাড় করা তোমার হাতের ওই একতারাটি
তুমি লালনের কাছেই খুঁজে পেয়েছিলে;

তখন আমাদের অবর্তমানে তোমার ভেতরের শূন্যতা
আর বুক জ্বালা করা একাকীত্ব বোধ
সারা রাত আমাদের গান শোনাতে চেয়েছিল
যদিও সে গানের ভাষা আমার সম্পূর্ণ অচেনা
তবুও তোমার বউঠাকরুন হয়ত বুঝে থাকবেন
এখানে তার শূন্যতাবোধই এ গানের উৎস
যদিও প্রতিটি গানের বহিরাবরণ মরমিয়া
বোধে আচ্ছন্ন আর ভেতরের 'তুমি' সেই চিরন্তন
বিরহেরই নামান্তর।

প্রিয় জাফলং

চঞ্চল শাহরিয়ার

জাফলং গিয়ে কটেজে ফেরার কথা
বেমালুম ভুলে যাই। পিয়াইন নদী
ডাউকী ব্রিজের মায়াবী দুপুর
আদিবাসী মেয়েদের অকারণ হাসি
ঝরনার সাথে একাকার হয়।

মেয়েদের সাথে পাহাড়ের সখ্য
জাফলং গিয়ে বারবার দেখি,
ক্লান্তি ভুলে যাই
ঈদের আনন্দ স্পর্শ করে পিকনিক বাসের জানালা,

অস্তিত্বের আপ্তবাক্য

সৌম্য সালেক

জানি খোয়া যাবে যৌনতার ঘর, ব্যর্থতায় পড়ে যাবে দেহ
কেন রোজ রোজ নেশা করি ক্লান্তিহীন কামনাবীজ...

যেন আলোকের ফুল হয়ে ফুটি– মৌতাতে
যেন অস্তিত্বের নভোনীল ব্যাপে–শিশুদের অনাবিল স্বর

যেন আচ্ছন্ন আমালিক রাত–ঘোরঘুমে স্বপ্ন হয় খুব॥

Manufacturer and Exporter
of Quality Offset Printing Ink

ISO 9001 & 14001 Certified

TOKA INK BANGLADESH LIMITED

A JOINT VENTURE INDUSTRY OF BANGLADESH AND JAPAN

2 DIT Avenue (Extn.) Motijheel C.A. Dhaka 1000 Bangladesh

Tel: 9568888, 9554143 Fax: 8802-9568887

কবিতা

জন্মগীতি

ফারুক মাহমুদ

সংলাপ মুখস্থ নেই। মুখোশের রং ছিল কড়া
বস্ত্রবাসে পড়ে আছে জং-ধরা ভাঙা তলোয়ার
রাজা ছিল, রাজ্য ছিল। কে নিয়েছে প্রবোচনাভার
মঞ্চের হৃদয় ফাঁকা, শুধু শুধু অসাড় মহড়া

আগুনের দগ্ধপাশে অশ্রুবিন্দু কতটা মানায়
এখনো ধারণা জন্মে। কোন যন্ত্রে নেভে দীর্ঘশ্বাস
নতুন প্রেমের মতো হেসে ওঠে মেঘের আকাশ
হিসাবের ক্লান্তি নয় ধ্বনিপুঞ্জ প্রতিধ্বনি চায়

যে-গল্প মাটির থেকে উঠে এলো মানুষের কাছে
হতে পারে পথিমধ্যে পরিতাপে পুড়ে গেছে দেহ
ঘাটের পারানি নেই, কাঁটামুখো প্রকট সন্দেহ
জন্ম তবু বেঁচে থাকে, মুখরতা মুখ তুলে আছে

অভিনয় সাঙ্গ হলো। অশ্রুভাষা ঝরে আছে একা
ফিরেছ কি জন্মগীতি। অগ্নিজলে দাও তবে দেখা

ক্যানভাস

কামাল মাহমুদ

শরতের রোদে ঝলমল করছে প্রকৃতি
আশ্চর্য আলোর প্লাবনে স্বর্গীয় সুন্দর হয়ে উঠেছে উদ্যান
নবীন দুপুরের গভীর থেকে ভেসে আসছে মৃদু উষ্ণতার প্রবাহ
তাতে যে বাতাস বইছে, ছায়া দুলছে শাখার, পাতার
তার নিচে বর্ণিল বালিকাদের পুতুল বিয়ের আয়োজন

মাঠজুড়ে ধান-কিশোরীরা সবুজের ফ্রক বদলে সোনালি কামিজ পরে
হয়ে উঠছে অঘ্রানের যুবতী
কৃষাণির গোবর লেপা উঠোনে নবান্নের সাজসাজ প্রস্তুতি
জবাব লোহিত রসে হৃষ্টচিত্ত কবিতা হাঁটছে কুমারী শাদায়

কার্নিশে ছায়ার আরামে শুয়ে থাকা বিড়ালের চোখে নির্ভার ভাতঘুম
পায়ে পায়ে থেঁতলে যাওয়া ঘাসপথের পাশেই ফুটেছে লাল হলুদ গাঁদা
দলছুট প্রজাপতি পায়ে-শুঁড়ে রেণু বয়ে নিয়ে ফুলদলে ফেরি করে চলেছে মিলন
পাখির চোখে মুগ্ধতার সাতপুরু আস্তরণ
বনে বনে রঙ বোনে পদ্মপলাশ–

এরকম সুখ শিহরিত চিত্রকল্পে কবিতা যখন গত জীবনের খুলে রাখা ডানা
ফের পরে নিয়ে উড়তে যাবে
একজোড়া কুৎসিত সাপ হুটোপুটি করে ঢুকে পড়ল ক্যানভাসে

ভণ্ডুল পুতুল বিয়ে, বিড়ালের বিশ্রাম ত্রাহিত্রাহি ঊর্ধ্বশ্বাসে নিমেষে উধাও
এমনকি বিহ্বল ধানশীষ, ভীত প্রজাপতি নিরাপদ উচ্চতার কঞ্চিতে হতবাক
ভস্মমাখা বাতাসে পোড়া মাংসের ঘ্রাণ যেন কোনো শোকবাড়ি শ্মশানে...

ডানা পুড়ে ছাই, শাদা পাতা কাদামাখা
কবিতাটা হাসিমুখে শেষ হতে পারে না।

অথচ মানুষ

মাহমুদুজ্জামান জামী

এত তীব্র রৌদ্র তবু
বৃক্ষদের ক্লান্তি নেই কোনো;
সহ্যের শিক্ষক সে তো–
মিছিলের অনন্য নীরব পুরোধা,
এমনকি নিদারুণ ঘূর্ণিঝড়েও
উচ্ছ্বসিত নাড়ায় প্রশাখা!
অথচ আশরাফুল মাখলুকাত–
দ্যাখো, কেমন ছিন্নভিন্ন, ক্লিন্ন,
কখনো বিরূপ ছদ্মবেশি, আবার
অল্পতেই করে হাঁস-ফাঁস–
যেন এইমাত্র লাফ দেবে
ট্রেনের জানালা দিয়ে;
কী কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

SINCE 1983
AB GROUP OF COMPANIES
Canca
Skyblue
Canca
Canca
CHIGO
Power Bank
AB TELECOM
AB TELECOM
Mini Bluetooth speaker
AB ELECTRONICS
AB TELECOM
SIDDIQUE & CO.
Corporate Office:
46/1,Sobhan Mansion
(7th floor),Purana Paltan,
Dhaka-1000,Bangladesh
Phone:+88-02-9556047,
9563479,9565694
Our Showroom:
1.32/32B,E.B National Stadium Market,Dhaka
2.House- 07,Road - 04,Mumotaz
Plaza,Dharmondi,Dhaka
3.64-66,Motalib Plaza,Isoragaon road,Mirpur1,Dhaka
4.Vhawal Point, Joydevpur Chowrasta, Gazipur
5.Muktijoddah Complex, Chowhatta, Sylhet
6.Noor Complex, Ground Floor487/A Salish Majib
Road,Agrabad, Chittagong
7.Agrabad Centre,1st Floor,2470/A Salish Majib Road,
Agrabad
8.Nasi Raja Miah Market, Muradpur, Chittagong
Find Us:
Websites:
www.abgroupbd.com
www.abelectronicsbd.com
www.abtelecombd.com
Your Priority Our 1st Choice

কবিতা

হয়ে ওঠে না

রেজাউদ্দিন স্টালিন

হয়ে ওঠে না কিছুই
গবেষণাগারে পিতল স্বর্ণ হয় না
একটা দিন রাত্রি হয়ে ওঠে না
এবং মানুষ হয়ে ওঠে না রোবট
পৃথিবী সৃষ্টির সব আয়োজন
বিস্ফোরণের আগেই
ফুরিয়ে যায় ভূগর্ভে

পরীক্ষাগারে ভাইরাসের পর ভাইরাস
তাদের পতন হয় না চিরন্তন
সব প্রতিপদার্থ দৃশ্যমান হয়
বাতাস ধরা দেয় খালি চোখে
চুম্বক রাস্তায় টেনে আনে সব আকাঙ্ক্ষা
কিন্তু কিছুই হয়ে ওঠে না
পা হয়ে ওঠে মাথা
কিংবা দাঁত মেরুদণ্ড
অবিমৃষ্যকারী ভবিষ্যৎ জড়িয়ে পড়ে দ্বিধায়
সাদা কালো হয়ে ওঠে
আনন্দ যন্ত্রণা
সূর্য হয়ে ওঠে চাঁদ
প্রকৃত অর্থে কিছুই হয়ে ওঠে না
গরু হয়ে ওঠে বাঘ
কুকুর ঘোড়া
এবং কাক মানুষ
আর অশথ শিমুল হয়ে যায়
জল আগুন

কিন্তু হয়ে ওঠে না কিছুই
জন্ম কিংবা মৃত্যু

দিন কাটে তো রাত কাটে না

শাফিকুর রাহী

তোমার শরীর নদীর মতো আকা-বাঁকা সর্পিল এক শিল্পকলা
সেই মাণিক্যে বিষ ও মধু উভয়েরই জাদুর টানে; কাকে টানে?
কোন সে অচিন পথের পথিক অপেক্ষাতে ঠায় দাঁড়িয়ে তোমায় জপে;
জনম জনম যায় রসাতল অকারণে অন্ধকারে কপাল ঠুকে!
কোন সরোবর-বৃন্দাবনে জোৎস্না ঝরা রাতে নাকি শীত-কুয়াশায়
নৈসর্গিক দ্বীপকুঞ্জে কুয়াকাটার নীল পাথারে ঢেউয়ের বাণে
নাকি কোনো সুখ আনন্দে ভাসো তুমি আমায় ভেবে প্রাণকোকিলা!

কোন অধরা সুখের নেশায় শীত-বসন্ত যায় কেটে যায় দারুণ কষ্টে
তোমায় ভেবে পথের বাঁকে একলা একা ধ্যানমগ্ন এ সন্ন্যাসী
বর্ষা কিংবা পৌষবিকেলে সুরেরই সাম্পানে আমি তোমায় খুঁজি
এ অনাথের শূন্য আকাশ খাঁ খাঁ করে ও-রঙিলা কোথায় তুমি;
তোমার ঠোঁটও চোখের বাঁকে এ কোন আগুন আফিমআরাম খেলা করে!
তোমার রূপের সপ্তকলায় মুগ্ধ নাবিক বেহুশ বেভুল তপস্যাতে
তৃষ্ণাকাতর মনের বীণায়- কামকামিনীর বক্ষযুগল নৃত্য করে
যার নাভিমূল চিত্রকলায় অফুরন্ত আনন্দ ঢেউ কাছে টানে।

অস্বাভাবিক স্বপ্নগুলো সত্যি হলে তোমায় পাবো এই আকাঙ্ক্ষায়
কালনিশিতেও তোমায় ভেবে সকাল দুপুর মনের তারে শান দিয়ে যাই,
তোমায় ছাড়া প্রাণের মাঝে প্রাণ থাকে না, দিন কাটেতো রাত কাটে না।
আকাশ পাতাল দুর্ভাবনায় গন্তব্যহীন নিরুদ্দেশের অভিযাত্রী
তোমার নামে নীল বেদনার পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেম কালিন্দীর ওই
ঊর্মিমালায়, দমকা ঝড়ের ঢেউয়ের তালে, পাবে কিনা তাও জানি না!

ছিটকে পড়ে লক্ষ্য

তোফায়েল তফাজ্জল

দড়ির আয়ত্তে প্রশস্ত মাঠ, ঘোড়াটি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে দূর্বাদলের আতিথ্যে।

এরই মাঝে ফুসমন্তরে তুলে আনা যুক্তির বাচ্চাটির
কোথায় প্রসব? উঁচু মাঠে নাকি নিচু অঞ্চলের মমতায়?
মতের পাল্লা অঙ্গুলি হেলায় নিম্নাচলের দলে।

শৈবাল পিচ্ছিল এমন ঢালু থেকে সমতলে উঠতে গিয়ে ধাঁধা লাগে চোখে,
কণ্ডুলি পাক পড়ে মাথায়, মূল সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে লক্ষ্য,
কারো মনেও গুঁতো দেয়নি প্রশ্নে, পুরুষ প্রাণী কি বাচ্চা দেয়?
তাই সাগরে নামবার আগে ধরনা দাও আবহাওয়া দপ্তরে,
পুচ্ছ উঁচিয়ে দেখে নাও গবাদি পশু কিনবার আগেই।

KONKA
Home Appliances

রান্না এখন ঝামেলাহীন, যখন তখন...

Microwave Oven
- Capacity 30 Liter • Digital Control • Touch Panel with LED Display
- 900 W • Power Level 11 • Glass Turn-Table • Micro, Grill & Convection
- Easy Cleaning & Easy Oprating • Multi Anti-Emission
- Speedy Defrost & Express Cooking • Digital Clock, Child Safe Lock

Microwave Oven Available Size: 17 Ltr | 20 Ltr | 23 Ltr | 25 Ltr | 30 Ltr

Rice Cooker
- Lucrative Design Options
- Low Power Consumption
- Keep Warm Function
- Smart Cooking

1.8 L | 2.2 L | 2.8 L

1 year warranty

Multi-Function Cooker
- Inner Pot: Aluminum • Black Non-stick Coating
- No Steamer, Glass Lid • Integrated Power Cord
- Black Color • 2 Round Plug

1100W | 2.5 L | 4.5 L

Induction Cooker
- Digital Display, 8 Safety Profection
- Body-sense Touch Technology • 24 Hours Timer Function • Temperature Adjustment
- Auto Voltage Protection

*শর্ত প্রযোজ্য

একমাত্র পরিবেশক
ইলেক্ট্রোমার্ট লিমিটেড
www.electromart.com.bd

electromartltd
01755661188

Now up to 24 months Installment available @ 0% interest*

সেলস্ এন্ড ডিস্প্লে সেন্টার : ঢাকা বাংলামোটর - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৪, ৮৩৪২৬৩২ | উত্তরা-৯ - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৫, ৮৮৩০৮২০, ৮৮৩০৯২৯ | নূর টাওয়ার, বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৬, ৯৬৬৬৪৫৫ | ফার্মগেট - ০১৭৫৫৬৬৬৬৬৬ | শেওড়াপাড়া - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৭,৯০৯৬৮৯৭ | ৯৯৭, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মার্কেট - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৮, ৯৫৮৬৬৬২ | ৯২-৯৩, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মার্কেট - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৫৯, ৯৫৬৪৬৪২, ৯৫৬৪৪৩৫ | ৫৪, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মার্কেট - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬০, ৯৫৮৭৯২৮ | চট্টগ্রাম রাজিয়াবাদ - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬৪, ০৩১-২৫৫৪৭৪০ | রাইফেলস ক্লাব -০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬৫, ০৩১ ৬৬৬৬০৯, ০৩১ ৬৩৬৫০৭ | নিউ মার্কেট - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬৬, ০৩১ ৬৩০৭৭৪ | সেন্ট্রালরোড-০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬৭, ০৩১ ২৫২৬৬৩২ | কক্সবাজার - ০১৭৫৫ ৬৬৬৬৬৯, ০৩৪১ ৬২৭৫৮ | রাজশাহী -০১৭৫৮ ৬৪৯৮৯৯ | সিলেট কিনবাজার -০১৭৫৫ ৬৬৬৬৭০, ০৮২১ ৭১৯৮৯১ | বাহাদুর শেরপুর রোড-০১৭৫৫ ৬৬৬৬৭১, ০৫১ ৬৪৫৯৮ | খুলনা - শিববাড়ি মোড়-০১৭৫৫ ৬৬৬৬৭২ |

এক্সচেঞ্জ সেলফোনে চমৎকার সার্ভিসিং ও রিপেয়ার খরচে পাওয়ার সুযোগ

সেলফোনে পরিবেশক নিয়োগ চলছে

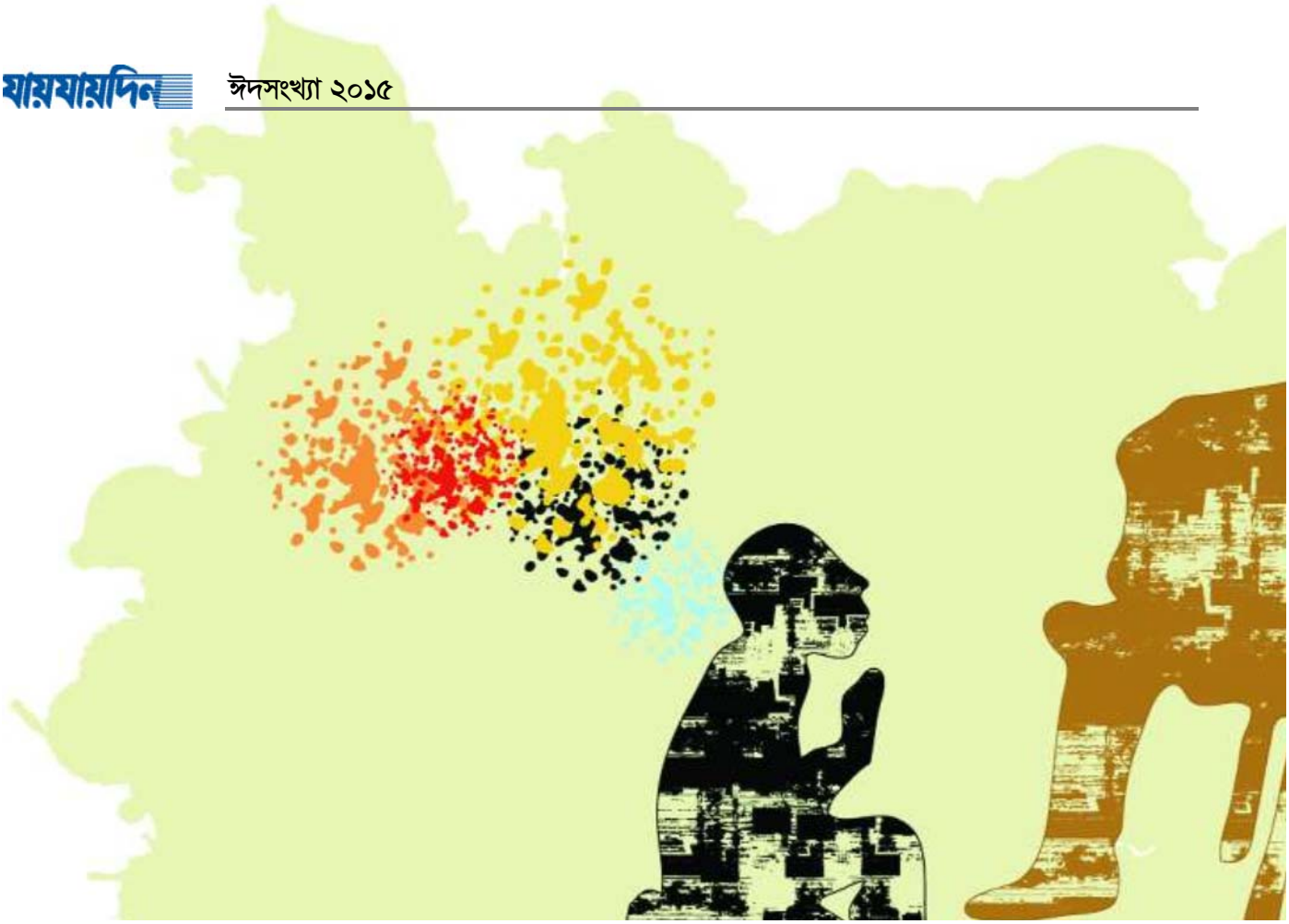

উপন্যাস

নীল সাহেবের গোলাম

আতা সরকার

১.

ম্যাকনেয়ার বিরক্ত হয়ে বলল : তোমার পা আমার কোমরে উঠে আছে। অ্যান দুষ্টু দুষ্টু সরে বলল: তাই নাকি? টের পাইনি তো!

ম্যাকনেয়ার আরো বিরক্ত।

বলল : আমাকে বানিয়েছ কোলবালিশ। আরামটা ষোল আনা। টের পাবে কী করে?

অ্যান এবার হাত বাড়িয়ে ম্যাকনেয়ারের গলা জড়িয়ে ধরল। আহ্লাদি গলায় বলল : আরামটা তাহলে পুরোপুরিই উপভোগ করতে দাও।

ম্যাকনেয়ার বলল : ন্যাকামি করো না। তুমি এখন আর কচি খুকি নেই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বয়স অনুপাতে আচরণ কর।

ম্যাকনেয়ারের জড়ানো কণ্ঠস্বর। সব কথা অ্যানের কানে ঢুকল না। ম্যাকনেয়ার উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। চোখে ঘুম। তাই কণ্ঠস্বরে জড়তা। কথাগুলো যদি পুরোপুরি অ্যানের কানে যেত, তাহলে এই সুশোভিত বিছানাই হয়ে উঠত কুরুক্ষেত্র। তবে অ্যান বুঝতে পারছে। ম্যাকনেয়ারের খুব ঘুম পেয়েছে। আর ঘুম পেলে তার স্বামীপ্রবর সবকিছুতেই খেই হারিয়ে ফেলে।

অ্যান বলল : তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছ কেন? এদিকে ঘোরো।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ম্যাকনেয়ার। কিন্তু

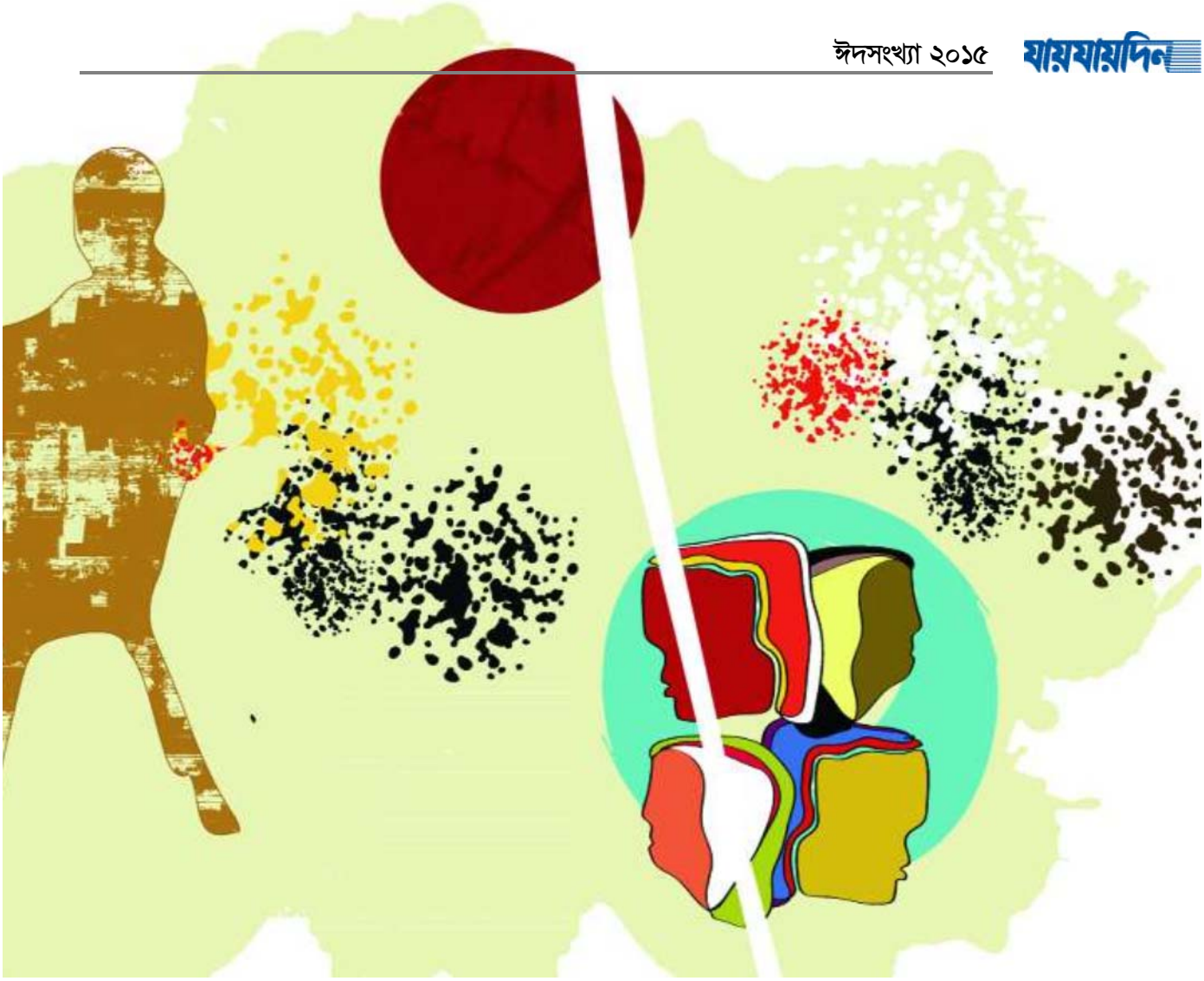

বলা হলো না। অ্যানের জোর টানাটানিতে এপাশে ফিরতে হলো। সে চোখ মেলল। লাল জবা চোখ।
অ্যান তার ঠোঁটে হালকা চুমু খেয়ে জড়িয়ে ধরল।
ম্যাকনেয়ার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল অ্যানকে। বলল : বিরক্ত করছ কেন?
অ্যান বিস্মিত হলো। আহতও। হিস হিস গলায় বলল : তুমি কি নপুংসক হয়ে গিয়েছ?
ম্যাকনেয়ার বলল : নিজেকে অতো সেক্সি মনে করো না। তোমার বয়সটা তুমি এখনো টের পাওনি। তোমার স্পর্শ পেলে আমি এখন হিম হয়ে যাই।
উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসল অ্যান। তীব্র কণ্ঠে বলল : মানে? কী বলতে চাও তুমি?
ম্যাকনেয়ার ঠাণ্ডা গলায় বলল : রাত দুপুরে খামোকা নাটক করো না। আমার মধ্যে কোনো হিপোক্র্যাসি নেই। যা আমার মনে হচ্ছে, সেটাই আমি বললাম। শুয়ে পড়। ঘুমাও। অ্যান আরো উত্তেজিত। বলল : শুয়ে পড়বই তো। তোমার দুঃখে সারা রাত জেগে থাকব নাকি? বুঝতে পারছি। তুমিই বুড়ো হয়ে গিয়েছ। অসুবিধা নেই, লন্ডন থেকে ওষুধ আনিয়ে খাও।
ম্যাকনেয়ার বলল : দেখ, আজ রাতে আমাকে কোনোভাবেই উত্তেজিত করতে পারবে না। আজ রাতে ওরা গ্রাম থেকে একটা মেয়ে ধরে এনেছিল। বেশ কচি। আর খুব তেজি। ওর সঙ্গে লড়াই করে আজ আমি ক্লান্ত।
ম্যাকনেয়ারের সমস্যাটা বোঝা গেল। এটা ওর পুরনো চরিত্র। অ্যান এ নিয়ে আগে বিরক্ত হতো। এখন আর হয় না। একথা তো সত্য, ওর বয়স বাড়ছে। বয়সী মেয়েদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ কমে যায় এটা তার জানা। তবে ম্যাকনেয়ার একটু যেন বেশি করেই নেটিভ মেয়েদের দিকে ঝুঁকছে। এ নিয়ে আবার কোনো ঝুট-ঝামেলা না হলেই হয়। অবশ্য এটা ম্যাকনেয়ারের সমস্যা, সে-ই দেখবে। কিন্তু তার প্রতি নিষ্ঠুরতা তো ক্ষমা করা যায় না।
অ্যান একটুক্ষণ ভাবল। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত

মোবাইলে প্রিমিয়াম জমা

সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম নিম্নোক্ত সেবার মাধ্যমে জমা করতে পারবেন :

সেবা-১ Dutch-Bangla Bank Mobile Banking এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা ঃ

· **সানফ্লাওয়ার লাইফ** ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর **Dutch-Bangla Bank Mobile Banking** একাউন্ট নম্বর **(Account Number)** ঃ **700** এর মাধ্যমে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পদ্ধতি ঃ

আরম্ভ করার জন্য *322# ডায়াল করুন। → 1 লিখে রিপ্লাই দিন → একাউন্ট নাম্বার 700 লিখে রিপ্লাই দিন

আপনার পলিসি নম্বরটি যেমন : ১২৩৪৫৬৭৮৯১-২ এর স্থলে ১২৩৪৫৬৭৮৯১২ লিখে রিপ্লাই দিন → টাকার (প্রিমিয়াম) পরিমান যেমন ৫৭৫০ টাকা হলে 5750 লিখে রিপ্লাই দিন → আপনার গোপন নাম্বারটি লিখে রিপ্লাই দিন → যদি লেনদেন সফল হয় একটি Confirmation SMS পাবেন

সেবা-২ bKash Mobile সেবার মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা:

· সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর bKash একাউন্ট নম্বর **(Account Number)** **01841017700** এর মাধ্যমে নবায়ন ((Renewal)) প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পদ্ধতি ঃ

আরম্ভ করার জন্য *247# ডায়াল করুন। → প্রিমিয়াম প্রদান করার জন্য 3 চাপুন → সানফ্লাওয়ার লাইফের বিকাশ একাউন্ট নম্বর 01841017700 লিখে Send করুন। → আপনার প্রিমিয়ামের পরিমান যেমন ৫৭৫০ টাকা হলে 5750 লিখে Send করুন।

আপনার পলিসি নম্বর যেমন 01234567-6 ও নাম মোঃ আবুল কালাম হলে 012345676KALAM লিখে Send করুন। পলিসি নম্বর এর সাথে নামের যে কোন অংশ যুক্ত করতে হবে (২০ ডিজিট এর মধ্যে) → কাউন্টার নাম্বার ০ (শূন্য) লিখে সেন্ড করুন। → আপনার গোপন পিন XXXX নম্বরটি চাপুন → যদি লেনদেন সফল হয় তাহলে আপনি একটি Confirmation SMS পাবেন

* প্রিমিয়াম জমার পর মূল রশিদ (O.R.) ইস্যুর সাথে সাথে SMS এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে জানান হবে (যদি ফোন নম্বর কোম্পানীতে দেয়া থাকে) এবং মূল রশিদ (O.R) ডাক যোগে গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে।
* এ ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম জমা করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭৫৭১০৭৯৬৮ ০১৮৪১৪১১১৫৫, ০১৮৪১৪১১১৬৬, ০১৮৪১৪১১১৭৭

সঞ্চয় সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি

সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ দিলকুশা সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ২৮ দিলকুশা বা/এ , ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭৫৭১০৭৯৬৮ ফোন : ৯৫৭১৬১৯-২০ ফ্যাক্স নং-৮৮-০২-৯৫৭৮৮৭০
ই-মেইল : sf_life@sparkbd.net web:www.sunflowerlife.com

pata creation'2014

নিল। তার ঠোঁটে খেলে গেল ক্রুর হাসি। বলল : তাই বল। তুমি ক্ষুধার্ত নও। আমি ভেবেছিলাম, তোমার খাদ্যের প্রয়োজন। তাই আয়োজন করছিলাম। ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।
ম্যাকনেয়ারের পাশে শুয়ে পড়ল অ্যান। বিড়বিড় করে কিন্তু ম্যাকনেয়ারকে শুনিয়ে বলল : আসলে আমারও খাদ্যের প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যাবেলায় খাওয়াটা আমিও সেরে নিয়েছি তোমাকে খুশি করার জন্য এখন এমন করছিলাম। আর তুমি তো জানো, বার বার খাওয়ায় মেয়েদের কোনো অসুবিধা নেই। আমার তো নেই-ই। মেয়েরা পারে, যেটা পুরুষরা পারে না। আবার ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ম্যাকনেয়ার। অ্যানের কথা কানে ঢুকতেই তার দুটো চোখই খুলে গেল। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মানে?
অ্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল: আহ! উত্তেজিত হচ্ছ কেন?
অ্যান যা চেয়েছিল, তাই হলো। ম্যাকনেয়ারের চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। তাকে খামচে ধরল। বলল : তুমি কী বোঝাতে চাইছ?
অ্যানের কণ্ঠস্বর আরো শীতল! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে পেয়েছ এবং বুঝেছও।
ম্যাকনেয়ার বলল : হ্যাঁ, বুঝেছি। ঘটনাটা সত্য?
অ্যান ম্যাকনেয়ারের মুখোমুখি : তোমার কী মনে হয়?
: তুমি এমন করতে পার না।
: তুমি পারলে আমি পারব না কেন? আমি কি তোমার ভোগ্যা কোনো নেটিভ? যেখান থেকে তোমার আসা, আমিও সেখান থেকে এসেছি। আমরা দুজনই স্বাধীন।
: ঠিক আছে। এ নিয়ে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। আমি তো আগেই বলেছি, তুমি তোমার মতো চলাফেরা কর। এনজয় কর।
: তাহলে তো চুকেই গেল। তাহলে এত কথা বলছ কেন? এত প্রশ্ন কেন?
: কৌতূহলে। জানতে ইচ্ছে করছে, আজকের সন্ধ্যায় তোমার সাথী পুরুষটা কে ছিল? উইলিয়াম শেরিফ?
: তাহলে তুমি খুশি হবে?
: আমি তোমাকে বহু আগেই শেরিফের ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছি।
: তাহলে তোমার খুব সুবিধা হয়। তোমার ক্যারিয়ারের। দুঃখিত, আমি তোমাকে খুশি করতে পারলাম না।
ম্যাকনেয়ার বিছানায় উঠে বসল। চিৎকার করে বলল : তাহলে বদমাশটা কে?
অ্যানও উঠে বসল। ম্যাকনেয়ারের চোখে চোখ স্থির করে বলল : তোমার চাইতে বড় বদমাশ সে হতে পারে না।
ম্যাকনেয়ার হিস হিস স্বরে বলল : কে সে?
: সেও একজন নেটিভ। ইন্ডিয়ান বাঙালি। তোমাদের কনসার্নেই কাজ করে।
: আমি তার নাম জানতে চাই। নগেন্দ্র? নাকি নলিনাখ্য? অ্যান বুঝতে পারে, তার ওষুধের ডোজে ভালো মতোই ধরেছে। আর ঠোঁটে এক টুকরো ক্ষীণ হাসি খেলে যায়। অ্যান কটাক্ষে বলল : কোনো অসুবিধা কি আছে?
ম্যাকনেয়ার দাঁত কিড়মিড় করে বলল : তোমার রুচিবোধ এত অধঃপাতে গিয়েছে?
অ্যান বলল : আমার রুচিবোধ কেমন, তা তুমি ভালোভাবেই জান। আমার এখনকার রুচি তোমার সঙ্গে বসবাসের ফল। ম্যাকনেয়ার ধমকে উঠল : খামোশ। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকে ওই নেটিভদের মতো এখানেই পুঁতে রেখে যাব।
অ্যান কঠিন কণ্ঠে বলল : সেটা তুমি পারবে না। তুমি ভালো করেই জান, আমি ইংল্যান্ডের কোন পরিবার থেকে এসেছি। আর তোমার নিজের অবস্থান কী।
ম্যাকনেয়ার হতাশ কণ্ঠে বলল : তাই বলে দেশি কুত্তাগুলোর সাথে?
অ্যানের কণ্ঠে আবার ব্যাঙের ঝাঁঝ : কেন? অসুবিধা কী? এখন তো ওদের মেয়েদের সঙ্গেই তুমি আনন্দ পাও।
: আমি ওদের ব্যবহার করি। তারপর ফেলে দিই। ঠিক ন্যাপকিনের মতো। বেশি দুর্গন্ধ ছড়ালে মাটিতে পুঁতে ফেলি।
: আমিও তো তেমন করতে পারি। তাই না?
ম্যাকনেয়ার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল : নেটিভদের মধ্যে কি কোনো পুরুষ আছে? তুমি কিসে আনন্দ পাও।
অ্যান বলল : ভারতবর্ষে আসা ব্রিটিশ ছেলেদের মধ্যে কি কোনো পুরুষত্ব আছে? সব তোমার মতো। ন্যাকা। মেন্দা মেরে গিয়েছে।
: তাই তুমি পুরুষ খুঁজলে নেটিভদের মধ্যে? হাহ।
: তোমার চোখে কি কোনো পুরুষই পড়েনি? ওদের মধ্যে তোমাদের চাইতেও সুপুরুষ রয়েছে। তরুণ। জোয়ান। লম্বা-চওড়া। প্রশস্ত বুক। চেতানো। সুদৃঢ় বাহু। মাসলগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শক্ত শিরদাঁড়া। সটান দাঁড়ায়। অসুরের মতো শক্তি। রাত দিন পরিশ্রম করে। কিন্তু ঠোঁটের কোণায় লেগে থাকা সারাক্ষণের হাসিটা মেলায় না। ম্যাকনেয়ার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : তুমি কার কথা বলছ? সহিসটার?
অ্যান বলল : এমন সুপুরুষ ভারতে আসা ইউরোপীয়দের মধ্যে একজনও নেই। খোদ ইংল্যান্ডেই বা কজন চোখে পড়ে?
ম্যাকনেয়ার দাঁতে দাঁত পিষে বলল : রইসখান! তুমি রইস খানের কথা বলছ?
অ্যান সহাস্যে বলল : তুমি কি মনে কর তার কাছ থেকে খুব বেশি আনন্দ পাওয়া যাবে না?
ম্যাকনেয়ার বিছানা থেকে নেমে গেল। বিড় বিড় করতে করতে বলল : আচ্ছা দেখছি।
সে ঘরের আলমারি থেকে হুইস্কির একটা বোতল ও গ্লাস বের করল। হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল ব্যালকনিতে।
ম্যাকনেয়ারের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান। বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরল।
আসলে সুখের দিনগুলো খুব দ্রুত ছুটে পালায়। ম্যাকনেয়ারের সঙ্গে তার পরিচয় মনে হয় এই সেদিনকার ঘটনা।
স্মৃতি যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ম্যাকনেয়ার তার মাথার পাশে বসছে। চুলে বিনি কাটছে। চিবুক স্পর্শ করছে। সোহাগ বুলিয়ে দিচ্ছে নাকের ডগায়। ঠোঁটে।
ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে।

২.
ব্যালকনিতে চেয়ার পাতা। পাশেই সাইড টেবিল।
ম্যাকনেয়ার হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসে বসে।
খুব রাগ হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে, এখনি সহিসটাকে ডেকে এনে চাবুকপেটা করে।
কিন্তু এ মুহূর্তে কিছু করা যাবে না।
রইস খান এমনিতে খুব ভদ্র। যোগ্য। সৎ। অনুগত। উইলিয়াম শেরিফ ব্যক্তিগতভাবে তাকে খুব পছন্দ করে।
অ্যানের সাথে সত্যিকার অর্থে তার কোনো ঘটনা আছে কিনা, অ্যানের বক্তব্য থেকে তা পরিষ্কার নয়। তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো অভিযোগ আনা যাচ্ছে না। অ্যানকে জড়িয়ে তো নয়ই। তাহলে এখানে গড়ে ওঠা তাদের সমাজে তার মাথাকাটা যাবে। ইংল্যান্ডেও সমস্যা হবে। অ্যানের পরিবার অত্যন্ত প্রভাবশালী। এ মুহূর্তে কিছু করতে গেলে তার ক্যারিয়ার একেবারে বরবাদ। তার চেয়ে ভালো, কিল খেয়ে কিল হজম করা। এবং সময়ের অপেক্ষা করা। সহিসটাকে সে দেখে নেবে। ম্যাকনেয়ার গ্লাসে তরল ঢালল না। বোতলের ছিপি খুলে সরাসরি গলায় ঢেলে দিল।
দিন কী তরতরিয়ে যায়? অতীত খুব ঝাপসাভাবে মনে পড়ে ম্যাকনেয়ারের। আসলে কষ্টের দিনগুলো সে মনে করতে চায় না। এখনকার সুখটাকেই নিয়ে তার বসবাস।
সিন্দুরিয়া নীলকুঠির ম্যানেজার সে। নীলকুঠির মালিক উইলিয়াম শেরিফ। শেরিফ নিজেও একসময় এ কুঠির ম্যানেজার ছিল। জেমস আইভান মে সিন্দুরিয়া নীলকুঠির প্রথম পত্তন করে। তার ম্যানেজার হয়ে আসে শেরিফ। কালক্রমে মেধা, বুদ্ধি, শ্রম দিয়ে কুঠির সর্বেসর্বা মালিক হয়ে যায়। আইভান মে ইংল্যান্ডে অবসর জীবনযাপন করছে।
সময়কে যদি মুঠোয় আনা যায়, তাহলে শেরিফের স্থলাভিষিক্ত হতে ম্যাকনেয়ারকে বাধা দেবে কে?
এ সময়গুলোতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ভালো হতো, অ্যান যদি তাকে সহযোগিতা করত। কিন্তু অ্যান যেন ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। হতে পারে, নেটিভরা তাকে প্রভাবিত করেছে। সে যখন ভারতে আসে, তখন তাকে অনেকে ভারতের বিভিন্ন বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছে। মশা, মাছি, সাপ, ম্যালেরিয়া। এগুলো যেমন ভয়ানক, তেমনি এখানকার লোকরাও রহস্যময়-জাদুটোনা জানে।
ওরা কি অ্যানকে জাদু করেছে?
না হলে একজন পাগলও নিজের বুঝ বোঝে।
ম্যাকনেয়ার লক্ষ্য করেছে, অ্যানকে দেখলেই

শেরিফের চোখ চকচকে হয়ে ওঠে। পার্টিতে ওর সাথে বলড্যান্সে আগ্রহ দেখায়। নিভৃতে কথা বলার সুযোগ খোঁজে।
অ্যান এসব পাত্তা দেয় না। চট করে এড়িয়ে যায় শেরিফকে। ম্যাকনেয়ার অ্যানে বোঝাতে চেয়েছে, শেরিফের বয়স হয়েছে তো কী হয়েছে? ওর হাতেই আছে আলাদিনের চেরাগ। চেরাগটা হাতিয়ে নেয়ার জন্য কয়েকদিন অভিনয় করলে তো অসুবিধা নেই। বরং সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়ে আনন্দ কর। মেয়েদের শরীর তো আর বাইবেল নয়। আর অ্যানের জীবনে ম্যাকনেয়ারই তো প্রথম পুরুষ নয়। বিয়ের আগে কত বয়ফ্রেন্ডের সাথে ডেটিং করে বেড়িয়েছে।
শুনেই অ্যান দূর দূর করে উঠেছে। সাফ-সাফ জবাব: ওই বুড়ো হাবড়ার কিছু নেই। মিসেস শেরিফ আমাদের গল্প শুনিয়েছেন, বুড়োটা খেলতে গেলেই রনে ভঙ্গ দিয়ে পালায়। এসব লোক দিয়ে আমার পোষাবে না।
ম্যাকনেয়ার ভাবে, অ্যান কি তার ব্যাপারেও এমন মনে করছে? ওর ডাকে সাড়া না দেয়াতে? এ জন্যই কি নেটিভদের সাথে তার এত মাখামাখি? নাকি তাকে রাগানোর জন্য অভিনয় করছে?
তবে অ্যানকে রাগানো যাবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। অ্যানকে দিয়েই তার ক্যারিয়ারের শুরু। উন্নতি!
আরো অনেক দূর যেতে হবে। ভারত জয় তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত কলকাতাই জয় হলো না। সে পড়ে রয়েছে সিন্দুরিয়ার এক নীলকুঠি কনসার্নে। তাও আবার নীলসাহেব হয়ে নয়। মালিক শেরিফের মতো ভাগ্য তাকেও গড়তে হবে।
কিন্তু সেখানেই আটকে থাকলে হবে না। তাকে আরো ওপরে উঠতে হবে। লর্ড ক্লাইভকেও ছাপিয়ে। ম্যাকনেয়ারকে কে চেনে? কিন্তু লর্ড ম্যাকনেয়ারের খ্যাতি হবে জগতজোড়া। হতেই হবে। আর এ জন্যই অ্যানকে তার সাথে জড়িয়ে রাখতে হবে। অ্যানের সাথে তার সম্পর্কটা কি শুধুই ক্যারিয়ারনির্ভর? ব্যবসায়িক বুদ্ধিতাড়িত?
তারুণ্যের উচ্ছ্বাসময় দিনগুলোর কথা ভাবল ম্যাকনেয়ার। তখনকার দিনগুলো ছিল তার জন্য কষ্টের। বাবা কারখানার মজুর। আর মা নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রী। শুনেছিল, তাদের বিয়ের ঘটনাটা ছিল আবেগঘন। কয়েকটা বছর তাদের দাম্পত্য ছিল সুখকর। তারপর একসময় এ সম্পর্কে ছেদ পড়ে। তার অ্যামবিসাস মা ক্যারিয়ার গড়ার ধান্দায় উঁচু থেকে আরো উঁচু সমাজে বিচরণ করতে শুরু করে। এর মধ্যেই সংসারে ম্যাকনেয়ারসহ পাঁচটি ছেলেমেয়ে এসেছে। তিন ছেলে দুই মেয়ে। মায়ের নাগাল ধরতে না পেরে বাবা মদাসক্ত হয়ে পড়ে। কারণ তার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না, এক মজুরগিরি ছাড়া।
কর্তব্য-কর্মে অবহেলায় বাবা চাকরিটিও হারায়। বাজারে তার অখ্যাতিই বেশি। নতুন আরেকটা চাকরি জোগাড় তার সহজে হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে তার আগ্রহটাই যেন কম।
আর মা হাই সোসাইটিতে লাফাতে লাফাতে বড় অভিনেত্রী না হলেও চড়া দামের বারবনিতায় পরিণত হয়।
তাদের সংসারটা ভেঙে যায়। মা আরো সমৃদ্ধি আরো সুখের আশায় একসময় তার বাবাকে ডিভোর্স দেয়। বিয়ে করে এক বুড়ো বায়রনকে। তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না ম্যাকনেয়াররা। তারা নানা-নানির সংসারে অযত্নে-অবহেলায় প্রতিপালিত হয়। আর বাবা আজ এ কারখানায় কাল ওই শপিং মলে চাকরি নেয় আর ছাড়ে। আর রাতে সময় কাটায় বারে। রাতের বাকি সময়টুকু নিজের ঘরে না এসে কাটিয়ে দেয় এক মহিলা দোকানির সাথে। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, এ দুঃখবোধ তার যত প্রবল, পাঁচটি ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আর অনাগ্রহ ততই বেশি। সে তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দেয় : আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। ওই পাঁচটা কার। তা আমি জানি না।
ভাই-বোনদের মধ্যে ম্যাকনেয়ার তৃতীয়। অন্য ভাই-বোনের তুলনায় তার কিছুটা বুদ্ধিসুদ্ধি রয়েছে। বড় মামা এ জন্য তাকে খানিটা পছন্দ করত। তাকে উৎসাহিত করত। বই-পত্র কিনে দিত। স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিল।
এ পছন্দের ব্যাপারে ম্যাকনেয়ার অবশ্য ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করে। বড় মামার একটা খোঁড়া মেয়ে রয়েছে। সম্ভবত বড় মামা এ মেয়েটিকে তার কাঁধে গছাতে চেয়েছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সারা জীবন ঘর-সংসার করার ইচ্ছা ম্যাকনেয়ারের কখনো ছিল না। কিন্তু বড় মামার কাছ থেকে আদর-যত্ন আর মেয়েটির কাছ থেকে শারীরিক সুখ গ্রহণ করতে তার কখনো নিরাসক্তি দেখা যায়নি। এ সময়েই সে অ্যানের প্রেমে পড়ে। তখন স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে। অ্যান উচ্ছ্বাসপ্রবণ তরুণী। লন্ডনের অভিজাত পরিবারের মেয়ে। সুন্দরী। স্বাস্থ্যবতী। ফিগার সচেতন। সংস্কৃতিবান। শহরের তরুণদের সে অনায়াসেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। তার চারপাশে একদল স্তাবক সবসময়ই ঘুর ঘুর করতে থাকে। ম্যাকনেয়ারও এ দলের সাথে ভিড়ে যায়। বিভিন্ন কায়দা করে সে অ্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।
এ সুযোগটা তাকে করে দেয় অ্যানের তখনকার মানসিক বিপর্যয়। অ্যানের এক বয়ফ্রেন্ড তাকে একদিন প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যাত হতে অ্যান কখনো পছন্দ করেনি। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
বয়ফ্রেন্ডকে প্রত্যাখ্যাত করতে সে তখন মরিয়া। কোন কারণে এই ভদ্রলোকের সাথে ম্যাকনেয়ারের বিতণ্ডা হয়। সেটা হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। ভদ্রলোক ম্যাকনেয়ারকে কঠোর শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
অ্যান তখন ম্যাকনেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব। সময়ে তা গাঢ় হয়। দুজন বিয়ে করে।
প্রথম দিকে দুই পরিবারের কোনো পক্ষই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। ম্যাকনেয়ারের বড় মামার স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। বড় মামা তাকে বেইমান বলে গাল দেয়।
অ্যানের পরিবার তাদের মানের বংশ-পদবী-বিহীন এই ছেলেটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। অ্যান পরিবারে সবার আদরের। শেষ পর্যন্ত তার জেদাজেদিতে ম্যাকনেয়ারকে গ্রহণ করা হয়। তাকে অভিজাত পরিবারে তুলে আনার জন্য উইলিয়াম শেরিফের নীলকুঠির ম্যানেজার করে ভারত পাঠানো হয়।
তাকে বলা হয় : সিংহ দরজা তোমার জন্য খুলে দেয়া হলো। সিংহাসনে তুমি বসবে কি বসবে না, বসতে চাইলে কী উপায়ে বসবে, সেটা তোমার নিজের ব্যাপার।
সিংহাসনে বসার স্বপ্ন ম্যাকনেয়ারের রয়েছে। লর্ড ক্লাইভের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তার কোনো দ্বিধা নেই। আর তার ভাগ্য-দুয়ারের সোনার চাবিকাটি অ্যান।

অ্যান যদি নেটিভ পুরুষগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই বয়সে, তাহলে তার কী হবে? চাবি তো চলে যাবে এক হিন্দুস্থানি যুবকের কাছে!
কে সেই যুবক?
রইস খান কি? নীলকুঠির প্রধান সহিস?
শেরিফের আস্থাভাজন পুরুষ?
ম্যাকনেয়ারের চোখে আর ঘুম নামে না। এক বোতল হুইস্কিও তার মাথাকে ঝিম পাড়াতে পারল না।

ভোরের আলো ফুটে উঠছে। প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে সিপাই-সান্ত্রীদের কুচ-কাওয়াজের আওয়াজ ভেসে আসছে। এর মধ্যেই আরদালি তার সাইড টেবিলে এক মুঠো ছোলার প্লেট আর এক কাপ ধূমায়িত চা রেখে গেল। দার্জিলিংয়ে এরই মধ্যে চায়ের বাগান গড়ে উঠছে। এ আরেক ধরনের ব্যবসা। এ মুহূর্তে এ ব্যবসায় নগদ নারায়ণ নেই। চায়ের লগ্নিকারীরা বলে, এতে নাকি বিপুল লাভ রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে এখনো নাকি ভালোই উপার্জন হয়।
চায়ের ব্যবসার প্রতি ম্যাকনেয়ারের কোনো টান নেই, তার ষোল আনা আগ্রহ নীলের ব্যবসায়।
চায়ের কাপ শেষ করে ম্যাকনেয়ার তার পোশাক ঘরে ঢুকল।
রুটিনমাফিক তার ভোরের পোশাক পরে নিন। নিচে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে তার ব্যক্তিগত সহিস।
প্রতিদিন ভোরে সে দুই ঘণ্টা ঘোড়া হাঁকায়। এতে অনেক লাভ। সকালের ব্যায়ামটা হচ্ছে। পুরো গ্রামটাকেও জরিপ করে দেখা যাচ্ছে। তার ঘোড়ার খুরধ্বনিতে সন্ত্রস্ত করে তোলে ঘুমন্ত গেঁয়ো লোকগুলোকে। নীল চাষের হিসাব, কোন কোন জমি নীলবিহীন পড়ে যাচ্ছে। আবাদ কেমন হয়েছে, কোন চাষা দাদন নিয়ে নীল চাষে ফাঁকি দিচ্ছে। এসবের হিসাব কষে নেয়া যায়। দিনের

কাজ গুছিয়ে নিতে এতে সুবিধাই হয়।
ম্যাকনেয়ার নিচে নেমে এসে ঘোড়ার পাশে দাঁড়ায়। হাতে চাবুক। তাকান সহিসের দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল বৃদ্ধ সহিসটিকে। তারপর গর্জে উঠল : তুই কেন?
কেঁপে উঠল সহিস। হাত থেকে খসে পড়ল লাগাম। তাড়াহুড়ো করে সেটা আবার তুলে নিল। আমতা আমতা করে বলল : আমিই তো হুজুর।
ভ্রু কুঁচকে ম্যাকনেয়ার বলল : আমিই তো মানে?
সহিস মাথা নিচু করে বলল : আমিই তো হুজুর, রোজ ঘোড়া নিয়ে আসি। আপনার খাস সহিস।
আবার গর্জে উঠল ম্যাকনেয়ার : তোদের প্রধান সহিস কোথায়?
রইস খান?
অ্যান ম্যাকনেয়ারের হাঁকডাকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাকনেয়ারের মুখে রইস খানের নাম শুনে তার ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে হাসি খেলে গেল। সে তাকাল বৃদ্ধ সহিসের দিকে।
সহিসের কাঁপুনি আরো বেড়ে গিয়েছে।
সহিস কাঁপতে কাঁপতে বলল : হুজুর, রইস তো অশ্বশালায়। ঘোড়াগুলোকে স্নান করাচ্ছে। ওদের খাওয়াচ্ছে। ভোরবেলায় কাজগুলো রইস ভাই নিজের হাতেই করে। আপনার এই ঘোড়াটাকেও রইস ভাই-ই স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে আমার হাতে দিয়ে পাঠিয়েছে।
ম্যাকনেয়ার বলল : ওইসব কাজ-টাজ বুঝি না। আজ থেকে প্রতিদিন ভোরে এখানে রইস খানকে চাই। যা, এখনি ডেকে নিয়ে আয়। সহিস তার হাতে ধরা লাগামের দিকে তাকাল। লাগামটা সাহেবের হাতে তুলে দেবে, না ঘোড়া নিয়েই অশ্বশালায় রইস খাঁকে ডাকতে যাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।
ম্যাকনেয়ার তার আরদালিকে হুকুম করল রইস খানকে জলদি জলদি ডেকে আনতে।

৩.

অশ্বশালায় এ সময়টায় রইস খান খুব ব্যস্ত। ঘোড়াগুলোকে সে খুব ভালোবাসে। এ দেশের মানুষের মতোই এই ঘোড়াগুলোও খুব খাটা-খাটনি করে।
খেটে খেটে সাহেবদের আয়-উপার্জন বাড়ায়। হুকুমের শক্তি জোগায়। সাহেবদের আচার-আচরণ পছন্দ নয় রইসের। মাঝে মধ্যে মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। বিদ্রোহ করলেও উপায় নেই। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে।
তার ছোট্ট মেয়ে বিলকিস। তার জন্য সব সহ্য করে আছে। এছাড়াও আরো কারণ আছে। এখানকার কেউ জানে না।
জানে তার মন।
সে কাজ করে। অশ্বশালার পাশেই বিশাল বিশাল মাটির গামলা। তার সহকারীরা ওইগুলোর কোনোটিতে পানি কোনোটিতে ঘোড়ার খাবার দিয়ে ভরিয়ে যাচ্ছে। পানি আর খাবার ফুরিয়ে যেতে ধরলেই তারা আবার ভরিয়ে দিয়ে যায়। রইস খান একটা একটা করে প্রতিটি ঘোড়াকে নিজের হাতে স্নান করায়। স্নানের সময় পুরো শরীর ডলে দেয়। ম্যাসেজ করে দেয়। একটি একটি করে ঘোড়াকে দেখে কেউ জখম হলো কিনা কিংবা অসুখ-বিসুখে পড়ল কিনা, কারো যদি কোনো অসুবিধা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা। ডাক্তার ডাকাডাকি। ওষুধ লাগনো কিংবা খাওয়ানো সবকিছু।
কাজ করতে করতে রইস খান কথা বলে। ঘোড়ার সাথে। যত আলাপ তার ওদের সঙ্গেই। ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি করে। যেন রইস খানের গল্পে ওরা সাড়া দেয়।
ওদের সঙ্গে তার কত আলাপ। এই আস্তাবল নিয়ে। ঘোড়াদের পরস্পর সুখ-দুঃখ নিয়ে। নিজের পরিবার-পরিজন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়েও কথা হয়। ওদের কাছ থেকেই অনেক পরামর্শ নেয়। যেন সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করে ওরা সুপরামর্শ দেয়।
নীলকুঠির সব সহিস আর সহকারীরা রইস খানের এই পাগলামিটা জানে। এ নিয়ে ওরা

বাইরে কথা বলে না। নিজেরাও কিছু বলাবলি করে না।
রইস খান তাদেরও ভালোবাসে। আপদে-বিপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। অভাবে পড়লে সাহায্য করে। ওরাও ঘোড়াগুলোকে ভালোবাসে। রইস খানকেও।
ম্যানেজারের আরদালি শম্ভুনাথ এসে হাজির হয় অশ্বশালায়। রইস খান তখন ঘোড়াদের খাওয়ানো নিয়ে ব্যস্ত। ম্যানেজারের আরদালিকে দেখতে পেল। স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে তার আগমন প্রথা করল।
রইস খানের জনপ্রিয়তা শম্ভুনাথের পছন্দ নয়। সে মনে করে, রইস খানের কারণেই লোকেরা তাকে অপছন্দ করে। গাঁয়ের লোকেরাও। ক্ষমতার দাপট দেখিয়েও ওদের বশে আনতে পারে না।
শম্ভুনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলল : রইস খাঁ, তোমার হাসি শেষ। ম্যানেজার স্যার তোমাকে তলব করেছেন।
ওর কথা শুনে রইস খান আবার হাসল। বলল : সাহেব তো এখন ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে যাওয়ার কথা। এখনো বেরুননি?
শম্ভুনাথ আরো গম্ভীর : স্যার খুব রেগে আছেন। তোমাকে জলদি জলদি যেতে বলেছেন।
রইস খান তাকাল আরদালির দিকে। বলল : আচ্ছা, যাচ্ছি। ঘোড়াগুলোকে একটু খাইয়ে নিই। তুমি যাও, তোমার পেছনে পেছনে আসছি।
শম্ভুনাথ বলল : তুমি যদি এখনি না যাও তাহলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাব। স্যার খুব রেগে আছেন।
রইস খান উঠে দাঁড়াল। শম্ভুনাথের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল : তুমি সেটা পারবে কিনা দেখা যাক। এসো আমাকে ধরো। ধরে নিয়ে যাও।
শম্ভুনাথ আর একটিও কথা বলল না। মাথা নিচু করে অশ্বশালা থেকে বেরিয়ে এলো।
ম্যাকনেয়ার তখনো উত্তেজিত। বার বার তার হাতে ধরা লাগামটাকে দেখছে।
শম্ভুনাথ সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পেছনেই রইস খানকে দেখতে পেল। সে তার মুখের কথা গিলে ফেলল।
রইস খান ম্যাকনেয়ারকে সালাম জানাল।
তাকে দেখেই ম্যাকনেয়ার আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল : আমার ঘোড়া নিয়ে তুমি নিজেই আসনি কেন? তোমার এত বড় স্পর্ধা।
রইস খান বলল : আজ আপনি আপনার ঘোড়া নিয়ে আমাকে আসার নির্দেশ দিচ্ছেন। অবশ্যই তা পালন হবে।
রইস খান বৃদ্ধ সহিসের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিল। ম্যাকনেয়ারের দিকে ফিরে বলল : তবে সাহেব, এটা শেরিফ সাহেবকে জানাতে হবে।
ম্যাকনেয়ার ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চাবুক তুলল। রইস খান ঘোড়াটা নিয়ে এগিয়ে এলো তার দিকে। বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। বলল : আপনার এই হুকুমের আগে শেরিফ সাহেবের একটা হুকুম আছে। তার ঘোড়াটার যত্ন যেমন আমাকে নিতে হবে, তেমনি তার ঘোড়াটাকে জিন চড়িয়ে আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। দুটো হুকুমই পালন করা সম্ভব। আগে আর পরে। আপনি বলুন, কার ঘোড়া আগে নিয়ে আসব?
ম্যাকনেয়ার শূন্যে চাবুক ঘুরাল। রইস খানের হাত থেকে লাগামটা ছিনিয়ে ঝট করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। চাবুকের ঘা সহ্য করল ঘোড়া। চেনা পথ ধরে ছুটে চলল।
দোতলার বারান্দায় চোখ গেল রইস খানের। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ঘটনা সব দেখছে। তার মুখে বিদ্রূপের হাসি। ঢুকে গেল ঘরে। রইস খান চোখ নামিয়ে নিল। শম্ভুনাথের দিকে তাকিয়ে বলল : আমাকে ডাকাডাকি করার সময় চিন্তা-ভাবনা করে নিও। আর আমাকে ধরে আনতে হলে কুঠির সব লাঠিয়ালকে সাথে নিয়ে এসো। দেখ তো কত বেলা হলো, কতগুলো ঘোড়ার এখনো

খাওয়া হয়নি।
রইস খান ফিরে এলো তার জগতে। ঘোড়াদের মধ্যে। তার সহকারী অভুক্ত ঘোড়াদের সবাইকে খাবার দিয়েছে। রইস খান ঘুরে ঘুরে ঘোড়াগুলোকে আদর করতে লাগল। বলতে লাগল : তোরা রাগ করিস না। ম্যানেজার সাহেব ডেকেছে, না গিয়ে তো উপায় নেই। তোদের আমি নিজ হাতে খাওয়াতে পারিনি। এবার বাবারা, তোরা খেয়ে নে। আমি তো আছি।
একটা ঘোড়া ডেকে উঠল চিঁহি। রইস খান ওর কাছে গিয়ে ওর গলায় আদরের পরশ বুলিয়ে দিল। বলল : ম্যানেজার সাহেব কি বলল জানতে চাচ্ছিস। সাহেব কিছু বলতে চায়নি, করতে চেয়েছিল। কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছে। কেউ হয়তো কান ভাঙানি দিয়েছে। চেয়েছিল চাবুক মারতে। আমার কথাবার্তা শুনে সেটা আর করেনি।
চিঁহি ডেকে উঠল আরেকটি ঘোড়া। ওই ঘোড়াটা রইস নিজে চড়ে। খুব বেয়াড়া আর তেজি ঘোড়া। ওকে কেউ বশ মানাতে পারে না। কিন্তু সেই ঘোড়াটাই ভক্ত হয়ে উঠেছে রইস খানের, এ জন্য শেরিফ সাহেব খুব খুশি। তাকেই ঘোড়াটা চালাতে বলে দিয়েছে।
রইস খান ঘোড়াটির কাছে গেল। ওর ঝুঁটি ধরে বলল : কিরে বেয়াদপ, তুই আবার মাজখানে রসভঙ্গ করছিস কেন? তোর গোছল হয়েছে? তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে এ বেলায় তোর নাওয়া-খাওয়া কিছু হয়েছে। তুই কোথায় লুকিয়েছিলি? আয় তোকে গোছল করিয়ে দিই। তারপর আমি তোকে নিজ হাতে খাওয়াব।
রইস খান ঘোড়াটিকে নিয়ে এলো পানিভর্তি বিশাল এক মটকার কাছে। বালতি বালতি পানি ঢেলে দলই মথাই করে ঘোড়াটাকে গোছল করাতে লাগল।
হঠাৎ খেয়াল করল তার সহকর্মীরা কেন জানি তার কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। একসময় তারা আড়াল হয়ে দেখল।
এসময় সে দেখতে পেল তার পাশে ম্যানেজার সাহেবের পত্নী অ্যান দাঁড়িয়ে আছে।
রইস খান ভক্তিভরে তাকে সালাম জানাল।
বলল : মেম সাহেবা, আপনি এখানে?
অ্যান বলল: হ্যাঁ। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।
রইস খান অবাক হয়ে বলল : হঠাৎ ধন্যবাদ! কেন?
অ্যান বলল: যে কোনো কারণে সাহেব আজ উত্তেজিত ছিল।
তোমার ওপর অন্যায়-আচরণ করতে যাচ্ছিল। তুমি রাগ না করে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে তার ক্ষমতার সীমানা সম্পর্কে ধারণা জানিয়ে সংযত করেছ।
রইস খান ম্লান হেসে বলল: মেম সাহেবা, আমরা গোলাম, গোলামের পাল্টা রাগ মানায় না।
অ্যান হাসল। বলল : তোমার সাথে আমার কথা ছিল, তুমি আমাকে ঘোড়ায় চড়াবে আর ঘোড়া চালানো শেখাবে। তুমি কিন্তু এখনো কাজটা শুরু করোনি।
রইস খান বলল: ম্যানেজার সাহেব এটা পছন্দ করবেন না। আপনি বরং সাহেবকে বলুন, তিনি নিজেই আপনাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবেন।
অ্যান বলল : তোমাদের সাহেব আমাকে ও কাজটি শেখাবেন না। শেষে আমি নিজেই যদি ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাই!
বলে অ্যান হেসে ফেলল। এর ফাঁকে সে রইস খানকে আর তার কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।
বলল : ঘোড়াটাকে এমন দলাই মথাই করছ কেন?
রইস খান বলল: ঘোড়াটাকে গোছল করাচ্ছি।
অ্যান বলল : সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওর সারা শরীরে এমন দলাই মথাই কেন?

রইস খান বলল : এ ঘোড়াটা খুব পাজি।

ছুটোছুটি লাফালাফি সব করে। ওর শরীরে কোথাও কোথাও মাংসপেশি শক্ত হয়ে গিয়েছে, রক্তচলাচলের পথে অসুবিধা হচ্ছে। রগের ওপর রগ উঠে গেছে। এভাবে মালিশ করে সেগুলো ঠিকঠাক করছি।
অ্যান চমৎকৃত হয়ে বলল : বাহ্! বেশ ভাল উপায় তো। আচ্ছা, মানুষেরও তো এ সমস্যা হতে পারে?
রইস খান বলল: মানুষেরও হয়।
অ্যান বলল: ওষুধ নিশ্চয়ই এই একটা। দলাই মথাই মালিশ।
রইস খান বলল: জ্বি।
অ্যান বলল: আমারও তো এই সমস্যা কিছু দিন থেকে চলছে। একটু কষ্টেই আছি। তুমি তো কাজটা ভালই পার। আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাংলোয় এসে। তোমার কাছ থেকে ওষুধটা শিখে নেব।
অ্যান আর দাঁড়াল না। চলে গেল।
রইস খান তার ঘোড়া ধরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
ঘোড়াটি নাক ঝাড়ল।
রইস খান হেসে ঘোড়ার চোয়ালে আলগোছে চাপড় দিল।
চুপি চুপি বলল : মেম সাহেবার মতলবটা কী? আমাকে এর আগেও দাঁড় করিয়ে ইতন-বিতন গল্প করেছিল। আজ যখন সাহেব আমার সাথে রাগারাগি করছিল।, তখন সে দোতলায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সাহেব চলে গেলে তা কী হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ মটকে দিল। তারপর ঘরের ভেতর হাওয়া। মেম সাহেবা আমার কাছে আসলে চায় কী? থাকগে, অত ভেবে আমাদের কাজ নেই। আমরা খাটা-খাটনির মানুষ। অনেক কাজ আছে, নাওয়া-খাওয়াটা আগে সেরে নিই।
ঘোড়ার গোছলের পর শরীরটা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তাকে নিয়ে এলো খাবারের মটকার সামনে। সামনে তাকিয়ে রইস খান আরেক সাহেব দেখতে পেল। এগিয়ে আসছে তারই দিকে। কম বয়সী সাহেব। এখানে এর আগে দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। তবু কেন জানি চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

লোকটি এসে দাঁড়ান রইস খানের সামনে।
জিজ্ঞেস করল : এটাই বুঝি কুঠিবাড়ির ঘোড়ার আস্তাবল?
সাহেকদের কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হয়তো। রইস খান তার হাতের কাজ সারতে সারতে বলল: জি। সাহেবদের ঘোড়াগুলো এখানেই থাকে।
: তোমার নাম রইস খান। তাই না?
: জি।
: তুমি এই আস্তাবলের প্রধান সহিস?
: জি। কিন্তু আপনি কোন সাহেবের মেহমান হয়ে এসেছেন?
: কোন সাহেবের মেহমান হলে তোমার ভালো লাগবে।
: সাহেব তো সাহেব! সব সাহেবই আমাদের মনিব। প্রত্যেক সাহেবকেই আমরা মান্য করি। এমনকি আপনাকেও মান্য করব।
: সাহেবদের মেহমান। এটা আমাদের একটা পরিচয়। আমার আরো একটা পরিচয় আছে। আমি সাংবাদিক। কলকাতার একটা ইংরেজি পত্রিকার রিপোর্টার। আমার নাম জন হেনরি। জন বলে আমাকে ডাকতে পার। তোমাদের ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার সাহেবের শালা আমি। অ্যান আমার কাজিন- মাসতুতো বোন।
: সালাম সাহেব। বেগম সাহেবার সাথে আপনার চেহারার কিছুটা মিল দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দুজনই হয়তো আপনাদের মায়ের গড়ন পেয়েছেন।
জন বলল : আমি শুনেছি তুমি জ্ঞানবান সাহসী কর্মট লোক। এবং স্পষ্ট বক্তা। সুতরাং তোমার ধারণায় ভুল তো থাকবে কম।
: এখানে বেড়াতে এসেছেন?

: রইস খান, তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই শুনেছি। তোমাকে আমার কাছের লোক বলেই মনে হয়। তোমাকে বলেছি, আমি একজন সাংবাদিক। নীলকুঠি, নীল চাষ আর চাষিদের সম্পর্কে অনেক খবর আমাদের কাছে গিয়েছে। আমাদের পত্রিকা থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে এসব রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করতে। প্রয়োজনে আরো রিপোর্ট লিখে পাঠাতে। তোমাদের সাহেবরা একথা জানতে পারলে আমি সঠিক রিপোর্ট জোগাড় করতে পারব না। তোমাদের মতো নিরপেক্ষ লোকদের আমি সহযোগিতা চাই।

: বেশ দেব।

: তুমি তোমার এই ঘোড়াটির পাশে দাঁড়াও। আমি একটা ছবি তুলি।

রইস খান বলল : আপনি সব ঘোড়ার ছবি তুলুন। কিন্তু আমার ছবি পাবেন না।

৪.

উইলিয়াম শেরিফ তার বাংলোর ছাদে উঠেছে। সূর্য উঠতে এখনো বাকি। সারারাত ঝড়-বাদলা গিয়েছে। শেষ রাতে বৃষ্টির টানটা ধরে এসেছে। এখন আকাশ ফুটফুটে। ঝিরঝির বাতাস। বাতাসে বৃষ্টির ঠাণ্ডাপনা আছে।

শেরিপ ভোগের ছাদে উঠে আসে। হাঁটাহাঁটি করে। সন্ধ্যায় ঘোড়া দাবড়ায়। শরীরচর্চায় এটা তার প্রাত্যহিক রুটিন।

ছাদে হাঁটাহাঁটি করতে করতে সে চারপাশে তার রাজত্বটা দেখতে পায়। নিজের চেষ্টায় সাধনায় সে তার বিশাল নীল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন লন্ডনের অভিজাত মহল এক নামে চেনে সিন্দুরিয়া কনসার্ন। এত বড় কনসার্ন মাঝেমধ্যে শেরিফ নিজেই খেই হারিয়ে ফেলে। নবগঙ্গা নদীর পাড়ে এই বিশাল কনসার্নে ১৬ হাজার ৬৫২ বিঘা জমিতে বছরে ৯৯৭ মণ নীল চাষ হয়। চাষি আর কর্মচারীর সংখ্যা ২ লাখ ২৬ হাজার ৩৬৮ জন।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পূর্ব সীমায় সিন্দুরিয়া। এর মৌজাগুলো মুর্শিদাবাদ নওয়াব স্টেটের খাস তালুকের অন্তর্গত ছিল। মেহেরপুরের বাবুরা এখানে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের থেকে আলমডাঙ্গার সনাতনপুরের গঙ্গাগোবিন্দ দেবের স্ত্রী অহন্যা দেবি কিনে নেয়। শেরিফ তার কাছ থেকেই পত্তনি ব্যবস্থা নেয়। কুঠির একাংশ হলো কুতুবপুর মৌজা। শেরিফ এটাও মেহেরপুরের বাবুদের কাছ থেকে কিনে নেয়।

শেরিফের মনে পড়ে যায় ভারতবর্ষে তার প্রথম জীবনের কথাগুলো। সে ছিল এই নীল কুঠির প্রথম ম্যানেজার। ম্যানেজার হিসেবেই তার এখানে আসা। তখন মালিক ছিল জেমস আইভান মে। তার সহকারী ম্যানেজার ছিল টমাস আইজাক মে। মালিক আইভান মের ভাইয়ের ছেলে।

শেরিফ একটু ভয়ে ভয়েই থাকত। চাকরিটা তার স্থায়ী হয় কিনা। নাকি বড় ভাইয়ের ছেলেকেই এক সময় ম্যানেজার বানিয়ে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সাবধানে থাকতে হতো তাকে। নানান ফন্দি-ফিকির কৌশলও নিয়ে হতো।

অবশ্য এ দুশ্চিন্তায় তাকে বেশি দিন থাকতে হয়নি। আইজাক মে এ কনসার্নে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। সাথে সাথে তার চাচাও। নীলকুঠি স্থাপনের গোড়ার দিকেই বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে। আজো চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে ওঠে।

পাঁচপীরতলা। চুয়াডাঙ্গার সিন্দুরিয়া আর মুর্তজাপুর গ্রামের মাঝখানের এক বিখ্যাত এলাকা। এ অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক পাঁচজন আউলিয়া আসেন এখানে। হযরত কুতুবউদ্দিন শাহ আর সহচর নেয়ামত শাহর মাজার রয়েছে এখানে।

গ্রামবাসীদের কাছে পাঁচপীরতলার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। জেমস আইভান মে, সি ডব্লিউ শেরিফ আর টমাস আইজাক মে ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রী আর মজুরদের নিয়ে পাঁচপীরতলায় আসে। উদ্দেশ্য এ জায়গায় নীলকুঠি স্থাপন।

নির্ধারিত স্থানে একটা উঁচু ঢিবি। তার পাশে শেওড়া গাছ। আইভান মে হুকুম দিল, শেওড়া গাছটা কেটে ফেলতে হবে। কাঠুরে কালীচরণ সরদার। জাতে বাগদি। বেঁকে বসল। সাহেবের মুখের ওপর জবাব দিল : না সাহেব, পারব না।

: কেন? তোমার হাতে কুড়োল আছে। ধারালো কুড়োল। গায়ে তোমার জোর আছে। আর এই একটা গাছ কাটতে পারবে না! বাগদির সাফ জবাব : না। এটা পীর-আউলিয়াদের জায়গা। এ জায়গা তোমাদের কোনো অনাচার সইবে না। আমি এখানে কুড়োল ধরতে পারব না।

শেরিফ বলল : ব্যাটা বাগদি, তোর ঘাড়ে কটা মাথা যে সাহেবের হুকুম অমান্য করিস?

কালীচরণ গোঁ ধরে রইল : সাহেব, ঘাড়ের ওপর আমার একটাই মাথা। এ মাথার দরদেই আমি এখানে কুড়োল চালাতে পারব না।

তরুণ টমাস আইজাক মে। ভারত জয়ের নেশা তার চোখে মুখে। তাচ্ছিল্যের সাথে বলল : যত্তসব কুসংস্কার। এই দেখ, আমিই চালাচ্ছি কুড়োল। দেখি, তোর পীর-আউলিয়ারা আমার কী করতে পারে। বাগদির কাছ থেকে কুড়োল কেড়ে নিল আইজাক। শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরল। তারপর শেওড়া গাছের গোড়া লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল কুড়োল।

হা-হা করে উঠল কালীচরণ সরদার। ছুটে এসে আটকাতে চাইল আইজাককে। মুহূর্তের ঘটনা। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই কুড়োলের ধারালো ফলক দেখতে পেয়েছিল। কেপে ওঠার কথা শেওড়া গাছের।

শেওড়া গাছ আগের মতই নিথর দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আইজাক। তার তলপেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কুড়োলটার কোপ শেওড়া গাছে পড়েনি। বুমেরাং হয়ে আঘাত করেছে আইজাকের বাম তলপেটে। জেমস আইভান মে নীলকুঠির স্বপ্ন বাদ দিয়ে আহত ভাইয়ের ছেলে টমাস আইজাক মেকে নিয়ে নৌকায় ওঠে। সেখান থেকে কলকাতা। পথেই মারা যায় আইজাক।

ভারতবর্ষে আইভান মের মন টেকেনি। নীলকর সাহেব হওয়ার সাধও তার উবে যায়। সে লন্ডনে পাড়ি জমায়। শেরিফ ভাগ্যের খোঁজেই এসেছে এ এলাকায়। দেশে ফেরার জন্য নয়। জেমস আইভান মে চলে যাওয়ার পর সে জোড়াদহে যায়। সেখানে নিজেই একটা কনসার্ন প্রতিষ্ঠা করে। জে বি ম্যাকনেয়ারকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে।

ম্যাকনেয়ারকে নিযুক্তির ক্ষেত্রে লন্ডনের এক অভিজাত পরিবারের শক্ত-পোক্ত সুপারিশ ছিল। এ পরিবারটির সাথে তার আগে থেকেই জানাশোনা ছিল। সেখান থেকে অনুরোধ আসে ম্যাকনেয়ারের ব্যাপারে। ছেলেটি একটা নিম্ন পরিবার থেকে এসেছে। তার মার পেশা দেহজীবিনী হিসেবে। মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে, এখন আর বলার কিছু নেই। ছেলেটিকে চাকরিতে নেয়ার সুপারিশের দুটো কারণ। এক. ওদের লন্ডন থেকে বের করে দিতে চায়, যাতে পরিবারের অপবাদ নিয়ে গল্পের চাড়া খুব বেশি না ছড়ায়। দুই. ছেলেটাকে জাতে তুলে আনতে হবে। ভারতবর্ষে গেলে সে পয়সা-কড়ি কামিয়ে যেমন ধনবান হবে, তেমনি উঁচু পদে চাকরি করে আভিজাত্যও অর্জন করবে।

ছেলেটিকে দেখে কিন্তু শেরিফের পছন্দই হয়েছিল। ভারতবর্ষে সে যে ব্যবসা করে আর যাদের নিয়ে করে, সেখানে ভদ্র সন্তানরা নাস্তানাবুদ হবে। ম্যাকনেয়ারকে দেখেই শেরিফ বুঝেছিল, এ ছেলে গ্রেট নটোরিয়াস। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পাশাপাশি পরিশ্রমীও। উচ্চাশা থেকেই সে অ্যানকে বিয়ে করেছে– কোনো ভালবাসা থেকে নয়। এ সুবাদে অ্যানের সাথেও তার একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না, মেয়েটাকে দেখলে যে কোনো পুরুষমানুষেরই ঘোর তৈরি হতে পারে।

ম্যাকনেয়ারকে তার কাজের লোক মনে হয়েছিল। অ্যানের সাথে কথা বলার পর সে তাকে ম্যানেজার পদেই নিযুক্তি দেয়।

পাঁচপীরতলায় সেদিনকার ঘটনার তিন বছর পর। জন আইভান মের কাছ থেকে এর মালিকানা কিনে নেয় জন রিভস। সেও আসে পাঁচপীরতলার ওই জায়গায়। কুঠি বানাতে। আগের গল্পটা জন রিভসের জানা। এবার সে সতর্ক। নীলকুঠি স্থাপন করতে উঁচু ঢিবি আর শেওড়া গাছটি বাইরে রেখে দালানের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

তখন তখনি কোনো বিপত্তি হয় না। সমস্যা দেখা গেল পরে। সারা দিন দেয়াল আর দালান নির্মাণের কাজ চলে। পরদিন সকালে দেখা যায় সব ভেঙে চুরমার। পাশের নবগঙ্গা নদীর অগাধ জলে সব নির্মাণসামগ্রী ভাসছে।

পাহারা বসানো হলো।

ঘটনার কোনো হেরফের দেখা গেল না। নতুন বানানো দেয়াল আর দালান ভেঙেচুরে হাবুডুবু

খাচ্ছে নবগঙ্গায়। জন রিভস ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘাবড়ে যায়। সে এসে হাজির হয় জোড়াদহে। সেখানকার নীলকর শেরিফের সাথে পরামর্শে বসে।
পরামর্শমতে অর্ধনির্মিত দালান-দেয়াল পরিত্যাগ করা হয়। মর্তুজাপুর ও হিঙ্গেরপাড়া গ্রামের মাঝখানে একটা স্থান কুঠিবাড়ির জন্য ঠিক করা হলো। আশগারা খালের শাখা হলো দোলাই খাল। আশগাড়া খাল খনন করা হয়েছিল সম্রাট শাহজাহানের সময়। আর দোলাই খাল পড়েছে নবগঙ্গা নদীতে। এর মুখটা ভরাট করা হলো মাটি কেটে। তার ওপর নির্মাণ করা হলো কুঠিবাড়ি। রিভস তার অংশীদার হওয়ার জন্য শেরিফকে প্রস্তাব দিল। সানন্দে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। এ কুঠিরও ম্যানেজার নিযুক্ত হলো ম্যাকনেয়ার। তার সহকারী ছিল রিভসের কর্মী অ্যাডামস।
কিন্তু রিভসের যৌথ মালিকানাধীন কনসার্নটি ভালো চলেনি। লাভজনক তো হয়ইনি। রিভস নাচার হয়ে কারবারটি শেরিফের কাছে বিক্রি করে দেয়।
শেরিফের পুরো নিয়ন্ত্রণে আসার পর অ্যাডামসকে বদলি করা হয় জোড়াদহে। ম্যাকনেয়ার চলে আসে সিন্দুরিয়ায়। সে শক্ত হাতে এ কনসার্নের হাল ধরে। বহু কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দেয়। কিংবা অন্য কনসার্নে বদলি করে। চাষিদের নতুন চুক্তিপত্রে সই করতে হয়।
কাজ শুরু হয় পুরোদমে।
শেরিফের নীল চাষ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সে রেশন চাষও শুরু করে। কুঠিবাড়িও সাজানো হয় নতুন সাজে।
শেরিফের বসবাসের জন্য আট কক্ষবিশিষ্ট এই সুরম্য প্রাসাদ। নীল হাউস। কাছারি। কর্মচারীদের বসবাসের জন্য বাসস্থান। ম্যানেজারের বাংলো।

এক জন্মে মানুষের আর কত চাই! আর কত পাওয়ার আছে। ছাদে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে শেরিফ। তবু তার ভেতরে কাজ করে অতৃপ্তি। মনে হয়, অনেক কিছুই পাওয়া হয়নি।
এসব এলেবেলে ভাবতে ভাবতেই তার চোখ চলে যায় নিচে। এক যুবক দাঁড়িয়ে। ইংরেজ যুবক বলেই বোধ হচ্ছে। তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। খুব সম্ভব তারই দিকে। যুবককে চেনা চেনা মনে হলো। এর আগে দেখেছে কোথাও। নিচে দারোয়ানকে দেখা যাচ্ছে। একবার যুবকের দিকে তাকাচ্ছে। আরেকবার ছাদের দিকে।
শেরিফ দারোয়ানকে ইঙ্গিত করল যুবকটিকে উপরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। যুবক ছাদে এসে শেরিফকে গুড মর্নিং জানাল।
যুবককে বলল, কে তুমি। মনে হচ্ছে তোমাকে চিনি। যুবক বলল, ইয়েস আঙ্কেল। আপনি আমাকে চেনেন। এর আগে আপনার সাথে আমার একাধিকবার দেখা হয়েছে। একবার লন্ডনে। আর কলকাতায়।
শেরিফ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে চিনেছি। তুমি ম্যাকনেয়ারের ব্রাদার ইন ল।
আমাদের অ্যানের কাজিন।
যুবক বলল, বাহ! আপনার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। ভালো বলেই আপনার পক্ষে এতবড় নীলকুঠি সামলাতে পারছেন।
শেরিফ বলল, এতে কিন্তু ম্যাকনেয়ারেরও কৃতিত্ব রয়েছে। তোমাকে না ভুললেও, তোমার নামটা কিন্তু আমার মনে নেই।
: আমি জন হেনরি?
: কবে এসেছ?
: কাল সন্ধ্যায়।
: অ্যানের ওখানেই তো উঠেছ?
: সরি আঙ্কেল। আমার পেশাটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?
: হ্যাঁ। হ্যাঁ। তুমি জার্নালিস্ট।
: জি। আমি ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার রিপোর্টার।
: ওটা তো সারা সময় আমাদের বিরুদ্ধে লেখে।
জন হেনরি হাসল। বলল, ওরা যাতে আপনাদের পক্ষে লেখে, সে জন্য আপনাদের কিছু করার

আছে।
শেরিফ টেছরা চোখে তাকিয়ে বলল, কী করার আছে? কোনো ডোনেশন চাই?
: না। পত্রিকা চালাতে ডোনেশন, স্পন্সরশিপ, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার। তবে আপনাদের কাছ থেকে চাই না। আপনারা যদি দেনও তাহলেও রিপোর্ট উল্টাবে না।
: তাহলে?
: আমার কিছু পরামর্শ আছে। সেগুলো আপনাকে জানাব।
: বেশ। তোমার পরামর্শ শুনতে একসময় অ্যানের কাছেই আসব।
: সরি আঙ্কেল। আমি অ্যানের ভাই, এ কথা সত্য। তবে আমি এসেছি সাংবাদিক হিসেবে। কোনো আত্মীয়ের বাসায় না উঠে আপনাদের রেস্ট হাউসে উঠেছি।
: ও হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় রেস্ট হাউসে কোনো একজন গেস্ট থাকবে বলে আমার অনুমতি নিয়ে গিয়েছে। একজন ইংলিশম্যান। সেই ইংলিশ ইয়ংম্যান যে তুমিই। তা ভাবিনি।
: রেস্ট হাউসে থাকার অনুমতি দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।
: এবার কী রিপোর্টের খোঁজে এসেছ?
: আপনাদের।
: ওরে বকাস! ধমকিয়ে দেবে না তো?
: পুরোটা নয়। আপনারা বলতে আপনি শুধু নন, আপনি। আপনার পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজসহ কর্মচারীরা, নীল আর নীল চাষ। নীল চাষিও। আপনারা দেশের অর্থনীতিতে এক অবদান রাখছেন। সেটারই হিসাব-নিকাশ।
: গুড। এটা একটা ভিন্ন ধরনের রিপোর্ট। আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা পাবে।
জন হেনরি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল। বলল : আপনার কাছে আসার আগে আমি খ্রিস্টান গোরস্থানে গিয়েছিলাম।
শেরিফের চোখে বেদনার ছাপ পড়ল। বলল : ওখানে এমন কিছু সমাহিত আছে যা আমার দুঃখ বাড়ায়।
হেনরি শেরিফের দিকে তাকায়। বলল : আপনার দুঃখের কারণ কি লুসি? ১১ বছরের মেয়ে?
: হ্যাঁ। তুমি ঠিক ধরেছ।
: সে আপনার কী হয়?
: আমার ভাইয়ের মেয়ে। একটা প্রজাপতি বললে ভুল হয় না। উড়েই বেড়াত। কোথাও স্থির থাকত না। কিন্তু হঠাৎ তাকে ম্যালেরিয়ায় পেয়ে বসে। এত চিকিৎসা করালাম, কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে এলাম। কিন্তু শোক থেকে সে আমাদের রেহাই দিল না। তাকে হারানোর ব্যথা এখনো আমাদের চোখে কান্না হয়ে ঝরে।
জন হেনরি একটু থমকাল। দেখতে পেল শেরিফের চোখের পাতা ভিজে উঠছে।
শেরিফই আবার বলল : মেয়েটা এসেছিল বেড়াতে। আমার সাথে ভারত জয়ের আনন্দ শেয়ার করতে। উল্টো সে আমাদের কাঁদিয়ে গেল। এর বারো বছর পর আমাদের পরিবারের লোকেরা আবার এখানে আসে। লুসির কবরে ফুল দিতে। আমার মা মার্গারেট শেরিফ। তিনিও আসেন তার নাতির কবর দেখতে আর ফুল দিয়ে তার প্রতি ভালোবাসা জানাতে। তিনি আর লন্ডনে ফিরে যেতে পারেননি। নাতির কবরে ফুল দিতে গিয়েই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
: হ্যাঁ। তার কবর তার নাতির পাশেই দেখেছি। গোরস্থানে পাসি বেসি রিভসের একটা কবর দেখলাম।
: তিনি জন রিভসের চাচা। তুলা ব্যবসায়ী। এসেছিলেন ভাস্তেকে দেখতে। আর ফিরে যেতে পারেননি।
: আরো একটা কবর। ব্রুমফিল্ড।
: ও-ব্যাটা ঘোলদাড়ি কুঠির ম্যানেজার। কলেরায় মারা যায়। আচ্ছা বল তো, এ এলাকায় দেখার মতো অনেক বিষয় আছে। অনেক কিছু আমরা বানিয়েছি। সেসব বাদ দিয়ে তুমি মৃতের আড্ডায় ঢুকলে কেন?

জন হেনরি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল : আমি আসলে টমাস আইজাক মের কবর খুঁজতে ওখানে গিয়েছিলাম।
শেরিফ কি চমকাল, বাইরে থেকে অতখানি বোঝা গেল না।
বলল : ওটা আবার কে? নামটা যেন চেনা মনে হচ্ছে!
জন হেনরি বলল : অনেক দিন আগের কথা, ভুলেও যেতে পারেন। আপনি যখন ম্যানেজার ছিলেন, তখন আপনার সহকারী ছিল টমাস আইজাক মে। সিন্দুরিয়ার প্রথম নীলকর জেমস আইভান মের ভাইয়ের ছেলে।
: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। এ ঘটনা কি কখনো ভোলা যায়! তার চাচা তাকে নৌকায় তুলে কলকাতায় রওনা দেয়। পথেই তার মৃত্যু হয়। কলকাতায় তার কবর থাকতে পারে। এখানে নেই। নিজের কুড়োলের ঘায়ে নিজেরই মৃত্যু। কী মর্মান্তিক অলৌকিক ঘটনা!
: আপনি কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন?
: আমার বিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে।
: ঘটনাটা আপনার চোখের সামনেই হয়েছে।
: শুধু আমার সামনে নয়, সেখানে আইজাকের চাচা জেমস আইভান মে সাহেব ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, মজুর– অনেকেই ছিল।
: গল্পটা আমি শুনেছি। সেখানে একজন বাসিন্দাও ছিল। শেওড়া গাছটা তারই কাটার কথা ছিল। পাঁচপীরের দোহাই দিয়ে কাজটি সে করেনি।
: সেটা তার বিশ্বাসের ব্যাপার। এ এলাকার সব মানুষ পাঁচপীরকে মান্য করে। সম্মান জানায়।
: সেটাও আমি জানি। আমার কথা হলো, আইজাক মে শেওড়া গাছ কাটার জন্য যখন কুড়োল উঁচিয়ে ধরল তখন কালীচরণ কার ইশারায় তাকে জড়িয়ে ধরেছিল?
: আমার মনে হয় পীরদের অভিশাপের আশঙ্কায় সে আইজাক মেকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল।
: বিশ্বাস কি এতই প্রবল যে কুড়োলটা আইজাকের পেটে ঢুকিয়ে দিল?
: ঘটনাটি না দেখে, ঘটনাস্থলে না থেকেও তোমার কি তাই মনে হয়? আর ওই যে ইশারার কথা বললে, সেখানে পাঁচপীর ছাড়া ইশারা করার মানসিক অবস্থায় আর কেউ ছিল না।
: তাহলে কালীচরণ এমন কাজ করল কেন?
: সেটা কালীচরণকেই জিজ্ঞেস কর।
: আমি খবর নিয়েছিলাম। এ ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কালীচরণ নিখোঁজ হয়ে যায়। দুই দিন পর নবগঙ্গার চরে এক বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলে ওটাই কালীচরণ ছিল।
: তাই নাকি? তখন তো এ খবর শুনিনি। আচ্ছা সাংবাদিক, তুমি কি গোয়েন্দাও। এতদিন বাদে তুমি এসে খোঁজখবর করছ এক ভুতুড়ে মৃত্যুর!
: গোয়েন্দাগিরি বা তদন্ত নয়। শুধুই কৌতূহল। জাদুটোনার দেশ বলে খ্যাত ভারতবর্ষ কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে আর কত নিচে নামবে? এর সাথে সাথে মনের ভেতরে জেগে ওঠা কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজছি।
: যেমন?
: কেউ কেউ এমন সন্দেহ পোষণ করে, আপনি খুব উচ্চাভিলাষী।
শেরিফ শান্ত কণ্ঠে বলল : এটা তো আমি অস্বীকার করি না। আমি আমার মাতৃভূমি ছেড়েছি কেন? কেন এসেছি ভারতবর্ষে? আমি তো কোনো মিশনারি নই। ধর্মপ্রচার তো আমার কাজ নয়। অনেক বড় টার্গেট নিয়ে আমার ইন্ডিয়ায় আসা। তার কিছু পূরণ হয়েছে। কিছু পূরণ হয়নি। হয়তো পরে আরো কিছু পূরণ হবে।
: সিন্দুরিয়া নিয়ে আপনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল?
: একজন উচ্চাভিলাষী লোকের পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক।
: কালীচরণ বাগদি আপনার ভাড়া করা লোক ছিল। আপনি সে পরিবারকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছিলেন যাতে এই কনসার্নটা আপনার হয়।
: তোমাকে আরো ভেবে বলতে হবে, বিশেষ করে আমার সম্পর্কে আঙুল তোলার আগে।
: আঙুলটা আমার নয়। অন্য মানুষদের।
: বেশ, তাহলে শোনো। সিন্দুরিয়া কনসার্ন কেনার মতো টাকা তখন আমার কাছে ছিল না। আর দেখ আমি মে সাহেবের কাছে চাইলেই তিনি কম দামে এটা আমাকে দিয়ে দিতেন। সে টাকাও আমার কাছে ছিল না। এমন বাজে পরিকল্পনাই যদি আমি করতাম তাহলে সিন্দুরিয়া আমি না কিনে রিভস কিনল কী করে?
: পরিকল্পনাটা তো অনেক দূরের। শেষ পর্যন্ত সিন্দুরিয়া কনসার্ন আপনারই।
: সেটা রিভসের অযোগ্যতা।
: আপনি তার সাথে যৌথ কারবার করেছিলেন।
: যৌথ কারবার আমি তো চাইনি। সে-ই আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।
: আপনি অথবা আপনার লোকেরা সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন।
: তুমি কি অভিযোগ তুলছ?
: অভিযোগ নয়। লোকমুখের চলতি কথাগুলো কেউ আপনাকে জানায় না। ওরা আপনার স্তাবক। খুশি করে শুধু সুবিধাগুলো নিতে চায়। কিন্তু এ কথাগুলো আপনার জানা দরকার।
: অভিযোগগুলো কেন? ধরনটাই বা কেমন?
: সেই শেওড়া গাছ আর উঁচু ঢিবি। রিভস সাহেব এ দুটোর পবিত্রতা মেনে তার পাশে কুঠি বানাতে চাইল। তার পরও বানাতে পারল না কেন? পাঁচপীরের অভিশাপ?
: তার আমি কী জানি? রিভস আমাকে জানিয়েছিল। ও প্রতিদিন দেয়াল বানাচ্ছে। দালান তুলছে। পরের দিন সকালে গিয়ে দেখে সব নদীতে ভাসছে। আমি তো ওখানে ছিলাম না।
: আপনার লোক থাকতে অসুবিধা কোথায়?
: রিভস রাতে পাহারাদার লোক রেখেছিল। : কিন্তু পাহারাদাররা কিছুই দেখতে পায়নি। সেই একই ঘটনা। ভোরে নির্মাণসামগ্রী নদীতে ভাসে। পাহারাদারদের তো কিনে নেয়া যায়, তাই না? ওরাও যদি নদী ভাসানোর কাজগুলো করে থাকে, দেখার তো কেউ নেই।
: এমন করা আমার প্রয়োজন কী?
: যৌথ কারবারের জন্য রিভস সাহেবের প্রস্তাব। পীর-দরবেশ ভূত-প্রেতের দেশে ব্যবসা করতে এসে ভয় না পেয়ে উপায় কি? পাশে আপনার মতোই সাহসী পার্টনার দরকার তো।
: তার পরও তো রিভস ব্যবসা চালাতে পারল না।
: আমার ব্রাদার ইন লর মতো দক্ষ ম্যানেজার আপনার সাথে। রিভস সাহেবের লাল বাতি জ্বালিয়ে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
আচ্ছা, বল তো তুমি এখানে কার হয়ে কাজ করছ?
: কলকাতা রিভিউর।
: এই অ্যাসাইনমেন্ট তোমাকে তোমার সম্পাদক দিয়েছেন?
: না। আমি একজন সিনিয়র রিপোর্টার। আমি নিজেই আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিই।
: সম্পাদক জানেন?
: পুরোটা নয়। আমি এসেছি নীলকুঠি, নীল চাষ, নীল চাষি এসব কভার করতে। প্রথমে আমিও ওইটুকুই জানতাম। এখানে এসে একটু একটু করে রিপোর্টটা একটা আকার নিচ্ছে।
: তুমি কি এর সবটাই লিখবে?
: বলতে পারি না। আমরা রিপোর্টাররা পুরোটা জানার চেষ্টা করি। আর প্রকাশ করি ততটুকুই, যতটুকু প্রয়োজন।
: তুমি আমাকে আঙ্কেল ডেকেছ। ম্যাকনেয়ার তোমার ভগ্নিপতি। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করবে না যাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।
: আমি যতটুকু জানি। আপনাদের ক্ষতি পত্রিকার রিপোর্ট করছে না, করছেন আপনারা নিজেরাই।
: আমাদের অনেক ভালো কাজও তো আছে।
: আছে বইকি। ওই যে পুকুরটা, ওর উত্তরপাড়ে অবসর বিনোদন কেন্দ্র আর নাচমহল রয়েছে। সন্ধ্যা হলেই চাষিরা ওখানে আসে। তাদের কলকাতা থেকে আনা কম্পার কোয়া খাইয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তারপর চলে অর্কেস্ট্রার বাজনা আর নাচ-গান, বাদ্যযন্ত্রের সুরের মূর্ছনা।
শেরিফ জন হেনরির কথা নিজের মুখে টেনে নিল
: কুঠির উত্তর-পূর্বে নদীর পাড়ে ওই দেখ, খোলা মাঠ রয়েছে। ওইখানে বসিয়েছি সাপ্তাহিক হাট। শনি আর বুধবারে এ হাট বসে। আর ওই যে গোরস্থান, তুমি তো ঘুরেই এসেছ। আরো আছে ঘোড়দৌড়ের মাঠ।
জন হেনরি হেসে বলল : আরো একটা জিনিস আছে। আপনি এড়িয়ে গিয়েছেন। নাচমহলের উত্তর পাশে তাকান। ওখানে একটা গুপ্তকক্ষ আছে। তাই না? এ কক্ষের সঙ্গে লাগানো পশ্চিম দেয়ালের পাশে রয়েছে একটি সুগভীর কূপ। লোকেরা একে অন্ধকূপ বা মৃত্যুকূপ বলে ডাকে।

আঙ্কেল, বলতে পারবেন, ওতে কতগুলো কঙ্কাল রয়েছে? শেরিফ শীতল চোখে তাকাল জন হেনরির দিকে। বলল : তুমি যদি জার্নালিস্ট আর ইংলিশম্যান না হতে তাহলে তোমার পরিণতি কী হতো জান?
শেরিফের চোখে স্থির জন হেনরির চোখ। বলল : হয়তো ওই অন্ধকূপে আমার একটা নিরিবিলি আশ্রয় জুটত।
শেরিফ বলল : না। আমি আমার দারোয়ানকে ডাকতাম। অবশ্য এখনো ডাকব। তবে তোমার জন্য নয়। নিচের ওই চাষাটা, অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছি, আমার বাংলোর সামনে দিয়ে বার বার হাঁটাচলা করছে। ওর মতলবটা জানা দরকার।
ছাদ থেকেই দারোয়ানকে বলল : ওই লোকটা মনে হয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওকে দরবার হলে নিয়ে বসাও। আমি আসছি। শেরিফ হাত রাখল জন হেনরির কাঁধে। বলল : তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, আমি তোমার কথাবার্তায় অভিযোগে খুব বেশি উত্তেজিত হইনি। এর কিছু কিছু কথা এর আগেও আমার কানে এসেছে। কিন্তু তুমি যেভাবে বিস্তারিত বললে, এভাবে কখনো শুনিনি। এগুলোর সবই যে মিথ্যা তাও বলা যাবে না। কিছু কিছু ভুল। কিছু কিছু লোভ তো আমাদেরও ছিল। যেগুলোর প্রতিকার করা যায়। সেগুলোর ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। আর এ কথাটাও সত্য। তুমি ইংলিশম্যান জার্নালিস্ট বলেই তোমার কথায় আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। যা আগেই দেয়া উচিত ছিল। এসো নিচে যাই। একসঙ্গে নাশতা করা যাবে।

দারোয়ান নফর মণ্ডলকে নিয়ে এলো শেরিফ সাহেবের দরবার হলে। হিঙ্গেরপাড়ার নফর মণ্ডল।
বুকটা কাঁপছে তার। এতদিন বাদে সাহেব তার নাগাল পেয়েছে। টুকরো টুকরো করে তার পোষা কুকরটাকে দিয়ে না খাওয়ায়।
শেরিফ সাহেবের কাছ থেকে নীলের বীজ পেয়েছিল। সাহেবের কড়া হুকুম, জমিতে বুনতে হবে। এবার চাই নীলের বাম্পার ফলন।
নফর মণ্ডল আর কী করে। নীলের বীজ বুনেছিল তার জমিতে। এর মধ্যে গুজব এসে পৌঁছল, নীল চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মনটা ধেই ধেই করে নেচে উঠল। কে আর সাধ করে জমিতে বিষ ঢালতে যায়।
রাতে রাতে সে তার জমিতে যত নীল চারা গজিয়েছে, সব তুলে ফেলল। জমি পরিষ্কার। নীলগাছ সব ফেলে দিল ভাগাড়ে।
শেরিফ সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছল খবর। শুনে সে তো রেগেমেগে আগুন। পারলে এখনই নফরের কল্লা কাটে।
তলব করল নফর মণ্ডলকে।
খবর পেয়ে নফর গায়েব। সাহেবের মুখোমুখি সে আর হতে চায় না। নিজেকে লুকিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় বন-বাদাড়ে।
কিন্তু কত দিন? ঘরে টানে মন। আনচান করে ওঠে নফর মণ্ডল। এদিকে সাহেবের লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে।
নফর বুঝল, এভাবে পালিয়ে থাকা যাবে না। সাহেবের খেপা লোকজন একসময় না একসময় পাকড়াও করবে তাকে। তখন আর হেনস্তার শেষ থাকবে না।
মরিয়া হয়ে উঠল নফর। যা থাকে কপালে, সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াবে। কৃষকের বুকে কেমন হিম্মত আছে বুঝিয়ে দেবে।
নফর মণ্ডল একটা ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে বনজঙ্গল ছেড়ে ফিরে এলো তার গায়ে। সেদিন থেকেই তুমুল ঝড়বৃষ্টি। এর মধ্যে কাকভেজা হয়ে ঘরে ফিরল নফর। মনের ভেতর তুষের আগুন। পরদিন সকাল। ঝড়বাদল থেমে গেছে। কিন্তু তার চিত্র ছড়িয়ে আছে সবখানে। স্নান সেরে পবিত্র হয়ে জেগে উঠেছে প্রকৃতি।
নফর মণ্ডল চলে এলো শেরিফ সাহেবের বাসভবনে। ছাদের ওপর সে দেখতে পাচ্ছে সাহেবকে। পায়চারী করছে। থেমে থেমে আবার গল্প করছে এক তরুণ সাহেবের সঙ্গে।
সাহেবের চোখ শকুনের থেকে কম নয়। এর ফাঁকেই দেখতে পেয়েছে তাকে। হাঁকাহাঁকি করে দারোয়ান ডাকিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে এই দরবার হলে।
শেরিফ জন হেনরিকে নিয়ে ছাদ থেকে নেমে এলো দরবার হলে। দুজনই বসল দুটি চেয়ারে। সামনে দাঁড়িয়ে নফর মণ্ডল। তার পাশে পাহ-ারায় দারোয়ান।
শেরিফ হেঁকে উঠল: কী হে নফর মণ্ডল! তোমার কী খবর? সেই কবে এলান দিয়েছি দেখা করার জন্য। পাত্তাই নেই। আজ আমার বাংলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছ কী মতলবে?
হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নফর মণ্ডল। ধরা গলায় দুঃখিত ভঙ্গি নিয়ে বলল : কী বলব সাহেব, আমার কপালটাই মন্দ। শেরিফ জিজ্ঞেস করল : কেন? কপাল আবার কী দোষ করল?
নফর বলল : দেখছেন না, কাল সারা রাত বৃষ্টি। এতে কার কী ক্ষতি হয়েছে জানি না, আমার সর্বনাশ। কাল সারা রাতের ঝড়বৃষ্টিতে আমার সব নীলের জমি কোথায় ভেসে গিয়েছে, কে জানে!
শেরিফ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : নীলের জমি ভেসে গিয়েছে?
নফর মণ্ডল বলল : হ্যাঁ সাহেব। কত জায়গায় কত আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম, পেলাম না।
শেরিফ মৃদু হেসে বলল : শুধুই নীল ভেসে গেল? আর কিছু যায়নি?
শেরিফের কথা শুনে থতমত খেল নফর। তবে মুহূর্তের জন্য। সপ্রতিভভাবে বলল : শুধু নীল কেন? ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার পাটের ক্ষেতও ভেসে গিয়েছিল। তবে সেটা বেড়াই গ্রামের মাঠে পাওয়া গিয়েছিল।
নফর মণ্ডলের চটজলদি জবাব শুনে তার দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। হাসি খেলে গেল জন হেনরির ঠোঁটেও। শেরিফ বলল : ঠিক আছে। ও বেলায় কাছারি থেকে নীলের বীজ নিয়ে যাস।

ম্যাকনেয়ার রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘোড়াটাকে ছুটিয়েছে যেমন তেমন। ঘোড়া কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে বোধ তার মাথায় কাজ করছে না। বার বার চক্কর দিচ্ছে রইস খানের ঠাণ্ডা কথাগুলো। আর অ্যানের ছলনাময়ী হাসি।
রইস খানকে শাস্তি দিতে না পারলে তার শান্তি নেই। অবশ্য তাকে শাস্তি দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর অ্যানের সাথে রইস খানের স্কান্ডাল জড়িয়ে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করলে সেটা তার পুরুষত্ব আর মানসম্মানের জন্য হানিকর হবে। রইস খান শেরিফের খুবই প্রিয়। কিন্তু তাই বলে তার শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের ওপর এক ব্ল্যাক নেটিভকে বেশি গুরুত্ব নিশ্চয়ই দেবে না। কোনো একটা ইস্যু নিয়ে ওকে শায়েস্তা করতে হবে।
চারপাশে ব্যাঙের ডাকে সে সচেতন হয়ে উঠল। সিন্দুরিয়া কনসার্ন ছাড়িয়ে সে অনেক দূর চলে এসেছে। গ্রাম ছাড়িয়েও দূরে। চারপাশে ডোবা। অথই পানি।
সে উল্টো পথে আবার ফিরে চলল। মাটির রাস্তা। ভাঙাচোরা মাটি ভেজা। কোথাও কোথাও পানি জমে রয়েছে। রাস্তার দুই পাশে কিছু ছোট-বড় গাছও উপড়ে পড়ে আছে।
তখন তার মনে পড়ল, কাল সারা রাত ঝড়বৃষ্টি চলেছে। শেষ রাতে সে যখন বারান্দায় হুইস্কি নিয়ে বসে, তখন বৃষ্টি ছিল না। তবে বেশ বাতাস ছিল।
ঝড়-বাদলের ছাপ পুরো রাস্তায়। যাওয়ার পথে উত্তেজনার ঘোরে এসব চোখে পড়েনি। এখন ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পাচ্ছে। কিছু নীল চাষেরও ক্ষতি হয়েছে। অবাক হয়ে দেখল, এখনো চাষীরা ধানের আবাদ করছে। পাটেরও। এ জমিগুলো তার চেনা। এর চাষিদের দাদনের টাকা গেলানো যায়নি। এদের ব্যাপারে আগামীতে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিকল্পনাটা করতে হবে এখন থেকেই।
হঠাৎ পেছন থেকে কেউ সুপ্রভাত জানাল। পেছনে তাকিয়ে দেখে নগেন্দ্র। তাদের গোমস্তা। বাইসাইকেলে চেপে আসছে। সাহেব ফিরে তাকাতেই সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। ম্যাকনেয়ারও ঘোড়া থামাল।
ম্যাকনেয়ার জিজ্ঞেস করল : কীহে নগেন্দ্র। ওদিকে তো তোমার বাড়ি নয়। কোত্থেকে এলে?
নগেন্দ্র বলল : ওদিকে গিয়েছিলাম নীলের আবাদ দেখতে।
: এত দেখেও তো ধান চাষ পাট চাষ বন্ধ করতে পারলে না।
: ওই চাষাগুলো খুব একরোখা।
: ওদের সোজা করতে হবে। এখন থেকেই ভেবে রেখ।
: জি স্যার।
: আর কোনো খবর আছে? সব ঠিকঠাক তো?
রাস্তায় কেউ নেই। তার পরও নগেন্দ্র গলা নামিয়ে বলল :

: স্যার, ঝামেলা তো এক-আধটুকু থাকেই।
: যেমন?
: জহরলালকে তো আপনি চেনেন।
: হ্যাঁ। সে নীল চাষ করেনি?
: স্যার, সে সিন্দুরিয়া গোলা থেকে নীলের বীজ নিয়ে গিয়েছে। সে তো অনেক দিন হয়। এরপর তার আর কোনো খোঁজখবর নেই। আমি ওর ক্ষেতগুলো দেখে এলাম। আর কোনো ক্ষেতেই নীল চাষ হয়নি।
ম্যাকনেয়ার গর্জে উঠল : নিয়ে আস তাকে। আজকেই এক্ষুনি।
নগেন্দ্র জিজ্ঞাস করল : কুঠিতে নিয়ে আসব স্যার?
ম্যাকনেয়ার বলল : কুঠিতে ফিরতে আমার দেরি হবে। আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি সাইকেল হাঁকিয়ে এখনই তাকে নিয়ে আস।
নগেন্দ্র আমতা আমতা করে বলল : স্যার, মারপিট বিচার-আচার এখানেই করবেন?
ম্যাকনেয়ার ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়াল। বলল : ডেকে আন। নীল চাষ না করার কারণটা শুনি। বিচার-আচার অন্যভাবে হবে।
নগেন্দ্র সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।
ম্যাকনেয়ারও ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখল। ভাবল, এখানে বেশ গাছপালা আছে। পরিবেশটা ভালো। শেরিফ সাহেবের রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, সেরেস্তাখানা, কারখানা সবই আছে। নাচঘরও আছে। কিন্তু বাদশাহ, নবাবদের মতো আলাদা কোনো বাগানবাড়ি নেই। এখানে একটা বাগানবাড়ি বানিয়ে দিলে কেমন হয়। ধরে আনা নেটিভ রমণীদের আর্তনাদ কোনো লোকালয়েই গিয়ে পৌঁছবে না।
জহরলালকে নিয়ে নগেন্দ্র ফিরল।
জহরলালের কোনো ভূমিকা নেই। সে সোজাসাপটা হাঁটু মুড়ে বসে করজোড় করল। ভক্তির একশেষ।
জহরলালের এ আচরণটা ম্যাকনেয়ারের খুব ভালো লাগল। বলল : জহরলাল তোমাকে ভালো মানুষ বলেই তো জানি।
জহরলাল বিনয়ের অবতার। বিগলিত হয়ে বলল : ম্যানেজার সাহেব, আপনারা রাজা। আমরা সামান্য প্রজা। কোনো গোস্তাকি হলে ক্ষমা করে দিন।
: হুম! তুমি সিন্দুরিয়া গোলা থেকে নীলের বীজ নিয়েছ?
: জে আজ্ঞে।
: কেন নিয়েছ?
: আমাদের নিজেদের ক্ষেতে বোনার জন্য।
: লাগিয়েছ?
: আজ্ঞে না।
: কেন?
জহরলাল হাত কচলে বলল, ক্ষমা খেন্না করে দিন সাহেব। আমার খুব সাধ ছিল নীল চাষ করার। এ জন্যই খুশি মনে আপনার গোলা থেকে নীলের বীজ নিয়ে গিয়েছিলাম। হা কপাল! ধামায় রেখে দিয়েছিলাম নীলের বীজ। বাড়িতে ছিলাম না। ছেলেমেয়েরা ধামায় নীলের বীজ দেখে মনে করল তিল। ভেজে গুড় দিয়ে নাড়ু বানিয়ে খেয়ে নিয়েছে। বাড়ি ফিরে এ ঘটনা শুনি। আমি হায়-হায় করি। আমার সাধের নীল বোনা আর হলো না।
নগেন্দ্র ধমকে বলল : তাহলে নতুন করে বীজ নিয়ে গেলি না কেন?
জহরলাল বলল : আমার সাহস হয়নি বাবু।
ম্যাকনেয়ার নীরবে জহরলালের কথা শুনল। সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না। বলল : ঠিক আছে। যাও।
জহরলাল বিদায় হলো। ম্যাকনেয়ার ঘোড়া চালাতে চালাতে বলল : লোকটা বেশ রসিক।
নগেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : এ রস যে কদ্দুর গড়াচ্ছে। ম্যাকনেয়ার জিজ্ঞেস করল : কেন?
নগেন্দ্র বলল, রসিক জহরলালের পথ ধরে গায়ের কোনো কোনো চাষাভুষো জোট বাঁধছে। ওরা নীলের বীজ খোলায় ভেজেছে। তারপর জমিতে বুনেছে। এভাবে ওদের জমির নীল আবাদ বরবাদ হয়ে গিয়েছে।

ম্যাকনেয়ার গম্ভীর গলায় বলল : জহরলালের রসিকতাতেই এ সর্বনাশা ইঙ্গিত পেয়েছি। তাই তো ওকে কিছু না বলে ছেড়ে দিলাম। আমাদের কৌশলের পথ বেছে নিতে হবে। আরেকটা কী খবর আছে বলেছিলে?
গোমস্তা বলল : সালামত মিয়া তেজ দেখিয়ে নীলের দাদন নিতে অস্বীকার করেছে।
: ওকে দাদন সেধেছিলে?
: জি স্যার।
: একবার যদি কাউকে দাদন সাধা হয়, তাকে দাদন নিতেই হবে। না হলে চাষারা অমান্য করতে শুরু করবে। এটা ছাড়া যাবে না।
: দাদন তো সে নেয়ইনি, আরো উল্টাপাল্টা কথা বলেছে।
: আজকেই ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এখনই।
: কিন্তু স্যার, আপনার একা যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। লোকটা খুব একরোখা।
: পরামর্শ দিয়ে ভালোই করেছ। তুমি কুঠিতে চলে যাও। আমি এখানেই রইলাম। তুমি আমাদের ইংরেজ সাহেব কর্মচারীকে পাঠিয়ে দাও। ঘোড়ায় চড়ে আসে যেন ওরা। তুমিও এসো। অশ্বারোহী সাহেবদের দেখলেই ও ভয় পেয়ে যাবে। গ্রামের লোকদেরও একটা নোটিস দেয়া হবে।
নগেন্দ্র সাইকেল চালিয়ে চলে গেল কুঠির দিকে।
ম্যাকনেয়ার ওখানে একটা গাছের নিচে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। ঘোড়ার পিঠেই সে অপেক্ষা করতে লাগল।
নগেন্দ্র একটা ভালো কথা বলেছে, বিক্ষুব্ধ রায়তের বাড়িতে একা যাওয়া উচিত নয়। ক্ষোভের আগুন যখন জ্বলে তখন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়েই ছাড়ে।
শেরিফের নীলকুঠি গোড়াপত্তনের প্রথম দিককার কথা তার মনে পড়ল।
সিডব্লিউ শেরিফের জমিদারিতে গোমস্তা ছিল শীতল বিশ্বাস। শেরিফের জমিদারির এগারপাড়া তরফের মৌজাগুলো নড়াইলের জমিদার রামরত্ন রায়ের কাছ থেকে পত্তনিমূলে ব্যবস্থা হয়। এ এলাকার খাজনা আদায়ের তহসিল কাছারি দখলপুর গ্রামে।
শেরিফ নীলকর বাড়িয়ে দিল দুই আনা। প্রজাদের ওপর ফরমান জারি হলো কবুলিয়াত দেয়ার জন্য। বেঁকে বসল প্রজারা। তারা পষ্টাপষ্টি না করে দিল। গোমস্তা শীতল বিশ্বাস শেরিফকে আশ্বাস দিল, আদায়ের ব্যবস্থা সে করছে।
নীলকর আদায়ের সহজ উপায় নিরীহ প্রজাতের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন।
জুলুমের মুখে প্রজারা গেল খেপে। তারা কাছারি লুটপাট করল। সব কিছু তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দিল। শেরিফের কর্মচারীদের দিল তাড়িয়ে।
শীতল বিশ্বাস তাড়া খেয়ে দাঁতে দাঁত পিষল। মনে মনে বলল, আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা। এ অপমানের শোধ কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেব। থানা-পুলিশ আমাদের হাতের মুঠোয়।
হরিণাকুণ্ডু থানার দারোগা বখশ তার বন্ধু। বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্যের আশায় সে রওনা করল থানার দিকে।
খবর পৌঁছে গেল প্রজাদের কাছে।
শীতল বিশ্বাসকে থামাতে হবে।
শীতল বিশ্বাসের বড় দাদার জামাই আদিল বিশ্বাস। মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল। এ কথা ও কথা। কথায় কথায় সময় গড়িয়ে যায়। এই করে সন্ধ্যা নামে। এরপর ক্ষান্ত হয় আদিল বিশ্বাস। কাকাশ্বশুরকে বিরান পথে ছেড়ে দিয়ে সে যায় ঘরে। এরপরও রাগ-তাপ কমেনি শীতল বিশ্বাসের। গায়ের মূর্খ চাষাভুষাগুলোকে এক হাত দেখে নিতেই হবে। সে পথ হাঁটতে থাকে। সামনেই বিল। পাড়ি দিয়ে তাহলেই থানার পথ। বিলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শীতল বিশ্বাস। তার কান সতর্ক হয়ে উঠেছে। চারপাশে ফিসফাস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে বিপদের গন্ধ। সুস্থির মতো কিছু ভেবে ওঠার আগেই শীতল

বিশ্বাস হকচকিয়ে যায়। চারপাশে মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছে তার অশুভ অস্তিত্ব। ওরা বলল, কত্তা থামলেন কেন? থানায় যাবেন না?
প্রজাদের কণ্ঠে নরম সুর পেয়ে শীতল বিশ্বাস তার আত্মায় জল খুঁজে পায়। এখনো তাহলে সে গোমস্তা। সাথে সাথে চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। ধমকে কথা না বললে প্রজারা মান্যগণ্য করে না। কর্কশ গলায় সে বলল, পথ ছাড়। আমি থানায় যাব। তোমাদের উচিতমতো শায়েস্তা করব।
খ্যাঁকখ্যাঁক হেসে ওঠে কে যেন, কাছারির আগুনের তাপ বুঝি এখনো গোমস্তা মশায়ের গায়ে লাগেনি।
আরেকজন বলল, এই সাঁঝবেলায় মুণ্ডুটা যদি ধড় থেকে নামিয়ে এই বিলের মাঝখানে পুঁতে রাখি, তখন কোথায় যাবে গোমস্তাগিরি আর তর্জনগর্জন?
আরেকজন অমনি বলে ওঠে, গোমস্তা বাবাজিকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেল না যেন। নাক-কান কেটে ছেড়ে দাও। নীল সাহেবরা ওর দশা দেখে বিলেতের জাহাজ ধরবে।
শীতল বিশ্বাস তখনো তার বিপদ বুঝে উঠতে পারেনি। তার রাগ চড়ে যায় মাথায়। খেঁকিয়ে ওঠে সে : ইস! নাক-কান কাটবে। ভিটেয় একেবারে ঘুঘু চড়িয়ে ছাড়ব।
তার এ আস্ফালনে সাড়া পড়ে যায় প্রজাদের মধ্যে। ওরা বলে ওঠে, ঘুঘু তুমি বার বার চড়িয়েছ, এবার তোমায় ফাঁদ দেখাচ্ছি।
গোমস্তা শীতল বিশ্বাসের নাক কাটা গেল। কান কাটা গেল। শেষ পর্যন্ত গলাটাও।
বিরান বিলে পড়ে রইল গোমস্তা শীতল বিশ্বাসের মুণ্ডু আর ধড়।

ঘটনাটা মনে পড়তেই ম্যাকনেয়ারের সারা শরীর শিউরে উঠল। এদের যেমন চাবুকের ওপর রাখতে হবে, এদের বিশ্বাসও করা যাবে না।
এর মধ্যেই উপস্থিত হলো শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী দল। ম্যাকনেয়ার সংক্ষেপে তাদের অভিযানের বিষয় বুঝিয়ে বলল।
নগেন্দ্র যথারীতি সাইকেলের ওপর। সে সালামত মিয়ার বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে সাহেবদের পথপ্রদর্শক হিসেবে এগিয়ে চলল। সালামত মিয়ার বাড়ির দরজায় যমদূত প্রায় সাহেবদের ঘোড়া। হাঁকডাকে সালামত মিয়া সামনে এসে দাঁড়ান। তার বাড়ির সামনে এতগুলো সাহেব আর ঘোড়া দেখে সে ঘাবড়ে গেল। গর্জে উঠল ম্যাকনেয়ার : কিরে চাষা, তুই নাকি নীলের দাদন নিচ্ছিস না?
মনে মনে ঘাবড়ে গেল সালামত মিয়া। তবু সাহস করে বলল : না ম্যানেজার সাহেব, এবারের মতো আমাকে মাফ করে দিন।
ম্যাকনেয়ার বলল : মাফ। মাফ কেন? নগদ পয়সা দিচ্ছি। বীজ দিচ্ছি : তোর ক্ষেতজুড়ে তুই নীলের বীজ বুনে দিবি।
সালামত মিয়া বলল : তাহলে সাহেব, আপনাদের মোদ্দা কথাটা বলি। আমার ক্ষেতে আপনাদের নীলের চাষ করতে আমার খরচা হয় তের টাকা ছয় আনা। আপনারা আমাকে দেবেন চার টাকা। এই ক্ষেতে আমি যদি তামাক লাগাই, আমার খরচা হয় চব্বিশ টাকা। তামাক বেচে আয় হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। আমার হাতে থাকে কমপক্ষে এগারো টাকা।
ম্যাকনেয়ার রেগে বলল : আমি ওইসব ম্যাথমেটিকস আর অ্যাকাউন্টিং বুঝি না। আমার চাই নীল। তোর ক্ষেতে নীল ছাড়া আর কিছুই হবে না। তামাক না। পাট না। ধান না। শুধুই নীল।
সালামত মিয়া অনেক কষ্টে রাগ সামলে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। আর পারল না। সেও ম্যাকনেয়ারের মতো খিঁচিয়ে উঠল : ক্ষেতে নীল বুনে কি নীল বিষ পান করব? আপনাদের দাদন নিতে পারব না।
ম্যাকনেয়ারের নীল রক্তে আগুন ধরে গেল। সালামত মিয়ার পিঠে কষে চাবুক মারল।
হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সালামত মিয়া। মারটা আচমকাই এসেছে। মেজাজ বিগড়ে গেল।

হাতের কাছেই ছিল একটা বাঁশের লাঠি। সেটাই হাতে তুলে নিল। চাবুকের জ্বালা এখনো পিঠে। ম্যাকনেয়ার ভাবতেই পারেনি, গোলামের জাত কালো চামড়ার নেটিভরা রুখে দাঁড়াতে পারে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক সাহেবের পিঠে পড়ল বাঁশের লাঠি। কোঁত করে উঠল সাহেব। শিরদাঁড়াটা বুঝি ভেঙেই গেল। সালামত মিয়ার তখন রণমূর্তি। চারপাশে সে সাদা চামড়া দেখছে। ঝানু লাঠিয়াল সে। চক্রাকারে ঘুরছে তার লাঠি। সাহেবের দল ঘা খেয়ে উহ্ আহ্ করছে।
পরিস্থিতি আগেই বুঝে গিয়েছিল নগেন্দ্র। সে তার সাইকেল নিয়ে চম্পট দিয়েছে।
সাহেবদের ঘোড়াগুলোও টের পেয়ে গিয়েছে আরোহী মনিবদের দশা। জান বাজি রেখে ছুটে চলল কুঠিবাড়ির দিকে।
ছুটছে ছুটছে।
সাহেবরা তাকাচ্ছে পেছনে। সালামত মিয়া তাড়া করে আসছে না তো?

৬.
জন হেনরি শেরিফের বাংলোয় ভরপেট নাশতা সেরে বেরিয়ে এলো। শেরিফের সঙ্গে তার আলাপটা সারল। সে তাকে ঘাবড়ে দিতে পেরেছে। শেরিফের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। যে তথ্য-উপাত্ত তার প্রয়োজন, যা নিয়ে সে রিপোর্ট করবে, তার ক্ষেত্র তৈরি করতেই সে শেরিফকে ঘাবড়ে দিয়েছে। এতে হেনরিকে সে আর ঘাঁটাতে চাইবে না। সর্বত্র গমনাগমনে বরং সে শেরিফের সহযোগিতা পাবে। তাহলে শেরিফও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, সে কোথায় কোথায় যাচ্ছে। সিন্দুরিয়া আসার পথে সে ফরিদপুরের এক ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষ্য নিয়েছিল। ভদ্রলোকের বক্তব্য : এমন এক বাক্স নীল ইংল্যান্ডে পৌঁছায় না যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়।
এটাই সত্য। এরই অনুসন্ধানে সে এসেছে।
জন হেনরি এখানকার শিক্ষিত এক বাঙালিকে তার সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করে। সে তাকে নিয়ে সিন্দুরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যায়। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকের সাক্ষাৎ নেয়। নীল চাষ সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সে তার নোটবুকে সাক্ষাৎকারগুলো সাজায়।
জয়চাঁদ পাল : যেখানে ৮টি লাঙ্গলের বাজারদর এক টাকা, সেখানে নীলকর দেয় মাত্র ৮ আনা। মানে টাকায় ১৬টা। নীল চাষের জন্য নীলকরকে খুব কমই খরচ করতে হয়। রায়তকে নিজের জমি ব্যবহার, শ্রম ও ব্যয় সবই করতে হয়। অথচ কোনো লাভই থাকে না। ধরা যাক, এক চাষির কথা। তার ২ বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে খুব কম করে ধরলেও খরচ হয় ১০ টাকা ১৩ আনা। এছাড়া চাষিকে জরিমানাদি বাবদ আরো টাকা খরচ করতে হয়। যেমন গরুর খোঁয়াড় থেকে ছাড়ানোর জন্য গরু পিছু ৬ আনা। এসব হিসাবের খাতায় ওঠে না। কৃষক ফসলের জন্য কী পায়? ধরা যাক, ফসল হয়েছে ৩২ বান্ডিল। টাকায় ৮ বান্ডিল হলে তার দাম পড়ে ৪ টাকা। এদিকে কিন্তু খরচ হয়েছে ১০ টাকা ১৩ আনা। সেখানে সে পাচ্ছে ৪ টাকা। লোকসান ৬টা ১৩ আনা। রায়ত তার মজুরির কিছুই পাচ্ছে না। অর্থাৎ কৃষকের পাওনা হলো বেগার খাটা। এত লোকসানের পরেও আমলাদের যথারীতি নজরানা দিতে হয়। এর পরিমাণ ৮ থেকে ১০ আনা। কোনো চাষি যখন নীলকরের কাছ থেকে একবার দাদন নেয়, সে আর কোনোকালেই এই দাদন শোধ করতে পারেনি।
জন হেনরি : রায়তরা এত লোকসান দিচ্ছে, এরপরও তারা নীল চাষ করে কেন?
জয়চাঁদ পাল : নীলকরদের অত্যাচার। বল প্রয়োগ। এর ধরন অসংখ্য। যেমন রায়তকে

গুদাম ঘরে আটক রাখা। ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া। মারপিট। উৎপীড়নের কোনো শেষ নেই।
মীর জান মণ্ডল : নীলকর একাধারে জমিদার আর মহাজন। সাধারণ মহাজনের কাছে বাজারদর টাকায় চৌদ্দ থেকে ষোল কাঠা ধান। আর নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা। আমরা যারা নীল চাষি, আমরা নীলকর ছাড়া আর কোনো মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারি না। গত কার্তিক মাসে নীলকর আমার সাতশ বাঁশ কেটে নিয়েছে। এ জন্য সে এখনো আমাকে কিছুই দেয়নি। যদিও দেয়, তাহলে প্রতি একশ বাঁশের জন্য মাত্র চার আনা পয়সা দেবে।
সুলতান মণ্ডল : সিন্দুরিয়া এলাকার কৃষকরা পালিয়ে যাবে এমন কোনো জায়গা নেই। এর আগে যারা পালিয়ে গিয়েছে, সাহেব তাদের ধরে এনে মাথায় কাদা মাখিয়ে নীল বুনিয়েছে। নীল চাষ করার আগে কৃষকদের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। কয়েক বছর মাঠে নীল ছাড়া ধান-পাটের আবাদ করা যায়নি। এর ফলে মহাজনের কাছ থেকে সুদে ঋণ নিতে হয়েছে, কর্জও নিতে হয়েছে। এদিকে ধানও হয়নি, পাটও না। এরা কেউই সে ধার শোধ করতে পারেনি। ঋণের যদি এক পয়সাও বাকি থাকে, তবে দুই এক বছরের মধ্যে আবার সাবেক হয়ে যায়। বাবার ঋণ ছেলে, ছেলের ঋণ নাতি-নাতনিরা বংশানুক্রমিক ধারায় বহন করে যেতেই থাকে। মহাজন আর নীলকর মিলে কৃষকদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং অসংখ্য লোককে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করে। আমি কোনোদিন ঋণ করিনি। বাপ-দাদাদের ঋণের খবর আমাদের জানা নেই। অথচ ম্যাক সাহেব আর বিহারীনাথ আমার দুটি বাগান থেকে ১৬টি কাঁঠাল গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছে। কোনো পয়সা দেয়নি। আমির জোয়ারদার আর মিয়াজান মুন্সীর বাড়িতে লুট করতে সাহেব উৎসাহ দেয়। তাদের ৭২ পোটে ধান লুট হয়ে গিয়েছে। সাবেদালী বিশ্বাসের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কে বিচার করবে? শেরিফ নিজেই তো ম্যাজিস্ট্রেট। এ ছাড়া গোয়াড়ি কিংবা যশোরে মামলা হলে সাহেব গিয়ে হাকিমের পাশে বসে থাকে। অত্যাচারের ঠেলায় বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।
খোদাবক্স মণ্ডল : প্রজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুঠিয়াল জোর খাটিয়ে তাকে দাদন নিতে বাধ্য করে। ফসলের ক্ষেত আর বাগান কেটে নীল আবাদ করায়। গোয়াল থেকে গরু-বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে কুঠিতে আটকে রাখে। কুঠিয়ালের অন্যায় দাবি ও আদেশ অমান্য করলে মলমূত্রপূর্ণ বদ্ধঘরে আটকে রাখা হয়।
তকী মুহম্মদ বিশ্বাস : একরারনামায় শুধু চাষিই শর্তাবদ্ধ থাকে। কুঠিয়াল থাকে না।
নীলকুঠির কর্মচারী ডেভিড হিল: নীল চাষে গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, জনসাধারণের কোনো উন্নতি হয়নি। রেভারেন্ড পার্সি হ্যাচার্ড সল : যারা কুটির কাজে নিযুক্ত, তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়। কিন্তু কৃষকের যে ক্ষতি হয় তা এ উপকার থেকে অনেক বেশি।
জন হেনরি : পুরো এলাকা ঘুরেছি। বিদ্রোহের ফুলকি সবখানেই। যে কোনো মুহূর্তে এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এতে নীল কুঠিয়ালদের পতন ঘটবে তো অবশ্যই, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনও নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

৬.

ম্যানেজার ম্যাকনেয়ারের মন-মর্জি খারাপ। এমন অবস্থায় কেউইবা মেজাজ ঠিক রাখতে পারে। অতগুলো সাহেব এক চাষার হাতে লাঠিপেটা খেয়ে পালিয়ে ফিরেছে, এ অপমানের জ্বালা এমনি-এমনি যায় নাকি।
গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন পরিস্থিতি সামাল দিতে জানে। ম্যানেজারের মর্জি ভালো না হলে কাজ করে সুখ নেই। কথায় কথায় ধমক খেতে হয়। কখনো কখনো কিল-চড়। জাতে ভারতীয়, তাই গোমস্তা বলে রেহাই নেই। সাহেবের মেজাজটা আজ সকাল থেকেই খারাপ দেখা যাচ্ছে। হয়তো বৌয়ের সাথে কোনো ঘাপলা হয়েছে। এমন আজকাল রোজ হয়। ঘরের রাগটা ঝাড়ে বাইরে এসে। তার ওপর আবার রায়তের হাতে অপমান। আজ সন্ধ্যেবেলায় গান-বাজনার আসর। অবসর বিনোদন কেন্দ্রে। স্টকে কলকাতার কমলা লেবু রয়েছে। কর্মচারী আর দর্শকরা খাবে। সাহেবদের জন্য বোতলকে বোতল পাগলা পানি আর মুরগি মসল্লামা।
জামালউদ্দিন খন্দকার নামে এক যুবক তার সহকারী। নগেন্দ্র তাকেই ডাকায় : বাবা জামাল।
জামালউদ্দিন কিছু একটা কাজ করছিল। নগেন্দ্রের গলার আওয়াজ পেয়েই সে কাজ ফেলে তড়িঘড়ি এসে দাঁড়ালো নগেন্দ্রের সামনে। বিনয়ের সাথে বলল : কত্তা মশায়, আপনি কি আমাকে ডাকলেন?
নগেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল : এটা সাহেবদের আপিস। তোমাকে কতবার বলেছি, আগের কালের মতো আজ্ঞে হুজুর কত্তা-ভত্তা এখন চলবে না। স্যার ডাকবে।
: জে কত্তা।
: নাহ, এ লোক শুধরাবার না। তুমি কি আজ আমাদের বাড়িতে যাবে।
: হ্যাঁ, যাব। বিজয়াদি খবর দিয়েছে।
: খবর তো তোমাকেই দেবে। তা কোন বেলায় যাচ্ছ?
: এবেলায় যাই?
: হ্যাঁ যাও। পিসির হাতের নিরামিষ দিয়ে দুপুরের খাদ্যপর্ব সেরে আস।
: আপনি যে কাজগুলো দিয়েছেন, ওগুলো তাহলে ওবেলায় সারব।
: থাক। কোনো বেলাতেই সারতে হবে না। তবে পিসির হাতে নিরামিষ গিলে ওখানেই আবার জমে যেয়ো না যেন। তাড়াতাড়ি আসবে। সন্ধ্যায় গান-বাজনার জলসা আছে। শেরিফ সাহেব ম্যাকনেয়ার সাহেব থাকবেন। আরো আরো সাহেবরা থাকবেন। উদ্যোগ আয়োজনটা আমাদেরই করতে হবে। বুঝেছ?
: জি। বুজেছি।
: কী বুঝেছ?
: সন্ধ্যায় আসর। সব ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।
নগেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল : আমাকে নয়, আমাদের। আর আমাদের বলতে কী বোঝায়? শিল্পী তবলচি বাজনাদারদের সঙ্গে খায়খাতির কার?
: জি বুঝেছি। এগুলোর ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। সব হয়ে যাবে।
: বাইজি নাচও লাগবে।
: ওটা তো আপনিই করেন।
: আচ্ছা, এবারো আমি করব। তুমি শুধু তাড়াতাড়ি ফিরো। সাহেবরা আবার তোমার চাঁদবদন পছন্দ করে। কত মানুষকে যে তুই মজিয়েছিস ভগবানই জানে। আর তুই মজে আছিস এক বাল-বিধবাতে। আচ্ছা জামাল, তোমার নার্গিসের কথা মনে পড়ে না?
জামাল থতমত খেয়ে বলে: কে নার্গিস?
নগেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলে : এবার বোঝো, নিজের বউকেও ভুলে গিয়েছ।
জামালের এবার মনে পড়ে। বলল : ওকে মনে পড়বে কী করে?
ওকে বিয়ে করার সময়ই চাকরিটা হয়ে গেল। নতুন বৌ ফেলে এখানে এসে চাকরিতে যোগ দিলাম। আর তো বাড়িতে যেতেই পারিনি।
নগেন্দ্র বলল : আমি ব্যবস্থা করে দেব, ছুটিও জোগাড় করে দেব। যাও, বাড়িতে গিয়ে বৌ নিয়ে এসো।
সাথে সাথেই অস্বস্তি প্রকাশ করল জামাল : না না। খুব ঝামেলা। সারাদিন আমি ব্যস্ত থাকি। কাজ করি। বৌ এলে কাজ কামাই হবে। তার চেয়ে এই বেশ, ভালো আছি।
: ভালো থাকো। আমাদের আর কী বলার আছে। তো তুমি যাও, আবার বলছি, তাড়াতাড়ি ফিরো।
জামালউদ্দিন খন্দকার বেরিয়ে গেল। নগেন্দ্রের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল।
জামালউদ্দিনকে দিয়ে নীলকুঠির খুব একটা কাজ হয় না। তবে ছেলেটা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি তার বাঁশি বাজানো। তার মুখশ্রী দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে।
নগেন্দ্র জামালকে তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে। বাড়ির বাজার সওদা থেকে শুরু করে অনেক কাজই সে করে দেয়। প্রথম প্রথম সে তার বাড়ি আলমডাঙ্গার পাশে হারদি গ্রামের যাওয়ার জন্য ছুটি চাইত। কুঠিবাড়িতে ছুটিছাঁটার সুযোগ খুবই কম। তাই তার কপালে ছুটি জুটত না। কখনো কখনো সে বিমনা হয়ে তার সদ্য বিয়ে করা বৌয়ের কথা ভাবত। তাদের ফুলশয্যার রাতটাও ঠিকমতো কাটেনি। ঘুম থেকে উঠেই তাকে চলে আসতে হয়েছে চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্য।
কুঠির যত অনুষ্ঠান, সবগুলোতেই জামালউদ্দিনের জয়-জয়কার। এই জামাল জড়িয়ে গিয়েছে

নগেন্দ্রের বিধবা পিসিমা বিজয়ার সাথে। কাজকর্মের সুবাদে জামালকে দিনে কয়েকবার নগেন্দ্রের বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাল-বিধবা পিসিমা জামালের সুন্দর মুখ দেখে লোভে পড়ে যায়। অভুক্ত জামালও শরীরের ক্ষুধার জ্বালায় আটকা পড়ে তার জালে। সেখান থেকেই প্রেম। প্রেম থেকেই গভীরতা।
জামাল এখন আর বাড়ি যাওয়ার কথা বলে না। এমনকি ঠেললেও সে তার গাঁয়ে যেতে রাজি নয়। নতুন বিয়ে করা বৌয়ের মুখটা সে ভুলেই গিয়েছে।
নগেন্দ্র নিজে ধর্মাধর্মের ধার ধারে না। কুঠিতে চাকরি করতে এসে এমন কোনো কুকীর্তি নেই যা সে করেনি। সাহেবদের উচ্ছিষ্ট মেয়েগুলোর জাত-পাতও বিচার করেনি। কিন্তু তারপরও সমাজ বলে একটা কথা আছে। পিসিমার নিজের নামে অনেক সম্পত্তি। সেগুলো নগেন্দ্ররাই ভোগ করছে। তাই পিসিমার ইন্দ্রিয় সুখকে চটকানো যাবে না। এ অর্ধম তারা নিজেরা মেনে নিয়েছে, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সমাজের মুখও বন্ধ রেখেছে।

সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসর। সিন্দুরিয়া কুঠিবাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই প্রজাদের একটা দল কুঠির কর্মচারীরা এসে আসন নিল বিনোদন কেন্দ্রে। সামনে কতকগুলো চেয়ার পাতা। আসছে কুঠিয়াল শেরিফ। ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার।
সুযোগটা কাজে লাগাল রইস খান আর তার দল। এমনিতে খুব প্রয়োজন না পড়লে অশ্বশালায় বাইরের লোকরা বা কুঠির অন্য কর্মচারীরা তেমন একটা আসে না। অশ্বশালা থেকে একটু তফাতে রইস খানের থাকার ঘর। সে একাই থাকে। তার মেয়ে বিলকিস তার নানির কাছে। সাধারণভাবে সন্ধ্যার পর রইস খানের ঘরের আশপাশটা নিরিবিলি থাকে। আজ একেবারেই সুনসান। সবাই, এমনকি অশ্বশালায় রইস খানের সহকারীরাও গান-বাজনায় ফূর্তি করতে গিয়েছে।
রইস খানের ঘরে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে ওরা কয়েকজন বসেছে শলা-পরামর্শ করতে। দরজায় খিল আঁটা। একজনকে রাখা হয়েছে বাইরে। ঘরের আড়ালে। ঝুট-ঝামেলা দেখলে গোড়ার আওয়াজ তুলে সতর্ক বার্তা জানাবে।
রইস খান ছাড়াও রয়েছে সহকারী গোমস্তা বেলায়েত আলী। তাগিদগীর জান মোহাম্মদ, লাঠিয়াল করিম সর্দার। এরা সবাই হামকল বাহিনীর সদস্য। নীলকরদের আজরাইল। তিতুমীরের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিতদের কাজ হলো নীলকুঠির, অত্যাচারী জমিদারের কাছারি আর মহাজনদের গোলাবাড়িতে হামলা চালানো। এরা সিন্দুরিয়া নীলকুঠিতে ঢুকেছে একই মতলবে। তারা কুঠিবাড়ির বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজখবর করে। গুপ্তচরদের মতো। দরকারি খবর আর তথ্য গোপনে পাচার করে হামকল বাহিনীর কাছে। হামকলদের ভয়ে অনেক কুঠিয়াল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরতে হয়েছে।
রইস খান তাদের অন্যতম নেতা। রইস খান ছদ্মনাম। আসল নাম সৈয়দ সদরুদ্দীন। উইলিয়াম শেরিফের আস্তাবলে ঢুকেছিল সহিস হিসেবে। এখন প্রধান সহিস। যোগসূত্র তার বিপ্লবী কৃষকদের সঙ্গে। সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে।
শেরিফ রইস খানের ওপর খুব খুশি। এমন সাহস, শক্তি আর নিষ্ঠা তার কুঠিতে খুব কম জনেরই রয়েছে। সাহেবের প্রিয় হলেও তাকে দেখতে পারে না কুঠির গোমস্তা-দালালরা। ম্যানেজার জর্জ ম্যাকনেয়ার আর দেওয়ান নলিনাক্ষ মিত্র তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু অন্য সব কর্মচারীর কাছে সে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। কোনো কিছুতেই কোনো পরোয়া নেই রইস খানের। দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার সে। তেমনি দূরন্ত ঘোড়া বশ মানাতেও তার জুড়ি নেই। এ জন্যই সে শেরিফ সাহেবের প্রিয়পাত্র। তার কথাবার্তা চাঁচাছোলা। যে কারো মুখের ওপর হক কথা বলতে তার বুক কাঁপে না এতটুকুও। কোথাও কোনো অন্যায় দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ জানায়। অন্যায়ের কোনো প্রতিকার না হলে সাথে সাথে ছোটে শেরিফের কাছে। তাই কুঠির সবাই তাকে সমীহ করে চলে। খানিকটা ভয়ও পায়। সহযোদ্ধাদের নিয়ে নিজের ঘরে বসেছে রইস খান।
সিন্দুরিয়া শীলকুঠির সার্বিক বিষয়, বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে তারা। সাথে সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সারাদেশেই নীলকরদের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের দিন ঘনিয়ে আসছে। সব এলাকার যোদ্ধা, বিদ্রোহী আর বিপ্লবীদের সাথে সমন্বয় করে দেশের বৃহত্তম কুঠিবাড়ি সিন্দুরিয়াতেও শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
আলোচনা প্রসঙ্গে বেলায়েত আলী বলল : আজ এক অচেনা সাহেব ছোকড়াকে দেখছি, সারা কনসার্ন চষে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে প্রজাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে।
রইস খান বলল : ওর নাম জন হেনরি। ওর ব্যাপারে খুব সাবধান। ও ম্যাকনেয়ারের শালা। অ্যানের খালাতো ভাই। করিম সরদার বলল : তো এদিকে এসে ঘোরাঘুরি করছে কেন? মতলবটা কী। দেব নাকি লাঠির এক ঘায়ে মাথাটা চৌচির করে। রইস খান সতর্ক করে দিল : খবরদার। ভুলেও এমনটি করো না। সারাদেশে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। হৈচৈ পড়ে যাবে। ব্যাটা সাংবাদিক। তাও আবার ক্যালকাটা রিভিউর পত্রিকাটা শুনেছি নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তদের পক্ষে লেখে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। সকালে আমার এখানে এসেছিল। ঘোড়াসহ আমার ফটো তুলতে চায়। আমি নিজেকে এড়িয়ে ওকে ঘোড়ার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। নাও বাবা, যত পার ঘোড়ার ছবি তোলো।
জান মোহাম্মদ একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল : আজকাল তোমার ঘোড়ার আস্তাবলে খুব হেঁজিপেঁজি, নামিদামি লোকরা আসা-যাওয়া শুরু করেছে।
বেলায়েত আলী বলল : কাদের কথা বলছ?
জান মোহাম্মদ বলল : আজ ছবি তুলতে সাহেবের ছাওই শুধু আসেনি, এসেছে মিসেস ম্যাকনেয়ার। ম্যানেজারের পত্নী। করিম সরদার চোখ গোল গোল করে বলল : তাই নাকি? ব্যাপরটা কী?
রইস খান বলল : আর বলো না। ম্যানেজারের এই বৌটাও আমার জন্য একটা সমস্যা।
জান মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করল : কি রকম। ওর স্বামী প্রবর যে তোমার জন্য একটা বড়-সড় সমস্যা, সেটা আমরা আগেই জানি। এখন বৌটাও খারাপ ব্যবহার শুরু করেছে?
রইস খান গম্ভীর হয়ে বলল : খারাপ ব্যবহার না। বেশি ঘনিষ্ঠ ব্যবহার। এই আমাকে দেখে হাসল তো, পরে চোখ টিপল। কখনো আলগোছে জিভটুকুও দেখিয়ে নেয়। আজকাল মতলব করছে গায়ে হাত দিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করার। সুযোগ অবশ্য এখনো পায়নি।
সশব্দে হেসে উঠল বেলায়েত আলী। বলল : এ দেখছি উল্টো পুরাণ। ওর স্বামী, কুঠিয়াল, এমনকি তাদের আণ্ডা-বাচ্চারা বাঙালি মেয়েদের সারা শরীর ছুঁয়ে দেখার জন্য পাগল। মেম সাহেবার সখ চাপতেই পারে বাঙালি পুরুষের অভিজ্ঞতা নেয়ার।
রইস খান বলল : আমি আজকের বৈঠকে প্রসঙ্গটা তুলতে চাইছিলাম। ভালো হলো, এমনি এসে গেল। ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমার ওপরও তার হুকুমের মাত্রা বাড়ছে। এদিকে আবার নতুন উৎপাত। এই মহিলা– অ্যান। মনে হচ্ছে, এখানে আমি আর বেশিদিন টিকতে পারব না।
করিম সরদার বলল : কুঠিয়াল সাহেব তো তোমাকে পছন্দ করে। তুমি তার আশ্রয় পাবা।
রইস খান বলল : ম্যাকনেয়ার আমাকে কিছু করলে শেরিফ কোনো কথাই বলবে না। ম্যাকনেয়ারকে চটাবে না। সাহেব সাহেব এক জাত। একজন ভারতীয়ের জন্য তারা নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করবে না। আবার শেরিফ সাহেব ছিপ ফেলে রেখেছে মিসেস ম্যাকনেয়ারের জন্য। সবচেয়ে বড় কথা হলো, শেরিফ তো ধোয়া তুলসী পাতা নয়। এখানে জুলুম, নিপীড়ন, ধর্ষণ যা হয়, সব কিছুর পেছনে রয়েছে সে। এগুলো আর কতদিন সহ্য করব। তোমাদের জানিয়ে রাখি। আমি যে কোনো দিন গর্জে উঠতে পারি। বেরিয়ে আসতে পারি খোলস থেকে।
জান মোহাম্মদ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। এ মুহূর্তে ঘরের আড়াল থেকে ভেসে এলো ঘোড়ার চিহি আওয়াজ।
সাথে সাথে সব কথা থেমে গেল। ঝটিতে নিভে গেল ঘরের বাতিটি। করিম সরদার তার হাতের বর্শা নিয়ে দরজার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। রইস খানের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় টোকা।
রইস খান হেঁকে উঠল : কে? এই ভর

সন্ধ্যেবেলায় কে?
দরজায় মহিলার কণ্ঠস্বর : রইস খান আছ নাকি?
: কে? আমিই তো কথা বলছি।
: দরজা খোলো। তোমার জন্য খরব আছে।
রইস খান দরজা একটুখানি ফাঁক করে দেখল অ্যানের খাস বাঁদি জোহরা। বলল : তোমাকে মেম সাহেবা ডেকেছেন।
রইস খান বিস্মিত হয়ে বলল : আমাকে!
জোহরা বলল : তোমাকে নয় তো, তোমার ঘোড়াগুলোকে? আচ্ছা বলো তো, তুমি সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়া নিয়ে শোও।
রইস খানের খুব রাগ হলো। নিজেকে সংযত করে বলল : মুখ সামলে।
জোহরা বলল : কিছু মনে করো না। ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তোমার ঘর থেকে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এমনও হতে পারে সেটা ঘরের পেছনে।
রইস খান বলল : আচ্ছা, তুমি যাও।
জোহরা মাথা নেড়ে বলল : না। তা হবে না। মেম সাহেবা তোমাকে আমার সাথেই নিয়ে যেতে বলেছেন। না হলে আমার চাকরি খতম।
রইস খান বলল : আচ্ছা তুমি এগোও। আমি আসছি।
জোহরা বলল : বেশ। আমি ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর নিচতলার দরজায় অপেক্ষা করব। দেরি দেখলে আবার আসব। একেবারে ঢুকে যাব ঘরে। না বেরুনো পর্যন্ত এখানেই থাকব।
জোহরা চলে গেল।
জান মোহাম্মদ ফিসফিস করে বলল : ভয়ঙ্কর মেয়ে তো ভাই।
বেলায়েত আলী বলল : ম্যানেজারের ছোঁয়া পাওয়া মেয়ে।
রইস খান বলল : মেম সাহেবা এর চেয়েও ভয়ানক। ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যার যার গন্তব্যে চলে গেল। রইস খান ঘরের তালা বন্ধ করে ম্যাকনেয়ারের বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

জন হেনরি সারাদিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে বিকেলে রেস্ট হাউসে ফিরল। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ম্যানেজারের বাংলোতে এলো সন্ধ্যেবেলায়। আজ সকালে গার্ড তাকে চিনেছে। পা ঠুকে স্যালুট দিল। সে উঠে গেল দোতলায়।
ভাবল, অ্যানের ঘরে পরে যাবে। সকালে এসেছিল, কিন্তু ইভার সঙ্গে তেমন করে কথা হয়নি তার ব্যস্ততার জন্য। মেয়েটার নিশ্চয়ই একটু মন খারাপই হয়েছে। তাকে খুশি করে দিতে হবে। ইভা ম্যাকনেয়ার-অ্যানের মেয়ে। ওরা যখন ভারতে চলে আসে তখন সেই ছোট বয়সেও ইভা লন্ডনে ছিল। নানা-নানির সাথে। সেখানেই পড়াশোনা করত।
দীর্ঘদিন মা-বাবার সান্নিধ্যের বাইরে। লন্ডনে চট করে যাওয়া যায় না। জাহাজে যাতায়াত। দিনের পর দিন পেরিয়ে যায়। মাসের পর মাস সমুদ্রে। মা-বাবার কাছে যাওয়ার জন্য জেদ করতে থাকে ইভা। পরে তাকে ভারতবর্ষে আনিয়ে নিয়েছে মা-বাবা। পরবর্তী সেশনে তাকে কলকাতায় ভর্তি করা হবে।
হেনরি ইভার কক্ষে ঢুকল। সে তখন টেবিলে কাগজ পেতে রঙিন পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছিল। জন হেনরিকে কামরায় ঢুকতে দেখেই ইভা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে বলল : মামা, আমি তোমার ওপর রাগ করেছি। হেনরি হেসে বলল : আমি হলেও রাগ করতাম।
: কেন? রাগ করতে কেন?
: এই যে এতদিন পর তোমার সাথে দেখা। তারপর শুধু হাই-হ্যালো করে ধুম বিদায়।
: এটা তুমি খুব অন্যায় করেছ।
: করেছিই তো। কিন্তু উপায় ছিল না তো। অনেকগুলো কাজ নিয়ে এসেছি। আজকেই একটা রিপোর্ট পাঠাতে হলো। দেখনি। কাজের চাপে তোমাদের বাসাতেও উঠিনি।
: হ্যাঁ, তাই দেখলাম। কোথায় উঠেছ?
: নীলকুঠির রেস্ট হাউসে। তারপর বলে, কেমন

কাটছে এখানে।
: খুব ভালো।
: বসে বসে থেকে খুব ভালো?
: না। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। ছবি আঁকি। গ্রাম ঘুরি। একগাদা বই নিয়ে এসেছি লন্ডন থেকে। সেগুলো তো এখনো ধরার সুযোগই পেলাম না। আর রাতের বেলাটা ছাদে উঠে ভূত ধরার চেষ্টা করি। ভারতে নাকি অনেক ভূত।
: ভূত ধরেছে?
: ওরা আমার কাছেই ভেড়ে না।
: তুমি তো সাহসী মেয়ে। সাহসীদের ভূত ভয় পায়।
: তাহলে আমার ভূত ধরা হবে না।
: মনে হয় না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমার সময়টা তরতরিয়ে যাচ্ছে।
: যাচ্ছেই তো।
: মার সময়টা কাছটে কেমন?
: খুব খারাপ।
: কেমন?
: যখন বাবা ঘরে থাকে, তখন দুজনে মিলে খুব ঝগড়া করে। আর বাবা যখন বাইরে থাকে তখন সারাক্ষণ দাসি-বাঁদিদের ওপর চোটপাট। ধমক-ধামক।
: বাহ্! তোমার মার সময়ও তো বেশ ভালোভাবেই কাটছে। ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞীর মতো।
: আমাদের রানীও বুঝি এমন করে!
: এরপর লন্ডনে গেলে খোঁজ নিয়ে দেখ। আচ্ছা বলো তো, এখানকার লোকদের তোমার কেমন লাগে?
: রাবিশ! এরা সব কুত্তামুখো। বানরমুখো। আই হ্যাট দেম।
: আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের দিকে তাকিও না। এখানে তো সাহেব-সুবোরাও আছে।
: আরে দূর! ওরা সব বুড়ো হাবড়া! তোমার তো খানিকটা বয়স হয়েছে, তোমার মতো ইয়াং থাকলেও হতো!
: ওরে দুষ্টু মেয়ে! কায়দা করে জানিয়ে দিলে আমি বুড়ো হতে চলেছি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এখানে একটাও পছন্দ মতো লোক নেই। তাহলে তোমার চলবে কী করে ইয়াং লেডি। একজন হিরো যদি না থাকে, তাহলে স্বপ্ন তৈরি হবে কী করে।
এবার মেয়েটার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে লজ্জাবনত হাসি হাসি মুখে বলল: আছে তো।
: আছে নাকি? কে সে সুপুরুষ যাকে আমার ভাগ্নি পছন্দ করে? তার মনের হিরো?
ইভা মুখ তুলে নির্দেশ কণ্ঠে বলল : তাকে তুমি দেখনি। আমাদের প্রধান সহিস। রইস খান।
আঁৎকে ওঠার মতো অবস্থা দাঁড়াল জন হেনরির। ঢোক গিলে হজম করল। বলল: তাহলে এক কাজ কর। তুমি তোমার হিরোর ছবি আঁকো। ডিনার টেবিলে চুপি-চুপি আমাকে দেখিও।
ইভা আলোকিত মুখে বলল: রইস ভাই আমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে। কী করে দুষ্ট ঘোড়াকে বাগে আনতে হয়, সেটাও শেখাবে।
হেনরি বলল: মনে মনে তুমি ভাবো কীভাবে তুমি ঘোড়ায় চড়বে, ঘোড়া দাবড়াবে। আমি একটু তোমার মার সাথে গল্প করে আসি।
ইভার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো জন হেনরি। এগিয়ে গেল অ্যানদের শোয়ার ঘরের দিকে। হেনরি অ্যানের প্রধান বাঁদি জোহরাকে দেখতে পেল। আর ঠিক তার পেছনেই রইস খান। জোহরা শোয়ার ঘরের পর্দা ফাঁক করে বলল: মেম সাহেব ভেতরে আছেন। আপনি ভেতরে যান। রইস খান ইতস্তত করল। তারপর ধীর পারে ভেতরে ঢুকল। জোহরা দরজা লাগিয়ে অন্যদিকে খুব সম্ভব কিচেনে চলে গেল।
বিস্মিত হেনরি আপন মনে বলে উঠল: ব্যস! মেয়ে আর মার দেখছি একই পছন্দ। একই হিরো! রইস খান।
সে এগিয়ে এলো ওদের শোয়ার ঘরের দিকে।

দরজায় কান পাতল অবাক করা কোনো আওয়াজ শোনার জন্য।
ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল রইস খান। অ্যান উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। থুতনিটা বালিশের ওপর রাখা। পরনে পাতলুন। আর পিঠটা চকচকে ফরসা। ব্রার হুক লাগানোর পাতলা ফিতা। বব-কাট মাথার চুল ঘাড়ের ওপর আলুলায়িত পড়ে আছে।
পায়ের শব্দে বালিশ থেকে মাথা তুলে সে দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল। ব্রার ফাঁকে গলে স্তনের এক পাশের আংশিক ঝলক দিয়ে উঠছে। অ্যানের মুখে মিষ্টি হাসি। বলল: কে? রইস খান?
রইস খানের দৃষ্টি একবারই বিভ্রান্ত হয়েছে। এখন তার চোখ মেঝের দিকে নামানো।
অ্যান বলল: তোমাকে বলেছিলাম সন্ধ্যেয় আসতে। আসনি তো। রইস খান মাথা নিচু করেই বলল: এলাম তো।
অ্যান বলল: এসেছ। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় আসনি তো। আমার অনুরোধও রাখনি। লোক পাঠিয়ে তোমাকে আনতে হলো।
রইস খান কথা বাড়াল না। মৃদুস্বরে বলল: আদেশ করুন মেম সাহেবা। আমাকে কী করতে হবে?
অ্যান বলল: তুমি কুঠির ঘোড়াগুলোকে যেমন ভালোবেসে ডলে ঘষে ম্যাসেজ করে দিতে দিতে স্নান করাচ্ছিলে, তা দেখে আমি মুগ্ধ। আমার বিশ্বাস, তোমার হাতের স্পর্শে ওদের ব্যথা-বেদনা সব মিটে যাবে। আমিও দেখলাম, ঘোড়াগুলো খুব আনন্দিত।
: ধন্যবাদ মেম সাহেবা।
অ্যান রহস্যময় হেসে বলল: ধন্যবাদ তো আমি জানাতে চাই। তোমাকে সত্য কথা বলছি, আমার পিঠ সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। আমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছি। অনুগ্রহ করে আমার পিঠটা ম্যাসেজ কর দাও, ওই ঘোড়াগুলোকে যেমন দিচ্ছিলে। এরপর আমি বুক পেতে দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে তোমারও আনন্দ হবে।
রইস খানের কানে কেউ যেন গরম তেল ঢেলে দিচ্ছে। তার মেঝের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।
সে ধীর কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল: আমি সহিস। ঘোড়া নিয়ে আমার কাজ। আমি ঘোড়া ম্যাসেজ করতে পারি। কোনো মানুষকে নয়।
অ্যান অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল: আমার ব্যথা-বেদনার কী হবে? রইস খান বলল: আপনার খাস বাঁদি জোহরা অথবা অন্য কাউকে ডেকে নিন। ওরা আপনার কাজ করে দেবে। অ্যান সোজা হয়ে বসল। ব্রা-ঢাকা তার উন্নত স্তন যেন স্থির হয়ে আছে রইস খানের দিকে।
অ্যান হিস হিস কণ্ঠে বলল: আমি তোমার মনিব। তোমাকে হুকুম করছি।
রইস খান যেন অন্ধ। যেন কিছুই দেখছে না। কিছুই তাকে আকর্ষণ করছে না। দৃঢ় কণ্ঠে বলল: আমরা বাঙালি। হিন্দুস্থানি। আমরা ধর্মাধর্ম মানি। কখনো অধর্ম করতে পারব না।
সে এক ঝটকায় দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দোতলা থেকে তর তর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। হন হন করে চলে গেল।
অ্যানের ঘরে ঢুকল জন হেনরি। মৃদু করতালি দিয়ে বলল: চমৎকার! নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। তাকাল অ্যানের দিকে। বিছানায় বসে ফুঁসছে। উত্তেজনায় ওঠা-নামা করছে তার বুক।
হেনরি আলগোছে দরজাটা লাগিয়ে দিল।
অ্যান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: আমি ওকে দেখে নেব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। হেনরি বলল: জোর করে কি ভালোবাসা পাওয়া যায়?
অ্যান বলল: ওর ভালোবাসা কে চায়?
হেনরি অবাক হয়ে বলল: আমার তো মনে হলো, তুমি ওকে ভালোবাস বলেই এমন করে নিজেকে উপস্থাপন করেছ।
অ্যান বলল: প্রশ্নই ওঠে না।
: তাহলে?
এটা শুধুই শরীরী ব্যাপার। ক্ষুধা মেটানো।
অ্যানের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে নিজের

দিকে তাকাল। হেনরিকে বলল: আমাকে এভাবে কতক্ষণ রাখবে। ওই ওয়ারড্রোবে কাপড় আছে।
হেনরি আলতোভাবে বলল: কিছুক্ষণ এভাবেই থাক না। তোমাকে বেশ লাগছে। কিশোরীর মতো। ওই লোকটা তো তোমাকে দেখেইনি। সারাক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল। মুখ তুলে তাকালেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যেত।
: তুমি অমন করে কী গিলছ? আমি কিন্তু তোমার বোন।
: হ্যাঁ। মাসতুতো। বোন অসুবিধা নেই। আমাকে দেখতে দাও।
: আমি তোমার থেকে বড়।
: পাঁচ বছরের। তো কী হলো। তুমি ওই লোকটার কাছে নির্যাতন চাইছিলে। পীড়ন চাইছিলে। আমি নির্যাতন করতে জানি না। পীড়ন করতেও না। আমি ভালোবাসতে জানি। শিল্পিত ভালোবাসা।
: তাই?
: আজ সত্য কথা বলি। আমি তখন বালক। তুমি কিশোরী। তখন থেকে তোমাকে মনে হতো, তুমি আমার রানী। মুগ্ধ হয়ে চুপি চুপি তোমাকে দেখতাম। তুমি যুবতী হলে। আমারও একটু একটু বয়স বাড়ছে। বাড়ছে আমার মুগ্ধতাও। তারপর তুমি বিয়ে করলে। প্রেম করে। আমার মনে হয়, তোমার বর ওই লোকটাকে খুন করি। অথবা আমি খুন হয়ে যাই।
বলতে বলতে জন হেনরি এসে দাঁড়াল অ্যানের পাশে। আবেগ-ঘন কণ্ঠে বলল: আজ আমি বড় হয়েছি। তোমার প্রতি আমার মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। এজন্যই তো আমার ভারত আসা। আজ তোমাকে এভাবে দেখে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এতটুকু মেয়ে বিছানায় হামাগুঁড়ি দিয়ে বসে আছে।
অ্যানের চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক খেয়ে গেল। বলল: ওরে ছেলে, আমি এতটুকু মেয়ে আর তুমি বড় হয়ে উঠেছ। দেখি খোকা, তুমি কতটুকু বড় হয়েছ।
অ্যান জন হেনরির উরুসন্ধি খামছে ধরে আকর্ষণ করল। তাল সামলাতে না পেরে অ্যানের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল: আহ্! সেটা কষ্টের। অথবা সুখের।

৭.
রাতের খাবার টেবিলে ওরা সবাই এক সাথে হলো। ম্যাকনেয়ার। অ্যান। ইভা। আর জন হেনরি। এখানে ম্যাকনেয়ারের সাথে হেনরির প্রথম দেখা।
ম্যাকনেয়ার অবাক হলো না। এক ঝলক হেনরিকে দেখল মাত্র।
ম্যাকনেয়ার জিজ্ঞেস করল: হেনরি, তুমি কখন এসেছ।
হেনরি জবাব দিল: সন্ধ্যায়।
ম্যাকনেয়ার অবাক হয়ে বলল: আজ সন্ধ্যায়? তাহলে সারা এলাকার মানুষ সারা দিন ধরে তোমাকে এখানে-ওখানে দেখল কী করে? শেরিফ সাহেবের সাথেও তো আজ সকালে তোমার কথা হয়েছে।
হেনরি বুঝল তার উত্তর ভুল বুঝেছে ম্যাকনেয়ার। সে ব্যাখ্যা করে বলল: সন্ধ্যায় আমি এখানে আপনার বাংলোয় এসেছি। আমি এসেছি কাল রাতে।
ম্যাকনেয়ার বলল: জানি। উঠেছ আমাদের রেস্ট হাউসে। এখানে তোমার আপার বাংলো থাকতে তুমি রেস্ট হাউসে উঠলে কেন?
হেনরি বলল: আমি আসলে বেড়াতে আসিনি। আমি ক্যালকাটা
রিভিউর সিনিয়র সাংবাদিক। নিউজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি। এ বাসায় থাকলে এ জন্য আপনারা বিব্রত হতেন। ম্যাকনেয়ার বলল : ইতোমধ্যে আমি বিব্রত হয়ে রয়েছি। তোমার এখানে আসার খবর আমি শেরিফ সাহেবের কাছ থেকে পাই। সকালে তার ওখানে গিয়েছিলে। অকারণে তাকে বিব্রত করেছ। কেন?
হেনরি হেসে বলল : ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

তার সাথে কথা বলে যেসব তথ্য পেয়েছি, তাতে কারো ক্ষতি হবে না। বরং আপনার উপকার হবে।
ম্যাকনেয়ার নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল : তুমি এখানে কদিন থাকবে? আমার মনে হয় আগামীকাল থাক। এরপরের দিন অর্থাৎ পরশুদিন সকালে বা বিকালে তুমি চলে যাবে। এখান থেকে এই দুই বেলাতেই কলকাতার ট্রেন পাবে। তুমি যদি চাও, তোমার ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থাও আমরা করে দিতে পারি।
: সিন্দুরিয়া থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?
: সাংবাদিক হেনরির ব্যাপারে আমার তেমন করণীয় কিছু নেই। তবে তুমি অ্যানের ছোট ভাই ইভার মামা হিসেবে আস, তখন তোমাকে আমাদের বাসা বাদ দিয়ে রেস্ট হাউসে কিছুতেই থাকতে দেব না।
: সাংবাদিকদের এত ভয়?
: কারণ তারা আমাদের চরিত্র হনন করে। ভুল-ভাল খবর দিয়ে আমাদের বিব্রত করে।
: আপনার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।
: দেখ শালাবাবু, এখানকার পরিস্থিতিটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটাকে আরো খারাপ আর উত্তেজক করে তুলো না। ওই মূর্খ বর্বর চাষাভুষাদের লাই দিও না।
জন হেনরি হাসল : আমরা কাউকেই লাই দিই না। আপনারা যা ঘটান আর ওরা যা ঘটায়, আমরা তার বিবরণটাই দিই। আমরা নীলকর, জমিদার, প্রজা বা রায়তদের খবর ছাপি না, ঘটনার খবর ছাপি। ম্যাকনেয়ার অবাক হয়ে হেনরির দিকে তাকায়। সেদিনকার এতটুকু ছেলে। আজ বেশ চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শিখেছে! হেনরির দিকে তাকিয়ে সে বলল : সব ঘটনাই কি খবর?
হেনরি বলল : না। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। বাতাসে, আপনাদের এখানকার বাতাসে যে আর্তনাদ আর ক্রন্দন ভাসে, যে গর্জন জমছে, তার আওয়াজ আপনারা শুনতে পাননি। আমরা মাঠে-ঘাটে চড়ে বেড়াই। মানুষের সাথে মেলামেশা করি। কথা বলি। আমরা জানি কী ঘটতে চলছে। আপনাদের এখন সংযত হতে হবে। আপনাদের হাতে যে হান্টার, তা খাপে ঢুকিয়ে খুলতে হবে।
ম্যাকনেয়ার তাচ্ছিল্যের সাথে বলল : এত বছর ম্যানেজারি করছি। তাও আবার দেশের সবচেয়ে বড় নীল কনসার্নে। আর এখানকার অবস্থার খবর শুনতে হবে তোমার কাছে। শোন হেনরি। বাতাস আমরা ছুঁতে জানি। কংস গাছের চাবুক দিয়ে সব ব্যাটাকে চাবকাতে হবে। গর্জন তো দূরের কথা কাঁদতেও ওরা সাহস পাবে না।
জন হেনরি হাসল। বলল : জানি, সবকিছুই আপনারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখছেন। কিন্তু আমরা সে গর্জন শুনতে পাচ্ছি, যাকে আপনারা পাত্তা দিচ্ছেন না, ওটাই আমাদের প্রধান খবর। জনতার ঢল যখন আপনাদের ওপর আছড়ে পড়বে, আপনারা সামলাতে পারবেন না। মুহূর্তে ভেসে যাবে। আফসোস, ওই বেটা ব্রিটিশ গভমেন্টকেও ভারতের মাটিতে নড়বড়ে করে তুলবে।
ম্যাকনেয়ার কঠিন কণ্ঠে বলল : যাই হোক, কাল বাদে পরশু তুমি সিন্দুরিয়া ছাড়ছ।
হেনরি বলল : আমি কারো আমন্ত্রণে আসিনি। সুতরাং কেউ আমাকে চলে যাওয়ার সময়ও ঠিক করে দিতে পারে না। আমার যখন যাওয়ার সময় হবে, তখন ঠিকই চলে যাব।
: সে ক্ষেত্রে তুমি আমাদের রেস্ট হাউসে থাকতে পারবে না।
: সেটা খানিকটা সমস্যা হতে পারে। কারণ এ এলাকায় হোটেল-টোটেল নেই। তবে আমার ধারণা, এলাকায় আমার আশ্রয় পেতে অসুবিধা হবে না।
: তুমি ভাবছ, রায়তরা তোমাকে খুব সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের হুকুম অমান্য করার সাহস তাদের নেই।
: এ এলাকায় এখনো এমন দুই-একটা বাড়ি রয়েছে যেখানে কুঠিয়াল সাহেবের বা নীলকুটির কোনো হুকুম কাজ করে না।
ম্যাকনেয়ারের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তার অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসল হেনরি। বলল : এলাম ভগ্নিপতির রাজত্বে। কটা দিন হেসেখেলে বেড়াব। তা না দেখা-সাক্ষাতের পর থেকে ভগ্নিপতি আমায় দূর-দূর করছে।
সাথে সাথে ইভাও বলে উঠল : হ্যাঁ মামা, তুমি ফট করে চলে যাবে না। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে চলে এসো আমাদের বাড়িতে।
: না মা। সেটা আরেকবার হবে। এবার নয়। এখানে আমি আরো কদিন আছি। আর ওই রেস্ট হাউসেই আছি। আশা করি, শেরিফ সাহেব এ ব্যাপারে অমত করবেন না। কেই-বা চায় তার অতীত নিয়ে প্রশ্ন উঠুক। সন্দেহ সৃষ্টি হোক।
ম্যাকনেয়ার অবাক হয়ে বলল : শেরিফের অতীত নিয়ে প্রশ্ন? তুমি কি ভাবছ, সেগুলো দিয়ে তুমি তাকে ঘায়েল করতে পারবে। আমরা যেমন তেমনি আদালতের সাদা চামড়ার লোকেরাও এই নেটিভগুলোকে মানুষ বলে গণ্য করে না।
: আমি নেটিভদের কথা বলছি না। ওদের ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করবে– থানা, কোর্ট-কাছারি, সরকার কারো ওপর ভরসা করবে না। শেরিফ সাহেব সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলোর কথা বলছি, তা ইংলিশম্যানদের কেন্দ্র করেই। রেস্ট হাউস থেকে আমি বিতাড়িত হলে যে প্রশ্নগুলো আমার মনে জেগেছে, তা যে আবার নতুন করে উঠবে না, সেটা কে বলতে পারে? অবশ্য আমি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পত্রিকায় ছাপতে ইচ্ছুক নই।
ম্যাকনেয়ার হালকা করে শ্বাস ফেলল। বলল : তোমাকে আমি চিনি। তুমি একাজ করতে পার না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করবে না যাতে তোমার বোন অ্যান আর আমার, মানে আমাদের পরিবারের ক্ষতি হয়।
জন হেনরি বলল : আশা করি, আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না। তবে আপনারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের ঘণ্টা যেন না বাজান।
এবার অ্যান ধমক দিল। বলল : টেবিলে খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। আর তোমরা কথার গরম ছড়িয়ে চলছ। খাবারে হাত লাগাও।
ইভা হেনরির কানে কানে বলল : তুমি পাপার সাথে এত কথা বলছ যে আমি ছবিটা দেখানোর সুযোগই পাচ্ছি না।
হেনরি ফিস ফিস করে বলল: এখনি দেখাবে।
ইভা বলল : না ভেবেছিলাম, ডিনারের আগে দেখাব। এখন ডিনার শেষ করে আমার ঘরে এসো। তখন দেখাব।
অ্যান বলল : মামা-ভাগ্নি চুপি চুপি কী কথা হচ্ছে?
হেনরি বলল : ষড়যন্ত্র হচ্ছে।
অ্যান বলল : আবার ষড়যন্ত্র।
হেনরি কথা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিল ইভা। বলল : আমরা কাল বেড়াতে বেরুবো। বদ্ধঘরে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছি। সমর্থন করল অ্যান। বলল : ইভা এখানে আসার পর ওকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়নি। ওকে এলাকাটা দেখানোও হয়নি। ম্যাকনেয়ার, কাল ওরা বেরুতে চাইছে, যাক না।

ম্যাকনেয়ার জিজ্ঞেস করল : কে কে?
ইভা বলল : আমি। মামা।
অ্যান বলল : আমিও যাব। কাছে ধারে যে বনটা আছে। আর তোমাদের বিখ্যাত পাঁচপীরতলা।
ম্যাকনেয়ার বলল : ঠিক আছে। আজ রাতেই টমটম গাড়িকে বলে দেব। সকালেই রওনা দেবে তো?
অ্যান বলল : হ্যাঁ। কাল তুমিও চলো না আমাদের সাথে।
সাথে সাথে সমর্থন করল ইভা। বলল : হ্যাঁ পাপা। কতদিন তোমাকে কাছে পাই না। চলো না পাপা। খুব মজা হবে।
ম্যাকনেয়ার আমতা আমতা করে বলল : শেরিফ সাহেব আমাকে একটা দিনের জন্যও ছাড়বেন না।
অ্যান বিলোল কটাক্ষে বলল : শেরিফকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।
ম্যাকনেয়ারের চোখ চকচকে হয়ে উঠল। বলল : তুমি বলছ? আচ্ছা ঠিক আছে। আমারও একদিন একটু রেস্ট দরকার। কুটির টেনশন থেকে মুক্ত থাকা দরকার।
অ্যান তেরছা চোখে ম্যাকনেয়ারকে দেখল। বলল, ওই টমটমটা চালায় কে?
ম্যাকনেয়ার বলল, চুন্নু নামের এক সহিস।
অ্যান বলল, ওইসব চুন্নু-ফুন্নু দিয়ে হবে না। কাল টমটম চালাবে রইস খান।
ইভা লাফিয়ে উঠল, দারুণ মজা হবে।
জন হেনরি তেরছাভাবে অ্যানকে দেখল। অ্যান এটা আবার কী খেলায় নেমেছে।
ম্যাকনেয়ারের চোখে সন্দেহের ছায়া। সে শক্ত দৃষ্টিতে তাকান অ্যানের দিকে। বলল, চালাবে তো টমটম। রইস খানকে কি দরকার। অ্যান গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আজ সকালে সে তোমার সঙ্গে যে বেয়াদবি করেছে। তা তুমি মেনে নিতে

পার, আমার সহ্য হচ্ছে না। সকালেই ওর শাস্তি পাওনা হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আমার মনে হয়েছে, আমার দিকেও ওর নজরটা ভালো না। ওকে শায়েস্তা করতে হবে। আর সেটা করবে তুমি, আমি চাই।
সন্দেহের ছায়া সরে গেল ম্যাকনেয়ারের মুখ থেকে। হেনরি মুখ টিপে হাসল। ইভার মুখ কালো।
ম্যাকনেয়ার বলল, কিন্তু ও তো শেরিফ সাহেবের খাস লোক। অ্যান বলল, সেটার ব্যবস্থাও করব আমি। তুমি খাওয়ার-দাওয়ার পরই ওকে জানিয়ে দাও, কাল সকালে আমাদের টমটম চালাবে সে। সে নিজেই আমার নাম বলে আজ রাতেই শেরিফের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেবে।
ম্যাকনেয়ার হেসে বলল, মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করেই নীলকুঠিটা চালানো দরকার ছিল।

ডিনার শেষে জন হেনরিকে নিয়ে ইভা তার রুমে গেল। ম্যাকনেয়ার বৈঠকখানায় বসে তার আরদালিকে ডেকে কালকের কর্মসূচি বুঝিয়ে দিল। তারপর ফিরে এলো নিজেদের বেডরুমে। অ্যান ডেসিং টেবিলের সামনে রাতের প্রসাধন করছে। ম্যাকনেয়ারকে দেখে ডাকল, হ্যাই ডার্লিং।
ম্যাকনেয়ারের কাছে অ্যানকে আজ উচ্ছল আর তরুণী মনে হচ্ছে।
অ্যান লাস্যময়ী ভঙ্গিতে ছন্দময় হাঁটায় ম্যাকনেয়ারের কাছে এলো। জড়িয়ে ধরল তাকে। আলতো করে চুমু খেল। পিঠে হাত পড়তেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ম্যাকনেয়ার। আঁতকে উঠল অ্যান। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল পিঠ। জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? পিঠে কোনো সমস্যা?
ম্যাকনেয়ার সংক্ষেপ জবাব দিল, হ্যাঁ।
সালামত মিয়া সব সাহেবকেই বেদম পিটিয়েছে। তার গায়ে হাত তোলার সুযোগ পায়নি। কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসার সময় লাঠির একটা ঘা ঠিকই তার পিঠে পড়ে।
ব্যথাটা টের পাচ্ছে এখন। সে শার্ট খুলে ফেলল। তার খোলা পিঠের দিকে তাকিয়েই মৃদু আর্তনাদ করে উঠল অ্যান।
পিঠের জায়গাটা জখম হয়ে কালচে লাল হয়ে উঠেছে। অ্যান ম্যাকনেয়ারের হাত ধরে টেনে এনে বিছানায় বসাল। এমন জখম কিভাবে হয়। তা জানতে চাইল। ম্যাকনেয়ার সংক্ষেপে সকালের ঘটনা জানাল।
অ্যান মৃদু ভর্ৎসনা করল: এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তুমি যাও কেন? লোকজন পাঠিয়ে দিলেই হয়।
সে আলমারি খুলে ব্যথানাশক মলম নিয়ে এলো। ম্যাকনেয়ারকে বিছানার ওপর উপুড় করে শুইয়ে মলমটা পরম যত্নে লাগিয়ে দিল।
আরাম হলো ম্যাকনেয়ারের। সে চিৎ হয়ে শুলো। অ্যানের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।
বুঝতে পেরে অ্যান বলল: হাসছ যে?
ম্যাকনেয়ার গভীর কণ্ঠে বলল: তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। আমাকে নিয়ে ভাব। টেনশন কর। ভালোবাস।
অ্যান আহ্লাদি কণ্ঠে বলল: তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালোবাসব?
ম্যাকনেয়ার দুষ্টুমির হাসিতে বলল: কেন? কোনো নেটিভকে?
অ্যান ম্যাকনেয়ারের বুকে ছোট কিল দিয়ে বলল: ওরা কি ভালোবাসার যোগ্য?
ম্যাকনেয়ার বলল: আজ তোমাকে কমবয়েসী তরুণী লাগছে। সেক্সি।
ম্যানের দুই হাতের কিল পড়ল ম্যাকনেয়ারের লোমশ বুকে।
বলল: অসভ্যতা করো না।
ম্যাকনেয়ার অ্যানকে হালকা টান দিতেই সে তার বুকের ওপর পড়ে গেল।
ম্যাকনেয়ার জড়িয়ে ধরল।
বাহুবন্ধনের এই পেষ্টনে শিহরিত হয়ে উঠল অ্যান।

সকালেই ম্যানেজারের বাংলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টমটম গাড়ি। সহিস রইস খান। ম্যানেজার সাহেবের আরদালি শম্ভুনাথ খুব তৎপর। তার খবরদারিতে প্রয়োজনীয় মাল-সামান উঠছে গাড়িতে। শুকনো খাবার-দাবার, ফলমূলও।
রেস্ট হাউস থেকে এসে পড়েছে জন হেনরি। সে ওপরে উঠে গেল। তারই হাত ধরে নিচে নামল ইভা। রইস খানকে দেখেই তার মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। উল্লাসে ডেকে উঠল: রইস খান। তোমাকে সাথে নিয়ে আজ বেড়াব। আর বেড়াব। সারাদিন। তুমি ঘোড়া চালাতে জান। টমটম চালাতেও পার কি?
রইস খান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।
ইভা বলল: পাপা-ম্যাম আসছে। আমি গাড়িতে উঠে যাই।
সে গাড়ির পাদানিতে পা রাখল।
রইস খান বলল: একটু দাঁড়াও। পাদানিগুলো তোমার তুলনায় উঁচু। আমি তোমাকে সাহায্য করছি।
রইস খান এসে ইভার কোমর ধরল। প্রায় শূন্যে উড়িয়ে তাকে তুলে দিল গাড়িতে। ইভা হাততালি দিল বেশ মজাতো। তোমাকে ধন্যবাদ রইস খান। হেনরিকে বলল: মামা, তুমি উঠবে না?
হেনরি বলল: উঠব তো অবশ্যই। আগে তোমার ম্যাম আর পাপা এসে নিক।
এসে গেল ম্যাকনেয়ার ও অ্যান। অ্যানকে অপূর্ব লাগছে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হেনরি হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল। তার পাশ দিয়ে হাসিমুখে যেতে যেতে অ্যান চোখ টিপল।
গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাকনেয়ার। বলল: আরে, এ গাড়ির পাদানিটা বেশ উঁচু। সহিস কোথায়? রইস খান এসে দাঁড়াল সামনে। তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাকনেয়ার। বলল: দাঁড়িয়ে থাকলেই তো হবে না। আমার ওঠার ব্যবস্থা করো।
রইস খান ঠিক বুঝে উঠতে পারল না তাকে কী করতে হবে। ম্যাকনেয়ার তাচ্ছিল্যের সাথে বলল: প্রধান সহিস হয়েছ, গাড়িতে তোলার বুদ্ধি পাচ্ছ না? গর্দভ কোথাকার। হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসো। আমি তোমার পিঠে পা দিয়ে উঠব। রইস খান ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। এখনি কি সে চাকরি ছেড়ে চলে যাবে? ঠিক বুঝতে পারছে না। এমন করা ঠিক হবে না। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আরো কদিনের জন্য অন্যায় আদেশগুলো মুখ বুজে মেনে নিতে হবে।
সে ম্যাকনেয়ারের নির্দেশ মতো গাড়ির পাদানির পাশে হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিল।
ম্যাকনেয়ার সন্তুষ্ট হলো না। বলল: না। এভাবে হবে না। তোর গায়ে জামা। জামায় পা দিলে পা পিছলে যেতে পারে। জামা খোল। রইস খান তার গায়ের জামা খুলে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর আবার হামাগুড়ি দিল।
ম্যাকনেয়ার তার খোলা পিঠে তার বুট জুতা পরা পা রাখল। জুতা দিয়ে পিঠটা মুচড়ে দিল। উঠে গেল গাড়িতে। এগিয়ে এলো অ্যান। নাকে রুমাল। রইস খানকে দেখে বলল: এহ রে! কী নোংরা পিঠ। এখানে আমি পা দিয়ে জুতা নোংরা করতে পারব না।
রইস খান মাটির ওপর সিধা হয়ে বসল।
ম্যানেজার সাহেব কাল রাতে যখন টমটম চালানোর জন্য সহিস হিসাবে তাকে চেয়েছে, তখনি সে জানত আজ তার কপালে ঝামেলা লেখা আছে। কিন্তু ঝামেলার চেহারা যে এমন হবে, সেটা তার জানা ছিল না।
সাহেবের মতো কড়া মেজাজে নেই অ্যান। বরং কণ্ঠস্বরটা নরম।
বলল: রইস খান, তুমি বরং তোমার হাতদুটো পাত। ওতেই পা দিয়ে আমি গাড়িতে উঠে যাব। এ আরেক আজব সাধ। রইস খান তার দুটো হাতের তালু জোড় করে পাতল। তার ওপর বাম পা টা তুলে দিল অ্যান। ডান পাটা তুলতে

গিয়েই সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। পড়ে গেল রইস খানের বুকে। খামচে ধরল তার পিঠ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রইস খান। গাড়ি থেকে গর্জে উঠল ম্যাকনেয়ার: ব্যাটা বদমাশ! শয়তান!
রইস খান নিজেকে সামলে নিতে না নিতেই অ্যান পাদানিতে পা দিয়ে উঠে গেল গাড়িতে। আর সাথে সাথে ম্যাকনেয়ারের হাতের চাবুক সপাং সপাং করে এসে পড়ল রইস খানের নগ্ন পিঠে।
রইস খান ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহ্য করল। জন হেনরি এসে ওকে জড়িয়ে দাঁড় করাল। ফিস ফিস করে বলল: আমি তোমার বুকে বুক মিলিয়ে গাড়িতে উঠছি। হেনরি গাড়িতে উঠল। রইস খান সবার আড়ালে তিক্ত হাসল।

৮.

শ্রীহরি রায় চণ্ডীপুরের জমিদার। একজন শক্তিসাধক। মাথায় পাগড়ি। পরনে ধুতি। পায়ে খড়ম। এই তার বেশভুষা। ধুতির একটা প্রান্ত দিয়ে সারা শরীর ঢাকা।
শ্রীহরি রায়েরও নীলের আবাদ ছিল। ছিল নীলকুঠি। তার ফুলবাড়ী নীলকুঠি জবরদখল করে নেয় উইলিয়াম শেরিফ। কুঠি দখল করে নিলেও এলাকাটার জমিদারি শ্রীহরিরই ছিল। তার অনুগত প্রজারা শেরিফের হুকুমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম।
চারপাশের অবস্থা যখন উত্তপ্ত, তখন শেরিফ শ্রীহরি রায়ের সাথে আপস-মীমাংসা করে ফেলার তাগিদ বোধ করল। শ্রীহরি রায়কে আলোচনায় ডেকে আনার জন্য ষোল ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিল।
শেরিফের আস্তানায় খুব সমাদর করে শ্রীহরি রায়কে অভ্যর্থনা জানানো হলো। কিন্তু আলোচনার টেবিলে দেখা গেল শেরিফ তার নিজ নীল রক্তের কথা ভুলে যায়নি মোটেও। শাসকের কণ্ঠেই সে কথা বলল : আপনার জমিদারির ভেতর আপনারই প্রজারা ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছে। এ অবস্থায় আপনাকে তো চুপ থাকলে চলবে না। আপনাকে নিজে হস্তক্ষেপ করে এসব বন্ধ করতে হবে। না হলে ব্যাপারটা ছোটলাট পর্যন্ত গড়াবে। এতে আপনার জমিদারিরই ক্ষতি হবে।
শ্রীহরি রায় স্বল্পভাষী। কথা বলে মেপে মেপে। বলল : আমি প্রজাদের কাছ থেকে লাটের খাজনা আদায় করে দিই মাত্র। এ ছাড়া তাদের ওপর আমার আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব তো আপনারই। তাদের প্রতিদিনকার কাজকর্ম, আচার-আচরণ-ব্যবহার সব আপনাদের হুকুমেই চলে। ওরা যদি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করে, তাতে আমার করার কী আছে? এ জন্য আমি দায়ী নই।
শ্রীহরি রায়ের এমন এক জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। উপস্থিত সবাই হতবাক। গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলল : আপনার ভুল হচ্ছে বাবু।
শ্রীহরি রায় তার দিকে দৃষ্টি রেখে বলল : আমার নয়, তোমাদের সাহেবের ভুল হচ্ছে হে।
মাথা গরম হয়ে গেল শেরিফের। রেগে-মেগে সে বলল : তুমি কোথায় বসে কথা বলছ, তা কি তোমার মনে রয়েছে?
শ্রীহরি হেসে জবাব দিল : আছে! আছে! আপনারা আমার কাছে কী চান সাহেব?
শেরিফ ধীর কণ্ঠে বলল : ফুলবাড়ী তরফ আমাকে ইজারা দিতে হবে। সেখানকার প্রজাদের শান্ত করতে হবে।
সেখানে উপস্থিত ছিল ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার। আদেশের সুরে সে বলল : এখানে বসেই সব করে দিয়ে যেতে হবে। তা যদি না কর, তাহলে তুমি জমিদারি ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথায় যেতে চাও, সেটাও এখানেই ঠিক করে নাও।
শ্রীহরি বসেছিল একটা চৌকির ওপর। পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। সে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : আর ক'দিনই বা আছ ম্যাক, এই সামান্য ক'দিনের জন্য আর ইজারার প্রয়োজন কী?
জবাব শুনে পিত্তি জ্বলে গেল ম্যাকনেয়ারের। সে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরল শ্রীহরি রায়ের।
সঙ্গে সঙ্গে সবাই এগিয়ে এসে ম্যাকনেয়ারকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।
আলোচনার এখানেই ইতি।
শ্রীহরি রায় উঠে দাঁড়াল। মাথা থেকে খুলে ফেলল তার ইজ্জতের পাগড়ি। কোমরে বাঁধল। গনগনে আগুনে চোখ নিয়ে তাকাল শেরিফের দিকে।
দৃঢ়কণ্ঠে বলল : জেনে রাখ সাহেব, এই আমি শপথ করছি, যেদিন আমি নিজের হাতে এ দেশের কুঠিগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারব, সেদিনই আমার এ পাগড়ি কোমর থেকে খুলে আবার মাথায় বাঁধব। এর আগে নয়।
শ্রীহরি রায় শেরিফের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে দিয়ে সোজা চলে যায় মথুরানাথ আচার্যের বাড়িতে।
মথুরানাথ আচার্য সাধুহাটির জমিদার ও নীল ব্যবসায়ী। ঝিনাইদহের পূর্বে পথহাটির জমিদার দিকপতি মজুমদার এবং সাধুহাটির পাশে আশুতোষ গাঙ্গুলির সঙ্গে সে পৃথক পৃথক যৌথ মালিকানায় নীলকুঠি স্থাপন করে এবং নীল ব্যবসা শুরু করে।
এ ছাড়া তার নিজের নীল চাষ ও নীলকুঠি ছিল। ম্যানেজার রেখেছিল এক সাহেবকে।
নীল চাষ আর কুঠি স্থাপন নিয়ে তার আর দিকপতি মজুমদারের সঙ্গে ম্যাকনেয়ারের বিবাদ ছিল। এর মধ্যে ম্যাকনেয়ার তাদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছিল। উৎপীড়ন চালিয়েছিল।
ইংরেজদের সিন্দুরিয়া ও মথুরানাথের সাধুহাটির নীলকুঠির দূরত্ব বেশি নয়। নবগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে সিন্দুরিয়া কনসার্ন এবং পূর্ব তীরে এনায়েতপুরের মাঠ। এ মাঠে মথুরানাথ আচার্যদের উন্নত জাতের নীল গাছ উৎপন্ন হয়। শেরিফ গায়ের জোরে মাঠটি দখল করে নেয়। এটাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ বানায়। মাঠে ঘোড়াদের ছোটাছুটি আর সাহেবদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ আচার্যদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজ কনসার্নের পাশেই দেশি বাবুদের কুঠি সাহেবদেরও মাথাব্যথার কারণ। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যেই ছিল ক্ষোভ। শুরুতে এ নিয়ে দুই পক্ষের পাইক-পেয়াদারদের বাদানুবাদ, ঝগড়াঝাঁটি হতো। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমে ক্রমে হানাহানির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।
পথহাটির জমিদার দিকপতি মজুমদারও সাহেবদের ওপর চটা আর বড় ভাই গণপতি মজুমদারও শ্রীহরি রায়ের মতোই ইংরেজদের অপমানের শিকার হয়।
পোড়াহাটি মৌজার দখল ও সেখানে নীলকুঠি স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে শেরিফ গণপতি মজুমদারকেও সিন্দুরিয়া নীলকুঠিতে ডেকে আনে। আলোচনা চলে চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। এক পর্যায়ে ম্যাকনেয়ার গণপতির সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। গণপতি উত্তেজিত হয়ে মুঠো পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যাকনেয়ারের ওপর।
এ অপরাধে গণপতিকে বন্দি করা হয় এবং মলমূত্রভর্তি এক কামরায় বারো দিন অভুক্ত অবস্থায় আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়।
এরপরই ঘটল শ্রীহরি রায়ের ঘটনা।
শ্রীহরি রায় এদের জিজ্ঞেস করে : আমরাও তো নীল চাষের নামে আমাদের দেশেরই কৃষকদের সর্বনাশ করছি। আর কতকাল ফিরিঙ্গিদের মতো আমরাও দেশের লোকদের সর্বনাশ করব?
তিন জমিদার ইংরেজ সাহেবদের বিরুদ্ধে জোট করল। তারা ঠিক করল সংগ্রামী কৃষক-জনতাকে এ কাজে ব্যবহার করা হবে। এ জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।
আয়োজন শুরু হলো। পোতাহাটির নেপাল বিশ্বাসের বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হলো। দাওয়াত দেয়া হলো কৃষক যোদ্ধাদের।
কৌশলে তাদের এ বৈঠকে সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া হলো। খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হওয়ার পর শুরু হলো আলাপ-আলোচনা।
জমিদার তিনজনের পক্ষ থেকে কৃষকদের আশ্বাস দেয়া হলো : জমিদাররা কৃষকদের আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করে। এ জন্য সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা জমিদাররা দেবে। আর কৃষকরা যদি সিন্দুরিয়া নীলকুঠি আক্রমণ করে, তাহলে তাদের সাহায্য করার জন্য জমিদাররা তাদের লেঠেল বাহিনী পাঠিয়ে দেবে এবং এর পুরো দায়দায়িত্ব জমিদাররা বহন করবে। কৃষকরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখে তাদের পরামর্শ করা হয়ে গেল।
তারা জানাল, জমিদারবাবুরা সাহায্যের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছে, এ জন্য জমিদারদের ধন্যবাদ। তবে তাদের কোনো সাহায্য কৃষক যোদ্ধারা নেবে না।

কৃষকদের পরিষ্কার দাবি, জমিদারদের নীল চাষ তুলে দিয়ে তাদের নীলকুঠিগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। এ ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

৯.

কৃষকদের ওপর শেরিফ আর ম্যাকনেয়ার যেমন জুলুম চালায়, তার চেয়েও বাড়া হলো তার কর্মচারী আর অনুচররা। জুলুম, নির্যাতন আর অবিচারের মধ্য দিয়েই কৃষকদের জীবন কাটছে কায়ক্লেশে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ প্রতিবাদ করছে। কেউ মরিয়া হয়ে উঠছে।

ওদিকে সবার অগোচরে সংঘবদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবীরা। যোদ্ধা কৃষকরা। দিন দিন বাড়ছে তাদের সংখ্যা। শেরিফের বাথান আর গরুর রাখালরা সন্ধ্যায় বেরোয় গরুর পাল নিয়ে, গরুগুলোকে পেটভর্তি খাইয়ে নেয়ার জন্য।

গরুগুলোকে ছেড়ে দেয় কৃষকদের জমিতে। তাদের মাঠের ছোলা আর মসুর জাতীয় রবিশস্য খাওয়ায়।

এ নিয়ে কারো প্রতিবাদ করার সাহস নেই। কুঠিয়ালের ভয়ে। বাসের মণ্ডলের বাস এ গাঁয়েই। তাকেও এ ধরনের উৎপাতের শিকার হতে হয়েছে।

তার স্ত্রী চিনি বিবি। কুঠিয়ালের লোকদের কাণ্ড-কারখানা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। এর শোধ নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলে। এক রাতে সে পুরুষের বেশ নেয়। হাতে তুলে নেয় শক্ত-পোক্ত লাঠি। তারপর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। একাই।

রাখালরা খুব আনন্দে আছে। কোনো মেহনত নেই। গোয়ালঘর থেকে গরুগুলো নিয়ে এসে ছেড়ে দাও কৃষকের মাঠে। তারপর নিজেরা ফুর্তি কর। আনন্দ কর। জুয়া খেল। কৃষকের ক্ষেতে আখ থাকলে ভেঙে ভেঙে খাও।

তাদের ওপর যে কেউ হামলা চালাতে পারে, ধারণাতেই নেই তাদের। হঠাৎ কোত্থেকে যেন আজরাইল এসে পড়ল তাদের ওপর। আচমকা লাঠির আঘাত। প্রতিরোধ করার সময়ই পেল না। আঘাতের পর আঘাত। কারো মাথা ফাটল। কারো ঠ্যাং ভাঙল। কেউ পিঠের যন্ত্রণায় কাতর। কারো কোমরটা বুঝি গেল। সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। পালিয়ে বাঁচল সবাই। মাঠে পড়ে রইল গরুগুলো। সব গরু নিয়ে গায়ে চলে এলো চিনি বিবি।

রাতারাতিই তিনটে তাগড়া গরু জবাই হলো। গোশত বিলিয়ে দেয়া হলো ঘরে ঘরে।

কেউ টেরই পেল না কাজটা কার। কাজটা যে কোনো পুরুষের নয়, এক সাহসী মহিলা করেছে– এটা কুঠির লোকেরাও বুঝতে পারেনি। কুঠি থেকে এ নিয়ে মামলা হলো। গায়ে পুলিশ এলো। গায়ের লোকেরা হয়রানি-হেনস্তাও কম হলো না। কিন্তু কাজটা যে কে বা কারা করল, তার রহস্য বের করা গেল না।

শেরিফ কুঠিয়াল। তার স্বার্থের জন্য সে যা করার করে। তার চাইতেও বেশি করে তার ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার। তাকে একটা শক্ত উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। ভারতবাসীরা কেউ কেউ হয়তো তাদের চামচাগিরি করে। কিন্তু ভারতীয় কৃষকরা লড়াকু। সেটা জানান দেবে।

পরিকল্পনা আঁটা হয়।

পরিকল্পনামতো কুতুবপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে অপেক্ষা করতে থাকে একদল যুবক।

ম্যাকনেয়ার আসছে। ঘোলদাড়ি থেকে এ পথে আসছে সিন্দুরিয়ায়। পাক্কা খবর।

কুঠির কর্মচারীদরে কাছ থেকে গোপন খবর পৌঁছেছে ওয়াসিম বিশ্বাসের কাছে।

আর ম্যাকনেয়ারের একটা ব্যবস্থা করার জন্য ওয়াসিম বিশ্বাস পাঠিয়েছে এই যুবক দলকে। ওরা এসে অপেক্ষা করছে এখানে।

ম্যাকনেয়ারের পাপের ভাঁড়ার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার অন্যায় আর অপরাধের শেষ নেই। এবার এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। যুবকদের চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন।

এই তো কিছু দিন আগেও একজনকে খুন করেছে কুঠিয়ালের পাইক-বরকন্দাজরা।

মথুরানাথের প্রজা কালু মণ্ডল। যাচ্ছিল সিন্দুরিয়া। পথে পড়ে সিন্দুরিয়া নীলকুঠি।

কুঠির পাহারাদার হেঁকে উঠল : কে? কে যায় রে?

কালু মণ্ডল সরল মনে জবাব দিল : আমি। কালু মণ্ডল।

পাহারাদারের প্রশ্ন আবারও : কালু? কে কালু মণ্ডল? কোথা থেকে এসেছ? যাচ্ছ কোথায়?

কালু মণ্ডল বিরক্ত হয়ে বলল : এ তো দেখছি প্রশ্নের পাহাড়! তাহলে শোনো। আমি থাকি সাধুহাটিতে। যাচ্ছি সিন্দুরিয়া।

: মানে জমিদার মথুরানাথ মজুমদারের প্রজা? কী নাম বললে? কালু মণ্ডল? তুমিই তো মথুরানাথের পেয়ারা খাস প্রজা।

শেরিফের পেয়াদারা ধরে ফেলল কালু মণ্ডলকে। সবাই মিলে তাকে পেটাতে লাগল। পেটাতে পেটাতে মেরেই ফেলল।

গ্রামের লোকেরাই উদ্ধার করে কালু মণ্ডলের লাশ। লাশ চলে আসে গ্রামে। সুবিদ মণ্ডলের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা তার লাশ খাটিয়ায় তুলল। ঘুরে বেড়াল ৫০-৬০টি গ্রাম।

কালু মণ্ডলের লাশ যে-ই দেখে আর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শোনে তার ভেতরেই শেরিফের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ।

বিক্ষুব্ধ প্রজারা এসে ধরনা দিল জমিদার মথুরানাথ আচার্যের কাছে। এর একটা বিহিত করতে হবে। করতেই হবে। মথুরানাথকে বার বার অনুরোধ করা হয়।

কুতুবপুর গ্রামের ওয়াসিম বিশ্বাসের সঙ্গে মথুরানাথের ভাব ছিল। দুজনে পরামর্শ করল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, ঘোলদাড়ি যাওয়ার পথে শেরিফের ম্যানেজার ম্যাকনেয়ারকে ধরে হত্যা করা হবে।

উইলিয়াম শেরিফের কানে গিয়ে পৌঁছল এ খবর। ঘোলদাড়ি গ্রামের প্রজারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘোলদাড়ি প্রজাদের বিদ্রোহ সামাল দিতে শেরিফ ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার ও তার সহকারী নলিনাক্ষ মিত্রকে নিয়ে সেখানে গেল। বৃষ্টি-বাদলার দিন। প্রবল বৃষ্টিতে শেরিফ পালকিতে চড়ে সিন্দুরিয়ায় চলে এলো। রয়ে গেল ম্যাকনেয়ার ও নলিনাক্ষ মিত্র। দুদিন পর শেরিফ খবর পাঠাল, শেরিফের ঘোড়া নীল ঘোড়া নিয়ে ম্যাকনেয়ার যেন ফিরে আসে সিন্দুরিয়ায়।

এই পাকা খবর ওয়াসিম বিশ্বাসের কাছে পৌঁছে গেল। সে যুদ্ধবাজ যুবকদের পাঠিয়ে দেয় কুতুবপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে, সিন্দুরিয়ায় যাওয়ার রাস্তা পাহারা দিতে।

যুবকরা সারা দিন সেখানে অপেক্ষা করল। ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা। ম্যাকনেয়ারের পাত্তা নেই। যুবকরা ভাবল, শিকার আর আসবে না। বোধ হয় এখন ফিরে যাওয়াই ভালো।

ওরা ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখনই ভেসে এলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

সচকিত হয়ে উঠল যুবক দল।

পুকুরের উত্তরে রাস্তার দুপাশে শেওড়া গাছের সঙ্গে বাঁধা হলো মোটা ও শক্ত দড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী সেখানে পৌঁছে গেল। যুবকরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে ক্ষুরধ্বনি।

হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ।

ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারি দড়িতে ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়েছে। যুবকদল পতনের আওয়াজ শুনল।

তারা বর্শা, বল্লম, লাঠিসোঁটা, রামদা, ভোজালি হাতে রে-রে করে ছুটে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়ল অশ্বারোহীর ওপর।

আহত অশ্বারোহী আবার আর্তনাদ করে উঠল; হা ভগবান! যুবকরা থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালানো হলো আলো। ওরা দেখল, ম্যাকনেয়ার নয়। নিচে আহত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে নলিনাক্ষ মিত্র।

যুবকরা বলল : যাহ! এ দফায় ম্যাকনেয়ার বেঁচে গেল। এই ব্যাটা নীল সাহেবের গোলাম, তোর সাহেব হারামজাদাকে বলে দিস, তাকে পেলে আমরা মারব না, পেটাবও না জ্যান্ত কবর দেব।

যুবক দল ঘোড়ায় চেপে স্থানত্যাগ করল। নলিনাক্ষ একা সেখানে পড়ে থেকে নিজের নিয়তিকে ধিক্কার দিতে লাগল।

আবার কুতুবপুর। এখানে কিছু দিন আগে নীল-দাঙ্গা হয়েছে। আসামিদের ধরে দলে দলে চালান দিতে হবে।

যশোর থেকে এসেছে শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। সাথে একদল পুলিশ। আসামি কারা সঠিক জানা নেই তাদের। অকুস্থলে এসেছে দারোগাবাবু। পথে খুব ঝক্কি গিয়েছে। বিশ-বাইশ ক্রোশ পথ তাকে পায়ে হেঁটেই আসতে হয়েছে।

এমনিতে বর্ষার মৌসুম। পথঘাট কাদায় মাখামাখি। এ কাদাপথ ভেঙেই সে সদলবলে কুতুবপুরে এসে যখন পৌঁছাল তখন রাত দশটা। পাড়াগাঁয়ের রাত দশটা মানে অনেক রাত। চারপাশে নিঃসাড় প্রকৃতি।

দারোগাবাবু এসে পৌঁছাল ওয়াসিম বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। সম্পন্ন গৃহস্থ। দেখেই বোঝা যায়। রাতের আশ্রয় হয়তো জুটবে এখানেই। সকালবেলায় তদন্তের ব্যাপারটা দেখা যাবে। দুর্গাদাস লাহিড়ী নিষ্ঠাবান হিন্দু। যত রাতই হোক আর খিদেয় যতই পেট চো চো করুক, বাছবিচার না করে সে জাতপাত হারাতে রাজি নয়। ওয়াসিম বিশ্বাস এত রাতে মেহমান দেখে দ্বিরুক্তি করল না। বিরক্তও হলো না। সাদরে গ্রহণ করল পুলিশ দলকে।

সে টের পেয়ে গিয়েছে পুলিশ দলের রাতদুপুরে এমন হঠাৎ গায়ে আগমন কেন।

ওয়াসিম বিশ্বাস কৃষক বিদ্রোহের এক নেতা। দারোগাবাবু তারই দুশমন। তাই বলে এত রাতে মেহমানকে দূরে ঠেলে দেয়া যায় না। সে ক্ষুধার্ত দারোগাবাবুকে চারটে কিছু মুখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু দারোগাবাবু কিছুই মুখে তুলবে না। অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে দারোগাবাবু বলল : এত করে যখন বলছেন, তখন কিছু মুখে না তুললে গৃহস্থের যেমন অকল্যাণ তেমনি অতিথিরও। যদি সদ্য ভাজা খই আর কুয়োর জল হয় তাহলে তা গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি নেই।

ওয়াসিম বিশ্বাস একটু ভাবল। বলল : ঠিক আছে, তাই হবে। আপনারা একটু বিশ্রাম নিন। আমি আয়োজন দেখছি।

ওয়াসিম বিশ্বাস বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে চলে গেল। পথচলার ক্লান্তিতে পুলিশ দল অবসন্ন। তারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। সবাই পরিচ্ছন্ন বিছানায় গড়িয়ে দিল শরীর। মুহূর্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল দারোগাবাবুও।

কতক্ষণ ঘুম হলো জানা নেই। যখন ঘুম ভাঙল, তখন শেষ রাত। প্রথম ঘুম ভাঙল দারোগাবাবুর। বাইরে একদল লোকের হল্লা। এতেই ঘুম ছুটে গেল। এসেছে শত্রুদের গায়ে। গায়ের লোকেরাই হামলা করে বসল না তো? নাকি ডাকাত পড়েছে বাড়িতে?

দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদের সবাইকে জাগিয়ে তুলল। আদেশ করল সবাইকে প্রস্তুত থাকার জন্য। নিজেও একটা বন্দুক টেনে নিল। এসে দাঁড়াল বাইরে। এমন সময় সদর দরজা খুলে উপস্থিত হলো ওয়াসিম বিশ্বাস।

দারোগাবাবুকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল : বড়বাবু, উঠে পড়েছেন?

দুর্গাদাস লাহিড়ী গৃহস্বামীকে দেখে আশ্বস্ত হলো। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওয়াসিম বিশ্বাসের দিকে। বলল : কী ব্যাপার? ভেতরে এত গোলমাল কেন?

ওয়াসিম বিশ্বাস সবিনয়ে বলল : মাফ করবেন বড়বাবু, একটু দেরি হয়ে গেল। মেয়েরা কিছু খই ভেজেছে। এখন ধান বেছে ফেলছে। আর ছেলেদের দল মিলে একটা কুয়ো কেটেছে। পানির খোলাটা এখনো কাটেনি, একটু সময় লাগবে।

গৃহস্বামীর এ অতিথিপরায়ণতা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল দারোগাবাবু। আবেগাপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরল ওয়াসিম বিশ্বাসকে। বলল : ভাই, ঘোলা কাটাবার প্রয়োজন নাই। তুমি ওই ঘোলা জলই নিয়ে এসো। ওটা জল নয়। ভালোবাসার অমৃত।

সকালবেলায় দুর্গাদাস লাহিড়ী ওয়াসিম বিশ্বাসকে জানাল কুতুবপুরে তার আসার কারণ। আসামিদের নামের একটা তালিকা ওয়াসিম বিশ্বাসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল : এদের হাজির করিয়ে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো। তালিকাটি দেখে মৃদু হাসল ওয়াসিম বিশ্বাস। তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের সবাইকে দারোগাবাবুর সামনে হাজির হওয়ার হুকুম দিল। দশ-বারো জন বলিষ্ঠ জোয়ান এসে উপস্থিত হলো। তাদের সবার গায়ে কাদা-বালি মাখানো। এরাই দারোগাবাবুর জন্য সারা রাত ধরে কুয়ো কেটেছে।

ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বড়

দারোগা শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। তার মুখে কোনো কথা নেই। আপনাতেই তার মাথা নুইয়ে এলো। মাথা নিচু করেই সে বলল : যাও। তোমরা খালাস।

১০.

মথুরানাথের ছেলে অমরনাথ। বৌ আরতি দেবীকে নিয়ে পূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল বোয়ালিয়ায়।

জমিদারবাড়ির ঐতিহ্যবাহী ময়ূরপঙ্খিতে করে বাড়িতে ফিরছিল। নৌকার মাঝি হলো দুই ভাই তারিণী আর রোহিণী পাটনি। দেহরক্ষী ছিল শম্ভু সরদার আর হাজারী সরদার।

রাত তখন সাড়ে দশটা। নৌকা এসে ভিড়েছে সিন্দুরিয়ার নীলকুঠির ঘাটে।

ম্যাকনেয়ারের কাছে খবর পৌঁছাল, মথুরানাথের ছেলে আর ছেলেবৌ নৌকায় করে যাচ্ছে।

ম্যাকনেয়ারের চোখ ধিকিধিকি করে জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেয়ার এই এক উপযুক্ত সময়।

ম্যাকনেয়ারের মনে রয়েছে কুতুবপুরে নলিলাক্ষ মিত্রের জখম হওয়ার ঘটনা। আসলে লক্ষ্য ছিল সে নিজেই। বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছে।

সেদিনের ঘটনার পরপরই ওয়াসিম বিশ্বাস বিহারে পালিয়ে যায়। অনেক দিন পর আবার ফিরে আসে। কুতুবপুরের লোক তার নাম বদলে দেয়। ওয়াসিম বিশ্বাস হয়ে যায় আশরাফ বিশ্বাস। পুরো গাঁয়ের লোকজন সাক্ষ্য দেয়। তাদের গ্রামে ওয়াসিম বিশ্বাস নামে কোনো লোক নেই। ছিলও না।

উইলিয়াম শেরিফ ধুরন্ধর লোক। পাণ্ডা লাগিয়ে মূল ষড়যন্ত্রের নাড়ি-নক্ষত্র সবই বের করে নিয়েছে। তার জানা হয়ে গিয়েছে, ঘটনার পেছনে ছিল মথুরানাথ আচার্য। এটা বুঝতে তার বাকি থাকে না।

শেরিফ ম্যাকনেয়ারকে তলব করে বেশ বকাবকি করেছে। তারপর হুকুম দিয়েছে, যে কোনো মূল্যে এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

আজ এসেছে প্রতিশোধ নেয়ার মওকা।

ম্যাকনেয়ারের আদেশে তার লেঠেল আর বরকন্দাজ বাহিনী ময়ূরপঙ্খি আটক করে। নিয়ে আসে বেড়াই গ্রামের নিচে নদীর চরে।

জমিদারপুত্র অমরনাথ ও মাঝি দুজন টের পেয়েই নৌকার খিড়কির পথ দিয়ে বেরিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। আরতি দেবী টের পায়, কুঠিয়ালের লোকেরা নৌকায় হামলা চালিয়েছে। সেও হুঙ্কার দিয়ে উঠল : ভয় কি শম্ভু। ভয় পেও না হাজারী সরদার। চালাও লাঠি। উপরে ভগবান আছেন।

কিন্তু শম্ভু ভয়ে ভয়ে কাঁপছে। খোদ ম্যাকনেয়ার নৌকায়। শম্ভু ছুটে গিয়ে তার পা জাপটে ধরল। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল : সাহেব, আপনিই আমার মা-বাপ। দোহাই বাবা। আমাকে কিছু করবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। নইলে আমার বৌ-ছেলে ভেসে যাবে। ম্যাকনেয়ার মুচকি হেসে শম্ভুকে ছেড়ে দিল।

আরতি দেবীর আদেশ শুনতে পেয়েছিল হাজারী সরদার। তার সাহসও অপরিসীম। সে ভয়-শঙ্কাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠিয়াল বাহিনীর ওপর। ম্যাকনেয়ারের ওপরও লাঠি চালাতে দ্বিধা করে না। অল্পের জন্য ম্যাকনেয়ারের মাথা বেঁচে যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। হাজারী সরদারের লাঠির ঘায়ে প্রাণ হারায় কুঠিয়ালের দুই লেঠেল গাজন ও সোজন।

যুদ্ধ করতে করতেই জীবন বিসর্জন দেয় হাজারী সরদার।

ম্যাকনেয়ার এসে ধরে আরতি দেবীর শাড়ির আঁচল। আরতি দেবী ঘৃণাভরে তাকাল ম্যাকনেয়ারের দিকে। অভিশাপ দিয়ে বলল : এই পাপের আগুনে সবংশে পুড়ে মরবি।

পরদিন ভোরবেলা।

আরতি দেবীর মৃতদেহ পাওয়া যায় কুঠির ঘাটের পূর্ব পাড়ে সাধুহাটির দিকে যাওয়ার রাস্তার পাশে। তারিণী পাটনির বাড়ির কাছে। বটতলায়

বেতবনের মধ্যে।
মথুরানাথ আচার্যকে লোকজন এসে খবর দিল, ওখানে একটা লাশ পড়ে আছে। মেয়ে লোকের। মেয়ে লোকটি কি আপনাদের বাড়ির বৌ?
মথুরানাথ হ্যাঁ-না কিছুই বলে না। তার চোখে বারুদ জমে। সে নীল চাষ আর নীল ব্যবসা ছেড়ে দেয়। কৃষকদের বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তার চোখের বারুদে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে।

১১.
সন্ধ্যা।
রইস খান আস্তাবলের দিকে যাচ্ছিল।
ঘোড়াগুলোর দেখভাল করা দরকার। আস্তাবল যাওয়ার পথে কাছারি পড়ে। কাছারিতে গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কক্ষ। তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতেই রইস খান দাঁড়িয়ে পড়ল। গোমস্তার কক্ষ থেকে চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।
রইস খান উঠে এলো কাছারির বারান্দায়। গোমস্তার কক্ষের কাছে আসতেই ভয়ার্ত নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : কেগো? কে তুমি বাবা? আমাকে বাঁচাও।
রইস খান এসে দাঁড়াল কক্ষের সামনে। দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তালা দেয়া।
দেখতে পেল জানালাটি খোলা। সেই জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক মেয়ে। চোখে টলটলে পানি। ভয়ের চোটে মুখ শুকিয়ে কাঠ। বিপর্যস্ত চেহারা।
রইস খানকে দেখেই সে হামলে কেঁদে উঠল।
রইস খান এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করল : কেগো মা? কে তুমি? এখানে এলে কী করে?
রইস খানের মুখে মা ডাক শুনে মেয়েটি আরো আকুল হয়ে উঠল। কান্নার উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে গেল পুরো মুখমণ্ডলে। কাঁদতে কাঁদতে বলল : আমার নাম সত্যবতী। বাপের বাড়ি গোপালপুর। বাবার নাম হরিপদ রায়। স্বামী ননী গোপাল। শ্বশুরবাড়ি হলো পাইকপাড়ায়।
সত্যবতী জানাল, সে তার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। বিকালবেলার খানিক আগে তারা কুঠির ঘাটে এসে পৌঁছায়। এ সময় কোথা থেকে যেন কুঠির লোকজন এসে হাজির হয়। তাদের ঘিরে ধরে।
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের বাড়িতে নাকি সাহেবের ঘোড়ার জিন পাওয়া গেছে। এ মিথ্যা অভিযোগে তাদের ধরে আনা হয় কাছারিতে। নির্দয়ভাবে পেটানো হয়।
তার পর থেকে সে এখানে এই ঘরে আটক। তার স্বামীকে কোথায় কোন ঘরে আটকে রাখা হয়েছে জানা নেই। বেঁচে আছে না মেরে ফেলা হয়েছে, নাকি ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কিছুই জানে না সে। সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রইস খান। পুরো ব্যাপারটাই তার বোঝা হয়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনা এখানে আকছারই ঘটছে। কত অসহায় মেয়ের করুণ আর্তনাদের এই কাছারিবাড়িতে রোল উঠেছে, এর পাথুরে মেঝে কত মেয়ের চোখের পানিতে ভিজে উঠেছে, তার হিসাব কে আর রাখতে গেছে!
রইস খান এ কুঠিবাড়িতে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে সময়ের অপেক্ষায়। এসব নিপীড়ন অত্যাচারেও সে কখনো মুখ খোলেনি।
আজ সত্যবতীর কথা ও কান্না তার হৃদয়টাকে গুমরে
তুলছে। এভাবে আর চলে না। এর একটা বিহিত দরকার।
কুঠির গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ তখন একটা কুলগাছের নিচে চেয়ার পেতে বসে আরাম করছে। নগেনবাবু তার কর্মজীবনে কুঠির হয়ে প্রজা ও সাধারণ মানুষদের ওপর অনেক জুলুম করেছে। উপরি কামাই করে বিত্ত বানিয়েছে। তার সহকারী জামান উদ্দিনের সাথে তার পিসির মাখামাখির অধর্ম সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে তার কোনো ধরনের নারী কেলেঙ্কারি নেই। এ ক্ষেত্রে সে সাধু-সাত্ত্বিক।

রইস খান এসে দাঁড়াল নগেনবাবুর সামনে।
ডাকল : বড়বাবু! বড়বাবু তখন চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছে। ডাক শুনে চোখ মেলে তাকাল। সামনে রইস খানকে দেখে জিজ্ঞেস কলর : কী ব্যাপার! কী চাও রইস?
রইস খান অনুনয়ের স্বরে বলল : আপনার কামরায় দেখলাম একটা মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে তো ছেড়ে দিতে হবে বাবু।
রইস খানের কথা শুনে নগেনবাবুর ভ্রু কুঁচকে গেল। সে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে এক লহমায় রইস খানকে জরিপ করে নিল। শান্ত কণ্ঠে বলল : রইস, আমি তোমাকে মন্দ চরিত্রের লোক ভাবী না। কিন্তু তোমার তো জানার কথা আমার হাত-পা বাঁধা। ইচ্ছে থাকলেও আমি কিছু করতে পারি না।
রইস খান অস্থির হয়ে কাতর স্বরে বলল : বেশ আপনি নিজে কিছু না করতে চাইলে ঘরের চাবিটা আমাকে দিন। আমিই ছেড়ে দিচ্ছি। হাজার হলেও হিন্দু ঘরের বৌ তো।
নগেনবাবু মনে মনে ভাবল : লম্পটের কাছে আবার হিন্দু-মুসলিম জাতপাত। সবি ওদের খাওয়া-খাদ্য। এই যে আমার নিষ্ঠাবতী বাল-বিধবা পিসি জামানউদ্দিনের মতো এক ম্লেচ্ছ যবনকে নিয়ে পড়ে অছে। সে কি তার খায়েশ ছেড়েছে, না ধর্ম ছেড়েছে। দুটোই সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সহিসটা বলে কী? সাহেব-বাবুদের খাদ্য সে কেড়ে নেবে? স্পর্ধা তো কম নয়!
রইস খানের দিকে সে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। খানিক পর শান্ত কণ্ঠে বলল : এমন কয়েদখানার চাবি আমি কখনো কি নিজের কাছে রেখে দিতে পারি? ছি-ছি!
রইস খান মুখ তুলে তাকাল। হতাশ কণ্ঠে বলল : মেয়েটির কি বাঁচার কোনো রাস্তাই নেই?
নগেন্দ্রনাথ একটু ভেবে নিয়ে বলল : তুমি বরং হারানবাবুর কাছে যাও।
হারানবাবুর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ সাধু খাঁ। বাড়ি সনাতনপুর গ্রামে। ম্যাকনেয়ার আর নলিনাক্ষের খুব প্রিয়াভাজন।
হারানের বিশ্বস্ত সহকারিণী রাধামণি। সুন্দরী রাধামণি। গবরাপাড়ার। গোমস্তা মহলের আয়া। হারান আর রাধামণি দুজনে মিলে কুঠির সাহেব, বাবুদের আনন্দের জন্য মেয়ে জোগাড় করে। তারা গাঁয়ে গাঁয়ে যায়। এটা-ওটা বলে মেয়েদের ফুসলায়। চাকরি-বাকরি আয়-উপার্জনের লোভ দেখায়। কোনো কিছুতেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে না আনতে পারলে জোর-জারিও খাটায়। এভাবে মেয়েদের নিয়ে আসে। কাজকর্ম সারা হলে উচ্ছিষ্টের মতো ব্যবহৃত মেয়েদের ঠেলে দেয়া হয় মৃত্যুকূপে।
রইস খান যখন হারানের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, হারান তখন ম্যাকনেয়ার সাহেবের সাথে গোপন শলাপরামর্শে ব্যস্ত। রইস খান দরজার কড়া নাড়ল।
হারান দরজা খুলল। দেখতে পেল রইস খান দাঁড়িয়ে আছে। হারান জানে রইস খানকে দু'চোখে দেখতে পারে না ম্যাকনেয়ার। সেও না। বিরক্ত হয়ে বলল : কী হয়েছে? অসভ্যের মতো দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন! কী চাই তোমার?
রইস খান আকুতি জানিয়ে বলল : বাবু, আপনার কাছে কখনো কিছু চাইনি। আজ চাইতে এসেছি। এই আপনার সামনে ভিখেরির মতো হাত পাতছি। যদি মেহেরবানি করেন তো আবেদন জানাই।
হারানের ভুরু কুঁচকে গেল। তেতো গলায় বলল : ব্যাটা খুব সেয়ানা হয়েছ তুমি। আগে-ভাগেই কড়াল করিয়ে নিতে চাইছ। শোনো, কাউকে দয়া দেখানোর জন্য কুঠিতে চাকরি করছি না। ইচ্ছে হলে বলতে পার তোমার কী চাই। কথা রাখা না রাখা আমার ব্যাপার।
রইস খান মাটির দিকে মাথা নুইয়ে সজল কণ্ঠে বলল : বাবু, কাছারিবাড়িতে বড়বাবুর ঘরে যে মা-মণিকে আটকে রেখেছেন দয়া করে তাকে ছেড়ে দিন।

রইস খানের কথা শুনে হারানের চোখ চড়কগাছ। ক্রোধে জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড রাগে শরীর থরথর কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে বলল : ছোট মুখে বড় কথা। এটা তোর আস্তাবল পেয়েছিস? আমাদের ঘোড়া ঠাউরেছিস?
হারান সাথে সাথে ঘরে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এলো চামড়ার তৈরি ম্যাকনেয়ারের হান্টার নিয়ে। সেটা দিয়ে সক্রোধে এলোপাতাড়ি পেটাতে লাগল রইস খানকে। তার সারা শরীর হান্টারের আঘাতে রক্তময় হয়ে উঠল।
হান্টারের মারের মুখে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও রইস খান কাকুতি মিনতি জানিয়ে বলতে লাগল : আমাকে মারুন। কিন্তু খোদার দোহাই, আপনি মা-মণিকে ছেড়ে দিন। তার ইজ্জত নষ্ট করবেন না।
বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রইস খান। ঘটনার সময় কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ম্যাকনেয়ার। হারানকে উৎসাহ দিয়ে আরো মারাল রইস খানকে। অজ্ঞান অবস্থাতেও। রইস খান যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তখন ম্যাকনেয়ার তার মুখে লাথি মেরে উল্লাস প্রকাশ করল। এতে রইস খানের নাক থেঁতলে যায়। রইস খান ওখানেই পড়ে থাকে। ম্যাকনেয়ার ও হারান দরজায় তালা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
রইস খানের জ্ঞান ফেরে পরদিন সকালে। চোখ মেলে তাকিয়ে সে করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে : মা! মাগো!
রইস খান উঠে দাঁড়াল।
তার পা টলছে। মাথা ঘুরছে। রক্তাক্ত দেহ। শতচ্ছিন্ন পরনের কাপড়।
সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল কাছারিবাড়ির দিকে।
কাছারিবাড়ির বন্দিখানায় জেগে ছিল সত্যবতী। সারা রাত তাকে বিরক্ত করে গিয়েছে রাধামণি। নীলকরের দূতি নষ্ট বাঁদি রাধামণি।
রইস খান ভাবছে, কত বড় আকাশ। আকাশের নিচেই আল্লাহর এই জমিন। এই জমিন আজ ইবলিশ নীলকর আর তাদের অনুচরদের দম্ভ পদচারণায় অপবিত্র হয়ে উঠেছে। এই নাপাক জঞ্জাল সরাতে হবে বিপ্লবীদেরই। রাধামণি সত্যবতীর কাছে অনেক ছলাকলার থলে মেলে ধরেছিল। অনেক লোভ দেখিয়েছিল। ভয়ের কথাও বলেছিল। বলেছিল, সত্যবতী সাহেব-বাবুদের মনোরঞ্জন না করলে সমূহ বিপদ হবে। শুধুই তো একটা রাত। এই এক রাতের বিনিময়ে তার স্বামী, পিতা, সে নিজে মুক্তি পাবে। তা না হলে সবার মৃত্যু। এমনকি সত্যবতীরও। তার আগে সাহেব-বাবুরা জোর করে তার সঙ্গে কাজ সেরে নেবে।
কিন্তু সত্যবতীকে এক চুলও নড়ানো যায়নি। এমনকি মুখে এতটুকু খাবারও তোলেনি। সারা রাত জাগরণ আর মানসিক নির্যাতনের ক্লান্তিতে ভোরবেলায় ঝিমিয়ে পড়েছিল সত্যবতী। হঠাৎ কানে মধুর আওয়াজ এলো, মাগো!
চমকে উঠল সত্যবতী। সামনে তাকিয়েই সে আঁতকে উঠল। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে রইস খান। ক্ষত-বিক্ষত বিপর্যস্ত দেহ। উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে।
রইস খান কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল : মাগো! এত অত্যাচার! এত কষ্ট! তার পরও তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না।
পরপরই তার চেয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে বলল : এই আমি কসম খাচ্ছি, তোমার পর আর কোনো মা-বোনকে এখানে এনে কেউ বন্দি করে রাখতে পারবে না।
শপথবাক্য উচ্চারণ করে রইস খান রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সে ইচ্ছা করলে শেরিফ সাহেবের কাছে যেতে পারে। সাহেব তাকে পছন্দ করে। সমীহ করে। রইস খান কথা বললে সে কথা রাখবে শেরিফ। এ ছাড়াও তার মাসহারা আর অনেক ইনাম পাওনা রয়েছে শেরিফের কাছে।
কিন্তু কী লাভ ইংরেজ বেনিয়ার কাছে হাত পেতে? সেও তো শাদা চামড়ার সাহেব। লোভ আর লালসা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। রইস খান সাহেবের দরবারে আর হাত পাতবে না। সে নিঃশব্দে সিন্দুরিয়ার পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তার গন্তব্য সে জেনে গিয়েছে।

১২.

সত্যবতীর প্রত্যাখ্যান সিন্দুরিয়া নীলকুঠির সাহেব, বাবুদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। সত্যবতী, তার বাবা আর স্বামীকে অন্ধকূপে নিয়ে ঢা করে মারা হয়।

হিঙ্গেরপাড়া গ্রামের কালু বেহারা। তার যুবতী মেয়ে জরিনা।
নীলকুঠির এক বাবুর নজর কাড়ে সে।
কুঠির দু'একজন কর্মচারী গোপনে যোগাযোগ করে তার সাথে।
বলে : তোর বাবা বেহারা। ভিটেটুকু ছাড়া জমি নেই কোনো। জিরেত নেই। এইভাবে কি সংসার চলে?
জরিনা ঠোঁট উল্টে বলে : সংসার কিভাবে চলবে না চলবে সেটা পুরুষ-মরদদের ব্যাপার। ওই নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়ে চুল পাকাতে যাব কেন? আর আমাদের সংসার চলছে তো খারাপ না।
কুঠির মতলববাজ কর্মচারী নাক সিটকে বলে : এক বেলা চলছে, আরেক বেলা আধপেটা। এটাকে কি চলা বলে?
জরিনা বলে : তার আমি কী করব? এ নিয়ে আমি ভাববার কে? এভাবেই আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ছোটবেলা থেকেই।
কর্মচারী মুখ গোমড়া করে বলে : তুই যদি তোমার বাপের ব্যাটা হতিস, তাহলে কি এ কথা বলতে পারতিস? নাকি বাপের কষ্ট দেখে তার পাশে না গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস?
জরিনা বলল : আমি তো আর ব্যাটা না। কপালে ছিল তাই মেয়ে হয়ে জন্মেছি। বাপকে সাহায্য করার কতটুকুই বা সাধ্য আমার রয়েছে?
ওষুধ ধরছে বুঝতে পেরে কর্মচারী মিটিমিটি হাসে। মিষ্টি করে প্রস্তাব তুলে ধরে : তুইও পারিস। তোর গায়ে তাকত কি কিছু একটা কম আছে? একটা কাজ-কাম জুটিয়ে নিতে পারলে বাপের হাতে ক'টা পয়সা গুঁজে দিতে পারিস।
জরিনা ঠোঁট উল্টে বলল : কাজ-কাম যেন আমার জন্য বসে বসে ঝিম পারছে। আমাকে কাজ-কামটা দেবে কে?
কর্মচারীর মুখে এবার পরিপূর্ণ হাসি। বলল : তুই যদি কাজ করতে চাস, তাহলে তোকে কাজ না দিয়ে থাকতে পারবে? আমাদের কুঠিতে বাবুদের রান্না-বান্নার কাজে একজন রাঁধুনি দরকার। করবি তুই?
জরিনা বলল : বাবুরা আমাকে নেবে না। তাদের জাত-পাত নিয়ে শতেক ঝামেলা। তারা কি আমার মতো মুসলমান মেয়ের রান্না মুখে তুলবে?
কর্মচারী বলল : কুঠির বাবুদের আবার জাতপাতের বাছবিচার! ম্লেচ্ছ সাহেবদের সাথে সারা দিনমান রাতদিন ওঠবস করে। ওদের এখন জাত-ধর্ম বলে কিছু নেই। তুই রাজি তো চল। আজ থেকেই কাজে লেগে যা।
জরিনা ইতস্তত করে বলল : বাপজানকে বলে আসি।
কর্মচারী বলল : তোর বাপকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। বাপের হাতে কামাইয়ের টাকাটা তুলে দিয়ে তারপর খবরটা দিবি। দেখবি তোর বাপ খুশিই হবে।
কড়কড়ে লোভ সামলাতে পারল না জরিনা। কর্মচারীর পিছু পিছু চলে এলো কুঠিতে।
আশায় আশায় বসে ছিল কুঠির বাবু। জরিনাকে দেখেই তার জিভের পানি ভিজিয়ে দিল ঠোঁট। আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল : এ যে দেখছি মজাদার জাদুই রান্নাবান্না।
সেদিন সন্ধ্যায় গজব নাজিল হলো জরিনার ওপর। দেশি শকুনগুলো তাকে ঠুকরে ঠুকরে নিল। যেন সে এক ভাগাড়।
এরপর তার আশ্রয় জুটল অন্ধকূপের মৃত্যুগুহায়। খবর শুনে ছুটে এলো জরিনার মা সখিনা। কিন্তু কুঠিবাড়িতে তাকে ঢুকতে দেয়া হলো না। মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেল সে।
কুঠিতে ঢুকতে না পারলেও কুঠির ছায়া ছাড়েনি সে। দিনমান পড়ে রইল কুঠির পুকুর ঘাটে। তার অট্টহাসি কাঁপিয়ে তুলল কুঠি। শেষ দিনটি পর্যন্ত সে পুকুর ঘাটেই ছিল। আর ছিল শোকে মুহ্যমান কুঠি-কাঁপানো তার অট্টহাসি।
কালু বেহারার মেয়ে জরিনা নীলকুঠিতে ধর্ষিতা ও নিহত। তার স্ত্রী পাগলিনী। মেয়ের শোকে।
এই নিয়ে পুরো তল্লাট তোলপাড়। হিঙ্গেরপাড়া ও এগারপাড়ার সর্বস্তরের মানুষ এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ। কুঠিবাড়ির মেয়ে-ফুসলানো দালাল রাধামণি। বিরশখালি থেকে কুঠিতে আসার পথে তাকে পাকড়াও করে লোকজন। সাহেব-বাবুদের কাছ থেকে কমিশন খেয়ে খেয়ে তার দেহটা দশাসই। এখন পিটুনি আর কথার হুলে তার অবস্থা সঙ্গিন।

বিপর্যস্ত দেহ নিয়ে জনতার রোষ থেকে সে কোনো রকমে পালিয়ে আসে।
উত্তেজনা অনেক দূর গড়িয়ে যেতে পারে। আর তেমনটি যদি হয় তাহলে নীল সাহেবদের দফারফা। এর আগেই পুরো ব্যাপারটা সামাল দেয়া দরকার। পানি আর বেশি দূর গড়াতে দেয়া ঠিক নয়। উইলিয়াম শেরিফ অনুগত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে পাঠান। সেদিন বিকেলবেলা। নীলকর সাহেবের সাথে স্থানীয় মাতব্বরদের বৈঠক বসল।
আলোচনার শুরুতেই উত্তেজনা। শেরিফও মুখর। সবাই সবাইকে দোষারোপ করছে।
নিমাই মণ্ডল একসময় শেরিফের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলল : সাহেব, তুমি বড্ড বেশি টিকটিক কর। তোমার কথায় কথায় টিক-টিক। এ কথা শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল কুঠিয়াল শেরিফের।
উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল : হোয়াট? কী বলছ তুমি? আমি টিকটিক করি! আমার কথায় কথায় টিকটিক!
বলতে বলতে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল সাহেব। কাঁপতে কাঁপতে হুকুম করল, নিমাই মণ্ডলকে 'আমি নিমাই টিকটিকি' বলতে বলতে কানে ধরে পাঁচবার ওঠবস করতে হবে। শুধু তাই নয়, এ বৈঠকে সব লোকের সামনে নিমাই মণ্ডলের মথায় কাদা মাখিয়ে নীল বোনা হবে।
কুঠিয়ালের উৎসাহী কর্মচারীরা লাফিয়ে এলো সাহেবের হুকুম তামিল করতে। এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত বৈঠক ভেঙে গেল। গ্রামের মাতব্বররা সাহেবদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে ঘরে ফিরল।
মাতব্বররা নিজেরাই সভা করল বিরশখালির বাঘা যতীনের বাড়িতে। সভায় সিদ্ধান্ত হলো : এ এলাকায় আর নীল চাষ নয়। নীল গাছ যা রয়েছে, সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
যেই কথা সেই কাজ। এগারপাড়ার লাখেরও ওপর নীল গাছের আঁটি মাঠে জড় করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো। একইভাবে চারপাশের গ্রামগুলোতেও হাজার হাজার নীল আঁটির ভাগ্যে একই পরিণতি জুটল। কুঠিয়াল শেরিফ তখন পালিয়েও বাঁচে না। যে কোনো সময় কুঠির ওপর হামলা আসতে পারে, এই ভয়ে সে তার কাগজপত্র সরিয়ে নিল খাড়াগোদা কুঠিতে। সেখানেই সে তার বাস তুলে নিল।
এদিকে কালুপুনে থানায় পুলিশের সংখ্যা ও শক্তি বাড়িয়ে দেয়া হলো। সাহেবকে মদদ দিতে আরো কয়েকজন সাহেব এসে আস্তানা গাড়ল খাড়াগোদা কুঠিতে।
কুঠির সর্বত্র ভীতির ছাপ।

১৩.
জন হেনরি সকাল-সকালই তার লাগেজ গুছিয়ে নিল। ছেড়ে দিল রেস্টহাউস। একজন আরদালি তার লাগেজ তুলে নিল। চলে এলো ম্যানেজারের বাংলোতে। আরদালিকে নিচের কক্ষে লাগেজসহ দাঁড় করিয়ে চলে এলো দোতলায়।
অ্যানের বেডরুমের দরজা খোলা তবে ভারী পর্দা টাঙানো। ভেতরের কিছুই দেখা যায়।
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেনরি হাঁকল, হ্যালো!
ভেতর থেকে অ্যানের তন্দ্রালু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওখানে কে?
হেনরি বলল, আমি জন হেনরি আপা। ভেতরে আসব।
ঘুমের রেশ কাটেনি। তবুও অ্যানের সাদর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এসো এসো। এ ঘর তো তোমারই। ভেতরে চলে এসো।
ভেতরে ঢুকল হেনরি। রাতের পোশাকে অ্যান আনুথালু বিছানায় গড়াচ্ছে। হেনরি সুপ্রভাত জানালে জড়ানো কণ্ঠে অ্যান পাল্টা সুপ্রভাত জানাল। বলল : বাহ। আজ বেশ সকালে। কতদিন তোমাকে দেখিনি। সেই জার্নির পর তোমার সঙ্গে আর দেখাই হলো না। মাঝখানে দু'দিন আমি রেস্টহাউসে গিয়েছিলাম। তোমাকে পাইনি।
হেনরি বলল : খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চারপাশের গ্রামগুলো ঘুরছিলাম।
অ্যান বলল : হ্যাঁ। ম্যাকনেয়ার বলেছিল। তোমাদের পত্রিকায় নাকি সিন্দুরিয়ার নীল চাষ নীলকুঠি নিয়ে খুব খারাপ খারাপ রিপোর্ট বেরিয়েছে। সে তোমার ওপর খুব রেগে আছে।
হেনরি বলল : এত সকালে মি. ম্যাকনেয়ারকে যে দেখছি না। সে কি প্রতিদিনের মতো ঘোড়ায় চড়ে মর্নিংওয়াকের নামে চাষিপীড়ন, নারীহরণে বেরিয়েছে?
অ্যান বলল : না। দু'দিন ধরে সকালে সে একা একা মর্নিংওয়াকে যাচ্ছে না। চাষারা নাকি কীসব গোলমাল পাকাচ্ছে। সেসব নিয়ে কথা বলতে সে শেরিফের কাছে গিয়েছে। সে মিটিং হয়তো গড়াবে দুপুর পর্যন্ত। দুপুর হয়ে গেলে লাঞ্চটা সেখানেই। আর লাঞ্চ হয়ে গেলে চলে যাবে কাছারিবাড়ি। ধরে নিতে পার সারা দিন তুমি আর আমি।
হেনরি হেসে বলল : সুবর্ণ সুযোগই বটে। তবে দুঃখিত, আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।
: পালাচ্ছ?
: বলতে পার।
: তাহলে তোমাদের কাগজে রিপোর্ট পাঠাবে কে?
: এক দিনে যে তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি তা দিয়ে এমন অনেক রিপোর্ট করা যাবে। তাই দিয়ে ম্যাকনেয়ার সাহেব আর তার মালিক উইলিয়াম শেরিফকে ধসিয়ে দেয়া যাবে। এখনকার ঘটনাগুলোর রিপোর্ট স্থানীয় সাংবাদিকই পাঠাতে পারবে।
: তুমি কি ম্যাকনেয়ার আর শেরিফকে ধসাতে এসেছিলে?
: না। আমি দেখতে এসেছিলাম, এরা দুজন কিভাবে নিজেদের ধ্বংস করছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটাতে সহযোগিতা করছে। বলতে পার, আমিও ইতিহাসের একজন সাক্ষী হয়ে রইলাম।
: আর আমরা
: দুঃখিত। তোমরা ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলে।
: আর নায়ক বুঝি এই সহিসটা?
হেনরি শ্লেষের হাসি হাসল : তাকে তো তোমরাই এমনকি তুমিও নায়ক বানিয়েই রেখেছ।
একই ধরনের হাসি খেলে গেল অ্যানের মুখে। বলল : তাহলে তোমার নায়কের কাহিনী শোনো। ক'দিন আগে ম্যাকনেয়ার আর হারানবাবু তাকে হান্টার দিয়ে পিটিয়েছেন। সারারাত সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল রাস্তার ওপর।
হেনরি বলল : ম্যাকনেয়ার সাহেব তাকে পিটিয়ে আত্মতৃপ্তির কথাটুকুই বলেছে। বাকিটুকু বুঝি বলেনি?
: বাকিটুকু আর কী? সে এখন আস্তাবলে পড়ে রয়েছে।
: না। সেদিনের পর সে আস্তাবলে যায়নি। এই নীলকুঠিতেও সে নেই। এর পর থেকে সে নিখোঁজ।
ঝটিতে বিছানায় উঠে বসল অ্যান। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ও বিষণ্নতা। বলল : সে কোথায় গিয়েছে? ওকে কি মৃত্যুকূপে ফেলে দেয়া হয়েছে?
: তার মৃত্যুতে তুমি খুশি হওনি?
: না। প্রশ্নই ওঠে না। আমি কখনই তার মৃত্যু চাইনি। চেয়েছি তার আনুগত্য।
: আর চেয়েছ তার হাতে পিষ্টিত হতে।
: এক অবহেলিতা বুভুক্ষা নারীর চাওয়াটা কি খুব বেশি? ওরা শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেলল?
: তাকে মারা অত সহজ নয়। সে এখানে চাকরি করত বলে তার ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তা মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু সে যদি ঘুরে দাঁড়াত, তাকে ঠেকানোর জন্য এ কুঠিতে একটা লোকও নেই। সে একজন হামকল নেতা।
: হামকল! সেটা আবার কী?
: তিতুমীরের অনুসারী কৃষক যোদ্ধাদের দল। তার নেতা রইস খান। ছদ্মবেশে নীলকুঠিতে চাকরি করেছে আর কৃষকদের সংগঠিত করেছে। সে নিখোঁজ হয়নি, সে ফিরে গেছে তার দলের কাছে।
আবার সে সিন্দুরিয়ায় ফিরে আসবে। ঝড়ের গতিতে। কুঠিবাড়ির সব তছনছ করে দিতে।
: এই ভয়ে তুমি পালাচ্ছ?
: খানিকটা বলতে পার।
: তুমি তো ওদের সাথেই?
: তবু তো ব্রিটিশ। ওদের সব ঘৃণা ইংরেজদের ওপর। সেখান থেকে আমিও রেহাই না পেতে পারি। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। আমি যে ধরনের রিপোর্ট লিখি, তার সব তথ্য পেয়ে গিয়েছি। এখন কলকাতায় গিয়ে এগুলো সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে।
: আজকের দিনটা থেকে যাও। সারা দিন মজা করা যাবে।

: এখন মজার সময় আর নেই। ইভার সাথে দেখা করেই আমি বেরিয়ে যাব। তব পরিস্থিতি খুব খারাপ। ম্যাকনেয়ার সাহেবকে সাবধান করে কোনো লাভ নেই। তিনি শুনবেন না। গোলযোগ থেকে সাবধান হতে হয়। গোলযোগ পাকাতেই তিনি পছন্দ করেন। মেয়েটাকে সাবধানে রেখ। আর নিজে সাবধানে থেকো। শিগগিরই আমাদের দেখা হবে কলকাতায়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। হয়তো গির্জাও অপেক্ষা করবে। মনে রেখ, আমি তোমাকে পিষ্টন করতে নয়, শিল্পিত ভালোবাসায় অভিষিক্ত করতে জানি।

: ওরে দুষ্টু ছেলে, তুমি ভুলে গেছ তুমি আমার দশ বছরের ছোট।

হেনরি হেসে বলল : বয়সের ব্যবধান সেই কবেই ঘুচে গিয়েছে! সে অ্যানের ঠোঁটে ছোট্ট করে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল। সে এলো ইভার কক্ষে। ইভার সাথে কথা বলে তাকে সাবধান থাকতে বলে সে ম্যানেজারের বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো। আরদালি তার লাগেজ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তারা একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করল।

জন হেনরির গাড়ি যখন লক্ষ্মীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেল। দু'জন সেপাই দারোগা দুর্গাদাস লাহিড়ীকে ধরে পেটাচ্ছে। এমন চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখে হেনরি গাড়ি থামাল। গাড়োয়ান যে বিবরণ নিয়ে এলো তা আরো আকর্ষণীয়।

ওয়াসিম বিশ্বাস আর তার দলবলকে ছেড়ে দিয়ে দুর্গাদাস লাহিড়ী তার বদনাম খানিকটা ঘোচাতে পেরেছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়। সে তার স্বরূপে চলে আসে।

একদিকে নীল চাষিরা সংগঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে কুঠিয়ালরা। ধূর্ত নীলকররা চাষিদের জাগরণ বানচাল করতে নানা ফন্দি-ফিকির ও জুলুমের আশ্রয় নেয়। উইলিয়াম শেরিফ দুই হাজার কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আসামি করে একই সাথে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের করে। সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্যকে এক নাম্বার আসামি করা হয়।

এদিকে বেড়ে যায় পুলিশের আনাগোনা। খামোকা হয়রানি আর জুলুম। এ উৎপাতে সিন্দুরিয়ার শক্ত-সমর্থ কর্মক্ষম পুরুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। মধুরানাথ আচার্যও কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।

মওকা পেয়ে যায় কুঠির লোকজন। শুরু হয় তাদের পাইকারি লুটপাট ও জুলুম-নির্যাতন। দুর্গাদাস লাহিড়ী পুলিশের হাবিলদার। সিন্দুরিয়া নীলকুঠিতে সে ফাঁড়ি স্থাপন করে। সেখান থেকেই সে কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব। গ্রামবাসীদের থেকে নগদানগদি পয়সাকড়ি আদায় করেও তার শান্তি হয় না। গরু-ছাগল পর্যন্ত লুটে এনে কলকাতায় তার বাড়িতে পাচার করে দেয়। কিষাণ মেয়ে ও গৃহবধূদের গয়নাগাটি লোপাট করতেও তার কোনো সংকোচ নেই।

বিচিত্র জুলুমের শিকার হয় আশপাশের সব ক'টি গ্রাম। কার্পাসডাঙ্গার তিনজন অবাধ্য প্রজার পশ্চাদ্দেশে কল্কে পুড়িয়ে ছেঁক দিয়ে ক্ষত তৈরি করা হয়।

গোপালপুরের একজনের কান কেটে সেই কাটা কান আবার ধরিয়ে দেয় তার হাতে। এরপর তাকে কান হাতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গ্রামের এক বিধবার শ্লীলতাহানির পর তাকে খুন করা হয়। হিঙ্গেরপাড়া গ্রামের সুবেদ আলী বিশ্বাসের বাড়ি অকারণে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এসব কাজে হাবিলদার দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রবল উৎসাহ। প্রতিদিন সে এ কাজে বেরোয়।

এমনি আজ বেরিয়েছে লক্ষ্মীপুর গ্রামে। মেয়ে-মানুষ দেখলেই তার রোখ চেপে যায়। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। মেয়েদের ওপর নির্যাতন করতে এগিয়ে গেলেই তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বাহিনীর দুজন সেপাই। আমিনউদ্দিন ও মঈনউদ্দিন।

তাদের দুজনের সাফ কথা : নিরীহ কৃষকদের পিটিয়ে, লুটপাট করে এর মধ্যেই মেলা গুনা হয়ে

গিয়েছে। তার ওপর আবার মা-বোনদের গায়ে হাত দেয়া কেন? আর যাই হোক, তারা দুজন এখানে থাকা পর্যন্ত এ ধরনের কাজ হতে পারে না। শুনেই সগর্জনে লাফিয়ে উঠল দুর্গাদাস। কিন্তু সেপাই দুজন অটল। ওরা বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বলল : নিকুচি করি তোর পুলিশের চাকরি।

দুজনে মিলে উত্তম মধ্যম দিল দুর্গাদাসকে। তাকে পিটিয়ে জখম করে তারা পুলিশ বাহিনী ছেড়ে সরে এলো। তাদের গন্তব্য পদ্মবিল। সেখানে যুদ্ধ-মহড়ার আয়োজন চলছে।

জন হেনরি মনে মনে হাসল! যাহ্ বাবা, বিদায়বেলাতে স্কুপ নিউজ। কলকাতার লোকেরা ভালোভাবে নেবে এ খবর। তার গাড়ি স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

যুদ্ধের মহড়ার আয়োজন করেছে রইস খান। উইলিয়াম শেরিফের কুঠি-ত্যাগী প্রধান সহিস। ছদ্মবেশী হামকল যোদ্ধা।

চারদিকে যখন নীলকুঠির সাহেব, কর্মচারী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ঠিক এ সময়ই রইস খানের আবির্ভাব। তার সাথে দশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী। চাঁদুড়ে। তিতুদহ, কাজিরহাট ও মাদারীপুর থেকে এসেছে এই যোদ্ধারা।

তারা চুয়াডাঙ্গার পূর্ব দিকে পদ্মবিল বাজারে ঘাঁটি গাড়ল। তিন রাত ধরে ঢোল-শোহরত বাজাল। একসাথে ঘোষণা : আগামী ২২ জানুয়ারি পদ্মবিল বাজারের পাশের মাঠে যুদ্ধের মহড়া হবে। বিপ্লবী ও কৃষক যোদ্ধা যারা আত্মগোপন করে রয়েছে তারা যেন এ মহড়ায় অংশ নেয়।

চারপাশে সাড়া পড়ে গেল। সাজ সাজ রব। ২০ জানুয়ারির মধ্যে সেখানে এসে সমবেত হয় ষাট হাজারেরও বেশি লোক। এ খবরে চমৎকৃত হয় বিলেতি মিশনারিরাও। হলব্রুকের নেতৃত্বে ছয় মিশনারি এলো সেই দার্জিলিং থেকে। তারাও যুদ্ধ মহড়ায় অংশ নেবে।

পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে এলো দুই সেপাই– আমিনউদ্দিন ও মঈনউদ্দিন।

পদ্মবিলে বিপ্লবীদের এ এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। এত লোকের সমাবেশ, কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই।

বিস্ময়কর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যেন মহড়া। গ্রামের সাধারণ মানুষও বসে নেই। তারা মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাবার-দাবার, জ্বালানি আর রসদপত্র সরবরাহ করল। এতসব দেখেশুনে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল জমিদার শ্রীহরি রায়। আনন্দে চিকচিক করে উঠল তার চোখ-মুখ।

আবেগাপ্লুত হলব্রুকও।

শ্রীহরি রায় ও হলব্রুক রইস খানের আয়োজন ও বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তারা দুজনও বিপ্লবী কৃষকদের সঙ্গে তাঁবুতে বসবাস করতে লাগল।

২২ জানুয়ারি। এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহরি রায় এ সভায় সভাপতিত্ব করে। এরপর যুদ্ধ মহড়া। আকর্ষণীয় এই যুদ্ধের মহড়ায় নেতৃত্ব দেয় রইস খান। কুঠিয়াল ও পুলিশ বাহিনীর ইচ্ছে ছিল এ সমাবেশটাকে বানচাল করার। কিন্তু উত্তাল জনস্রোত, তাদের আবেগ ও জাগরণ দেখে তারা আর কিছু করার সাহস পায়নি।

মর্তুজাপুর গ্রামের কয়েকজন গাড়োয়ান। ধানের নাড়া জোগাড়-যন্ত্র করে গাড়ি নিয়ে ফিরছিল। শিবপুর পৌঁছতেই নীলকুঠির পেয়াদারা তাদের থামায়। নাড়ার গাড়ি জোর করে কুঠিতে নেয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করে। বাধা দেয় গাড়োয়ানরা।

শুরু হয় গাড়োয়ান ও নীল পেয়াদাদের মধ্যে সংঘাত। এতে কয়েকজন গাড়োয়ান মারা যায়। নীল পেয়াদারা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে গরুসহ দুটি গাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এ ঘটনা বাতাসের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে এলাকার সর্বত্র। আগুন জ্বলে ওঠে সব কৃষক যোদ্ধার মনে।

২৩ জানুয়ারি। ভোর।
আর কোনো ঘোষণা নয়। আর কোনো কর্মসূচি নয়। বিপ্লবীদের একটাই লক্ষ্য হয়ে দাড়াল : নীলকুঠির উৎখাত। বিলেতি সাহেবদের এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে। তাড়াতে হবে দেশ থেকে। একই সঙ্গে বিদায় করতে হবে দেশ-ঘাতক চামচাদের। চারদিকে ধিকিধিকি আগুন একসঙ্গে প্রবল অগ্নিকুণ্ড হয়ে জ্বলে ওঠে। শুরু হয় অভ্যুত্থান। সর্বাত্মক আক্রমণ।
মিছিলের পর মিছিল। দূর দূর গ্রাম থেকে মিছিলে মিছিলে লোকজন এসে আছড়ে পড়তে থাকে। ক্ষোভ ও ক্রোধে তারা একেকজন আগুনের কুণ্ড। রাতের অন্ধকার মুছে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই চারপাশের গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসে। দুপুরের মধ্যে সিন্দুরিয়া নীলকুঠি তারা ঘিরে ফেলে।
আর এদিকে জোড়াগত ও ঘোলদাড়িতে যাওয়ার

পথ আগলে রাখে রইস খান ও শ্রীহরি রায়ের বাহিনী। কুঠির সঙ্গে বাইরের জগতের সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ।
শ্রীহরি রায় নিজের হাতে কুঠির গোলাবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এরপর তার পাগড়ি কোমর থেকে খুলে নিয়ে মাথায় বাঁধে। এতদিন পর তার শপথ পূর্ণ হলো।
কুঠির সব সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। কৃষক যোদ্ধারাও শত শত মণ নীল ফেলে দেয়। কুঠির বাড়িঘর তছনছ করে ফেলে।
প্রথম দিকে দারোগা দুর্গাদাস নাহিড়ীর পুলিশ দল ও কুঠির লেঠেল বাহিনী বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়।
কৃষক যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার। তাকে খুব করে পেটানো হয়। তারপর একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। আশপাশের যতগুলো কুঠি ছিল সেগুলোর সব কর্মচারীর বাড়িঘর ও সহায়সম্পদ লুট করা হয়।
নীল গোলাম নরেন্দ্রনাথ, হারান আর মেয়ে সরবরাহকারিণী রাধামণির নাক-কান কাটা হয়। তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

ঘটনার তৃতীয় দিন। রইস খান তার বাহিনী নিয়ে গিয়েছে ঘোলদাড়ি। গোপনে খবর গেল উইলিয়াম শেরিফের কাছে।
ম্যাকনেয়ার আর কুঠির জন্য মনটা টাটাচ্ছে শেরিফের। রাতের অন্ধকারে একদল পুলিশ নিয়ে সে উপস্থিত হলো কুঠিতে, ম্যাকনেয়ারকে উদ্ধার করতে।
এগারপাড়ার কৃষক যোদ্ধারা টের পেয়ে গেল ব্যাপারটা। তারা ছুটে এলো। ঘিরে ফেলল পুলিশ বাহিনীকে। ঢাল-সড়কি নিয়ে হামলা চালাল তাদের ওপর। অবলীলাক্রমে তাদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। তাদের বন্দি করে ফেলল।
গোলযোগের এই সুযোগে শেরিফ ম্যাকনেয়ারের বাঁধন খুলে সেখান থেকে সরে পড়ল। তারা দুজন কালবিলম্ব না করে কুঠির ঘাটে বাঁধা জমিদার মথুরানাথ আচার্যের নৌকা চুরি করে পালানোর পথ খুঁজল। জমিদার চাচা কাশিনাথ আচার্যের হাত-পা ধরে জমিদারবাড়িতে এসে জীবন বাঁচানোর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করল। কৃষকরা যখন দেখতে পেল শেরিফ ও ম্যাকনেয়ার পালিয়ে গিয়েছে, তাদর মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন তারা ছড়িয়ে দিল কুঠির সর্বত্র।
আগুন জ্বলে উঠল ম্যাকনেয়ারের বাড়িতেও। অ্যান আলুথালু বেশে ইভার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো।
ইভার মনে পড়ল, আর কিছু না হোক তার নায়কের ছবিটা আনা দরকার। সে মায়ের হাত ছাড়িয়ে আবার বাংলোয় ঢুকে গেল।
তখন বাংলোর ভেতরে-বাইরে চারপাশে আগুন। বাংলোর ভেতরে ছুটোছুটি করছে ইভা। চারপাশের আগুন তার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।
ঘরে আগুনের ভেতর ইভাকে দেখে অ্যান চিৎকার করে উঠল। সে ছুটে যাচ্ছে ঘরে। তাকে আটকাল কৃষকরা। মেয়েটা কোন ফাঁকে আগুনের ঘরে ঢুকে গিয়েছে খেয়াল করেনি তারা। কিন্তু তাই বলে এখন দেখে শুনে অ্যানকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেবে না।
অ্যান ডুকরে কেঁদে উঠল। নিজেকে ছাড়িয়ে ইভার কাছে যেতে জোরাজুরি করতে লাগল। ওই অবস্থাতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।

কৃষক যোদ্ধাদের হাতে পুলিশ আটক। এ খবরে বিচলিত হয়ে ওঠে ইংরেজ প্রশাসন। পুলিশদের উদ্ধার করার জন্য নবগঙ্গা নদীপথে একটা যুদ্ধজাহাজ ও ১০০ সৈন্য পাঠানো হয়। এদের নেতৃত্বে রয়েছে মরিস।
দিনের বেলায় নয়। দিনের আলোয় জনগণ দেখতে পেলে আর রেহাই নেই। পুলিশ দলের পরিণতি তাদেরও বরণ করতে হবে। তাই রাতের অন্ধকারে চুপিসারে তারা এসে নামল পোতাহাটির কাছে। এরপর পায়ে হাঁটা। রাতে রাতেই সবার অগোচরে সেখানকার ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছাউনি গাড়ল।
ভোরবেলা। মাঠে ফুরফুরে বাতাস। সেনা দলে রয়েছে কয়েকজন সাবেক গোরা সৈনিক। উইলিয়াম শেরিফকে সাহায্য করার জন্য তাদের পাঠিয়েছে নীলকর সমিতি।
ভোরের বাতাস তাদের মনকে চাঙ্গা করে তুলল। তারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো। ভোরের মুক্ত হাওয়া পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তারা মাঠে জগিং করতে লাগল। কেউ কেউ হাঁটাহাঁটি।
এ সময় বিপ্লবী কৃষক যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এগিয়ে যাচ্ছে কুঠির দিকে। মাগুরা, পোতাহাটি, নাথকুণ্ড, রাঙ্গিয়ারপোতা, ধুহাটি, গোলাপপুর থেকে কৃষকরা এগিয়ে যাচ্ছে নীলকুঠির দিকে।
প্রথমেই তাদের নজর গেল সাবেক গোরা সৈন্যদের দিকে। মনের আনন্দে ভোরের হাওয়া খেতে খেতে তারা মাঠের বাইরে চলে এসেছে। কৃষকরা তাদের এক নজরেই চিনতে পারল। মারমুখো জনতার সামনে আকর্ষণীয় খাদ্য। কৃষকদের আর পায় কে। বায়ু সেবনরত গোরা সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করল।
শুরু হয়ে গেল ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবী কৃষকদের মুখোমুখি লড়াই।

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন। নীল বিদ্রোহের জানা কথা। ঢাকা, ১৯৯০।
২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৮-১৯৭১। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। ঢাকা, ১৯৯৩।
৩. সুপ্রকাশ রায়। ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। কলকাতা, ভারত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০।
৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। ঢাকা, ১৯৮৬।
৫. মেসবাহুল হক। পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ। ঢাকা, ১৯৮২।
৬. মহসিন হোসাইন। নীল বিদ্রোহের অজানা ইতিহাস। ঢাকা, ২০০১।
৭. আতা সরকার। সাহসী মানুষের গল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৯।

গল্প

জন্মের রহস্য

ইকবাল আজিজ

কার জীবনে কখন ঝড় আসবে কেউ জানে না। আরিফ ভেবেছিল, তার জীবনটা সুখে-দুঃখে কেটে যাবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার তেমন নেই, তাই জীবন নিয়ে জুয়াও সে কোনো দিন খেলেনি; সহজ সরল জীবনই ছিল আরিফের সারা জীবনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। কিন্তু জীবন এক আশ্চর্য রহস্যের নাম; কারো পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, মাত্র এক মিনিট পরে তার জীবনে কিংবা সংসার জীবনে কী ঘটতে চলেছে। আরিফ এমন ভাববাদী বা ভাগ্যবাদী নয়, বরং পুরোপুরি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও নিতান্তই কর্মে বিশ্বাসী এক সাধারণ মানুষ। আরিফ যা কখনই ভাবেনি, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়টি শেষ পর্যন্ত তার জীবনে এসে ভর করল। এটা তেমন অসামান্য কোনো ঘটনা নয়; কিন্তু যার জীবনে ঘটে সে-ই শুধু টের পায়। চৌদ্দ বছর সংসার করার পর আরিফের ঘর ভেঙে গেছে। আরিফ, তাদের তের বছরের পুত্র তুষার এবং স্ত্রী লায়লা– এই নিয়ে একটি সংসার হঠাৎই ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। তিন মাস আগে সহসাই আরিফের যৌথ জীবন ভেঙে গেছে।

বিবাহিত জীবনে আরিফ ছিল বউয়ের ওপর নির্ভরশীল, সংসারের সব দিকই সামলাত লায়লা। আরিফ একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার মালিক। ওর বউ একজন গৃহবধূ; তবে মাঝে মাঝে এনজিওতে কনসালট্যান্সি করে। গত চৌদ্দ বছর

তাদের সংসারে সুখ-দুঃখ সবই ছিল; কিন্তু চূড়ান্ত কোনো সংঘাত হয়নি। ঘটনাপ্রবাহে আরিফ ও লায়লার জীবন দুটি দিকে চলে গেল, মাঝখানে তুষার দাঁড়িয়ে ছিল দুটি জীবনের স্বপ্নময় প্রত্যাশা হয়ে– তার জীবনের ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হয়ে গেছে; সে বাবার সঙ্গে থাকবে। বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনার জন্য তিন মাস আগে এক বিকালে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একসঙ্গে বসেছিলেন আরিফ, লায়লা ও তুষারকে নিয়ে। যার কারণে এই বিচ্ছেদের ঘনঘটা– সেই আবদুল মালেক সেদিন ছিলেন অনুপস্থিত। এই ঘরোয়া আসরে লায়লা বলল, তার আরিফের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। সে বিবাহবিচ্ছেদ চায়, তার ভরণ-পোষণ দরকার নেই। তুষারের বিষয়ে তার কোনো আলাদা দাবি নেই; সে ইচ্ছা করলে তার বাবার সঙ্গে থাকতে পারে, অথবা তার কাছেও থাকতে পারে তার নতুন সংসারে। কিন্তু পারিবারিক বৈঠকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তের বছরের তুষার বলল, 'আমি আব্বুর সঙ্গে থাকব। জীবনে কোনো দিন আম্মু আর ওই কুত্তা মালেক মামাকে দেখতে চাই না।' লায়লার বড় বোন বললেন, 'বাবা, বড়দের ওইভাবে গালি দিতে নেই। লোকে খারাপ বলবে।'

তারপর তিনি সবাইকে চা-নাশতা দেয়ার জন্য বাড়ির কাজের মেয়েকে নির্দেশ দিলেন। তুষার বাবার পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার বড় খালাই এই পারিবারিক আলোচনার আয়োজন করেছেন। সেদিনই বিচ্ছেদের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত লায়লা শান্তিনগরে তার পৈতৃক বাড়িতে থাকবে; অন্যদিকে তুষারকে নিয়ে আরিফ থাকবে সেন্ট্রাল রোডে তার ফ্ল্যাটে। যেহেতু মুসলমানের বিবাহবিচ্ছেদ এবং মিয়া-বিবি রাজি; সুতরাং আইনত তালাক কার্যকর হতে তেমন ঝামেলা হয়নি।

তিন মাস ধরে তুষার আছে তার বাবার সঙ্গে। আরিফ নিজের মানসিক বিপর্যয় অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। বাবা ও ছেলের সংসার এক নতুন ও ব্যতিক্রমী নিয়মের আবর্তে ক্রমেই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। জগতে এই এক নিয়ম, মানুষ সব পরিবর্তনেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সামলানোর জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একজন বুয়া রাখা হয়েছে। সামান্য লেখাপড়া জানা এ মহিলাকে ঠিক কাজের মেয়ে না বলে বরং কেয়ারটেকার বলা যায়। এই কেয়ারটেকার তসলিমার অধীনে একজন ঠিকা ঝি কাজ করে সকাল-সন্ধ্যা। আরিফ সকালে ধানমণ্ডির টিউলিপ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে তুষারকে রেখে চলে যায় বনানীতে তার অ্যাড ফার্মে। 'মোনালিসা অ্যাড ফার্ম' নামে মাঝারি আকারের অ্যাড ফার্মের ২৫-৩০ জন কর্মচারীর ভাগ্যবিধাতা সে। অফিসে পৌঁছেই ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিল তুষারের স্কুলে। ড্রাইভার দু-তিন ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকে তুষারের। আগে এ দায়িত্বটা পালন করত লায়লা। স্কুলের সামনের আঙিনায় অনেক মহিলাকে নিয়ে বসে থাকত। ড্রাইভারও থাকত গাড়ি নিয়ে। এই স্কুলে মালেক আসত তার ভাগ্নিকে নিয়ে। লায়লার বয়সী মালেক প্রথম থেকেই অ্যাগ্রেসিভ এবং কিছুটা অশালীন ধরনের। আর এ স্বভাবের কারণে মেয়েরা তাকে খুব সহজেই পছন্দ করে ফেলে। লায়লার সঙ্গে এখানেই আলাপ হয়েছিল মালেকের। তুষার ও মালেকের ভাগ্নি তিশা যখন স্কুলে ক্লাস করত তখন লায়লা ও তার 'মালেক ভাই' ৮ নম্বর রোডের ভারতীয় রেস্টুরেন্ট 'খানা-খাজানায়' বসে দহিবড়া ও চটপটি খেত। এভাবে সম্পর্কটা গভীর হতে দেরি হয়নি। লায়লা বাস্তবিকই প্রেমে পড়েছিল, সেই সঙ্গে অনুভব করেছিল, আরিফকে সে কোনো দিনই ভালোবাসেনি। আর আচরণে রাফ অ্যান্ড টাফ স্বভাবের অবিবাহিত ব্যবসায়ী মালেকও যেন তার এক উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছিল লায়লার মধ্য দিয়ে; এই নারী যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও কামনিপুণা। মাঝে মাঝে ওরা ধানমণ্ডিতে মালেকের বাসায়ও যেত, নিভৃতে দু-এক ঘণ্টা সময় কাটাতে। ব্যাপারটা এভাবে চলতে পারত বেশ কিছুকাল। কিন্তু জীবনের গতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে– কেউ জানে না। ইতোমধ্যে তুষারকে লায়লা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মালেকের সঙ্গে, বলেছিল 'মালেক মামা' বলে ডাকতে। ওরা তিনজনে ধানমণ্ডি লেকে ডিঙায় চড়ে ভেসে বেড়াত। তুষার মজাই পেত, তবে মাঝে মাঝে ওর খারাপ লাগত, যখন দেখতে পেত ওই গুণ্ডার মতো লম্বা-চওড়া লোকটা মায়ের হাত ধরে বসে আছে। তখন সে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকত। ব্যাপারটা আরো এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রেম-ভালোবাসার মানুষকে অনেক বেশি সাহসী করে তোলে। শরীরের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে লায়লা বুঝেছিল, এতকাল সে বড় বেশি বঞ্চিত হয়েছে। আরিফের অল্প অল্প ভুঁড়িওয়ালা আয়েশি শরীরটা জীবনের অনেক ছন্দময় রহস্যে অভ্যস্ত নয়। লায়লা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আরিফ যদি তার মালেকবিষয়ক অপরিহার্যতাকে মেনে নিয়ে চুপ থাকে, তবে সে আরিফের সংসারে থাকবে; না হলে সে মালেকের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধবে। এর মাঝামাঝি অন্য কোনো পথ নেই। লায়লা আরিফের সঙ্গে মালেকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মালেক প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার-দাবার নিয়ে আসত। কখনো কখনো খাবারের সঙ্গে বিদেশি হুইস্কি কিংবা রেড ওয়াইনের বোতল আসত। বাবা সারা দিন অফিসে, তুষার দেখত তাদের ফ্ল্যাটে মা আর মালেক মামা বোতলের পানীয় খেয়ে কিছুটা অসংলগ্ন কথা বলছে। তুষার তখন ওদের কাছে গেলে ওরা দুজনই হাসত। মা বলত, 'তুষার আমার লক্ষ্মী ছেলে।' মালেক মামা মদের ঘোরে বলত, 'তুষাররে আমি কাইলই আমেরিকায় পাঠাইয়া দিমু। আমার সব ট্যাকা ধন-সম্পত্তি ওরে দিয়া যামু।' গোটা ব্যাপারটা তুষারের খারাপ লাগত। কারণ ওর বাবাকে সে কোনো দিন মদ খেতে দেখেনি। মা-ও আগে কোনো দিন খায়নি। বাবা সিগারেট পর্যন্ত খান না; তিনি সব সময় বলেন, 'সিগারেট-মদ এগুলো খুব খারাপ জিনিস।'

আরিফ বাসায় ফিরে মালেকের সঙ্গে প্রায়ই লায়লাকে বসে থাকতে দেখেছে, খাবার ও পানীয় খেতে দেখেছে। কিন্তু নিরীহ ও নির্বিরোধী স্বভাবের আরিফ কিছু বলতে সাহস পায়নি। লায়লা এমনিই কিছুটা তেজি ও ডেমিনেটিং স্বভাবের, তার ওপর ইদানীং সঙ্গী হয়ে জুটেছে মালেক নামের এক মাতাল ও গুণ্ডা। একদিন সেন্ট্রাল রোডের অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে ওরা দরোজা লাগিয়েছিল, তুষারকে বলেছিল, টিভিতে ওরা একটা বিশেষ ফিল্ম দেখবে। তুষার নিজের ঘরে মন খারাপ করে বসে ছিল। একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। আরিফ হঠাৎ বাসায় ফিরে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বাইরে থেকে বেডরুমের দরোজায় কড়া নেড়ে লায়লাকে ডাকল। কিছুক্ষণ পর দুজন বেরিয়ে এলো। মালেক ও লায়লা দুজনেরই চুল অবিন্যস্ত, মালেকের শার্টের দুটি বোতাম খোলা। লায়লা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'এভাবে অসভ্যের মতো দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলে কেন? জীবনেও ভদ্রতা শিখলে না!'

আরিফ একটু সাহস করে বলল, 'তোমরা দরজা লাগিয়ে কী করছিলে?'

এবার মালেক কেমন অদ্ভুতভাবে ভিলেনের মতো হাসল, তারপর সোজা আরিফের কাছে এসে ওর ঘাড়ে হাত রেখে অস্ফুট স্বরে বলল, 'এসব কথা যদি কাউকে বল, দ্যান আই উইল কিল ইউ।'

আরিফ ভাবতেই পারেনি, তার বাসায় এসে বাইরের কোনো লোক তাকে এভাবে হুমকি দিতে পারে। আরিফ সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। তুষার ব্যাপারটা বুঝতে পারল না; শুধু দেখতে পেল বাবা খুব গম্ভীর ও বেদনার্ত হয়ে বসে আছে।

এবার লায়লা মালেকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি ওই গাধাটার সঙ্গে কেন কথা বলতে গেছ?' তুষার তাকিয়ে থেকে মায়ের কথা বলার ভঙ্গিটা দেখল। গত কয়েক মাসে মা কত বদলে গেছে, একটা বাইরের লোকের সামনে আব্বুকে গাধা বলছে। সেদিন মালেক চলে যাওয়ার পর আরিফ লায়লাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আসলে কী চাও?' লায়লা বলল, 'আপাতত তোমাকে ছাড়তে চাই। কাল শান্তিনগরে চলে যাব। এরপর তুমি ভেবে দেখ, কী করব?'

লায়লা তার বাপের বাড়ি শান্তিনগরে চলে যাওয়ার কদিন পরে তুষারের বড় খালার বাসায় ঘরোয়া আলোচনার মধ্য দিয়ে সব চূড়ান্ত হয়ে গেল নির্বিবাদে।

এরপর ছয় মাস কেটে গেছে। সেন্ট্রাল রোডের অ্যাপার্টমেন্টে আরিফ ও তুষারের জীবনে স্বাভাবিক ছন্দ অনেকটাই ফিরে এসেছে। আরিফ ভাবে, বাবা ও ছেলের এ সংসারটা নিয়ে যদি দেশের কোনো নারীবাদী লেখিকা একটি গল্প লিখতেন, তবে হয়তো ভালোই হতো। আরিফের মনে হয়, কোনো জীবনেরই শেষ কেউ বলতে পারে না। তুষারও হয়তো বিপর্যয় কাটিয়ে

উঠেছে, তবে মাঝে মাঝে সে একা কাঁদে। এই ছয় মাস সে একবারও মাকে দেখতে চায়নি। বরং লায়লা দুবার তুষারকে দেখতে আসার জন্য ফোন করেছিল। তুষার বলে দিয়েছে, 'কোনো দরকার নেই। তুমি কুত্তার বাচ্চা মালেক মামার সঙ্গেই থাক। আর কখনো আমাকে ফোন করবে না।' লায়লা ওপার থেকে চুপ হয়ে গেছে।

এই বিচ্ছেদের ঘটনাটি তুষারের মানসিক বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সে জানে, তাদের ক্লাসেও দু-তিন জন বন্ধুর বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের বাবা-মা দুজনই আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু তার বাবা কত ভালো; মা ওকে ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে চলে গেছে, কিন্তু বাবা চিরকাল একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুষার একদিন বলেছিল, 'বাবা তুমি একটা বিয়ে কর। সারা জীবন এভাবে একা থাকবে?' আরিফ বলেছে, 'আমি তো একা নই। তুই আছিস আমার সঙ্গে। তোর সঙ্গে আমি সারা জীবন থাকব। লেখাপড়া শেষ হলে খুব লক্ষ্মী একটা মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।' ততক্ষণে তুষার বাবার হাত ধরে কাঁদতে শুরু করেছে। বুঝেছে, এ জীবনে এত বড় আশ্রয় আর কেউ নেই। তবে রাতে বাবা ও ছেলের ঘুমানোর ঘর আলাদা। তুষারের ১০ বছর হওয়ার পর লায়লাই ছেলের আলাদা ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছিল, নিয়মটা এখনো চালু আছে। ঘুমানোর আগে বাবা ও ছেলে একে অন্যকে 'গুডনাইট' বলে চলে যায় যে যার ঘরে। তুষার ঘুমানোর সময়ও অনুভব করে, ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন 'আব্বু' পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে। আরিফও ঘুমের মধ্যে উপলব্ধি করে, তার পুত্র ও একমাত্র বংশধর এখন ঘুমের মধ্যে মেঘের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুষার তার জীবনের একমাত্র আশ্রয়, বড় আদরের সন্তান, তার বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা।

তুষার এখন অনেক বেশি দায়িত্বশীল, কাজের বুয়াকে যথাযথ নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্বটি অনেকখানি পালন করে সে, অবশ্য এ নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শও করে। তারপর সঠিকভাবে বুয়াকে নির্দেশ দেয়, কোন বেলায় কী রাঁধতে হবে। এ ছাড়া এক সপ্তাহে নানান কাজের আগাম নির্দেশ দিয়ে রাখে। আরিফ একটু উদাসীন প্রকৃতির মানুষ, বিয়ের পর কোনো দিনই এসব নিয়ে ভাবতে হয়নি; সবই লায়লা সামলেছে। আরিফ বুঝতে পারে, লায়লার গোছানো স্বভাব ও সাংসারিক বুদ্ধি অনেকটা অবিকল তুষারের মধ্যে আছে। আরিফ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, এমন গোছানো স্বভাবের বউটা হঠাৎ সংসার ভেঙে চলে গেল কেন? শরীরই কি সব? কে জানে আরো কিছু আছে কি না জীবনের অদেখা জটিল অধ্যায়?

দুপুরেই স্কুল থেকে ফিরে আসে তুষার, সাধারণত সন্ধ্যার পর নিজের অ্যাড ফার্ম থেকে ফিরে আসে আরিফ। ছেলের কথা ভেবে ইদানীং একটু আগে ফেরে সে। মনে হয় ঘরে ফিরে ছেলের সঙ্গে কথা বলে যে শান্তি, তা আর পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। আগে সাধারণত পেশাগত কারণে কিংবা আড্ডা দিতে সে যেত আলী যাকের, নূর ভাই কিংবা রামেন্দুদার কাছে। ব্যবসায়ী জগতের এসব শুভাকাঙ্ক্ষীর সান্নিধ্য তার ভালো লাগত। এখন অফিসের বাইরে অন্য সব কিছু থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আজও রাতে সন্ধ্যার আগে আরিফ বাসায় ফিরে এলো। হাতমুখ ধুয়ে চা-নাশতা খাওয়ার সময় বাপ-বেটার আলাপ শুরু হলো। টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের অনুষ্ঠান। আরিফ-তুষার দুজনই উৎসাহ নিয়ে দেখছে। টিভির পর্দায় ডায়নোসর বাবা-মা ও শিশু ডাইনোসর। তৃণভোজী ডাইনোসর বিশাল প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে।

তুষার বলল, 'কোটি কোটি বছর আগে ওরা এভাবে চরে বেড়াত।'

আরিফ বলল, 'বিজ্ঞানীরা তা-ই মনে করেন। ওদেরও সন্তান হতো। ডাইনোসর বাবা-মা যত্ন নিত তার সন্তানের। প্রায় একুশ কোটি বছর আগে এরা পৃথিবীতে এসেছিল। তারপর কোটি কোটি বছর পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। প্রায় সাত কোটি বছর আগে তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অনেক পরে পৃথিবীতে মানুষ এসেছে।'

এমন সময় টিভির পর্দায় দেখা গেল সবুজ প্রান্তরে বৃষ্টি হচ্ছে। শিশু ডাইনোসর তার বাবা-মার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তুষার কেমন যেন করুণ মুখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। তারপর একসময় উঠে টিভিটা বন্ধ করে দিল। এরপর সে নিজের পড়ার ঘরে চলে গেল। আরিফেরও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। তুষার পড়ার ঘরে এসে বই সামনে নিয়ে ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল, মানুষের জন্মের রহস্য কী? অনেক দিন আগে সে মাকে প্রশ্ন করেছিল, 'মানুষের জন্ম হয় কেন? আমি কিভাবে এলাম?' মা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল, তারপর বলেছিল, 'আমরা মনের গভীরে খুব আন্তরিকভাবে চেয়েছি, তাই তোকে পেয়েছি।'

তুষার জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আর কে আমাকে চেয়েছিলে, মা?' মা সেদিন বলেছিল, 'আমি আর তোর বাবা।' তিন বছর আগে সেদিন বাবাও মায়ের পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন অবশ্য তুষার অস্পষ্টভাবে মানুষের জন্মের রহস্য বুঝতে পারে, তবে সবটা নয়। তুষার উপলব্ধি করেছে, ছোট্ট একটা ভ্রূণ থেকে মায়ের জরায়ুর গভীরে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় মানবসন্তান; তারপর তা একদিন নবজাতকের নরম শরীর হয়ে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীতে জন্ম হয় এক নতুন মানুষের। তবে তুষার অনুভব করে, তার এ শরীর ও মনের সব কিছু জুড়ে আছে সেই মানবী– যে এখন চলে গেছে গুণ্ডা মাতাল 'মালেক মামার' কাছে।

আরিফ আবার আগের মতো স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে তার ব্যবসা নিয়ে। দৈনন্দিন রুটিন আগের মতোই; ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সে বনানীতে চলে যায় নিজের অ্যাড ফার্মে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে বাবা ও ছেলের আবার দেখা হয়। আর শুক্রবার ছুটির দিন দুজন কোথাও বেড়াতে যায়। অথবা তুষারের বন্ধুরা আসে, সারা দিন বাসায় খুব মজা হয়। আরিফ অনেক দিন লক্ষ্য করেছে, অথবা হঠাৎ তুষারের ঘরে গিয়ে দেখতে পেয়েছে, কী যেন খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে তার ছেলে। বাবাকে দেখে লুকিয়ে ফেলেছে বালিশের নিচে। এ নিয়ে আর আগ্রহ প্রকাশ করেনি আরিফ। ছেলের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। আরিফ কখনো হঠাৎ ভাবে, লায়লার কথা। এতগুলো মাস চলে গেল, একবারও জানা হয়নি, কেমন আছে তার একসময়ের স্ত্রী এবং তার বর্তমান স্বামী আবদুল মালেক। আরিফের মধ্য দিয়ে ছেলের সব অপ্রাপ্তি ও শূন্যতা যেন ঘুচে গেছে।

তবে আরিফ জানে না, তুষারের কাছে আছে খুব সাধারণ একটা স্মৃতিচিহ্ন, একটি পুরনো পারিবারিক ছবি। এই ছবিতে তিন বছরের তুষারকে কোলে নিয়ে মা বসে আছে। এ ছবিটাই তুষার সবার অজ্ঞাতে একা একা দেখে। সে মায়ের কোলে বসে থাকা নিজের শিশুবয়সকে উপলব্ধি করে; সে অনুভব করে, একদিন মায়ের শরীরে মায়ের ইচ্ছায় সে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তারপর একদিন পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু মা কেন চলে গেল ওই গুণ্ডা ও মাতাল মালেক মামার কাছে? একদিন মাঝরাতে চারদিকে গভীর বৃষ্টি, তুষার নিজ ঘরে আলো জ্বেলে সেই পুরনো ছবিটি দেখছিল। ভাবছিল জন্মের রহস্যের কথা। এই মায়ের শরীর থেকে তার জন্ম। তারপর মুক্তি ও বিকাশ। সেই মা কোথায় চলে গেল? পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর আগে ডাইনোসর এসেছিল, তারপর তারা বিলুপ্ত হয়েছে। মায়ের শরীর থেকে তার জন্ম, মা চলে গেছে তাকে ছেড়ে। কিন্তু নিজের শিকড়ের টান গভীরভাবে অনুভব করে তুষার। মাঝরাতে মায়ের ছবির দিকে সে অপলক তাকিয়ে থেকে নিজের জন্মরহস্যকে উপলব্ধি করল। সে তাকিয়ে থাকে, মা এবং মায়ের কোলে বসে থাকা তিন বছর বয়সী নিজের আশ্চর্য নিষ্পাপ চেহারার দিকে। তুষার ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'মা, তুই আমার জন্মের রহস্য আবার নতুন করে বল। আমাকে তুই কোথায় রেখে গেলি মা? এই সাজানো সংসার, সরল নিরীহ বাবা, অন্তহীন পুরনো স্মৃতি সব আমাকে দিয়ে তুই কোথায় গেলি মা ওই নিষ্ঠুর মালেক মামার কাছে? ওই গুণ্ডা বদমাশটা কি আমার চেয়েও তোর কাছে বেশি প্রিয়, মা?'

তুষার যখন মাঝরাতে বিড়বিড় করে এসব কথা বলছিল ছবিটির দিকে তাকিয়ে, তখন পাশের ঘরে আরিফ ঘুমিয়ে আছে পরম শান্তিতে। বাইরে বৃষ্টির রাত, আরিফের মনে আশ্চর্য প্রশান্তি; তার একমাত্র ছেলে ও বংশধর আছে তার কাছে পরম নির্ভর হয়ে।

গল্প

নিপুণ

জয়দীপ দে

স্কুলের সবচেয়ে ডিস্টার্বিং ক্লাস হচ্ছে এইট। আমার মন্তব্য নয়; মন্তব্য ভুবনমোহিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত স্যারদের। প্রায়ই তারা ক্লাসে এসে জোরে জোরে টেবিলে জালি বেত মারার পর ক্লান্ত হয়ে উদাস গলায় এ জাতীয় কথা বলেন। সবাই একই ভঙ্গিতে একই কথা। আমাদের ধারণা তারা স্টাফ রুমে বসে এসব নিয়ে আলোচনা করেন। তার পর মহড়া করে নিয়ে ক্লাসে এসে ডায়ালগ ছাড়েন।
মনে মনে বলি, ডিস্টার্বিং-ই তো হবো আমরা। স্কুলের আপদে-বিপদে কে থাকে আমরা ছাড়া। অ্যানুয়াল স্পোর্টসের দিন এত সুন্দর করে স্কুলটা সাজায় কারা– আমরা। কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারি– শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রাতদুপুরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক দেয় কারা– আমরা। অতএব আমরা তো ডিস্টার্বিং। ডাকো না নাইন-টেনের ভাইদের। পড়ার বাহানা করে কেটে পড়বে একেকটা। কিন্তু ঠিক গিয়ে পাবে বাজারের সেলুনে নয়তো গার্লস স্কুলের মোড়ে। স্কুলোপকারের মহানব্রত নিয়ে নেমেছি। তাই লোকের এসব ছেঁদো কথায় আমরা বিশেষ কর্ণপাত করি না। বরং শিরীষ তলায় বসে আড্ডা দিতে গেলে ঘুরেফিরে স্কুলের কথাই আসে। স্কুলের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে টক শোর লোকদের মতো ভারী ভারী কথা বলি। মাঝেমধ্যে তর্ক লেগে যায়। কী স্কুল কী হয়ে

গেল রে! চারদিকে কেবল পড়ো পড়ো দশা। সবকিছুতেই ডাব্বা মারছি আমরা। এসএসসির রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না, কালচারাল কম্পিটিশনে আর থানা লেবেলে আধিপত্য নেই, শেষ ভরসা খেলাধুলা– কিন্তু পর পর দুবার ইন্টার স্কুল ফুটবলে আমাদের টিমলিডার ল্যাং খেয়ে ব্যাঙ হয়ে ফেরার পর থেকে সে আশায়ও গুড়ে বালি। অথচ থানার একমাত্র গভর্নমেন্ট স্কুল, একসময় অন্যরা তো আমাদের পাশ ঘেঁষার সাহস পেত না। আর আজ– নাম শুনলে সবাই দাঁত কেলিয়ে হাসে। 'ওহ, ওমুক স্কুল,' মুখের ওপর তাচ্ছিল্যের থুথু ছিটিয়ে দেয় যেন। ফাইভে বা এইটে কোনরকমে স্কলারশিপটা লাগিয়ে ফেললে হলো; দল বেঁধে চলে যাবে মিলিটারিদের স্কুলে। সুন্দর জুতো-মোজা লাগিয়ে মসমস করে যাবে এ পাক্কা রাস্তা ধরে। যেন ঠিক আমাদের নাকের ওপর দিয়ে। আমরা একেকজন পলাশীর আম্রকাননে পরাজিত নবাব সেজে বিষণ্ন মুখে চেয়ে থাকি। ভাবী আর বলি– যে করেই হোক স্কুলের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

এ ভাবনা শুধু ক্লাস এইটের টিনশেডের ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কি করে যেন সামনের এক চিলতে মাঠ পেরিয়ে টিচার্স কমন রুমেও ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে হঠাৎ ডিডি স্যার এসে ছাইপাশ কি বলে গিয়েছিলেন সবাইকে; তার পর থেকে। পুনরোত্থানের প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন আমাদের একেকজন শিক্ষক। একদিন অ্যাসেম্বলিতে সে কথাই ঘোষণা করলেন আমাদের হেডস্যার নূর বক্স সাহেব। তারপর স্যারদের মিটিং বসল। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো– এই মাথামোটা ছেলেগুলোকে দিয়ে আর যাই হোক লেখাপড়া হবে না। তার চেয়ে বরং এক্সট্রা ক্যারিকুলামে জোর দেয়া হোক, তাতে যদি ভালো কিছু আসে। যে মতে সিদ্ধান্ত সে মতেই কাজ। কালচারাল সাইডের দায়িত্ব দেয়া হলো বায়োলজির ললিত স্যার, আর স্পোর্টসের দায়িত্ব যথারীতি স্পোর্টস টিচার হাই স্যারকে।

চিনতে পেরেছেন আমাদের হাই স্যারকে। না চেনার কিছু নেই। বাংলাদেশের সবাই তাকে চেনে। চিনতে বাধ্য। কথায় কথায় তিনি এমনই দাবি করেন। করাই স্বাভাবিক, তার মতো বিশাল শরীরের মানুষ গোটা দেশে জনাদশেক আছে কিনা সন্দেহ। দূর থেকে দেখলে মাঝেমধ্যে ভ্রম হয়, মানুষ নাকি ছোটখাটো কোনো হাতির বাচ্চা-টাচ্চা। এই বিপুল দেহ আর খ্যাতি নিয়ে তার আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই। একমাত্র উপরওলা বাদে দুনিয়ার কাউকে তিনি কেয়ার করেন না। ক্লাস থ্রির বাচ্চাগুলো বেশি ক্যাচর-ম্যাচর করলে একেবারে ৩ নাম্বার ডিয়ার বলের মতো কিক ছুঁড়ে মারেন। তার ভয়ে দশ পাড়ার বানর এক গাছে উঠে কলা খায়। তার শরীর দেখে নাকি অন্য দলের গোল কিপাররা কাপড় নষ্ট করে ফেলে। আমরা মনে মনে ভাবী, স্যার যদি একবার আমাদের হয়ে মাঠে নামতেন, তো ওদের জালে কেয়ামত হয়ে যেত। আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমাদের স্পোর্টস দল এই বিশাল শরীরের মানুষটিকে নিয়ে সবসময় একটা গর্বের মধ্যে থাকে। দেখ, আমাদের স্যারের শরীরটা, তোমরা চ্যাম্পিয়ান হতে পারো– ট্রফি নিতে পারো, কিন্তু এরকম একটা জীবন্ত কিংবদন্তি পাবে না।

শরীরটা বিশাল হলেও স্যার মানুষ হিসেবে খুব হালকা মেজাজের। সারাক্ষণ একটা চাবির রিং আঙুলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ভাবখানা বাকের ভাই বাকের ভাই। আর মাঝেমধ্যে এটা ওটার ক্লাস নিতে গেলে বই উল্টিয়ে রেখে রাজ্যের যত মজার মজার গল্প করেন। এর মধ্যে কেউ যদি অন্যের পেন্সিল নিয়ে টান মারে, হাফপ্যান্টের তলায় একটা চিমটি কাটে, কৌটোয় 'বান্দরের লোলা' নিয়ে এসে লাগিয়ে দেয় গায় কিংবা কানে কানে বলে 'যাবি নাকি আজ..'– তাহলে রক্ষা নেই। হেসে হেসেই বাদী-বিবাদী দুজনকে ডাকবেন। দুই হাতের তলায় দুটো শালিক ছানাকে নিয়ে আস্তে করে ছেড়ে দেবেন বজ্রমুষ্ঠিখানি। তারপর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মিনিট পাঁচেক কোনো সাড়া-শব্দ নেই। একটা প্রশ্নই শুধু মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাবে, বেঁচে আছি নাকি মরে গেলাম। ৫ মিনিট পর নিঃশ্বাস ফিরে এলে মনে হবে হাড়ের জয়েন্টগুলো সব খুলে খুলে যাচ্ছে। স্যারের হাতে যারা এই বোমবাস্টিক থাবাটি খায়নি, তারা বুঝবে না স্যারের হাত দুটোতে কী পরিমাণ

শক্তি! শক্তি হবেই না বা কেন। একদিন ভূগোলের ক্লাস নিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তার প্রতিদিনকার খাওয়ার রুটিন। তিনি সকালে উঠেই জগে করে ঠিক সোয়া এক কেজি দুধ নিয়ে ঢকঢকিয়ে খেয়ে ফেলেন। তারপর একটু হেঁটে এসে ৪টা ডিমকে একসঙ্গে ওমলেট করে ১৮টা রুটি খান এক নিঃশ্বাসে। দুপুরে একটা খাসি কিংবা গরুর রান খেয়ে আধা সের চিনাবাদম চিবুতে চিবুতে স্কুলে আসেন। রাতে একটু কম খান– দুই কেজি চালের ভাত, ছটা গলদা চিংড়ির দোপিয়াজা দিয়ে। এসব খেয়েই না তার এই শরীর। তিনি সবসময় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যত্ন নিতে বলেন। বিশেষ করে আমার প্লাস্টিক বডি দেখিয়ে প্রায় বলেন, 'একসময় আমি তোর লাহান আছিলাম, খাইয়া দাইয়াই না এই শরীর বানাইছি–'

এত কিছুর মধ্যেও স্যারের একটা খুব খারাপ স্বভাব আছে। তিনি সারাদিন ঘুষ খোঁজেন এবং খান। আমাদের ধারণা ঘুষ খেয়ে খেয়ে যেমন তার ভুঁড়িটা ফুলছে; তেমনি ব্যাংকের একাউন্টও। তার মতো ধনী লোক বুঝি দেশে আর দুটো নেই। অবশ্য তার ঘুষগুলো খুব সামান্য। শরীরচর্চায় ২৫-এ ২৫ পেতে চাও, তাহলে সামনের বার্মাইয়্যার হোটেল থেকে এক কাপ চা আর দুটো জিলেপি নিয়ে এসো, স্যার তারতারিয়ে খাবেন আর নাম্বার বসাবেন। ফুটবল টিমে নাম লেখাতে চাও, কিন্তু মাঠে নামলে বল পায়েই আসে না, অসুবিধে নেই স্যারের জন্য এক প্যাকেট স্টার ফিল্টার নিয়ে আসো– মেজাজ ভালো থাকলে ক্যাপ্টেনও বানিয়ে দিতে পারেন। মাঝেমধ্যে একে-ওকে তিনি হুংকার ছেড়ে বলেন, 'এই তুই আমারে খাওয়াস না ক্যান, দেখি শরীরচর্চায় কেমনে পাস করস!' ফেল করানোর কোনো ইচ্ছে যে তার নেই সবাই তা জানে, এটা স্রেফ ভয় দেখানো। এত বড় একজন দুর্নীতিবাজ হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে আমরা তাকে পছন্দই করি। আমাদের ধারণাটা এরকম, তিনি ঘুষ না খেলে কে খাবেন, ঘুষ খাওয়ার মতো এত বড় শরীর কার বা আছে।

হেডস্যারের জেহাদি ডাকের পর হাই স্যার তার ফুটবল টিম নিয়ে খুব সিরিয়াস হয়ে উঠলেন। টিফিন ব্রেকে সবাইকে একদিন ডেকে পাঠালেন মাঠে। আমরা সৈন্যসামন্তের মতো লাইন করে দাঁড়ালাম। আগামী ফেব্রুয়ারিতে ইন্টার স্কুল ফুটবল, আর যা কিছু জাহান্নামে যাক, এবার থানা চ্যাম্পিয়ন হওয়া চাই আমাদের। আমরা সবাই মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করলাম। 'তোরা চিন্তা করিস না, প্রয়োজনে আমি ঢাকা থেকে কোচ নিয়ে আমু', স্যার আমাদের আশ্বস্ত করেন। আমরা মনে মনে দারুণ উজ্জীবিত হই। ভাবী এবারের সংগ্রাম...। ভাবনার অবকাশ মেলে না। স্যার বাঁশি বাজিয়ে জানান, 'তাইলে আইজ থেইক্যা শুরু হউক প্র্যাকটিস। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর এক ঘণ্টা প্র্যাকটিস।' প্রথম দিন আর বেশি কথা হলো না।

২৫ জনকে নিয়ে একটা খসড়া টিম করা হলো যাতে ১৩ জনই ক্লাস এইটের! আমার তালগাছের মতো হিলহিলে শরীরটাকে তিনি পোস্টিং দিলেন গোলপোস্টের সামনে। ফুটবলের 'ফ'-ও বোঝে না, অথচ গায়ের জোরে স্কুলের সবাইকে ছাড়িয়ে, সেই ওসমানকে নিয়ে এলেন ডিফেন্সে। শুধু একটা ছোট্ট পারশিয়ালিটি করলেন, ডিসি অফিসের বড়বাবুর ছেলেকে তার পদাধিকার (!) বলে দলে রাখলেন। অবশ্য তার থাকা না থাকা একই কথা। কখনো তার পায়ে বল গেছে বলে মনে পড়ে না।

যাই হোক, পরের দিন থেকে জোরেশোরে প্র্যাকটিস শুরু হলো। কিন্তু ঢাকার কোচ দূরে থাক স্যারেরই আর দেখা নেই। স্কুল ছুটি হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেই স্পোর্টস রুমের চাবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গুনগুনিয়ে গান ভাজতে ভাজতে বাসায় চলে যান। তার বাসা অবশ্য বেশি দূরে নয়। স্কুল মাঠ ঘেঁষে একটা ছিপছিপে খাল, তার ওপারে চারচালা টিনের ঘর, তিনি দুটো রুম নিয়ে ভাড়া থাকেন সেখানে। আমরা অপেক্ষায় থাকি, কখন সেই বিখ্যাত কোচ রাতের ট্রেনে এসে সাতসকালে স্কুলের মাঠে হাজির হবে।

আমরা আর স্যারের জন্য বসে রইলাম না। নিজেরাই নিজেদের পারফরমেন্স ডেভেলপ করতে লাগলাম। যে করেই হোক সার্ক থুড়ি থানা চ্যাম্পিয়নশিপ আমাদের চাই। এর মধ্যেই চলে এলো উইন্টার ভ্যাকেশন। পরীক্ষা শেষ, ক্লাসও নেই। আমরা আরো উঠেপড়ে লাগলাম। দুপুরে দু-গ্রাস মুখে দিয়ে চলে আসি মাঠে। পথে স্যারের বাসা থেকে স্পোর্টস রুমের চাবি নিয়ে আনি। একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত চলে প্র্যাকটিস। কিপিংয়ের পাশাপাশি এখন স্ট্রাইকিঙেরও তালিম নিচ্ছি। চারপাশে আর তাকানোর সময় নেই। ফেব্রুয়ারি এই তো চলে এলো!

একদিন দুপুরে স্যারের বাসায় গেছি স্পোর্টস রুমের চাবি আনতে। খুব তাড়া। সবাই মাঠে দাঁড়ানো। কাঠের দরজায় জোরে জোরে আঘাত হানতেই দেখি এঁটো হাতে এগিয়ে এসেছেন স্যার। বিশাল থলথলে শরীর। কখনো কোনো পুরুষের এভাবে বুক ঝুলতে দেখিনি আমি। স্যারের মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। খেয়ালি মানুষ। হাসি-কান্না বা রাগের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই বিশেষ পাত্তা দেইনি।

আমাকে দেখে পরম মমতায় বললেন, আয় ভিতরে আয়।

সাধারণত বাসায় গেলে স্যার এরকম করেন না। আমি দ্বিধাজড়ানো পায়ে ভেতরে গেলাম। একটা ভাঙাচোরা কাঠের খাট। তার ওপরে খাবারের আয়োজন নিয়ে বসেছেন তিনি। খাবার বলতে একথাল লালচে ভাত, কোণায় একটুখানি পাটশাখের তরকারি, তিনি আপন মনে তা চটকাচ্ছেন।

খাইছস। খেতে খেতে বললেন।

আমি মাথা নাড়ালাম।

মিথ্যা বলিস না। ক্ষুধা থাকলে খাইয়া নে। সাপ্তাহে একদিন আমি আবার ডায়েট করি। অনলি ভেজিটেবল। খাবি?

আমি স্যারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। স্যার কী নিপুণভাবে মিথ্যা বলেন।

গল্প

অতঃপর নাইওর

নাসিম জাহান

আজমত আলীর কাপড়ের দোকান। হাটের মধ্যে দোকান থাকায় বেচাকেনা ভালো। দিন মান দোকানে খেটে চলে সে। এই তার সুদিন দুই ছেলে শোভন, রোকন। শোভন কলেজে পড়ে আর রোকন ক্লাস নাইনের ছাত্র। খাদিজা নিপুণ হাতে সংসার গোছায়। চারদিকে ঘর গরিব মানুষের মধ্যে খাদিজাদের অবস্থা ভালো। প্রায়ই মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসে। আজমত আলী ব্যাগভর্তি বাজার সেরে নেয়ে হাটে যায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ একেই বোঝায়।

২

শরাফত ধান্ধাবাজ নামে পরিচিত। মুখে হাসি লেগেই থাকে। লুঙ্গির কোঁচা হাতে জুতোয় মচ মচ তুলে হাটে বাজারে তোলা ওঠায়। সব দোকান থেকে মাসিক ৫০০ টাকা মাত্র। ঐ বাজারে তোলা দুই ধরনের, পুলিশের ভাগ শরাফতের ভাগ, দিতেই হবে। এছাড়া মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, সমিতির চাঁদা ইত্যাদি।

৩

আজ হাটে লোকজন নেই। সকাল থেকে বৃষ্টি ঝরছে। আজমত আয়েশ করে চা নিয়ে বসেছে। হঠাৎ শরাফত এসে হাজির। আজমত বাই চা খাইতাছেন? লন বিস্কুট আনছি। দুজনে চায়ে ভিজিয়ে বিস্কুট খায়। আজমত ভাবে কোন মতলব

কে জানে। শরাফত মিহি কণ্ঠে ডাকে 'আজমত বাই রোজগার পাতিতো বালাই।' আজমত উসখুস করছে, এই আল্লার ইচ্ছায় বউ পোলাপাইন লইয়া খাইয়া দাইয়া চইল্যা যায় আরকি। শরাফত একটি ছবিদেয় তার হাতে 'দেহেন ত? আজমত উল্টে পাল্টে দেখে, একটি অল্প বয়সী মেয়ের ছবি, বেশ কাটা কাটা চেহারা বেশ মগ্ন হয়ে দেখে হঠাৎ বলে, আমার শোভনের জইন্য সম্মন্ধ? শরাফত খেখে করে হাসে। এই ডাইতো ভাবছিলাম তুমি কইবা, না আজমত কেইস ভিন্ন, এই হারাদিন দোকান, বাসা কইর‍্যা হাফ ধরে না, আজমত মাথা নাড়ে ধরে' 'হু সংসার ও ঠিক থাকলো একটু রসও নিলা কেমুন লাগবো ?'
আজমত চমকে ওঠে, সে বুঝাতে পারে শরাফত কি বলতে চায়। 'যুগে যুগে পুরুষ মাইনষে বাধ মানছে? জগৎটা পুরুষের, বুজলানি, এই ফাঁহে ফাহেঁ মউজ মজমা অইলে ক্ষতি কি? এই পরীবানু আইছে ঢাহাখন, লও হের আতের চা খাইবা। এই বাইস্যায় দোহানে কাষ্টোমার নাই, বেশ কর্তৃত্বের স্বরে সে ধমকে আজমতকে রাজি করে নেয়।

৪
পরীবানু, কোড়া লাল জামা পড়েছে, পায়ে রুপার মল, চোখে ঘন কাজল মেখেছে। শরীর থেকে সুগন্ধ আসছে। মিষ্টি হাসিতে ভরে সে ভেতরে বসতে দেয়। আহেন ভিতরে আহেন। আজমতের চোখ সরে না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। বাহিরে তখন ঝাঁপিয়ে বৃষ্টির দাপানি। পরীবানু এক কাপ রঙ চা এগিয়ে দেয়। হাতে সদ্যো মেহেদী লাগানো চুড়িতে রিনটিন শব্দ। 'লন পাতলা রঙ চা'।
শরাফত গমগম করে কথা বলে লও আজমত ভাই অর চা, ভালা লাগবো।'

৫
আজ ফিরতি পথের চেহারা টাই বদলে গেছে। ঘাসপথের পাশের ডোবা উপছে গেছে জোয়ারের পানিতে, কচু পাতার ওপর ঝিলমিল করছে মিঠে রোদ্দুর। ব্যাঙের ঐকতান কানে কর্কশ ঠেকছে না। শরীর মন হালকা আনন্দে ভরে গেছে। আজমত আজ ফুরফুরে। হাতে ঠোঙা ভরা মিঠাই। ঘরে ফিরে ভেজা ছাতা জুতো রেখে সিগ্রেটে মুখ টান দেয়। বউ হেঁশেল খানায় খাবার গরম বসিয়েছে। অ শোভনের আম্মা রাইতে চাইলে ডাইলে খিচুড়ি করতানি। বউ জব দেয় 'লাগতো না রাইন্দা ফালাইছি উঠেন খাইবেন'। জুৎ করে বসে মাখিয়ে মাখিয়ে মুরগির মাংস খায় সে। বাইরে শোভন এবং রোকন এসে পড়েছে। ওরাও তাড়াতাড়ি বসে পড়েছে। খাদিজা শোকোর গুজার করে। বড় কপালে এমন সুখের সংসার পেয়েছে সে। মনে মনে আল্লাকে ডাকে। এমন টাই যেন থাকে চিরটাকাল।

৬
ক্রমেই বাজার ঘাট কমে আসে। ছেলেরা তরকারি খেতে চায় না। ছোট মাছের চচ্চরিতে এসে ঠেকেছে সব। খাদিজা কারণটা জানতে চায়। 'শোভনের বাপ এককান কত্তা জিগাই, আমনের দোকানে কি বেচা কেনা কম নি ?' 'হ কম, ঠাডা পড়ছে দ্যাশটায় হরতাল অবরোধ মানুষ ঘরের থন বাইরায় না। খাদিজা নীরব থাকে।

৭
আজমত আজকাল দেরিতে ঘরে ফেরে। কোনো কথা তুললেই কর্কশ গলায় জবাব মেলে না। খাদিজা জানতে চায় 'এত রাইত করেন ক্যা আমার ডর করে।' 'ঐ মিটিং আছিল, শরাফতের দলের লোকজন ধইর‍্যা লইয়া যায়।' 'মিটিং বালা না, বড় খুন খারাপি চলতাছে, সাবধানের মাইর নাই'। 'এত চিন্তা করনের কাম নাই।'

৮
খাদিজা কানাঘুষায় জানতে পারে ব্যাপারটি। সে মুষড়ে পড়ে, তার প্রিয় মানুষটি অন্য নারীতে আসক্ত এমনটা সে কখনো ভাবেনি। গাঁয়ের ঈমাম সাহেবকে একদিন দাওয়াত করে সে। শোভনের বাবা অজু করতে পুকুরে গেলে খাদিজা জানতে চায় 'হুজুর এই তো ব্যাপার' হুজুর বললেন 'বড়ই অন্যায় ও গর্হিত অপরাধ মা জননী।' খাদিজা চোখের জলে বলে 'হুজুর ফিরানের পথ নাই?' ঈমাম সাহেব বিচক্ষণ মুরব্বী'। আছে মা তুমি ধৈর্য ধর আমি দেখছি কি করা যায়।' খাদিজা কিছু দোয়া ও তাবিজ নেয়। ঈমাম সাহেব আজমতকে স্মরণ করিয়ে দেন আখেরাতের রাস্তা মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান করেন।

৯
আজমতের হাবভাব, পোশাক-পরিচ্ছেদে সবই বোঝা যায়। খাদিজা নিজেই প্রতিবাদ করে বসে। 'শোভনের বাপ আমনের মতিগতি সুবিধার বুঝি না। আজমত ক্ষিপ্ত স্বরে বলে 'তুই ভাত টিপস ঐডাই কর, বেশি ফালবিনা' খাদিজা চিৎকার করে জানায় 'শোভন রোকন বড় হইছে, অরানি ঠিক থাকপো? আমনে ঠিক না থাকলে অইব? আজমত রুক্ষ স্বরে জবাব দেয় 'তয় তোর কাছে বইয়া রইলে খাওন জুটবো? বাপের বাড়ির থন দুই আনা আনছিলি হ্যাঁ, এত তড়পাবিনা।'
অতঃপর খাদিজা সুটকেস গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কৃষ্ণ সন্ধ্যায় খাদিজার গোছানো সংসারে আলো জ্বলে না। আজমত একবার উঁকিও দেয় না । সে জানে মুর্খ স্ত্রীটির বাপের বাড়িতে জায়গা হবে না । সে ফিরবে এবং লেজ মোড়ানো জন্তুর মহত সংসারের জোয়াল কাঁধে নিবে।

১০
খোদেজা নামাজ সেরে বৃদ্ধ মায়ের দুধ সাবু রান্না করে দেয়। ভইয়ের ছেলেরা একটি টিভি প্রোগ্রাম দেখছে এবং চিৎকার করছে। ওর মাথা ধরে। ভাবী ফজিলা চাপা স্বরে তার ভাইকে বলছে 'আমনের বইনে হেইযে আইলো আরতো যা ওনের নাম নাই। জামাই ও আইলো না খোঁজ নিলো না। ভাই জানায় 'সবুর কর আমনে আইছে আমনেই যাইবো' ভাবী খুব চটকে কথা বলে 'হুনছি খাদির জামাই এ বোলে বাজাইর‍্যা ধরছে। কি কেলেঙ্কারি ঘরে ডাক্তর পোলারা আছে।' ভাই ধমক লাগায় 'তুই চুপ যা, সময় গেলে সব সইয়া যাইবো। তোর তো বালা দুমাস রানীর হালে থাকলি। বইন আমার বইয়াতো থাহে নাই।'
খাদিজা বুকে ব্যথার পাথর ভাঙে, চোখ ভেঙে পানি নামে। শোভন রোকন ও একবার মাকে দেখতে আসেনি। ওরা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দরিদ্রতা কিনতে রাজি নয়। ঠিকা কাজের ঝি রেখে আজমত সংসারের হালটা ঠিক রেখেছে। ছেলেদের ইস্কুলের কলেজের বেতন দিয়েছে। ছেলেদের হাতে ঘুষ হিসেবে দুটি মোবাইল কিনে দিয়েছে।

১১
আসরের আযান শেষ হতে সূর্যটা হেলে পড়ে। দূরের গাঁয়ে আবছায়া বিকাল হেঁটে যায় সঙ্গে সূর্যটাও। ঈমাম সাহেব এসেছেন খাদিজার ভাইর বাড়ি। এমন মানুষের দেখা পেয়ে সকলে ধন্য মনে করে। নামাজ শেষে তিনি শরবত এবং ফল খান। ভেতরে খাদিজা শোনে মনোযোগ দিয়ে। 'মা তোমার চোখের পানি আল্লাহ শুনেছেন। তুমি এবার বাড়ি ফিরতে পারো। আজমত হুশ হারানোর পোলা নয়। সে বুজদার পুরুষ। সে বুঝেছে। কিন্তু তারে আর খোঁচাইও না। জীবনে ভুলচুক হইতে পারে। ক্ষমা কইর‍্যা তুমি সন্তানগো দিগে চাইয়া আইস্যা পড়ো। সংসারের হাল ধরো। খাদিজা এবার হুশ ফিরে পায়। ঐ রাতেই আহার শেষে হুজুর ফিরে যান।

১২
আজ শুক্রবার। আজমতের হাটে যাবার তাড়া নেই। ছেলেরা খেলতে বেরিয়েছে। বাড়িটা দুমাসেই মরা বাড়ির রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে পরীর ঘরে যাতায়াত কমে এসেছে। ওর নানান বায়না ক্কাতে আজমতের দোকানের ব্যবসাতেও কুলোচ্ছে না। এবার পরী একটি জমির নকশা দেখিয়েছে। দাম শুনে আঁতকে যায়। পরী মধুর স্বরে জানায় জাগাডা কিনেন, সংসার থুইয়া আইয়া পড়েন দুইজনে নিরালে ঘর বান্দুম। এইরম কতজনেই ঘর ভাঙে। এই দুইন্যাইতে নিজের সুখটাই বড় বুজেন। আজমত ঘরে ফিরে আসে। পরীর দালাল তার কাছে হুমকি পাঠায় পরী কেস ঠুকবে, প্রতারণার কেস। আজমতের রাতের ঘুম নষ্ট। ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে কিন্তু রাটি করনের নাই। এমন কাজ কত পুরুষেই করে থাকে কিন্তু তাদের গায়ে লাগে না। আজমতের শরীরে জলবিছুটি লাগে। বাড়ির সামনের রাস্তায় একটি রিকশা এসে থামে। খাদিজা আর ভাইর ছেলে এসেছে। কিরে হাসু বালা আছতনি? তর বাজানে কেমন আছে? আজমতের সম্ভাষণ থেকে বোঝা যায় খাদিজার আমন্ত্রণ, তাকে গ্রহণ। টাঙ্গাইল শাড়িতে জড়ানো মাথায় ঘোমটা দেয়া স্ত্রীকে দেখে আজমতের বুকের ভেতর নরম পলীর মতো আর্দ্রতা ছড়ায়।

IT'S A
GIRL
THING
SYMPHONY W94
1.3 GHz Quad core processor | 4.5" IPS FWVGA Display | 8MP (AF)+ 2MP | RAM 1 GB + ROM 8 GB
Available in 4 different colors:
Pink, Golden, White & Black
A Product of EDISON Group
SYMPHONY
new experience

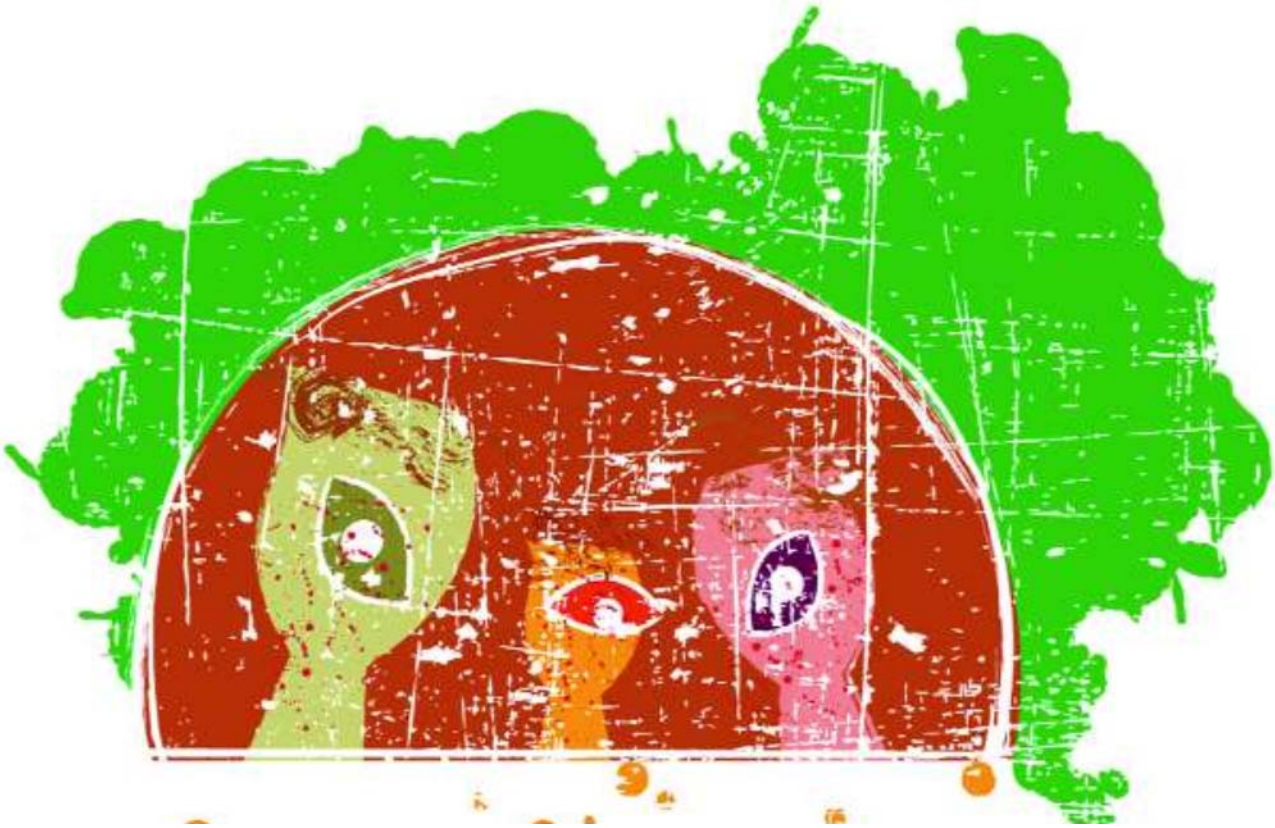

গল্প

অন্তর্দ্রোহ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

সকালে ঘুম ভাঙার জন্য সুলতানের অ্যালার্ম ক্লকের প্রয়োজন হয় না। তাদের বাড়ির পাশে তিনটে বড় বড় দেবদারুর গাছ আছে। সূর্য ওঠার অনেক আগেই গাছের পাখিগুলো কিচিরমিচির করতে থাকে। পাখির ডাকে সুলতান আর চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। চোখ খুলে প্রথমে হাই তুলে বিছানার ওপর উঠে বসে। বারান্দার এক কোণে রাতে শোয়ার আগে আরিফা বালতিতে পানি ভরে পাশে একটা মগ রেখে দেয়। সুলতান বিছানা থেকে উঠে বালতিতে মগ ডুবিয়ে পানি তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। বারান্দার ডান দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে প্রতিদিনের মতো আজও আরিফা চুলো জ্বালিয়ে রুটি সেঁকছে।

ছোট ঘরে মাদুর বিছিয়ে মেয়েকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী রাতে শুয়ে পড়ে। নুরুননাহার মায়ের পাশেই ঘুমোয়। মেয়ের দিকে তাকাতেই আহত পাখির মতো সুলতানের সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। হাত-পা জড়িয়ে একপাশে কুঁজো হয়ে শুয়ে আছে নুরুননাহার। জন্মের পর থেকেই মেয়েটা বিকলাঙ্গ। চৌদ্দ বছরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোলে করে বাইরে আনতে হয়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে আরিফা মেয়েকে খাইয়ে মুখ-হাত ধুয়ে দেয়। সবাই বলে মেয়েটা সংসারের বোঝা। সুলতান এসব কথা গায়ে মাখে না।

'না গো ও আমাদের বোঝা নয়, ও আমাদের

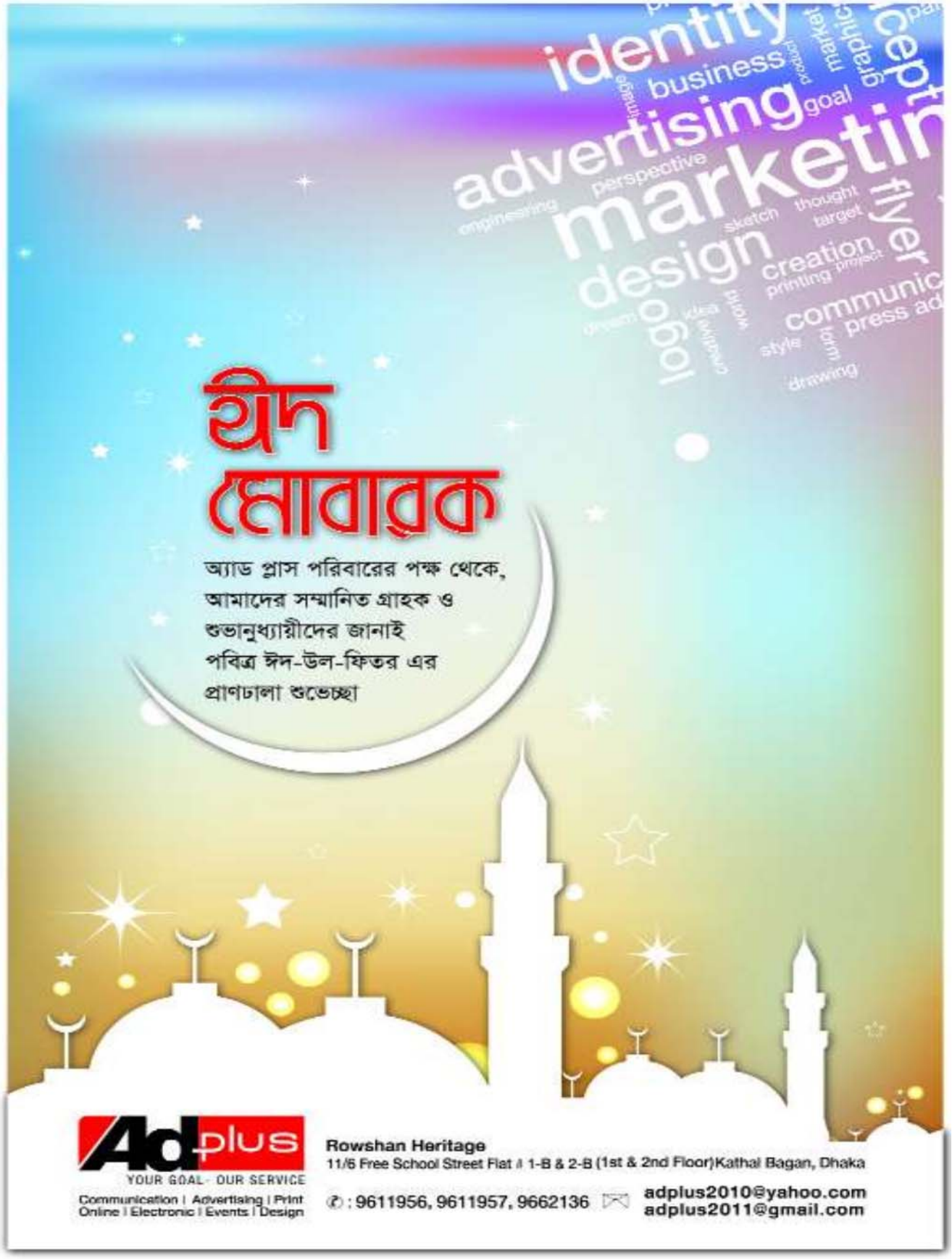
identity
business
advertising
goal
marketing
perspective
design
creation
printing
project
flyer
thought
target
sketch
logo
press ad
style
drawing
ঈদ মোবারক
অ্যাড প্লাস পরিবারের পক্ষ থেকে,
আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা
Adplus
YOUR GOAL - OUR SERVICE
Communication | Advertising | Print
Online | Electronic | Events | Design
Rowshan Heritage
11/6 Free School Street Flat # 1-B & 2-B (1st & 2nd Floor)Kathal Bagan, Dhaka
: 9611956, 9611957, 9662136
adplus2010@yahoo.com
adplus2011@gmail.com

স্বাধীনতার সময়ের ফসল।'
স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ দিকে আরিফার কোলে এসেছিল নুরুননাহার। বিকলাঙ্গ মেয়েটা তাদের কাছে কোনো বোঝা নয়, গাছের একটা ফুলের মতোই প্রিয়।
'কি গো পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল?'
স্বামীর দিকে চেয়ে হাসে আরিফা।
'রুটি আর আলু ভাজা করেছি খেয়ে নাও। নুরুন-নাহারের ঘুম ভাঙলে ওকে খাইয়ে দেব।'
'জানো, ওই পাখির কিচিরমিচির শব্দ আমার কাছে ঘড়ির অ্যালার্মের মতো।'
আরিফা স্বামীর কথায় হাসে, কোনো কথা বলে না। সুলতান গুনে গুনে তিনটে রুটি খায়।
'আর একটা নাও না।' আরিফা একটা রুটি নিয়ে স্বামীর বাসনে রাখতে যায়। সুলতান ওর হাত চেপে ধরে বলে, না, নুরুনের মা, তিনটের বেশি রুটির দরকার নেই। তোমাদের কম পড়বে।'
আরিফা কোনো কথা না বলে হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজে বসে থাকে। তার মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর কথার নড়ন-চড়ন হয় না। স্বামীর আদর্শ তাদের দারিদ্র্যের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখলেও সে অন্যায়ভাবে কোনো দিন বেড়া ভাঙতে চায়নি।
খাওয়া শেষ করে সুলতান শার্টটা গায়ে চাপিয়ে পকেটে দোকানের চাবিটা ঠিক আছে কি না দেখে বারান্দা থেকে নিচে নামার পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, নুরুনকে ঠিকমতো দেখ। বাড়িতে তুমি ছাড়া তো ওর আর কেউ নেই।'
আরিফা মাথা নাড়ে। রাস্তায় স্বামীকে যতক্ষণ দেখা যায় সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। পাশের রাস্তায় সুলতান অদৃশ্য হওয়ার পর তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। লোকটা মচকাবে কিন্তু ভাঙবে না।
শহরতলির একদিকে সুলতানের ছোট একটা চায়ের স্টল। দোকানের চারপাশে কঞ্চির বেড়া। দোকানের সামনে ছোট ছোট প্যাকেটে আচার আর চিপস ঝোলানো। একদিকে একটা বোয়েমে কিছু বিস্কুট আর অন্যদিকে চুলো, কেটলি আর গোটাকতক চায়ের কাপ। দোকান খোলার পর হকার ছেলেটা একটা সংবাদপত্র তার হাতে তুলে দেয়।
'কেমন আছেন চাচা?'
'ভালো। তুমি কেমন?'
'আগের মতোই চাচা, আমাদের কি আর দিন বদলাবে? গরিবই থেকে গেলাম চিরকাল।'
সুলতান ওর পিঠে একটা হাত রেখে স্নেহভরে বলে, দুঃখ করো না মতিন, মানুষের চিরকাল একরকম থাকে না। সবার দিন বদলায়, তোমার কেন দিন বদলাবে না?'
'জানিনে চাচা, জীবনে কোনো আশার আলো দেখতে পাইনে। চললাম, অন্যদের কাগজ দিতে।'
মতিনের অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে সুলতান চায়ের কাপ ঠিক করতে থাকে। তার দোকানে অনেকেই চা খেতে আসে, কিন্তু সবার আকর্ষণ ওই সংবাদপত্রের দিকে। একটু বাড়তি খরচ হলেও এই কারণে সুলতান একটা কাগজ রাখে। মেহেরপুরের এই অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে কাগজ রাখে না।
সবেমাত্র চুলোয় আগুন দিয়েছে হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে ওসমান শেখ দোকানের পাশে রাখা বেঞ্চিতে বসে বলে, কি গো মুক্তিযোদ্ধা কেমন আছ?
সুলতান তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসিতে তরঙ্গ তুলে বলে, চাচা, আপনি মুক্তিযোদ্ধা শব্দটাকে আর বাদ দিতে পারলেন না?
'পারব কেমন করে? ওটাই তো তোমার মাথার মুকুট। আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধ করতে পারিনি, শুধু তোমাদের দিকে তাকিয়ে তখনকার ছবি আঁকতে চেষ্টা করি।' ওসমান শেখ খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বলে, এক কাপ চা দাও। চা খেতে খেতে খবরগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই।'
ওসমান শেখের পর আরো কয়েকজন খরিদ্দার আসে। সবাই খবরের কাগজের পাতা ভাগ করে চা খেতে খেতে গল্প করে। দুপুরের সময়ও দু'একজন চা আর বিস্কুট খায়। দু'একজন ছোট ছেলেমেয়ে চিপস আর আচার কেনে। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খদ্দেরের আনাগোনা কিছুটা বেড়ে যায়। দুপুরে একসময় খাবারের ছোট বাক্সটা খোলে। আরিফা যত্ন করে দুপুরের খাবার তার হাতে তুলে দেয়। সেদিকে তাকিয়ে সুলতান মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়। কখনো আলুর তরকারি, কখনো বেগুন ভাজা বা পটোল– আলু মিশিয়ে একরকম ঘণ্ট। এর বেশি কিছু করা আরিফার পক্ষে সম্ভব নয়, সে সব সময় স্বামীর আয়ের দিকে তাকিয়ে রান্না করে। আশ্চর্য, মেয়েটা বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে একটা কথাও বলেনি। সুতির মোটা আভরণকেই আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে। রুটি ছিঁড়ে আলুর তরকারি ভেতরে নিয়ে আস্তে আস্তে খায় সুলতান। অন্ধকারের মধ্যেও আরিফার চোখ দুটো উজ্জ্বল আলোর মতো তার সামনে ভাসতে থাকে।
মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা দোকানের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকে সুলতান। তারুণ্যের শক্তিতে সে তখন বটগাছের মতো সংসারে দাঁড়িয়ে। সবেমাত্র মা তার বিয়ে দিয়েছে একই গ্রামের আরিফার সঙ্গে। যৌবনের উচ্ছলতা আরিফার সারা গায়ে ছড়ানো। বিয়ের পর বউয়ের দিকে তাকিয়ে সুলতান তাকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে এনেছিল। কী নরম আরিফার সর্বাঙ্গ। আরিফা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'ছি, ছাড়। মা পাশেই আছে, দেখলে কী ভাববে?'
সুলতান আরিফাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভাববে আমার ছেলে সত্যিই বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে।
'তুমি একটা অসভ্য।'
'অসভ্য বলেই তো তোমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছি, তা নইলে তো তোমার কাছ থেকে দূরে বসে শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তুমিও বুঝতে না লতাকে বড় একটা গাছ জড়িয়ে ধরার কী আনন্দ।'
আরিফা আর কোনো কথা বলেনি। স্বামীর বুকে পিষ্ট হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো অনবরত কেঁপে উঠেছিল। একটা গভীর পুলক ছড়িয়ে পড়েছিল তার সারা দেহে। যৌবনের প্রথম আস্বাদ নীরবে উপভোগ করেছিল দু'জনেই।
সোমবার সকালে চায়ের স্টলের ঝাঁপ খুলতেই সুলতানের চোখে পড়ে ওসমান শেখকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু আগেই এসেছে।
'ওহে, তাড়াতাড়ি এক কাপ গরম চা দাও। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।'
ওসমান শেখ খবরের কাগজে চোখ বুলাতে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক বলে মনে হলো। সুলতান কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই নিন আপনার চা।
ওসমান শেখ মৃদু হেসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতে নিতে বলে, আমি তো বিস্কুটের কথা বলিনি, তুমি দিলে যে।
সুলতান একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আপনার কথা শুনে মনে হলো সকালে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তাই বিস্কুটটা দিলাম।
ওসমান শেখ আর কোনো কথা না বলে চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে লাগল। চা পান শেষ করে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা সুলতান, তোমার বউয়ের সঙ্গে কখনো ঝগড়া হয় না?
ওসমান শেখের কথায় সুলতান খানিকটা বিব্রত হয়, তার মুখে এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন কোনো দিন শোনেনি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমাদের ছোট সংসারে ঝগড়া করার সুযোগই পাইনে। ঝগড়া করব কী নিয়ে? 'তাহলে ভালোই আছ বলতে হবে।' একটু চুপ করে থেকে ওসমান শেখ বলে, 'আজ সকালে আমার বউয়ের সঙ্গে একদফা ঝগড়া হয়েছে। আর এক কাপ চা দাও তো, তোমার চা যতই খাচ্ছি ততই ভালো লাগছে।'
সুলতানের ইচ্ছা হয়েছিল ঝগড়ার কারণ জানতে, কিন্তু তার পরিধির মধ্যে নয় বলে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে না।
'কৈ ঝগড়ার ব্যাপারে তুমি তো কিছু বললে না?' ওসমান শেখ জিজ্ঞাসু নয়নে তাকায় সুলতানের দিকে।
'আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে জিজ্ঞেস করিনি। আমার মনে হয় যাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে তাদের মধ্যেই ঝগড়া হতে পারে।'
ওসমান শেখ স্মিত হেসে সুলতানের দিকে তাকায়।
'মাঝে মাঝে তুমি দার্শনিকের মতো কথা বল।'
'কী যে বলেন আপনি, আমার পক্ষে স্কুলের গণ্ডিই পার হওয়া সম্ভব হয়নি ওসব বিদ্যে জানব কেমন করে।'
দুজনের কথার মধ্যে বাধা পড়ে অন্যরা দোকানে আসতে থাকার পর। সুলতান অনবরত চা বানাতে থাকে। চায়ের কাপে চামচের আঘাতে অনবরত টুং টাং শব্দ হতে থাকে। এভাবেই

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমার জগতে এক অনন্য নাম

অগ্নি, নৌ, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ বীমার
সর্বোত্তম সেবা প্রদানে সারা বাংলাদেশে রয়েছে

আমাদের ৩৮টি শাখা

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
ISLAMI INSURANCE BANGLADESH LIMITED

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়

রূপায়ন তাজ (৩য় তলা)
১, ১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৭৩৫৩ পিএবিএক্স ঃ ৮৩১৭৩২০, ৮৩১৭৬৭১, ৮৩১৭৭৩৭ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৩১০৩২
ওয়েবঃ www.islamiinsurance.com ই-মেইলঃ islamiinsurance@gmail.com

বারোটা বেজে যায়। ওসমান শেখ তখনো বেঞ্চির একদিকে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। সুলতান তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবেন? বাড়িতে চিন্তা করতে পারে।
'না হে, আমার জন্য চিন্তা করার কেউ নেই। তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করো না।'
এভাবে আরো এক ঘণ্টা কেটে যায়। সুলতান ওসমান শেখের সামনে এসে বলে, 'আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।'
'বল, বল, তুমিও আমার আপনজনের মতোই। কোনো কিছু বলতে দ্বিধা করো না।'
সুলতান বিনম্রভাবে বলে, 'এবার আপনি বাড়ি যান। গিয়ে দেখবেন ভাবীর সব রাগ পড়ে গেছে। আপনার জন্য দুপুরের খাবার সাজিয়ে বসে আছেন আর অনবরত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বাইরে তাকিয়ে আছেন।'
লোকটা বলে কী? ওসমান শেখ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন সময় থেকে বেরিয়ে এসে চমকে ওঠে। দাঁড়িয়ে সুলতানের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে শুধু বলে, 'সুলতান!' তারপর বাড়ির দিতে দ্রুত পা ফেলতে থাকে।
পরদিন ওসমান শেখ প্রত্যেক দিনের মতো সবার আগেই সুলতানের চায়ের দোকানে আসে। হাতে একটা টিফিন বক্স। বেঞ্চিতে বসে মুখে একগাল হাসি ফুটিয়ে বলে, 'এক কাপ চা দাও তো খুব ভালো করে।' ওসমান শেখের মুখের ওপর থেকে অন্ধকার সরে যাওয়ায় সুলতান মনে মনে খুশি হয়।
'এই নিন আপনার চা?'
ওসমান শেখ তার দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'কৈ, আজ তো আর বিস্কুট দিলে না?'
সুলতান হেসে ফেলে।
'আপনার মুখ থেকে বুঝতে পারছি আজ আপনার আর বিস্কুট লাগবে না।'
ওসমান শেখের চোখে-মুখে হাসি ফুটে ওঠে।
'তুমি অন্তর্যামী নাকি? এমনভাবে কী করে মনের কথা বল, বল তো?'
সুলতান হেসে দোকানের ভেতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ওসমান শেখ তার একটা হাত ধরে টিফিন বক্সটা তার হাতে তুলে দেয়।
'তোমার জন্য আমার স্ত্রী গতকাল বিকেলে নারকেলের লাড়ু তৈরি করেছে। তুমি গতকাল যেসব কথা বলেছিলে তা ধ্রুবতারার মতো সত্যি হয়েছে। আসলে তোমার গণৎকার হওয়া উচিত ছিল।'
সুলতান কোনো কথা না বলে টিফিন বক্সটা নিয়ে দোকানের ভেতরে একদিকে রেখে দেয়। বাড়িতে আরিফা আর নুরুন্নাহার একটার পর একটা লাড়ু খায় মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটিয়ে। কতদিন যে তারা এমন মিষ্টি খায়নি! সুলতান তাদের পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে। তার জন্য রাখা চারটে লাড়ুও সে আরিফা আর নুরুন্নাহারের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'ওগুলো তোমরা দুজনে খেয়ে নিও।' তারা তা করেনি।
নুরুন্নাহার হাতে লাড়ু নিয়ে খানিকটা কষ্ট করে বাবার মুখের দিকে লাড়ু এগিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছিল, 'না বাবা, তুমিও খাও।' সুলতান তার হাত ধরে লাড়ুটা মুখে দিয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটা কথা বলতে পারে না, কিন্তু সেই বোবা মেয়েটার অন্তরেও ভালোবাসা লুকিয়ে আছে তার এই দরিদ্র পিতার জন্য। রাতে বিছানায় শুয়ে অনবরত এপাশ-ওপাশ করেছিল সুলতান। সারা রাত চোখের পাতা ফেলতে পারেনি। তাদের জীবনে এমন উপহার এলো কিন্তু চাঁদের মতো কলঙ্ক নিয়ে কেন? ফুটফুটে মেয়েটা শুধু বোবা দৃষ্টি নিয়ে মা-বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে হাসার চেষ্টা করে কিন্তু ঠোঁট দুটো বেঁকে যায় গাছের একদিকে কাত হওয়া ডালের মতো।
চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত প্রশ্ন করে ওসমান শেখ।
'দেখ সুলতান, প্রায়ই আমার একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করে, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তোমার আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো নয়। তুমি মুক্তিযোদ্ধা ভাতার জন্য আবেদন কর না কেন?'
সুলতানের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ছাঁকনি দিয়ে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে, 'চাচা, আমরা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছি, কোনো আর্থিক সুযোগ পাওয়ার জন্য নয়। আমি মুক্তিযোদ্ধার ভাতার জন্য আবেদন করব কেন, তারাই তো আমাকে খুঁজে ভাতা দিতে পারে। আমি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে হাত পাততে যাব– এ কথা ভাবতে খুব খারাপ লাগে। আমার ঘরে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিন দিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে অথচ কেউ কোনো খোঁজ নেয় না। আর আজ রাজাকাররা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ভাতা পাচ্ছে, এর চেয়ে বড় দুঃখ কী হতে পারে।'
কথা শেষ করে সুলতান হাঁপাতে থাকে। তার দেহে এখনো অনেক স্প্লিন্টার ঢুকে আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে গিয়ে কোনো লাভ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি নিয়েই দিন কাটাতে হবে। আরিফা প্রতিবেশীদের কাঁথা সেলাই করে মাঝে মাঝে সামান্য আয় করে। বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে বাড়িতে একা রেখে বাইরে যেতে সাহস করে না। বাপ-দাদার আমলের ছোট বাড়িটা ছিল বলে কোনোক্রমে মুখ বুজে এখানে পড়ে আছে। চা বিক্রির টাকা দিয়ে সংসার চলে, স্ত্রী-মেয়ের আবদার পূরণ করতেপারে না। গরিব মানুষের কোনো স্বাধ-আহ্লাদ নেই, সেসব আছে তাদের গ্রামের দোতলা বাড়িতে, যারা পায়ের ওপর পা তুলে মুখে হুঁকোর নল নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে আর কালো টাকা ঘরে তোলে শ্রমিকদের দেহের ঘামের বিনিময়ে আর চোরাকারবারি করে। এদের তিন-চারটে বউ ঘরে আনতে কোনো বাধা নেই, পালাবদলের খেলা তারাই ভালো জানে।
চোখ বুজলেই সুলতানের চোখের সামনে তিন যুগের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কী উত্তাল তখনকার দিনগুলো। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজাকাররা দেশে ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করে চলেছে। মেহেরপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পতপত করে উড়ছে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে আরো অনেক আওয়ামী লীগ নেতারা সরকার গঠন করেছেন। খবর শুনে চারপাশের গ্রামের লোকেরা ছুটে গেছে সেখানে। সুলতানও বন্ধুদের সঙ্গে সকালে গিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরেছিল। নিজের উত্তেজনাকে দমন করার ক্ষমতা তার নেই। বন্ধুদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে নিজেদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে। বাড়িতে মার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। বুকের মধ্যে উন্মাদনা চেপে সে বাড়ির দিকে রওনা হয়। অন্ধকার বাড়ি দেখে খানিকটা বিস্মিত হয় সুলতান। মা সন্ধ্যের আগেই হেরিকেন জ্বালায়।
'মা, কোথায় তুমি? বাড়ি এত অন্ধকার কেন?'
সুলতানের কথায় কেউ কোনো সাড়া দেয় না। সুলতান ঘরের ভেতরে ঢুকে নিজেই হেরিকেন জ্বালায়। হেরিকেনের স্তিমিত আলোতে ঘরের এক কোণে মাকে কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে এগিয়ে যায়।
'মা, এখানে এমনভাবে বসে আছ কেন?'
মা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, 'চুপ। আমাকে ছুঁবি নে, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি।'
সুলতান অপলক নয়নে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের সাদা শাড়ির অনেকটা রক্তে লাল হয়ে গেছে আর সেই রক্ত নিয়ে মা অন্ধকার গুহায় নিজেকে বন্দি করে রেখেছে। মা বলে চিৎকার করে সুলতান দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই মা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একপাশে দ্রুত সরে যায়। 'তোমার এমন অবস্থা কারা করল মা? বল, আমি তাদের এখুনি মাটির ভেতরে পুঁতে রাখব।'
'না। বেদনায় কাতর হয়ে বলে মা। তুই ওদের সঙ্গে পারবিনে। আমি আদেশ করছি, তুই মুক্তিযুদ্ধে যা। যেখানেই পাবি সেখানেই পশুদের শেষ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবিনে।'
মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে সারা মুখ ঢেকে রাখে। শুধু তার চোখজোড়া দেখা যায়।
'তুই কাল গিয়ে বউমাকে তার বাপের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে বলবি। ওর পেটের বাচ্চা যেন নষ্ট না হয়। আমার কথা ভুলেও বলবিনে।'
বিহ্বল সুলতান কী করবে বুঝতে পারেনি। তার সারা দেহ ক্রমে অসাড় হয়ে এসেছিল। মার দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো বসে ছিল। সারা রাত কেমন করে কেটেছিল তা মনে ছিল না। শুধু এটুকু তার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে, মা যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে আর নড়েনি। সকালে মাকে ঘরে না দেখে প্রথমে বিস্ময় পরে একটা অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে। ঘরের বাইরে গিয়ে উঠোনের দিকে তাকাতেই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে ঘামতে থাকে। উঠোনের বকুলগাছে শাড়ি গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। বিস্রস্ত চুলগুলো সারা মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।
মা বলে চিৎকার করে সুলতান মায়ের দেহটা নিচে নামিয়ে আনে। মায়ের বুকে মাথা রেখে

cweÎ C`-Dj-wdZi
Dcj‡ÿ
mevB‡K RvbvB
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ঈদ মোবারক

Letter n Colour Ltd.
Adding life to paper

Head Office :
43, Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16, Shantinagar), Dhaka-1217
Phone : 9335826, Fax : 8318526
Web : www.lcl.com.bd

শেখ সিরাজ উদ্দিন
†Pqvig¨vb

ইউনিলিভার কেয়ার লাইন
০৯-৬৬৬-৯৯৯-৬৬৬

দীপিকার নিজের পছন্দের সুরভি নিয়ে
নতুন LUX স্টার কালেকশন
সুরভিত সৌন্দর্য যা জাগায় ভালোবাসার নতুন আবেশ!

Deepika Padukone

Unilever
STAR COLLECTION
LUX
Sweet Temptation
By
Deepika Padukone
DEEPIKA PADUKONE
LUX
বাস, একটুখানি LUX

কাঁদতে কাঁদতে বলে, এ কী করলে মা? এভাবে নিজের জীবন কেন নিলে? মা বলে ডাকার কেউ রইল না আর।
সুলতানের তীব্র চিৎকার অনেকের কানে যায়। প্রথমে বাড়ি থেকে বেরোতে কেউ সাহস করে না। সূর্য ওঠার পর একে একে আশপাশের বাড়ির লোকজন এসে ভিড় করে। বৃদ্ধ আনসার আলি সুলতানকে মায়ের বুক থেকে তুলে এনে বলেন, 'বাবা মায়ের জন্য চিরজীবনই তো তোমাকে কাঁদতে হবে। এখন নিজেকে সংবরণ করে তোমার মাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা কর। তাতেই তোমার মায়ের শান্তি হবে।' পাশের বাড়ির রহিমা খালা মৃতের গা ধুইয়ে দিয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়। মাকে কবর দেয়ার পর সুলতান কবর থেকে একমুঠো মাটি হাতের মধ্যে রেখে বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার এ অপমানের শাস্তি দেব আমি। কবরের মাটি ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যারা তোমার সম্ভ্রম নষ্ট করেছে তাদের কাউকে আমি ছাড়ব না। চললাম মা মুক্তিযুদ্ধে, দোয়া করো তোমার ছেলেকে।'
মাকে কবর দেয়ার পর সুলতানকে কেউ আর গ্রামে দেখেনি। শুধু শুনেছে একটার পর একটা খবর : সুলতানের মায়ের যারা সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল তাদের পাঁচজনেরই মৃতদেহ পাওয়া গেছে বাড়ির পাশের পাট ক্ষেতে।
সুলতান নয় মাস আর বাড়িতে ফেরেনি। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করেনি। শত্রুদের মারতে হবে, এ দেশে ওদের কোনো ঠাঁই নেই। যুদ্ধ থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে রাতে ঘুমোনোর পর সকালে হাতে অস্ত্র নিয়ে আবার বের হয়ে গেছে। সারা রাত শত্রুদের অপেক্ষায় সতর্ক প্রহরায় থেকে সকালে আবার ফিরে এসেছে নিজেদের আস্তানায়। একবার শত্রুদের ছাউনি আক্রমণ করার সময় কাঁধে গুলি লেগেছিল। হাসপাতালে কদিন থাকার পর আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের কমান্ডো লিডার একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'এমন সাহস কোথা থেকে পাও সুলতান?' সুলতান হেসেছিল। 'সাহস আসে আমার হৃদয়ের ভেতর থেকে। সেখানে একজন আমাকে সাহস দিয়ে বলে, একজন শত্রুকেও বাঁচিয়ে রাখবিনে সুলতান। সবাইকে শেষ করে দিবি।' শুধু একবার সুযোগ পেয়ে মেহেরপুরে স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিল। আরিফার কোলে তখন এক মাসের নুরুন্নাহার। মেয়েকে আদর করে রাতের অন্ধকারেই আবার বের হয়ে এসেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আরিফা আর মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল সঙ্গিন ঘাড়ে করে।
আরিফা ঘর আর বারান্দা পরিষ্কার করেছিল মেয়েকে সুলতানের কোলে দিয়ে। সুলতান মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এমন স্বাধীন দেশে তুই বিকলাঙ্গ হলি কেন মা?' তার প্রশ্নের কোনো উত্তর পায়নি।
নিজের সামান্য টাকা দিয়ে আর আরিফার বালা বিক্রি করে সুলতান গ্রামের বুকে ছোট চায়ের দোকান তৈরি করেছিল। আরিফার বালা নেবার সময় তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল।
'তোমাকে তো কিছু দিতে পারিনি। তোমার বাবার দেয়া বালা বিক্রি করে দোকান করতে মন চাইছে না।' আরিফা তার হাত দুটো বুকের কাছে টেনে এনে বলেছিল, 'আমার বালা কি তোমার বালা নয়? কেন আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছ? পরে না হয় এটা আবার তৈরি করে দিও, যেদিন আমাদের সুদিন আসবে।' সুলতান আর কোনো যুক্তি দেখাতে পারেনি, শুধু এখনো তাদের প্রতীক্ষিত সুদিন আসেনি।
সকালে চায়ের দোকান খুলে রাস্তার দিকে বার বার তাকায় সুলতান। দোকানের প্রথম খরিদদার ওসমান শেখের এখনো দেখা নেই কেন? ওসমান শেখ দোকানে এলো প্রায় আধঘণ্টা পরে। মুখটা বেশ শুকনো আর একটা হতাশায় পরিপূর্ণ। দোকানের পাশে চৌকিতে বসার পর সুলতান এক কাপ ধূমায়িত চায়ের কাপ তার সামনে ধরে বলে, 'আজ এত দেরিতে যে চাচা?'
'শরীরটা ভালো নেই, মনটাও বলতে পার।'
'অসুখ-বিসুখ করেছে?'
'না হে তা নয়। সকাল থেকেই মনের যেন কী হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরেরও। দেখ না, দেশের অবস্থা দিন দিন কেমন খারাপ হচ্ছে। খুন, ছিনতাই, ডাকাতি এসব কেন হচ্ছে বলতে পার? স্বাধীন দেশে এই কি চেয়েছিলাম আমরা?'
সুলতান কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে। রাজীব হোসেন রাজনীতি করে। মাঝে মাঝে তার দোকানে এসে পরপর দুকাপ চা খেয়ে যায়। যাবার সময় বলে, 'আমার বাড়ি থেকে একসময় চায়ের দামটা নিয়ে এসো'। আজও রাজীব হোসেন চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে একমনে। তার সামনে সুলতান মুখ বন্ধ করে থাকে। লোকটার ক্ষমতা অসীম, ইচ্ছে হলে সুলতানের চা দোকানও বন্ধ করে দিতে পারে। রাজীব হোসেন চলে যাওয়ার পর আরো কজন খদ্দের আসে। দোকান একটু ফাঁকা হলে সুলতান ওসমান শেখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।
'আপনি দেশের কথা বলছিলেন তখন কিছু বলতে পারিনি, চাচা। আমরা সাধারণ মানুষ, কতটুকুই বা বুঝি। তবুও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জন্ম নেয়, তার উত্তর খুঁজে পাইনে। দেশের দু'দুজন লিডারকে হত্যা করা হলো– এই হত্যার কারণও বুঝতে পারিনি।'
'তুমি কি শেখ মুজিব আর জিয়াউর রহমানের হত্যার কথা বলছ?'
'জি চাচা।'
'এসব কথা আর বলো না, এর উত্তর আমাদের কাছে নেই। শুধু ভাবী, দেশটা কি হত্যাকাণ্ডে ভরে যাবে? এসব কি আর থামবে না কোনো দিন?'
'কী জানি, চাচা। এই প্রশ্ন আমার মনকেও দোলা দেয়, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাইনে।'
ওসমান শেখের মধ্যে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা হতাশা, ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তির গভীর বেদনা।
দোকান বন্ধ করার আগে দিনের উপার্জন গুনে সযত্নে কোমরে লুঙ্গি ভাঁজ করে তার ভেতরে রেখে দেয়। বাতি নিভিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করার সময় ঝাঁপের একটা অংশ হাতে পড়ায় হাতের অনেকখানি অংশ কেটে যায়। বিরক্ত হয় সুলতান। একটু সাবধানে কাজ করা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল আঘাত পায়। বাড়ি গিয়ে এখানে হলুদের সঙ্গে নুনের প্রলেপ না দিলে ব্যথা করবে।
অন্যান্য রাতের মতো আরিফাকে বারান্দায় দেখতে না পেয়ে খানিকটা বিস্মিত হয় সুলতান। রাত বেশি হয়েছে বলে ঘরে বোধ হয় নুরুনকে খাওয়াতে বসেছে।
'আরিফা!'
আরিফার সাড়া না পেয়ে তার নাম ধরে আবারো ডাকে। কোনো উত্তর না পেয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে।
'আরি–'
আরিফার সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণের আগেই সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার চোখ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আরিফার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ঘরের জানালার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এক লাফে আরিফার কাছে পৌঁছিয়ে তার দেহের বাঁধন খুলে দিয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে দেয়। আরিফা কান্নায় ভেঙে পড়ে।
'কী ব্যাপার, নুরুন কোথায়?'
আরিফা উত্তর দেবার আগেই নুরুননাহারকে দেখতে পায় সুলতান। ঘরের এক কোণে বিবস্ত্র নুরুননাহারের দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বার বার সে চেষ্টা করছে সালোয়ারটা নিজের কাছে টেনে আনতে। সেদিকে তাকিয়ে বাঘের মতো তার দু'চোখ জ্বলে ওঠে। সারা শরীরে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। ছুটে গিয়ে সে নুরুন-নাহারকে কোলে তুলে নেয়।
'কে তোর এমন অবস্থা করল মা? কে করল বল আমাকে। আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে নেবে।'
নুরুননাহারের মুখটা অনবরত কাঁপতে থাকে কিছু বলার জন্য। বিকলাঙ্গ মেয়ের মুখ থেকে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বের হতে থাকে। সুলতানের চোখের সামনে মায়ের ছবি ভেসে ওঠে। তার মাও একদিন এভাবে ঘরের এক কোণে রক্তাক্ত কাপড় গায়ে দিয়ে অনবরত কেঁপেছিল সমস্ত মুখ কাপড়ে আবৃত করে। সুলতান মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে তাকে সালোয়ার পরিয়ে দেয়।
'আরিফা, আমার বিকলাঙ্গ অবুঝ মেয়েটার এ দশা কে করল?'
'ওগো, ভুলে যাও। ওদের সঙ্গে তুমি পারবে না। ওদের শক্তি আছে, অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে।'
'না আরিফা, তোমার কথা ঠিক নয়। আমার এই শক্ত হাত দিয়ে তাদের অন্যায় গুঁড়িয়ে দেব। আমি গরিব, কিন্তু মেয়ের অপমান সহ্য করব না। একদিন রাইফেল হাতে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

সম্পদ আপনার - ঝুঁকি আমাদের!

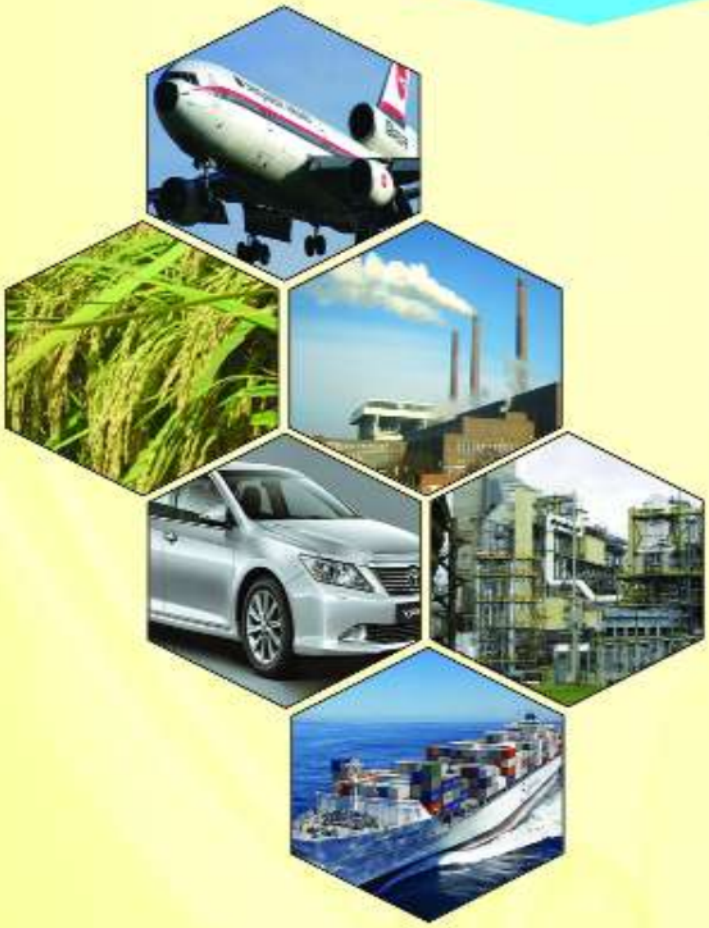

আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান, তেল-গ্রাস উত্তোলন, ওভারসীস মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।

রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

যুদ্ধ করেছি, আজ আমার হাতে রাইফেল নেই কিন্তু রাইফেল ধরার শক্তি আছে।'

সুলতান বাড়ি ফেরার আগে গ্রামের মাতব্বর সাত্তারের ছেলে মোস্তফা ঘরে ঢুকে আরিফার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে দড়িতে শক্ত করে বাঁধে জানালার সঙ্গে। তারই সামনে অসহায় মেয়ের ওপর অত্যাচার করে পালিয়ে যায়।

সারা ঘরে নুরুননাহারের গোঙানির শব্দ ছড়িয়ে পড়েছিল। সারাক্ষণ ছটফট করেছিল সে। আরিফা মুখ নিচু করে অনবরত কাঁদতে থাকে। এক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলে সুলতান। ঘরের কুলপিতে রাখা দা বের করে শক্ত হাতে চেপে ধরে। আরিফা স্বামীর হাত চেপে ধরে।

'এমন কাজ করো না, ওদের সঙ্গে পারবে না।'

সুলতান ধাক্কা দিয়ে আরিফাকে সরিয়ে দেয়। তার চোখের সামনে মায়ের আত্মহত্যার দৃশ্য ভেসে ওঠে। মাকে সে রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু মেয়ের ইজ্জত এভাবে নষ্ট হতে দেবে না।

'আমাকে বাধা দিও না নুরুনের মা। আমার মেয়ের সম্ভ্রম মাতব্বরের মেয়ের চেয়ে কম নয়। পাকিস্তান আমলে রাজাকারদের শাস্তি দিয়েছি, এবার বাংলাদেশের রাজাকারকেও শাস্তি দেব।'

সুলতান ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হাতে দা নিয়ে দ্রুতপদে মাতব্বরের বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। মাতব্বরের বাড়ির পাশে পুকুরের ঘাটে হেলান দিয়ে মোস্তফা চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছিল। সুলতান আস্তে আস্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে সামনে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে মোস্তফা। সুলতান তার মুখ থেকে সিগারেট টেনে বের করে পুকুরের পানিতে ছুড়ে ফেলে শক্ত হাতে তার মুখ চেপে ধরে।

'শালা, বাঙালি রাজাকার তোর আজ রক্ষা নেই।' আকাশের বুকে তখন মিটমিট করে তারা জ্বলছে, এ তারাগুলোই বোধ হয় জ্বলেছিল সুলতান কাঁধে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার সময়।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক মাতব্বরের পুকুরপাড়ে একে একে জমা হতে থাকে। সবার চোখে বিস্ময় আর ভয়। মাতব্বরের ছেলে মোস্তফার টুকরো টুকরো করা দেহ পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকরা যখন পুকুরপাড়ে তখন ঘরের এক কোণে সুলতান এক হাতে তার স্ত্রী আর অন্য হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে পুকুরের নিস্তরণ ঢেউয়ের মতো।

আজ সুলতানের দোকান খোলেনি। হকার খবরের কাগজ দোকানের দরজার সামনে ফেলে রেখে গেছে। সকালে তিনবার দোকানে এসে ফিরে গেছে ওসমান শেখ। বাড়িতে ফেরার সময় বিড়বিড় করে বলতে বলতে পথে হেঁটেছে।

'লোকটার হলো কী আজ? এমন তো কখনো হয়নি। সকাল থেকেই দোকান বন্ধ। আবার কোনো নতুন পালাবদল শুরু হচ্ছে নাকি?'

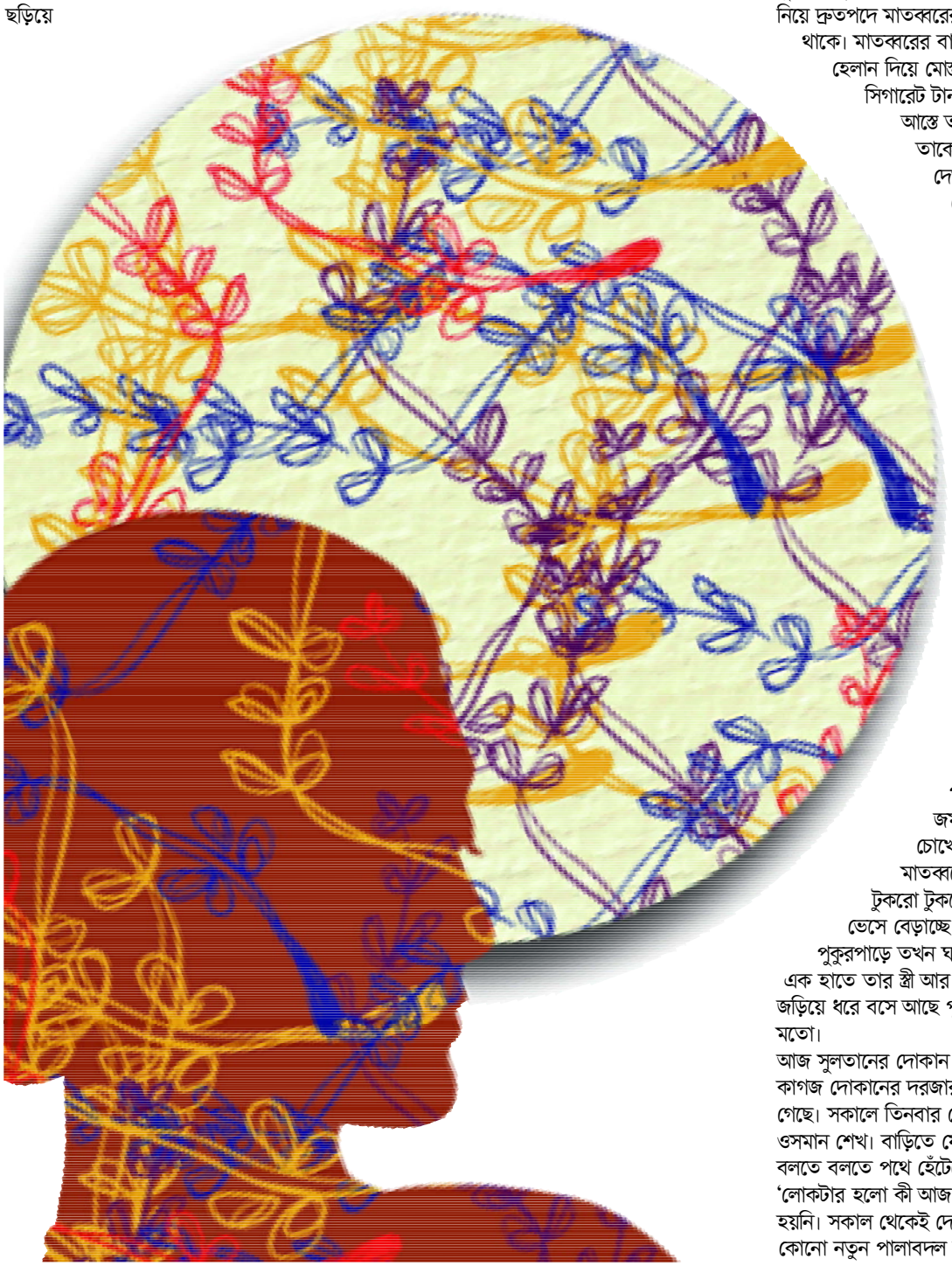

দৈনিক যায়যায়দিনের সংশ্লিষ্ট সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পত্রিকাজগতের সাথে আমাদের বসবাস অঙ্গাঙ্গিভাবে

খ্যাশী-বেইজার্স

৬/৭, নওয়াব ইউসুফ রোড (আরমানিটোলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭৩৯৪১৮৫, ৭৩৯২৩০৪, ৭৩৯৩৫৮৯ (অফিস)
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭৩৯১২৪৮

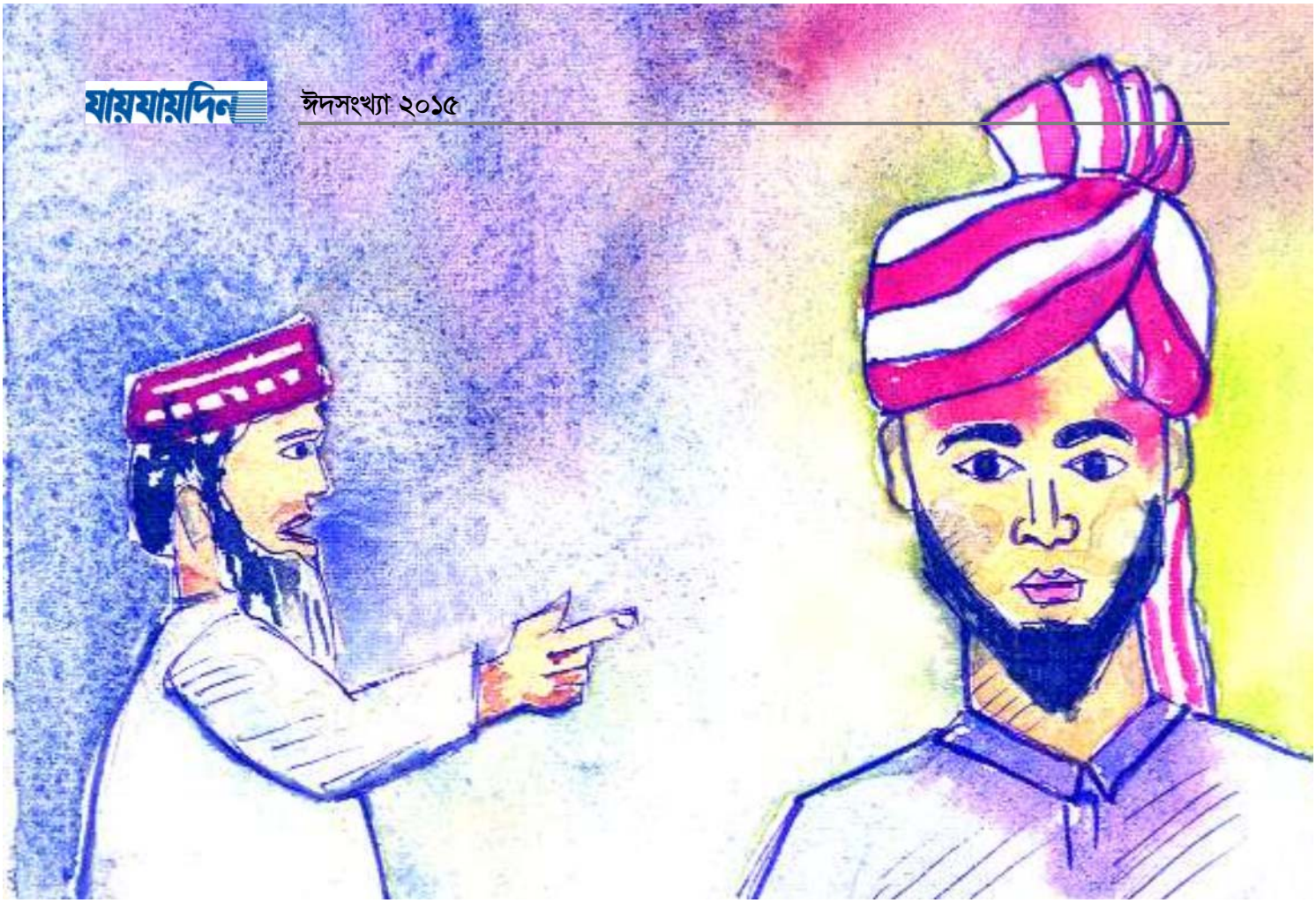

উপন্যাস

চাপ

হাবিব আনিসুর রহমান

সকালের সময়টুকু অনেকটা যুদ্ধ করার মতোই মনে হয় অন্তরা হাসানের কাছে। ভোরবেলা উঠতে হয় বিছানা থেকে। ৩ জন মানুষের নাস্তা এবং দুপুরের খাবার রেডি করে হটপটে ঢুকিয়ে আবার হাতে তুলে দিতে হয়। মাহবুব আগে বের হয়। কোনো রকমে নাস্তাটা মুখে দিয়ে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায় অন্তরা। রাস্তায় বের হয়ে আর এক যুদ্ধ শুরু হয়। চারপাশে বাস-স্কুটার-প্রাইভেট গাড়ির প্যাপু হর্ন আর রিকশার ক্রিং ক্রিং শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। রাস্তায় ফুটপাথে ফুটওভার ব্রিজে কিলবিল করছে মানুষ! যে যার কাজে ছুটছে। কারো দাঁড়াবার ফুরসত নেই। এ সময় রিকশা পাওয়া বড্ড কঠিন। ভাড়ার দিকে তাকাতে গেলে আর যাওয়া হবে না। অন্তরা হাত তুলে চিৎকার করল– এই যে খালি, এই যে ভাই...। রিকশাটা কাছে আসতেই উঠে পড়ল দুজন। মেয়েকে স্কলাস্টিকায় নামিয়ে দিয়ে অন্তরা চলে যায় নিজের স্কুলে।

টিচার্স রুমের চেয়ারে বসে মরিয়মকে ডাকল অন্তরা। মরিয়ম ছুটে এসে সালাম দিল, 'কি করতে হবে আপা?' খাবারের হটপটটা মরিয়মের হাতে দিয়ে অন্তরা বলল, 'মুখটা ভালোভাবে আটকানো হয়েছে কিনা দেখ, যে তাড়াহুড়ো করে বের হতে হয়, কোনোকিছু দেখার সময়টুকু পর্যন্ত পাই না।' মরিয়ম

বলল,'ঠিক আছে আপা আমি দেখে রাখব।'
হটপটটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে হেঁটে গেল মরিয়ম।
ঘড়ি দেখে অন্তরা। এখন ৯-৫০। ঠিক ১ ঘণ্টা পর ১০-৫০-এ তার ক্লাস। ফ্রেশরুমে গেল সে। রাস্তার ক্লান্তি আর ধূলাবালি সরাতে চোখে-মুখে একটু পানি আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁয়া, এসব সেরে ক্লাসে যাবে। অন্তরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দরী মেয়ে অন্তরা চক্রবর্তী, হালকা-পাতলা গড়ন, মায়াবী চোখ, উজ্জ্বল শ্যামলা রঙ। এখনো কি তেমনটি আছে? অন্তরা তার নিজের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়াল অনেকদিন পর।
দীপশিখা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠতলা ভবনটা ছোট ছোট শিশু-কিশোরদের কোলাহলে ভরে যায় প্রতিদিন সকালে। নতুন জয়েন করা তরুণ শিক্ষকদের ব্যস্ততা বেশি থাকে। রুটিনে ওদের ক্লাস বেশি। সবকিছু মিলিয়ে সকালটা কাটে হুলস্থুল। অন্তরার প্রথম ক্লাসটা ইলেভেন আর্টস, সেকশানে, থার্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার টু।
অ্যাটেনডেন্স খাতাটা সামনে রেখে বসল অন্তরা। শিলা গোমেজ এসে বসল তার পাশে, বলল–
'ক্লাস কখন?'
'১০-৫০-এ।' অন্তরা জানাল।
'সকালটা কিভাবে যে কাটে বাপরে বাপ। এমনিতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়, এর ওপর কাজের মেয়েটা আজ আসেনি, ছেলের টিফিন আর মাইকেলের দুপুরের খাবার দিতে গিয়ে নাস্তাটা পর্যন্ত করা হলো না!'
'নাস্তা করে নাও, ক্লাস ক'টায়?'
ঘড়ি দেখল শিলা, বলল, '২০ মিনিট পর।'
মরিয়মকে ডাকল।
বসে আছে অন্তরা। মাথার ভেতর চিন্তাগুলো পোকার মতো কামড়ে ধরে আছে এখনো। থেকে থেকে চিনচিন করছে। হঠাৎ কীসব ঘটে যায়! একবারও ভাবেনি অন্তরা এমন একটা কথা বলে ফেলবে মাহবুবকে। বিয়ের পর ১৫ বছর ধরে যা কিছু বোঝাতে চেয়েছে, এর

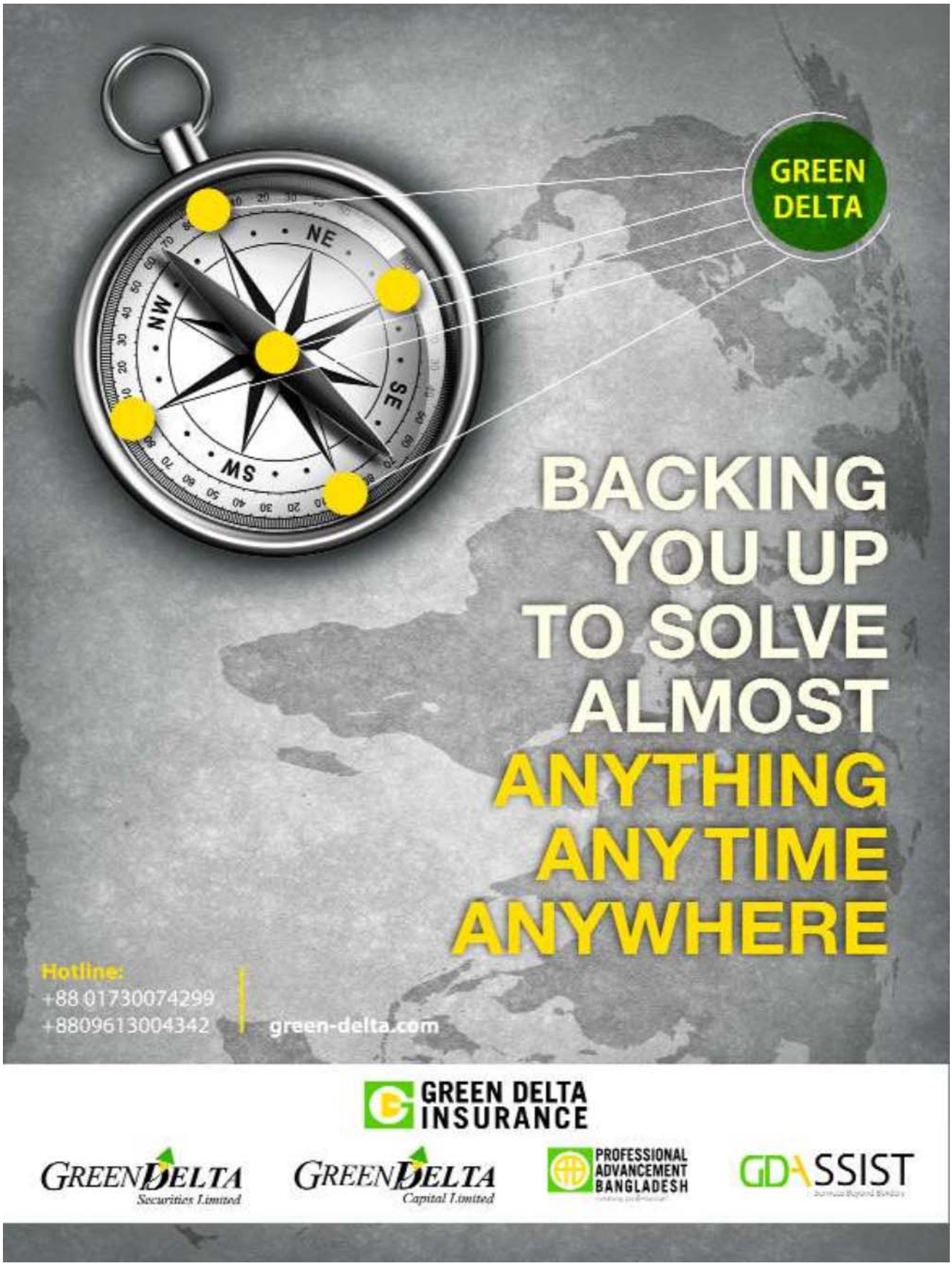
GREEN DELTA
BACKING YOU UP TO SOLVE ALMOST ANYTHING ANY TIME ANYWHERE
Hotline:
+88 01730074299
+8809613004342
green-delta.com
GREEN DELTA INSURANCE
GREEN DELTA Securities Limited
GREEN DELTA Capital Limited
PROFESSIONAL ADVANCEMENT BANGLADESH
GD-ASSIST

কতটুকু বুঝতে পেরেছে মাহবুব! যদি সবটুকু বুঝতে পারত, তাহলে বেঁচে থাকার জন্য এত মনোকষ্টে ভুগতে হতো না অন্তরাকে! ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সংসারে যা কিছু করেছে শুধু একটা কথা ভেবেই, সংসারটা তার। সকালের হুড়োহুড়ির কারণে রিকশা পেতে দেরি হলে কিংবা ক্লাসে যেতে দেরি হলে টেনশনটা বেড়ে যায়। সবকিছু বুঝতে পারে অন্তরা। কিন্তু এতকিছুর পরও সে চায় মাহবুব তাকে বুঝুক, সহমর্মী হোক। এক গ্লাস পানি খেল অন্তরা। কিন্তু ভাবনায় ছেদ পড়ল না। মেয়েরা নিজের সুখের জন্য, নিরাপত্তার জন্য কত কিছুই না করে! ছেলেরা ওসব বুঝতে না পেরে বলে, মেয়েরা দুর্বোধ্য, রহস্যময়ী, মেয়েরা ছলনা করে! অমনকিছু করার বা ভাবার আগেই অন্তরা প্রেমে পড়েছিল মাহবুব হাসানের। পাগলের মতো প্রেম! যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি সে। শুধু ভালোবাসার জোরেই অন্তরা মাহবুবের গলায় মালা পরিয়েছিল সেদিন। বাবা-মাকে না জানিয়ে, তাদের দূরে রেখে শক্ত করে হাত ধরেছিল ভালোবাসার মানুষটার। প্রচণ্ড সাহস দেখিয়েছিল সে। আত্মীয়স্বজনরা বলেছিল, ছি, বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে ওই মুসলমানের ছেলেটাকে বিয়ে করল মেয়েটা, নিজের বাবা-মা'র কথা একবারও ভাবল না! সবকিছু শুনে অন্তরার বাবা কলেজ শিক্ষক অরুণ চক্রবর্তী আকাশ থেকে পড়লেন! স্ত্রীকে বললেন, আমার অন্তরা এমন করতে পারল মাধবী! শেষ পর্যন্ত মুসলমানের ছেলেকে... সমাজে মুখ দেখাব কি করে। মাধবী চক্রবর্তী নির্বাক, রাগে দুঃখে অভিমানে কোনো কথা বললেন না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ভগবান এটা তুমি কী করলে! অন্তরার ছোট দু'ভাই-বোনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন তারা। আজ সেসব কথা ভাবলে শিউরে ওঠে অন্তরা, কি করে পেরেছিল এতটা সাহসী হতে? নিজের প্রেমাস্পদের ওপর কতটুকু বিশ্বাস থাকলে একজন তরুণী বাবা-মা, ভাই-বোন– এমনকি ধর্মকে পর্যন্ত ছাড়তে পারে! ভালোবাসাময় সেসব দিন! পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে আসার মূল্য পেয়েছে কি মাহবুবের কাছে? তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে অথবা সমাজের অন্য মানুষদের কাছে? আচমকা ক্রিং ক্রিং বেল বেজে উঠল। ঘড়ি দেখল অন্তরা, ১০-৫০। ইলেভেন আর্টস, সেকশন এ'র ক্লাসটা এখন। অ্যাটেনডেন্স খাতাটা নিয়ে দ্রুত লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সে।

প্রথম ক্লাসটা শেষ করে এসে বসতেই মরিয়ম জানাল, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সালাম দিয়েছেন তাকে। উঠে গেল অন্তরা । ম্যাডামের সামনে গিয়ে সালাম দিতেই বললেন,

'বসো অন্তরা, কথা আছে।'

অন্তরাকে চা দিতে বললেন ম্যাডাম। বাহার আলী পরিষ্কার কাপে দুধ ছাড়া র'চা দিয়ে গেল দু'জনকে। চা খেতে খেতে ম্যাডাম বললেন,

'দুদিন আগে যে ভূমিকম্পে সবাইকে নিচে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো মনে আছে তোমার?'

'জ্বী ম্যাডাম, মনে আছে' অন্তরা বলল।

'সবাই যখন নিচে বাহার তখন ওপরে উঠে আসে, কারণ ওর টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, ও টয়লেটে ঢুকতে গিয়ে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ, অন্যটাতে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পায় একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে, আমি বললাম চিনতে পেরেছ, নাম বলতে পারবে দুজনের? ও চুপ করে থাকল, কিছুক্ষণ পর বলল, চিনতে পারেনি।'

'ম্যাডাম, আমার মনে হয়, ও ঠিকই চিনতে পেরেছে, নামও জানে, কিন্তু আপনাকে বলবে না, বললে আপনি ওদের টিসি দিয়ে দেবেন সেজন্য, বরঞ্চ আপনাকে না বলে ওদের বলবে, তোমাদের বাঁচিয়ে দিলাম আমাকে কিছু খাওয়াও অথবা কিছু দাও, আমার এমনটাই মনে হচ্ছে।'

'কেন, এমন মনে হলো কেন?'

'এর আগেও এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, তবে সেটা ফ্রেশরুমে নয় ক্লাসরুমে, বাহার দেখেছে কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটির নাম বলেনি, পরে মরিয়মের কাছে জানা গেল বাহারকে ওরা বিরিয়ানি খাইয়েছে।'

'কিছুই করার দেখছি না, বাসায়, রাস্তায় ওরা কথা বলতে বা অন্যকে স্পর্শ করতে পারে না, সুযোগ যেটুকু পায় তা এখানে, কো-এডুকেশন, কি করা যায় বলত?'

'এসব করলে সোজা টিসি দেয়া হবে, এ ধরনের নোটিশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই, তবে ভিজিলেন্স টিমকে আরো সতর্ক হতে হবে।'

'এর আগে নোটিশ করা হয়েছে স্কুলে সেলফোন আনা নিষেধ, কিন্তু বাসায় তো সবার হাতে হাতে ওটা থাকে তাই না, বাবা-মা'তো ২৪ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে বসে থাকে না, হাতে হাতে ইন্টারনেট, কি করবে বলো, ঠিক আছে তুমি এসো।'

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কক্ষ থেকে বের হয়ে টিচার্স রুমে ফিরে গেল অন্তরা। টিচারদের এই রুমটা বিশাল বড়। যাদের ক্লাস অফ থাকে, তারা অবসরটুকুতে নানান গল্প আর আড্ডায় মেতে ওঠে। অন্তরার দ্বিতীয় ক্লাসটা ১১টা ৫০-এ

***

একা থাকলে এলোমেলো ভাবনা চলে আসে অন্তরার মনে। আজ কদিন হলো এরকম হচ্ছে। নিজের মনের এই অবস্থার কথা কাকে বলবে সে! বিয়ের পর মাত্র দেড় বছর কোনোরকম কেটেছিল মাহবুবের বাবা-মা আর বোনদের সঙ্গে ওদের আজিমপুরের বাড়িতে। কিন্তু তারা সবাই সর্বত্র সতর্ক খেয়াল রাখত অন্তরার দিকে, যাতে সে এমন কিছু করতে না পারে যেটাতে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায়। মনে হতো অন্তরা খাঁচায় বন্দি। কোনোদিনও উড়তে পারবে না মুক্ত আকাশে। কোনোকিছু করতে গেলেই ওদের অনুমতি নিতে হতো। অথচ মাহবুবও তাদের সন্তান। বিয়ের আগে রাতবিরেতে কত জায়গায় কত অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে। তার বেলায় কখনো কোনো বাধা-নিষেধ আসেনি কিন্তু যতো বিপত্তি সব অন্তরার বেলায়। অন্তরা নীরবে সবকিছু সয়ে গেছে। কোনোদিন মাহবুবের কাছে কষ্টের কথাগুলো বলেনি। ভেবেছে মাহবুব এসবের একটা সুরাহা করবে। বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলবে যে, অন্তরা রক্ত-মাংসের একজন মানুষ। আর ৫ জনের মতো সেও হেসে-খেলে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু সেটা বলেনি কেউ। পাছে সংসারে অশান্তি হয় সেজন্য অন্তরা চেপে গেছে সমস্ত কিছু। ঝগড়াঝাটি, অশান্তিকে ভীষণ ভয় পায় সে।

মাহবুব হাসান তার স্বামী অথচ তখন তাকেও অপরিচিত মনে হতো মাঝে মাঝে। অবাক হতো অন্তরা এত দ্রুত বদলে যায় মানুষ! কিভাবে? যে যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে লালন সাঁইয়ের গান গেয়ে মুগ্ধ করেছে হাজার হাজার শ্রোতাকে, যার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এসেছে... সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, এমন মানব জনম আর কি হবে ...। জাত-পাত-ধর্মের বেড়াজাল ছিঁড়ে খাঁটি মানুষ হওয়ার আকুতি যার কণ্ঠে, তাকে ভালো লাগতেই পারে অন্তরার মতো সাহিত্যে পড়া ছাত্রীর। অন্তরা যখন থার্ড ইয়ার বাঙলায়, মাহবুব তখন ইতিহাসে ফাইনাল ইয়ারে। উঁচু নাক, দুটি সুন্দর চোখ, উজ্জ্বল-শ্যামলা রঙের পৌরষদীপ্ত মাহবুব যখন হাসতো তখন তাকে আর ৫ জন মানুষের থেকে আলাদা চোখে দেখত অন্তরা চক্রবর্তী। প্রচণ্ড ভালো লাগত তাকে। এই ভালো লাগা শেষ পর্যন্ত অন্তরাকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে গেল, যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো পথ ছিল না তার! প্রেম এমনই এক রহস্যময় কিছু, যার জন্ম হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হৃদয়ের গভীর গোপনে। যে প্রেমে মজে সে তার ব্যাখা জানে না। অন্তরা একদিন মাহবুবকে বলেছিল, আপনাকে

দেখলেই আমার ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়, আবার আপনাকে এড়িয়ে যাওয়ার স্পর্ধাও দেখাতে পারি না, মরে যাওয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো পথ দেখছি না। অন্তরা যখন মরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না, মাহবুব তখন হেসে উঠে বলল, একটা কবিতা পড়ছি শুনুন। তার হাতে একটা কবিতার বই। ভরাট কণ্ঠে সে বলল, বিশ্বখ্যাত কোনো বুড়ো কবির কবিতা নয়, আবার চন্দ্রালোকিত ধূসর জ্যোৎস্নাঢাকা রহস্যময় কোনো কবির কবিতা নয়, এটা বাংলাদেশের এক তরুণ কবির কবিতা... শুনুন, কবিতার নামটাও সুন্দর –'নালন্দা মেয়ের পুরাণ'

অবশেষে মেয়েটি দাঁড়ায় নালন্দার ঢেউয়ের ওপর
নালন্দানদী দূর-বিশ্বে ভাসে
নিম্নতরঙ্গে ভেসে ভেসে সাঁতরায় মহাকাশে...
এ কী বিভ্রম দেখি?
মেয়েটি নালন্দা থেকে
নীলাচলে আঁচল খুলে
নিজেই নদী হয়ে ঢেউ তোলে...

কবিতা পড়ে হো হো করে হেসে ওঠে মাহবুব, কী খুব খারাপ লাগল? অন্তরার চোখ দিয়ে পানি, 'এত সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন আপনি, ইউ আর সিম্পলি গ্রেট মাহবুব, গান শুনে মজে গিয়েছি সত্যি কিন্তু একটুও জানতাম না আপনি চমৎকার আবৃত্তি করেন!'

বাবা-মা ভাই-বোন এমনকি নিজের ধর্ম বেঁধে রাখতে পারল না অন্তরাকে। একদিন সে নিজেকে সঁপে দিল গায়ক প্রেমিক মাহবুবের কাছে।

ক্লাস শেষে সবাই যখন টিএসসির বারান্দায় আড্ডা জমায়। অন্তরা আর মাহবুব তখন রিকশায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কত কথা যে বলে দুজন, তার ইয়ত্তা নেই। টিএসসির চারপাশে এখানে-ওখানে সবখানে বসে ওরা। নতুন প্রেমের কাব্য রচনা করে। একজন আর একজনের হাতের আঙুল নিয়ে খেলে। এটুকু স্পর্শ ওদের কাছে স্বর্গসুখের মতো মনে হয়। একদিন সন্ধ্যায় রিকশায় বসে মাহবুব রিকশাওয়ালাকে বলল, ওই যে বড় বৃষ্টি গাছটা দেখছেন, ওটার নিচে রিকশা রেখে আপনি চা-বিস্কুট খেয়ে আসেন যান। লোকটার হাতে ৫০ টাকার একটা নোট দিল মাহবুব। চারপাশে গাড়ি-ঘোড়া চলছে, নাগরিক ব্যস্ততা, যার যার কাজ নিয়ে ছুটছে মানুষ, অন্যের দিকে নজর দেয়ার ফুরসত কোথায় তাদের? তখন অবিশ্বাস্য এক প্রেমে মগ্ন ওরা দুজন! রিকশার ভেতরই হঠাৎ অন্তরার ঠোঁটে চুমু খায় মাহবুব। অন্তরাও সাড়া দিল প্রেমিককে। কিন্তু একি! শরীরে কী হলো তার? মনে হলো বিদ্যুৎ চমকে উঠলো! দ্রুত রিকশা থেকে নেমে গেল অন্তরা। মাহবুব মনে করল, অন্তরা রাগ করেছে। সেও নেমে পড়ল। আসলে ওটা রাগ ছিল না অন্তরার, ছিল অন্য কিছু। মাহবুবের স্পর্শ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল।

এখন বুঝতে পারে অন্তরা মাহবুবের সেই প্রথম চুমু তার শরীরে-মনে কতটা ঝড় তুলেছিল। দুটি ঠোঁটের স্পর্শ, কি আশ্চর্য তার ফলাফল! দূরে রাখা যাবে না মাহবুবকে, দূরে থাকতে পারবে না অন্তরা নিজেও! এরপর যা কিছু হয়েছে, সেটা অন্যরকম কিছু। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটির মতো...শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু হে প্রিয়... মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও...। বহুদিন বহুবার অন্তরা মাহবুবের সঙ্গে রিকশায় চেপে ঘুরেছে। টিএসসি থেকে লালবাগ ফোর্ট, সেখান থেকে বুড়িগঙ্গার পাড়। ওরা মনের আনন্দে ঘুরেছে দুজন। মাহবুব কখনো অন্তরার বাবা-মা-ধর্ম এসব নিয়ে ভাবেনি। বরঞ্চ অন্তরার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতোই মনে হয়েছে তার কাছে! অন্তরা তাকে ভালোবাসে এই ভাবনা তাকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন মাহবুব বলল,

'বিয়ে করবে অন্তরা?'
'হ্যাঁ, করব।'
'তোমার বাবা-মা, রাজি হবেন?'
'রাজি হওয়ার দরকার আছে বলো? আমি তো রাজি. আমি রাজি হলে হবে না?'
'তোমার আমার সম্পর্কের কথা বলেছ তাদের?'
'না।'
'এখন যদি তারা তোমাকে বলেন, মাহবুব হিন্দুর ছেলে নয়, সে মুসলমান, তাহলে?'
'আমরা কোর্টে যাব, সেখানে বিয়ে করব।'

কোর্টে নয় বন্ধুদের পরামর্শে কাজির অফিসে গিয়ে বিয়ে করেছিল মাহবুব আর অন্তরা চক্রবর্তী। কাজি বললেন, দেখেন মা, একটা ভালো মুসলিম নাম রেখে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম হবে না। অন্তরা বলল, কি নাম দিতে চান হুজুর? হুজুর বললেন, মোসাম্মৎ উম্মে মুসলিমা, এই নামটা নিলে আপনার দিলের ভেতরে পরিবর্তন চলে আসবে, ভবিষ্যতে কেউ কিছু বলতে পারবে না। মাহবুব বলল, হুজুর কিছু মনে করবেন না, এই নামটা বাদ দিয়ে অন্য একটা নাম দিন। হুজুর বললেন, তাহলে মোসাম্মৎ উম্মে হাবিবা রাখেন, এই নামটা আরো ভালো, দেখেন যেটা উনি পছন্দ করেন, উনাকে জিজ্ঞাসা করেন কোনোটা ভালো লাগে? অন্তরা মাহবুবের দিকে তাকায়, তুমি বলো প্লিজ। মাহবুব বন্ধুদের দিকে তাকাল। বন্ধু সৈকত বলল, তোরা কিছু মনে না করলে আমি একটা বলতে পারি, অবশ্য এটা যদি তোদের ভালো লাগে। মাহবুব বলল, বল্। সৈকত বলল, 'মাহবুব হাসানের স্ত্রীর নাম হতে পারে অন্তরা হাসান।' ওই নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাত তালি দিয়ে উঠল, এটা ভালো এবং সুন্দর। ওই নামেই বিয়ে পড়ালেন কাজি সাহেব, তবে অন্তরাকে কলেমা পড়তে হলো। অন্তরা চক্রবর্তী বিয়ের পর হলো অন্তরা হাসান।

এখন কি করবে ওরা। সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে যাবে মাহবুবের বাড়ি। ওখানে বোঝাপড়া করে সন্ধ্যায় যাবে অন্তরাদের বাড়ি। কারণ, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। এটা গোপন রাখলে নানান সমস্যা দেখা দেবে। বন্ধুদের সঙ্গে নিল মাহবুব। যে কোনো রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হোক না কেন, সেটা ওরা সবাই মিলে ফেস করবে।

***

৪ জন বন্ধু আর অন্তরাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ড্রইং রুমে গিয়ে বসল মাহবুব। বছর-বিশেক আগে তার বাবা মেহেদী হাসান কিনেছিলেন বাড়িটা। এখানেই মাহবুবের ছেলেবেলা কেটেছে। বাড়ির সব কিছুই তার পরিচিত। একান্ত তার নিজের। কিন্তু আজ অন্তরাকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন এই পুরনো বাড়িটাতে ঢুকল, তখন সে অন্য এক মাহবুব! মনে হলো সব কিছুই নতুন। আজ সকালে সে ছিল শুধু মাহবুব হাসান এবং অবিবাহিত কিন্তু এখন সে বিবাহিত এবং অন্তরা হাসানের স্বামী! আশ্চর্য, মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই পাল্টে গেল তার অবস্থান। হয়ত দেখা যাবে পাল্টে গেছে তার কথাবার্তা, চালচলন। কাজের মেয়েটা দরজা খুলেছিল, ভেতরে গিয়ে সে রিনিকে বলেছে, ভাইয়ার সঙ্গে অনেক মেহমান এসেছে সঙ্গে একটা মেয়েও আছে। রিনি মাহবুবের ছোট বোন। সে ছুটে আসে ড্রইং রুমে। মাহবুবের দু-একজন বন্ধুকে চেনে সে। অন্তরার দিকে তাকিয়ে রিনি বলে, ইনি কে ভাইয়া? সৈকত মুখ খুলল প্রথমে, ইনি তোমার ভাবি, মাহবুবের বউ। রিনি বোকার মতো তাকাল ভায়ের দিকে! আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা রিনির! হাসতে হাসতে রিনি বলল, মিথ্য কথা, যাহ্! সৈকত হেসে বলল, নতুন ভাবি পছন্দ হয়েছে তোমার? রিনি আগের মতো বলল, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে সৈকত ভাই, সত্যি করে বলেনতো কি ব্যাপার? রিনি এবার মাহবুবের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি ভাইয়া ইনি তোমার বউ, মানে ভাবি? মাহবুব মাথা নেড়ে একটু হাসতেই প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল রিনি– 'মা...আ ... ভাইয়া বিয়ে করেছে।' সৈকত বলল, 'আস্তে, ভাবি পছন্দ হয়েছে তোমার?' 'হ্যাঁ, খুব, খুব সুন্দর, একদম ঐশ্বরিয়া রায়ের মতো বেবি ডল।' অন্তরাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল রিনি।

বন্ধুদের সঙ্গে বসে মাহবুব অপেক্ষা করেছিল ভাগ্য তাকে কত নাম্বার দেয় সেটা দেখার জন্য, পাস না ফেল! ভাগ্য তাকে যে নাম্বারই দিক না কেন, সেটার মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত সে। মনের দিক থেকে এবং আইনগত দিক থেকে তারা দুজন সঠিক পথেই রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

ভেতরে তখন অন্তরাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত রিনি। অন্তরাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। অন্তরাকে বাবা-মা'র সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছে, 'দেখ মা ভাইয়ার বউ, বিয়ে করেছে ভাইয়া।' অন্তরা শ্বশুর-শাশুড়িকে সালাম করে। শাশুড়ি বলেছেন,'বেঁচে থাকো মা, এ কেমন কথা ভরদুপুরে ছেলে এসে বলছে বিয়ে করেছে, আমাদের সাধ-আহ্লাদ নেই বুঝি! ও কোথায়?'

রিনি গিয়ে ডেকে আনে মাহবুবকে। মাহবুব বাবা-মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মাথা নত করে। মা বললেন, 'বলা নেই কওয়া নেই, এভাবে হুট করে বিয়ে করাটা ঠিক হয়েছে?' মাহবুবের বাবা ছেলেকে কি বলবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। মাহবুব একটু আগে যতটা সাহসী ছিল, বাবা-মা'র সামনে এসে এখন আর ততটা সাহসী হতে পারছে না। মহা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল সে। বাবার মুখোমুখি হওয়ার আগেই সে বলল, 'আমি একটু কথা বলে আসি ওদের সঙ্গে।' মাহবুব ড্রইংরুমে গিয়ে বসলে সৈকত বলল,' আসল কথাটা বলেছিস?' মাহবুব বলল, 'তোরা গিয়ে বল যা, আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।' ঘরের ভেতরে তখন অন্তরাকে তার শাশুড়ি বললেন, 'তুমি রেস্ট নাও, তোমার তো কোনো দোষ নেই।' হঠাৎ বললেন, 'তোমার নাম কি?' অন্তরা মাথা নিচু করে বলল, 'অন্তরা।' রিনি বলল, 'ভাবির নামের সঙ্গে চেহারার খুব মিল, দুটিই সুন্দর তাই না মা?' ভদ্র মহিলা বললেন, 'এত ছোট নাম, পুরো নামটা বলো?' অন্তরা মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন আমার নাম অন্তরা হাসান।' 'এখন অন্তরা হাসান মানে বিয়ের পর?' 'জ্বী' অন্তরা জবাব দিল। 'তাহলে বিয়ের আগের নাম কি?' 'আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন মা।' সৈকত সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'রিনি, তুমি ভাবিকে নিয়ে ভেতরে যাও, আমি আঙ্কেল-আন্টির সঙ্গে কিছু কথা বলব।' রিনি চলে গেলে সৈকত বলল, 'দেখুন আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আপনারা সত্যকে মেনে নিন অনুগ্রহ করে।' মাহবুবের বাবা বললেন, 'তুমি কোনো সত্যের কথা বলছ বাবা?' সৈকত বলল, 'আঙ্কেল-আন্টি সত্যটা হলো মাহবুব আর অন্তরা দুজন-দুজনকে ভীষণ ভালোবাসে, বিয়ে করা ছাড়া ওদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।' মাহবুবের বাবা বললেন, 'ঠিক আছে এই সত্য আমরা মেনে নিচ্ছি, এ ছাড়া আর কিছু আছে?' 'আছে আঙ্কেল' সৈকত বলল। 'তাহলে সেটা বল?' 'বিয়ের আগে অন্তরার নাম ছিল অন্তরা চক্রবর্তী, বাবার নাম অরুণ চক্রবর্তী তিনি মিটফোর্ড কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, এই সত্যটুকু আপনারা মেনে নিলে ওদের জন্য সেটা মঙ্গল হবে।' এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাহবুবের মা শোয়ার ঘরে চলে গেলেন। মাহবুবের বাবা বললেন, 'ছেলেটা এমন একটা ভুল...।' থেমে গেলেন মাহবুবের বাবা জনাব মেহেদী হাসান। রিনি অন্তরাকে একা রেখে তার মায়ের কাছে চলে গেল। হয়ত এটাকেই বলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। ড্রইংরুমে বসে আছে মাহবুব, অন্তরা আর তাদের ৪ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। কারো মুখে কোনো কথা নেই। নীরবতা ভাঙল মাহবুবের আর এক বন্ধু মারুফ। সে বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ভেঙে পড়লে চলবে না বা ইমোশনাল হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না, সবাই একটু ধৈর্য ধর, দেখবে সময় আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছে, সুতরাং বন্ধুরা ওয়েট, অপেক্ষা কর সবাই।' মারুফের কথাতে আশ্বস্ত হলো অন্যরা এবং দ্রুত সমাধানের কথা বাদ দিয়ে ধৈর্য ধরে থাকল। অপেক্ষমান সবাই বুঝতে পারল ঘরের ভেতর মাহবুবের বাবা-মা এবং রিনি, তারা কথা বলা শুরু করেছে। অর্থাৎ সব কিছু থেমে যায়নি, কিছু একটা হচ্ছে এবং হলোও তাই। ড্রইংরুমে এলেন মাহবুবের বাবা-মা আর রিনি। মা আর রিনি অন্তরাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। 'এসো মা' মাহবুবের মায়ের একটা কথাতেই মনটা জুড়িয়ে গেল অন্তরার। সে রিনির হাত ধরে শাশুড়ির পেছন পেছন ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। মাহবুবের মনে হলো, মাথার ওপর থেকে একটা ভারি বোঝা নামাতে পেরেছে তারা। থাকল আর একটা, সেটা অনেক বড়, সে বোঝা নামানো বড্ড কঠিন হবে কারণ্ অন্তরার বাবা একজন অধ্যাপক শুধু নন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ। মেয়ের এই বিয়েকে তারা মানতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদি না মানেন এবং অন্তরাকে দূরে সরিয়ে দেন, তাহলে

অন্তরা হয়ত ভেঙে পড়বে যদিও অন্তরা এখন পর্যন্ত খুব শক্ত আছে। কিন্তু তার বাবা-মার মুখোমুখি হলে অবস্থা কোন দিকে যাবে, সেটা বোঝা শক্ত। এসব সত্ত্বেও আজ সন্ধ্যায় যেতেই হবে অন্তরাদের বাড়ি। বিষয়টা জানাতে হবে ওদের।

মাহবুবের বাবা বসলেন ড্রইংরুমে। ছেলেকে বললেন, 'তুমি বিয়ে করে কোনো অন্যায় করনি, আমি তোমার কথা ভাবছি না ভাবছি বউমার কথা। এ ধরনের বিয়েতে সমস্যা হয় মেয়ের আর মেয়ের পরিবারের। সেটা পারিবারিক এবং সামাজিক। সব সময় আত্মীয়স্বজন এবং স্বধর্মীয়দের একটা চাপ থেকেই যায় তাদের ওপর। এই চাপ সহ্য করা খুব কঠিন। চাপের তীব্রতা এত বেশি যে, ভারসাম্য রাখা অসম্ভব হয়ে যায়।' মাহবুবের বাবা সচিবালয়ে সেকশন অফিসার ছিলেন। গত বছর অবসর নিয়েছেন। এখন পেনশনে। সরকারি চাকুরে হলেও তিনি আর ৫ জনের মতো নন। যথেষ্ট পড়াশোনা জানা মানুষ। এক সময় নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতেন পত্র-পত্রিকায়। এখনো লেখেন তবে আগের চেয়ে কম। মাহবুবের দাদার বাড়ি চব্বিশ পরগনার বশির হাটে। সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হলে তার দাদা পরিবার-পরিজন নিয়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। মাহবুবের বাবার বয়স তখন ৫ বছর। সীমাহীন কষ্ট আর দুঃখকে মাথায় নিয়ে তার দাদা যশোরের পণ্ডিত পুকুরে এসে বসবাস শুরু করেন। মেহেদী হাসান বলছিলেন, 'শোন- বাবা-রা, সাতচল্লিশ সালটা আমাদের পরিবারের জন্য একটা দুঃসময়। সমস্যাটা কী, সমস্যা হলো হিন্দু-মুসলমান তারা এক সঙ্গে থাকতে পারবে না। এক সঙ্গে থাকতে পারবে না, তাহলে কি করতে হবে? ভাগ করতে হবে। ভারতকে ভাগ করে একটাতে হিন্দু আর অন্যটাতে মুসলমানের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে! কিভাবে? পাকিস্তানে যাবে মুসলমানরা আর ভারতে আসবে হিন্দুরা। লাখ লাখ মানুষ নিজেদের ভিটামাটি, ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হলো। সে কি কষ্ট বাবা! গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, পায়ে হেঁটে, জীবনের ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে মানুষ তাদের জন্মভূমি ছাড়ল। বিষয়টা একটু চোখ বুঝে ভেবে দেখ। কী ভয়াবহ দৃশ্য! ১ হাজার মাইল দূরত্বের দুটি দেশকে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে এক শাসনের অধীনে আনা হলো, পাগল আর কাকে বলে! যাদের ভাষা আলাদা, খাবার-দাবার আলাদা, কৃষ্টি-কালচার-আবেগ সব আলাদা, নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাদের কোনো মিল নেই, তারা শুধু ধর্মের কারণে এক সঙ্গে থাকতে পারে? সেই দেশ কী টেকে? এরপরও নিজেদের জেদ বজায় রাখতে করুণ একটা ইতিহাস রচনা করল আমাদের রাজনীতিবিদরা। যত কষ্টের শিকার হলো সাধারণ মানুষ। আজও এসব দেশের বাসিন্দারা মানুষ হতে পারল না, তারা হিন্দু-মুসলমানই থেকে গেল! আমার ছেলে বাউল ফকিরদের গান গায়। সে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে ঘরে এনেছে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একটু খারাপ লাগছে, কবি নজরুলও গান গাইতেন, তিনিও হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বেচারা নজরুলকে তিষ্ঠাতে দেয়নি মানুষ। কারণ্ তিনি দুই ধর্মের মানুষের মিলন চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমাজের মানুষ তাকে কাফের বানিয়ে ছাড়ল, তিনি পাগল হয়ে গেলেন।' মাহবুবের বন্ধুরা তার বাবার কষ্টের কথা শুনলো। সব কিছু শুনে সৈকত বলল, 'আঙ্কেল আপনার কষ্টটা কোথায়, সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তবে সময় পাল্টে গেছে। আপনি নিজে ছেলের বউকে আপন করে নিতে পেরেছেন– এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের বিষয়।'

সেদিন সন্ধ্যায় একটা রিকশায় উঠল মাহবুব আর অন্তরা। আজিমপুর থেকে মিটফোর্ড যাবে তারা। ওখানে জিন্দাবাহার লেনে অন্তরার বাবার বাড়ি। অন্তরা ভাবছে, নতুন একটা জীবন শুরু করতে যাচ্ছে সে। কতদিন মাহবুবের সঙ্গে

রিকশায় চেপে ঘুরেছে। কিন্তু আজ সবকিছু নতুন মনে হলো। সকালে বাবা-মা দুজনকে সুস্থ দেখে বের হয়েছিল। বের হওয়ার সময় মাকে বলেছে, ফিরতে রাত হতে পারে, বান্ধবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে থাকবে সে। তারা জানে না তাদের প্রিয় অন্তরা মিথ্যা বলেছে তাদের। প্রেমে যুদ্ধে জিততে হলে দু-একটা মিথ্য বলা জায়েজ! এই তত্ত্ব মেনেছে অন্তরা। সেও বলেছে, এতে কতটুকু পাপ হবে তার, জানে না সে।

'ছারে কি আমারে চিনতে পারছেন?'

রিকশাওয়ালা মুখ ঘুরিয়ে বলল মাহবুবকে।

'আমাকে বলছেন?' রিকশাওয়ালাকে বলল মাহবুব।

'হ ছার, আপনারে কইতাছি'

'কি জানতে চাচ্ছেন?'

'অমারে চিনতে পারছেন, ছার?'

'না তো ভাই, চিনলাম না।'

'একদিন গাছের নিচে আমার গাড়িতে বসছিলেন, ৫০ ট্যাকা দিছিলেন চা খাইতে, মনে করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি সেই লোক?'

'হ ছার হ, আমিই সেই লোক।' রিকশাওয়ালা হাসলো। হাসার কারণটা কি সেটা জানে মাহবুব, জানে অন্তরাও।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চিনলেন কি করে আমাদের, কেমন আছেন আপনি?' 'ম্যাডামরে দেইখ্যা চিনছি, ভালা আছি ছার, একখান কতা জিগামু?'

'হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করেন, সমস্যা নাই।'

'আপনারা বিয়া করছেন ছার?'

'হ্যাঁ, করেছি, আর কিছু জানতে চান?'

'না ছার, আর কিছু জানতে চাই না।'

হঠাৎ অন্তরা মাহবুবকে বলল, 'লোকটাকে বলো আমাদের জন্য আশির্বাদ করতে।'

রিকশাওয়ালাকে মাহবুব বলল,

'আমাদের জন্য দোয়া করে দিয়েন, কেমন।'

'হ করমু ছার, আল্লায় আপনাগো দুজনরে অনেক সুখী করবো, সহি-সালামতে রাখবো।'

আজিমপুর থেকে জিন্দাবাহার লেন। পুরনো ঢাকার রাস্তা। এসব রাস্তায় সবসময় হে চৈ শব্দ লেগেই থাকে। চারপাশে শোরগোল। এখানকার বাসিন্দারা সবসময় প্রাণবন্ত, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও রসিকতা করতে পারে এরা। মাহবুবের হাতের ওপর হাত রেখে অন্তরা বলে– 'কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, লোকটা আমাদের ঠিকই চিনতে পেরেছে, তার আশির্বাদ যেন কাজে লাগে আমাদের, ওকে ডবল ভাড়া দিয়ে দিও, কেমন?'

'দেব, তোমার কি খুব ভয় পাচ্ছে অন্তরা?'

'হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে বৈকি, তুমি যেন বাবা-মা'র সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না প্লিজ, তুমি মাথা নত করে থাকবে, কারণ অপরাধ যা করার তা আমরাই করেছি তাই না?' 'ঠিক আছে তাই হবে।'

অন্তরার বাবা-মা'র কথা ভাবছিল মাহবুব। একবারও তাদের দেখেনি সে। কি ভাববেন তারা! হয়ত মনে করবেন, মাহবুব একটা মস্তান টাইপের ছেলে। অন্তরা সুন্দরী মেয়ে, এর ওপর বোকা টাইপের, তাই ফুসলে বিয়ে করে এনে এখন ভদ্রলোক সাজছে! তার দুটি ছোট ভাই-বোন আছে, তারাই বা কি ভাববে! হঠাৎ মাহবুবের মনে হলো, ঘটে যাওয়া সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্তরার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হওয়াটা যেমন, দেখা না-ও হতে পারত, কিন্তু হয়েছে, এটাই সত্যি এবং বাস্তব, রহস্যময়ও বটে! আবার কোনো এক সন্ধ্যায় তারা যে রিকশায় বসে একজন আর একজনকে চুমু খেয়েছিল সেই একই রিকশাওয়ালার রিকশায় আজও বসে আছে তারা দুজন, এই শহরে এমন আরো অসংখ্য রিকশা রয়েছে, কিন্তু তারা এতদিন পর আবার সেই একই রিকশায় উঠল কিভাবে, এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে! চারপাশের দোকানের ঝলমলে আলো, আর ক্রিং ক্রিং শব্দের ভেতর ওদের রিকশা এগিয়ে যেতে লাগল।

***

রিকশা থেকে নেমে ভয় লাগল অন্তরার। সেই সকালে বের হয়েছে বাড়ি থেকে। এখন রাত ৮টা। বাবা আর মা'য়ের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে, কিভাবে শুরু করবে সে! কিভাবে উপস্থাপন করবে মাহবুবকে, ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কিভাবে বিয়ে করল মুসলমানের ছেলেকে, ভেতরে তোলপাড় চলছে অন্তরার। ডোরবেল টিপল অন্তরা। দরজা খুলল ছোট ভাই দিপু। ভাইকে জড়িয়ে ধরল সে। তার চোখে পানি। দ্রুত চোখের পানি মুছে হাসল সে, ভালো আছিস দিপু? দিদির ব্যবহারে বোকার মতো তাকাল তার দিকে, হঠাৎ দিদি এমন করছে কেন? কোনো দিন ঘরে ফিরে এমন করেছে বলে মনে পড়ে না তার। দিপুর দিকে তাকিয়ে মাহবুবকে দেখিয়ে বলল, দাদা, মানে মাহবুব দাদা, বসতে বল্ দিপু। দিপু মাহবুবকে বলল, বসেন দাদা। মাহবুব বসলে অন্তরা বলল, মা কোথায় রে দিপু? অদিতি, অদিতি কোথায়?

মাহবুব বুঝে ফেলল অন্তরা ভয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছে। আসলে অন্তরা অসম্ভব আবেগপ্রবণ মেয়ে। তার ভাবসাব দেখে মাহবুব নিজেও ভয় পেয়ে গেল। তখন সুন্দরী একজন মহিলা ঘরে ঢুকে অন্তরাকে বললেন, 'কিরে সারা দিন পর ফিরলি, ভেতরে না ঢুকে কী এত কথা বলছিস দিপুর সঙ্গে?' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'না মা, না মা, কই না তো, কিরে দিপু কিছু বলেছি তোকে, বল্ দিপু?' মেয়েটা কি জন্মদিনে কিছু খেয়েছে নাকি! আজকালকার ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাস নেই। নেশাটেশা করেনি তো মেয়েটা! 'কখন ফিরেছিস?' অন্তরার মা জানতে চাইলেন। মা'য়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সোফার ওপর বসে থাকা মাহবুবের দিকে আঙুল তুলে অন্তরা বলল, 'মা, মাহবুব।' সঙ্গে সঙ্গে মাহবুব উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

'আদাব আন্টি।'

'বসো বাবা বসো, ভালো আছো?'

'জ্বী আন্টি, ভালো আছি।'

তখন অন্তরা ঘরের ভেতর চলে গেছে। সোজা বাবার ঘরে ঢুকে বাবার পা জড়িয়ে ধরে সশব্দে কেঁদে উঠলো হাউ হাউ করে। অন্তরার কান্নার শব্দ পেয়ে আশ্বস্ত হলো মাহবুব। এখন যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারে অন্তরা তাহলে সে সবকিছু খুলে বলতে পারবে তার বাবা-মা'কে। মেয়ের আকস্মিক কান্না দেখে বাবাও কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'কাঁদছিস কেন মা, কি হলো?' 'বাবা আমি ভুল করেছি বাবা, তোমরা আমায় ক্ষমা করে দাও বাবা।' কেঁদেই যাচ্ছে সে। মেয়ের কান্না দেখে ভীতসন্ত্রস্ত মা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। 'কি হলো অন্তরা, আজ এমন করছিস কেন? খুলে বল সব, ভয় কি? আমরাতো আছি, কি হয়েছে?' 'মা আমি ভুল করেছি, আমায় ক্ষমা করো তোমরা।' কী ভুল করেছে, তাদের মেয়ে যে এভাবে হাউমাউ করে কেঁদেই যাচ্ছে! ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন অন্তরার মা! অন্তরার বাবা ড্রইংরুমে ঢুকলেন। লম্বা ফরসা উঁচু নাকের অধিকারী, সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা মানুষটা সামনে আসতেই উঠে দাঁড়াল মাহবুব, বলল– 'আদাব।'

'তুমি এসেছ অন্তরার সঙ্গে, বসো।'

মাহবুব বসতেই তিনি বললেন, 'আমি অন্তরার বাবা অরুণ চক্রবর্তী। আচ্ছা অন্তরার কী হলো, মেয়েটি এভাবে কাঁদছে! বলছে ক্ষমা করে দাও ...কী হলো বাবা, আমাদেরতো খুব খারাপ লাগছে।'

'আমি মাহবুব হাসান, ইতিহাসে এমএ করেছি, অন্তরা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, আমরা দুজন-দুজনকে ভালোবাসি, আনুষ্ঠানিক বিয়েতে কেউ রাজি হবে না বলে আমরা..।'

'তেমরা! তোমরা কী...?'

'আমরা বিয়ে করেছি, দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন।'

'তুমি কি সজ্ঞানে বলছো এসব, এসব কি সত্যি নাকি আমি ভুল শুনছি, অন্তরা হিন্দু, সে ব্রাহ্মণের

মেয়ে। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় কি করে!' মাথা নত করে আছে মাহবুব, তার মুখে কোনো কথা নেই। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। পিনপতন নৈঃশব্দ। ঘরের ভেতর থেকে সবাই শুনেছে এ সমস্ত কথাবার্তা। মনে হলো সময় থেমে গেছে। দেয়াল ঘড়িটার পেন্ডুলাম ডান-বাম করছে, টিক টিক শব্দ। কয়েক সেকেন্ডের মৌনতা ভাঙলেন অন্তরার মা মাধবী চক্রবর্তী– 'হায় ভগবান একি হলো... সর্বনাশ হয়ে গেল...এসব কি শুনলাম মাগো...!' খাটের ওপর শুয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন তিনি। দুপাশে দুই ছেলে মেয়ে দিপু আর অদিতি। তাদের চোখেও পানি। অরুণ চক্রবর্তী নিজের ঘরে গিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে থাকলেন। আবার সবকিছু চুপচাপ, নীরব! মাহবুব ড্রইংরুমে, অন্তরা মাথা নিচু করে কেঁদেই চলেছে।

মস্তিষ্ক অবশ করে দেয়ার মতো এমন একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা খুব কঠিন কাজ। এই দুঃসময় কাটাতে কে এগিয়ে আসবে এখন! উঠে দাঁড়ালেন অন্তরার বাবা অরুণ বাবু। ফুটফুটে ফুলের মতো ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি কবে বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারেননি তিনি। কাঁধে চড়িয়ে পথে পথে হেঁটে বেড়িয়েছেন, বন্ধুদের বাড়ি গেছেন, পিতৃস্নেহের সবটাই ওই মেয়েটিকে উজাড় করে দিয়েছেন, সেই মেয়ে এমন একটা কাজ করে বসলো বোকার মতো! বাবা হয়ে এটা তিনি কী করে মেনে নেবেন! ড্রইংরুমে বসে আছে ছেলেটা। যদি এখন গিয়ে তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, বাবা, মেয়েটা আমার যাচ্ছেতাই বোকা, ওকে তুমি ভুলে যাও বাবা, ও যা কিছু করেছে সব আবেগের বশে করেছে, এই আমি তোমার হাত ধরে আমার অন্তরাকে ভিক্ষা চাইছি বাবা, ভিক্ষা দাও? তার দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। বসে থাকা ছেলেটির সামনে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। মনে হলো যদি তার মেয়ে বলে, বাবা ওই ছেলেটিই আমার প্রেম, ওই আমার জীবন, ওকে যদি তুমি অপমান করে বের করে দাও, তাহলে আমি বাঁচবো না। অরুণ চক্রবর্তী স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সামনে সামনে বসালেন। চোখ মুছে চুপিচুপি স্ত্রীকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মাধবী।'

'কি সিদ্ধান্ত নিলে?' নিচু স্বরে জানতে চাইলেন মাধবী চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন অরুণ বাবু, এরপর বললেন,

'মাধবী, এমন একটা সময় অতিক্রম করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব, এ অবস্থা আর কিছুক্ষণ চললে আমরা অসুস্থ হয়ে যাব।'

'কিছু একটা বলো, এখন কি করব আমরা?'

'দেখ, ওরা বিয়ে করেছে, এ ছাড়া মেয়েকে আমরা যখন ফেরাতে পারব না তখন এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না, ওরা চলে গেলেই মঙ্গল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের শত্রুরা হাসাহাসি করুক– এটা আমি চাই না।'

'তাহলে?'

'খেয়ে যেতে বলো, খেয়ে গেলে ভালো আর না খেয়ে গেলেও আপত্তি নেই!'

'এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে ছেড়ে দেবে সব, একটুও চেষ্টা করে দেখবে না?'

'কি করব বলো, কী করা যায়?'

'অন্তরাকে বলে কয়ে যদি ফিরিয়ে আনা যায়।'

'আমার মনে হয় ওতে কাজ হবে না, সকালে যাওয়ার সময় সে বলেছিল বান্ধবীর জন্মদিনে যাচ্ছি, কিন্তু সে কোনো জন্মদিনে যায়নি, গেছে কাজির অফিসে।'

'অন্তরাকে কি বলব?'

'বলো, খাওয়া-দাওয়া কর, কান্না থামাও, পরে সময় করে একদিন এসো।'

স্বামী যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবেই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন মাধবী চক্রবর্তী। অন্তরা আর মাহবুব দুজনই বুঝতে পেরেছে এই বাড়ির মানুষরা অন্তরার বিয়ে এবং মাহবুবকে গ্রহণ করতে অপারগ। দিপু ফ্রিজ থেকে মিষ্টি এনে ওদের সামনে দিলে মিষ্টি খেয়ে বাবা-মাকে প্রণাম করে মাহবুবের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে অন্তরা।

অন্তরার চোখে পানি। রিকশায় উঠে অন্তরা বললো, এখানে আসার পর থেকে আমার অসম্ভব খারাপ লাগছিল, নিজের সন্তানের চেয়ে ওদের কাছে বড় হলো তাদের হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব আর আধঘণ্টা থাকলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যেতাম। শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসে অন্তরা দেখল, রিনি মাহবুবের খাটটা লাল গোলাপ আর রজনী গন্ধা দিয়ে সাজিয়েছে। দামি একটা সুন্দর চাদর বিছিয়েছে খাটের ওপর। অন্তরার বাবা-মা রক্ষণশীল নীতিকে ধরে রেখে মাহবুবকে গ্রহণ করতে না পারলেও মাহবুবের বোন অন্তরাকে গ্রহণ করল। আসলে সেই রাত ছিল মাহবুব আর অন্তরার জীবনে সবচেয়ে মধুর এবং স্মরণীয়। যে রাতে তারা দুজন-দুজনাকে আবিষ্কার করেছিল আরাধ্য নারী-পুরুষ হিসেবে! দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের লুকোচুরি খেলা বন্ধ হওয়ার পর একান্ত নিজেদের মতো করে পাওয়া প্রথম একটা রাত। বাসর রাত! ধন্যবাদ রিনি। রিনিকে বারবার ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ, সে অন্তরাকে সম্মান করেছিল সেদিন। যে রাতটা অন্তরার জীবনে শ্রেষ্ঠ রাত।

***

১২-৫০ থেকে ১-২০ পর্যন্ত কোনো ক্লাস হয় না। লেজার টাইম। টিচাররা তখন যার যার ঘর থেকে আনা খাবার খায় ডাইনিংরুমে বসে। অন্তরা খাবার খেয়ে ক্যান্টিনে চলে যায়। চা খাবে সে। অন্তরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই তার সামনে এসে বসলো ইংরেজির শুভাশীষ রায়। শুভাশীষ মাঝে মাঝে এটাওটা নিয়ে কথা বলে অন্তরার সঙ্গে। যাদের দুপুরের খাবার পর চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তারা চলে আসে ক্যান্টিনে। আবার যারা খাবার আনার সময় পায় না তারা দুপুরের খাবারটা ক্যান্টিনেই সেরে নেয়। ছোট্ট ক্যান্টিন। ৫০ ভাগ স্পেস টিচারদের জন্য বাকি স্পেস স্টুডেন্টদের। মাঝখানে পার্টিশন। শুভাশীষ জানতে চাইলো,

'লোপা কেমন কেমন আছে?'

'ভালো।'

'গান চলছে তো ঠিকমতো?'

'চলছে তবে ছুটির দিনগুলোতে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে, হারমোনিয়ামের সামনে বসতে চায় না।'

'ওদের বয়সী সবার ওই একই সমস্যা, স্কুলের পড়ার চাপে ওদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় পায় না।'

'খুব সুন্দর নাচতো, আমি বলেছি দুটি এক সঙ্গে পারবে না, নাচটা বাদ দাও।'

'ওর কণ্ঠটা দারুণ, খুব তেজি গলা, এরকম কণ্ঠ খুব রেয়ার।'

'উঠি শুভাশীষ বাবু, ক্লাসে যেতে হবে।'

'আমারও ক্লাস আছে, আসি।' তখনই ক্যা..ড়ড়ড় শব্দে বেল বাজলো অর্থাৎ লেজার শেষ। ক্লাস শুরু হওয়ার বেল এটা।

অ্যাটেনডেন্স খাতা হাতে ক্লাসে ছুটছিল অন্তরা। শিলারও ক্লাস। শিলা অন্তরার হাত ধরে বলল,

'প্লিজ ক্লাস শেষে জরুরি কথা আছে, মনে রেখ একটু।' 'ঠিক আছে বসবো।' ওরা ছুটলো যার যার ক্লাসে।

ক্লাস শেষ করে অ্যাটেনডেন্স খাতাটা রেখে বসতেই অন্তরা দেখল শিলা গোমেজ ছুটছে তার দিকে। শিলা বসতেই অন্তরা বলল,

'কি ব্যাপার এমন করছ কেন, এনিথিং রঙ শিলা?'

'ইয়েস, সামথিং রঙ অন্তরা, আই হ্যাভ টু মিট দ্য প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, জাস্ট নাও।'

'হোয়াই শিলা, এনিথিং আরজেন্ট, খুলে বলো?'

'শোনো, যেদিন ভূমিকম্প হলো সেদিন বাহার নাকি দেখেছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফ্রেশরুমের ভেতরে ছিল, বাহার বলেছে সে মেয়েটাকে পেছন থেকে দেখেছে, মেয়েটার চুল নাকি বয়কাট এবং সে বলেছে ওই বয়কাট চুলের মেয়েটা নাকি শান্তা গোমেজ, মানে আমার বড়ো ভাসুরের মেয়ে শান্তা, কী উদ্ভট ব্যাপার দেখতো?'

'শান্তার তো অতটা সাহস নেই, ক্লাস নাইন আর টেন মিলে ৫- ৬টা মেয়ের চুল বয়কাট, আর পেছন থেকে দেখে কি কাউকে চেনা যায়?'

'প্লিজ অন্তরা চলো ম্যাডামকে একটু বুঝিয়ে বলি বিষয়টা, শান্তা বলেছে সে কোনো ছেলের সঙ্গে ছিল না, ও কাঁদছে।'

বিকালে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কক্ষে ডাকা হলো বাহারকে। বাহার এসে সালাম দিল ম্যাডামদের। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন,

'তোমাকে প্রথম দিন আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তুমি ছেলেমেয়ে দুজনকে চিনতে পেরেছ, তুমি বললে, না চিনতে পারিনি, আর আজ সকালে বলেছ যে, মেয়েটা বয়কাট চুল এবং সেটা আমাদের একজন টিচারের বড় ভায়ের মেয়ে, বিষয়টা আমার কাছে দুর্বোধ্য

এবং রহস্যময় মনে হচ্ছে, তোমার কথা দু'রকম হচ্ছে, যেমন– প্রথমবার বললে চিনতে পারনি আবার পরে পেছন দিক থেকে দেখেও চিনে ফেললে ওটা শান্তা গোমেজ, আশ্চর্য! যাও তোমাকে ৫ মিনিট সময় দিলাম, বাইরে যাও এবং খুব ভালো করে চিন্তা করে এসে আমাকে বলো, কোনটা সত্যি, যাও।' বাহার চলে গেলে শিলা বলল,
'ম্যাডাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি কিছু বলব।'
'তাড়াতাড়ি বলো, ও এখনি চলে আসবে।'
'শান্তা আমাকে যে কথাগুলো বলেছে, সেসব কথা কিন্তু খুব মারাত্মক!'
'মারাত্মক! কেমন মারাত্মক বলো তো?'
'দেখুন ম্যডাম , শান্তা যেটা বলছে সেটা আমি আপনাকে গুছিয়ে বলতে পারব না, বরং ওর মুখ থেকে শোনাই ভালো।'
'শান্তা আছে না চলে গেছে?'
'আছে, ডাকবো ম্যাডাম?'
'দাঁড়াও, বাহার আসুক, ও এবার কি বলে শুনি, এরপর মেয়েটাকে ডেকো।'
বাহার আলী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসতে পারি ম্যাডাম?' ম্যাডাম বললেন, 'এসো।' বাহার সামনে দাঁড়ালে ম্যাডাম বললেন, 'বলো, কিন্তু মিথ্যা কারো নামে বদনাম করবে না আর যদি প্রমাণিত হয় যে, তুমি মিথ্যা বলছো, তাহলে কিন্তু তেমার ক্ষতি হয়ে যাবে, বলো।'
'আমি মিথ্যা বলবো না ম্যাডাম, মিথ্যা বললে আমার চাকরি চলে যাবে।'
'তাহলে সত্যি কথাটা বলো, তোমার চাকরি যাবে না, আমি কথা দিচ্ছি।'
'প্রথমে বাথরুমে ঢোকার সময় দেখি ভেতর থেকে বন্ধ, আমি তখন সামনে হেঁটে যাই, তখন পেছনে শব্দ হলে দেখি একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে, মেয়েটার বয়কাট চুল, আমি ওদের চিনতে পারিনি।'
'তাহলে...। আচ্ছা তুমি বাইরে যাও।'
'আচ্ছা, তোমার ভায়ের মেয়েটাকে ডাকতো এবার।' শিলাকে বললেন। শিলা উঠে গেল।
'তোমার কি মনে হচ্ছে অন্তরা?'
'মনে হচ্ছে বাহারকে আর দু-একবার শক্ত করে জেরা করলেই সব বের হয়ে যাবে।'
শিলা গোমেজ ঢুকল, সঙ্গে তার ভায়ের মেয়ে শান্তা গোমেজ। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শান্তাকে বললেন, 'এখানে দাঁড়াও, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে সব খুলে বলো।' শান্তা বলা শুরু করল,
'ম্যাম আমি একটুও মিথ্যা বলবো না, যা ঘটেছে শুধু সেটাই বলবো...আমি এখন ক্লাস টেনে, ২০১৩ সালে ক্লাস এইটে ছিলাম, তখন হরতাল-অবরোধ এসব চলছিল। মতিঝিলে আগুন দিয়ে সবকিছু পুড়িয়ে দেয়া হলো, তখন একদিন উম্মে সালসাবিল বলেছিল, পুড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক করছে, কেন পোড়াবে না, আমি বলেছিলাম, নিজেদের দেশ পোড়ানো কি ঠিক, দেশটাতো আমাদের সবার তাই না?...
'উম্মে সালসাবিলটা কে?'
'ও আমার সঙ্গে পড়ে।'
'বলে যাও।'
'ক্লাস টেনে ওঠার পর একদিন তানিয়া ম্যাডাম যখন, 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটা পড়াচ্ছিলেন তখন সালসাবিল কটাক্ষ করে বলল, এই কবিটা খুব খারাপ, আমি বললাম, মোটেও খারাপ নন, উনি খুব ভালো মানুষ, আমি উনার সঙ্গে কথা বলেছি, সালসাবিল আমাকে খুব হিংসা করে, ও আমার মতো বয়কাট চুল করেছে, সেদিন ফ্রেশরুমে ছিল সালসাবিল, বাহার ভাই সেটা জেনেশুনেই সালসাবিলের কথামতো আমার নাম বলেছে।' সঠিক আছে তুমি যাও, মিথ্যা কিছু বলো নি তো, আমি কিন্তু সালসাবিলকে ডাকবো, ঠিক আছে?'
'আচ্ছা ম্যাডাম ডাকবেন, ওর সামনেও আমি এগুলো বলতে পারব।'
শান্তা চলে গেলে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অন্তরা আর শিলাকে বললেন, 'শান্তা মেয়েটাকে দেখে মনে হলো ও মিথ্যা বলেনি, যে বিষয়টা সে আমাদের বোঝাতে চাইলো, তা সত্যিই ভয়াবহ, সালসাবিল মেয়েটার পরিবার তাকে এসব শিক্ষা দিয়েছে, পরিবার যদি তাকে এভাবে ভুল শিক্ষা দিয়ে স্কুলে পাঠায় তাহলে স্কুলের শিক্ষক তাকে যাই বোঝাক না কেন, সেটা সে বুঝতে চাইবে না।'
'তাহলে ম্যাডাম, ফ্রেশরুমে শান্তা ঢুকেছিল, যেটা রটিয়ে দেয়া হয়েছে, এর কি হবে, বিষয়টা কিভাবে ফয়সালা হবে?'
ম্যাডাম হাসলেন, 'ওইটুকু মেয়ের কাছে হেরে যাব আমি, মেয়ের চেয়ে বেশি শাস্তিটা দেব তার অভিভাবককে, কালই ডেকে পাঠাবো ওই মেয়েকে, সঙ্গে ওর বাবা-মা দুজনকেই আসতে বলবো,।'
প্রিন্সিপালের রুম থেকে ফিরে এসে কথা বলছিল শিলা আর অন্তরা। শিলা বললো, 'কি ভয়াবহ ব্যাপার, একটু ভেবে দেখ অন্তরা' চারপাশে দেখে নিল শিলা এরপর ফিসফিস করে বলল, 'ধরো প্রিন্সিপাল ম্যাডাম রেগে গিয়ে ওই মেয়েকে এমন টিসি দিলেন, যে টিসিতে সে কোনো ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারল না, তখন যদি মেয়ের বাবা বা ভাই অথবা ওদের নিজেদের লোক দিয়ে ম্যাডামকে অপমান করে অথবা অন্যকিছু, তাহলে... ভাবতে পারছি না আমি!'
'তুমি যে আশঙ্কা করছ, সেটা অমূলক নয়, ওরা যে কোনো কাজ করতে পারে।'
'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি অন্তরা?'
'কি কথা, বলো।'
'কিছুদিন থেকে দেখছি, তুমি একাকী হলেই কিছু একটা বিষয় নিয়ে ভাবছ, মনে হচ্ছে বিষণ্নতা, কোনো বড় কিছু প্রবলেম?'
অন্তরা হেসে ফেলে বলল, 'হয়ত আমার জন্য তোমার মায়া হয় সে জন্য তোমার চোখে ধরা পড়েছে বিষয়টা, তবে আমার এই বিষণ্নতা কোনো দিনও কাটবে না, যতদিন না আমি আমার জীবনের কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি, তবে তোমাকে ধন্যবাদ।'
'আসলে অন্তরা, সত্যি বলতে কি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে এমন কিছু জেনেছি, যা খুব বিচিত্র এবং আমার জন্য তা অনেক বড় অভিজ্ঞতা।'
'ওটা শুনে আমার কোনো লাভ হবে না শিলা, আমার বাবা-মা এখনো বেঁচে আছেন অথচ আমার প্রতি তারা কখনো সুবিচার করতে পারেননি, ভবিষ্যতেও পারবেন না অথবা পারলেও করবেন না, আমি নিশ্চিত।' তখন বেল বাজলো ক্যা..ড়ড়ড় শব্দে অর্থাৎ আজ ক্লাস শেষ। লোপা আসবে এক্ষুণি, সে এলেই অন্তরা তাকে নিয়ে রিকশায় উঠবে।

***

পাশে বসে আছে লোপা। রিকশা এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। অন্তরা ভাবছে সে যদি স্কুলে মাস্টারির চাকরিটা না পেত, তাহলে তাকে ঘরে বসে থাকতে হতো, সময় কাটতো কীভাবে! লোপা স্কুলে, মাহবুব অফিসে আর ঘরে অন্তরা, সারাদিন রান্নবান্না সংসারের টুকিটাকি এসব করতে করতে একদিন পাগল হয়ে যেত! ভাবলে গা শিউরে ওঠে অন্তরার। ভাগ্যিস চাকরিটা পেয়েছিল। হঠাৎ লোপা লোপা বলে কেউ ডেকে উঠল। লোপাই বলল, মা ওই যে শুভ আঙ্কেল ডাকছেন আমায়। শুভ মানে শুভাশীষ রায়। দূর থেকে ছুটে এসে শুভ বললেন, 'প্লিজ ম্যাডাম, একটু অপেক্ষা করেন আমি আসছি।'
রিকশাওয়ালাকে একপাশে দাঁড়াতে বলল অন্তরা। চারপাশে তাকাল, কোথায় গেল শুভাশীষ বাবু? রাস্তায় এভাবে রিকশা দাঁড় করিয়ে কারো জন্য অপেক্ষা করাটা খুব কষ্টের ব্যাপার, তা সেটা যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন? একটা শপিং ব্যাগ হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রিকশার সামনে এসে দাঁড়ালেন শুভাশীষ বাবু। ব্যাগটা লোপার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার জন্য।' অন্তরা বলল, 'কি আছে ভেতরে?' 'বাসায় গিয়ে দেখবেন, আসি ম্যাডাম, আসি লোপা।' ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন শুভাশীষ। লোপা ব্যাগের ভেতর দেখে বলল, 'দেখ মা শুভ আঙ্কেল আইসক্রিম দিয়েছেন।' অন্তরা বলল, 'আইসক্রিম খাও, খেয়ে গলার বারোটা বাজাও, সে জানে তুমি গান গাও, আইসক্রিম তোমার জন্য মোটেও ভালো না, ক্ষতিকর, এরপরও কেন যে ওটা দিল!' মা'র দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোপা বলল, 'বেশি খাবো না মা, কম কম করে খাবো, ঠিক আছে?' অন্তরা বলল,' ফ্রিজে রেখে দিও, বাবা দেখলে ভীষণ রাগ করবে।'
লোপাকে আইসক্রিম নিয়ে এতক্ষণ অন্তরা যা কিছু বলল, এর সবটুকু ঠিক নয়। একটু আধটু আইসক্রিম খেলে বাচ্চাদের গলার তেমন ক্ষতি হয় না। বিষয়টা আরো গভীরের। যখন মাহবুব শুনবে শুভাশীষ আইসক্রিম দিয়েছে তখন তার

মন বিগড়ে যাবে। কিন্তু কেন বিগড়ে যাবে অন্তরা তা জানে না। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলছে রিকশা। হঠাৎ অন্তরার মনে হলো মাহবুবের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে সে আশপাশের পরিচিত মানুষগুলোর মুখ আর মুখোশের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে। নিজের পরিবার, মাহবুবের পরিবার, সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষদের ভেতরের রূপটা ক্রমশ ধরতে পারছে সে।

বাবার কথা মনে পড়লো অন্তরার। বিয়ের প্রথম দিন জিন্দাবাহার লেন থেকে ফিরে আসার পর আরো কয়েকবার বাবার বাড়ি গিয়েছিল সে। তখন ঘনঘন একটা কথা মনে হতো, বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে তো? মুসলমানের ছেলেকে বিয়ে করার জন্য বাবা কতটুকু আঘাত পেয়েছেন? এ বয়সে সেই আঘাত সইতে পারবেন বাবা? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তারা সবার আগে বাবার কথা ভাবে। কি খাচ্ছে, কি পরছে, কিভাবে তার অবসর জীবনটা কাটছে? এমন একটা অপরাধ বোধ থেকেই ওই বাড়িটাতে ছুটে গেছে অন্তরা। কিন্তু যা কিছু ভেবে ওই বাড়িতে গিয়েছিল সে, এর কিছুই দেখতে পায়নি। মনে হলো পাশের বাড়ির মুসলমানের কোনো মেয়ে বেড়াতে এসেছে। যখন সে বাবা-মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, আমি তোমাদের সন্তান আমায় তোমরা ক্ষমা করো, মাহবুবকে গ্রহণ করতে যদি দ্বিধা হয় আমাকে গ্রহণ করো। যতক্ষণ আমি তোমাদের এখানে থাকি একটু আগের মতো ব্যবহার করো। মনে হয়েছে বাবা যেন প্রাণহীন জড়পদার্থ। অন্তরা তার কেউ নয়। কেউ বোঝার চেষ্টা করেনি তাকে! মা পারেনি, বাবাও পারেননি, অদিতি সেও না শুধু ছোট ভাই দিপু সে পেরেছে। দিপু তার কথবার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছে, সে অন্তরাকে ভালোবাসে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে– এটাইতো স্বাভাবিক। ভিড়ের মধ্যে মানুষ দেখে কেউ বলতে পারবে– এটা হিন্দু, এটা মুসলমান, ওটা খ্রিস্টান, সবাইকে তখন মানুষই মনে হবে। হাত-পা কেটে গেলে যে রক্ত বেরিয়ে আসে সেটা মানুষেরই রক্ত! ওরা বোঝেনি যে, মানুষের জাত ওই একটাই যার নাম মানুষ, মনুষত্ব তার ধর্ম। হয়ত দিপুর চোখে তার দিদি মানুষ। তাই সে অন্তরাকে বলতে পেরেছে– মাহবুব ভাইকে আমার ভালো লেগেছে। অন্তরা যখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বাসা বদল করে এসেছে দিপু তখন আসতো মাঝে মাঝে। দিপুটা এখন বিদেশে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। অদিতির বিয়ে হয়েছে অনিমেষ চক্রবর্তীর সঙ্গে। শুনেছে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। অদিতি এখন ভালো আছে কিনা জানেনা সে। অনিমেষের অভিযোগ অদিতির বাবা কঞ্জুস।

বাবা-মা'র কাছ থেকে পাওয়া কষ্ট ভুলে থাকতে চাচ্ছিল অন্তরা। কোথাও স্বস্তি পাচ্ছিল না একটুও। তারা তখন আজিমপুরের বাসায়। কি করে মন ভালো রাখা যায়! মাঝে মাঝে মাহবুবের সঙ্গে বাইরে যায়। একদিন মাইকে গান হচ্ছিল খুব জোরে। অন্তরার মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পূজা। ছোটবেলায় শুধু নয় বড় হয়েও সে পূজায় গেছে ঠাকুর দেখতে। কি মনে হলো হঠাৎ, সে এখন পূজা দেখতে যাবে! সন্ধ্যাবেলা বেনারসি শাড়িটা পরলো। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ইচ্ছামতো সাজতে শুরু করলো। মাহবুবকে বলল, 'দামি সিল্কের পাঞ্জাবিটা পরো।' 'হঠাৎ সন্ধ্যায় পাঞ্জাবি, কোথায় যাবে?' জিজ্ঞাসা করল মাহবুব। 'প্লিজ জানতে চেও না, বলছি পরো, ব্যাস।'

জিন্দাবাহার লেন থেকে ফিরে আসার পর অন্তরার মন ভালো নেই সেটা জানে মাহবুব। সে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বলল, 'পাজমা না ফুলপ্যান্ট কোনটা বলো?' অন্তরা বলল, 'আজ পাঞ্জাবির সঙ্গে পাজামা পরো।'

রিকশায় উঠে অন্তরা বলল, জগন্নাথ হল যান। মাহবুব অবাক! 'জগন্নাথ হলে কি?' 'চুপচাপ বসে থাক, গেলেই তো দেখতে পাবে।' মাহবুব চুপ করে বসে থাকল অন্তরার পাশে। আজিমপুর থেকে জগন্নাথ হল কাছেই। রিকশা সামনে

এগিয়ে চলেছে। মাইকের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। রিকশা থেকে নেমে অন্তরা বলল, 'ছোট বেলায় বাবার হাত ধরে পূজা দেখতে আসতাম, বাবা নেই, আজ তোমার হাত ধরে পূজা দেখব আর ফুচকা খাবো, চলো।' হাত ধরাধরি করে ওরা দুজন সামনে এগিয়ে গেল। চারপাশে মানুষের ভিড়। বেশির ভাগ পুরুষ পাঞ্জাবি পরেছে। মেয়েরা পরেছে রঙ-বেরঙের শাড়ি। আলো ঝলমল রাত। আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা চারপাশ। একপাশে দেবী সরস্বতী বসে আছেন তার বাহনের ওপর। সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকায় অন্তরা। হঠাৎ হাসতে হাসতে অন্তরা বলল, 'জানো পূজা দেখতে এসে একবার আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, এরপর সে কি কান্না। পরে মাইকে আমার নাম বলা হলো, একটি ৮ বছরের মেয়ে পাওয়া গেছে নাম অন্তরা, মাইকে শুনে বাবা পড়ি-মরি করে ছুটে এসে বললেন, অন্তরা আমার মেয়ে, আমার মেয়ে, বাবার চোখে-মুখে সে কি উদ্বেগ বাপরে বাপ! এরপর আমাকে পেয়ে বাবার আনন্দ আর ধরে না।' এসব বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল অন্তরা। 'সেই বাবা আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারল মাহবুব?' 'কেঁদনা অন্তরা, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে দেখ' সান্ত্বনা দিল মাহবুব। জোরে বাজলেও মাইকে সুন্দর একটা গান হচ্ছিল– এই নীল মণিহার, এই স্বর্ণালী দিনে, তোমায় দিয়ে গেলাম, শুধু মনে রেখ...।

মাহবুবের প্রিয় গান এটা। ভালো লাগলো তার। অন্তরা বলল, 'ফুচকা খাবো মাহবুব?' ফুচকা খেতে খেতে ওরা গান শুনতে লাগলো– এই স্বর্ণালী দিনে, তোমায় দিয়ে গেলাম...।

***

আজ অন্তরার ক্লাস কম। টিচার্স রুমে শিক্ষকদের ভিড়। বেশির ভাগ তরুণ । ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। রেহার্সেল শুরু আজ থেকে। শিলা গোমেজ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক। সে বলেছে অনুষ্ঠানে গান গাইতে হবে লোপাকে। শিলা জানে অন্তরা নাচতে পারে। ছোটবেলায় সে ফাংশনে নাচ করেছে। হেসে বলেছে শিলা, 'তোমাকে নাচতে হবে কিন্তু অন্তরা?' 'এখন নাচতে পারি না শিলা, আমাকে দিয়ে হবে না, নতুনদের দিয়ে করাও।' শিলা ছাড়বে না নাচতেই হবে তাকে। হঠাৎ ভেতরে ঢুকলেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে ম্যাডাম বললেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্কুলের চেয়ারম্যান স্যার। সবাই বুঝতেই পারছ, অনুষ্ঠান খুব ভালো হতে হবে। ম্যাডামের কথা শুনে খুশি হলো টিচাররা।

ফোর্থ ফ্লোরে হলরুমে রেহার্সেল শুরু হলো ম্যাডামের উপস্থিতিতে। তবে ক্লাস সাসপেন্ড করা হলো না। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রছাত্রীরা এসে অংশগ্রহণ করছে। শিলা গোমেজ ভীষণ ব্যস্ত। শিলার একটাই অনুরোধ অন্তরার কাছে, 'তুমি হেল্প করবে, তুমি ছাড়া আমার পক্ষে একা এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।' অন্তরা বলেছে, 'তুমি শুরু করো আমি তো আছি তোমার পাশে।' সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব গান প্রচারিত হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ওগুলো গাইবে ছেলেমেয়েরা। এর সঙ্গে থাকবে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত আর লালন ফকিরের গান। বিশেষ একটা গান থাকবে কোরাস- মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি...। অন্তরাকে জানিয়ে দিল শিলা, 'লোপাকে বলো– সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, এটা গাইতে হবে তাকে।' মাথা নড়ালো অন্তরা অর্থাৎ সে বলবে। ফোর ফাইভের মেয়েরা নাচ করবে, আবৃত্তিও থাকবে। সব মিলিয়ে স্বাধীনতা দিবসে একটা সুন্দর উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেবে দীপশিখা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকরা।

রেহার্সেল শুরু হলো একটা ছোট্ট মেয়ের নাচ দিয়ে। ওর নাম টুশি, ক্লাস থ্রি'র ছাত্রী। মোবাইল ফোনে মিউজিক অন করতেই সাউন্ডবক্সে ভেসে এলো গান। কণ্ঠ ফিরোজা বেগমের...মোমের

পুতুল, মোমের দেশের মেয়ে নেচে যায়, বিহ্বল চঞ্চলতায়...। টুশি নেচে চলেছে... গানের তালে তালে কোমর দুলিয়ে, সুন্দর ছন্দে হাত পা নেড়ে নেচে চলেছে ছোট্ট টুশি। সবাই বলছে, বাহ্ এইটুকু মেয়ে এতো সুন্দর নাচতে পারে! চেয়ারে বসে নাচ দেখছিল অন্তরা। হঠাৎ অন্য কোথাও চলে গেল সে। হলিক্রস স্কুলের ফাংশনে নাচ করছে অন্তরা চক্রবর্তী। ফিরোজা বেগমের গানের সঙ্গে নেচে চলেছে। এই সেই গান, মোমের পুতুল, মোমের দেশের মেয়ে...ধা-ধিন-ধিন-ধা, ধা-ধিন-ধিন-ধা...নেচে চলেছে অন্তরা। সামনে বসে দর্শকরা দেখছেন মুগ্ধ চোখে! বাহ্, খুব সুন্দর নাচছে মেয়েটা, নাম কি মেয়েটার? অন্তরা চক্রবর্তী, ওই যে মিটফোর্ড কলেজের অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী, তার মেয়ে। খুব ভালো নাচছে তাই না? হ্যাঁ, ছোট বেলায় খুব সুন্দর নাচ করত অন্তরা, এখনকার কেউ জানে না। নাচের ছবিগুলো একদিন দেখিয়েছিল শিলাকে। সে জন্যই শিলা বলেছে, এই অনুষ্ঠানে নাচতে হবে অন্তরাকে। মায়ের অগ্রহে আর অনুপ্রেরণায় বাড়িতে নাচের শিক্ষক এসে নাচ শেখাত তাকে। সে যখন ক্লাস নাইনে, তখন লেখাপড়ার চাপে আর নাচা হয়নি। গান গাইতে পারতো অন্তরা, আবৃত্তি চর্চ্চাও ছিল। এসব বিষয়ে মাহবুবের সঙ্গে তার জীবনের অনেক কিছুরই মিল খুঁজে পেয়েছিল। দু'জনেই নাচ গান আবৃত্তি পছন্দ করতো। তাদের ওই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল, যারা সংস্কৃতিমনা। যারা কুপমুণ্ডকতার বাইরে, গোঁড়ামির বাইরে থেকে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিতে চেয়েছিল। সেসব দিনগুলো এখন অতীত। এখন সকালে উঠেই মাহবুব অফিসে দৌড়ায়। অন্তরা নাস্তা আর দুপুরের খাবার তৈরি করতে ঘাম ঝরায়। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজের স্কুলে যেতে হয়। এখন এসব সত্য এবং বাস্তব।

এসব ভাবনা একরকম। এ ছাড়া আরো অনেক কিছু ভাবতে হয়েছে অন্তরাকে, যা নিতান্তই কষ্টের এবং ব্যর্থতার। যেসব কিছুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে তাকে। লড়াইটা নিজের সঙ্গে নিজের, বাবা-মা ভাই-বোনের সঙ্গে, শ্বশুর-শাশুড়ি-রিনি মাহবুবের সঙ্গে, সবার ওপরে সমাজ নামের একটা ভারি বস্তুর সঙ্গে যেটা নিতান্তই একচোখা, প্রায় অন্ধ। বিয়ের পর যখন পেটে এলো লোপা। শাশুড়ি আর ননদ মিলে বলা শুরু করল মাহবুবের ছেলে হলে নাম রাখবে মাহমুদ হাসান আর মেয়ে হলে মাইশা হাসান। হায়রে শাশুড়ি, হায়রে ননদ! ১০ মাস গর্ভে ধারণ করে নিজের রক্ত মাংসে যাকে লালন করছে অন্তরা, সে নবজাতক পৃথিবীতে এলে তার নাম রাখতে পারবে না তার মা! এ কেমন কথা! মা হিসেবে তার অধিকারটা? অন্তরার প্রথম সন্তান মেয়ে হলো। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, মেয়ের নাম হবে লোপা হাসান। এরপর যা হওয়ার তাই হলো, শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হলো না ওদের।

হাতীরপুলে নতুন বাসা ভাড়া নিল মাহবুব। দুটি রুমের সঙ্গে ড্রইং কাম ডাইনিং। দোতলায় ছোট্ট বাসা। সবে নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে মাহবুব। বাসা ছোট, দু-একটা সমস্যাও আছে কিন্তু অন্তরা এখন স্বাধীন। নতুন বাসায় ওঠার পর থেকে অন্তরা দেখল, তার সামনে নতুন আর এক সমস্যা, মাববুব বিষণ্ন থাকে প্রায়ই। মাহবুবের বিষণ্নতা কেটে যাবে একদিন। সংসারে এটুকু আশা করতেই পারে অন্তরা। যেদিন মাহবুব বুঝতে পারবে, অদৃশ্য একটা চাপ, যেটা অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল অন্তরাকে, শুধু সেখান থেকে পালাতে চেয়েছে সে। নিশ্চয় একদিন বুঝবে অন্তরা, যা কিছু করেছে সেটা এই ছোট্ট পরিবারের মঙ্গলের জন্যই করেছে। করেছে তার মেয়েটার ভবিষ্যতের জন্য। কোনো মা যদি বদ্ধ দরজা-জানালার ভেতর জীবন কাটায়, সেই মা কি করে তার মেয়েকে আকাশ দেখাবে? লোপার জন্য আলাদা একটা খোলা আকাশ

চেয়েছে অন্তরা!

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোপার পেছনে সময় দেয় অন্তরা। লোপাকে মানুষ করতে হবে দুজন মিলে। সময় মেপে গোসল করানো, দুধ খাওয়ানো, ছোট ছোট জামাগুলো ধুয়ে শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখা। যতক্ষণ অফিসে থাকে মাহবুব ততক্ষণ সে মেয়ের জন্য ভাবে। অফিস থেকে ফিরেই ছুটে যায় মেয়ের কাছে। লোপা দিন দিন বড় হচ্ছে। খাওয়ার সময় হলেই হাত পা নেড়ে কেঁদে ওঠে চিৎকার করে। ওর বাবা কোলে নিলে হাসে। অন্তরা বলে, 'বাচ্চা মানুষ করা কতটা কষ্টের তুমি কিছুই টের পেলে না!' মাহবুব হাসে।

কেমন একটা সুখ সুখ লাগে অন্তরার। কষ্টের মধ্যেও বেঁচে থাকার আনন্দটুকু উপভোগ করে ওরা। কিন্তু নতুন আর এক সংকটে পড়লো অন্তরা। হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে দেখা হয় এক মহিলার সঙ্গে। অন্তরাকে দেখেই মহিলা ভুত দেখার মতো চমকে উঠল, 'অন্তরা চক্রবর্তী না! কী আশ্চর্য আপনি এখানে?' অন্তরাও ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক! বলল, 'আপনি! ঠিক চিনতে পারছি না, সরি!' চলে যাচ্ছিল অন্তরা। মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি বাংলায় পড়তেন আমি ইসলামের হিস্ট্রিতে ছিলাম, অমার নাম মাসুমা, আপনাকে তো আমি তখন থেকেই চিনি।' 'ভালো আছেন?' বলে চলে যাচ্ছিল অন্তরা। 'হ্যাঁ, ভালো আছি, দোতলায় আপনারা এসেছেন বুঝি?' 'জ্বী, আমরা এসেছি, আসি।' মাসুমা বুঝতে পারল অন্তরা তাকে এড়িয়ে গেল। কেন এড়িয়ে গেল সেটা জানে মাসুমা। ঘরের ভেতর গিয়ে খাটের ওপর বসলো অন্তরা। পাশে শুয়ে আছে লোপা। জানালা দিয়ে দূরে তাকালো সে। দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে মাসুমা নামের এই মহিলাটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কেমন রহস্যময় মনে হলো তার কাছে! সে কি অন্য আর একটা ঝামেলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল আজ থেকে! কে বলতে পারে এসব! ভাগ্যের ওপর কতটুকু নিয়ন্ত্রণ থাকে মানুষের? কার সঙ্গে কার কখন কোথায় কিভাবে দেখা হয়ে যাবে– এসব ভবিতব্য। যার হদিস জানে না কেউ!

অন্তরা ভেবেছিল, নিজের মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে এই ছোট্ট বাসাটাতে নিরিবিলি জীবন-যাপন করবে। সন্ধ্যায় মাহবুব এলে তাকে চা দিল অন্তরা। মাহবুব চা খাচ্ছিল আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুঁনসুটি করছিল। অন্তরা তখন বলল, 'আজ সিঁড়িতে হঠাৎ একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হতেই বলল, আপনি অন্তরা চক্রবর্তী না? আমি বোকার মতো তাকালাম তার দিকে, সে বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি যখন বাংলায় আমি তখন ইসলামিক হিস্ট্রিতে।' 'তুমি কি বললে?' মাহবুব জানতে চাইল। 'আমি আর কি বলবো বলো, তবে মনে মনে বললাম, বিধাতা তোমাকেই পাঠালেন অন্তরা চক্রবর্তীর খোঁজ করতে!' মাহবুব হাসলো তার কথা শুনে। 'তুমি হেসনা প্লিজ কিছু একটা বলো?' মাহবুব বলল, 'শোনো তুমি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্তরা চক্রবর্তী সেটা প্রমাণ করার জন্য ওই মহিলা আরো দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন আবার এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি।' অন্তরা ভয় পেয়ে বলল, 'কেন, কেন তারা আবার আসবে?' কারণ, খুব সহজ। 'যেমন?' 'যেমন এ সমস্ত মহিলাদের কোনো কামকাজ নেই, স্বামীরা ব্যাগ ভরে বাজার করে দেন, স্ত্রীরা সেটা ফ্রিজে রেখে দেন, কাজের বুয়ারা ওসব মাছ-মাংস কেটে ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেন, ভদ্র মহিলারা সেটা রান্না করে স্বামী-সন্তানকে পরিবেশন করেন, এরপর দিনরাত ভারতীয় সিরিয়াল দেখেন, অন্তরা চক্রবর্তী ওদের কাছে কোনো বিনোদনের বিষয় হতো না, যদি তার স্বামী হিন্দু হতো, এবার বুঝতে পেরেছ, তারা কেন আবার আসবে?'

মাহবুবের কথাই সত্যি হয়েছে। কদিন পর মাসুমা আবার এসেছে। তবে এবার সে একা নয়। সঙ্গে এনেছে আরো এক মহিলাকে। 'কেমন আছেন? ভালো আছি' বলে কথা শুরু হলেও

দু'ঘণ্টার বিরতিহীন গল্প ক্রমশ মোড় নিয়েছে অন্তরার প্রেম বিয়ে জীবন নিয়ে। হঠাৎ মাসুমা বলল, 'দিদি, আগে যে নাচ-গান করতেন এখনো করেন, আপনার হাজব্যান্ড এসব অ্যালাউ করেন?' কী জবাব দেবে অন্তরা. আশ্চর্য! অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'সে কিছুই বলে না তবে আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।' 'খুব ভালো করেছেন, ইসলামে নাচ-গান হারাম।' মাসুমারা চলে গেলে একা একা কেঁদেছিল অন্তরা। সেই কান্নার কথা কখনো বলেনি মাহবুবকে। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তরা এখানে এই বাসায় আর থাকবে না সে। মানুষ এমএ পাস করেও এতটা আনকালচার্ড হয়? ওরা হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে নিয়ে এত আগ্রহী কেন, কেন তারা অন্তরার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে এনেছে বারবার সেটা বোঝেনি অন্তরা। ওদের এসব হ্যাংলামির জন্য দু'মাস পর বাসা বদল করতে হলো মাহবুবকে। মাহবুব নতুন বাসা নিল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। বছর আটেক ছিল সেই বাসায়। এরপর মাহবুবের বেতন বেড়েছে। প্রমোশন হয়েছে। বড় বাসা ভাড়া নিয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা করে জীবন এগিয়েছে অনেকখানি। লোপা বড় হয়েছে। এখন ক্লাস এইটে উঠেছে। বাবার মতো সেও গান গায়।

***

অন্তরার চাওয়া-পাওয়াটা আর ৫ জন মেয়ের চেয়ে আলাদা। লোপা একটু বড় হয়েছে তাতে কি, অন্তরা চায় মাহবুব বিয়ের আগের মতোই ভালোবাসুক অন্তরাকে। আগে যা যা করতো এখনো সেসব করবে। হাসবে, গান গাইবে, পাগলের মতো করবে অন্তরাকে নিয়ে। মাহবুবের কাছে এই চাওয়াটা পূর্ণ হয় না। তাহলে মাহবুব কি এখন বিরক্তিকর মনে করে অন্তরাকে? এতগুলো বছর এক সঙ্গে কাটিয়ে দেয়ার পর অন্তরা হিসাব করে দেখেছে, লোপার নাম রাখা নিয়ে যখন সে আজিমপুরের বাসা ছেড়েছে। এরপর থেকেই মাহবুব পাল্টে গেছে, কিন্তু বাইরে থেকে বিষয়টা বোঝার উপায় নেই। 'ম্যাডাম চা খান' আচমকা মরিয়মের কথায় সম্বিত ফিরে পায় অন্তরা, তাকিয়ে দেখে তার সামনে ট্রে'র ওপর চা আর সিঙাড়া। অবাক হয়ে তাকাল মরিয়মের দিকে, কই আমি তো চা আনতে বলিনি তোমাকে? মরিয়ম বলল, 'শিলা ম্যাডাম পাঠিয়েছেন, খান ম্যাডাম।'

চা খাচ্ছিল অন্তরা। হঠাৎ মনে হলো, দিন দিন সে নিজেই অন্যমনস্ক হয়ে যচ্ছে। চারপাশে জীবনের যে কোলাহল তার সঙ্গে মিশে যেতে পারছে না। ক্রমশ সে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। ছকে বাধা একটা কিছুর ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে প্রতিদিন। একই কথা ভাবছে, একই কাজ করছে। সেই ফাঁকে জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ দূরে সরে যাচ্ছে! শিলা গোমেজ কিন্তু এসব কিছুকে অতিক্রম করে নিজেকে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে। অন্তরা কেন শিলার মতো হতে পারছে না!

একদিকে রেহার্সেল চলছে। অন্যদিকে টিচার্স রুমে আজ চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে শিক্ষকরা। রুমা খান আড্ডার মধ্যমণি। আড্ডার সঙ্গে ঘন ঘন চা সিঙাড়া চলবে। চাইলে কফিও খাওয়াবে রুমা। শুভাশীষ রায় দুবার ডেকেছে অন্তরাকে। সে যায়নি।

আসলে অন্তরা ভীষণ ক্লান্ত! গতকাল সন্ধ্যায় মাহবুবের বন্ধুর ছোট ভায়ের বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিল আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টারে। খুব সেজেছিল অন্তরা, লোপাকে দামি কাপড় পরিয়েছিল। মাহবুবকেও সিল্কের দামি পাঞ্জাবিটা বের করে দিয়েছিল। একটা উদ্দেশও ছিল। নিজের মনটা ভালো রাখা। লোপা আর মাহ-বুবকেও একটু চেয়ার আপ করা। খাওয়া শেষ হলে আমন্ত্রিত মানুষগুলো নানান কথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। এসব দাওয়াতে বহুকাল আগের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায়। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে মাহবুবকে দেখে চিৎকার করে উঠল দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা একজন লোক, 'মাহবুব না, কেমন আছিস দোস্ত?' মাহবুব লোকটার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, 'অতাউল্লাহ না, এতদিন পর, তোকে তো চেনার উপায় নেই! কোথায় ছিলি এতদিন?' 'আমি সৌদিতে ছিলাম, গত বছর ওখানকার পাট চুকিয়ে দেশে চলে এসেছি।' অন্তরার দিকে হাত তুলে মাহবুব বলল, 'আমার স্ত্রী অন্তরা আর এই আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী আতাউল্লাহ।' অন্তরা তার ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'আসলামু আলাইকুম।' আতাউল্লাহ 'ওয়ালাইকুম সালাম' বলে মাহবুবের দিকে তাকাল, 'বহুদিন পর রায়হানের সঙ্গে দেখা, ওর মুখে তোদের বিয়ের হিস্ট্রি শুনেছিলাম, তা ভাবি গোরুর গোশত খান তো?' কথাটা বলে ভিড়ের মধ্যে আতাউল্লাহ হো হো করে হেসে উঠলেও অন্তরা একদম বোকা বনে গেল। কোনো রকম প্রসঙ্গ ছাড়াই আচমকা কী বলল এই লোকটা! অন্তরা মাথা নিচু করে স্মিত হাসিতে ঠোঁট নাড়ল একটুখানি। এ কেমন বন্ধু! ১৪-১৫ বছর পর দেখা অথচ কোনো কুশল বি-নময় ছাড়াই বন্ধুর নতুন পরিচিত বউকে জিজ্ঞাসা করল, গোরুর গোশত খান তো? এ কেমন প্রশ্ন! লোকটার রুচি এতটাই নিচু, ছি। এমন রুচিহীন মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলাই ভালো। কথা না বাড়িয়ে মাহবুবকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্তরা বলল, 'লোকটা কেমন বন্ধু তোমার, প্রথম দেখাতেই বন্ধুর স্ত্রীকে এমন প্রশ্ন করে কেউ?' মাহবুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'এসব কথাকে গুরুত্ব দিও না, এগুলো কথার কথা, তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ।' 'তুমি ওই লোকটাকে সমর্থন করছ, আমার বোঝা হয়ে গেছে, তুমি বোঝো।' মেয়েরা যেভাবে কথার পিঠে কথা বলে, প্রতিপক্ষের মুখের ওপর জবাব দিয়ে দেয়, সেভাবেই কথাগুলো বলেছে অন্তরা। বিয়ের পর থেকেই একটা চাপের মধ্যে আছে অন্তরা সেটা অনুভব করলেও অন্তরার কথা সহ্য করতে পারল না মাহবুব। সে-ও তো একই রকম চাপ অনুভব করে এসেছে বছরের পর বছর। কিন্তু সেটা বলেনি কাউকেই, কাকে বলবে এসব কথা, নিজেদের নেয়া সিদ্ধান্তেই বিয়ে করেছিল তারা! অন্য কাউকে বললে কি হতো, সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? হতো না। শেষে মাহবুব বলেছিল, 'কোনো পশু যদি তোমার পায়ে কামড় দেয়, তাহলে তুমিও কি তার পায়ে কামড় দেবে?' কুকুর শব্দটা ব্যবহার করেনি মাহবুব।

গতরাতের আকস্মিক ঝগড়ার কারণ বা পটভূমিটা কী হতে পারে! ভেবে পায় না অন্তরা। বোধশক্তি কমে যাওয়ার মতো বয়স হয়নি তার। মাহবুবের সহপাঠী বন্ধু অতাউল্লাহর আকস্মিক উদ্ভট প্রশ্নটা নাকি তার মনোজগতে অতীতের মিথষ্ক্রিয়া, তাকে গ্রহণে তার বাবা-মা'র অস্বীকৃতি নাকি লোপার নাম নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব, নাকি মাহবুবের অবচেতন মন, নাকি প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারাটা? কোনটি? এমনি অনেক জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায় অন্তরা!

অন্তরার ভয়ানক দোষ হলো হুট করে রেগে গিয়ে কথার পিঠে কথা বলা। কেউ কিছু বললে চুপ করে থাকতে পারে না। কাল রাতে প্রচণ্ড রেগে গেল মাহবুব। যেটা আগে কখনো করেনি সে। অন্তরা বলেছে, 'থেকে থেকে মনে হয় লোপাকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যাই, এসব মানুষকে আর সহ্য করতে পারছি না আমি!' মাহবুব চট করে রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'গেলেই পারো, কেউ কি বেঁধে রেখেছে তোমাকে?' 'হ্যাঁ, যাবই তো, অবশ্যই যাব।' 'যাও, এখনি যাও।' অন্তরা তখন হু হু করে কেঁদে উঠেছে। অন্তরার কান্না দেখে খারাপ লেগেছে মাহবুবের, সে বলেছে, 'কতবার বলেছি, ওসব মানুষের কথাকে কোনো গুরুত্ব দিও না, ওসব হলো কথার কথা, কোথাকার কে বলেছে গোরুর গোশত খেয়েছেন, অমনি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? ওটাকেই ধরে বসে থাকতে হবে? জগৎ সংসারে আর কিছু নেই যেগুলো সুন্দর?' 'তোমাকে কেউ যদি বলত, হারাম পশুর মাংস খেয়েছেন তো, তাহলে তখন তোমার কেমন লাগত, ভেবে দেখ...অসহ্য।' 'এই তো, অন্য মানুষকে তুমি বলো ছোট লোক, আনকালচার্ড, তাহলে তুমি কি? তুমিও তো সব সময় তোমার অহঙ্কার নিয়ে সবার ওপর থাকতে চেয়েছ, এই অহঙ্কারটা ছাড়তে পারো না বলেই তো তুমি মানুষের সঙ্গে মিশতে পারো না মন খুলে।' অন্তরা কাঁদতে কাঁদতে ড্রইংরুমে গিয়ে মেঝের ওপর শুয়েছে।

মাঝরাতে মাহবুব অন্তরার পাশে গিয়ে বসেছে, বলেছে, 'বিছানায় চলো, খুব খারাপ লাগছে আমার, বুকের ভেতর কেমন করছে, ওঠো অন্তরা।' দীর্ঘদিন ধরেই বুকের ভেতর অপরিচিত একটা ব্যথা অনুভব করে মাহবুব কিন্তু কাউকে সে বলেনি এসব। অন্তরার রাগ পড়েনি তখনো, ভীষণ রেগে ছিল সে, 'তোমার বুকে ব্যথা করছে তো আমি কি করব, তুমি যাও।' এরপরও

অন্তরার হাত ধরে টেনেছে মাহবুব, তাকে খাটের ওপর শুতে অনুরোধ করেছে। অন্তরা যায়নি।

***

শেষ ক্লাসটা নিয়ে এসে টিচার্স রুমে বসে অন্তরা। ঘড়ি দেখল। বিকাল ৩টা। লোপার ছুটি হয় ৪টায়। এখনো ১ ঘণ্টা। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল অন্তরা হাসান। আজ ভীষণ মেঘ করেছে আকাশে। মনে হচ্ছে ঝুম বৃষ্টি নামবে। আশ্চর্য! সকাল থেকে একবারও ফোন করল না মাহবুব! যত রাগই করুক ও একবার ফোন দেবেই। সরি বললেই রাগ পড়ে যায় অন্তরার। মাহবুব তাকে বোঝায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন কথা কাটাকাটি হতেই পারে। আজ কিন্তু আকাশের মেঘের মতোই থমথমে চুপচাপ সবকিছু! এখনো ফোন করল না মাহবুব! না করুক। সেও ফোন দেবে না। তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

একটা বিষণ্ন মন নিয়ে বসে থাকে অন্তরা। হঠাৎ ব্যাগের ভেতর শব্দ করে নড়ে উঠল মোবাইল ফোনটা। মাহবুবের ফোন আসল ভেবে উজ্জ্বল হলো অন্তরার মুখ। দ্রুত ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করল সে। কিন্তু অপরিচিত নাম্বার। ধরবে কি ধরবে না ভাবল। আজকাল কিছু লোক ফোন করে অশ্লীল কথা বলে, নানা রকম বাজে প্রস্তাব দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোন ধরল অন্তরা –'হ্যালো?'

'মিসেস মাহবুব বলছেন?'

'জ্বি বলছি, কে বলছেন?'

'ভাবি, আমি মাহবুবের কলিগ আশফাক বলছি।'

'হ্যাঁ আশফাক সাহেব বলুন, কি খবর?'

'আজ দুপুরে মাহবুব হঠাৎ ঘামতে থাকে, বলে বুকে ব্যথা করছে, আমরা ওকে অফিসের পাশের হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে ওরা কার্ডিয়াক হাসপাতালে ভর্তি করাতে বলে।'

'এরপর এরপর...! প্লিজ তাড়াতাড়ি বলুন আশফাক সাহেব?'

'আমরা ওকে রেড কার্ডিয়াক হাসপাতালে ভর্তি করেছি।'

'ডাক্তাররা কি বলেছে, কেমন আছে মাহবুব?

'কিছুই বলা যাচ্ছে না, ওতো অজ্ঞান, আপনি এক্ষুনি চলে আসুন।'

সমস্ত শরীর কাঁপছে অন্তরার। মাহবুব হাসপাতালে। তার হার্ট অ্যাটাক করেছে! সে অজ্ঞান! হাঁটু কেমন করে উঠলো তার। মেঝেতে পড়ে যাবে নাকি অন্তরা? মাথার ভেতর কিছু একটা হচ্ছে। ফোনটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। ছুটে এল শিলা, কোনো খারাপ খবর অন্তরা? হ্যাঁ শিলা, খুব খারাপ খবর, আমার হাজব্যান্ড রেড কার্ডিয়াক হসপিটালে, কথা বলার সময় নেই।

দ্রুত নিচে নেমে গেল অন্তরা। একটা সিএনজি স্কুটার নিল। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো স্কুটারের ছাদে পড়ছে পট্‌পট্ শব্দে। অন্তরার মনে হল বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তার মস্তিষ্কে বিঁধে যাচ্ছে। সে কিছুই ভাবতে পারছে না। সে ড্রাইভারকে বলল, একটু জোরে যান ভাই, প্লিজ একটু জোরে চালান।

স্কুটারের ঘর ঘর শব্দ অন্তরার কানে যাচ্ছে না। রাস্তা একটু ফাঁকা পেলেই জোরে চালাচ্ছে ড্রাইভার। পান্থপথের মাঝখানে এসে বাঁদিকে ঢুকে গেল স্কুটার। গ্রিনরোড পার হলেই সামনে রেড কার্ডিয়াক হাসপাতাল।

আশফাক সাহেবকে ফোন করল অন্তরা, জানাল সে হাসপাতালের নিচে। ভেতরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল আশফাকের সঙ্গে। 'তাড়াতাড়ি আসেন ভাবি' বলে অন্তরাকে নিয়ে লিফটে ঢুকে গেলেন আশফাক।

আইসিইউর দরজার কাছে অন্তরাকে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন আশফাক। মিনিটখানেক পর একজন ডাক্তার সঙ্গে করে এনে বললেন, 'ভাবি, ইনি ডক্টর আসিফ রহমান আর ইনি মিসেস অন্তরা হাসান, প্যাসেন্টের ওয়াইফ।' ডাক্তারকে সালাম দিয়ে দ্রুত অন্তরা বলল, 'প্লিজ, ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি বলুন, আমার হাজব্যান্ড কেমন আছেন, খবর শুনে আমার শরীরটা

খারাপ করছে, আমি দেখতে চাই তাকে।'

ডাক্তার বললেন, 'দেখুন মিসেস হাসান, এখানে প্যাসেন্টের কোনো ভিজিটরকে আমরা অ্যালাও করি না, তবে তার স্ত্রী হিসেবে আপনাকে আমি খুব কম সময়ের জন্য দেখাতে পারি, এরপর প্যাসেন্টের অবস্থা বর্ণনা করা যাবে, আসুন আপনি।' ভেতরে গিয়ে অন্তরা দেখল রোগীদের আলাদা করে চেনার উপায় নেই। প্রথম দেখলে মনে হবে সবাই যেন এক রকম। মাহবুবকে খুব বেশি খুঁজতে হলো না। দু-এক কদম সামনে এগিয়ে গিয়ে আইসিইউর পাঁচ। বুক পর্যন্ত সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। কব্জি দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢুকছে শরীরে। মুখে অক্সিজেন মাস্ক। বেডের নিচ দিয়ে তার সংযোজিত হয়েছে কার্ডিয়াক মেশিনে। মাথার কাছে মনিটর, সেখানে জীবনের ওঠানামার রেখাচিত্র। কখনো তিরাশি কখনো সাতাশি কখনো বা নব্বই। অন্তরার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছিল। ১৬ বছরের কাছের মানুষটাকে এমন অচেনা লাগছে কেন? এমন আচ্ছন্ন অবস্থায় কখনো দেখেনি মাহবুবকে! অক্সিজেন চলছে। এসব দেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল অন্তরা। ডাক্তার বললেন, 'আসুন মিসেস হাসান।'

বাইরে এসে ডাক্তার আসিফ অন্তরাকে বললেন, 'দেখুন, আপনার হাজব্যান্ডের অবস্থা কেমন সেটা আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারব না, উনি আমাদের পর্যবেক্ষণের ভেতর আছেন, বাহাত্তর ঘণ্টা পর আমরা কিছু বলতে পারব।' চোখ মুছে অন্তরা বলল, ' প্লিজ ডক্টর তবুও কিছু একটা বলুন, আসলে উনার কি হয়েছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?' ডাক্তার আসিফ আসলে যেটা বলতে চাচ্ছিলেন না সেটা বলতে হলো, কারণ ইনি প্যাসেন্টের স্ত্রী। ডাক্তার বললেন, 'হয়েছে মানে, এটা মাইও কার্ডিয়াল ইনফার্কশন, আমাদের এখানে যখন এসেছেন তখন আমাদের দায়িত্ব উনাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলা তাই না, ধৈর্য্য ধরুন প্লিজ।' চলে গেলেন আসিফ রহমান।

আশফাক সাহেবের মুখোমুখি বসে থাকল অন্তরা। তখন লোপার হাত ধরে ভেতরে ঢুকল শিলা গোমেজ। লোপা তার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'বাবার কি হয়েছে মা! বাবা কোথায়?' মেয়েকে দেখে আবার কেঁদে ফেলল অন্তরা। সবে ক্লাস এইটে পড়ছে সে। এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে। মেয়েকে সান্ত্বনা দিল অন্তরা, 'বাবা অফিসে কাজ করছিল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার আঙ্কেলরা হাসপাতালে এনেছেন, ভালো হয়ে যাবে, কেঁদনা মা।' শুধু লোপাকে নয় পুরো পরিবারকেই এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে! আশফাক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'ভাবি, কাগজটা রাখুন, আমি পরে আবার এসে খোঁজ নেব।' অন্তরা কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল ১০ হাজার টাকার অ্যাডভান্স মানি রিসিট। রোগী হিসেবে ভর্তির সময় এই টাকাটা জমা দেয়া হয়েছে। 'অনেক ধন্যবাদ আশফাক ভাই, কষ্ট করে ওকে ভর্তি করে দিয়েছেন, ওর জন্য সবাইকে দোয়া করতে বলবেন, আর এই টাকাটা আমি দিয়ে দেব।' অন্তরা উঠে দাঁড়াতেই আশফাক বললেন, 'ভাবি আপনি বসুন, ওসব কথা এখন বলবেন না প্লিজ, মাহবুব সুস্থ হয়ে উঠুক, কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' লোপার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কেঁদনা মামণি, তোমার বাবা ভালো হয়ে যাবেন, আমি আসি।' চলে গেলেন আশফাক আহমেদ।

একদম অপরিচিত একটা পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল অন্তরা হাসান। জীবনে আকস্মিকতা বলে কিছু আছে সেটা জানত অন্তরা। কিন্তু এভাবে এখনই তাকে সেই আকস্মিকতার সঙ্গে বুঝতে হবে তা ভাবেনি সে! আশফাক চলে গেল, একটু পর চলে যাবে শিলা। ওদের নিজেদের সংসার আছে। কে এখন তার পাশে থাকবে? মাহবুব বাহাত্তর ঘণ্টা থাকবে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, এরপর যদি কিছুটা

ভালো হয় তখন হয়ত কেবিনে সরিয়ে নেবে। এসব হাসপাতালের কোনো দয়া-মায়া নেই! ইচ্ছা মতো বিল করে বলে শুনেছে। কত লাখ টাকা লাগবে জানে না অন্তরা। যদি টাকার জন্য কারো কাছে হাত পাততে হয়, তাহলে উহ্ ভাবতে পারছে না অন্তরা! তার নিজের বাবা-মা নাকি শ্বশুর-শাশুড়ি, যারা তাকে আর মাহবুবকে প্রত্যাখ্যান করেছে! অন্তরার ভেতরটা তোলপাড় করছে। হঠাৎ শিলা গোমেজ বলল, 'অন্তরা, মাহবুব ভাই অসুস্থ, তুমি এখন একটা সংকটের মুখোমুখি, একটা কথা দীর্ঘদিন ধরে বলব বলব করে বলা হয়নি।' 'আগে বলা হয়নি তাতে কি, তাহলে এখন বলো শিলা?' 'তুমি এটাকে অন্যভাবে নিও না প্লিজ, শোন অন্তরা, তুমি আর মাহবুব ভাই দুজন দু'ধর্মের, সে জন্য তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ঝগড়া হলে তুমি কষ্ট পাও অনেক বেশি, কারণ তুমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছো, তুমি ধর্মান্তরিত না হয়ে যদি মুসলমানের মেয়ে হতে তাহলেও সংসারে এমন ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতো, ঝগড়ঝাটির বিষয়টির সঙ্গে তোমার ধর্ম ত্যাগের বিষয়টিকে এক করে ফেল না প্লিজ, মাহবুব ভাই একজন ভালো মানুষ, আগামীকাল আবার আসবো, আসি।' শিলা! কী বলে গেল শিলা! তার কথায় হতবাক অন্তরা, তাহলে এসব কথা আগে কেন বলেনি শিলা? শিলার কাছে সে চারপাশের মানুষের কথা তুলে ধরেছে বহুবার! অভিযোগ করেছে অনেক। তাহলে! ওই একটা কথা ভেবে ভেবেই হয়ত কষ্ট পেয়েছে মাহবুব! লোপাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে ডাক্তার আসিফের খোঁজ করল অন্তরা। দূর থেকে নিজের বাবাকে দেখল লোপা, বাবা সাদা বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে মেশিন, কাছে যাওয়া যাবে না। মা-মেয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেদিকে। ডাক্তার এসে বললেন, আজ প্রথম দিন, কিছুক্ষণ আপনারা বাইরে থাকুন এরপর বাসায় চলে যান, এখানে থাকলে রোগীর বা অ্যাটেনডেন্টদের কোনো লাভ নেই, যাওয়ার সময় রিসিপশন থেকে ডেলি এন্ট্রিপাস নিয়ে যাবেন আর নামসহ দুটি সেলফোন নাম্বার দিয়ে যাবেন, যাতে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যায়।

আইসিইউর বাইরের চেয়ারে মেয়েকে নিয়ে বসে থাকল অন্তরা। আজ এখন ফিরে গেলেও কাল আবার আসতে হবে মা আর মেয়েকে। মানুষ তার অতীত নিয়ে যা কিছু লালন করে তার স্মৃতিতে, সেগুলোকেই সত্য মানে। অন্তরা সারাজীবন যা কিছু জেনে এসেছে, যা কিছু বুঝে এসেছে সেখানে কোথাও না কোথাও অসম্পূর্ণতা ছিল বৈকি! শীলা গোমেজ হয়ত সেটাই বলে গেল! ক্রমশ চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে অন্তরার। কিন্তু এখন এই বিপদে অন্য কিছুই ভাববে না সে। মাহবুবের সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টা সবার আগে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে গেল মা আর মেয়ে।

***

সন্ধ্যায় ফোন করেছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, মাহবুবের খোঁজ নিয়েছেন, ডাক্তাররা কি বলেছে সেসব বিস্তারিত খবর নিয়েছেন, বলেছেন একদম দুশ্চিন্তা করবে না। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সবাই খোঁজ নিয়েছে, কেমন আছে মাহবুব? মেয়ের সামনে কাঁদতে পারে না অন্তরা, লোপা তার ঘরে গেলে একাকি কাঁদে। এখন এই মুহূর্তে কেমন আছে মাহবুব! একদিকে মাহবুবের জীবন, অন্যদিকে তার চিকিৎসার খরচ। এসব ভাবলে মনে হচ্ছে সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার কাছে সংসার খরচের টাকা ছাড়া আর কোনো টাকা নেই। একটা ব্যাংকে বছর দুয়েক হলো মাসিক কিস্তিতে টাকা জমিয়েছে। হয়ত ওটা ভাঙাতে হবে। কাগজ বের করে দেখলো মাত্র দেড় লাখ মতো পাবে এখন ভাঙালে। তাহলে বাকি টাকার জন্য কী করবে অন্তরা? নিশ্চয় এই টাকায় মাহবুবের চিকিৎসা হবে না।

পরদিন সকালে উঠেই লোপাকে স্কুলে পৌঁছে

দিয়ে ব্যাংকে গেছে অন্তরা। সমস্ত টাকা তুলে এনেছে। বিকালে টাকা আর লোপাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেছে হাসপাতালে। ডাক্তার আসিফ রহমানের সঙ্গে কথা বলেছে। মাহ-বুবকে দেখার জন্য ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছে।

মেয়েকে নিয়ে আইসিইউর ভেতরে ঢুকেছে অন্তরা। বারবার অন্তরার মনে হচ্ছে আজ নিশ্চয় ভালো দেখবে তার মাহবুবকে! সেই একই রকম শুয়ে আছে মাহবুব, কোনো পরিবর্তন নেই। নিথর দেহ। চোখ দিয়ে দুফোঁটা পানি গড়ালো অন্তরার। কাছে গিয়ে লোপাকে বলল, বাবাকে বলো, বাবা আমি লোপামণি, কথা বলো বাবা? লোপা, বাবা বলে ডাকতেই চোখের পাতা নড়ে উঠল মাহবুবের! লোপা বলল, মা, বাবা তাকাচ্ছে, দেখ দেখ! সত্যিই দুচোখ খুলে তাকাল মাহবুব! অবিশ্বাস্য অবর্ণনীয় ব্যাপার। অন্তরার সমস্ত শরীর মন নেচে উঠল, জ্ঞান ফিরেছে মাহবুবের! ডাক্তার আসিফ জানালেন, ঘণ্টাখানেক আগে প্যাসেন্টের জ্ঞান ফিরেছে। আগের চেয়ে ভালো। জ্ঞান যখন ফিরেছে, তখন সবকিছুকেই ইতিবাচক ভাবতে পারেন, ডাক্তার আসিফ সেটাই বোঝাতে চাইলেন। মাহবুবের দিকে তাকিয়ে অন্তরা বলল, কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করোনা কেমন, লোপা আমি ভালো আছি, সবাই তোমার খোঁজ-খবর রাখছেন। মাহবুব কোনো কথা না বললেও মনে হলো ও সব বুঝতে পেরেছে। বাইরে এসে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে গেল অন্তরা। এরপর আরো দুদিন এসেছে অন্তরা। আইসিইউ থেকে কেবিনে পাঠানো হয়েছে মাহবুবকে। ডাক্তার আসিফ রহমান এসে বললেন, এখন আমরা বলতে পারি উনি শঙ্কামুক্ত, দু-একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারবেন। ডাক্তার আসিফের কথা শুনে অন্তরার ভেতরটা নেচে উঠল!

পরদিন বিকালে অন্তরাকে ডেকে পাঠাল হাসপাতালের বিলিং অফিসার। বলল, আগামীকাল আপনার প্যাসেন্টকে রিলিজড করা হবে। টাকার কথা জানতে চাইল অন্তরা। অফিসার নির্বিকার চিত্তে জানালেন, কাল সকালে রিলিজড হলে আজ রাতের খরচটা যোগ হবে, বিলের টোটাল ব্যালান্স হবে ফাইভ ল্যাকস, মোট ৫ লাখ টাকা। বিলিং সেকশন থেকে ঘুরে এসে অন্তরার মনে হলো সে খুব অসহায়। ৫ লাখ টাকা সে এখন কোথায় পাবে?

দুশ্চিন্তায় যখন মাথা ঠিক নেই, অন্তরা তখন ফোন করল শিলা গোমেজকে। প্রথমে জানতে চাইল, মাহবুব কেমন আছে, এরপর বলল, কোনো দুশ্চিন্তা করো না। অন্তরা যখন বলল, কাল সকালে রিলিজড করে দেবে, তখন শিলা বলল, কত টাকা লাগবে? অন্তরা টাকার অংকের কথা বলার পর শিলা বলল, তোমার কাছে কত আছে? সব মিলিয়ে ধর দেড় লাখ। সেদিন বিকালে শিলার শেষ কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল অন্তরা! স্কুলের চেয়ারম্যান সাহেব দিয়েছেন দেড় লাখ, টিচাররা সবাই মিলে ১ লাখ, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শিক্ষক কল্যাণ ফান্ড থেকে ৫০ হাজার, ছাত্রছাত্রীরা দিয়েছে ৫০ হাজার, মোট সাড়ে ৩ লাখ টাকা। শিলা বলল, কাল সকালেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম টাকা পৌঁছে দেবেন তোমার কাছে। অন্তরা বিস্ময়ে হতবাক! ভীষণ আনন্দিত! মানুষের প্রয়োজনে মানুষ তাহলে এভাবেই পাশে দাঁড়ায়! অন্তরা এখনো জানে না, শিলা গোমেজের চেষ্টাতেই এসব সম্ভব হয়েছে। সকাল ৯টায় হাসপাতাল থেকে মাহবুবকে নিয়ে গাড়িতে উঠল অন্তরা। এক পাশে লোপা অন্য পাশে অন্তরা, মাঝখানে মাহবুব। লোপা বাবার কাঁধে মাথা রেখেছে। চারপাশে রোদ ঝলমল করছে! আজ অন্য একটা পৃথিবী দেখছে অন্তরা! গাড়ির জানালার গ্লাস সরাতেই ঠাণ্ডা বাতাস ওদের শরীর জড়িয়ে ধরল। চারপাশে জীবনের কোলাহল, বহমান জীবনের স্রোত। অন্যরকম কিছু অনুভব করল অন্তরা। এমন মানবজনম আর কি হবে...। মাহবুবের একটা হাত চেপে ধরল অন্তরা। মাহবুবও শক্ত করে ধরল অন্তরার হাত।

অনুবাদ গল্প

গজল গায়ক

মূল : জয়শ্রী চ্যাটার্জী

অনুবাদ : মোবারক হোসেন খান

খবরের কাগজে বেরোল : হিন্দুস্তানি গজল গায়কের কুয়েত সফর। খবরের কাগজের সংবাদটা পড়ে খুশিতে আমার মনটা আনচান করে উঠল। লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আকবর আলী সুলতান এ সপ্তাহের শেষের দিকে কুয়েত সফরে আসছেন। আমার স্বামী এবং আমি দুজনেই আকবর আলী সুলতানের গজল গানের খুব ভক্ত। তাছাড়া কুয়েতে আসার আগে ঘরোয়া জলসায় শিল্পীর সঙ্গে মুম্বাইতে আমার দু-একবার দেখাও হয়েছে। কুয়েতের কোন হলে অনুষ্ঠান হচ্ছে টুকে নিলাম। এখন উদ্বোধনী সন্ধ্যায় টিকিট পেলেই হয়।

আকবর আলী সুলতান তার প্রথম রাতের জলসাতেই কুয়েতের শ্রোতাদের মন জয় করে ফেললেন। শুধু তাই নয় পর পর পাঁচ রাত জলসা হলো। প্রত্যেক রাতেই শ্রোতারা তার গজল শুনে মুগ্ধ হলো। তার গলার স্বর অপূর্ব আর সুরেলা। প্রতিটি গজল মন কেড়ে নেয়। জলসা শেষ হতেই হঠাৎ কি মনে করে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রিনরুমে গেলাম।

শিল্পী তার অন্য ভক্তদের মতো আমাদেরও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানালেন। মুম্বাইয়ে

আমার যে বান্ধবীর বাড়িতে ঘরোয়া জলসায় তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সে কথা বললাম। কিন্তু আমার বান্ধবীকে চিনতে পারলেও তিনি যে আমাকে চিনতে পারেননি বুঝতে পারলাম। তবে চিনতে পারার ভান যে করেছেন তা আমার চোখ এড়াল না। আমি আমার স্বামীকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি আমার স্বামীকে সহাস্য মুখে অভিবাদন জানিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি আমার স্বামী কী করেন জানতে চাইলেন। আমার স্বামীর চাকরির কথা শুনে শিল্পীর চেহারা হঠাৎ যেন বদলে গেল। একটা অকপট আগ্রহ অস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল চোখে-মুখে।
আপনার কার্ড আছে নাকি? দিন না একটা। আপনার সঙ্গে পরে দেখা করব।'
ইতোমধ্যে গ্রিনরুমে শিল্পীর ভক্তদের ভিড় জমে গিয়েছিল। বাইরে আরো অনেক মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। আলী সুলতান সাহেবও পেলেন। তিনি সযত্নে আমার স্বামীর কার্ডখানা পকেটে রেখে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বিদায় করলেন।
আমরা ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে বসে আমার স্বামীকে বললাম, 'তোমার কার্ড নিল কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'
'হয়তো অতি উৎসাহী ভক্তের প্রতি ভদ্রতা দেখানোর জন্য।' আমার দিকে কটাক্ষ চোখে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'কোনো শিল্পীকে উপরে উঠতে হলে অনেক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়, জানো না? তাছাড়া তোমার মতো অমন সুন্দরী একজন ভক্ত পেলে তো কথাই নেই।'
আমি মুখ ভেংচে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, অমন চমৎকার কণ্ঠের কোনো শিল্পী আমার প্রতি ভদ্র আচরণ করলে তো চোখ টাটাবারই কথা। তবে তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, তার কণ্ঠের তুলনা হয় না, আর গেয়েছেনও অতি চমৎকার।'
'তা তুমি ঠিকই বলছ', আমার স্বামী এবার বেশ সিরিয়াসলিই বলল, 'তার মতো কণ্ঠের অধিকারী দ্বিতীয় কোনো গজল গায়ক আছে বলে আমার মনে পড়ে না।'
সত্যিই তাই। তার গলার স্বর খুব মিষ্টি। আর গলার কাজও খুব দানাদার। সত্যি তার জুড়ি নেই। যে ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়েছেন তিনি তাকে প্রাণভরে শিখিয়েছেন। আমার অন্তত তাই মনে হলো।
বাসায় ফিরে রাতের বেলা আমরা খাচ্ছিলাম। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার তোলার আগে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে ১২টা। এত রাতে কে আবার টেলিফোন করল।
'আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করছি বলে সত্যি খুব দুঃখিত।' আকবর আলী সুলতান ওপ্রান্ত থেকে বললেন, 'আমি ভাবলাম, আপনারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে যাননি। হয়তো এই মাত্র বাড়ি ফিরেছেন... এদিকে আমার হাতেও সময় খুব কম। আর দু-একদিনের মধ্যেই আমি চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?'
আকবর আলী সুলতানের কণ্ঠে গজলের সুরেলা বিনয় যেন ঝরে পড়ছিল।
'নিশ্চয়, নিশ্চয়', আমি বললাম।
আমার স্বামী কথা বলতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে তার চেহারা কেমন যেন বদলে গেল। তাকে কেমন যেন হতবুদ্ধি মনে হতে লাগল। তাকে একটা নাম কয়েকবার উচ্চারণ করতে শুনলাম। অথচ ওই নামটা আমি আর তার মুখে কোনোদিন শুনিনি। আমার স্বামী রিসিভারে বলছিল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় তাকে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। হ্যাঁ, কাল সকাল ১০টায়। আচ্ছা, তাহলে রাখি। আদাব।'
আমার স্বামী রিসিভার নামিয়ে রাখল।
'কী ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।' আমার স্বামী আস্তে আস্তে বলল, 'আকবর আলী সাহেব বললেন, আমাদের কোম্পানিতে নাকি নূর মোহাম্মদ নামে একজন কাঠের মিস্ত্রি কাজ করে। তিনি নূর মোহাম্মদের প্রতি আমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করলেন। তার প্রতি একটু সুনজর দিলে নাকি তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন,' তাকে আমি নূর মোহাম্মদকে আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম।'
'ও নামে সত্যিই কোনো লোক তোমাদের কোম্পানিতে আছে নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'জানি না', আমার স্বামী বলল, 'একটা কোম্পানিতে কত ধরনের লোক কাজ করে, সবাইকে চিনে রাখা যায় না, আর সবার নামও মনে থাকার কথা নয়। তবে আমাদের প্রশাসনিক বিভাগ নিশ্চয় তাকে চিনবে।'
আমরা আরো একঘণ্টা ধরে লোকটা কে হতে পারে বের করতে চেষ্টা করলাম। লোকটা কি আকবর আলী সুলতানের দেশের কোনো পুরনো বন্ধু নাকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? আমার স্বামী ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ ধরে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।
পরের দিন বেলা ১১টায় আমার স্বামীকে টেলিফোন করে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলল, 'না, এখনো কেউ দেখা করতে আসেনি।' তার কথা শুনে আমি খুব আশাহত হলাম। তাকে বললাম, 'তুমি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছ, এই নামে কোনো লোক তোমার কোম্পানিতে কাজ করে কিনা?'
'হ্যাঁ, আমি খোঁজ নিয়েছি', সে বলল, 'ওই নামে... দাঁড়াও, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পরে আবার টেলিফোন করব।' আমার স্বামী টেলিফোন রেখে দিল।
প্রায় ৪৫ মিনিট পর সে আবার আমাকে টেলিফোন করে বলল, 'আমি আকবর আলী সুলতান সাহেবকে দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য নিয়ে আসছি। তুমি নিশ্চয় তার জন্য সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের আয়োজন করতে পারবে। আর হ্যাঁ, নূর মোহাম্মদ আমার সঙ্গে ১০টার সময় দেখা করতে আসেনি। কারণ সে নাকি আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে ভীষণ বিব্রতবোধ করছিল। আকবর আলী সাহেব তাকে ১১টার সময় টেলিফোন করে আমার সঙ্গে দেখা করেছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। যখন জানতে পারলেন সে দেখা করেনি, তখন তিনি নিজেই বৃদ্ধ নূর মোহাম্মদকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তুমি আন্দাজ করতে পারো, নূর মোহাম্মদ কে?'
'তার বাবা!' আমি কৌতূহলী কণ্ঠে বললাম।
আমার স্বামী ওপ্রান্ত থেকে বলল, 'আরে না না, তিনি হলেন তার ওস্তাদ, তার শিক্ষাগুরু।'
নূর মোহাম্মদ (আকবর আলী সুলতান আমাদের পরে বলেছিলেন) লক্ষ্ণৌর একটা ছোট গ্রামে বাস করতেন। তার বাবা ছিলেন একজন মিস্ত্রি। নূর মোহাম্মদ বড় ছেলে। শৈশবকাল থেকেই তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ভালোবাসতেন। শৈশবকালের অবসর সময়গুলো তিনি ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের বাইরে দাঁড়িয়ে কিংবা কোনো উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জলসার শেষ সারিতে বসে গভীর আগ্রহে ওস্তাদদের গান শুনে কাটাতেন। তার স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। একদিন বাড়ি ফিরে সেদিন যেসব গান জলসাতে শুনে এসেছিলেন গুণগুণ করে গাইতে লাগলেন। আর ওইদিনই তার জীবনে এক নতুন মোড় নিল। তার চাচা ছিলেন সঙ্গীতপাগল লোক। তিনি নূর মোহাম্মদের গান শুনে অবাক হলেন। কালবিলম্ব না করে সেদিনই তিনি তাকে এক সঙ্গীতজ্ঞের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করার জন্য ভর্তি করে দিলেন।
নূর মোহাম্মদ খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো কঠিন তালিমও তুলে নিতে পারতেন। আর রেয়াজ করতেন অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে। ওস্তাদজি তার তালিমের খুব প্রশংসা করতেন। তার মতো এমন প্রতিভাবান সাগরেদ নাকি তিনি খুব কমই পেয়েছেন। শুরু থেকে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে স্বর প্রয়োগে পারদর্শী হয়ে উঠলেন নূর মোহাম্মদ। কোমল স্বর বা তীব্র স্বর প্রয়োগে কখনো চুল পরিমাণ বিচ্যুতি ঘটত না। ওস্তাদজি নূর মোহাম্মদকে সঙ্গীত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। যথাসময়েও নূর মোহাম্মদ সঙ্গীত গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করলেন। পরে গুরু তাকে দক্ষিণ ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন।
নূর মোহাম্মদকে চাকরি পেতে দেখে তার বাপ-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কারণ নূর মোহাম্মদের সঙ্গীত সাধনায় তাদের সম্মতি ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, গান-বাজনা করে আর যাই হোক পেটের ভরণ-পোষণ চলে না। কিন্তু তাদের সে আশঙ্কাকে ব্যর্থ করে দিয়ে নূর মোহাম্মদ চাকরি পেলেন। নিয়মিত রোজগারের একটা পথ হলো। দুর্ভাগ্যক্রমে, অধ্যাপনার কাজটি নূর মোহাম্মদের জীবনে বয়ে আনলো হতাশা। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, পূজা করতেন রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। তাই চাইতেন তার ছাত্ররা রাগের প্রতিটি স্বর প্রক্ষেপণে বিশুদ্ধতা বজায় রাখবে। কিংবা গান গাইবার সামনে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লয় থেকে বিচ্যুত হবে না।
একমাত্র 'ভূপালী' রাগ শেখাতেই তার তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদের শেখানোর ব্যাপারে তেমন খোঁজ-

খবর নিতেন না। কিন্তু কিছুদিন পর নূর মোহাম্মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলেন যে, তিনি কিছুতেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস অনুযায়ী ১২টি রাগ শেখাতে পারবেন না। তাই তিনি একদিন তাকে বললেন, 'না, না, বছরে কেবল চারটি রাগ শেখালে চলবে না।'
'কী বললেন,' নূর মোহাম্মদ জবাবে বললেন, 'ভূপালী রাগ শিখতেই যদি তাদের তিন মাস লাগে, যেসব রাগে কোমল আর তীব্র (কড়ি) স্বর ব্যবহার হয়, সেসব রাগ শিখতে তাদের কয়মাস লাগতে পারে আপনি নিজেই আন্দাজ করতে পারেন। আমি যে রাগটা শেখাতে শুরু করেছি সেটা নির্ভুলভাবে গাইতে না পারলে আমি অন্য কোনো রাগ শেখাতে শুরু করব না।'
সঙ্গীত শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে, সিলেবাস শেষ করার বিষয় নিয়ে, এক ক্লাসে এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে তালিম দেয়ার জটিলতা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং নতুন আদর্শবান সঙ্গী শিক্ষক নূর মোহাম্মদের জন্য একটা পথই খোলা রইল। আর সেই পথই তিনি অনুসরণ করেন। নূর মোহাম্মদ চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন।
আরো দুটো সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এরপর আর কোনো কলেজেই নূর মোহাম্মদের চাকরি হলো না। সব কলেজের দুয়ার তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল।
নূর মোহাম্মদ লক্ষ্ণৌতে ফিরে এলেন। ওস্তাদের কাছে নূর মোহাম্মদ গজল গানে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্ণৌতে ফিরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিষ্যদের গজল শেখাতে শুরু করলেন। বেশ কিছু শিষ্য পেলেন। ঠিক এ সময়ে আকরব আলী সুলতান তার কাছে গজল শিখতে এলেন। নূর মোহাম্মদ ওস্তাদের কাছে দীর্ঘদিন সাধনা দ্বারা রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধভাবে পরিবেশনের যে কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন তার শিষ্যদেরও সেই পদ্ধতিই তালিম দিতে শুরু করলেন। ফলে আবার তাকে সংঘাতের মুখোমুখি হতে হলো। কারণ তরুণ শিষ্যদের ধারণা ওস্তাদজি সরগরম তালিম দিতে অহেতুক কালক্ষেপণ করেন। আসলে, সময়ের যে পরিবর্তন এসেছে নূর মোহাম্মদ সে বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হলেন। পুরনো দিনের শিক্ষাপদ্ধতি আর মূল্যবোধ অচল হয়ে গেল, সেই সত্যই উপলব্ধি করতে পারলেন না।
অবশ্য যে দুই চারজন শিষ্যসঙ্গীতের বিশুদ্ধ রীতি বজায় রেখে তালিম নিতে তার কাছে রয়ে গেলেন তাদের মধ্যে আকবর আলী সুলতানও ছিলেন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শেষ প্রয়াস হিসেবে নূর মোহাম্মদ চলচ্চিত্র জগতে যোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু তার মতো সঙ্গীতজ্ঞ, সুর আর ঢঙের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি যে নাকি সহ্য করতে পারতেন না, তার স্থান কোথাও হলো না। সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল। নূর মোহাম্মদের রোজগার কমে গেল। তার বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয় উঠলেন।
অবশেষে নূর মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন, সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বাঁচতে পারবেন না। ইতোমধ্যে তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করছিলেন। তার মনের জোর কমে গিয়েছিল। সঙ্গীত পেশা ছেড়ে দিয়ে পিতার পেশা কাঠমিস্ত্রির কাজ শুরু করলেন। কাঠের কাজে যৎকিঞ্চিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আশাহত নূর মোহাম্মদ একদিন দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেলেন।
'আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি তাকে সাহায্য করার অনেক চেষ্টা করেছি।' আকবর আলী সুলতান বললেন, 'আমি তাকে সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আমি তার জন্য জলসার আয়োজন করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।'
আকবর আলী সুলতান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি ভাবলাম অন্তত কাঠমিস্ত্রি হিসেবে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সে চেষ্টা করব। তাছাড়া এখানে গানের ব্যাপারে তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি কি না সে চেষ্টাও একবার করব।'
'তার মানে আপনি তার জন্য এখানে জলসার আয়োজন করতে চান?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'না', আকবর আলী সুলতান বললেন, 'তবে তা করতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু কে এই জলসার আয়োজন করবে? তবে এখানকার কয়েকজন ইন্ডিয়ান সঙ্গীতরসিক ব্যক্তি তাদের বাড়িতে গজল পরিবেশন করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে কারো বাড়িতে ওস্তাদজিকে নিয়ে আমি গাইতে পারি কি না দেখি!'
সেদিন বিকালে আকবর আলী সুলতান টেলিফোন করে জানালেন, একজন ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যান তার বাড়িতে এক জলসার আসরে তাকে আমন্ত্রণ করেছে। আগামীকাল রাতে জলসা। তার ওস্তাদ নূর মোহাম্মদও সে জলসায় কয়েকটা গজল পেশ করবেন। নূর মোহাম্মদেরও তাই ইচ্ছা। সেই জলসায় কয়েকজন সাংবাদিককেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাতে নূর মোহাম্মদের একটা পাবলিসিটিও হয়ে যাবে। আকবর আলী সুলতানকে তার ওস্তাদজির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশাবাদী বলে মনে হলো।
আমরা যথাসময়ে জলসাতে হাজির হলাম। আমন্ত্রিত মেহমানরা তখনও আসছে। গজল গায়করা এসে গেছেন। গাঢ় নীল রঙের গালিচার এক পাশে তারা বসে আছেন। সঙ্গতকারীরাও তাদের পাশে উপবিষ্ট। হয়তো উপবিষ্ট দুজন গায়কের তুলনা করা ঠিক হচ্ছে, তবে না করেও পারছি না। দুজনের মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনি বেশ লম্বা ও হালকা-পাতলা। তাকে বেশ সংযত মনে হচ্ছিল। তার বসার ভঙ্গিতে সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ছিল। পাথরের মূর্তির মতো পিঠ সোজা করে বসে আছেন তিনি। বয়সে কনিষ্ঠ শিল্পীকে বেশ সুশ্রী আর রোমান্টিক দেখাচ্ছিল। পা ভাঁজ করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসেছিলেন, তার সামনে একটা হারমোনিয়াম। তার হাত দুটো হারমোনিয়ামের ওপর। তার পরনে সূক্ষ্ম নকশি করা পাঞ্জাবি আর পাজামা। তার মুখটা ভরাট আর চেহারাতে তারুণ্যের সুস্পষ্ট ছাপ। মাথার চুল সযত্নে পেছনের দিকে ভাঁজ করা। তার বড় বড় চোখ দুটো যেন তার চেহারার রোমান্টিকতাকে আরো সজীব করে তুলছে।
জলসা শুরু হলো। প্রথমেই মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হলো। দেয়ালে ছোট ছোট আয়না বসানো ছিল। মোমবাতির আলো পড়ে হাজারো আলোতে যেন ঝিকিমিকি করে উঠল সারাটা জলসা ঘর। সেই আলোতে আকবর আলী সুলতানকে আরো উজ্জ্বল আর রোমান্টিক দেখাচ্ছিল। অন্যদিকে তার ওস্তাদজির মুখের কোঁকড়ানো বলিরেখা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।
গান শুরু হলো। আকবর আলী সুলতান হৃদয়ের সব আর্তি দিয়ে যেন গান পরিবেশন করলেন। অত সুন্দর করে গান গাইতে তাকে আর কোনোদিন শুনিনি। তার কণ্ঠের মাধুর্য যেন মোমবাতির গলা মোমের মতো ঝরে পড়ছিল। গজলের কারুকার্য তার কণ্ঠে সুললিত সুরে যেন অপরূপ রূপে মূর্ত হয়ে উঠল। গান গাইবার ঢং আর কণ্ঠের কোমলতা যেন শিল্পী আকবর আলী সুলতানকে এক মহান জগৎ থেকে আসা দূত বলে মনে হলো। আকবর আলী সুলতান দুটো গজল পরিবেশন করে হারমোনিয়ামটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর নূর মোহাম্মদকে তার একজন সাথী গায়ক ও বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
জলসা ঘরে তখনও আকবর আলী সুলতানের গজলের রেশ দোলা দিচ্ছিল। নূর মোহাম্মদ গান ধরল, আর মুহূর্তের মধ্যে যেন এতক্ষণের সব সুরের রেশ উধাও হয়ে গেল। শ্রোতাদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা দেখা দিল। মনের ভেতর যেন তারা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। জলসা ঘরে অবশ্য সবাই নীরবে গান শুনছিল। গায়কের গলাও বেশ সুন্দর। পরিবেশনের ঢং চমৎকার। সুর প্রয়োগ আর স্বরের ওঠানামাতে কোনো ছন্দপতন নেই। সঙ্গীতের সব কারুকার্যই তার কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছিল। আসলে তার গানের ভেতর দিয়ে গায়কের গায়কীর আপন সত্তা যেন প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আমি বুঝতে পারলাম, নূর মোহাম্মদের গান বোঝার মতো কান বা মন শ্রোতাদের নেই।
নূর মোহাম্মদ দুটো গজল পেশ করলেন। সবাই করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু সেই করতালিতে যেন আন্তরিকতার অভাব ছিল। নূর মোহাম্মদের গান শেষ হতেই আকবর আলী সুলতান আবার গান ধরলেন। জলসা ঘর আবার তার কণ্ঠের মাধুর্যে মোহনীয় হয়ে উঠল। শ্রোতাদের মন আনন্দের হিল্লোলে ভরে উঠল।
দুদিন পরে সে রাতের জলসার কথা খবরের কাগজে বের হলো। আমি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম। আলোচনাজুড়ে রয়েছে আকবর আলী সুলতানের প্রশংসা। তার গায়কী আর কণ্ঠস্বরের তারিফ। কিন্তু কোথাও নূর মোহাম্মদের নাম চোখে পড়ল না। আলোচনার শেষ প্যারাতে এসে পৌঁছলাম। শেষ প্যারাটি এক লাইনেই শেষ। তাতে লেখা রয়েছে নূর মোহাম্মদ নামে আকবর আলী সুলতানের বন্ধুও অনুষ্ঠানে কয়েকটি গজল পেশ করেন।

গল্প

মাকিদ, সুব্রত ও ইন্দ্রাণীর গল্প

সরকার মাসুদ

দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই সুব্রতর। বিছানায় যায় অবশ্য ঘণ্টাখানেকের জন্য। চোখ বন্ধ করে না। যদি ঘুম এসে যায় তাহলে বিকালের পড়াটাই মাটি! সিলিঙের মোটা মোটা কাঠের বিমগুলোর দিকে, চলন্ত ফ্যানের দিকে, ভেন্টিলেটরের দিকে, এমনকি শিকারের দিকে ধীর পায়ে এগোতে থাকা টিকটিকির দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে এবং আট/দশবার এদিক-ওদিক গড়াগড়ি দিয়ে অবশেষে উঠে পড়ে। তারপর সোজা পড়ার টেবিলে।

লাঞ্চ খেতে খেতে সুব্রত ভাবছিল, আজ আড্ডায় যাবে না। দাদুকে নিয়ে প্রায়ই সে পদ্মার ধারে হাঁটতে যায়। দাদুর শরীরটা আজ কদিন বিশেষ ভালো না। তিনি আজ হাঁটতে বেরোবেন না। তাহলে ছেলেটা বিকালে কী করবে? ওদের গেটের বাইরে কলতলার ধারের পাশ দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ অনেক নিচে নেমে গেছে। ওখানে পাথর-মোড়ানো ঘাটের পাশে এক চিলতে সুন্দর জায়গা

আছে; বসা যায়। জায়গাটা থেকে নদীর ভিউ পুরাটাই চমৎকার আসে। সুব্রত ভেবে রেখেছে, বিকালের পড়া শেষ করে সাড়ে ৬টার দিকে ওই জায়গায় গিয়ে বসবে। তার আগে পাঁচ টাকার বাদাম কিনে নেবে।

এখন বসন্তের মাঝামাঝি। পদ্মা সরু হয়ে সুব্রতদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে। পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। সামনের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা সি-বিচের মতো হয়েছে। দেখতে দারুণ লাগে। মাঝে মধ্যে পাল তোলা নৌকা চলে যায়। ওপারে চরের পায়ে হাঁটা পথ ধরে লাইন হয়ে মানুষ আসে। আবার দূরে চলে গেলে মানুষের অবয়ব ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হয়। সুব্রত এ দৃশ্য অনেকটা সময় ধরে দ্যাখে। একটা দেশি নৌকা চর আর শহরের মধ্যে পারাপার করে। হঠাৎ একটা শুশুক ডিগবাজি খায় একেবারে চোখের সামনে।

বিকালের ঝিরিঝিরে, মুলমুলে, মন ভালো করে দেয়া বাতাসে বসে পৃথিবীর এসব কর্মযজ্ঞ দ্যাখে সে। শুধু কি দ্যাখে, কিছু কি ভাবে না ছেলেটা? ও! বলতে ভুলে গেছি, সুব্রত কেবল রাজ্যের বইপুস্তকে ডুবে থাকে না, কবিতাও লেখে!

এখন সোয়া ৬টা। সুব্রত নদীর পাড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় মাকিদ এসে হাজির। সে সুব্রতের বিছানায় পা তুলে বসেছে। এল শেপের এই প্রায় পোড়ো বাড়িটার ঘরগুলো ছোট ছোট। পুব দিকের কোণার ঘরে থাকে সুব্রতর দাদু। পশ্চিমের ঘর দুটোর একটাতে থাকে সুব্রতর ছোটভাই শ্যামল আর জ্যাঠামশাই।

মাঝখানেরটাতে ইতি পিসি। দাদু যে রুমে থাকে সেখানেই সুব্রতর চৌকি। দুটো চৌকি ছাড়া ঘরে আছে একটা ছোট আলনা, একটা টি-টেবিল, সুব্রতর পড়ালেখার টেবিল আর একটা হাতলওয়ালা চেয়ার। গাদাগাদি করে রাখা বইয়ের পাশে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে একটা টেবিল ফ্যান। সুব্রতর টেবিলে এত বই! একটা সাইডের রীতিমতো বইয়ের পাহাড়।

ইকোনমিক্সের বইপুস্তকের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', আবিদ আজাদের কাব্যগ্রন্থ 'ঘাসের ঘটনা', পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত 'মডার্ন পোয়েটস ফাইভ' সিরিজের একটি বই। দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্করের উপন্যাস 'কবি'। 'ইকোনমিক্স টুডে' নামের একটা মোটা বইয়ের পাশে শোভা পাচ্ছে অশ্রুকুমার সিকদারের 'আধুনিক কবিতার দিকবলয়' গ্রন্থটি। শেষোক্ত বইটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে মাকিদ মনে মনে হাসে। ভাবে, সুব্রত কেবল কবিতা লেখে না, আধুনিক কবিতার নানা ভাব-ভঙ্গিও বুঝতে চায় ভালো করে। ও কবি না হয়ে যায় না!

সুব্রতর বিছানার শিথানের ডান দিকে কাঠের সেলফে এক সারি বয়াম আছে। বয়ামে কী? বয়ামে রাখা আছে আচার– ইতি পিসির সাধনার ধন! তেঁতুলের আচার, আমের আচার, চালতার আচার, আমলকির আচার, বরইয়ের আচার, রসুনের আচার...। প্রত্যেকটাই সুস্বাদু। আচারের দশটি বয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাকিদের মনে পড়ে পিসির কথা। মহিলার পুরো নাম ইন্দ্রাণী দাস। তো ২০-২২ বছর বয়সে ইন্দ্রাণী দাসের চেহারা-সুরত খারাপ ছিল না। অবশ্য এখন যে খারাপ তা বলা যাবে না। তার ৩১+ জীবনে স্বাস্থ্যটাও মোটামুটি অটুট আছে। কিন্তু একুশ বছরের রূপ-লাবণ্য তো আর একত্রিশে এসে একই রকম থাকার কথা নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তা অনেকটা ক্ষয়ে এসেছে। নয়টি সম্বন্ধ এসেছিল গত ছয়-সাত বছরে। তারপরেও বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না ইন্দ্রাণীর। কী এক রহস্যময় কারণে তার বিয়ের কথাবার্তা বেশিদূর এগোয় না। শেষেরটা অবশ্য অনেকদূর এগিয়েছিল কিন্তু পাত্রের মামা তীরের কাছে এসে তরী ডুবিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর ইন্দ্রাণী রাগে-দুঃখে অপমানে ঘরের বাইরে বেরোয়নি বেশ কদিন। তার গানের গলা মোটামুটি ভালো। ১২-১৩ বছর বয়স থেকে প্র্যাকটিসও করে আসছে। কিন্তু যারা সঙ্গীতের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে তাদের সঙ্গে শুধু সাধা গলার শিল্পীরা পেরে উঠবে কেন? সুতরাং ৭-৮ বার অডিশন দিয়েও তার রেডিওতে গান করার সাধ মিটল না। পাত্র পক্ষের লোকজনের ওপর তার যেমন রাগ, রেডিওর কর্মকর্তাদের ওপরেও রাগ তার চেয়ে কম নয়। রেডিওতে চান্স পাওয়ার ব্যাপারটাকে তো ইন্দ্রাণী টেলিভিশনে ঢোকার সিঁড়ি হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল! শেষবার রেডিও স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে সুব্রত তাই ইন্দ্রাণীকে বলেছিল, পিসি তোমার আর অডিশন দিতে আসা উচিত হবে না। আর যায় কোথায়, তার শাসন উদ্যত ডান হাত তেড়ে গিয়েছিল সুব্রতর দিকে, বেশি পাকামো, না! আমি খারাপ গাই?

সুব্রত বলেছিল খারাপ গাও কে বলেছে? কিন্তু অতটা ভালো গাও না যে, তোমাকে ওদের নিতেই হবে। তাছাড়া, একটা কথা বলি মাইন্ড করো না, তোমার উচ্চারণের ত্রুটিগুলোও পুরোপুরি যায়নি। রিকশায় সুব্রতর পাশে বসা ইন্দ্রাণী দাস এরপর আর একটা কথাও বলেনি ভাইপোর সঙ্গে।

সুব্রতর ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার-পাঁচজন। মাকিদই ঘনিষ্ঠতম। এর অন্যতম প্রধান কারণ ওরা ক্লাসমেট। সহপাঠী বলেই মাকিদ কোনো কোনো দিন দুপুরের দিকে সুব্রতর বাসায় যায়, বিশেষ করে যখন ভার্সিটি বন্ধ থাকে। তেমনি এক দুপুরের কথা। খোলা গেট দিয়ে ঢুকেই মাকিদ সুব্রতর নাম ধরে দুবার ডাক দেয়। কোনো সাড়া নেই। তার হঠাৎ চোখে পড়ে, ইতি পিসি উঠোনের ওই পাড়ে পেয়ারাগাছের ছায়ায় বসে তরকারি কাটছে। তার বুকের ওপর থেকে আঁচল সরে গেছে। কাপড় এলোমেলো হয়ে প্রায় লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। তার কপালে বড় একটা সাদা টিপ। নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। প্রথম দৃষ্টিতে অদূর, থেকেই তাকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো মাকিদের। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সুব্রত নেই পিসি?

বাবার সঙ্গে বাইরে গেছে। অনেকক্ষণ হয় গেছে, এসে পড়বে। তুমি বসো বাবু!

মাকিদ বলে, আমি তাহলে পরে আসি।

ইন্দ্রাণী অবাক হয়, সেকি! বাবু (সুব্রত) বাসায় নেই এ জন্য বসা যাবে না?

নাআ, টিক তা না।

ইন্দ্রাণী বলে, তাহলে আর কী! ওর ঘরে গিয়ে বসো। মুড়ি-চানাচুর বানিয়ে দিচ্ছি। চিবাতে থাকো। দেখবে ওরা এসে গেছে।

ইন্দ্রাণী রহস্যময় মুচকি হাসে। মাকিদকে মুড়ি বানিয়ে দিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের ভেতর আবার ঘরে ঢোকে মহিলা। এবার তার এক হাতে আচারের বয়াম অন্য হাতে পিরিচ। চামচ দিয়ে আচারের তেল তুলে আনতে আনতে ইন্দ্রাণী বলে, একটু মেখে নাও। টেস্ট লাগবে।

আচারের তেল মাখানো মুড়ি-চানাচুর খেতে মজাই লাগছে মাকিদের। সে অনেকক্ষণ পর লক্ষ্য করে বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই। সেবাব্রত কলেজে গেছে। জ্যাঠামশাই অফিসে। সোমা (জ্যাঠার মেয়ে) তার মাকে নিয়ে গেছে পদ্মায় স্নান করতে। বাড়ি একদম নিঝুম। ঘরের ভেতর মাকিদ আর ইন্দ্রাণী। মাকিদের লজ্জা লজ্জা করতে থাকে। ততক্ষণে পিসি মাকিদের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

পিরিচটাতে দু-তিন পিস আমের আচার তুলে এগিয়ে দিতেই মাকিদ বলে, না না পিসি আমি আচার খাবো না!

ইন্দ্রাণী অবাক হয়, বলো কী বাবু! আমার হাতের আচার তো তুমি খাওনি আগে। একদিন খেয়ে দেখ। তারপর রোজ খেতে আসবে। ছেলেবেলায় একবার নিম্নমানের আচার খেয়ে একটু মজা পায়নি মাকিদ। তখন থেকে এ খাদ্যটির প্রতি তার বিতৃষ্ণা। মাকিদ যখন বার বার 'না না' করছিল, ইন্দ্রাণী তখন করলো কী? ছেলেটার কাঁধে-পিঠে হাত রেখে বললো, আরেএ ছেলে খাও না।

একবার মুখের ভেতর নিয়ে নাও জিনিসটা, দেখবে কি মুখরোচক লাগে। একজন কিছুতেই খেতে চাইছে না, আরেকজন তাকে খাওয়াবেই। হুড়োহুড়ি এক পর্যায়ে মহিলার সমৃদ্ধ স্তনের ওপর থেকে কাপড় ছলকে পড়ে যায় আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাকিদ তার ডান কাঁধে অনুভব করে ইতি পিসির স্ফীত স্তনের উদ্দেশ্যমূলক চাপ। এক লহমায় মাকিদের সারা দেহে মনে খেলে যায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির বিদ্যুৎ। তার মনে পড়ে, সুযোগ পেলেই ইন্দ্রাণী নানা ছুতোয় মাকিদের কাছে এসে বসে। গাল টেনে একটু আদর করে দেয়! কখনো বা কথা বলতে বলতে অন্য মনস্কতার ভান করে তার উরুতে হাত রাখে। রেখেছে কয়েকবার। মাকিদের ঝাঁকড়া মাথা দুষ্টুমিভরা আঙুল দিয়ে এলোমেলো করে দিতে দিতে 'তুমি খুব ভালো বাবু' বলে তার কপালে-গালে চুম্বন এঁকে দিয়েছে মহিলা। একবার নয়, বেশ কয়েকবার এবং প্রতিবারই তাকে বলেছে, তুমি আমার ওপর রাগ করো নাই তো?

মাকিদ অবাক হয়ে বলেছে, রাগ? নাহ্! কিন্তু পিসি, তোমার এমন ধারণা হলো কেন বলো তো? তুমি আমাদের বাসায় আসা কমিয়ে দিয়েছ তো সে জন্য।

আজ আবার ওই আচারের বয়ামগুলোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অনূঢ়া মহিলাটির মনোভাব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করে মাকিদ। যে

বয়সে মেয়েরা ২-৩ সন্তানের মা, সেই বয়সে ইতি পিসি একা। মাকিদের মাথার ভেতর এ মুহূর্তে ইন্দ্রাণী দাসের পুষ্ট বাহু-কোমর-স্তনের ছোঁয়া লাগিয়ে তার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকার নিঝুম দৃশ্য! এসব মুহূর্তে শারীরিক উত্তেজনার অনুভূতিগুলো মন্দ লাগেনি মাকিদের। কিন্তু অন্য সময় ইন্দ্রাণীর জন্য সত্যিই তার খারাপ লাগে, বিশেষত তার দীর্ঘ বিকেল দীর্ঘ রাত্রির নিরুপায় নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে। কোনো কোনো দুপুরে বা মধ্যরাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগের মুহূর্তগুলোতে মাকিদ ইন্দ্রাণীর কথা খুব ভেবেছে। ভাইপো আর পিসির সম্পর্ক যতটা নির্দোষ হওয়া উচিত, যতখানিক দূরত্ব থাকা শোভন দুজনের মধ্যে, ইতি পিসি আর আমার সম্পর্কটা কি টিক সে রকম? না বোধহয়! পিসি আদর-স্নেহের নামে একটু বাড়াবাড়ি করছে না কি? আমি তো আর আপন ভাইপো নই; তার ভাইপোর বন্ধু। মহিলা সুব্রতর পিসি। সে হিসেবে আমারও পিসি। তার নিরানন্দ যৌবন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। অবিলম্বে তার বিয়ে হওয়া দরকার। তার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর আচরণ, বিশেষ করে সুব্রত যখন ঘরে থাকে না, প্রথম দিকে মাকিদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সে দু'একবার এমনো ভেবেছে, মহিলা মানসিক রোগী নয়তো! কিন্তু ৬-৭ মাস পরে, ততদিনে মাকিদ ফ্রয়েডের চার-পাঁচটি বই পড়ে ফেলেছে, সে ভেবেছে, ইতি পিসির ও রকম ব্যবহার আর কিছু না, যৌন অবদমনের বহিঃপ্রকাশ। মাকিদ যদি তাকে পিসি না ডেকে দিদি বলে ডাকতো, তাহলে কে বলতে পারে, তাদের সম্পর্কটা আরো অন্য রকম হতো কিনা। সেটা বিপজ্জনক কোনো মাত্রার দিকে মোড় নিতে কিনা। সুব্রতর বিছানার শিথান বরাবর হাতখানেক ওপরে একটা জানালা। লোহার মোটা শিক আছে। কিন্তু জানালা না বলে ওটাকে বড় সাইজের ঘুলঘুলি বলাই ভালো। ছোট্ট জানালার ওপাশে গলি; তার ওপাশের অন্য বাড়ির উঁচু দেয়াল। কাজেই এদিকে বাতাস ঢোকে না বললেই চলে। অবশ্য একটু আলো আসে। সেই আলোটুকু ঘরের মাঝখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই হারিয়ে যায়। ফলে সারাদিন বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। পাশের বাড়ির ক্যাসেটে প্রায় সারাদিনই 'মানিকগঞ্জের বড় মিয়া' টাইপের সস্তা গান বাজে। কোনো কোনো দিন অনেক সকালেও বাজে। সুব্রত তখন তার স্টাডি টেবিলে। সেসব মুহূর্তে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তার মন। তখন হয়তো 'উফ অসহ্য! আমি একটা নরকের মধ্যে আছি।' এ রকম কিছু বলে রিলিফ পাওয়ার চেষ্টা করে সে। ধুমধাড়াক্কা বাংলা গানের শব্দ, গুমোট গরম লোডশেডিং... এসবের মধ্যেই ছেলেটা পড়াশোনা করে। অভ্যাস হয়ে গেছে। মাকিদ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু, সুব্রত পড়ছে কেমন? দাদু উত্তর দিয়েছিল, পড়ছে রে। খুব পড়ছে! ঘরের মধ্যে মেলা কথাবার্তা হয়, হাসি-ঠাট্টা চলে। বাবুটা তার মধ্যেই পড়ে। আর না পড়েই বা কী করবে বল? মাকিদ বলেছে, ও যে রকম পড়ুয়া ছাত্র, ওর দরকার ছিল একটা আলাদা ঘর। শুনে প্লাস্টার-খসা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সমর্থনবোধক মাথা ঝাঁকিয়েছে দাদু। সে মুহূর্তে তাকে আরো বেশি বৃদ্ধ আরো বেশি অসহায় মনে হয়েছিল মাকিদের। ঘরের ভেতর থেকে মানুষের একটু আকাশ দেখার সুযোগ চাই। না হলে সে মরে যাবে। সুব্রত পড়তে পড়তে কখনো বা মুখ তুলে ওই ছোট্ট জানালাটি দিয়ে এক টুকরো স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখে সে মুহূর্তে অনন্তের অসীমের অনুভূতি তাকে ছুঁয়ে যায়। সে ভাবে, আর কতদিন এই খুপরির মধ্যে জীবন কাটাবো আমি? আলো-বাতাস খেলা করতে পারে এ রকম একটা বাসা কবে হবে আমাদের যার বারান্দা থেকে নদী অথবা মাঠের একাংশ দেখতে পাওয়া সম্ভব? আর এ রকম ভাবাতুর মুহূর্তে কল্পনাতাড়িত সে কবিতার দু'চারটি ছত্র লিখে ফেলে। লেখা শেষ করার পর সে যখন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, আত্মতৃপ্তির বদলে অনুভব করে এক ধরনের অসন্তোষ। তরুণ কবি হিসেবে সুব্রত মজুমদার কারো কারো নজর কাড়তে পেরেছে এটা ঠিক। কেউ কেউ তার পিঠও চাপড়ে দিয়েছে। কিন্তু সে যে রকমটা লিখতে চায়, যেভাবে লিখতে চায়, তার ধারে কাছেও সে পৌঁছাতে পারছে না এ রকমই তার বিশ্বাস। লেখাজোকার প্রথম পর্যায়েই যারা এমনটা ভাবে, হয় তারা কাজটা বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারে না; না হয় ব্যতিক্রমী ধরনের কিছু লিখে শেষ পর্যন্ত একটা সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করে নেয়। আত্মসমালোচনা ভালো। তবে তার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে সৃষ্টিশীল কাজে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সুব্রতর অনেকটা সেই দশা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসের প্রতি তার আবেগী পক্ষপাত; কোন বিষয়গুলো তার প্রকৃত আনন্দের উৎস, কোনগুলো নয় ছেলেটা আজো তা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না।

সুব্রত জানালা দিয়ে ওপাশের বিল্ডিংটার দিকে তাকালো। শিপ্রাদের ছাদের ভাঙ্গা চোঙ, যেটা দিয়ে জমে থাকা পানি নিচে পড়ে, বরাবর দেয়ালের অনেকটা নিচ পর্যন্ত শ্যাওলা পড়ে গেছে। তার কারণ ওই জায়গাটা পানিতে ভেজা থাকে সারা বর্ষায়। সুব্রতর চোখ এ মুহূর্তে ছাদে। তারে শুকোতে দেয়া জামা-কাপড় তুলছে শিপ্রা। কলেজ পড়ুয়া, স্লিম, নাক-মুখ চোখা মেয়েটা ছাদের কিনারে সামান্য ঝুঁকে নিচে তাকালো। মেয়েটা সুব্রতকে দেখার চেষ্টা করলো কি? শিপ্রা অনেকবার সুব্রতকে ওদের বাসায় যেতে বলেছে। সে যায়নি। পথে-ঘাটে দেখা হলে মেয়েটা আহ্লাদ করে কথা বলে! মনে হয় সুব্রতর সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। সুব্রত যে ওকে অপছন্দ করে ঠিক তাও নয়। আসলে সে ভয় পায়। শিপ্রার বাবা রগচটা ধরনের লোক। আর শিপ্রার একটা আধপাগলা ভাই আছে। কথাবার্তার ছিরিছাদ নেই। কখন কী বলে বসবে ঠিক আছে?

সুব্রত দৃষ্টি নামিয়ে আনে ঘরের ভেতর। টেবিলের ওপর চাঁই হয়ে থাকা বইগুলোর দিকে তাকায়। তার ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু হাসি উঁকি দেয়। তাচ্ছিল্যের হাসি। কার উদ্দেশে? নিজের উদ্দেশে নয় তো? সে ভাবে, ঘর আর বাইরের ভেতর পার্থক্য সামান্যই। ঘরের বদ্ধ পরিবেশ না থাকলে মানুষ বাইরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হতো না। আবার বাইরের জীবনের বিশৃঙ্খলা ও লাগামহীনতাই তো মানুষকে আবার ঘরের ভেতর ঢুকতে উদ্বুদ্ধ করে। মার্ক শাগালের একটা পেইন্টিং মনে পড়ে যায় তার যেখানে ঘর আর বাহির মিলেমিশে গেছে। জানালার ভেতরে-বাইরে সৃষ্টি হয়েছে এক অসেতুসম্ভব সম্পর্ক। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার স্বপ্ন সুব্রতকে দীর্ঘ সময় ঘরের ভেতর আটকে রাখে। অন্যদিকে কবিতার ইশারা তাকে অবিরত বলে, বেরিয়ে এসো দেয়ালের বাইরে। বাইরে নদী, নিসর্গ, পথ-ঘাট, জীবনের জটিল জঙ্গমতা; বাইরে শিপ্রার মতো বুকে-প্রেম-চেপে রাখা মেয়েদের বিলোল হাতচানি। সুব্রত দাদুর ওই কথাটা শুনতে পাচ্ছে আবার। বুঝলি দাদা, মেয়েরা হলো আঠা, আঠা! জিগা গাছের আঠা! আর ছেলেগুলো সব ফড়িং। কাছে গেলেই আটকে যায়! পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করতে চাইলে ওদের থেকে সাবধান। সে নিজের উদ্দেশ্যে বলছিল, হোউর! ক্রিয়েটিভ ছেলেরা সারাক্ষণ ঘরে থাকবে কেন? তাকে অনেক কিছু বুঝতে হবে না? বাইরের জীবনের মধ্যে মিশে যেতে হবে না? ঠিক সেই সময় মাকিদ এসে হাজির। তার পকেটে সিনেমা দেখার দুটো পাস। সে এসে কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই প্রস্তাবটা রাখলে অপ্রস্তুত সুব্রত প্রথমে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিল। ভেবেছিল ও ইয়ার্কি মারছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পেরেছে মাকিদ সিরিয়াস। তারপর দশ সেকেন্ড চিন্তা করেছে। ও একদম টিকিট নিয়ে হাজির। সন্ধ্যায় আমার কোনো কাজও নেই। কাজেই ওর সঙ্গে যাওয়াই উচিত। না হলে খুব মাইন্ড করবে। ওরা খুব ভালো বন্ধু। দীর্ঘদিনের বন্ধু। সুব্রতর মধ্যে অনেক গ্রেট ব্যাপার আছে। আবার গোঁয়ার্তুমিও আছে। মাকিদের ভয় ছিল, ও হয়তো যাবে না। আবার মাকিদকে সুব্রতর চেয়ে ভালো আর কে চেনে? অভিমানী ছেলে। আর তার ওপর দাবি খাটাতে পারে তো সেই। সুব্রত, অতএব, মুচকি হেসে বলেছে, ঠিক আছে চলো। মুহূর্তেই মাকিদের মনে স্বস্তির বাতাস বয়ে যায়। সেই বাতাস তার চোখে-মুখে নিয়ে আসে আনন্দের অভিব্যক্তি। সে তখন সুব্রতকে তাগাদা দেয়, তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। ৭টায় শো। এখন বাজে ৬টা ১০।

হ্যাঁ ১০ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে, দাঁড়াও।

এক ঘটি পানি চোখে-মুখে হাতে খরচ করে বারান্দায় ঝুলানো গামছা দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে মাঝকানের রুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই সুব্রত থমকে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ। তার সারা মুখে তাৎক্ষণিক অসন্তোষের ছায়া। কিন্তু সে ওই ঘরে যাচ্ছিল কেন? যাচ্ছিল, কেননা ওখানেই আজ ভার্সিটি থেকে এসে প্যান্ট খুলে রেখেছে। ওই প্যান্টে মানি ব্যাগও আছে। ভেতর থেকে ইন্দ্রাণীর গান ভেসে আসছে, 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো...'। মাকিদ মনে মনে বলে, সেরেছে! পিসি নিশ্চয়ই রূপচর্চায় ব্যস্ত। নির্ঘাত দেরি হবে আমাদের। দরজায় জোরে

জোরে ৩-৪টা টোকা দিয়ে সুব্রত অস্থিরভাবে পায়চারি করে বারান্দায়। এদিক-ওদিক তাকায়। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের সামনে বারান্দার কোণে ঝুলছে টিয়ের খাঁচা। টিয়ে পাখিটা ফ্যাকাশে লাল ঠোঁট দিয়ে পা খুঁটছে, পালক আঁচড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে গলা ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে উঠছে পেয়ারাগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে উদাস আকাশ। পুব দিকে বৃষ্টি সম্ভাবনাহীন একপুঞ্জ মেঘ। ইতোমধ্যে ১০ মিনিট গত হয়েছে। এখনো সুব্রতর জামা-কাপড় পরা হলো না। এদিকে ইন্দ্রাণীও দরজা খুলছে না। নিরুপায় সুব্রত আবার দরজায় জোরে নক করতে থাকে। পিসি তাড়াতাড়ি করো! মাকিদ এসেছে। কোনো সাড়া নেই। পিসি শুনতে পাচ্ছো? আমরা বেরোবো। ৭টায় প্রোগ্রাম!

ইন্দ্রাণীর গলায় আবারো একটু গুণ গুণ শোনা গেল। যেন সুব্রতর কোনো কথাই তার কানে ঢোকেনি। এখন মহিলার ওপর চটে আছে সুব্রত। মুখে আর কিছু বলছে না। ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে। আর ভাবছে, এই মহিলার জন্যই আজ আমরা ছবিটার শুরুটা দেখতে পাব না। ফ্যামিলির ভেতরে থাকলে মানুষকে কিছুটা ছাড় দিতে হয়। চলতে হয় অ্যাডজাস্ট করে। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু একজনের অসুবিধা করার অধিকার তো আরেকজনের নেই। মাকিদের মাথার ভেতর ইন্দ্রাণী ঢুকে পড়ে আবার। সিনেমা দেখার কথা আপাতত সে ভুলে গেছে। তার বদলে জেগে উঠেছে একজন আইবুড়ো মহিলার জন্য সমব্যথা। ইতি পিসি কি শেষ পর্যন্ত একটাই থেকে যাবে? তার ঘর-সংসার হবে না? গান আর রূপচর্চা এ নিয়েই তো আছে মহিলা। বুড়ো বাবার ঘাড়ে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো বেঁচে আছে। সুব্রতকে কোলে-পিঠে করে বড় করেছে এই পিসিই। সে জন্য সুব্রতর খুব খারাপ লাগে পিসির কথা ভেবে। কিন্তু কী করবে সে? কী করার ক্ষমতা আছে তার?

সুব্রত দেখলো, ৭টা বাজতে ২৫ মিনিট বাকি। ঘর থেকে বেরিয়ে রিকশা ধরতে কমপক্ষে ৫-৭ মিনিট। গন্তব্যে পৌঁছাতে মিনিট বিশেষ। হাতে আর সময় থাকে না। দুবন্ধু প্রায় দৌড়ে মহল্লার মোড়ের দিকে যায়। রিকশায় উঠে মাকিদ সিগারেট ধরায়। ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ তুলে বলে, ও মাই গড! সাজগোজ করতে মানুষের এত সময় লাগে! সুব্রত বলে, তাহলে আমার অবস্থাটা একবার তুমি ভাবো। কোথায় আছি আমি!

মাকিদ কিছু বলে না। নিঃশব্দে সিগারেট টানে। অর্ধেক রাস্তা গেলে সুব্রত বলে, অনেক দিন পর ইন্ডিয়ান হাইকমিশনে ছবি দেখতে যাচ্ছি। তুমি আগে ছবি দেখেছো ওখানে?

হ্যাঁ, একবার। ওই 'পথের পাঁচালি' দেখেছিলাম। সে একটা অভিজ্ঞতা রে! বাংলা ফিল্ম যে এ রকম হতে পারে ধারণা ছিল না।

সুব্রত নিঃশব্দে হাসে। রাজেন তরফদার, তপন সিংহ, নিমাই ঘোষ নামগুলো তার মনে পড়ে। সত্যজিৎ এদের চেয়ে কত আলাদা! তার ক্যামেরার ভাষাই অন্য রকম। আড্ডার সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য মহসিন ভাই একবার বলেছিলেন, সুব্রত, মডার্ন ফিল্ড কিন্তু মডার্ন পোয়েট্রির খুব কাছাকাছি জিনিস। কিছু বিষয়ে মডার্ন পেইন্টিংয়ের সঙ্গেও তার মিল খুঁজে পাবে তুমি। তারপর থেকে ছেলেটা আধুনিক সিনেমা এবং আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে খোঁজ–খবর রাখার চেষ্টা করে। সুব্রত এখন বলে, 'আকালের সন্ধানে' শুনেছি নামকরা ছবি। মাকিদ, তুমি সিওর ওই ছবিটাই দেখাবে? মাকিদ মাথা নাড়ায়, তাইতো জানি।

ও, তুমি তাহলে সিওর না!

মাকিদ বলে, আরে মৃণাল সেনের ছবি যদি নাও দেখায়, ফালতু কিছু নিশ্চয়ই দেখাবে না।

ওরা দুজন যখন অডিটোরিয়ামে ঢোকে তখন রুমটা প্রায় ভর্তি। বাঁ দিকের চেয়ারগুলোর মহিলা দর্শক গিজগিজ করছে। সুব্রত ঢুকেই সুবিধাজনক একটা কর্নার খোঁজে। সামান্য এগিয়ে ডান পাশের দুটো খালি সিটে ওরা বসে পড়ে। মহিলাদের মাঝখানে কোনো বাচ্চা একটু কেঁদে উঠতেই তার মা 'এই চুপ! একদম চুপ। চবি শুরু হবে' বলে থামিয়ে দিল। মাকিদ লক্ষ্য করলো, অডিটোরিয়ামের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হলো প্রামাণ্যচিত্র। ভারতের নানা পর্যটন কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর ডকুমেন্টারিটা দেখতে খারাপ লাগছিল না, যদিও ওগুলো নতুন কিছু না। মিনিট ১৫ ধরে ডকুটা চললো। কিন্তু তারপরও এসব কী? কোথায় 'আকালের সন্ধানে' কিসের কী, 'জিন্দেগি' নামে প্রায় বিশ বছর আগের একটা হিন্দি ছবি শুরু হয়ে গেছে। বনপথে টাঙ্গার ওপর বসে এক মধ্যবয়স্ক নায়ক মাফলার উড়িয়ে গান করছে! মাকিদ বিব্রত হয়। ভালো একটা ছবি দেখানোর কথা বলে সুব্রতকে নিয়ে এলাম, আর এখন কী সব দেখাচ্ছে এরা! সে দেখলো, আশপাশের ৩-৪ জন দর্শক উসখুস করছে। দুজন ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুব্রত বললো, দোস্ত এ জিনিস দেখা যাবে না। চলো বেরিয়ে যাই। এবং সত্যি সত্যি ছবি আরম্ভ হওয়ার ৫ মিনিটের মাথায় ওরা বেরিয়ে পড়লো অডিটোরিয়াম থেকে। মাকিদ বিরক্তি ঝাড়ে, থউর! রিকশা ভাড়াটাই!

সুব্রত টিপ্পনি কাটে, 'আকালের সন্ধানে' তো খুব দেখা হলো। এবার চলো মৃণাল সেনকে খুঁজে পাই কিনা দেখি।

মাকিদ বুঝলো, সুব্রত বন্ধু মৃণালের কথা বলছে। তবে ও সেন নয়, ঘোষ। মৃণাল ঘোষ। সোস্যাল ওয়ার্কে পড়ে। মাঝে মাঝে ওদের আড্ডায় আসে। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় মৃণাল। জ্যোৎস্না রাতে যেদিন ওরা পদ্মার চরে যায় সেদিন ও গাইবেই। তখন বন্ধুরাও ওর সঙ্গে গলা মেলায়।

এখন সন্ধ্যার বাতাস দুবন্ধুর হতাশা ও বিরক্তি মাখানো মুখ মুছে দিচ্ছে গভীর মমতায়। ওরা হাঁটতে হাঁটতে গ্রেটার ঝেড়ে এসে পড়েছে। অনতিদূরে 'বর্ণালি' সিনেমা হলের বাতিগুলো জ্বলজ্বল করছে। গ্রেটার রোড ঘেঁষে চলে গেছে রাজশাহী-চাঁপাই রেললাইন। একটা শুধু ইঞ্জিন ঝকরঝকর মকরমকর শব্দ তুলে কোর্ট স্টেশনের দিকে চলে গেল। এ রাস্তাটা নতুন। বেশ চওড়া, ফলে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় নেই। শেষ বিকেলে ও শুরু সন্ধ্যায় অনেক মানুষ, বিশেষ করে উপশহর এলাকার লোকজন, এদিকে হাঁটতে আসে।

মাকিদ মনে মনে ছবি প্রদর্শকদের এক হাত নিল। অনেক আশা ছিল, দুজনে মিলে ফিল্মটা এনজয় করবে। মাকিদ ছোট্ট মুদিখানা থেকে সিগারেট কিনলো। একটা সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এমন হবে জানলে কোন শালা আসে!

সুব্রত অনেকক্ষণ পর সিগারেট টানছে। নাক-মুখ দিয়ে ভুর ভুর করে ধোঁয়া ছাড়ছে। মাকিদের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু গলায় এখন বলে এই স্টুপিড অরিয়েন্টেড দেশে ভালো কিছু হবে মনে করেছ? হবে না! একটা রিকশাকে এ সময় ওদের দিকে এগোতে দেখা যায়। মাকিদ ইশারা করে। কিন্তু চালক বোঝায় সে অন্যদিকে যাবে। অগত্যা ওরা হাঁটতে থাকে। প্রায় সাড়ে ৮টা বাজে। সাহেববাজার ও সোনাদীঘির মোড়ের দোকানপাটগুলো বেচাকেনা জমে উঠেছে। শান্তা প্লাজার নিচের যে শানবাঁধা পেভমেন্টে প্রায় প্রতিদিনই সুব্রত, অসীম, আলমগীর, মাকিদ, রফিক, মৃণালরা আড্ডা দেয়, পাশের ছোট স্টলের বেঞ্চে বসে চা খায়, সেখানে আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ মাকিদের মনে পড়ে, ক্যাম্পাসে অসীম সকালে বলেছিল, আলমগীর আর রফিককে নিয়ে ও বিকেলের দিকে তালাইমারি যাবে, মামার বাসায়। কাজেই সন্ধ্যাবেলা মার্কেটের আড্ডায় ওরা থাকবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মৃণালটা তো থাকবে। সেও নেই। মৃণালের কথা ওঠায় সুব্রত বলে, ও তো রোজ আসে না। হঠাৎ হঠাৎ আসে। হয়তো এসেছিল। কাউকে না পেয়ে অন্যদিকে চলে গেছে।

মাকিদ ভাবলো, পুরো বিকেল সন্ধ্যাটাই আজ মাটি! ঘুম থেকে উঠে আজ কার মুখ দেখেছি প্রথম? অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণার ভেতর থেকে সে বলে, চলো, কী আর করা। রাজশাহী রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। ওরা কেউ এলেও আসতে পারে। না এলেও ক্ষতি নেই। সুব্রত বলে, বাজে লাগছে! চলো এক কাপ করে চাপ গিলি!

মুখ বেজার করে বসে আছে সুব্রত। মাকিদ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রে নাড়াচাড়া করে। তার ভালো লাগে না। তার কিছুই ভালো লাগছে না এ মুহূর্তে। তার মাথায় এমন এক অস্বস্তির এবং মনে এমন এক দুঃখের উদয় হয়, যার সঙ্গে সে আগে পরিচিত ছিল না। ওদিকে চা খেতে খেতে সুব্রতর মনে হয়, সে এক অদ্ভুত জিনিস খাচ্ছে যার গন্ধ স্বাদ কিছু নেই। তার ভেতরে খুব চিকন ও অবহেলাযোগ্য একটা তোলপাড় টের পায় যার প্রকৃতি সে নিজেও বুঝতে পারে না। মাকিদ সিগারেট ধরায়। সুব্রত মাকিদের হাত থেকে দেশলাই নিয়ে একটা কাঠি বের করে। কাঠিটা শুধু শুধু জ্বালায়। নিভে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আগুনের শিখাটা অপলক লক্ষ্য করে।

গল্প

ফেরে নাই

অনুপ সাহা

এ রকম যে হবে তা সোহানা কখনো ভাবতে পারেনি। তার বিশ্বাস এখনো দৃঢ় এবং তা যে কোনো সময়ের থেকে। তার বিশ্বাস উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা তার কাজ দেখলেই বোঝা যায়। এখনো প্রতিদিন ঠিক সময় আসে, এরপর দুপুর পার করে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলতে থাকে তখন চলে যায়। তার এই আসা এবং যাওয়া খুব নিভৃতেই হয়। অনেকেই বুঝতে পারে না। কিন্তু যারা জানে তারা বুঝতে পারে সোহানা কি জন্য এসেছে আর কি চায় সে। প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে সে প্রতিদিন খুব সকালে উঠবে, নিজেকে পরিচ্ছন্ন করবে এরপর যে কাপড়টা পরলে তাকে সব থেকে ভালো লাগে, সেই কাপড়টা পরবে। কপালের মাঝে একটা গোল টিপ দেবে। এরপর সকালের খাবারটা খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। বাড়ির মানুষরা জানে সোহানা এখন কোথায় যাবে। কি করবে। কিন্তু তাকে বাধা দেয় না কেউ। সবাই জানে তাকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কাজটি তার নিত্যদিনের সঙ্গী। জীবন চলার পথ। যাওয়ার আগে মা তাকে জিজ্ঞেস করে,

'কোথায় যাবি?'

'জান তো কোথায় যাই। জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ আছে?'

'ফিরবি কখন?'

'যে সময় ফিরি, তখন।'

কথা বাড়ায় না মা। চুপ করে থাকে। বাবা অপলক দৃষ্টিতে মেয়ের এই কাজ দেখতে থাকে। কোনো কিছু বলতে সাহস করে না। জীবনের নির্মমতাকে জীবনের অংশ হিসেবে মেনে নিয়ে সময় কাটায়। সব সন্তানের প্রতিই তার সমান শুভ কামনা আর ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসা দুর্বলের প্রতি একটু বেশিই। তাই সোহানার বাইরে যাওয়াকে সন্তানের জীবনের অধ্যায় বা তার ভালোবাসার আওতার মধ্যে পড়ে কিনা, সে বুঝতে পারে না। তবু সন্তানের শুভকামনার মাঝে হয়তো পড়তে পারে সেটা ভেবে তাই সে কোনো কাজে বাধা দেয় না, নিভৃতে অনুমোদন করে।

সোহানা বাড়ির বাইরে বেরুতেই দেখতে পায় কয়েকটা রিকশা তার বাড়ির সামনে। তাদের ডাকতে হয় না। এমনিতেই উপস্থিত থাকে। অনেকদিন যাওয়ার ফলে অনেক রিকশাওয়ালাই তার সময়টা জেনে গেছে। তাই প্রতিদিনই দু-একজন রিকশাওয়ালা তার বাড়ির সামনে হাজির থাকে। আর গন্তব্য স্থানটা রিকশাওয়ালাদের সবারই জানা।

'আপা, সেই সকালের তে আমি আপনার জন্যি দাঁড়ায় আছি।'

সোহানা উঠলেই, রিকশাওয়ালা একই কথা জিজ্ঞেস করবে। সোহানা জানে তাদের নামটা জানা, তারা জায়গার নাম না জিজ্ঞেস করলেও পারে। কিন্তু প্রতিদিনই চর্বিতচর্বন। না করলেও করতে পারে কিন্তু একঘেঁয়েমিতে পরিণত হয়েছে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেই রিকশা থেকে খুব ব্যস্ত হয়ে নামবে সে। যেন একটু গাফিলতিতে ট্রেনটা চলে যেতে পারে। রিকশা থেকে নেমে দ্রুতগতিতে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। যে জায়গা থেকে সে আশিককে বিদায় দিয়েছিল। তার মনে আছে, ফার্স্ট ক্লাসের কামরাগুলো সাধারণত পেছনের দিকে থাকে। যেখানে একটা আমগাছ আছে। আমগাছের ঝুলন্ত আমগুলো বাতাসে দুলছিল। তার স্পষ্ট মনে আছে, সেবার বেশ বড় বড় আম হয়েছিল। আর ফার্স্ট ক্লাসের কামরাগুলো বরাবরই আমগাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। সেও সেখানে দাঁড়িয়েছিল দুজন হাত ধরাধরি করে যতক্ষণ না ট্রেনটা আসে। ফার্স্ট ক্লাসের গাড়িগুলো একটু ভিন্নতর হয় সাদা পোশাকের লোকেরা খুব সতর্কতার সঙ্গে যাত্রীদের তোলে।

গাড়িটা দাঁড়াতেই যাত্রীরা নামতে থাকে। এ সময় আশিক সোহানার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে, মনে হচ্ছিল আশিকের সমস্ত শক্তি সোহানার দেহের ভেতর প্রবিষ্ট হচ্ছে। সোহানা তখন অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল, একটা অন্য জগত যে জগত শুধু সেইই বুঝতে পারছিল। এমন সময় যার ভেতর কিছু একটা প্রবিষ্ট হয় তখন সেইই শুধু অনুভব করতে পাওে, নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়তে থাকে, সারা শরীর অন্য একটা খেলায় নিজেকে মোহগ্রস্ত করে তুলে। সোহানা এই আমতলায় আর এই ফার্স্ট ক্লাসের সামনে এসে দাঁড়ালেই সেই শক্তিটা তার দেহে খেলে যায়। একটা অন্য জগতে প্রবেশ করে। তাকে অন্য একটা জগতে নিয়ে যায়। এই খেলা থেকে সে কিছুতেই বেরুতে পারে না।

সোহানা এখন ঠিক করতে পারে না আশিক কোন ট্রেনটাতে গিয়েছিল আর কোন ট্রেনে ফিরে আসবে। দিনের সব কয়টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। বিকালের শেষ ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর তখন দিনের সূর্যটা স্টেশনের বড় তালগাছটার মাথায় এসে বসবে। বুঝতে হবে দিনের সূর্যটা এখন অনেক ক্লান্ত, পাখিরা তাদের আস্তানায় ফিরে আসতে শুরু করবে। এখন সোহানার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, তারও পাখিদের মতো ফিরবার পালা। একটা দিনের শেষ আর একটা দিনের শুরু। সোহানা আগামীর বার্তা নিয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। রাত অতিবাহিত করার পর পরের দিনের কর্মসূচি। এভাবেই চলে সোহানার জীবন, এ ছাড়া সে চলতে পারে না। তার জীবনে এ ছাড়া অন্য কোনো প্রাপ্তি নেই। অন্য কোনো প্রাপ্তির সন্ধানও তার কাছে নেই। সে তার সমস্ত কিছুকে ক্ষয় করে ভিন্নতর কিছু করতে চায়। নতুনকে নতুন করে দিতে চায়। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে ধরে রাখতে চায়। কেউ তাকে বোঝে আবার কেউ তাকে বুঝে না। ক্ষয়কে অবচয় হিসেবে ধরতে চায়, ক্ষয়ের মাঝ দিয়ে যে নতুনভাবে নব নব সৃষ্টি হয় আর সৃষ্টির যে উন্মাদনা থাকে, তা কেউ উপলব্ধি করে আবার কেউ কেউ করে না বা করতে পারে না।

সে দিন ছিল এমনি একদিন যেদিন ছিল মানুষের সব থেকে আনন্দের আর প্রাপ্তির। সে প্রাপ্তি এমন ছিল না যাকে প্রাচুর্যতা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে। প্রাণের প্রশান্তির লেপন ছিল, যা কোনো অর্থেই পরিমাপযোগ্য ছিল না। কিন্তু প্রশান্তির নির্ণয়ে তা ছিল অপরিসীম এবং অনন্ত। তেমনি প্রাপ্তি ছিল সোহানার। মনটা ছিল প্রাপ্তির পূর্ণতায় ভরপুর। পৃথিবীর সব কিছুকে তার মনে হয়েছিল পূর্ণতায় ভরা, কিছুই ছিল না তার কাছে অপূর্ণ আর অপ্রাপ্তির।

'আশিক তুমি কিন্তু নেমেই ফোন দেবে।' সোহানা আশিকের চোখে চোখ রেখে বলে, সোহানা মোহবিষ্ট। সোহানার আয়ত চোখের মণিটা তখন খুব উজ্জ্বল এবং সেই চোখের তারাতে এখন আশিকের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে।

'আমি ট্রেন থেকে নেমেই তোমাকে ফোন দেব, সোহা।' আশিক সোহানার কথায় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলে। যাতে করে সোহানার আবেদনটা সে পূরণ করতে পারে। আশিক খুব আদরের ভাব নিয়ে সোহানাকে 'সোহা' নামে ডাকে।

'তুমি যদি ফোন না দাও, তাহলে আমি কিন্তু পারব না, নিজেই করে ফেলব। আমার ওত ধৈর্য থাকবে না।'

'তোমাকে করতে হবে না। আমিই তোমাকে ফোন দেব।'

কিন্তু আশিকের ফোন সোহানার কাছে আর আসে না। সোহানা তাকে ফোন করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। ভাবে আশিক তো নিজেই তাকে ফোন করবে। তাই সে চুপ করে থাকে। কিন্তু সব বিষয়ের তো একটা শেষ থাকে। সে আর পারে না।

আশিকের ফোন না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে যায় সোহানা। একবার ফোন দেয় আশিককে। ফোন বাজতে থাকে কিন্তু কোনো উত্তর আসে না।

'বাবা, আশিক না ফোন ধরছে না। ও কেন ওরকম করছে?'

'কই ফোনটা দেতো, দেখি।'

সোহানার বাবা ফোন করতেই দেখে ও পাশের ফোনটা বাজছে কিন্তু কেউ ধরছে না।

'তাই তো দেখছি। আশিকের ফোনে কলটা ঢুকছে। কিন্তু কেউ ধরছে না। কি মুশকিল হলো দেখছি। এখন কি করা যায়।'

সোহানা বাবার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে আবার কথা বলার চেষ্টা করে।

'বাবা, আশিক কেন কথা বলছে না।'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। দেখছি কি করা যায়।' মেয়েকে সান্ত্বনা দেয় অসহায় বাবা।

এরপর বার বার তাকে ফোন দেয় সোহানা। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো উত্তর আসে না। কতবার ফোন দেয় তার হিসাব থাকে না।

আগের রাতে প্রচুর বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসে প্রকৃতি ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতির রুদ্রতার কাছে হার মানে সবকিছু। কিন্তু এমন রুদ্রচণ্ডের পর প্রকৃতি এতটা নির্মল হয় তা দেখা যায় না। কিন্তু সেদিন হয়েছিল। প্রকৃতি এমন উদার করে সবকিছু দিয়েছিল, যা বলতে গেলে বিরল এবং অস্বাভাবিকও বটে। কিন্তু তাদের জীবনে সেটা দেখা দিয়েছিল অনেক বড় ব্যাপ্তিতে। কিন্তু এত বড় ব্যাপ্তির পর পৃথিবীটা এত ছোট হয়ে যায় তার জীবনে, যা কোনোমতেই পরিমাপ করা যায় না। এমন অসংলগ্নতা বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতি তার হিসাব মিলাতে গিয়ে সমস্ত হিসাব মেলাতে পারে না। গড়মিল হয়ে যায়। সোহানার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তির পরিমাণটার মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন থাকে না। সেতু ভেঙে যায়। সে ভাবতে পারেনি আশিক চলে গিয়ে আর ফিরে আসবে না। কোথায় হারিয়ে গেল তার কোনো হদিস মিলে না। কোন্ স্টেশনে সে নেমেছিল তাও সে জানতে পারে না। তার এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে

গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সে সেই স্টেশনে নেমেছিল। অনেককে জিজ্ঞাসা করতেই বলেছিল, হয়তো এমন চেহারার একটা মানুষকে তারা নামতে দেখেছিল, এরপর কি জানি কি হয় হঠাৎ মাথায় ঘুরপাক পড়ে যায়। এরপর মরে যায়। মৃত দেহটা হাসপাতালে ফোন করলে নিয়ে যায়। কিন্তু যে মারা গিয়েছিল, সে সেই কিনা তা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর আশিকের বয়সটাও যে খুব বেশি ছিল ঠিক তাও নয়, যে বিবরণ তারা পায় তার সঙ্গে কিছুটা মেলে। কিন্তু সবটুকু মেলে না। সবটুকু মেলানো সম্ভব ছিল না, সোহানার মোটেও আশিক বলে মনে হয়নি। তার আশিক এমনটা নয় যেভাবে বিবরণটা পাওয়া যায়। হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যে দেহ তারা দেখায়, তার সঙ্গে একটা মৃত দেহেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সে তার আশিককে কিছুতেই হারাতে চায় না। তার কাছে আশিক আছে, যেমনটা ছিল তেমনি আছে, এতটুকুনও পরিবর্তন হয়নি। সে আশিকের কোনো পরিবর্তন মানতে পাওে না, মানতে চায় না। তার মনে হয়েছে, আশিক একদিন ফিরে আসবে। যেমন করে তার কাছ থেকে সে বিদায় নিয়েছিল। সেই আমেপূর্ণ গাছটার তলায় তার হাতটা শক্ত করে ধরেছিল, এরপর সেই ধরা হাত নিয়ে তারা ট্রেনের কামরায় উঠে। বসেছিল দুজন কিছুক্ষণ পাশাপাশি। হাসাহাসি হয়েছিল অনেক, দেহের আর চোখের ইশারায় কথা হয়েছিল প্রচুর। ট্রেনের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিচে নামতে সাহায্য করে আশিক। রেলগাড়িটা ছেড়ে দিলে তারা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যতদূর চোখ যায় এবং আশিকের সাদা রংয়ের জামাটা এবং হাত নাড়তে থাকাটা অস্পষ্ট বিষয়ে পরিণত না হয়। সোহানাও হাত নাড়তে থাকে। এক সময় রেল পাটির ওপর সূর্যের রশ্মিটা পড়ে একটা শীর্ষ বিন্দুতে পরিণত হয়। রেলগাড়িটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে। বাঁকটা ঘুরতেই ট্রেনটা একদম হারিয়ে যায়। এরপরও সোহানা হাত নাড়াটা থামায়নি।

এক সময় খেয়াল করে প্লাটফর্মে সে ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। এরপর সে আর করতে পারে না তার হাতটা নামিয়ে ফেলে। আর দূরে দেখতে পায় তার বাবা আর মা নিথর নিষ্পলক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বারের মতো এবারও আমগাছে প্রচুর আম এসেছে, থোকায় থোকায় ঝুলছে। কিন্তু আশিক আর ফিরে আসেনি এই স্টেশনে– যে স্টেশন দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। সোহানার কাছে মনে হয়নি আশিক চলে যেতে পারে বা হারিয়ে যেতে পারে। সে তারই প্রতিক্ষায় এখনো আছে যে আশিক একদিন ফিরে আসবে। সেই আমগাছ তলায় যেখান থেকে সে চলে গিয়েছিল।

গল্প

শেষ স্টেশন

শাকির সবুর

নিঃশব্দ-নিশ্চুপ একাকী বসে আছেন হায়দার সাহেব। গলা অবধি রিভলবিং ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়া, পা দুটো টেবিলের ওপর লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে দু'চোখ বুজে গভীর ভাবনায় নিবিষ্ট। বাম হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ধরা গোল্ডলিফ লাইট জ্বলছে আর মৃদু ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। বাইরে মধ্য জ্যৈষ্ঠের তীব্র রোদে বাতাসে আগুন ছড়ালেও ঘরময় জেনারেল স্প্লিট এসির ছড়ানো শেষ হেমন্তের তন্দ্রাময়ী হিমেল হাওয়া সারা শরীরে সোহাগী স্পর্শ বুলাচ্ছে। একটু আগে বেয়ারা লেমন ফ্লেভারের এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করে দিয়ে গেছে। ছড়ানো এয়ার ফ্রেশনারের তাজা লেবুর গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধের মিশেলে অদ্ভুত রকমের একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে এখন। গন্ধটা ভালোই লাগছে তার।

চোখ বোজা অবস্থায়ই মনে মনে ভাবলেন, এত দূর পর্যন্ত এসে, এত এত টাকা লগ্নি করে এখন যদি প্রজেক্টটা না ওঠানো যায়, তাহলে একেবারে মাঠে মারা। কাকে কত দিতে হবে, রাফ একটা হিসাব করলেন। ফিগারটা বেশ বড়। দশ কোটির মতো। নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করলেন, হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে। সব সময় যেমন হয়। টাকা ঢাললে এ দেশে কী না হয়! তখনই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললে হয়তো কোটি

টাকায়ই হয়ে যেত, এখন সেখানে দশ কোটি যাবে। যাক। কাজ হওয়া দিয়ে কথা। স্বস্তিতে বাম হাতটা বাঁকা করে দুই ঠোঁটের কাছে এনে সিগারেটে ঠোঁট ছোঁয়ান।

খুব বেশিক্ষণ কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় তাকে তেমন থাকতে হয় না। অফিসের ঝুট-ঝামেলা সিইও নিজেই সামলায়। শুধু কোনো ক্রাইসেস মুভমেন্ট তৈরি হলে সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হয় তাকে। কাকে কিভাবে কত দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে? কার মাধ্যমে কার সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে হবে?– এসব। এগুলো ভাবতে বেশিক্ষণ লাগেও না তার। শুধু তার কেন, তার মতো এই লেভেলের ব্যবসায়ীদের কাউকেই তেমন ভাবতে হয় না। টাকা দিয়ে ম্যানেজ করা যায় না, এমন কেউ কি এ দেশে আছে? আগে ছিল– ফেল কড়ি, মাখো তেল। এখন তা পাল্টে হয়েছে– মাল ছাড়, ম্যানেজ কর। এই আর কি।

পাঁচতলা ভবনের চতুর্থ আর পঞ্চম তলা জুড়ে হায়দার সাহেবের অফিস। তিনি বসেন চতুর্থ তলায়। একদম শেষদিকে। অন্যান্য ইগজেক্যুটিভ, চিফ ইগজেক্যুটিভ, তারপর রূপবতী স্মার্ট পিএস অনিমার টেবিল। সবশেষে কাচের দেয়ালে ঘেরা হায়দার সাহেবের চেম্বার। আধুনিক, ছিমছাম। নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। বাইরের হৈ-হট্টগোলের শব্দ তো পৌঁছেই না, এমনকি অফিসের ইগজেক্যুটিভদের কাজকর্মের সাড়াশব্দও তার কানে আসে না। তার সারা অফিসজুড়েই নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব। তার ইগজেক্যুটিভরাও খুব স্মার্ট, আধুনিক। অনেকটা নিঃশব্দেই অফিসের সব কাজকর্ম সারেন তারা। বিশেষ করে তিনি যতক্ষণ অফিসে থাকেন, ততক্ষণ তাদেরকে তার কাছে যন্ত্রমানব বলেই মনে হয়। মানুষ এতটা নিঃশব্দ থাকে কী করে! কখনো কখনো এই নৈঃশব্দ্য তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন গলা ছেড়ে গান ধরতে ইচ্ছা করে তার। শৈশবের মতো, শ্রাবণ-ভাদ্রে যখন তাদের পুরো গ্রাম বর্ষার পানিতে ডুবে যেত, চারদিকে পানিতে থই থই করত, গ্রামের একমাত্র বাঁধানো কাঁচা সড়কটা কোনো রকমে মাথা তুলে জেগে থাকত, তার দু'পাশের ধানক্ষেতগুলোতে কালচে সবুজ পোয়াতি আমন ধানে ঢেউ খেলে যেত পুবালি হাওয়া, সেই কাঁচা সড়ক ধরে প্রতিদিন বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে বাতাসের উজান ঠেলে কতদূর পর্যন্ত দৌড়ে চলে যেতেন তিনি। কিন্তু এখন শহুরে ভব্যতায় তার মতো মানুষদের কত কিছুই না মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে তিনি যে পর্যায়ে নিজেকে পৌঁছে দিয়েছেন, এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মানুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কত যে বাছবিচার!

হঠাৎই কী একটা অচেনা আতঙ্কে আঁতকে ওঠেন হায়দার সাহেব। রুমের ভেতর কেউ একজনের নিঃশব্দ উপস্থিতি অনুভব করেন, আবার করেনও না। তার দেখতে ইচ্ছে করছে, কার এত বড় দুঃসাহস যে, নিঃশব্দে বিনা অনুমতিতে তার রুমে এসে ঢুকেছে? কিন্তু মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে দেখতেও সাহস পাচ্ছেন না। নিজের কাছে নিজেকেই বিস্ময়কর মনে হয় তার। অবশেষে মনের ভেতর সাহস সঞ্চয় করে দ্বিধা-সংকোচে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকান। চোখের সামনে দণ্ডায়মান অবয়বের ওপর তার ভয়ার্ত দৃষ্টি আটকে যায়। প্রশস্ত স্কন্ধ-দীর্ঘাঙ্গী-বিশালবপু বিস্ময়কর একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে। এক নিমেষের জন্যও দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না। ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া জিহ্বায় অতি কষ্টে ঢোক গেলেন তিনি। যদিও তার অধীনস্থ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গেই লোকটির কোনো ধরনের সাদৃশ্য নেই, তবুও তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছে করছে তার। বিনা অনুমতিতে অসময়ে তার রুমে ঢুকে পড়ার জন্য শক্ত করে একটা ধমক দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারছেন না। লোকটার অস্বাভাবিক বিশালত্ব তার মধ্যে কেমন যেন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বহু কষ্টে শুধু যে কথাটা তিনি বলতে পারলেন, তা হচ্ছে– আপনি!

লোকটা একটু নড়ে উঠল। তার অস্বাভাবিক বড় এবং মোটা ঠোঁট দুটো বিস্ময়কর ভঙ্গিতে ফাঁক করে কোনো রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ভীতিপ্রদ স্বরে বলল– আজরাইল!

হায়দার সাহেব কিছুটা স্বস্তি পেলেন। তার বুকের ভেতরে অনুভূত অচেনা আতঙ্কটা মুহূর্তেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এয়ারকন্ডিশনারের ফিক্সড্ করা আঠারো ডিগ্রি তাপমাত্রার ভেতরেও একটু আগে যে তিনি রীতিমতো ঘামছিলেন–কপালে, চিবুকের নিচে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক চিক করছিল–শীতল বাতাসে মুহূর্তেই তা কর্পূরের মতো মিলিয়ে যেতে লাগল। ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া জিহ্বায় কথা আটকে যাচ্ছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, কে যেন গলার খাদে শুকনো আটার গুড়ি বিছিয়ে দিয়েছে। হঠাৎই একটা রসালো ধারা সেই কণ্ঠনালিকে যেন ভিজিয়ে দিল। কুলু কুলু ধারায় খাল বেয়ে আসা নতুন বর্ষার ঢলের মতো। মনে মনে ভাবলেন, লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। তার সঙ্গে রসিকতা করছে। সত্যিই তো। আজকাল সাংবাদিকরাই তো আজরাইল। বিশেষ করে তার মতো ভুঁইফোড় ব্যবসায়ী আর নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের জন্য। এই তো সেদিন টাকার জোরে দলীয় টিকিটে এমপি হয়ে মন্ত্রিত্ব বাগিয়ে নেয়া এক নব্য রাজনীতিককে কী নাস্তানাবুদই না করল সাংবাদিকরা। মাত্র কয়েকদিন আগে হয়ে যাওয়া সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একসময়কার জনপ্রিয় তরুণ এমপি, কলামিস্ট, টিভি-টকার গোলাম মাওলা রনির জামানত বাজেয়াপ্ত হলো, সে তো এই সাংবাদিক আজরাইলদের জন্যই। হায়দার সাহেব কিছু একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু অস্ফুট একটা আর্তনাদের শব্দ তার কণ্ঠনালিতে আটকে গেল। এছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

আজরাইল সামান্য সামনে এগিয়ে এসে নিস্পৃহ স্বরে তাকে লক্ষ্য করে বলল, নিজেকে এত বেশি ক্লান্ত করো না। আর তো সময় নেই। এখন তো তোমাকে ছুটি দিতে হবে...

মৃত্যু! মরতে তো হবেই। অবশ্যই! তাই বলে এক্ষুণি? তাই কি হয় নাকি? না, সম্ভব না। আসলে তার মরারও সময় ছিল না। অন্তত এখন তো ছিলই না। একটা জীবন অনেক চেষ্টা-তদবির, দৌড়ঝাঁপ করে, নানা রকম ফন্দি-ফিকির করে, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, অসহায় লোকদের সর্বস্বান্ত করে সবে জীবনে কিছু সাফল্য এসেছে। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মতো বেশ কিছু টাকা হয়েছে। লোকজন একটু একটু করে চিনতে শুরু করেছে। এখনো খ্যাতির শীর্ষ বলতে যা বোঝায়, সেই যায়গায় পৌঁছতে পারেনি সে। আশা ছিল নিজ এলাকা থেকে ২০১৪-তে এমপি ইলেকশন করবেন। যত টাকাই লাগুক, প্রভাবশালী একটা রাজনৈতিক দল থেকে নমিনেশন কিনতে পারলে পাস করাটা ছিল নিশ্চিত। মনে মনে দলও ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার সব আশার গুড়ে বালি দিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি নির্বাচন বর্জন করে নির্বাচন ঠেকানোর আন্দোলন শুরু করলেন। হায়দার সাহেবের কাছে মনে হলো, এই যাত্রায় নির্বাচন হচ্ছে না। শুধু শুধু টাকা নষ্ট করে লাভ নেই। আগে সব সেটেল্ড হোক। তারপর হিসাব-নিকাশ করে দেখবেন, কোন দলের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই দল থেকেই নমিনেশন কিনবেন তিনি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। ভোটাররা ভোট দিক আর না-ই দিক, নির্বাচন কিন্তু ঠিকই হলো। সেই নির্বাচনে লন্ডনে রেস্টুরেন্টে ভাত বিক্রেতা সিলেটি ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগের টিকিট কিনে এমপি হয়ে মন্ত্রিত্ব বাগিয়ে নিয়ে এখন সভা-সমিতিতে নাকে শর্ষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর সামান্য ভুলের কারণে তার এখন আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এখানে ওখানে 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' করে যেতে হচ্ছে। এখন, এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা ভাবাও তো তার জন্য রসিকতা। না, এখন সে মোটেই মরতে পারবে না। মানে, এখনই অন্তত তার মরা উচিত হবে না। এই কথাটা যে কোনোভাবেই হোক আজরাইল সাহেবকে বোঝাতে হবে। শরীরের সব শক্তি দুই ঠোঁটে একত্র করে বহু কষ্টে ঠোঁট দুটোকে নাড়ান– না না, এখন হবে না। মানে, আসলেই এখন সময় নেই।

'জানেন?' আজরাইলের দুই ঠোঁটে হাসি খেলে যায়। সামান্য নড়ে আরো সামনে এগোয় সে। একেবারে কাছে এসে বিশাল স্কন্ধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কবে থেকে আপনারা মানুষেরা নিজেদের মৃত্যুক্ষণ নিজেরাই নির্ধারণ করছেন? তাও আবার আপনার মতো মানুষেরা!

হায়দার সাহেব তার সারা জীবনে এই প্রথম তীব্র ভয় অনুভব করেন। ছোট্ট শিশুর মতো তার চোয়ালগুলো কাঁপতে থাকে। দুই ঠোঁট আটকে আসে। তীব্র ভয় আর আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। এখন তার কেন যেন মনে হয়, লোকটা আসলে তার সঙ্গে রসিকতা করছে না। মনে হয়, লোকটা সত্যি

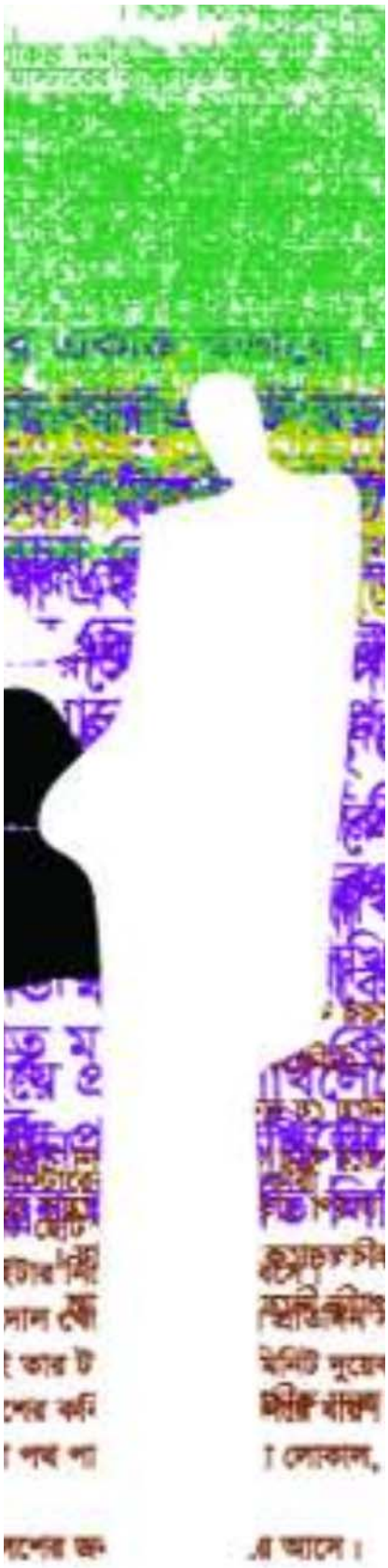

সত্যিই আজরাইল। ভয়ার্ত চোখে আজরাইলের দিকে তাকান। সত্যিই তো। আজরাইলই তো তার টেবিলের ওপাশে সামনের চেয়ারে বসে আছে। এতক্ষণে তার টেবিলের ওপরে সটান মেলে দেয়া পা দুটোর কথা মনে পড়ে। লোকটা যদি সাংবাদিক হতো, তাহলেও অনেক আগেই সেগুলো নামিয়ে ফেলা উচিত ছিল তার। দুটোকে টেবিলের ওপর থেকে বুকের কাছে গুটিয়ে আনতে চান তিনি। কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে অনুভব করেন, সেগুলো অসার হয়ে গেছে। বরফের মতো শক্ত, শীতল। তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামান্য নড়াচড়া করার মতো, এমনকি চোখের পলক ফেলার মতো শক্তিও তার শরীরে আর অবশিষ্ট নেই। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে, অনুনয়ের স্বরে বহু কষ্টে কোনো রকমে শুধু উচ্চারণ করতে পারেন– শুধু একটা সপ্তাহ সময় দিন; প্লিজ, দয়া করুন!

দাঁত বের করা হাসিতে আজরাইলের পুরো ঠোঁট যুগল খুলে যায়। বিশাল দেহের ওপর স্থাপিত এত বড় মাথাটা ঝাঁকিয়ে ভীতিকর ফেশফেশে গলায় জবাব দেয়, আজ পর্যন্ত কখনো কি শুনেছেন, আজরাইল কারো জান নিতে এসে তাকে সময় দিয়েছে? আমি আদিষ্ট এবং নিরুপায়। বুঝতে পারছেন?

সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলেন হায়দার সাহেব। নিঃশব্দ লোনা কান্না। চরম বেদনাগ্রস্ত আর দৈন্যদশাপূর্ণ সেই কান্না এতটাই তীব্র যে, তার চোয়ালগুলোও কাঁপতে থাকে। নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করেন। এবার তিনি আজরাইলের পায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করতে চান। কিন্তু তার পাগুলো যেভাবে টেবিলের ওপর সটানে মেলা ছিল, সেভাবেই মূর্তির মতো শক্ত হয়ে আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটা পর্যন্ত নাড়াতে পারছেন না তিনি। বুকের ভেতর জমা হওয়া আতঙ্কের পাথরটা ক্রমেই আরো ভারী হতে থাকে। বহু কষ্টে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কোনো রকমে শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলেন, অন্তত কয়েকটা মিনিট। আমাকে শুধু আমার ইচ্ছাপত্রটা লিখতে দিন। অনেকগুলো পরিকল্পনা ছিল। তিল তিল করে আমার এই প্রতিষ্ঠানটা আমি গড়ে তুলেছি। আজ এতগুলো মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। কতগুলো পরিবারের অন্ন-সংস্থান হচ্ছে এর মাধ্যমে। কত স্বপ্ন ছিল। কতকিছু করার ইচ্ছে ছিল। অনেক কাজ এখনো করা হয়নি। সবই তো বাকি রয়ে গেছে। অন্তত এটুকু তো পারবেন। পারবেন না?

রাগে আজরাইলের স্বর বলকানো ভাতের মতো তপ্ত আর উচ্চ হয়, স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া জীবনের এতগুলো বছরে যে কাজগুলো করতে পারেননি, এখন এই কয়েক মিনিটেই তা করতে চাইছেন?

হায়দার সাহেব কেঁপে ওঠেন। আজরাইল ঠিকই বলছে। সত্যি কথাটাই বলছে সে। সত্যিই তো। এতটা বছর সে কী করেছে? প্রকৃত অর্থে কিছুই করেনি। শুধু অন্যায়ের পর অন্যায়। পাপের পৃষ্ঠে পাপ। ভুলের ওপর ভুল। প্রতারণা আর প্রতারণা। চুরি আর চুরি। না, মাঝরাতে কারো অলক্ষে মালামাল নিয়ে দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়নি, বরং সসম্মানে, প্রকাশ্য দিবালোকে, সবার চোখের সামনেই চুরি করেছে। শুধু কেউ বুঝতে পারেনি। ঠিক অন্যরা যেমন করে। আর সব লোকদের মতো। জীবনের সমস্ত ছোট-বড় পাপ এক নিমেষে অশ্রুসজল তার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়ায়। হায়, এই অনুতাপপূর্ণ ক্ষণে এত এত অন্যায়, এত এত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করেই তাকে মরে যেতে হবে!

এই ভাবনায় আবারো কেঁপে ওঠেন হায়দার। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু গলা দিয়ে একচু শব্দও বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আগুনে পোড়া মাটির উনুনের মুখগহ্বরের মতো তার মুখগহ্বরটাও যেন পুড়ে খরখরে হয়ে আছে। মনে মনে ভাবেন, এগুলো সবই যেন স্বপ্ন হয়। তিক্ত দুঃস্বপ্ন। চোখের পলক ফেলা মাত্রই এই দুঃস্বপ্ন যেন জলের ওপরের বুদ্বুদের মতো নিমেষেই মিলিয়ে যায়। আর তিনি দেখতে পান, এগুলো ছিল শুধুই দুঃস্বপ্ন। পরাজিত অপরাধীর ভঙ্গিতে বলেন, শুধু একটা লাইন লেখার সুযোগ দিন। শুধু একটা লাইন।

আজরাইলের তিক্ত হাসির ভীতি তার সমস্ত অস্তিত্বে কাঁপুনি তোলে। গভীরভাবে তার দিকে লক্ষ করেন। এখন শুধু তার চোখের স্থলে কালো রঙের বড় বড় দুটি শূন্য গর্ত দেখা যাচ্ছে। মুখগহ্বরেরও অন্যসব মুখগহ্বরের সঙ্গে কোনো রকমের সাদৃশ্য নেই।

'ধরুন, একটা লাইন লেখার সুযোগ দিলাম। কী লিখবেন? যদি আপনার সব ইচ্ছার সারসংক্ষেপ এক লাইনে লিখতে পারেন, তাহলে অনুমতি দিলাম।'

অনুজ্জ্বল ক্ষীণ একটা আনন্দ-রেখা তার সারা মুখে প্রাণময় হয়ে ওঠে। বহু কষ্টে সিক্ত মুখে দ্রুত ঢোক গিলেন। বিশৃঙ্খল স্মৃতির কুঠরিটা তন্ন তন্ন করে হাতড়ে বেড়ান। স্মৃতিকোঠার অন্ধকার সরু গলির ভেতর থেকে নিপীড়িত দুঃখিনী মায়ের মুখখানা বেরিয়ে আসে; সেই চিরচেনা কপালের ভাঁজ এবং চিবুকের নিচের কুঞ্চনসহ। সারাক্ষণ যে মুখে যিকির আর দুচোখে অশ্রু জমে থাকে। ক'মাস হয় তাকে দেখতে যাওয়া হয়নি? এক মাস? না, আরো বেশি। শেষবার গিয়েছিলেন তার পৈতৃক বাড়ির দলিলটা আনতে। বাড়ি? বাড়িটা তো বিক্রিই করে দিয়েছিলেন। আর মাকে...

আহ্... এখন মনে পড়ছে। তাকে রেখে এসেছিলেন বৃদ্ধাশ্রমে। বলেছিলেন, ওখানেই তার জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে। ওখানেই তার ভালো সেবা-যত্ন হবে। তখন হায়দার সাহেবের রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা সবে জমে উঠতে শুরু করেছে। তারপর এই আট-দশ বছরে জাদুর টাকার মতো শুধু টাকা জমছে আর জমছে। আলাদিনের চেরাগও বোধ হয় এত টাকা দিতে পারত না। ব্যবসায় হায়দার সাহেব দিন দিন এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও ভুলে গেলেন। এখন তার চার-চারটা আবাসন প্রকল্প। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে, পূর্বাচলের

পাশে যে বিশাল জলমহাল পানির দরে কিনে রাতারাতি বালু ফেলে ভরাট করেছেন, শুধু এই এক প্রকল্প থেকেই যে টাকা আসছে, তা দেখলে চেরাগের মালিক খোদ আলাদিনও ভিরমি খেয়ে পড়ত। কিন্তু হঠাৎই কোত্থেকে যেন কাবাবের হাড্ডি হয়ে এসে পড়ল প্রভাবশালী এক পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতা। রাতারাতি জলমহাল ভরে শহরের নাগরিক পরিবেশ নষ্ট করছে অভিযোগ তুলে সংগঠনটির নেতা তার কাছে অনুদান চাইলেন। এক কোটি। টাকার অঙ্ক শুনে হায়দার সাহেবের নিজেরই ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এক নেতার ঘাটে এত টাকা না ঢেলে বিভিন্ন ঘাটে তার অর্ধেক কড়ি ফেলেই পরিবেশ অধিদপ্তরসহ রাজউকের ছাড়পত্রও বাগিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই পরিবেশবাদী নেতা কোথা দিয়ে কেমন করে যে মামলা নিয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে তার প্রজেক্টের ওপর ইনজ্যাংশন জারি করিয়ে দিয়েছে, তিনি বুঝতেও পারেননি। এই এক মহিলাই যে তাকে সাত ঘাটের পানি খাওয়াতে পারে, তা আগে জানলে তিনি সাত ঘাটের পরিবর্তে এক ঘাটেই কড়ি ফেলতেন। এখন নানা ঘাটে হেঁটে, হিসাব করে সবে দশ কোটি টাকায় মনে মনে বিষয়টি রফা করার একটা পথ বের করেছেন মাত্র। সেই দৌড়ঝাঁপের চাপে গত পাঁচ মাস ধরে মাকে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, তার কোনো খোঁজ-খবর নেয়ারও সুযোগ পাননি।

এসব না হয় বাদই দিলাম। এই বছরগুলোজুড়ে বৃদ্ধ মাকে কত কষ্টই না দিয়েছেন তিনি। তার মনে কত আঘাত দিয়েছেন। তার কত কান্না ভ্রুক্ষেপহীনভবে এড়িয়ে গেছেন। বাবার মৃত্যুর পর মা তার জীবন-যৌবনের সবটুকুই তো হায়দার সাহেবের জন্য নিংড়ে দিয়েছেন। এখন যতই এসব কথা ভাবছেন, ততই মায়ের কাছে নিজেকে লজ্জিত মনে হচ্ছে তার। আগে কেন এসব কথা ভাবেননি? অবসর ছিল না? এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, এ রকম ছোট্ট ছোট্ট সমস্যা, এসব গুরুত্বহীন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সময়ই ছিল না তার। এর চেয়ে অনেক বড় বড় কাজ তাকে সম্পন্ন করতে হতো। টাকা কামানো আর সমাজের উঁচু পর্যায়ে পৌঁছা কি এতই সহজ কাজ? সব সময় মনে মনে ভাবতেন, যখন তিনি একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন, যখন তার টাকা হবে, তখন মায়ের জন্য সব ধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দেবেন। পূর্ণকালীন একজন নার্স রেখে দেবেন, যে তার সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করবে। পরে ভেবেছেন, নার্স রাখা বাড়তি খরচ। বরং বিয়ে করবেন। বিয়ের পর তার স্ত্রীই মার দেখাশোনা করবে। বিয়ে অবশ্য করেছেন, কিন্তু এমন স্ত্রী যে...

সত্যিই, এই একটাই তো কত বড় পাপ তিনি করেছেন। কত মিথ্যা বলেছেন। কত ছলচাতুরি করেছেন। কত প্রতারণা। এক মুহূর্তের জন্য তার খালাতো বোনের অস্পষ্ট ফ্যাকাসে মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। অসহায় মেয়েটার মনটা কিভাবে ভেঙে দিয়েছেন তিনি। কত সরল বিশ্বাসে সবকিছু তাকে সপে দিয়েছিল মেয়েটা। অথচ শুধুমাত্র স্বার্থের টানে সুযোগ বুঝে সটকে পড়েছেন তিনি। তার খালা আর অসহায় খালাতো বোনটা তো কোনোদিন তাকে জোর-জবরদস্তি করেনি। তাহলে কেন তিনি তাদের বলতে পারেননি যে, ওর মতো অশিক্ষিত-ব্যাকডেটেড মেয়ের সঙ্গে সারাটা জীবন তিনি এক ছাদের নিচে কাটাতে পারবেন না। তা না বলে এতগুলো বছর আশা দিয়ে দিয়ে কেন তিনি তাদের ঠকিয়েছেন? আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী– সবাই জানত, হায়দারের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। এখনো পর্যন্ত মেয়েটার বিয়ে হয়নি। লজ্জায় সে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারে না। এসব কথা এখন তার মনে পড়ছে কেন! এতদিন কেন মনে পড়েনি? টাকা আর টাকা। টাকার মোহে এতদিন সবকিছু তার চোখের আড়াল হয়ে ছিল। এই টাকা অর্জনের জন্য কত মিথ্যা কসমই না খেয়েছেন তিনি। কতজনকে কত টাকা ঘুষ দিয়েছেন। কত ঘাটে কত চুরি করেছেন। কত অসহায় মানুষের বসতবাড়ি বিরান করেছেন। কত মানুষের বুকের স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছেন। টাকা... টাকা... শুধু টাকা। টাকা ছাড়া আর কিছুই তো তিনি চিনতেন না। এমনকি অন্যের মান-মর্যাদা ধূলিসাৎ করে দিয়েও তিনি শুধু টাকা অর্জন করতেন।

সম্মান... তার মনে পড়ে, এইমাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তার তরুণী পিএসের সঙ্গে...

আজরাইল আরো এক পা এগিয়ে আসে। সেই চোখমুখ অন্ধকার করা কর্কশ হাসিতে মাথা ঝাঁকায়। হায়দার সাহেবের ভাবনার জাল বুননের সুতায় গিট বেঁধে যায় তাতে। তাঁর বুকের গহিন থেকে একটা অনুতাপের অস্ফুট আর্তচিৎকার মাথা তুলে দেয়। কিন্তু আজরাইল এসব অপরাধী পাপী মানুষদের ভালো করেই চেনে। সে জানে, এ ধরনের মানুষদের যদি এক মিনিট, এক ঘণ্টা, এমনকি সৃষ্টি জগতের সবটুকু সময়ও সুযোগ দেয়া হয়, তাহলেও তারা যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। বরং যদি তার চেয়ে আরো খারাপ না হয়, সেটাই হবে বিস্ময়ের।

আরো কাছাকাছি আসে সে। কাছে, আরো কাছে। তার ভীতিকর দীর্ঘ ছায়াটা হায়দার সাহেবের সমস্ত মুখের ওপর পড়ে। চোখের সামনে নিকষ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না তিনি। আজরাইল উবু হয়ে তার চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এবার হায়দার সাহেব সম্বিত ফিরে পান। তবে কোনো রকমের একটু নড়াচড়া ছাড়া, কোনো একটা শব্দ উচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারেন না!

রুমের ভেতর এসির আরামদায়ক মৃদু শীতল হাওয়া নিঃশব্দে ঘুরছে। সেই মৃদু হাওয়ায় টেবিলের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাফনের মতো সাদা কাগজগুলো থেকে থেকে নিঃশব্দে নড়ে উঠছে। ভীতিকর নিঃশব্দ নিশ্চল রুমের ভেতর ইজি চেয়ারে গলা অবধি গা এলানো আর সামনের টেবিলের ওপর সটানে পা মেলা অবস্থায় বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন হায়দার সাহেব।

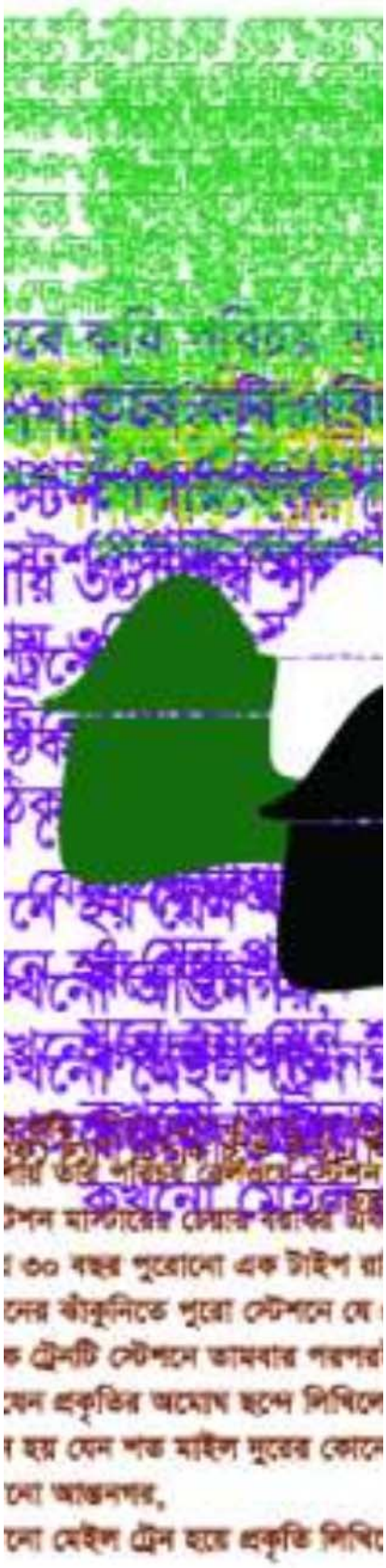

গল্প

বাউল

সমীর আহমেদ

আমি কাল কাটাইলাম পথে পথে ঘুরে,
পাগল মন রে।
কোথাও পাই না পথের দিশা, দুই নয়নে
আজও নিশা
জানি না সেই পথ যে কত দূরে।

হায়রে, কত রঙ্গের পথিক পথে হাঁটে
কারও সঙ্গে মিললো না মন হৃদয় নদীর ঘাটে,
একা একা হেঁটে বেড়াই, সঙ্গহীন সঙ্গী সঙ্গে
করে।

আছে এক বনের পাখি, সারাক্ষণ ডাকাডাকি
করে এই খাঁচায়
যতই তারে ভালবাসি, সেই উদাসী বনের
দিকেই চায়;
জানি, সুযোগ পেলে থাকবে না আর, যাবেই
যে সে উড়ে।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে হইলাম ঘরছাড়া
আজকে দেখি পথ আমারে দিচ্ছে ঘরের তাড়া,
এই অবেলায় এই অধমরে আর কে নিবে ঘরে?

আমাগো আইজও মনে পড়ে, তারে পরথম
আমরা দেকছিলাম, তিন মাতার মোড়ে,
ডালপালা ছড়ায়া খাড়ায়া থাহা বড়সড় এট্টা
বটগাছের নিচে; খিরকি পইরা একতারা

বাজায়া, নাইচ্যা নাইচ্যা গান গাইতে। পড়ন্ত বিকাল তহন। বেশি দশ্‌শক হেইহানে ছিল না। যারা হারাদিন ক্ষেতে কাম কইরা ক্লান্ত অইয়া বাড়ি ফিরছিল, তারাই এই মনকাড়া গানের সুরে চমকায়া, মাডিতে গজায়া উডা সবুজ বিচালি ঘাসের ওপর একজনের পাশে আরেকজন আলগোছে বইয়া পড়ছিল। কেউ কুনো কতাবর্তা কইছিল না। এক্কেবারে গানের সুরের মদ্যে মইজ্যা গেছিল। মইজ্যা যাওয়ার কতাও। কারণ গায়ক তার বেতর থাইক্যা সুরের সবটুকু মধু নিংড়ায়া আইন্যা গলায় মাহাইয়া ছাইড়া দিছিল। আর হেই সুধা পান কইরা সবাই কেমন চুপ অইয়া গেছিল। গান শ্যাষ অইলে গায়ক তার জোলাডার পাশে বইয়া পললেও কেউ কুনো কতা কইবার সাহস পায় নাই। মনে অয় তারা তহনও সুরের মদ্যে ডুইব্যা আপন মনে তা বাজায়া যাইতেছিল। বাজানোডা শ্যাষ অইলে হয়তো তাগো কেউ কেউ বৃদ্দ গায়করে আরেট্টা গান গাওয়ার জন্য অনুরোদ করতো। আর বৃদ্দ গায়কও খুশি অইয়া দ্বিতীয় গানে আগের চাইয়াও বেশি দরদ দিয়া সুর তুলতো। কিন্তু তার আগেই আমরা হেইহানে আইয়া খাড়াই। লোকটার দিকে বাল কইরা চাই। চুল-দাঁড়ি সবই দবদবে শাদা এবং বেশ লম্বা। পেট্টা এট্টু উঁচু, মানে বুড়ি অইয়া গ্যাছে গ্যা। চেহারাহান বেশ উজ্জ্বল। চাইয়া থাকপার মনে চায়। ক্রমে চরপাশে নিরালে নাইমা যাওয়া আন্দারের মদ্যেও তা ঝলকায়া উটছিল। পরথমে তারে দ্যাকলে যে কেউ দাক্কা খাইব – আরে এ যে দেহি সাক্কাত আমাগো লালন সাঁই। তবে সাঁইজির চেহারাহান যাগো মগজের মদ্যে আইজও গাঁইত্যা রইছে তাগো মনে কিছুডা খটকা লাগে। বাবে বিন্ন কতা। আমাগো গিরামের সবচায়া তেড়া পোলা মুকছেদ আলী তো তারে জিগায়াই ফালায়, আপনি ক্যাডা? হে সরাসরি কোনো জবাব দেয় না। এট্টু মুচকি হাসি ছড়ায়া কয়, আমি? সত্যিই তো বাবা, আমি ক্যাডা? আমি তো কেউ না, কিম্বা দরো, আমি, আমিই। তার জবাব হুইনা আমরা সবাই ব্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাই, আর মনে মনে কই, এইডা আবার কীরম কতা? বুজবার পাললাম না তো। হে তহন মুচকি হাইস্যা কয়, জগতের সবকিছু কি বুজা যায়, বাপ! জীবন ও জগত কত যে রহস্যময়, বুজতে চাইয়া আইজও কিছু বুজা অইলো না। তারপর গুনগুন কইরা হে গান ধরে,

আমি বুজতে গিয়া পড়লাম ফান্দে,
সদাই কার লাইগা যে মন কান্দে
জানা হইলো না।
গুরু, সংসার ধর্ম হইলো না।
বুজতে চাইলাম কতকিছু
এ জীবনে বুজা হইল না।
পথে পথে ঘুরলাম কত
গুরু, তোমার দেখা পাইলাম না।

এই গানডাও আমাগো বেশ বালই লাগতেছিল। আমরা মন দিয়া হুনতেছিলাম। কিন্তু আমাগো ব্যাক্কেল্যা নূরু খালাসি তারে ফট কইরা জিগায়, আপনার দ্যাশ কোতায় গো বাপ? লোকটি গুনগুন থামায়া কিছুক্ষণ চুপ কইরা থাহে। তারপর গম্বীর সুরে কয়, দ্যাশ! দ্যাশ আবার কোতায় অইব। যহন যে দ্যাশে যাই, তহন হেই দ্যাশই আমার। তারপর একতারায় টুকা দিয়া আবার সুর ধরে–

যেথায় গেলে তোমার সাথে আমার মন মিশে,
আমারে নিয়া চল সেই দেশে।

ব্যাক্কেল্যা নুরু খালাসি তবু যদি থামে, গানডা তারে শ্যাষ করবার না দিয়াই কয়, আপনার খালি প্যাঁচের কতা। মাতামুণ্ডু কিছুই বুজি না আমরা।

লোকটি গান থামায়া পাতলা আন্দারের মদ্যেই তার মিহি চাইয়া থাহে। কী বাবে কেডা জানে! হয় তো তারে আমাগো লাহান মনে মনে ব্যাক্কেলই বাবে। নুরু খালাসির ওপর আমাগো খুব রাগ অইতে থাহে। সুময়গুময়, মানুষজন কিচ্ছু বুজে না, যহনতহন কতার মদ্যে খালি বাও আত দ্যায়। বয়স অইল, চুলদাড়ি পাকলো, তবু আইজও তার বুজজ্ঞান কিচ্ছু অইল না। আদম আলী শ্যাক তো তারে পিরায় এট্টা ধমকই লাগায়। কানের কাছে মুখ নিয়া ফিসফিসায়া কয়, চুপ থাহো, এত কতা কও ক্যা?

হে কয়, খারাপ কিছু কী কইলাম, মিয়া? জানবার মুনে চাইল, তাই।

এইবার আদম আলী শ্যাক হয়তো তারে আগের চাইয়া জোরে এট্টা ধমকই লাগাইতো। কিন্তু তার আগেই কতা কইয়া ফালায় লোকটি। আমি সুজাসাপ্টা কতাই কই, বাপ। তয় কতা অইল কী, মানুষ সহজ কতা সহজে বুজে না। সরল পথে সরলে চলে না। জগতসংসারে এই পথে চলাও খুব কডিন। আসলে যত সহজ বলে, তত সহজ না, যত সরল বলে তত সরল না। তবে যে বুজার হে সহজেই বুজে, সরলেই চলে, বাপ।

মুকছেদ আলী কয়, এই তো কতার মদ্যে দিলেন এট্টা প্যাঁচ মাইরা। এই সব কতার আমরা কী বুজি? এক আনাও বুজি না। তার চাইয়া কন, আইজ রাইতে আপনি কোতায় থাকপেন?

লোকটি মিটমিটায়া হাসে। হাইজা আন্দারেরর মদ্যেও তার হাসি বেশ ঝকমক কইরা উডে। হে কয়, দয়াল, যেইহানে রাহে, হেইহানেই। এই বডতলায়?

লোকটি কিছু কয় না। হটাৎ মুকছেদ আলীর ওপরও আমাগো খুব রাগ অইতে থাহে। এত কতা কওনের দরকারডা কী ওর? কিন্তু আমরা কেউ তারে কিছু কই না। লোকটির মিহি চাইয়া থাহি। আহা! কী অসহায় লোকটি!

রাইতবিরাতে এট্টু থাহার জায়গাও নাই! কিন্তু আমরাই বা কী করুম? চিনা নাই, জানা নাই। বেগানা পুরুষ। ক্যাডা তারে রাইতহান রাহার দায়দায়িত্ব নিবো।

আন্দার আস্তে আস্তে গন অইয়া উটছে। আমাগো কারও আর এইহানে দেরি করা উচিত না। বাড়ির মিহি পাও বাড়ান দরকার। কিন্তু লোকটির প্রতি আমাগো সবারই টান এমনই যে, আমরা তারে এইহানে একলা ফালায়া বাড়ির মিহি সহজে পাও বাড়াইবার পারছিলাম না। আবার তারে আমাগো হাথে কইরা নিয়া যামু, হেই উপায়ই বা কই? কিছুডা চিনপরিচয় থাকলে না অয় কতা অইতো। হাথে কইরা নিয়া যাওয়া যাইতো। নিজেরা যেহানে থাহি, হেইহানেই রাহা যাইতো। কিন্তু এই অচেনা মানুষটারে নিয়া আমরা কই রাহুম। নিজেগোই, বলা চলে, বালো মত মাতা গুজার ঠাই নাই। খাওয়াপরার ম্যালা কষ্ট। ক্ষেতখামারে কাম কইরা, বউপোলাপান নিয়া, এই দুর্মূল্যের বাজারে কুনোমতে টিক্কা আছি।

আমাগো গিরামে তারে রাহার একমাত্তর ক্ষমতা আছে বাছেত মোল্লার। আল্লায় তারে সহায়সম্পদ বালই দিছে। তাছাড়া হে কিছুডা গানপাগল মানুষও। ইস, এই সুময় হে যদি এইহানে থাকতো! তাইলে লোকটির এট্টা গতি অইতো। আর কী আচ্চায্য ব্যাপারস্যাপার, হেই সুময় হে আমাগো পেছন থেইক্যা কতা কইয়া উডে। কুন ফাঁকে যে হে আমাগো পিছনে আইয়া খাড়ায়া রইছে, আমরা কেউ টেরই পাই নাই। কতা না কইলে আমরা কেউ হয়তো বুজতেই পারতাম না, হে আছে। বাছেত মোল্লা কয়, আইজ রাইতে আমার বাড়িতে চলেন। দিন কতক থাহেন। আমাগো গান হুনায়েন।

লোকটি কয়, সবই দয়ালের ইচ্ছা। সবই তোমার লীলা গো সাঁই, সবই তোমার লীলা। চলেন। সে উঠে। ঝোলাডা কান্দে নেয়। একতারাটা হাতে নিয়া হাঁটতে থাহে বাছেত মোল্লার পিছু পিছু। আমরা তাগো পেছনে হাঁডতে হাঁডতে কই, এইবার তাইলে কিছুদিন গান হুনোন যাইবো।

এক রাইত কিম্বা কয়েকটা দিন বাছেত মোল্লার বাড়িতে তার থাহার কথা ছিল। কিন্তু হে দিব্যি কাডায়া দিল পিরায় দুইডা বছর। এই দুই বছরে ম্যালা বালোমন্দ কতাবার্তা তার নামে গিরামে ছড়ায়া পড়ছিল। তবে হে এসব পাত্তা দেয় নাই। বাছেত মোল্লাও না। হে তো তিন দিনের মাতায় তার মুরিদ অইয়া তারে এট্টা ঘরই ছাইড়া দিছিল। তার বউ-পোলাপানও লোকটির খুব বক্ত অইয়া গেছিল। সব সুময় তার সেবাযত্নে অস্থির। বাছেত মোল্লা কইতো, এমুন সোনার মানুষ, এযুগে অয় না। বহুদিন মনে ইচ্ছা আছিল, একজন বালো মানুষ যদি পাইতাম, মুরিদ অইতাম। দয়াল আমার হেই বাসনা পুরণ কইরা দিছে। তোমরাও বায়াত লও। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুজো মিয়ারা। আমরা বায়াত নিমু কি নিমু না, সিদ্ধান্ত নিবার পারছিলাম না। তবে ঠিকই হাইনজাবেলা ওই বাড়িত গান হুনবার যাইতাম। তার গান হুনলে মনডা কেমুন যানি আকুলিবিকুলি করতো। মনে অইতো জগতসংসার সব মিছা। সবকিছু ছাইড়া দিয়া তার হাথে কোতাও চইলা যাই। আমাগো

মদ্যে অনেকেই তলে তলে ঠিকই তার বায়াত নিয়া মুরিদ অইয়া গেছিল। মুরিদ অওয়ার পর তাগো কতাবার্তা, চালচলনও কেমুন যানি বদলাইয়া যাইতেছিল। সব সুময় মুহে গুরু গুরু – গুরুপদে প্রেমভক্তি হইলো না মন হবার কালে/আর কি রে তোর সাধনভজন হবে অনুরাগের সময় গেলে। এই সব গানে সুর দিয়াই ওরা কেমুন চক্ষের পানি ফেলতো। এসব আমাগো অনেকেরই মোটেও বালো লাগতো না। আমরা বাবতাম, এই সামান্য কতায় এত কান্দনের কী আছে?

আমাগো গিরামে যারা তার মুরিদ, তারা গান শ্যাষে কিম্বা বিশেষ কোনো সুময় তার কাছে বইয়া দীক্ষা নিতো। হেই সুময় ওই ঘরে, তার কাছে যাওয়ার কারো অনুমতি মিলতো না। ওই সুময় আসলে গুরু-শিষ্যর মদ্যে কী অয়, কিম্বা কী আলাপসালাপ অয় তা আমরা কেউই জানতাম না। কিন্তু আমাগো তা জানার খুবই ইচ্ছা। আমাগো মদ্যে যারা তার মুরিদ অইয়া খেদমতে মন মজাইছে, তাগো জিগাইলে কয়, এই সব কতা কওন গুরুর নিষেধ। জানবার, যদি এতই ইচ্ছা তার বায়াত লও।

আমরা কী করুম, ঠিক বুজবার পারছিলাম না। আমাগো গিরামের অনেক বউ-ঝিও তার মুরিদ। তাগো হাথে গোপনে তার কী কতা অয়, কী করে, তা নিয়া ম্যালা কানাঘুষা অয়। যারা পীর-ফকিরে মোটেও বিশ্বাস করে না, মসজিদে গিয়া নামাজ পড়াই যাগো পুরধান কাম, তারা কয়, নাফরমানি, বেজায়েজ কাম অইতেছে বাছেত মোল্লার বাড়িত। এসব সহ্য করাও মহাপাপের কাম। অরা মসজিদে আহে না। নামাজ পড়ে না। রোজা করে না। একেবারে ভন্ড। ওই ভণ্ড ফকিররে গিরাম ছাড়া না করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে অইবো সবার। তাই ফকিররে তাড়ানোর লাইগা তলে তলে আমরাও জোটবদ্দ অই। বাছেত মোল্লার ক্ষমতারেও আমরা ডরাই না। একদিন বেশ আটগাট অইয়া তার গানের আসরে যাই। কিন্তু তার দিকে তাকায়া আমরা কেমুন যানি বদলায়া যাই। আসরে বইয়া চুপ কইরা গান হুনি। গান শ্যাষ অইলে, হে কয়, তোমরা আইছো বাবারা। তোমাগো কষ্ট করতে অইবো না। সুময় অইলেই আমি চইলা যামু।

আমাগো উদ্দেশ্য হে বুজবার পাললো কী কইরা, তা বাইবা আমরা বেশ অবাক অই। মরমে মইরা যাই। কয়দিন আর ওই মিহি গান হুনবারও যাই না। কিন্তু কয়দিন পর আবার আমরা মানুষের কতাবার্তায় উস্কায়া যাই। ম্যাচের কাডির লাহান জ্বইলা উডি। না, গিরামে আসলেও এইসব অনাচার ঘডতে দেওন ঠিক না। এইবার আমাগো দল আরও ভারি অয়। ঠিক করি, এইবার আর গান হুনাহুনির মদ্যে নাই। যাইয়াই এট্টা রফাফা কইরা ফালামু। ফকিররে গিরাম থেইক্যা বাইর কইরা দিমুই দিমু। কেউ বাদা দিলে হুনুম না। বাছেত মোল্লা সামনে আইয়া খাড়াইলেও সরুম না। পুরয়জনে রক্তারক্তি অইয়া যাইবো। আমরা দিনক্ষণও একেবারে ঠিক কইরা ফালাই। আগামী শুক্কুরবার বাদ জুমা। দলেবলে লাঠিসোটা নিয়া হামলা করুম বাছেত মোল্লার বাড়ি।

শুক্কুরবার দিন সকল প্রস্তুতি নিয়াই আমরা মসজিদে যাই। নামাজ পড়ি। নামাজ পইড়া বাইর অইয়া যহন ওই রওয়ানা অই এবং কিছুডা পত আগায়াও যাই, বলা চলে বাড়ির খুব কাছাকাছি, তহন ওই বাড়ি থেইক্যা কান্দনের শব্দ বাইসা আহে। আরও কিছুদূর যাইয়া বুজবার পারি, ফকির আর নাই। এই দুন্নাই ছাইড়া চইলা গ্যাছে। আমাগো মদ্যে অনেকেই হাফ ছাইড়া বাঁচে। যাইক মইরা বালোই অইছে। শ্যাষমেশ রক্তারক্তি কান্ডডা ঘডানোর আর পুরয়জন অইলো না। হালটেই থাইমা যাই আমরা। বাড়িতে ঢুকি না। কেউ কেউ যার যার বাড়ির মিহি পা বাড়ায়। কেউ আবার বাড়ির কতা কইয়া গোপনে বাছেত মোল্লার বাড়িতে ঢুকে, হয়তো ফকিরকে একনজর দেহার লাইগাই, কিম্বা, তার শিষ্যগো শোকতাপ দেহার লাইগা। আমরা অনেকে হালটেই খাড়ায়া থাহি। বাড়ির মিহি যহন পা

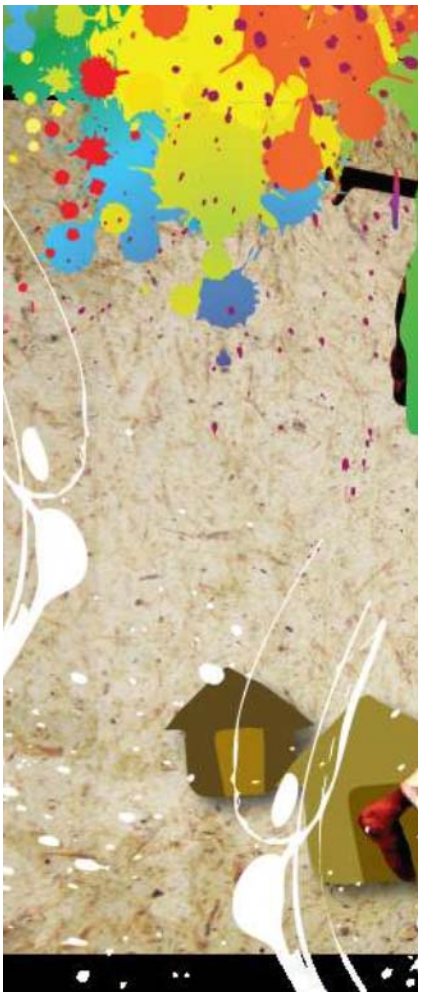

বাড়াইবো, তহন, আমাগো দলের আনিস মিরদ্দা, যে কিনা দুইদিন আগে গাঙ পার অইয়া ফরিদপুর গেছিল তার মেয়ের জামাই বাড়ি, নাতিন অইছে, দেহার লাইগা। মেয়ে-জামাই, বিয়াই-বিয়াইন নাকি খুব জোরাজুরি করছিল তারে আরও কয়ডাদিন রাহার লাইগা। তারও খুব ইচ্ছা আছিল থাহার। কিন্তু গিরাম থেইক্যা ভণ্ড ফকির তাড়ানোর লাহান এত বড় এট্টা ছওয়াবের কাম অইতে হে নিজেরে বঞ্চিত করবার চায় াই নাই। তাই সকাল সকাল বাইর অইয়া পড়ছিল জুম্মা ধরার লাইগা। কিন্তু খেয়াঘাডে নাও ছাড়তে দেরি অওয়ায় জুম্মা সে ধরবার পারে নাই। আরে মিয়া জুম্মা ধইরা লাভই বা কী? হে কয়, যার জন্য এত কষ্ট কইরা আমার আহা, গাঙ পার অইয়া তারে দেহি খেয়া খাডে। আমারে দেইক্কা হাইস্যা কইল, খালাসি নাতিন দেইক্কা আইলা। আমি তো অবাক, নাতিনের খবর হে পাইলো ক্যামনে! বাবলাম, গিরামের কারও মুহে হয়তো হুনছে হে। তহনই কয়েক ঘা বহাইয়া দিবার পারতাম। কিন্তু তার মিহি চাইতেই এমুন মাইয়া লাগলো, কিছু আর কইবার পাললাম না। বরং জিগাইলাম, ফকির সাব কই যান? হে হাইস্যা কইলো, যাইগা। তারপরই হে নায় উটলো। হাতে হেই একতারা। কান্দে হেই ঝোলাডা। মুহে হেই দাড়ি। এহনও চক্ষে লাইগা আছে।

আমরা তারে জোরে এট্টা ধমক লাগাই, দুর মিয়া কী যে কও! ফকির গাঙ পার অইবো ক্যামনে? হে তো কিছুক্ষণ আগে মারা গ্যাছে। মড়ার কান্দন হুনো না?

বাছেত মোল্লার বাড়ি থেকে তহনও কান্দনের সুর বাইসা আহে। কিন্তু হে, মুনে অয় কিছুতেই বিশ্বাস করবার পারে না। ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া খাড়াইয়া থাহে, মিনমিন কইরা কয়, কিন্তু আমি যে তারে দ্যাকলাম। আমার মিহি চাইয়া কয়, বিশ্বাস কর রহমান ভাই, আমি তারে সত্যিই খেয়াঘাডে দ্যাকছি। একবিন্দু মিছা কই নাই।

হেই সুময় মড়াবাড়ি থেইক্যা ফিরতে ছিল কাসেদ ব্যাপারি। যে কিনা আমাগো দলেরই লোক ছিল, দিন কতক আগে গোপনে বায়াত নিছে ফকিরের, তার চোখে পানি, মুকখান ব্যাদনায় এক্কেবারে কালা। হে কয়, তুমরা খালি তার বদনামই করলা। মানুষটারে চিনলা না। যাইয়া দ্যাহো গা মিয়ারা কী সুন্দর মানুষ। মরার পরও তার গায়ের রঙ কেমুন ঝলকাইতেছে। মুনে অয় নূরের আলো। সোনার মানুষ না অইলে, খাঁডি মানুষ না অইলে এমুন অয় কুনোদিন? কয়দিন আগেই গুরু কইছিল, তার যাওয়ার সময় অইয়া গেছে। আর থাকপার পারবো না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে হে চইলা যাইবো, ক্যাডা জানতো?

হু হু কইরা কাইন্দা উডে হে। তার দিকে অবাক চোখে চাইয়া থাহে খালাসি। কোনডা সত্য, কোনডা মিত্যা, আমরা বুজবার পারি না। আমাগো মাতা ঘুরো, টাসকি লাইগা যায়।

গল্প

অথচ একা

দিলরুবা আহমেদ

ঘুটঘুটে অন্ধকারে সোহাগীর চোখ কিলবিলিয়ে ওঠে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ বন্ধ করে আবার খুলে। অন্ধকার খানিকটা সরে যায়। রান্নাঘরের হারিকেনটা নিভিয়ে বেরিয়েছে। পেছন ফিরে রান্নাঘরের হুকটাও লাগিয়ে দেয়। রাতের খাবারের পাট চুকেছে। ক'দিন ধরে কামলার বউটা আসে না। তাকেই এখন সব দেখতে হয়, করতে হয়। কামলার বউটা নাকি আবার পোয়াতি। ক'দিন পর পর বাচ্চা ছাড়ে। মুরগি যেন। সেই মেয়ে অসুস্থ হলে তার কাজ বেড়ে যায়। এত কাজ করতে কার ভালো লাগে। সবার সব কাজ তাকেই এক হাতে সামলাতে হচ্ছে। স্বাধীনতার বাবা বেঁচে থাকতে কাজ করতে তার এত খারাপ লাগত না। মনে হতো তার সংসারের কাজ সে করছে, এ আর এমন কি! এখন বুঝতে পারে না, এটা আদৌ তার সংসার কিনা। বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেন ফেললো কে জানে। আজকাল প্রায়ই পড়ে। দূরে কোথাও কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। তারপরে বোধ হয় শিয়ালও। পাড়াটা নিঝুম হয়ে আসছে। রাতের ক'টা হবে? ১০টা মনে হয়। ৯টাও হতে পারে। পাড়া গাঁয়ের নিশুতি রাত। বাতাস বইছে। প্রচণ্ড বাতাস। শন শন শব্দ। যেন কাঁদছে কেউ। সহসাই ঝড় উঠবে।

ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে সে এক দৌড়ে ঘরে

ঢোকে। তাকে দেখে কোত্থেকে যেন একটা টিকটিকি শব্দ করে উঠলো, টিক টিক টিক। ঘরে ঢুকেই পেছন দিক্কার এই দরজাটাও বন্ধ করে। ঘরের ভেতরে বেশ তাপ। সোহাগীর ভালো লাগে। সামনের লম্বা গলির মতন জায়গাটায় ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছে। বা দিকে সারি সারি ঘর। ডানে একটাই অনেক বড় ঘর। বৈঠক খানা। শেষ মাথায় শহীদের ঘর। অনেকদূরে। আসলেই অনেক যেন দূরে। সোহাগীর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এগিয়ে এসে প্রদীপটা হাতে নেয়। স্বাধীনতার বাবা সেবার রানীগঞ্জের মেলা থেকে এনেছিল। ৮টা। ননদ-ননাসরা বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসে দুটো একটা করে নিয়ে গিয়ে এখন রয়েছে মোটে তিনটা। প্রদীপটার গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। সোনা রং ছিল। সময়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কাল তেঁতুল দিয়ে ধুয়ে দেবে। ভাবে করবে না কিছু আর তারপরও সবই করে।

বড় ফুপু-শাশুড়ির ঘর থেকে কোরআন শরীফ পড়ার আওয়াজ আসছে। এমন নিঝুম রাতগুলোতে কিংবা খুব ভোরে যখন উনি কোরআন নিয়ে বসেন তখন সোহাগীর কান দুটো নিজের থেকেই খাড়া হয়ে যায়। শুনতে তার যে কি ভালো লাগে। অথচ কোরআন শরীফের একটা অক্ষরেরও বাংলা জানে না। কি বলা হয়েছে বুঝতে পারে না। বড় জানতে ইচ্ছে হয়। আহা বিদ্যার দৌড় তো ওই সুরা মুখস্থ আর কোরআন পড়া পর্যন্ত। তাও যদি ঠিকভাবে হত। খুব ছোট বেলায় কয়েকদিন গিয়েছিল স্কুলে। তেমন করে কিছু মনেও এখন আর পড়ে না। শুধু মনে আছে স্কুলের মাঠে একটা বিশাল আমগাছ ছিল, অনেক বড়। সে গুনে রাখতে চাইতো, কয়টা আম আছে, কয়টা পড়েছে। কিন্তু কখনই তার গোনা শেষ হতো না। ৫৫ এর পরে সে তখন আর গুনতেও পারতো না। অথচ এখন তো সে দিব্যি সংসারের হিসাব মিলায়।

ফরিদ মাস্টার বলতেন অমন রূপের মাথায় শুধুই ডাল। ডাল কি খারাপ। সোহাগী বুঝে না। তখনও বুঝতো না। এখনও না। বিয়ের পর পরই স্বাধীনতার বাবা যখন তাকে পড়াতে বসাতো, তখন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল,

: হ্যাঁ গো তোমার কি মনে হয় আমি পড়তে পারবো?

সে মানুষটা হেসে বললো,

: না পারার কী আছে।

স্বাধীনতার বাবা সবসময় এই করেছে, বলেছে, সে সব পারবে, হেসে হেসে সাহস দিয়ে বলেছে, পারবে। বলেই গেছে শেষদিন পর্যন্ত। সে উত্তরে বলেছিল,

: তাহলে যে ফরিদ স্যার বলতেন আমার মাথায় নাকি ডালে ভরা।

: মাথায় তো শুনেছি গোবর থাকে, এই ডাল এলো কোত্থেকে? মসুরের ডাল না মুগ ডাল? সোহাগী তা জানবে কোত্থেকে। স্বাধীনতার বাবা যা জানে না তা সে জানবে কেমন করে!! তবে এটা বোঝে গোবরের চেয়ে ডাল ভালো।

শহীদ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হাতে কি একটা ইশারা করে ভাইকে বলেছিল, ভাইয়া ভাবীর ডাল ব্রেইন। বলে সে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল । ইউনিভার্সিটিতে সবে কিছুদিন হয় শহীদ ভর্তি হয়েছে। সব কিছুতেই কিছু না কিছু বক্তব্য দিত। তার বয়স তখন ১৪ হলে শহীদ ছিল ২১ বছর মনে হয়। তবে তার কথাতে স্বাধীনতার বাবা 'ও বুঝেছি' বলে হাসতে শুরু করেছিল। মানুষটা না বুঝে কিছু পারে। সব জানে। তবে এত হাসার কি হলো। সোহাগী খুব অবাক হয়ে লজ্জাও পেয়েছিল। নিশ্চয়ই কোনো বোকামী করেছে সে। সে চেয়ে আছে দেখে হেসে বলেছিল,

: তোমার মাথা একেবারে ডাল গো সোনা এক্কেবারে ডাল, মনে হয় সোনামুগ ডালে ভরা। সেই কবেকার কথা, মনে হয় বুঝি এই সেদিনের কথা। অর্থটা বলেনি। সুযোগ পেলেই ডেকেছে কই গেল আমার ডাল মাখাওয়ালী বৌ। কিংবা বলতো ডালওয়ালী ডল। ডল মানে পুতুল। এটা সে জানে। সোহাগী ধৈর্য ধরে ছিল একদিন জেনে যাবে। ভেবেছিল একদিন লেখাপড়া করে নিজেই জেনে নেবে। ঠিক করে রেখেছিল নাহলে শহীদকেই না হয় জিজ্ঞেস করে নেবে।

কিন্তু তার সেই লেখাপড়ার পাট কবেই চুকে বুকে গেছে। স্বাধীনতার বাবা থাকতেই পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার বাবা মেতে উঠেন গ্রাম নিয়ে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সংসার নিয়ে। গভীর রাত ছাড়া দুজনার দেখাই হতো না। তবুও মানুষটাকে তার বড় ভালো লাগতো। ভালোবাসতো। বড় পছন্দের একজন মানুষ।

সোহাগী দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে।

নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুলগুলো শক্ত করে টেনে বাঁধে। আয়নার দিকে তাকাতে মন চায় না। প্রদীপটা নিভিয়ে দেয়। শূন্যঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। স্বাধীনটা যে কোথায়। চাচা তার এত বড় নাম রেখেছে। সারা গ্রামের মানুষ এমন নাম মনে হয় জীবনেও শুনে নাই। প্রথমটায় কেউ ডাকতেও পারতো না। দাঁত ভাঙতো। এখন পারে। সবাই পারে। স্বাধীন দেশের নাগরিক তারা স্বাধীনতা কেনই বা বলতে পারবে না শহীদ এই বলে জোর করেই নামটা রেখেদিল। শহীদ কত আদর করতো এই মেয়েকে। নাহ্ এখনও করে। অনেক করে। তবে বদলে গেছে শহীদ। তাকে দেখলেই অন্যদিকে চলে যায়। একেবারেই যেন সহ্য করতে পারে না। সোহাগী আবারো বড় করে একটা শ্বাস ফেলে।

কেও অবহেলা করলে তার বড় কষ্ট হয়। শহীদ তাকে কেবলই অবহেলা করছে। বলেছেও সবার সামনে চিল্লায়ে চিল্লায়ে আমার জীবনটাতো আমি শহীদ করে দিলাম আপনাদের জন্য। আর কী চান? এবার আমাকে একটু একা থাকতে দেন। শ্বশুর মশাইয়ের মুখের ওপর বলেছিল। তার পুরনো ওই ছোট শেষ কোণার রুমটাতে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল। সোহাগীর প্রায়ই মনে হয় ওই রুমেই সে ঢুকে গেছে আর বেরুবে না।

বাসরঘরে সেদিনও সে একা একা বসে ছিল সারারাত। এমনি বহুরাত সে জেগে আছে। জেগে থাকে। ঘুম আসে না।

কী নীরব এই বাড়ি! ফুপু আম্মার কোরআন পড়া ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বাড়িটাই যেন এক কবরখানা। সোহাগীর বড় ভয় করে। কবরের ভেতর মানুষটা কেমন করে শুয়ে রয়েছে কে জানে। নড়তে পারে না চড়তে পারে না। একইভাবে এতদিন। প্রায় তিন বছর হতে চললো তো। কত দিন কত রাত পার হয়ে গেছে ওই মানুষকে ছাড়া। বড় ভয় ভয় করে। সে দ্রুত ফুপু আম্মার ঘরে ঢুকে পড়ে। ফুপু আম্মার পাশে শাশুড়িও বসা। মাটিতে বসে খাটে হেলান দিয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। যেন ধ্যানে বসেছেন। ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকেই বড় উদাসীন তিনি। নিজে বেঁচে রয়েছেন, অথচ এত বড় একটা ছেলে চলে গেল ধাপ করে। কার সয়! প্রায়ই বিলাপ করেন, কেন যে ছেলেটা রাজনীতি করতে গেল। ইলেকশনে দাঁড়ালো। এক রাতে ডেকে নিল তারপরে পাওয়া গেল তিনদিন পরে ঝিলের ধারে। হাত দুটো বাঁধা দিল পেছনে। আহা কী কষ্ট পেয়েছে মানুষটা মরবার সময়। দলাদলি করে জীবন গেল মানুষটার। মানুষটার সাথে তার মায়ের চেহারারাও অনেক মিল। তার মাকে দেখতে এই মুহূর্তে অনেকটা ছেলের মতন দেখাচ্ছে। শাশুড়িকে সোহাগীর বড় দুঃখী একজন মানুষ মনে হয়। আচ্ছা কেউ কি বলতে পারে, মায়ের কষ্ট বেশি না বৌয়ের। সোহাগীর বুকটা যেন কেমন করতে থাকে। দুদণ্ড শান্তি মতন কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। কি যেন তাকে সারাটা দিন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সোহাগী বেরিয়ে আসে। তার বুকের ভেতর বড় কষ্ট। জ্বলছে পুড়ছে অনেক কিছু। কিন্তু কোথায় কোনো ছারখার হওয়া কিছু কেন সে দেখতে পাচ্ছে না। চারদিক কেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। কান্না চাপে। কান্না চেপে মেয়ের কথা ভাবতে থাকে, মেয়েটা কোথায়? কোথায় মেয়েটা?

স্বাধীনটা যে কোথায় শুলো আজ, দাদার কাছে নাকি চাচার ঘরে, সোহাগী ভাবতে ভাবতেই উকি মারলো শ্বশুরের ঘরে। ঢাউশ সাইজের ঘর বিশাল খাট। দাদার বুকের মাঝে গুটলি মেরে ঘুমাচ্ছে স্বাধীনতা। দুজনাই ঘুমে অচেতন। সোহাগীর মনে হয় দুটাই শিশু। সোহাগীর খুব মনে আছে ফাল্গুনের সেই দিনগুলোর কথা। তার এই বিশাল শ্বশুর রাতের পর রাত পায়চারী করে বেড়িয়েছে আর পাষাণের মতন জানে যাকে সবাই, সেই এই মানুষটা, একা একা শিশুর মতন কেঁদেছে সেই দিনগুলোতে। শুধু সে সোহাগী তা জানে। তারও তখন ঘুম আসতো না। সময়ে মনে হয় মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। সেও হঠাৎ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ভয় পেয়ে যেনো চমকে উঠে বসে।

বাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ডেলার ওপর গিয়ে বসে। চারদিকে কী গভীর ঘন রাত নেমেছে। নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ঝিঁঝিঁ একটানা সুর

তুলছে। একঝাঁক রাতকে রানির ফুলের গন্ধ এসে তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাতাসের বেগ বাড়ছে। সোহাগীর ভালো লাগছে কিছুটা। চুপ করে বসে থাকে উঠানে। আকাশের দিকে চায়, চাঁদ নেই। তবুও ঘন ছাই রংয়ের একটা আলো যেন আকাশ থেকে ছড়িয়ে নামছে। আকাশের আলো। স্বাধীনতার বাবা বলেছিল ওটা নাকি আসলে চাঁদেরই আলো। আকাশের নাকি কোনো আলো নেই। এত মানুষের আত্মা ওখানে ভিড় করছে, আত্মার আলো আছে না। এটা সে আলোই হবে। সোহাগীর চোখ জলে ভরে ওঠে।

তারই শুধু ভোলা হয় না।

বেড়ায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। যদি হঠাৎ তার মুখটা দেখতে পায়। আকাশ ফুঁড়ে সেই মুখ যদি ভেসে ওঠে। ১৩ বছর বয়স থেকে একটানা দেখে এসেছে ১৮ বছর পর্যন্ত। এতগুলো দিনের দেখা। তার মুখটা কেটে বুকের ভেতর বসে গেছে।

সোহাগী চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে। 'আই' করে মৃদু একটা শব্দে সোহাগী চমকে ওঠে। কে করলো শব্দটা, শহীদ। শহীদের ঘরে আলো জ্বলছে। বাতাসে আলোটা ঢেউ তুলছে কদম গাছটার উপর। সোহাগী এবার ওঠে। এগিয়ে যায় ঘরটার দিকে। দুইদিন ধরে পুরো এলাকাতেই সন্ধ্যা হতে কারেন্ট চলে যায়। খোলা জানালায় উঁকি দেয়। টেবিলের ওপর দুটো মোম জ্বলছে। মোমের সামনে শহীদ চুপচাপ বসে আছে। সামনে লেখার কাগজপত্র। একপাশ থেকে এই আলো আঁধারীতে শহীদকে দেখে সোহাগী চমকে ওঠে, এতো স্বাধীনতার বাবাই যেন। সেই গড়ন, সেই ভঙ্গী, সেই চোখ নাক মুখ। শহীদ কীভাবে মিশে গেলো তার ভাইয়ের আবরণে? সবই তো সেই, সেই মানুষটারই যেন।

ভাইয়ে ভাইয়ে তো মনে হয় এমন মিল থাকেই। হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিশেষ কোণ থেকে দেখলে মনে হয় এইতো সে। সোহাগীর বুকের ভেতরটা ধুপধাপ করে ওঠে। সরে আসে জানালা থেকে। শহীদ এখন আর আগের শহীদ নেই। কথাই বলে না তার সাথে। এড়িয়ে চলে। বিরক্ত হয়ে থাকে। মুখ ভার। সব অপরাধ যেন তার। কিন্তু তার কী দোষ? সে কী করেছে? কেউ কি তাকে জিজ্ঞেস করেছে একবারও, সে বিয়ে বসতে চায় কিনা, তের বছরের সময় বাবাও জানতে চাননি ১৮/১৯ এ শ্বশুরও না। তারও যে কিছু বলার থাকতে পারে এতো সবাই ভুলে গেছে। সে যেন এক পুতুল। আমরা দেব দম, তুমি নড়চড়। সোহাগীও এখন তাই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কারো কথাতেই তার মুখে রা নেই। শহীদের সাথে যেদিন বিয়ে হলো সেদিনও কথা ছিল না। কেন যে ট্রেনটা এক্সিডেন্ট করতে গিয়েছিল। পেট্রলবোমায় অনেক পোড়া ছিল শরীরে। কতদিন ছিল হাসপাতালে। তারপরে এক সময় বাসায় এলো। পা-টা তখনো অচল। সুস্থ না পুরোপুরি, সব তাকে করতে হয়েছে, করাতে হয়েছে, দেখে রাখতে হয়েছে। ধরে তুলে খাওয়ানো থেকে আরো কত কি।

তারপর শ্বশুর মশাই জোর করে বিয়েটা দিয়ে দিলেন। ঠিক তাই, স্বাধীনতার দাদা একদিন জোর করে বিয়েটা দিয়ে দিলেন। সোহাগীর বলার কিছু ছিল না, আর শহীদ তো পঙ্গু অসুস্থ তখনও। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের কতো রকমের কত কথা। সেসব আজ আর সে মনেও করতে চায় না। তবে শুধু ভেবেছিল শহীদ সুস্থ হয়ে তাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। শহীদ তার সব কষ্ট চুষে নেবে। সে আবার বাচবে, নাচবে, গাইবে । বাচতে চায় সে কিন্তু শহীদ আসেনি। বরং যেদিন একটু সুস্থ হয়েছে, হাঁটতে পেরেছে সেদিন-ই হন হনিয়ে বালিশ নিয়ে রুম ছেড়ে ওই কোণের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সবার জন্য নাকি সে শহীদ হয়ে গেছে।

তাকে বাঁচিয়ে ভুলতে পুরো একটা বছরজুড়ে যে কি যমে মানুষে টানাটানি করতে হয়েছে, তাকি সে দেখেছে যে বুঝবে! বুঝলে এমন সে করতে পারতো না। শহীদ ওতো খারাপ না।

শহীদের ঘরে আলোটা এখনও জ্বলছে। নীরবে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওই দিকে চেয়ে চেয়ে যেন সে শক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু কেবলই তার প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে। শহীদ তাকে কেন যে তুলে নিচ্ছে না এই কষ্ট থেকে। কেন যে এমন করে। কবে শহীদ বুঝবে যে তার খুব কষ্ট।

দুই

শহীদ টুং টাং করে সাইকেল বাজিয়ে বাড়ি ফিরলো। কলেজটা অতবেশি দূরেও না। কাছেই। তারপরও এক পা নিয়ে সাইকেল চালিয়ে অতটা দূরেও যাওয়া হয় না। যাওয়া সম্ভবপরও না। বাস স্টেশনের কাছে রহিম মিস্ত্রির দোকানে সাইকেলটা রেখে বাসে যায়। আবার ফিরে এসে সাইকেলে বাড়ি আসে। এতে করে ঘোরা লাগে বেশি। তা লাগুক। কিছু করার নেই। বাবা চান-ই না যে সে যাক কলেজে ছাত্র পড়াতে। তার পরিবর্তে জমিদারি দেখুক। জমি যখন আছে ব্যাপক তখন উনি জমিদার-ই। কাগজে কলমে না হলে কি হবে লোকের মুখে মুখেই উনি জমিদার। যা কিছু সে বদলাতে চেয়েছে, ভাঙতে চেয়েছে সবকিছুর ভিতরই যেন সে এসে পড়েছে। বাড়ি থেকে যতটা সময় বাইরে থাকা যায় ততক্ষণই ভালো থাকে। দুপুর বা বিকেল পর্যন্ত সময় কলেজেই কেটে যায়। তারপরে বাড়ি। সাইকেলের শব্দ পেলেই স্বাধীনতা ছুটে বেরোয়। প্রতিদিনই সে তার জন্য কিছু না কিছু আনে। বাবা থাকলে যা যা স্বাধীনতার পাওয়ার কথা সবই দেয় তাকে। বেশিই দেয়। যেন স্বাধীনতা কোনো দুঃখ নিয়ে বড় না হয়। শহীদের প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীতে করুণা দয়া এই অনভূতিগুলোই সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। ভালোবাসা, রাগ, শোক, দুঃখ সবকিছু ছাপিয়ে একজন দরদী মানুষকে 'করুণা'-ই সবচেয়ে বেশি গভীরভাবে বেঁধে রাখে। নতুবা কেনই বা সে এই সম্পর্কগুলোর সাথে ঝুলে আছে। একজনও তো নেই তার চারপাশে ভালোবাসবার জন্য। নাকি একজন নেই বলেই কি সব ক'জনের ভালোবাসা তার কাছে নাই হয়ে দেখা দিচ্ছে। জুঁই নামের সেই মেয়েটি হয়তোবা তাকে ভুলেই গেছে। কোনো কারণ তো নেই মনে রাখবার জন্য। কেন মনে পড়ে তাকে। কেন মন চায় উড়ে যেতে! সে নিজের পোড়া পা-টা দেখে, আহত পঙ্গু প্রায় একটা পা। একটা রেল অ্যাকসিডেন্ট তারপর সব শেষ।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলো অশ্বত্থ গাছটার নিচে পঞ্চায়েত বসেছে। বাবাতো রয়েছেনই সেখানে। কঠিন কঠোর এক মানুষ। ভয়ঙ্কর ধমক দিয়ে সব করিয়ে নিতে পারেন। সেও করে যাচ্ছে। চায় না, তারপরও করছে। করে গেছে।

আর কেবলই পিছু ডাক শুনেছে একজনের। শহীদ নামটা কি ওই মেয়ে আদৌ জানতো। শুনেছিল কি? মনে হয় না। জুঁই তো শুধু বলতো, 'শুনুন, এই যে শুনছেন।' ব্যস। সে ছিল একজন কবি, কবিতা লিখতো, মেয়েটা নিশ্চয়ই তা জানতো না। এত চঞ্চল মেয়ে। কবিতা-টবিতা নিশ্চিয়ই তার আগ্রহের বিষয় নয়। কে জানে। আবার তো বলেছিল পত্রিকা বের করবে, কলেজের ম্যাগাজিন। সে নাম জানতে চেয়েছিল। বললো, যাই এর বিপরীতে নাম। কী নাম তাহলে। 'আসি'। 'এসো'। কখনোই আর তার যাওয়া হবে না। কেন অযথা মনে রাখা। মন খারাপ করা। সাইকেল দ্রুততর করে। কিন্তু পরক্ষণেই সবুজ ধানক্ষেতের দিক থেকে মনে হলো কিছু একটা ছুটে গেল। চেয়ে দেখলো চোখ বড় বড় করে। মনে হচ্ছে তো জুঁই। হাত নাচিয়ে নাচিয়ে কি যেন সে বলছে। শহীদ মাথায় ঝাঁকায়। হাস্‌স। হচ্ছে-টা কি এসব। সে ছেড়ে এসেছে অতীত। অতীত যেন ছাড়ছে না তাকে। প্রায় চার বছর আগে সেই যেন কবেকার কোনো এক আলোময় বেলায় সে গিয়েছিল শহরের এক বাসায় ভাড়া থাকতে। ওই বাসায় একটি মেয়ে ছিল- জুঁই। মাত্র ক'টা দিন দেখেছে। তারপরও ভাবছে তাকে নিয়ে, কেন এমন হয়।

নাহ, সে এখন শুধু ছোট্ট স্বাধীনতাকে নিয়েই ভাববে, আর কাউকে নিয়ে না। তার সাইকেলের টুং টাং শব্দেই স্বাধীনতা কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়। নেচে কুদে নেমে আসে। আজও আসলো। ছুটে তাকে জড়িয়ে ধরলো। কী নরম ফুটফুটে আলিঙ্গন! পাঁচ বছরের মেয়ে অথচ যেন পাঁচশ বছরের ভালোবাসা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কেবলই মনে হয় একে আরো ভালোবাসা উচিত অথচ পারছে না। কে যেন কেবলই তাকে পিছু ডাকছে। পিছু ছাড়ছে না যেন কেউ একজন।

সে যখনই শহরের সেই বাড়ির বাগান পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যেত প্রায়ই শুনতো জোরে জোরে কে যেন বাজিয়ে রেখেছে গান, 'তুমি রোজ বিকালে আমার বাগানে ফুল নিতে আসতে', মেয়েটিই কি বাজাতো সেই গানটা? কে জানে। কেন যেন মনে হয় মেয়েটিরই কাজ এটি। নিজেদের ছোট বাগানটা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে

আজো তার আবার জুঁইয়ের কথা মনে পড়লো। জুঁই ফুলের কিছু গাছ লাগাতে বলেছিল, কাসেম মিঞা শুনেই বলে দিয়েছিল চেনে না সে জুঁই ফুল কেমন, এটা হচ্ছে কাসেম মিঞার কাজ ফাঁকি দেয়ার একটা অজুহাত। এরপর শহরে গেলে নিজেই নার্সারি থেকে খুঁজে কিছু জুঁই ফুলের চারা নিয়ে আসবে। ভাবীর পছন্দ গাঁদা ফুল। ভাবীও তো আর এখন বলা যাচ্ছে না তাকে। তবে তাই আসে মুখে। ভাইয়ের কবরটার চারদিকে গাঁদা ফুলের গাছ দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি কবরস্থানে। বাড়ির পেছনের বিশাল মাঠটা পেরিয়ে তারপরে গোরস্তান। ছোটবেলায় ঘরের মানুষদের ওপর রাগ হলেই দুই ভাই মিলে অনেকবার ওখানে গিয়ে বসে থেকেছে। শহীদ আজকাল ওখানে যায় না। রুকু শুয়ে রয়েছে ওখানে। শহীদ কেন যেন এটাও মেনে নিতে পারছে না। তার বড় কষ্ট হয়। রুকুর সবকিছুই যেন সে হরণ করেছে। ঘরবাড়ি সংসার বউ বাচ্চা। সব। কিন্তু সে তো এসবের কিছুই চায়নি। নিতেও চায়নি। ছুঁতেও না। ছোঁয়ওনি। ভাবিকে তো আজও সে ছোঁয়নি। ছুঁতে পারেনি। আজ হঠাৎ স্বাধীনতার হাত ধরে আনমনেই হেঁটে চলে এলো কবরস্থানে। অজান্তে যেন রুকুর কাছে। হলুদ ফুলগুলো তো আর নেই। শেষ যখন এসেছিল, দেখেছিল। এখন সব উধাও হয়ে গেছে। শুধু ঘাস লাগানো। কাসেম মিঞার ফাঁকিবাজি কি? ওই তো সে, তার দিকেই দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে।

জানতে চাইলো,

: কী ব্যাপার, ফুল সব কই?

: ভাবী তো না করলো। বললো আপনি মরলে আপনার কবরে গাঁদা ফুলের গাছ লাগাতে। স্বাধীনতা একথা শুনেই হেসে উঠলো, কিন্তু শহীদ ভেবে পায় না এটা কি ধরনের কথা হলো। আসলেই বলেছে না এ লোক বানাচ্ছে?

: ফাজলামো একদম করবে না আমার সাথে। বলেছে সে এই কথা?

: অর্ধেক বলেছে। বলেছে গাঁদা লাগাতে হবে না। আমি তাই ভাবলাম সোয়ামী তো আপনি এখন তাই আপনি মরলে ওনার পছন্দের ফুলগাছ লাগাতে হবে।

দেবে নাকি একে ধরে দুটো চড়। ত্রিশ বছরের ভেদারাম মার্কা কামলা। আসলেই ভেদারাম না ধুরন্ধর, কে জানে!! ফাজিল তো বটেই।

তিন বছর আগে যখন বিয়েটা হয়েছিল সে কি অবস্থা মনের, বেরুতেই চাইতো না ঘর থেকে, আর কত রং তামাসা মানুষের। যন্তসব। যন্তসব। অসুস্থ ছিল। হাঁটতেও কষ্ট হতো। বাবা ধরে বেঁধে একদিন বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সেই থেকে বাবার ওপরও তার ভীষণ রাগ। যেদিনই হাঁটতে শুরু করেছিল। পা টানতে টানতে ওই রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

না গিয়ে উপায় ছিল না। ঘর সাজিয়ে ছিল গ্রামের ফাজিল কিছু ভাবীরা। বাসররাতের আদলে। তার আগের একমাস শহরে গিয়ে ফিজিও থ্যারাপিস্টের কাছে ছিল। হেঁটে চলে

গ্রামে ফিরতে পেরেছে দেখেই কি লাপঝাঁপ একেক জনের যেন পৃথিবীতে সেই প্রথম হাঁটছে। ধরে ধরে সবাইকে থাপ্পড় দিতে পারলে ভালো লাগতো। দেওয়া তো গেলই না বরং ওরা সবাই কোলে করেই যেন মাঝরাতে তাকে ভাবীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিল খাওয়া-দাওয়া শেষে। কী সুন্দর করে যে সাজানো ছিল ঘরটা। আহ্, জুঁই যদি থাকতো। কোথায় সে। নেই যেন কোথাও আর। ছুটে সে বেরিয়ে গেছিল ওই রুমে থেকে। ছুটতে আসলে পারেনি। পা-টা টেনে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের পুরাতন রুমে। সেই থেকে একই ছাদের নিচের দুইজন দুইরুমে। কাল রাতেও দেখেছে ভাবী বসে কাঁদছে। কিন্তু তার কেন যেন কোনো মায়াও লাগে না। একটুও কষ্ট লাগে না ওই মহিলার জন্য। এতদিন হয়ে গেল। তারপরও মেনে নিতে পারলো না। ভাইয়ের জায়গাটা সে নিতে পারছে না। পারবে না। রুকু যেখানেই থাক নিশ্চয়ই খুশি হবে তার ওপর।

: ভালো আছিস ভাইয়া?

আপন মনেই বলে ওঠে। জানে কবর থেকে কোনো জবাব আসবে না। তারপরও ওই দিকেই চেয়ে বলে,

: আমি স্বাধীনতাকে ভালো রাখার খুব চেষ্টা করছি।

: আমরা সবাই সেটা জানি।

কে! পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাবা।

: নাও, জুঁইয়ের গাছ। তুমি নাকি বলেছো ওই গাছ জোগাড় করতে। আমি জোগাড় করেছি।

শহীদ চুপচাপ চেয়ে থাকে। বাবার হাতে জুঁই।

: জুঁই নামের কাউকে কি তুমি চেন? যখন অসুস্থ ছিলে প্রায়ই জুঁই জুঁই করতে।

হঠাৎ তার মনে হয়, বাবা কি তাকে সত্যি সত্যি সত্যিকারের জুঁই -কে এনে দিতে পারতো না!! কাসেম মিঞা এতক্ষণে পাশ থেকে বললো,

: জুঁইগাছ তো আমিও লাগাইছি, ওই যে, ওইখানে। বাচে না। জুইয়ের জায়গা এটা না। স্বাধীনতা ছুটে চলে গেছে কাসেম মিঞার সাথে বাগান দেখতে।

: শহীদ, তুমি শহরে গিয়ে একবার জুঁইয়ের সাথে দেখা করে আস। না হলে তোমার মন থেকে সে যাবে না।

শহীদ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মাত্র ঘুরেছিল চলে যাবে বলে। দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চায়,

: এসব আপনাকে ভাবতে কে বলেছে। ভাইয়ার জায়গাটা আমি এত সহজে ধ্বংস হয়ে যেতে দেব না।

: এটা তোমার ভাইয়াকে নিয়ে সমস্যা নয়। জুঁইকে নিয়ে। তুমি জুঁইকে ভাবছো সবসময়। জুঁইকে ভেবে এটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছো। ওর সাথে দেখা করে কথা বললেই তোমার মোহ চলে যাবে। এই পা ভাঙা অর্ধেক পোড়া শরীরের ছেলেটাকে আগে পছন্দ করে থাকলেও আর ভালো লাগবে না তার। যাও মোহ কাটিয়ে আস।

শহীদ চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না । শুধু বলে,

: নাহ্ আমি কোথাও যাব না। আমি একা ভালো আছি।

: একা নও তুমি।

শহীদ জবাব দেয় না। মনে মনে আনমনে বলে, আমি শুধু-ই একা। একাকী একজন মানুষ।

শহীদ খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে। সে হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে যায়। সে কোনো স্বপ্ন তার ভাঙবে না। জুঁই হয়তো বা তাকে দেখলে চিনবেও না। কবে কে এসেছিল তাদের একটা রুম ভাড়া নিতে, ক'টা দিন থাকতে। দুতিনদিনের দেখা। সেই বা কেন মনে রাখবে। কিন্তু শহীদ মনে রাখবে। এটা তার স্বপ্ন। স্বপ্নীল একটি মেয়ে জুঁই। কী সুবাস! সে যখন চূড়ান্ত আনন্দময় জীবনে ছিল তখন দেখেছিলো সেই প্রজাপতিকে। সে সেই আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বাকি দিনগুলো কাটাবে। জুঁই আছে তার স্বপ্ন হয়ে। যেখানেই থাক আছে কেউ একজন, যাকে সে বলেনি ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসে।

ব্যাংকিং সেবাকে আরো আধুনিক ও সহজলভ্য করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংক চালু করেছে কার্ডভিত্তিক বেশ কিছু আধুনিকতম সেবা। এই সব সেবার মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকের কাছে নয়, বরং ব্যাংকই পৌঁছে যাবে গ্রাহকের দোরগোড়ায়।

EXIM BANK CALL CENTER
16246
www.eximbankbd.com

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়: সিম্ফনি, প্লট- এস ই (এফ)-৯, রোড- ১৪২
গুলশান ১, ঢাকা ফোন- ৯৮৮৯৩৬৩, ফ্যাক্স- ৯৮৮৯৩৫৮

কবিতা

এত শব্দ এত শব্দ

শিহাব সরকার

সিম্ফনি শেষ হলে জেগেছি সহসা
বাড়ি যেতে হবে, দূরে কোন সে পাহাড়ে
মধ্যরাতের অন্ধকার। অসুরের হল্লা
তবু বাড়ি যেতে হয়,
বাতাসে ঘুমহারা শিশুর কলকাকলি
নৈঃশব্দ্যের সুড়ঙ্গ পেছনে টানে।

নিঝুম প্রহর নেমেছে ঘরে ও বাইরে
বুঝতে পারি না, শব্দ-বিষ্ঠা আর আবর্জনা
এত শব্দ এত শব্দ,
ছায়ানট ভবনে অপেরায় ভেসে ওঠে
মূলধ্বনি, নীল অপরাজিতা ফুল
হাঃ দিনগুলো যায় নিষ্ফল আড্ডায়...

সুর থেকে নিঝুমের মন্ত্র, শ্লোক, স্তোত্র
পবিত্র গুহায় ধ্যানে ডুবে গিয়ে দিব্যস্নান,
হাওয়ায় ঝরাপাতায় কত যে চিঠি
নৈঃশব্দ্যের নিমন্ত্রণ দিনভর রাত্রিভর,
সিম্ফনিতে ডুবে থাকি, জাগি
নিঝুমের মুখে গুপ্তঘাতকের বল্লম।

রোদ্দুর উৎসবে বরফ ঘুমায়

রনি অধিকারী

শীত নিন্দ্রা ভঙ্গ হয় প্রার্থিত পুরুষ
অঝোর কান্নায় জাগে মাটির ময়ূর।
শাদা বরফের বাড়ি লীন হয়ে যায়
রোদ্দুর উৎসবে আজ বরফ ঘুমায়।
বরফ কুচির শব্দ নেই যে কোথাও!
শীতার্ত শরীরে সব কুয়াশা পালায়
শীতার্ত শরীরে সব কুয়াশা পালায়।

শাদা জল ভেসে যায় জন্ম নেয় নদী
জলদ্যুতি পাখি ওড়ে কাল নীরবধি।

এসো বৃষ্টি

সমর চক্রবর্তী

এসো বৃষ্টি শরীরভ্রমণে, পর্বত-কান্তারে,
ঝরো নির্ঝর রোমাঞ্চিত পাথরে!
অনাবাদী-অফসলি বুকের জমিন
ভরে আছে পাথর-শিলায়,
এসো নতুন অভিজ্ঞতায়, এই ভুলভ্রান্তিময়
দেহখানি পাঠ করো,
পুলকিত করো, তারপর
অবিমিশ্র ধারার নদী হয়ে যাও বিশাল প্রান্তরে ...

তোমার হৃদয় অববাহিকায়
আমি কাদামাটি হবো! পাললিক হবো,

এসো বৃষ্টি ঝরো নির্ঝর আমার তৃষ্ণার্ত জমিনে!

প্রণয়ী যায় কপিলা গুহায়

দ্বিত্ব শুভ্রা

প্রণয়ী শব্দের সারি বনানী সবুজে, নিসর্গ নেমেছে করপুট সমতটে,
আসমুদ্র হিমাচলে তার ছায়া লেগে আছে, মেঘালয়ে বৃষ্টি, বৃষ্টি
চেরাপুঞ্জিতে, প্রণয়ে ডুবেছে ঘর-মাঠ-বন...ফিসফিস...ফিসফিস...
কার সাথে? কার সাথে?

গোখরার গায়ে ভৈরবী বান, গোখরানী ছাড়ে সুতানটি, কোন পাহাড়ের
গায় গহ্বর গুহায় দোলায় শরীর...পাতা ঝিরঝির...তিরতির...ঘাসে
দুর্বায় শিরশির...কে যায়? কে ধায়? প্রণয়ী যায় কপিলা গুহায়।

বাঁধুয়া বাঁধে, আকাশগঙ্গা থেকে নামে বটুয়া ঝুরি, ঢুকে যায় মাটির
শরীরে, দূরত্ব নৈকট্যের শিবিরে শোরগোল তোলে, ব্রততী মহলে
আজানু বসে কবিতা পড়ে, গীতবিতানের সুর যতদূর নিয়ে যায়
সেই চরাচরে সারগাম বাজে তুমি...তুমি করে...বেঘোরে বিভোরে...
নিশাচর মুখ রাখে প্রভাতী ডোরে।

তুমি আছো বলে ভবঘুরে খোলা ডাঙা-জল-বায়ু ফেলে ঘরে ফেরে,
রাত দ্বিপ্রহরে বুকে মুখ রেখে বলে, আছো জেগে?

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

Phone-0371-62149, Fax-0371-62610
www.knsikhagrachari.org

প্রতিষ্ঠার পর হতে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর প্রকাশনাসমূহ নিম্নরূপ

ক্রঃ নংঃ	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১.	চাকমা সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি	ড. জাফার আহমদে হানাফী	৩৫০/-
২.	সান্দবীর বারমাসী	ড. আফসার আহমদ	২৫০/-
৩.	ককবরোক (ত্রিপুরা শব্দকোষ)	মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা	১০০/-
৪.	মারমা শব্দকোষ	অংক্যজাই মারমা	৭০/-
৫.	চাকমা শব্দ ভান্ডাল	আর্য মিত্র চাকমা	২৪০/-
৬.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি	সুগত চাকমা	১২০/-
৭.	The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein	Capt. T.H. Lewin	২৫০/-
৮.	ত্রিপুরা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র	প্রভাংশু ত্রিপুরা	৬০/-
৯.	Chittagong Pattern of The Chakma Society in the Chittagong Hill Tracts	Dr. Sudhin Kumar Chakma	২৪০/-
১০.	ত্রিপুরা তন্ত্র মন্ত্র সার	প্রভাংশু ত্রিপুরা	১৩০/-
১১.	A History of Chittagong Hill Tracts	Suniti Bhushan Qanungo	২৮০/-
১২.	কবরক (বিশেষ সংকলন)	সম্পাদক-সুসময় চাকমা	১০০/-
১৩.	পার্বত্য রাজলহরী	নোয়ারাম চাকমা	৮০/-

সকল বই ২০% কমিশনে বিক্রয় করা হয়।

সুসময় চাকমা
উপ-পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

কবিতা

ছায়ানীল বারান্দায় স্বপ্ন ঝালর

রাহমান ওয়াহিদ

পুরু লেসেও ধরা পড়ে না ঐশ্বর্য পলল
গড়াগড়ি খায় বিবমিষা, পতিত গরল
বিচূর্ণ ভূমিতলে ভেজে নদী কাদাজল।

শিয়রে দাঁড়ানো ঘোলাচোখ, পালকিবাহক
কে বা তার সোয়ারি– কী-ই বা কুহক
কাকে তুলে নেবে, হায়, জানে না তা কেউ
জলে ভেসে যায় শুধু আতরের ঢেউ।

দেখি না, দেখি না তবুও দেখে যাই
অরণ্য দুপুর, নাকি সন্ধ্যের ভাই
রাতের বোনেরা তবে কেন আসে নাই?

স্ফীত হতে থাকে ফের আকাশকুসুম
জলডাঙ্গা গ্রাম দোলে ডাহুকের কোলে,
ছায়ানীল বারান্দায়, আহা, কী দারুণ–
কাচভাঙা স্বপ্নের ঝালর ঝোলে!

বিমূর্ত আয়নার আলোয়

মিলন সব্যসাচী

যেসব দিনের প্রার্থনায় সময়ের এত প্রয়াস
যে প্রাণপণ প্রস্তুতি– ফাগুন ও শ্রাবণের
সুস্বাগত উচ্চারণে টিয়ে-রঙের কচি পাতার
পেলবতা ছুঁইয়ে নাচের নিমগ্নতা, প্রবাহমান সমুদ্র সৈকতে
অতিথি পাখিদের ডানা ঝাঁপটানো শব্দ-সুরের মূর্ছনা
সংগোপনে নিভৃতে-নীরবে বয়ে চলা নদীর কলতান।

রক্তিম পদ্ম ফোটা দিগন্তবিস্তৃত হাওর-বাঁওড়ে
কিংবা বাতাসের সিঁড়ি ভাঙা নীলিমার শরীর ছুঁইয়ে
এক মহিমান্বিত সূর্যোদয়ের শুভ সূচনা
এক আলোকিত স্তব্ধতার শিল্পকলা–
সবুজ দূর্বাঘাসের ডগায় জ্যোতিময় শিশির বিন্দু
কখনও দ্যাখোনি বলেই
আজও অজ্ঞাত ক্রমশ সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যস্ত পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ

অদৃশ্য অচিন অদ্বিতীয় এক বাউলের একাকিত্বের স্পর্শে
পুষ্পের মতোন পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠা স্বর্ণালি দিন
তার বিমূর্ত আয়নার আলোয় উদ্ভাসিত মুখ,
উদাস দুপুরের রহস্য রোদ্দুরে ঝলসে ওঠা দৃশ্যাবলি।

সাম্যবাদ

সালাহউদ্দিন খোকা

কালের খেয়ায় ঠাঁই নিয়েছে দুর্বোধ্য পাথর সময়।

বসতি স্থাপনকল্পে জীবনের মৌলিক চাহিদারা যে যার
মতে; দিয়ে চলেছে কঠোর কর্মসূচি।
চাল ও চৌহদ্দির চারপাশ ঘিরে তুলে ধরেছে অপ্রাপ্তির
আশ্বাস চিত্রের আকাশ শামিয়ানা।

শ্রেণি-বৈষম্যহীন ছায়াতল কামনায়...
আমরা যারা শব্দের সমকালে হাত বুলাই, তারাও চাই
একই ঠিকানার একই সাময়িকী।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ
মোবারক

মিসেস হেলেন আহমদ
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী
প্রেসিডেন্ট, সুরমা লায়ন্স ক্লাব
চেয়ারম্যান
এইচ এম গ্রুপ লিমিটেড
ফরিদ প্লাজা, জঙ্গলারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট।

নিবন্ধ

নারীর অগ্রযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দ

তারাপদ আচার্য্য

‘এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’

সৃষ্টির শুরু থেকে নারীকে দেখেছেন কেউ মা হিসেবে, কেউ বোন হিসেবে, কেউ স্ত্রী হিসেবে, কেউ ভোগ্যবস্তু হিসেবে, আবার কেউবা শক্তির প্রতীক হিসেবে। নারীর কারণেই ধ্বংস হয়েছিল ট্রয় নগরী। আবার নারীর জন্যই গড়ে উঠেছিল ভালোবাসার অমর প্রতীক তাজমহল। নারীর অধিকার খর্ব করার জন্য কেউবা উঠেপড়ে লেগেছে, আবার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেউবা মিছিল-মিটিং করছে প্রতিনিয়ত। ইতিহাস কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই– হাতেগোনা কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সবাই নারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। নারীদের সবসময় বন্দি করে রাখতে চেয়েছেন।

নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ। নতুন যুগের শুরুতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নারীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছিলেন, আবাহন করেছিলেন বিদ্যাশক্তিরূপে জগতের কল্যাণের জন্য। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে সেই শক্তি স্ফূরণ হলেই অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটবে। তারই শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র নারী জাতিকে মা ও বোন হিসেবে অন্তরে ধারণ করে সবসময় চেষ্টা করেছেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

করতে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মূল কথা যথার্থ সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ঘোষণা। উপনিষদে আমরা দেখতে পাই- "ত্বং স্ত্রী তং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী" অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারীও তুমি।

তাই তো স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আত্মাতে কি আর লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।'

স্বামীজীর মতে, নারীজাতি ও জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের ওপর নির্ভর করছে বিশ্বের উন্নতি ও সব রকমের সমস্যার সমাধান। দেশের ধর্ম ও শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মভিত্তিক সংস্কৃতি থাকবে সেই শিক্ষার মূলে।'

স্বামীজী কিন্তু অত্যন্ত সচেতনভাবে নারী জাতির কথা চিন্তা করেছেন। কারণ যদি নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন সমানভাবে উন্নত না হয়, তাহলে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের জনসাধারণও মেয়েদের অবস্থা কতোটা শোচনীয় হয়েছিল তা স্বামীজীর এক চিঠিতে দেখা যায়- 'শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সম্মান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে...।' '...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল- আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।'

স্বামীজী আরো লিখেছিলেন- 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করতে পারো, তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।'

স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি নারীগণকে ঠিক তাহা-ই বলি...।'

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার জাদুকরী শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের বা আক্ষরিক নয়। যে শিক্ষার চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। বস্তুত তার মতে, লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ এবং নারীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাকেই স্বামীজী চরমমুক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা বা জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তার মতে পুরুষ-নারী উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য পরম সত্য লাভ, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি। ব্যবহারিক জগতে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি কোনো ভেদ করেননি।

আমরা স্বামীজীর বাণীতে নারীর পূর্ণস্বাধীনতা বা জাগরণের পরিচয় লাভ করি। আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতালাভ সম্ভব। ভাগিনী নিবেদিতা মতে– যে সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি আত্মা ও মনের ওপর শরীরের বন্ধন দৃঢ় করে, স্বামীজী তাকে কোনোক্রমেই সহ্য করতে পরতেন না। তার বিশ্বাস ছিল, যে নারী যত বড় হবেন, তিনি ততই নারীসুলভ দুর্বলতাগুলো অতিক্রম করতে পারবেন।

স্বামীজী আরো বলেছিলেন– 'তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বুঝিবে কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।'

স্বামীজী এই ধারণা পোষণ করতেন যে, অতীত যুগে যেসব মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন, আগামীকালের নারীর মহত্ত্ব তাদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প ও জননীর মতো কোমল হৃদয়। নারী হবে পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভই হবে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তারাই গ্রহণ করবে মেয়েদের শিক্ষার ভার। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে পরিচালনার মূলে থাকবে নারীর প্রভাব। থাকবে না পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা অধিকার লাভের দাবি। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নারী নিজের ভাগ্য, নিজেই জয় করবে।

'হে ভারতবর্ষ, ভুলিও না তোমাদের নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী'

-এই উক্তিতে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তি বলেই যুগ যুগ ধরে নারীজাতির আদর্শ হয়ে আছেন সীতা, সাবিত্রী। তাদের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত সবাই তাদের পতিব্রতা রূপটির বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা ভুলে গেছি, তারা শুধু পতিব্রতা ছিলেন না, তাদের তেজস্বিতা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতা ছিল জগতের কল্যাণে।

সাধ ও সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

HAL

আকর্ষনীয় হাড়ে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে

HAL চলতি প্রকল্প ঃ ঢাকা

HAL রক্তকরবী

মিরপুর, কমার্স কলেজের পূর্বদিকে

HAL রঞ্জন

রূপনগর,মনিপুর ব্রাঞ্চ-১ স্কুলের বিপরীতে

HAL'S Sayeeda Daffodil

প্লট ৪৬/এ, রোড ৬/এ ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা।

HAL'S মাধবীলতা

মালিবাগ বাজার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।

HAL চলতি প্রকল্পঃ ঢাকার বাইরে

HAL'S এস্টার আনোয়ার

বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

HAL'S Jahura Mollika

হোল্ডিং নং-২৪৬, ২৪৭, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ।

২৪ HAL

HAL

HASSAN AND ASSOCIATES LIMITED

real estate development, construction & consultancy

"হাল মার্স" ৫, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩১৯৫৫৭, ৯৩৫৭৪৪৭, মোবাইল : ০১৯১৩ ৫২৬২৪৩, ০১৯১৩ ৫২৬২৭৬ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২- ৮৩২১৩৬৫

ই-মেইলঃ hal_sales.bd@mail.com, halsales@gmail.com, ওয়েব সাইট ঃ www.hal-bd.com, follow us on facebook f

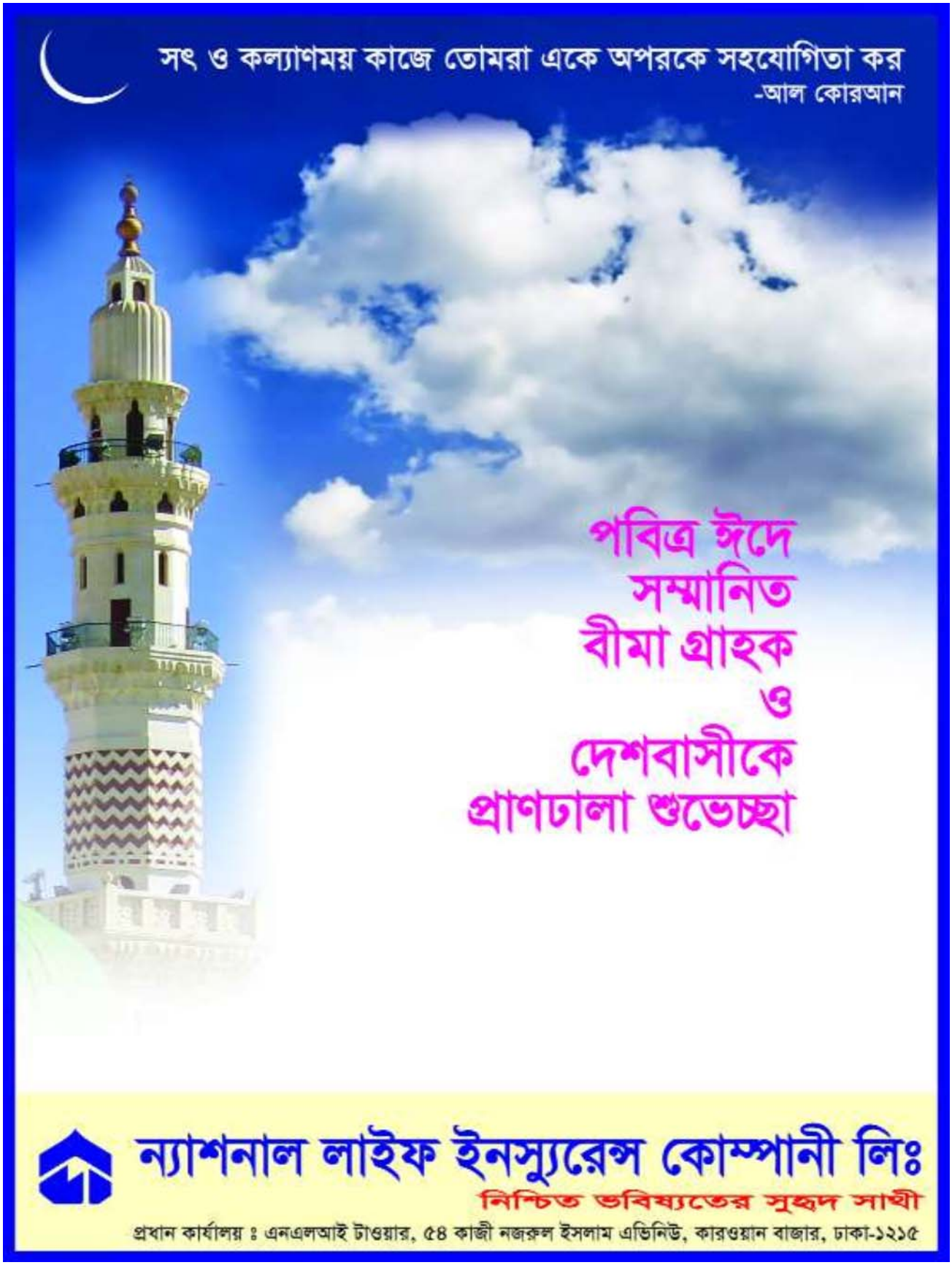
সৎ ও কল্যাণময় কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা কর
-আল কোরআন
পবিত্র ঈদে
সম্মানিত
বীমা গ্রাহক
ও
দেশবাসীকে
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা
ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী
প্রধান কার্যালয় ঃ এনএলআই টাওয়ার, ৫৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

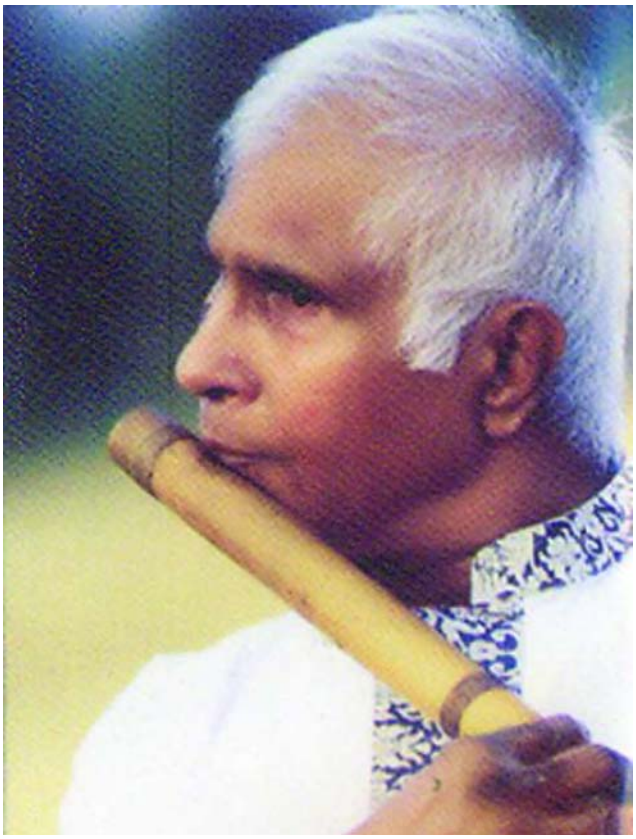

ব্যক্তিত্ব

সাধক শিল্পী ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম

মমতাজ আলী খান

যে কোনো শিল্পীর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও একনিষ্ঠ অনুশীলন তার শিল্পী জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের সঙ্গীত জগতের যারা সাধক ও অমরশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমানের মর্যাদায় সম্মানীত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অঙ্গনে ধারাবাহিক সাধনা বা চর্চার বলেই শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পের সাধনায় সহজতর পথ বা সহজে প্রাপ্তি বলে কিছু নেই। শিল্পের গুণগত মান অর্জনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করেই একজন শিল্পী সাধক হিসেবে তার প্রাপ্তি লাভে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

আজকে যে শিল্পীর পরিচয় তুলে ধরব, তিনি কণ্ঠশিল্পী নন। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বংশীবাদক ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম। প্রথমত: তিনি বাংলাদেশ বেতারের একজন সম্মানিত বংশী-বাদক। সেহেতু বাংলাদেশ বেতারে মান সম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্বে শিল্পীর কণ্ঠ ও পরিবেশনার মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয় সে দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় ওস্তাদ ক্যাপ্টন আজিজুল ইসলাম বেতারের পাসকৃত একজন

পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

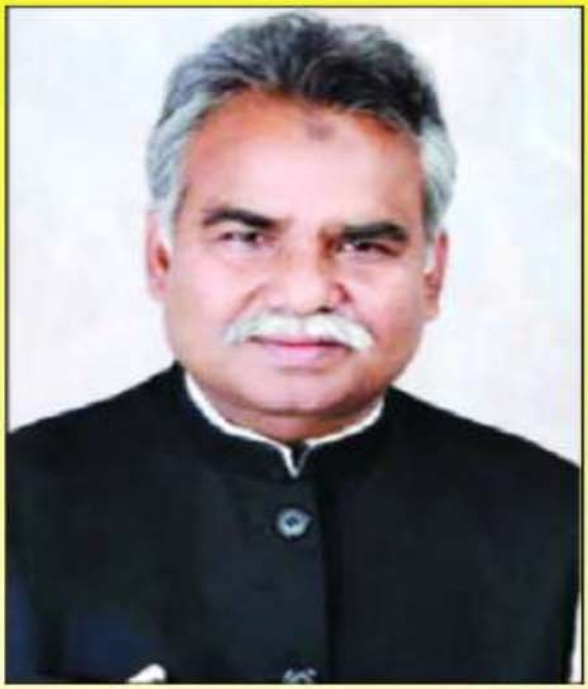

আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরী
সাবেক এমপি, সিলেট-২ ও
সাধারন সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, সিলেট।

পরীক্ষিত শিল্পী। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা এবং চট্টগ্রামে নিয়মিতভাবে বাঁশিতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

সঙ্গীতের সাধনা বাঁশিকে তিনি এমনভাবে তার জীবনের সঙ্গি করে নিয়েছেন যে, দিনে দিনে বাঁশিতে নানা রাগ-রাগিনীর তাল-মান-লয়ে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের একজন অপরাজেয় শিল্পী হিসেবে বহুদিন আগেই বিশেষভাবে পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পীর যে ব্যবহারিক জীবনের চালচলন, পোশাক আশাকে, কতটা মানসম্মত হতে হয়, তা ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের জীবন-চরিত্রের সঙ্গেই পরিস্ফুট। প্রতিদিন নিয়ম করে বাঁশি বাদনে তার নিয়মিত চর্চাও থেমে নেই। সঙ্গীতের যে কোনো ধারায় সাধনার বিষয়টি যে অপরিহার্য তা ওস্তাদ আজিজুর ইসলাম ভালোভাবেই জানেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন ইতোমধ্যে এই বংশীবাদকের অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে। প্রচুর দর্শক সমাবেশে প্রতিটি অনুষ্ঠান পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। ভারতের বিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ সাবির খানের সঙ্গে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সস্টিটিউটের এই সাধক বংশীবাদকের অনুষ্ঠানে বেশ কটি রাগ-রাগিনীর ওপর বাঁশির যে মোহনীয় বাদন পরিবেশনায় দর্শক-সাধারণ অভিভূত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, অনেক দিন ধরে ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার এই প্রতিবেদকের সুযোগ হয়েছিল। বাসভবনের আয়োজনটা খুব বড় না হলেও শ্রোতা উপস্থিতি একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হতো। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের দর্শক-শ্রোতার অংশগ্রহণে প্রতিটি অনুষ্ঠানই ছিল উপভোগ করার মতো।

সমুদ্রগামী জাহাজের একদা নাবিক ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রীয় ধারার বংশীবাদক। জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি জীবনে বহু সাগর পাড়ি দিয়েছেন। সাগরের বুকে নিঃসঙ্গ প্রহরগুলো তিনি কাটাতেন বাঁশি বাদনের মধ্যদিয়ে। বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীদের রেকর্ড ছিল তার নিত্য সঙ্গি।

১৯৪৫ সালে বাবার তৎকালীন কর্মস্থল রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান রাজবাড়ী হলেও বিশ্বনন্দিত সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতি বিজড়িত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিল্পীর গ্রামের বাড়ি। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন চট্টগ্রামে।

চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে চর্চারত শিল্পীর হাতেখড়ি চট্টগ্রামের আর্য সঙ্গীত সমিতির প্রয়াত প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে। তারপর কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ বেলায়েত আলী খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে বিশ্ববিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ বাহাদুর খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে স্বর্গীয় পণ্ডিত পান্না লাল ঘোষের ঘনিষ্ঠ শিষ্য পণ্ডিত দেবেন্দ্র মুদ্রেশ্বর ও পণ্ডিত ভি জি কার্নাডের কাছে শেখার সুযোগ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত ভি জি কার্নাডের সান্নিধ্য শিল্পীকে আজকের এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম বিদেশে বহু বিশ্বরেণ্য সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগলবন্দি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় প্রেসক্লাব, শব্দ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠী, ছায়ানট, আঁলিয়াস ফ্রঁসেস, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভাল-২০১০, সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র, মিডিয়া সেন্টার, সাহিত্য একাডেমি, বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন কমিটি এবং দেশের বিভিন্ন রোটারি ক্লাব শিল্পীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং সম্মাননা প্রদান করে। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন দর্শকের উপস্থিতিতে শিল্পীর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তিনি বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সিটিসেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

বিশ্ববিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন 'ডোভারলেন মিউজিক কনফারেন্স' এর সুবর্ণ জয়ন্তীতে শিল্পীর পরিবেশনা দেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছে। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিবেকানন্দ হলে কিংবদন্তি সেতারবাদক ওস্তাদ বেলায়েত খানের অনুষ্ঠানের পূর্বমুহূর্তে ভারতের হিন্দুস্থান মিউজিক প্রোডাক্টস এ অনুষ্ঠানের সিডি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। উপমহাদেশের অন্যতম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন 'ভারতের উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র' আয়োজিত সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম বাঁশি পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের বিমোহিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি শিল্পী হিসেবে একমাত্র তিনিই এই দুটি কনফারেন্সে পরিবেশনার সুযোগ পান। ভারতের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমি, সপ্তসুর, রোটারি ক্লাব অব কালীঘাট, রোটারি ক্লাব অব সল্টলেক, সঙ্গীত পিয়াস স্পন্দন, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, দিল্লির হ্যাবিটেট সেন্টার, মুম্বাইয়ের নেহেরু সেন্টার এবং চেন্নাইয়ের মাস্টার মেরিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট ফেইরি স্প্রিং মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, মেলবোর্নের মেলবা হল, সিডনিতে প্রতীতি আয়োজিত অনুষ্ঠান, সিঙ্গাপুর-ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস সোসাইটি (SIFAS) ও বাংলাদেশে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশন, মালয়েশিয়ার দ্য গ্রিন টাউন ইন্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটি, শিল্পীর অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে দেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে করেছে বহুল প্রচারিত।

সম্প্রতি শিল্পীকে 'অদম্য চট্টগ্রাম' সম্মাননা প্রদান করা হয়। শিল্পী বঙ্গমেলা সঙ্গীত সম্মেলনসহ আমেরিকা, কানাডায় বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বংশীবাদন পরিবেশন করেন। শিল্পী ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম এখনো তার বাঁশিতে নিয়মিতভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারায় রাগ-রাগিনী সুর তুলে প্রতিদিন তার রেওয়াজ অব্যাহত রেখেছেন। খ্যাতিমান এই শিল্পীর জীবদ্দশায় তাকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার সময় এসেছে।

সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের একনিষ্ঠ সাধনা ও সঙ্গীতে তার অবদানস্বরূপ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করার বিষয়টি সুনজরে নিলে তা হবে আনন্দের বিষয়।

পণ্ডিত ভি. জি. যোগের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম

AMBER LIFESTYLE

amber

/myamberlifestyle

AMBERLIFESTYLE.COM.BD

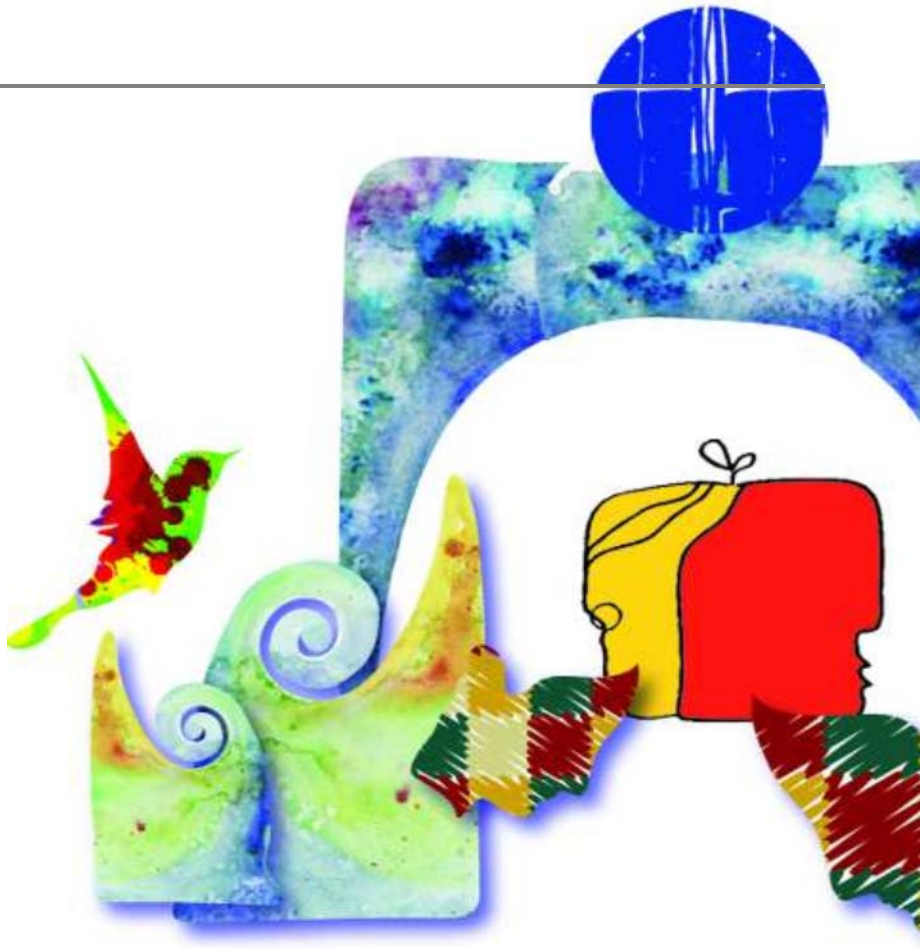

উপন্যাসিকা

কন্যার নাম মিলেনিয়াম

সারোয়ার কবীর

ব্যাপারটা পয়লা জানতে পারি যার কাছে, সেই শিরিন খুব আফসোস করে বলে, কাজটা ও ঠিক করল?

আমি ভালোমন্দ কোনো জবাব দিইনি তখন। মতিঝিলের ওদিকে আমার এক বন্ধু চৌধুরীর অফিসে নিছক আড্ডা কিংবা অন্য কোনো ধান্ধায় হাজির হলে শিরিনের দেখা-সাক্ষাৎ পাই কখনো কখনো। ওর বান্ধবীই মুক্তা। এক সময় ওদের মনে হতো হরিহর আত্মা। একসঙ্গেই আসা-যাওয়া করত মতিঝিলের অ্যাডফার্ম কাম প্রিন্টিং প্যাকেজিংয়ের অফিসটায়। পরে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের চিড় তো স্পষ্টই ধরা দেয়, তারপর মুক্তাকে দেখা যাচ্ছিল না বেশ কিছুদিন যাবত। সেদিন দুপুরবেলায় হঠাৎ শিরিনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় কৌতূহলবশত মুক্তার কথা জিজ্ঞেস করতেই শিরিন যা শোনায়, তাতে রীতিমতো তাজ্জব। শিরিন জানায়, ও আমারে নিয়া উল্টাপাল্টা অনেক কথা বলে। সবটা না হলেও কিছু কিছু তো আমার কানে আসে। তা ভাই, আমি কিন্তু ওরে খারাপ কই না। একটু সেন্টিমেন্টাল হলেও মনটা কিন্তু ভালো, জেদটা একটু বেশি। আমাকে ভুল বুঝতে পারে। আমি কিন্তু ওর ভালো চাই। আমার লগে আগের সম্পর্কটা থাকলে ওর এই সর্বনাশটা হইবার দিতাম না। আমি একটা কথা সাফসুফ বলে দিলাম, মুক্তাকে একদিন পস্তাতে হবে।

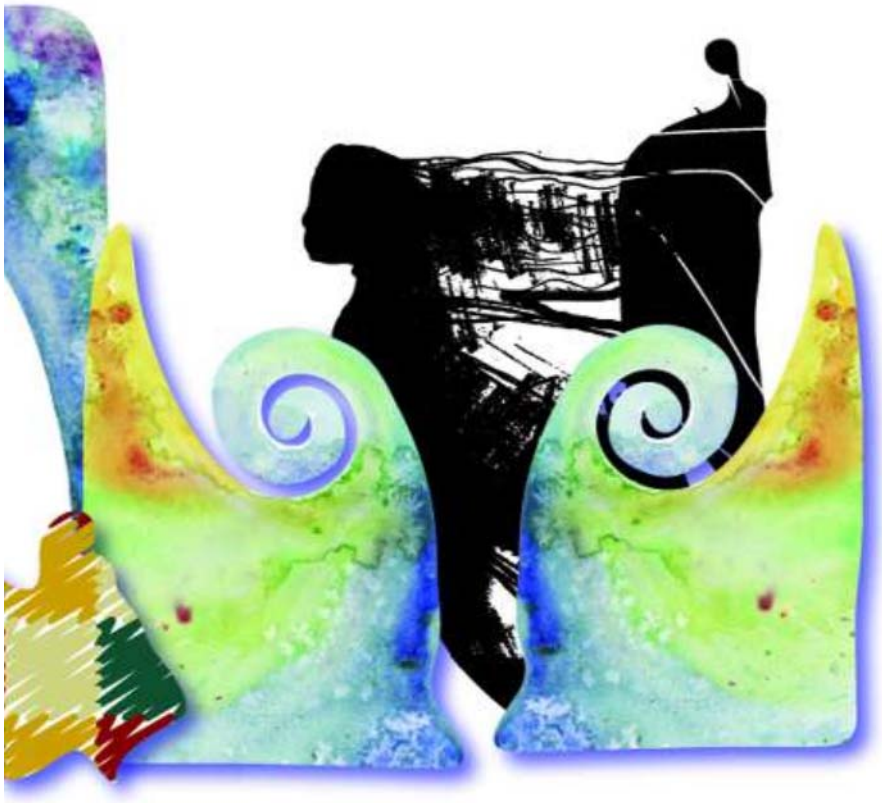

যতটা দেখেছি আর জেনেছি, মুক্তার স্বভাব-চরিত্র যেরকম, ওর পক্ষে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। তাই বলে এমন একটা কাণ্ড ঘটাবে, এটা ছিল কল্পনাতীত।

শিরিন আফসোস লুকাতে পারেনি, হতভাগী করল কী! ওর যা চেহারা-সুরত, সুন্দর ফিগার, ভালো কাউকে ফাঁসাতে পারত। এখন এ ঝামেলা কেউ ঘাড়ে নেবে?

কথাটা শোনার পর আর নিশ্চুপ থাকলাম না- মেয়েটা এতো বোকা, জানতাম না। ঢাকা শহরে এটা কি কোনো সমস্যা? অলিগলিতে এখন কত ক্লিনিক-নার্সিং হোম, কোনো একটা থেকে ঝামেলামুক্ত হলেই তো পারত।

মুক্তার তখন কয় মাস যাচ্ছিল, সেটা জানানোর সুযোগ পায়নি শিরিন। হঠাৎ বেজে ওঠে ওর মোবাইল ফোন। কোত্থেকে কল আসতেই সে ছুটে যাওয়ার সময় বলে-কিছুক্ষণ আছেন তো আমি আবার আসব।

হয়তো অপেক্ষায় থাকতাম। বিনা নোটিশে লোডশেডিং। অন্ধকারের ভেতর এপ্রিলের গুমোট গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার চেয়ে বিরক্তিকর আর কী আছে। বিকেলের মধ্যে আবার অন্য জায়গায় যাওয়ার তাগাদা। তাছাড়া অভিজ্ঞতা আছে যে শিরিন কখন ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিছুক্ষণ পর বিদায় নিই। খারাপ লাগছিল মুক্তার জন্য। চৌধুরীর অফিসেই একদিন শিরিনের সঙ্গে মুক্তাকে দেখে যাকে বলে পয়লা নজরেই কুপোকাত। শ্যামলা, মিষ্টি চেহারা, দোহারা গড়ন শরীরে টাইট ফিটিং সালোয়ার-কামিজ যে কোনো পুরুষের অন্তরে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট। আমি আর কোন ছার! বলতে দ্বিধা নেই যে ওকে দেখে এতটাই উত্তেজিত অথবা মুগ্ধ ছিলাম যে ওদের ভাষায় প্রোগ্রাম বলতে যা বোঝায় সেটা মুক্তার সঙ্গে হয়ে যেতে পারত। শুধু শিরিনকে বললেই চলত। কখনো যাইনি তবে শুনেছি, শাজাহানপুরের কোনো এক গলিতে শিরিনের পরিচিত এক আপার ফ্ল্যাট আছে। জানালায় ভারী ভারী পর্দা টানা বেডরুম এতটাই অবাধ এবং নিরাপদ, সেখানকার আধো অন্ধকারে নিবিড় মুহূর্ত থেকে চূড়ান্ত আল্লেষে পৌঁছে যেতে কোনো বাধা নেই। কেবল মাত্র খরচের মতো টাকা চাই। কিন্তু আমি ধরতে গেলে

Accident May Happen
Protection You Must Ensure

Call :

Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Head Office: 42, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone : 9550379, 9564731, PABX : 9555073-74, 9563056-58, 9566125
FAX : +88-02-9564212, E-mail : bgic@citechco.net
Web: http://www.bgicinsure.com, Cable : BGIC, G.P.O. Box No. 3519

First General Insurance Company In Private Sector.
Service is our Strength

প্রায় ছাপোষা আর হিসেবি মানুষ। সরকারি বেতনে সংসারে টানাটানি বলেই উপরি আয়ের ধান্ধায় ছুটতে হয় এদিক-ওদিক। মেয়েলোকের পেছনে ওড়াবার মতো টাকা কোথায়? তারপর সামাজিক ভয়ভীতি আর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা ঝেড়ে ফেলার সাহস কোনোকালেই ছিল না। তবু মুক্তার প্রতি একটা কৌতূহল শুরু থেকেই আমাকে পেয়ে বসে। এর নামই কি দুর্বলতা? সপ্তাহখানেক পর আবার দেখা, চৌধুরীর অফিসেই। সেদিন একা, শিরিনের খোঁজে গিয়েছিল। টাইট ফিটিং সালোয়ার-কামিজ নয়, শাড়ির সাথে ম্যাচ করা ব্লাউজে মুক্তাকে লাগছিল দারুণ। গায়ে পড়ে আলাপ কুড়াতে গিয়ে বোকার মতো এক কাণ্ড করে বসলাম-ম্যাডামের সাহেব আছেন কি নেই?

-ছিল, এখন আর নেই।

-নেই কেন?

-অত জেনে দরকারটা কি আপনার?

পাল্টা প্রশ্নে থ মেরে গিয়েছিলাম। আর ঘাটাতে যাইনি। আমার অবস্থাটা আঁচ করেই মুক্তা বলল, মাইন্ড করলেন না তো? ওর কথা, মানে আমার এক্স হাজবেন্ডের কথা মনে হলেই মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারি না।

সেদিন না হলেও পরে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে জেনেছি অনেক কিছু। একদিন, সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপজনিত দারুণ অস্বস্তিকর গরমের মধ্যেও আমার মনটা ফুরফুরে ছিল যে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডাকসাইটের সিবিএ নেতার সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে পঁচিশ হাজার ক্যালেন্ডার প্রিন্টিং এবং সাপ্লাই অর্ডার অনেকটা পাকাপোক্ত করে আসতে পেরেছি। সেই সুখবর চৌধুরীকে পৌঁছে দিতে ওর অ্যাডফার্মে পা রেখে দেখি সে নেই। তবে সাদা আঁটসাঁট পোশাকে অফিস আলো করে বসে আছে মুক্তা। চৌধুরীর রিসেপশনিস্ট জানায়, সব গাজীপুর গেছেন, মোবাইল অন থাকবে ইচ্ছা করলে কথা বলতে পারেন।

মুড ভালো ছিল বলেই শিরিনের অপেক্ষায় থাকা মুক্তাকে পেয়ে হঠাৎ খেয়াল জাগে, লাঞ্চ আওয়ারের রেশ ফুরিয়ে যায়নি, ওকে নিয়ে কোনো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লে কেমন হয়। অফার দিতেই লুফে নিই, আমার কাছে নাকি ওর কিছু! কথা বলার আছে। পরিচিত চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে মতিঝিলের কাছেই, তার সারকুলার রোডে। কড়া রোদে রিকশায় হুড না তুলেই সেখানে যাওয়ার সময় বললাম, আমার সঙ্গে এভাবে চলে এলে, শিরিন আবার মাইন্ড করবে না তো!

-কে মাইন্ড করল আর কে মাইন্ড করল না, সেটা আমি কেয়ার করি না। আমার ইচ্ছে হলো তাই চলে এলাম। আমি তো কারো কেনা বাদী নই।

চাইনিজ রেস্তোরাঁয় দোতলায় নির্জন এক কোণ বেছে নিই, আধো আলো আধো অন্ধকার, এয়ারকুলার ওগড়ানো ঠাণ্ডা পরিবেশ পেয়ে অর্ডার অনুসারে খাবার পৌঁছার আগেই বেশ মজে যাই কথাবার্তায়। শুধু আমি নই, মুক্তাও ছিল ফুরফুরে মোজাজে। অনেক কথাই বক বকিয়ে গেল; এক বোনের বাসায় থাকে, পেইংগেস্ট। বেশিদিন থাকবে না। একে তো মুগদাপাড়ার ওপাশে মান্ডা, এলাকা হিসেবে সুবিধার নয়, তারপর বোনের স্বামীটা মিন মাইন্ডের। ইস্কাটনের এক কর্মজীবী নারী হোস্টেলে ওঠার চেষ্টা করছে। তার এক বান্ধবী থাকে। সেদিন সুযোগ বুঝে ওর স্বামীর প্রসঙ্গ তুললে ঠিক আগের মতো বিরূপ না হলেও মুক্তা সত্যিই খুশি হতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলে। তবু মুখ খোলে। বিয়েটা হয় তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, যা হওয়ার তাই হয়েছে; অ্যাডজাস্ট হয়নি-ডিভোর্স নেয় নিজ থেকেই। এসব জানাতে গিয়ে মুক্তা বলল আমার স্বামীকে শুধু দোষ দিচ্ছি কেন, গোটা পুরুষজাতটাই ও রকম। বউ যেন কেনা বাঁদি। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই।

-ভুল ধারণা। সব পুরুষই এক নয়।

আমার ভিন্নমত দেখে মুক্তা ক্ষণেক নিশ্চুপ থেকে ফের বলে, আমি বিশ্বাস করি না। সব পুরুষই এক। যতক্ষণ তার কথা– চলো ততক্ষণ সবই ভালো, কিন্তু যখন নিজের ইচ্ছেমতো চলতে যাবে তখনই দেখবে, কত বাধা কত উপদেশ।

জানেন, এই যে তসলিমা নাসরিন নামের এক লেখিকাকে দেশছাড়া করা হয়েছে তার অপরাধটা কোথায়? অপরাধ একটাই মেয়েদের পক্ষে উচিত কথা লেখে সে। আপনি ওর লেখা পড়েছেন?

আমি নিরুত্তর। ট্রেতে স্যুপের বাটি চড়িয়ে বেয়ারা এসে যাওয়ায় মুক্তাও চুপচাপ। খানিক বাদে গরম স্যুপের বাটিতে চীনামাটির চামচ চুবিয়ে সে বলল, এই যে আপনার সঙ্গে এসে এভাবে গল্প করেছি, স্বামীর ঘর করলে এটা কি সম্ভব হতো? ঘরের বাইরেই আসতে দিত না, পরপুরুষের সঙ্গে চাইনিজ খেতে খেতে গল্প করা তো দূরের কথা।

– কিন্তু স্বামীছাড়া চলবে কদ্দিন?

- যতদিন পারি চালিয়ে যাব। আর না পেলেও দুঃখ নেই। নোংরা মন থেকে দূরে থাকতে চাই। প্রতিবাদ না করে পারলাম না– তুমি কিন্তু ঠিক বলছ না, স্বামীদের মন নোংরা হবে, এটা ঠিক নয়।

মুক্তা তার কথাতে অনড়। স্বামীর মন যে কত নোংরা হতে পারে, সেটা বোঝাতে নিজের কাহিনী শুনিয়ে গেল। জেলা শহর লাগোয়া গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি। বিদ্যুৎ আছে, রিকশা চলাচলের রাস্তা আছে। একটু হেঁটে গেলে বাসে চড়েও যাওয়া যায় শহরে। মুক্তা সেখানকারই এক মহিলা কলেজের ছাত্রী ছিল বিয়ের আগে। রাস্তাঘাট সবই চেনা। রূপবাণী আর ছায়াবাণী নামের দুটি সিনেমা হল শহরের কোন কোন জায়গায় সেটাও তার জানা। মৌসুমী-সালমান ছুটি অভিনীত সুপারহিট ছবি রূপবাণীতে এলো, তার শ্বশুরবাড়ির সামনে রাস্তার ওপাশে বিশ্বাস মঞ্জিলের বাউন্ডারি দেওয়ালে ছবির পোস্টার পড়ার পর থেকেই মুক্তার মন আনচান করছে। কয়েক জনের মুখে ছবির গল্প শুনতে শুনতে দেখার অপেক্ষায় ছিল। সেই ইচ্ছা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেও লাভ হলো না-জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের মইদ্দে হলের ভেতর অতক্ষণ বস্যা বস্যা বই দেখানের কাম নাই। মাঝে-মধ্যে বাবা ইটভাটা দেখাশোনা করলেও স্বামী তার বিএ পাস বেকার। তবে ব্যস্তবাগিশ। দুপুরে এক ফাঁকে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই যে বেরোয় রাত দশটা-এগারটার আগে বাড়ি ফেরার নাম নেই। মাঝে-মধ্যে মদ গিলে ফেরে। মুক্তার কানে এসেছে, বাজে জায়গায় গিয়ে ফুর্তি ফাট্টা করে। মুক্তা নাছোড়বান্দা। স্বামী যাবে না তো কি হয়েছে, এক চাচাতো দেবর আছে, সবে কলেজে ঢোকা তরুণ। তাকে নিয়েই সিনেমা দেখতে যা এক বিকেলে। শাশুড়ি মিয়াবাড়ির মেয়ে বোরখা ছাড়া কোথাও এক পা বেরোয় না, ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি। সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবে অমন সময় প্রবল বৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। ততক্ষণে মিয়া বাড়ির নাতি ফিরে এসেছে, এসে তো মদ গিলেছে তারপর মায়ের উস্কানি। শুধু মুখের নয়, দুই হাতের ঝালও মেটায়। মুক্তা বইয়ে ক্রীতদাসীদের কথা পড়েছে, মা-চাচিদের মুখে দাসি-বাঁদীদের গল্প শুনেছে; নির্যাতনের সেই নির্মম মুহূর্তগুলোতে নিজেকে ক্রীতদাসী-বাঁদীদের অধম বলেই মনে হতে থাকে। স্বামী তার কখনোই মনের মতো ছিল না, নিষ্ঠুর-স্বার্থপর। দরিদ্র প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের বাবার মুখ চেয়ে বাস্তবতাকে মেনে নেয়। সেই স্বামী এতটা পাষণ্ড হতে পারে ধারণাই ছিল না। প্রহারের চোটে বোধহয় জ্বর এসে যায়। অসহ্য যন্ত্রণার ভেতরেও বার বার কানে বাজে অশ্রাব্য গালিগালাজ, তার চরিত্র নিয়ে কটূক্তি। অপমানের একটি শেষ আছে। ভেতরে ভেতরে ফুঁসে ওঠে মুক্তা। আর নয়, সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার একটা জেদ তখন থেকেই পেয়ে বসে। সে রাতে আবার বৃষ্টি হয়, রীতিমতো ঝড় শুরু হয়। ঘরের ভেতর খাটের ওপর তার মদ্যপ ও পরিশ্রান্ত স্বামী নাক টেনে ঘুমালেও বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর দুই পা ছড়িয়ে বসে মুক্তা, বাতাসে তেড়ে আসা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে ভারী হয়ে যায় অন্ধকারে লুটানো তার শাড়ির আঁচল। ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এক সময় থেমে যায় বৃষ্টি-বাতাস। অদূরের জামে মসজিদের মাইকে ছড়ানো ফজরের আজান কানে আসে। পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হওয়ার মুখে অন্ধকারের চাদর সরে রাস্তাঘাটে কিছুটা পষ্ট হতে না শুকানো কাপড়ে প্রায় বিধ্বস্ত শরীরে পা বাড়ায়, তার বাবার বাড়ি গ্রামের দিকে, বেশিদূরে নয়; তারপর খালি রিকশা পেতেই চড়ে বসে। রোদ ওঠার আগে ওভাবে পৌঁছাতে দেখে ভাইবোনেরা ভীষণ অবাক। কান্নায় ভেঙে পড়ার আগে মুক্তা মাকে শুধু বলেছিল– রিকশাওয়ালার ভাড়াটা দিয়া দ্যাও।

শ্বশুরবাড়ি, স্বামীর ঘরে আর যায়নি। মুক্তার ছোট খালার এক ভাসুর উকিল, তাকে দিয়েই একতরফা ডিভোর্স। উকিল ভদ্রলোক তাকে

মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, নানা ঝামেলার কথা চিন্তা-ভাবনা করেই ওদিকে আর যাওয়া হয়নি। মুক্তার ইচ্ছে ছিল কলেজে ফের ভর্তি হওয়ার। কিন্তু কলেজে ঢুকে বাবার টানাটানির সংসারের বোঝা বাড়াবে কি বাড়াবে না– এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঘড়ির পেণ্ডুলাম হয়ে দুলছিল, এমন সময় খালা তো বোন রাশিদা গিয়ে হাজির। ঢাকায় থাকে, হাসপাতালের নার্স। মুক্তার কাছে ঢাকা শহরের কত কী গল্প শোনায়। ঢাকা আর ঢাকা নেই, শত শত অফিস-গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি, হাজার হাজার মেয়ে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। রাত দশটা-এগারোটায় ঢাকা শহরের রাস্তায় দেখা যায় কত মেয়ে কাজ সেরে নির্ভয়ে ঘরে ফিরছে। এ গল্প শোনার পর হঠাৎ করে বেড়াতে আসা খালা তো বোন মুক্তার সামনে অন্ধকারের টর্চ লাইট হয়ে দেখা দেয়। সেও ঢাকায় যাবে, আর কিছু না পারুক, আগে যাব ঢাকায়। প্রস্তাবটা দিতেই রাশিদা শুধু খুশিতে ডগমগ নয়, তার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে চুপিচুপি বলল– তোর খবর জানার পর এই কথাটা শোনার জন্যই আসছিলাম তোদের বাড়ি। তুই শিক্ষিত মাইয়া দ্যাখতে খারাপ না, গেলামে ক্যান পইচা পইচা মরবি! টাউনে চল, সেখানে টাকা আছে, মানুষের মনে আনন্দ-ফুর্তি আছে।

রাশিদার মোতাবেক টাউনে, মানে এই ঢাকায় যে আনন্দ আছে ফুর্তি আছে, তার আসল চিত্রটা ধরতে সপ্তাহখানেকের বেশি লাগেনি। তাকে নিয়ে রাশিদা প্রায় কয়েকদিন শহরের এমাথা থেকে ওমাথায় কত কী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, মার্কেটে ঢুকে এটা-ওটা কিনে দেয়। সেই সঙ্গে কত কি উপদেশ-লজ্জা-শরমের বালাই রাখবি না। বাঁচতে হলে টাকা চাই। টাকার জন্যই সব। হাতে টাকা থাকলে কেউ আর লাথি-গুঁতা দেবার সাহস পাবে না। তারপর একদিন, মহাখালি রেলগেট থেকে রিকশায় চড়ে রেললাইনের পাশঘেঁষা রাস্তা ধরে নির্জন এক এলাকার আলিশান বাড়ির তিনতলায় ঢুকে মুক্তা দারুণ অবাক হয়ে যায়। খুবই পরিচিত এক মুখ। সিনেমার পর্দায় দেখেছে অনেক। রাশিদা বলে– চিনোস, নায়িকা সেলিনা।

ঠিক দুপুর বেলায় সেলিনা দুজনকে দেখে খুব খুশি। ডাইনিং টেবিলে নিয়ে আদর করে খাওয়াতে খাওয়াতে রাশিদাকে বলে তোমার এত সুন্দর বোন আছে, আগে তো বলনি। তোমরা এসে ভালোই করছ। হঠাৎ কইরা চিটাগাঙের এক সওদাগর আইসা পড়ল, আমার শইলটাও খারাপ, মাসিক চলতাছে। ভাবতেছিলাম কারে কল দিই– এমন সময় তোমরা আইসা ভালোই করছ।

খাওয়া-দাওয়ার পর সেলিনা একবারে বেডরুমে বক্স খাটের নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া সওদাগরের সঙ্গে দুই বোনকে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই মুক্তাকে চয়েজ করে। সেলিনা আর রাশিদা তাকে সওদাগরের জিম্মায় রেখে রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা লক করে দিতে ভুল করে না। মুক্তার জীবনে এ যেন আরেক বাসর রাত। প্রথম বাসর রাতের মতোই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার সারা শরীর। এবার সংকোচ-অজানা ভয়ে নয়, এক ধরনের ঘৃণায়। এক প্রাগৈতিহাসিক সরিসৃপ তাকে খুবলে-খাবলে খাচ্ছিল। সওদাগরের কাছ থেকে গিফট বাবদ পাওয়া পাঁচশ টাকার দুইটি চকচকে নোটও সেদিন গ্লানি ঠেকাতে পারেনি। খুব খারাপ লাগছিল তার। রাশিদার সঙ্গে স্কুটারে চড়ে ফেরার সময় বার বার কেবল বাবার মুখটা নজরে ভাসতে থাকে। একজন স্কুল শিক্ষকের মেয়ে কিনা শেষ পর্যন্ত...। বাবা জানতে পারলে আত্মহত্যা করবে– এ আশঙ্কায় ভারী হয়ে উঠেছিল

তার দুই চোখ। মুক্তা বলল, সে কথা মনে পড়লে তো এখন অবশ্য হাসি পায়। তখন কাচা ছিলাম তো। এখন অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি। রশিদা ছাড়াই চলতে পারি, শিরিনরা আমার বান্ধবী।

খারাপ লাগছিল না মুক্তার কথা শুনতে। ও যে

বানিয়ে গল্প করছে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে যখন বেরোই রীতিমতো বিকেল হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিকেল ফুরাতে বেশি বাকি নেই। সরাসরি বাসায় ফিরবে মুক্তা। এটা জানার পর, রিকশায় ওর পাশে বসে কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে মুগদা বিশ্বরোড পর্যন্ত এগিয়ে দিই। রিকশায় যেতে যেতে মুক্তা বলে ওঠে আহ হো, আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি যেদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে এলাম, সেদিন আমার এক বান্ধবীর কথা খুব মনে পড়ছিল। বান্ধবীর নাম আসমা, একই সঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হওয়ার পরও পরামর্শ দিয়েছিল, খবরদার মুক্তা ভুল করবি না। দুই-তিন বছরের আগে কোনো বাচ্চা নিবি না, নিলেই তোর লাইফটা শেষ। জন্মনিয়ন্ত্রনের বড়ি খেয়েই বাসরঘরে যাবি। জানেন, সেদিন অত কষ্ট যন্ত্রণার ভেতর আসমার কথা মনে পড়তেই ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছিল। এক বছরের বেশি স্বামীর সংসার করেছি, বলুন তো বাচ্চা-কাচ্চা হলে আমার অবস্থাটা আজ কি হতো?

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটার জবাব ছিল না আমার কাছে। বিশ্বরোড থেকে মুগদাপাড়ার ভেতরে সেঁধে যাওয়া রাস্তার মুখে রিকশা হতে নেমে যাবার আগে জিজ্ঞেস করি– তুমি কি এখন রাশিদার বাসায় থাকো? না, না, রাশিদা তো আমার খালাতো বোন। আমি থাকি এখন আমার চাচাতো বোনের বাসায়।

সত্যি বলতে কী, পেছনের কথা জানার পর মুক্তা সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যায় অনেকটা। ভাবতেও পারিনি, ও এমন সাংঘাতিক রকমের ঝুঁকি নিয়ে বসবে। পরিচয়ের পর থেকে দেখেছি, ওর মধ্যে একটা ড্যামকেয়ার ভাব। তাই বলে এতটা বেহিসেবি-এটা জানা ছিল না। হিসেবি-বুদ্ধিমতি বলেই জানতাম। স্বামীর ঔরসকে যে গর্ভ ধারণ করতে চায়নি, সে কিনা এত বড় একটা ভুল করে বসবে!

শিরিনের মুখে খবরটা শোনার পর কিছুতেই অঙ্ক যখন মেলাতে পারছিলাম না হঠাৎ সন্দেহের চাগার দেয় আগের সুসম্পর্ক নেই দেখে আবার গিবত গাইছে না তো! কে জানে! মুক্তাকে পেলে আসল ঘটনা জানা যেত। ওকে পাবো কোথায়? বেশ কিছুদিন হয় মুক্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোথায় থাকে সেটাও তখন নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিল না। মতিঝিলে চৌধুরীর অফিসে কী কারণে যেন মুক্তার আনাগোনা প্রায় বাদ পড়ার মতোই। আমার সঙ্গে যোগাযোগটাও তথৈবচ। এ ক্ষেত্রে দোষটা আমারই, দুজনের ঘনিষ্ঠতায় বাগড়া পড়ে এমন একটি ঘটনায় যা ছিল সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কার কাছ থেকে কিভাবে যেন মুক্তা আমার অফিসের ফোন নাম্বারটা জোগাড় করেছিল। সরকারি অফিসের এজমালি ফোন। দুদিন সে ফোন করলে রীতিমতো অস্বস্তিতে জড়িয়ে পড়ি। তার কারণও আছে। আমার এক সিনিয়র সহকর্মী রশিদ সাহেব, আমরা মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় একই স্টাফ কোয়ার্টার পাশাপাশি দুটি দালানের বাসিন্দা। রশিদ সাহেবের স্ত্রী শাহানা ভাবীর মনটা বড় ভালো, দোষ একটাই মহিলার পেটে কিছু থাকে না। আমার গিন্নির সঙ্গে বেশ খাতির, কুদিন যেতে না যেতেই একজনের পায়ের ধুলো পড়ে আরেকজনের বাসায়। আমার আশঙ্কা ছিল মুক্তার এই ফোনের ব্যাপারটা রশিদের কানে গেলে ভদ্রলোক, নিশ্চয় তার স্ত্রীকে বলবেন। আর সেটা ঘটলে সংবাদটা আমার গিন্নির কানে উগড়ে না দেয়া পর্যন্ত শাহানা ভাবীর পেটের ভাত হজম হবে না। এমনিতেই তিন সন্তানের জননী হয়েও গিন্নির মনে নানা সন্দেহের বাতিক, এমন খবর শোনার পর সংসারে অশান্তির লতাপাতা গজিয়ে উঠতে আর কতক্ষণ। তারপর কলোনির যা পরিবেশ, একান ওকান হতে হতে তিন থেকে তাল হবে। এসব কথা ভেবেই আমার পরিচিত কোনো মেয়েকে কখনো অ্যালাউ করি না অফিসে। মুক্তাকেও বলেছি-দ্যাখো, আমার

অফিসে আর ফোনটোন করো না। ওখানকার পরিবেশ ভালো নয়। বুঝতেই পারছ, সরকারি অফিসের কেরানিদের মন ছোট।
অনুরোধ মুক্তা রেখেছিল, আর ফোন করেনি আমার অফিসে। অথচ সে, আমাকে কোনো এক শিল্পপতির কাছ থেকে গিফট হিসেবে পাওয়া মোবাইল ফোনের নাম্বারটা জানাতে দ্বিধা করেনি। বেশ কয়েকদিন অফিস হতে বেরিয়ে ওর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে মিলিত হয়েছি কখনো চৌধুরীর অফিসে, কখনো অন্য কোথাও। একদিন ফোন করতেই সে জানায়– ভালো হলো। আধাঘণ্টার মধ্যে শাহবাগ মোড়ে জাদুঘরের পাশে আসতে পারবেন?
- কেন?
- আগে আসুন না।
সেগুনবাগিচা হতে শাহবাগ মোড়ের দূরত্ব আর কত। ঠিক আধাঘণ্টার মাথায় পৌঁছে দেখি, মুক্তা আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। চকোলেটে সঙ্গেও হাল ফ্যাশনের থ্রি পিস আর পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করা সানগ্লাসে ওকে লাগছিল দুর্দান্ত। মিনিট কয়েক আগে পৌঁছেছে। রাস্তা পেরিয়ে দুজনে হেঁটে গেলাম আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের নিচতলায়। এক বইয়ের দোকান থেকে হুমায়ুন আজাদের একটি বই কিনতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলাম। ওর মতো মেয়ে যে এ ধরনের বই কিনে পড়ে এটা ছিল আমার ধারণার বাইরে। স্ন্যাকস বারে ঢুকে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে চিপস খেতে খেতে না বলে পারলাম না তুমি হুমায়ুন আজাদ পড়ো?
-এতে কি দোষের কিছু আছে? ওর লেখা আমার ভালো লাগে। আপনি ওর 'নারী' পড়েছেন?
- না, পত্রিকায় দেখেছি সরকার বইটা ব্যান্ড করে দিয়েছে।
-সুযোগ পেলে পড়বেন। পড়ার পর দেখবেন, মেয়েদের সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে।
- তাই নাকি!
খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মুক্তা বলে– জানেন, একটু আগে আপনার প্রশ্ন শুনে আমার শ্বশুরবাড়ির কথা মনে পড়ল। ওরা কত মিন মাইন্ডের। গল্প উপন্যাস পড়াকেও ওরা শুধু খারাপ চোখেই দেখত না, বলত ওসব পড়া নাকি পাপ। বুঝতেই পারছেন ভাই, কী অবস্থা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি।
সেদিন আমার ইচ্ছা জেগেছিল মুক্তাকে নিয়ে মতিঝিলে গিয়ে মধুমিতায় ঢুকব। ইভিনিং শোয়ে সিনেমা দেখব। হলিউডের বাজার কাঁপানো একটা ছবি চলছে। ইচ্ছে প্রকাশ করলাম যথারীতি। কিন্তু আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে শাহবাগ মোড়ের দিকে এগোতেই মুক্তার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। কোনো এক মিলি আপার কল। অনেকটা তড়িঘড়ি করেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুটারে চড়ে বসল। গন্তব্য সামান্য দূরেই, কারওয়ান বাজারের কাছে হোটেল সোনারগাঁও। কেন জানি, সেই মুহূর্তে মুক্তাকে মনে হলো দারুণ স্বার্থপর। অমন সুন্দর বিকেলটা মাটি করে দিয়ে গেল। নিজকে অপমানিত, পরিত্যক্ত ঠোঙ্গার মতো মনে হতেই ওর প্রতি না বিগড়ে পারলাম না।
শাহবাগ মোড়ে স্কুটারে চড়ে বিদায় নেয়ার পর মুক্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না বললেই চলে। ওদিকে বন্ধুবর চৌধুরীর সঙ্গে যাকে বলে একটু মন কষাকষি চলছিল তেমন একটা প্রফিট হয়নি– এই অজুহাতে আমাকে ন্যায্য পারসেন্টিজ থেকে বঞ্চিত করায়। কিছুদিন মতিঝিলে তার অফিসে যাওয়া-আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। তারপর মুক্তার ওপর বিগড়ে যাওয়ায় পকেটের পয়সা খরচ করে ওর মোবাইলে ফোন করার আগ্রহ একদম ছিল না। চৌধুরীর মতো বন্ধু থাকায় কিংবা ঘটনাচক্রে মুক্তার মতো আরো মেয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। স্বাভাবিক হিসেব অনুযায়ী মুক্তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাওয়ার মুখেই আরেক ঘটনা, যা ছিল আমার কাছে ধারণাতীত। মুক্তা কতটা বেপরোয়া মেয়ে, সেদিনই টের পেয়েছিলাম। লাঞ্চ আওয়ারের কয়েক মিনিট বাকি, ফাইলপত্র গুছিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠতে যাব আর অমনি গোটা অফিস রুমে পারফিউমের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে মুক্তা হাজির। জীবনে কখনো ভূত দেখলেও বোধহয় অতটা চমকে উঠতাম না। মুক্তার হাইফাই বেশবাসে আশপাশে আমার সহকর্মীদের চোখ ছানাবড়া না হলেও বিস্ময় আর কৌতূহলের ঝিলিক। সেদিন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তবু যেন ঘামছিলাম। একমাত্র স্বস্তি যে রশিদ সাহেব নেই, গলব্লাডারে কুপোকাত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তখন। মুক্তা বলল– আপনাকে আমার খুব দরকার। না এসে পারলাম না।
কথা না বাড়িয়ে গোমড়া মুখে দ্রুত কাগজপত্র গোছগাছ করে বললাম– চলো, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি। অফিস থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় পা রাখার পর নিজকে আর সংযত রাখতে পারিনি– আমার অফিসের ঠিকানা পেলে কী করে?
- বাহ, এটা খুব কঠিন কাজ। ইচ্ছে করলে আমি তো আপনার বাসাও খুঁজে বের করতে পারি।
- তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে ফোন করতে নিষেধ করেছিলাম। আমাদের অফিস সরকারি অফিস, চৌধুরীর অ্যাডফার্ম নয়। এখানে অনেক রকম সমস্যা আছে। তোমার এভাবে আসাটা উচিত হয়নি।
- আমার কথায় মুক্তা থতমত খেয়েই বলে– কিন্তু এমন একটা প্রবলেমে জড়িয়ে পড়েছি যে আপনার কথাই বার বার মনে পড়ছিল। তাই চলে এলাম।
- আমি তো তোমার এমন কেউ নই, আমার কাছে, আমার অফিসে এভাবে ছুটে আসতে হবে, চৌধুরীর অফিসে খবর দিলেই তো পারতে ...।
এ ধরনের আচরণ কিংবা বক্তব্য মুক্তা বোধহয় আশা করেনি, মুহূর্তেই বলে ওঠে- প্লিজ, প্লিজ আর না। কাকতালীয় ভাবেই একটা খালি রিকশা আমাদের পাশে দাঁড়ানো মাত্রই মুক্তা চড়ে বসে মতিঝিলে চলো।
বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মুক্তার আতে ঘা লেগেছে। আমিও হাফ ছেড়েছিলাম। খানিকটা হেঁটে পরিচিত এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ি, লাঞ্চ আওয়ারের ক্ষিদেটা যথারীতি চাগাড় দেয়। কিন্তু খেতে বসে কোনো স্বাদ পেলাম না। মুক্তার জন্য খারাপ লাগে। অমন ব্যবহার না করলেও পারতাম, খুব অপমানিত বোধ করেছে। আসলে শাহবাগের সেই ঘটনা, তারপর বিনা নোটিশে অফিসে ওর আগমনে আর ঠিক ছিলাম না। মুক্তা যে অমন নাটকীয়ভাবে বিদায় নেবে ভাবিনি।
রেস্টুরেন্ট থেকে অফিস রুমে ফেরা মাত্রই যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটে। সহকর্মীরা ঘিরে ধরে। মুক্তার পরিচয় জানতে চাওয়া মাত্রই ওদের রীতিমতো গল্প শোনালাম– আমার এক শ্যালিকা, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে, এখন আমাকে বলছে মিটমাট করে দিতে। রাস্তায় নিয়ে গিয়ে আচ্ছা মতো ধোলাই দিয়ে বললাম এসব নিয়ে অফিসে কেন, বাসায় গেলেই পারতে। নিশ্চিত হলাম যে সহকর্মীরা গল্পটা গিলেছে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় রশিদ সাহেব নেই দেখে। নইলে থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।
মুক্তা বলেছিল, তার একটা প্রবলেম আছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, অর্থকড়িসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। আমার ধারণা ছিল, ঢাকায় মুক্তার মতো মেয়েদের অর্থের অভাব কখনো মেটে না। যত দেবে, ততই চাইবে। তবে শিরিনের মুখে ওর দশা শোনার পর ঠিকই আঁচ করলাম, সেদিন মুক্তার সমস্যাটা কোথায় ছিল।
হঠাৎ লোডশেডিং না ঘটলে চৌধুরীর অফিসে শিরিনের জন্য অপেক্ষা করতাম। ওর দেখা পেলে মুক্তা সম্পর্কে আরো কিছু জানা যেত। অন্তত মুক্তা কোথায় থাকে সেটা নিশ্চয় ওর জানা আছে। কয়েক দিন পর অফিস ছুটি শেষে মতিঝিলে গেলাম শিরিনের সন্ধানে। চৌধুরীর অফিসের রিসেপনিস্ট মেয়েটা জানায়- ভাইয়ার ব্যাড লাক, একটু আগেই শিরিন আপা উঠে গেলো। বললো বাসায় যাবে।
যাত্রাবাড়ীর ওদিকে সায়েদাবাদ ব্রিজের পাশেই এক গলির ভিতর শিরিনের বাসা। একদিন সন্ধ্যার দিকে চৌধুরীর অফিস হতে বেরিয়ে জুরাইন রেলগেটের কাছে এক কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের দাওয়াত খেতে যাওয়ার সময় শিরিনকে সায়েদাবাদ ব্রিজে নামিয়ে দিয়ে যাই, তখনই একটা গলি দেখিয়ে সে বলে, ওখানে তাদের বাসা। অনেক দিন ধরে থাকে। গিয়ে একটু খোঁজ করলেই বাসাটা খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু কে যাবে সায়েদাবাদ। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মাধ্যমে শিরিনের নাম্বারে রিং করতেই জানা গেল, ওর মোবাইল ফোন অফ। হঠাৎ খেয়াল হলো, মুক্তার মোবাইল ফোন নাম্বার তো আমার কাছে আছে, সরাসরি খোঁজ নিলে দোষটা কী? সেদিন ওকে রীতিমতো অপমানিত করার ঘটনা মনে হতেই আর ভরসা পেলাম না।

বেপরোয়া মেয়ে, অপমানের শোধ তুলতে কসুর করবে না নিশ্চয়। শেষ পর্যন্ত টানা যায়নি কৌতূহলের লাগাম। চৌধুরীর অফিসে নয়, দুদিন পর পরিচিত এক ফোন ফ্যাক্সের দোকান হতে মুক্তার মোবাইলে রিং করতেই রেকর্ডকৃত মেয়েলি কণ্ঠ বেজে ওঠে– দুঃখিত আপনার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
সংসার আর অফিসের নিত্যদিনকার ঝামেলা তো আছেই, তার মধ্যে এগারো-বারো বছরের একমাত্র মেয়েটি কোত্থেকে টাইফয়েড বাধিয়ে বসে। ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলে কিছুদিন। কথায় আছে বিপদ যখন আসে চারদিক থেকেই আসে। মেয়েটি সুস্থ হতে না হতেই ট্রাঙ্ককল এলো, বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শ্বশুর সাহেব হাসপাতালে। অফিস হতে দুদিনের ছুটি নিয়ে নাইট কোচে সস্ত্রীক রাজশাহীতে গিয়েই দায়িত্ব শেষ হলো না, রোগীকে ঢাকায় এনে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করেই তবে হাফ ছাড়তে হয়। নিজ ঘরে নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত, তখন বনের মোষ তাড়াবার সময় কোথায়? শিরিনের সঙ্গে দেখা কিংবা মুক্তার খোঁজ-খবরে বিরতি পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। মতিঝিলে চৌধুরীর অ্যাডফার্মেও যাওয়া হচ্ছিল না। সেদিন অফিসে তেমন কাজ ছিল না, লাঞ্চ আওয়ারের পর বেরিয়ে পড়লাম। আরেকটু হলেই মিস করতাম, চৌধুরীর অফিসে ওঠার সিঁড়িতেই শিরিনের মুখোমুখি। ওকে আবার উঠতে হলো চারতলায়। চৌধুরী নেই অফিসে। তার খাস কামরায় ঢুকে, এসি অন করে দিয়ে বসলাম এক সোফায়।
শিরিন বলে– আপনে যে আমারে খুঁজতাছেন, এটা আমি শুনছি।
- খুঁজছি, মুক্তার ব্যাপারটা জানতে। ওর খবর-টবর কী?
- আমার মুখে শুনলে তো বলবেন, আমি অর বদনাম করতাছি। দাঁড়ান, আপনাকে আসল মানুষ ডাইকা দিচ্ছি, তার মুখেই শুনবেন। শিরিন তার ভ্যানেটি ব্যাগের ভেতর মোবাইল ফোনটা বের করে কাকে যেন কল করে তুই এখন কোথায়, সেক্রেটারিয়েটে? প্রোগ্রাম না থাকলে চইলা আয় চৌধুরীর অফিসে। আমার এক ভাইয়ের লগে পরিচয় কইরা দিমু।
- কে?
- আসলেই দেখতে পারবেন। মুক্তার লগে আমার এখন যোগাযোগ নেই। লাভলি বলতে পারব তার কথা। থার্টি ফার্স্ট নাইট এই লাভলি আরে নিয়ে যায় গুলশানে।
ঘণ্টা আধেকের মধ্যে পৌঁছে যায় লাভলি। ত্রিশোর্ধ্ব, শ্যামলা, ববকাটা চুল, সিল্কের চটকদার সালোয়ার-কামিজে কেমন এক বেলেল্লাপনা ভাব নিয়ে উপস্থিত এই মহিলার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি। হয়তো রাস্তায় চলতে ফিরতে, নয়তো কোনো অফিস বা অনুষ্ঠানে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শিরিন তাকে বলে– এবার বলত মুক্তার ঘটনাটা কী?
অমনিই লাভলি শুরু করে দেয়– আর বলবেন না ভাই, বোকা দেখেছি, কিন্তু এমন বোকা দেখিনি। যাবে বলে নিজের পায়ে কুড়োল মারা। তো বাবা, তুই যখন এমন কাণ্ডটাই করলি, তা বলে এভাবে ছেড়ে দিবি। আমি হলি তো সব ব্যাটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতাম।
যশোরের মেয়ে লাভলি। অনেক দিন ধরে ঢাকায় বসবাস করলেও আঞ্চলিকতার রেশ ঝেড়ে উঠতে পারেনি কথাবার্তায়। সে ইচ্ছে আছে বলে মনে হলো না। মুক্তা কী করে ফ্যাসাদে জড়াল তার বর্ণনা দিতে থাকে বেশ রসিয়ে রসিয়ে। থার্টিফার্স্ট নাইটে তারা হ্যাপি নিউ ইয়ার্স প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিল গুলশান দুই নাম্বারের ওদিকে এক বাড়িতে। রোজা রমজানের দিন হলে কী হবে, মধ্যরাতে আনন্দ-ফুর্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। চড়া ভলিউমে সিডি ছেড়ে ড্যান্সের আয়োজন, সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত বিদেশি মদ আর সুস্বাদু খাবার। একে থার্টিফার্স্ট নাইট, তারপর মিলেনিয়ামের রাত। নতুন সহস্রাব্দের সূচনা। আনন্দে-আত্মহারা সবাই। ১২টা ১ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে পটকাবাজি, হৈ-হুল্লোড়। তারা, মানে পাঁচজন পুরুষ আর তিনটি মেয়ে একটা মাইক্রোবাসে চড়ে বেরিয়ে পড়ে। সে এক অন্য জগৎ। ড্যান্স ক্লাবে গিয়েছে, এ রাস্তায় ও রাস্তায় টহল দিয়েছে; আবার ফিরে গেছে গুলশানের সেই বাড়িতে। এত ড্রিঙ্ক করেছিল যে এক পর্যায়ে হুঁশ ছিল না লাভলির। পরদিন নিজকে আবিষ্কার করেছিল বিরাট এক ড্রইংরুমের ফ্লোরে কার্পেটের ওপর, পোশাক-আশাক ঠিক ছিল না, প্রায় বিবস্ত্রা। তার সঙ্গে যাওয়া মুক্তা আর সোনিয়ার দশাও একই রকম। একটা বড় সোফার ওপর সোনিয়া ঘুমাচ্ছিল একজনকে জড়িয়ে ধরে। আর মুক্তা দরজা খোলা পাশের এক বেডরুমের বিছানায়। সারা রাত আনন্দ-ফুর্তির ধকল কম যায়নি, নেশায় ঘোর তখনো ছিল। লাভলিই ওদের ডেকে তোলে। ঘরে ফিরতে হবে। বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা ছিল, ফেরার আগে আচ্ছামতন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নেয়। লাভলি বলে, সে রাতেই কেসটা বাঁধিয়েছে মুক্তা। প্রোগ্রামে গিয়ে মদ খেলে মাগির আর হুঁশ থাকে না, থার্টিফার্স্ট নাইটে সব ব্যাটার সঙ্গেই ও সেক্স করেছে... বলেই হি হি হি করে হাসতে থাকে।

পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তবে থার্টিফার্স্ট নাইট সম্পর্কে আমার যা ধারণা আছে, তাতে এ ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই বলে মুক্তার মতো একটি মেয়ে... আমার তখন সন্দেহ জাগে, নিশ্চয় লাভলি বানোয়াট গল্প ঝাড়ছে। আমি কী ভাবলাম, না ভাবলাম তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই লাভলি বলল, বুঝেছেন ভাই! আমি হলি কী করতাম! সেদিন যাদের সঙ্গে প্রোগ্রাম করেছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মক্কেলটারে বাইছা নিয়ে বলতাম, তুমার বাচ্চা আমার পেটে এখন কী করবে কর। নইলি মামলা করব, তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বলব। তাতেও যদি কাজ না হতো, তাহলি বলতাম, প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে সব ফাঁস করে দিব। বুঝেছেন তো, তখন ব্যাটা যাতি কোথায়, আমার সাথে কমপ্রোমাইজে আসতি হতো। আর আমি টাকা হাতে পেয়ে এক ক্লিনিকে গিয়ে মামলা খতম করে ফেলতাম। সেটাও করতি রাজি হলো না মুক্তা। অত যদি সতী হয়ে থাকিস, তাহলি এমন ভুলটা করলি ক্যান? বুঝেছেন ভাই! এ লাইনে আমি বহুদিন, কম মাগি কি দেকেছি! এই মুক্তার মতো এমনটা আর দেকিনি।

শিরিন ওর কথায় সায় দেয়, ঠিকই বলেছিস। বেশি বুঝবার চায় তো, তাই এমন দশা হইছে। আমগো কথা শুইনা চললে এমন হতো না।

লাভলির মুখে ঘটনা শোনার পর মুক্তার কথা মনে পড়লেই ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা চাগাড় দিত। তাকে পাই কোথায়? আমার কাছে ওর যে মোবাইল নাম্বার, কয়েক দিন কল দিতেই শুধু শুনতে হলো– সংযোগ বিচ্ছিন্ন। যারা মুক্তার হদিস দিতে পারে, তারাও বলতে পারছে না ঠিক কোথায় থাকে। কারো কারো অনুমান, মুক্তা বোধ হয় ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকায় থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। ওর কোনো পাত্তা না পেয়ে একদিন আমার মনে হলো, এ ঢাকা সত্যিই মেগাসিটি হয়ে গেছে, একটা মানুষ খুন করেও অনায়াসে লোকারণ্যে ডুব মেরে থাকা যায় বছরের পর বছর।

হঠাৎ করে কদিন ধরে বুকে চিনচিনে ব্যথা। আমার এককালের সহপাঠী বন্ধু এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক। তার কাছে গেলাম। প্রথমে ধূমপান ত্যাগ, তারপর ইসিজি করার পরামর্শ দেয়। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতালের লম্বা করিডর মাড়িয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছি, কী আশ্চর্য– উল্টা দিক থেকে মুক্তা আসছে! একা নয়, সাথে কালো মোটাসোটা এক মহিলা। সে মুহূর্তে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার অফিসে গিয়ে রীতিমতো অপমানিত হলেছিল মুক্তা। প্রচণ্ড আবেগে দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে আমার ভেতরটা, না বলে পারলাম না, কোথায় থাক আজকাল? তোমাকে কত খুঁজে বেড়িয়েছি।

অবাক চোখে আমাকে দেখে কয়েক পলক, একটা চাপা হাসি ফুটে ওঠে ওর দুই ঠোঁটে। ঠিক তখনই ওর সঙ্গিনী বলে, একপাশে সইরা দাঁড়া মুক্তা, লোকজন যাচ্ছে না!
মুক্তা কিছুটা সরে বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমিও সরে দাঁড়ালাম। কত বদলে গেছে, চোখের নিচে কালি, সুন্দর মুখটাতে একটা বিপর্যস্তের ছাপ। মলিন বেশবাস। সস্তা দামের ইন্ডিয়ান প্রিন্ট সুতি শাড়ির আড়ালে ওর পেটের স্ফীতি নজর এড়ায় না। মুক্তা বলল, কেমন আছেন আপনি?
– আমি সব জানি, বিশ্বাস কর তোমাকে অনেক

খুঁজেছি।
– একটু অবাক হয় মুক্তা। আমাকে খুঁজেছেন ক্যান?
– বারে, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুঁজবে না! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সাথের মহিলা এবার তাড়া দেয়, চল রে মুক্তা। আপা এখন রাউন্ড থেইকা ফিরছে। আবার বাইরে যাইতে পারে। এরপর আমাকে বলল, কথা থাকলে বাসায় আইসেন। আমার নাম রাশিদা, আমি মুক্তার বড় বইন। আমরা এলিফ্যান্ট রোডের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকি। স্টাফ কোয়ার্টারে গিয়ে আমার স্বামী হুমায়ুন মিয়ার নাম বললেই লোকে দেখাইয়া দিব। নামটা মনে রাখবেন হুমায়ুন মিয়া।
মুক্তা বলল, তাহলে আসি।
– ঠিক আছে। আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ওরা বিদায় নেয়ার পর আমি দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। মুক্তার মধ্যে এতটা পরিবর্তন! কখনো ধারণাও করতে পারিনি। আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুক-কলম বের করে এলিফ্যান্ট রোডের স্টাফ কোয়ার্টার্সের হুমায়ুন মিয়ার নাম টুকে রাখি। এই তাহলে মুক্তার সেই রাশিদা আপা! মহিলাকে বেশ আন্তরিক বলেই মনে হলো। যদিও লিকলিকে সন্দেহ উঁকি দেয়– মহিলার দেয়া ঠিকানা সঠিক কি না। ঠিকানা ভুয়া হলেও আমার আফসোস থাকত না। মহিলা আছে বলেই চরম দুর্দিনে মুক্তার একটা গতি হচ্ছে।
দিন কয়েক পর আমি গিয়ে হাজির হলাম এলিফ্যান্ট রোডের স্টাফ কোয়ার্টার্সে। বৃহস্পতিবার আধা বেলা অফিস, হাতে সময় নিয়েই বেরোই। আগে গেলাম নিউমার্কেটের পাশে এক সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে। সেখানকার এক ব্যবসায়ী নেতা আমার পরিচিত এবং এলিফ্যান্ট রোড স্টাফ কোয়ার্টার্সের বাসিন্দা। ভাগ্য ভালো যে দুপুরের দিকে হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে ভারী এক পসলা বৃষ্টির কারণে আটকে গিয়েছিল; পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোনো এক তদবির কাজে বেরিয়ে গেলে তার দেখা মিলত না। তাকে হুমায়ুন মিয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই হতবাক। তারপর জানায়, বউ মরার পর বছর না ঘুরতেই লোকটা আরেকটা বিয়ে করেছে। আগের স্ত্রীর ছেলেমেয়ের সাথে সম্পর্ক নেই। উল্টা কিছু দিন ধরে স্বামীর কাছ থেকে তালাক খেয়ে চলে আসা এক শ্যালিকা জুটেছে। মেয়েটার পেটে বাচ্চা আছে। ব্যবসায়ী সমিতির উঠতি নেতা যেন থ মেরে গেল, যখন জানতে পারে হুমায়ুন মিয়ার শ্যালিকা আমার পরিচিত। আমি কিন্তু বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম, মুক্তার ঠিকানা ভুয়া নয় দেখে। ব্যবসায়ী সমিতির নেতাকে বললাম, লিটন ভাই! ওদের একটু দেখেশুনে রাখবেন, যাতে কোনো প্রবলেম না হয়।
আমি জানতাম, এলাকায় লিটন অত্যন্ত প্রভাবশালী। থানা-পুলিশরা পর্যন্ত তাকে সালাম দেয়। সুপার মার্কেট থেকে বেশি দূরে নয় এলিফ্যান্ট রোড স্টাফ কোয়ার্টার্স। জুলাই মাসের লম্বা বিকেল ফুরাতে বেশ বাকি; দুপুরের ভারী বৃষ্টিপাতের পর খানিকটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। মিরপুর রোডের ফুটওভার ব্রিজ পেরিয়ে কোনো মহাদেশ আবিষ্কারের তৃপ্তি নিয়ে ফুটপাতের ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেলাম স্টাফ কোয়ার্টার্সের সামনে। গেটের পাশে পান-সিগারেটের টং দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দেয় বিল্ডিংটা। সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় ওঠার পর বাঁ পাশের দরজাটাই হুমায়ুন মিয়ার। বন্ধ দরজার পাশে কলিংবেলের বোতাম টিপতেই সাড়া এলো– কে?
একটা শিহরণ খেলে যায় আমার ভেতর, তা মুক্তার গলা চিনতে অসুবিধা হয় না। নিজের পরিচয়টা দিতেই দরজা খুলে যায়। আমি যে এভাবে হাজির হব মুক্তা আশা করেনি। তবে বেজার মনে হলো না তাকে। ঘরের ভেতরে একটা বেতের চেয়ারে বসতে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার রাশিদা আপা নেই?
– একটু আগে দুলাভাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার না আজ, হাইকোর্ট মাজারে গেছে,

তারপর যাবে তাদের পীর বাবার কাছে। জানেন, আমার রাশিদা আপা একদম বদলে গেছে। আগের লাইন ছেড়ে দিয়েছে। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর স্বামী ছাড়া কিছুই বোঝে না।
– ভালোই হয়েছে, সুমতি ফিরছে।
– আপনারা পুরুষরা সেটাই তো বলবেন।
মুক্তার শেষের কথায় আমার হুঁশ হয়, ওর সঙ্গে গল্প করে নেহায়েত সময় কাটাতে আসিনি। আমার মধ্যে জিরাফের গলার মতো উঁচু হয়ে ওঠা কৌতূহল নিবৃত্ত করতেই এসেছি। মোটামুটি কনসাস মেয়ে হয়েও এমন একটা বোকামি কেন করতে গেল? আসল কথাটা বলার সুযোগ খোঁজার মুহূর্তেই মুক্তা উঠে দাঁড়ায়– একটু বসেন, চা বানিয়ে আনি।
আমার আপত্তি গায়ে মাখল না, চা বানাতে যাওয়ার সময় ওকে লক্ষ্য করলাম, বিরাট পেট নিয়ে হাঁটতে যেন কষ্ট হচ্ছে। নিজের ঘরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, ডেলিভারির সময় ঘনাতে খুব একটা বাকি নেই।
শুধু আমার জন্যই নয়, নিজের জন্যও চা বানিয়ে আনে মুক্তা। আরেকটা পিরিচে আবার কয়েক টুকরা বিস্কুট। চা পান করতে করতেই বললাম, তোমাকে আমি দুটি কারণে খুঁজেছি। এক নাম্বার, আমার অফিসে তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। দুই নাম্বার, তোমার এই প্যাগনেন্টের ব্যাপারটা, মানে এই মারাত্মক ভুল তুমি করতে গেলে কেন?
– ভুল কেন করব! সব মেয়েই তো মা হতে চায়। আমার দোষটা কোথায়?
– তাই বলে এভাবে?

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মুক্তা। এমন হাসি, আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। হাসি থামিয়ে বলল, জানেন, এটা অ্যাক্সিডেন্টলি হয়নি, ইচ্ছে করেই নিয়েছি। ভালো লাগছিল না, বিয়েতে আর মন টানছিল না। এক শিল্পপতি আমাকে কেপ্টে রাখতে চাইল, ফ্ল্যাট ভাড়া করে আমাকে রাখবে, মাসে মাসে খরচ দেবে, কিন্তু কারো রক্ষিতা হতে মন চাইল না। রাজি হলে আরাম-আয়েশে থাকতে পারতাম। কিন্তু রক্ষিতা হওয়ার জন্যই কি আমার জন্ম– এ প্রশ্ন বাদ সাধল। তারপর আনোয়ার নামের এক লোক আছে না চৌধুরীর অফিসে যায়? ও ব্যাটা একদিন অফার দেয় লিভ টুগেদার করার। জানেন, লোকটা আস্ত এক বদমাশ। লাভলির মুখে শুনেছি, যশোরের গেরামে ওর বউ-বাচ্চা আছে, তারপর লোকটা ঢাকা একেক সময় একেক মেয়ের ভুয়া স্বামী সেজে থাকে। ও ব্যাটা অফার দেয়ার পর আমি ওকে জবাবটা কী দিয়েছিলাম শুনবেন?
বলেছিলাম, আবার যদি এ ধরনের বাজে কথা বলেন, তবে পায়ের স্যান্ডেল খুলে সোজা আপনার মুখে মারব, সব মেয়ে কি একই পাল্লার মাল ভেবেছেন! আমার জবাব শুনে বলল, আমাকে দেখে নেবে। আরে, ওতে কি আমি ভয় পাই! কালা সেন্টুর নাম শুনেছেন?
– কোন কালা সেন্টু, ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের টপটেরর, পুলিশ যাকে খুঁজছে?
– হ্যাঁ, সেই সেন্টু। এক ঘটনার পর আমাকে বোন ডেকেছে। ওর মোবাইল ফোন নাম্বার আমার কাছে ছিল। আমি যদি সেন্টুকে বলতাম, তবে আনোয়ারকে সিস্টেম করে ছাড়াত।
অবাক হয়ে বললাম, সিস্টেম, সে আবার কী?
– সিস্টেম হলো কালা সেন্টুদের ভাষা। সিস্টেম মানে হলো মেরে হাত-পা ভেঙে সোজা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া। তার দরকার অবশ্য পড়েনি। এর মধ্যে শিরিনের সঙ্গে আমার একদিন ঝগড়া হলো, তারপর তো আমি চৌধুরীর অফিসে যাওয়া ছেড়েই দিলাম।
– জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, শিরিনের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল কী নিয়ে?
– শুনবে সেই ঘটনা? শিরিনের সঙ্গে এক প্রোগ্রামে গিয়েছি, পুরান ঢাকার এক হাজী সাহেব। লোকটা অনেক টাকার মালিক। মদ গিলে পুরোপুরি মাতাল ছিল, কী কারণে আমাকে তার পছন্দ হলো, নেশার ঘোরেই হয়তো লোকটা আমার গলায় আড়াই ভরি ওজনের একটা সোনার চেন পরিয়ে দেয়। ওটায়

আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। এরই মধ্যে শিরিন আমার গলা থেকে চেন খুলে নিয়ে নিজের গলায় পরল আর বলল তার খুব পছন্দ হয়েছে কয়েক দিন গলায় রাখবে। আমি না করিনি। কিন্তু দ্যাখেন, মানুষের চরিত্র দ্যাখেন। চেনটা আমাকে আর ফেরত দেয়নি, কিছু দিন পর বলে ওটা নাকি ছিনতাইকারী নিয়ে গেছে। ওর কথায় বিশ্বাস করিনি বলে সে কী ঝগড়া! আমি আর ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি।
শিরিনকে নিয়ে আমার আর আগ্রহ ছিল না, টেবিলের ওপর চায়ের খালি কাপটা রেখে বললাম, ওসব আরেক দিন শুনব, এবার আসল কথাটা বল। কেসটা কী করে বাঁধালে?

খানিক কী যেন ভাবে, আমার দিকে তাকায়, হঠাৎ দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে মুক্তার নজর– একেক সময় নিজকে বড় নিঃসঙ্গ লাগত, একদিন ভাবলাম মা হলে কেমন হয়? তখন থেকেই আমার জেদ আমাকে পেয়ে বসে। আমার সন্তান, শুধু মায়ের পরিচয়ে বড় হয়ে উঠবে। লাভলি নামে একটা মেয়ে আছে, ওর সঙ্গে একদিন গেলাম থার্টিফার্স্ট নাইটের প্রোগ্রামে, গুলশানে। সেখানে রিয়াদ নামের এক ইয়াংম্যানকে দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। জানেন, বিয়ের আগে উঠতি বয়সে আমি ঠিক রিয়াদের মতো একজনকে নিজের পাশে কল্পনা করতাম, কত কী স্বপ্ন দেখতাম। থার্টিফার্স্ট নাইটে আমার জীবনে স্বপ্ন যেন ধরা দিল। আপনি তো ড্রিংক করেন না, সেদিন এত ড্রিংক করেছিলাম যে আমি আর আমি ছিলাম না। মিলেনিয়ামের রাতে রিয়াদের কাছে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে।
– রিয়াদ এখন কোথায়?
– আর দেখা হয়নি। সেদিন শুনেছিলাম কানাডায় থাকে। শীতের ছুটিতে এসেছিল। হয়তো কানাডায় চলে গেছে।
– কোনো খোঁজখবর নাওনি?
– নিয়ে আর কী হবে! ও তো জোর করে চাপিয়ে দেয়নি আর আমিও ওর মতামত নিয়ে যাইনি। সে অধিকারও আমার নেই।
– তাহলে তুমি সতর্ক হলে না কেন? এভাবে ঝামেলায় জড়ানো কি ঠিক হয়েছে?
– যা করেছি, আমি নিজের ইচ্ছায় করেছি। অন্য কাউকে দায়ী করব না। আসলে আমি এমনটাই চেয়েছি।
এ কথা শোনার পর সত্যিই ভাষা হারিয়ে ফেলি, ওকে কী বলব তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ও কি মেয়ে না অন্য কিছু!
আমার মনের অবস্থা আঁচ করেই যেন মুক্তা বলল, একটা সুখবর দিচ্ছি আপনাকে।
– সুখবর!
– হ্যাঁ, দুই দিন আগে আলট্রাসনোগ্রাম করিয়েছি। আমার মেয়ে হতে যাচ্ছে। মেয়েই চেয়েছিলাম। আর শুনবেন, মেয়ের নামও ঠিক করে ফেলেছি।
– কী নাম?
– তা এখন না, সময় হলে বলব।

বিদায় নেয়ার আগে হঠাৎ মনে হলো, এ মুহূর্তে আর্থিক দিক থেকে ওর সাহায্যের দরকার। মাত্র একদিন হলো বেতন পেয়েছি, পকেটের অবস্থা ভালো। প্যান্টের ব্যাক পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করে ওর দিকে দুটা ৫০০ টাকার নোট বাড়িয়ে বললাম, তোমার এখন টাকার প্রয়োজন। এটা রেখে দাও।
– না, না আমার টাকা আছে। কেন আপনি আমাকে টাকা দিতে যাবেন, আমি কি চেয়েছি? মানুষ বদলে যায়, কিন্তু এতটা বদলে যায় ধারণা ছিল না। নিজকে কেন জানি মনে হলো বেকুব। আমার হাত থেকে মুক্তা টাকা নিল ঠিকই তবে দুই ভাঁজ করে তা আবার ফিরিয়ে দেয় আমার বুক পকেটে– আপাতত রাখেন। আমি আপনার বাসা না চিনলেও অফিস চিনি। দরকার হলে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। খানিক চুপ থেকে ফের বলল, আরেকটা কথা হলো কী এ দুনিয়াই গিভ অ্যান্ড টেকের। আপনার কাছ থেকে টাকা নেব, বিনিময়ে আমাকে তো কিছু দিতে হবে! আমার তো দেয়ার মতো আর কিছু নেই। তা ছাড়া ব্যাংকে আমার টাকা আছে। মোবাইল ফোন বিক্রি করার টাকাও ব্যাংকে রেখে দিয়েছি। আর জানেন, হাসপাতালের গাইনির যে ম্যাডাম আমাকে দেখছেন, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। চাকরিও দিয়ে রেখেছেন তার ক্লিনিকে। ডেলিভারির ঝামেলা পার হলেই জয়েন করব।
– ম্যাডাম তোমার পূর্বপরিচিত?
– আমার না, রাশিদা আপার।
সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ওকে বলে এসেছিলাম, প্রয়োজন হলে আমার অফিসে যেও। বাচ্চার নামটা কী রাখলে তা অন্তত জানাবে।
এলিফ্যান্ট রোড স্টাফ কোয়ার্টার্সে আর যাওয়া হয়নি। মুক্তার ব্যাপারে আগ্রহেও ভাটা পড়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। কৌতূহলের একটা সীমা আছে। অফিস করছি। সংসারের খরচ বাড়ছে দিন দিন। উপরি আয়ের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকতে হয়। কত কী সমস্যা চারদিকে। দেখতে দেখতে শীত পড়ে গেল। একদিন মাঝরাতে পটকাবাজি, স্টোরিও ডেক থেকে ছড়িয়ে পড়া ব্যান্ডসঙ্গীত, হৈ-হুল্লোড় মনে করিয়ে দেয় আজ থার্টিফার্স্ট নাইট। মনে পড়ল মুক্তাকে। ওর বাচ্চা হলো কী, না অন্যকিছু ঘটল, কে জানে?
ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে, নগরীর গা থেকে ঠাণ্ডা প্রায় ঝরে গেছে। অফিসের আশপাশে ঢাকার প্রাচীন কিছু বিশাল বৃক্ষ অবশিষ্ট আছে, মাঝেমধ্যে কোকিলের গলা শোনা যায়। একদিন পিক অফিস আওয়ারে চমকে উঠলাম, আমার টেবিলের সামনে মুক্তা। একা নয়, কোলে বাচ্চা। চাঁদের মতো এমন ফুটফুটে, দেখলে লোভ হয় ছিনিয়ে নিতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাচ্চা কোলে নিই। সুন্দর দুটি টানা টানা চোখ। বাজি রেখে বলা যায়, বড় হলে ডাকসাইটের সুন্দরী হবে। মুক্তা ওর কাছে কিছু না।
মুক্তা বলল, ভাই! রিকশা কিন্তু দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কয়েক দিন ধরে ভাবছিলাম এদিকে আসব। কিন্তু সময় পাই না, বড্ড ব্যস্ত থাকতে হয়।
– ঠিক আছে, চল তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

মুক্তার বাচ্চা আমার কোলে দেখে সহকর্মীরা, যাকে বলে তাজ্জব। খানিকটা দূরে রশিদ সাহেবের চোখ জোড়া প্রায় বিস্ফারিত। নিচ তলার অফিসরুম থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়িয়ে মুক্তাকে বললাম, আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি আসাতে। তা কী রেখেছ মেয়ের নাম?
- মিলেনিয়াম।
– এ্যাঁ!
আমার বিস্ময় দেখে মুক্তার দুই চোখে খুশির ঝিলিক– ভেবেচিন্তে আগে থেকেই রেখেছি নামটা। বেশ সুন্দর না নামটা?

মুখে আমার রা নেই। কোনো মেয়ের নাম এমন হতে পারে, এটা ছিল আমার ধারণার বাইরে। তবে হ্যাঁ, শব্দটা আগে শোনা না গেলেও নতুন সহস্রাব্দের সূচনা উপলক্ষে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মিডিয়ায় বেশ উচ্চারিত হচ্ছিল। তাই বলে কোনো মেয়ের নাম? কে জানে, কোন খেয়াল চেপেছে মুক্তার মাথায়। রিকশা চড়ার পর মুক্তার কোলে ফিরিয়ে দিলাম বাচ্চাকে। দ্রুত পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ভেতরে যা ছিল, ১০০ টাকার তিনখানা নোট বাড়িয়ে দিই– তোমার মেয়েকে কিছু কিনে দিও আমার পক্ষ থেকে। আজও টাকা নিতে ওর কুণ্ঠা দেখে বললাম, এ শুধু টাকা নয়, তোমার মেয়ের প্রতি আমার আশীর্বাদ। আমার নিজের ভাগ্নি হলেও তো কিছু দিতে হতো।

এবার আমাকে বিমুখ করল না মুক্তা। বলল, দোয়া করবেন, এ মেয়েকে আমি যেন মানুষ করতে পারি। ও মেয়েমানুষ নয়, প্রকৃত মানুষ হতে পারে। ওকে এমন মানুষ হতে হবে, আমার মতো যেন পরিস্থিতির শিকার অসহায় মেয়েলোক যেন না হয়...
শেষের দিকে ভারী হয়ে ওঠে মুক্তার গলা। ততক্ষণে রিকশা চলতে শুরু করে। বাঁ দিকের রাস্তায় মোড় নিয়ে চার তলা বিল্ডিংটার আড়ালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ খেয়াল হলো, মুক্তার ঠিকানা নেয়া হলো না। কোথায় থাকে এখন– এলিফ্যান্ট রোডের সেই স্টাফ কোয়ার্টার্সে?
অফিসরুমে ফেরামাত্রই রশিদ সাহেব আমার ওপর হামলে পড়েন– কী আশ্চর্য, আপনার এই শ্যালিকাটির কথা তো কখনো আমাকে বলেননি।
– সব যে বলতেই হবে, এমন কোনো দস্তখত দিয়েছি নাকি কখনো?
জবাবটা কড়াই হয়ে গেল, রশিদ সাহেব বোধ হয় আহত হলেন। অন্যরাও অবাক। তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কানে তখন রেকর্ডের মতো লাগাতার চলেছে মুক্তার কণ্ঠ– মিলেনিয়াম।

নৃ-গোষ্ঠী

সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী গারো নৃ-গোষ্ঠী

ড. হারুন রশীদ

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে খ্রিস্টপূর্ব কালেই প্রথমে উত্তরে অগ্রসর হয়ে পরে ভারতের ওপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবেশের মুহূর্তে একদিকে বগুড়া জেলা অন্যদিকে ময়মনসিংহের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই নদ। এর একটি শাখা বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে বগুড়ার বাঙালি নদী ও করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিরাজগঞ্জের কাছে পদ্মার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যমুনা নাম ধারণ করে অপর শাখাটি ময়মনসিংহের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

যমুনার পূর্বতীর ধরে মধুপুরের অরণ্যভূমি থেকে উত্তরে গারো পাহাড় পূর্বদিকে সিলেট জেলার পশ্চিমে বিস্তৃত হাওড় অঞ্চল ও সুরমা কুশিয়ারা নদীর পূর্ব তীরের নিম্নভূমি ময়মনসিংহ নামে প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। এই জেলা একই সঙ্গে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং নৃতাত্ত্বিক কৌতূহল উদ্রেককারী ভৌগোলিক এলাকা। এতে রয়েছে ছোট ছোট

টিলা, সবুজ অরণ্য, সীমাহীন জলরাশি আর লাল মাটি বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সমতলে দো-আঁশ বেলে দো-আঁশ মাটির দ্বারা গঠিত উর্বর ভূমি। বৈচিত্র্যপূর্ণ এর প্রাকৃতিক গড়ন। ভৌগোলিক গঠন বিচারে নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত ছাই বর্ণের বেলে দো-আঁশ মাটি ও লাল বর্ণের এঁটেল মাটি দ্বারা এর মৃত্তিকা গঠিত। নদী বিল ঝিল হাওড় জলজ প্রাণীর জন্য যেমন স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ সৃজন করেছে তেমনি বিচিত্র বৃক্ষ শোভিত মধুপুরের গড় সহস্র বছর ধরে বন্যপ্রাণী ও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছে বসবাস উপযোগী পরিবেশ। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য এখানকার অধিবাসীদের জীবনে আনন্দ আর সুরের ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

অরণ্যসঙ্কুল নাতি উচ্চ গারো পাহাড় টিয়া, ঘুঘু, হরিয়াল ও বনমোরগের সুমধুর ডাকে মুখর হয়ে ওঠে। লাল-মাটির অরণ্যতুল্য বনে শাল্মলী বৃক্ষের সারি পাখ-পাখালি আর জীব-জন্তুর নিরাপদ আবাস রচনা করে। এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থা অধিবাসীদের মধ্যে মানস গঠনের সহায়ক। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের প্রভাবে এই অঞ্চলের মানুষ স্বভাবতই রোমান্টিক। স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর অথচ গার্হস্থ্য জীবনে বাস্তবতাকে বরণ করতে সাহসী–আবেগপ্রবণ এবং একনিষ্ঠ। শ্রম, প্রেম, আনন্দ জীবনের নিত্যসঙ্গী। প্রেমে আছে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা। জারি, সারি, আর বাউল ভাটিয়ালির বিবাগী সুর জনজীবনকে ভাব জগতের অফুরন্ত মাধুর্য দেয়। ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, কংস নদীর খরস্রোতে পা ধুয়ে কখনো মৎস্য শিকার করে ঘরে ফেরে গারো নারী পুরুষ। গারোপাহাড় নিবাসী গারোগণ যৌথশ্রমে বিশ্বাসী। পাহাড়ের ঋজুতা সমতলের কোমল নরম পরিবেশের স্পষ্ট প্রভাব সে জীবনের প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে নিত্য বহমান। কোমল-কঠোর স্বভাব তাদের। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এসব মানুষের মনে কোনো কুটিলতা নেই।

সংখ্যালঘুতার কারণে প্রতারিত ও বঞ্চিত জীবনের ভার বইতে বইতে গুটিয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে। কখনো বা বিসর্জন দিয়েছে আত্মপরিচয়, নাম, গোত্র এমনকি ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত। অধিকার বঞ্চিত এই নৃ-গোষ্ঠী বর্ণহীন বলেই তাদের জীবনের সুমহান বাণী লিপিবদ্ধ হয়নি মাতৃভাষায়। তাইতো তারা আজ বিলুপ্তির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। কিন্তু লিখিত বর্ণমালা না থাকা সত্ত্বেও নিসর্গকেন্দ্রিক জীবনে তাদের উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, গীতিনাট্য, গীতিকা, পালা ইত্যাদি শিল্প এবং নানা রকম ক্রীড়া কসরৎ ইত্যাদি গড়ে ওঠে জুমকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ঘন-গম্ভীর শালবনের পাতায় পাতায় ঠোঁটের স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলিয়ে শিশু-রোদের কণা ছড়িয়ে পড়ত জুমচাষে নিরতা গারো রমণীর বাদামি অথবা শ্যামলা কালো গ্রীবার পরে। শ্রমক্লান্ত স্বেদসিক্ত, প্রাকৃত সুন্দরী তার ছোট ছোট চোখে সেই সদাহাস্য রৌদ্রকণার দিকে তাকিয়ে সংযুক্ত দুই কর কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাতো তার ফসলের দেবতা *'সালজংকে'*। ঐশ্বর্যময় জীবন ছিল এক কালে– ইতিহাসের পাতায় খতিয়ান রয়েছে তার। সুসং দুর্গাপুরে গারো রাজপুরুষদের শাসন অব্যাহত ছিল মধ্যযুগে। গারো জীবনে তখন সোমেশ্বরীর কলরোল, বেগ ও আবেগ শক্তিতে সমুজ্জ্বল। মধুপুর থেকে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ভাওয়ালের গড় পর্যন্ত আপন আধিপত্য ও গৌরবে উন্নত শির। এই ভূভাগ সমতল এটেল ও দো-আঁশ মাটির সংমিশ্রণে গঠিত সমতল অরণ্যভূমির গর্ভে বাস করে গারোরা।

বাংলাদেশে অভিবাসনকারী বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে গারো নৃ-গোষ্ঠী একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। প্রায় প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর মতো এদেরও রয়েছে নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত স্বতন্ত্র পরিচয়। এ ছাড়া রয়েছে লোকজ সংস্কার, উপকথা, লোককথা, কৃত্যমূলক গীত ও গেয় আখ্যানপালার সুবিশাল সম্ভার।

গারো নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই এদের বসবাসের ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর উপজেলার গভীর অরণ্য, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী, শেরপুর, নকলা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা এবং বাংলাদেশ অংশের গারো পাহাড়ের টিলায় এই নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছে। এদের আদি নিবাস ছিল ভারতের অঙ্গরাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিমার্ধজুড়ে এবং আসাম অঙ্গরাজ্যে। স্যার রিজলির মতে, গারোদের আদি বাসভূমি ছিল আসাম প্রদেশে। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে তারা আসামের খাসিয়া, নাগা ও মণিপুরীদের উত্তরাধিকারী বলে অনুমান করা হয়। আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে তাদের সঙ্গে গারোদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। মঙ্গোলয়েড মহাজাতির নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য [১] এদের মধ্যে বিদ্যমান। অনেকে অবশ্য মনে করেন এরা মঙ্গোলয়েড মহাজাতির একটি শাখা Bodo-এর অন্তর্ভুক্ত। গারোদের বিশ্বাস খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সাল থেকে তারা উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে বসবাস করে আসছে।

গারো নৃ-গোষ্ঠী যে মঙ্গোলয়েড মহাজাতির একটি শাখা এ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিধ Edward Dalton ও Rabbins Burling প্রমুখ অভিমত পোষণ করেন।

যজুর্বেদে 'কিরাত বলে উল্লিখিত ভোট চীনীয়, Sino-Tibetan ev Tibeto-Chinese ভাষা-ভাষী মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠী আর্যদের আগমনের পর আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে ভারত বর্ষে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ২৪৯ অব্দের পরে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' চীন শব্দটির উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওই সময় মঙ্গোলয়েড মহাজাতির লোকদের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ছিল। এতদ্ব্যতীত ১২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীন ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর, পূর্ব Han সম্রাটগণ বার্মা এবং আসামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতীয় বন্দর ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই যে গারো নৃ-গোষ্ঠী ধীরে ধীরে বার্মা এবং আসাম হয়ে বাংলাদেশে অভিবাসন করে এটাই প্রকৃত সত্য। এবং এই নৃ-গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমনকাল খ্রিস্টপূর্ব যুগে হলেও বর্তমান গারো নৃ-গোষ্ঠী কখন থেকে যে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে তা লিখিত দলিলপত্রের অভাবে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ।

গারোরা এখানকার ভূমিজ সন্তান (Autochthones) নয়। নৃতত্ত্ববিদদের মতে উপমহাদেশের আদিম অধিবাসীমাত্রই বাইরে থেকে আগমন করেছে এবং ভাষাতত্ত্ববিদরাও বিভিন্ন আদিম জাতীয় ভাষা বিশ্লেষণ করে একই কথার সমর্থন জানিয়েছেন।

সুতরাং গারোদের জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না যে তারা মঙ্গোলয়েড মহাজাতিরই উত্তরাধিকার। সব জাতির সামাজিক অস্তিত্ব নানা গোত্রে বিভক্ত। বিভক্তির কারণও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক। গারোদের সমাজ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় নানা বিভক্তির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। গারোদের মধ্যে গোত্র বা গোষ্ঠীবিভাগ রয়েছে। *আচ্ছিক* গারোদের মধ্যে তিনটি গোত্রবিভাগ যথা: ১.*অয়* ২. *আবেং* ৩. *দেয়াল*। *লামদানী* গারোদের গোত্রবিভাগও তিনটি যথা: ১.*মমীন* ২. *মারাক* ৩. *সাংগমা*। স্পষ্ট বোঝা যায় ওই শ্রেণীকরণ কোনো অতিলৌকিক শক্তির লীলায় ঘটেনি। শ্রম বিভাজনের স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে উঁচু-নীচুর ভেদবুদ্ধিজাত এই গোত্র বিভাজন। উন্নত জাতির সমাজ যে নিয়মে ও কারণে কৌলিন্য দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয় একইভাবে এই অনুন্নত সমাজ মানুষও নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, গারোগণ সমাজ অভ্যন্তরে যে দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করে তা বাঙালি কিংবা জাপানি সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে কোনো অবস্থায় দুর্বল নয়।

Major A Play fair-এর মতে লামদানী শ্রেণির গোত্রবিভাগ আসলে আচ্ছিক শ্রেণির গোত্র বিভাগেরই অন্য নাম মাত্র। এই গোত্রগুলো কী অর্থ জ্ঞাপন করে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এসব যে টোটেম (মানবেতর জন্মবাদ) বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, এটা অনুমান করা চলে। গারো নামের উৎপত্তি কোথা থেকে এ নিয়েও সংকট রয়েছে। গারো নৃ-গোষ্ঠী *'মান্দি'* নামেও পরিচিত। কালের ব্যবধানে এই নৃ-গোষ্ঠী *'আচ্ছিক'* ও *'মান্দি'* দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। গারো ভাষায় 'আচ্ছিক' শব্দের অর্থ

পাহাড় বা টিলায় বসবাসকারী। *'মান্দি'* শব্দের অর্থ মানুষ। এ কথা সত্য যে সমাজ বিকাশের ধারায় এ' নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও পরিবর্তনের রীতি বহমান ছিল। ফলত পাহাড় বা টিলায় বসবাসকারী গারোগণ *আচ্ছিক'* এবং সমতলে বসবাসকারীগণ *'মান্দি'* অভিধায় নিজেদের শনাক্ত করতে থাকে। খুব সম্ভব অন্তকলহ কিংবা জীবিকার সহজতম উৎসের কারণে এ নৃ-গোষ্ঠীর একটি অংশ পাহাড় থেকে সমতলে চলে আসে। সমতলে জীবন প্রবাহ এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তাদের জীবন পাহাড়িদের থেকে ভিন্ন খাতে বাহিত হয়। ফলে সমতলবাসী গারোগণ তাদের সংস্কৃত জীবনাচারণের জন্যই হয়তো নিজেদের *'মান্দি'* অর্থাৎ মানুষ ভাবতে থাকে। অন্যদিকে পাহাড়িদের তুচ্ছার্থে বলে *'আচ্ছিক'* বা পাহাড়ি। যেন তারা মানুষ নয়, মানবেতর। প্রকৃতার্থে মানুষ (Man) একটি Common Noun বা জাতিবাচক বিশেষ্য– যা বিশ্বের সব মানুষকেই বোঝায়। বিশেষ একটি নৃ-গোষ্ঠীকে কেবল এ পরিচয়ে শনাক্তকরণের কারণ যে গোষ্ঠীগত বৈরিতা তা সহজেই অনুমান করা যায়। এবং এতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জীবনাচরণের পার্থক্য কোনো মানুষকে রক্ত সম্পর্কের অপর একজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ভাবতে বাধ্য করে।

পাহাড় ও অরণ্যচারী গারো সমাজ ব্যবস্থা আদিতে পিতৃতান্ত্রিক ছিল। রেভা সিডি বল্ড উইনের সংকলিত তথ্যানুসারে গারোরা পাঁচ থেকে ৬০০ বছর পূর্বে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অধীন ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী মায়ের বড় ছেলেই উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতো এবং বিয়ের পরও পিতৃ গৃহেই থাকত। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক হলেও গারোরা আদি থেকে মায়ের মাহারিই গ্রহণ করত। ফলে এক গোষ্ঠীর সম্পত্তি আরেক গোষ্ঠীর হাতে চলে যেত। এ কারণে পিতৃ-প্রথাকে ক্রমাগত প্রভাবিত হওয়া থেকে নিজের সত্তা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য গারোরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটায়। এতে মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হলেও পরিবার ও সমাজ পরিচালনায় পুরুষরাও দায়িত্বশীল থাকে।

আসামের খাসিয়াদের মতো এরাও মাতৃপ্রধান সম্প্রদায়। খাসি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে: *'লং জেইদ না কা কিনথেই'* অর্থাৎ মেয়েদের থেকেই মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি। অতএব, মায়ের সূত্রে মানুষের বংশপরিচয়, বাবার সূত্রে নয়। সূত্রটি গারোদের বেলায়ও প্রযোজ্য। উপরোক্ত বিশ্বাস নিশ্চয়ই আদিম। আধুনিক বিজ্ঞানের বিপরীত সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে। বাবা-মার সমান অংশীদারত্বে সন্তানের জন্ম–সন্তানের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান। সুতরাং মায়ের প্রাধান্য কেবল আদিম সমাজে ছিল যেখানে নারীকে অবলম্বন করে যুথবদ্ধ হতো একদল পুরুষ। কাজেই গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে প্রাগ্রসর এটা বলাই সঙ্গত। প্রথার প্রতি 'Tribe' সুলভ শ্রদ্ধার কারণে গারো পুরুষগণ পুরনো সম্পত্তি আইন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিচ্ছে। কিন্তু মানসিকভাবে তারা এ প্রথা সমর্থন করে না। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকালে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আধুনিক গারোগণের মধ্যে এমন মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া গেছে। এ তথ্য সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের বিপরীত ধারার। মানব সভ্যতার ইতিহাস বলে– উৎপাদন ব্যবস্থায় পুরুষের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ হওয়া এবং উৎপাদনের উপায় উপকরণে মাত্রাগত পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন পরিপূর্ণ না হলে সমাজ কখনো মাতৃতান্ত্রিক হতে পারে না। ওই প্রথা বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। এ থেকেই প্রমাণিত হয় সমাজ জীবনে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজনীতির পরিবর্তন অসম্ভব। এ কারণেই মাতৃপ্রধান সমাজের উত্তরাধিকার রীতি অনুযায়ী মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পায়, সম্পত্তিতে ছেলেদের বা পুরুষদের কোনো অধিকার নেই। বিয়ের পর ছেলেরা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে। এখানে এসে ছেলে স্ত্রীর সম্পত্তি ছাড়া যেসব সহায়সম্পত্তি অর্জন করে তাও তার স্ত্রীর অধিকারে চলে যায়। শ্বশুরবাড়িতে থাকা অবস্থাকে গারোদের আঞ্চলিক ভাষায় *'নোকরাম'* বলে। গারোদের রক্ত সম্পর্ক নিম্নরূপ :

গারো উত্তরাধিকার আইন নিয়ে ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ সাবঅর্ডিনেট জজের চতুর্থ কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। জয়মণি বনাম সারামণি মামলা নং ৩৮। মেজর পে ফেয়ার রচিত The Garos, জবাং ডি মারাক সংকলিত The Garo law এবং রেভা : সি ডি বলডুইন সংকলিত The Garo, এই তিনটি বইয়ে গারোদের উত্তরাধিকার বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো অগোছালো এবং বিচ্ছিন্ন। উপরোক্ত মামলার রায় গারো উত্তরাধিকার আইনকে অনেকটা বিশদ ও সহজবোধ্য করেছে।

পৃথিবীর আদিম সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রম বিবর্তনের ধারায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটায়। গারোদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিপরীত যুক্তির অনুসারী। সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত হওয়ার কারণেই সম্ভবত তাদের সমাজ একটা সময় পর্যন্ত স্থবির ছিল। পরবর্তীকালে সেই বৃত্তাবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য গারো সমাজ পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়াসী। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কার ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জীবনবোধ উচ্চাঙ্গের হবার ফলে অপরাপর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরন তাদের চেতনায় উপরোক্ত পরিবর্তনের প্রণোদনা জাগায়।

গারোদের দৈহিক আকৃতি মাঝারি ধরনের। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে গারোগণ মঙ্গোলয়েড মহাজাতির উত্তরাধিকার। বর্তমান গারো নৃ-গোষ্ঠীর অবয়বে মঙ্গোলয়েড মহাজাতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পরিদৃশ্যমান। যেমন– এদের নাক চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত। কপাল ক্ষুদ্রাকৃতির, ঠোঁট মোটা, মুখাকৃতি গোলাকার, চোখ তেমন সম্প্রসারিত হয় না। এ কারণে এদের চোখ ছোট হয়ে থাকে। তাদের চুল কালো ও কোঁকড়ানো, রং ফর্সা থেকে শ্যামল; কান অনেকটা বৃহদাকারের। পুরুষের দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য কম। গোলাকার মুণ্ডু। তাদের গড় উচ্চতা সাধারণত ৫ ফুটের বেশি নয়। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবে তারা বেশ শক্তিশালী ও কর্মঠ।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে, একটি জাতিসত্তার মৌল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের জন্য দৈহিক আকৃতি, ভাষা ও সংস্কৃতি এই তিনটি বিষয় মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিচারে দৈহিক আকৃতির দিক থেকেও গারো নৃ-গোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড মহাজাতির অন্তর্গত। অন্যসব জাতির মতোই গারোদেরও একটা মাতৃভাষা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক বিনিময় ও আত্মিক ভাবের প্রকাশ ঘটায় তারা নিজস্ব ভাষায়। সেটা তাদের মাতৃভাষা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হাজার বছরের ইতিহাসের ধারায় বাংলাদেশে বসবাসরত গারোগণ নিজস্ব ভাষার লিপি আবিষ্কার করতে পারেনি। তাদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি রয়েছে যাঁরা অন্যের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে– কিন্তু মাতৃভাষার লিপি আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয় নাই। তাদের ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মকথা, রূপকথা সবই মৌখিক রীতির। এমতাবস্থায় গারোদের ভাষার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

পণ্ডিতগণ গারোদের মুখের ভাষার শব্দরূপ ও ধ্বনি গুণের বিচারে একে *'টিবেটো বর্মীণ'* ভাষা বলে শনাক্ত করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই যে, গারোগণ একটি উন্নত ও যে কোনো ধরনের ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। ঐতিহাসিক এক জাতিসত্তার উত্তরাধিকার গারো সম্প্রদায় এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক। অর্থনৈতিক উৎপাদন, স্বতন্দ্র ব্যবহারিক জীবন পারিবারিক ও সামাজিক আচার রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাকাদি, প্রথাপদ্ধতি, মানস গঠন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যা কোনো জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক চৈতন্যের মানদণ্ড তাই সংস্কৃতি অভিধায় চিহ্নিত।

জুমচাষ পদ্ধতি থেকে ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় গারো জাতিসত্তা কৃষি অর্থনীতিতে পৌঁছে সহস্র বছর পূর্বেই। কৌম সমাজ থেকে জটিল সমাজ কাঠামোতে প্রবেশের মাধ্যমে সামন্ত সমাজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যযুগে। গোষ্ঠীবদ্ধ শিকারজীবী গারোরা সাহস, বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে, সুসংদুর্গাপুর অঞ্চলে গারো রাজত্ব স্থাপন করে

মোঘল আমলে। ওই সময় আধুনিক জীবনের সব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি গারোদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। ঔপনিবেশিক শাসন এতদঞ্চলে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। ফলে প্রকৃতিপূজক এই জাতিসত্তার সিংহভাগ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ইউরোপীয় জীবন-সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে চার্চের মাধ্যমে। গারোদের ধর্মবিশ্বাস দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়– সাংসারেক সমাজ অর্থাৎ আদি ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান গারো, খ্রিস্টান সমাজ অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মে আস্থাবান গারো সমাজ। ধর্মান্তরের পুরস্কারস্বরূপ উৎপাদনের উপায় অর্জন করে এই জনগোষ্ঠী। অরণ্যবাসী গারোদের মধ্যে এই সময়েই কিছু জুম চাষ অব্যাহত থাকে।

কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল প্রাগ্রসর অংশের শিক্ষিত গারোগণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নানা রকম চাকরি। এভাবে এক মিশ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে কালের স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করলেও মানস জগতে সৃষ্টি করে প্রবল সংকট। সাংসারেক ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্মের টানাপড়েনে দ্বিধা-বিভক্ত হয় পরিবার ও সমাজ। দুটি ধর্মবিশ্বাস এবং তাদের রীতিনীতি, উৎসব, কৃত্য, শাস্ত্রশাসন গারোদের জীবনের স্বাভাবিক চলন ব্যাহত করে। আত্মপরিচয়কে করে প্রশ্নবিদ্ধ। গারো, গারো খ্রিস্টান, বাঙালি কোনো একটি সাধারণ পরিচয়ে তারা পরিচিত হতে পারে না। গারো জাতিসত্তা হিসেবে তারা ওয়ানগাল্লা নামক জাতীয় উৎসব উদযাপন করে– বিভিন্ন দেবদেবীর কৃত্যাদি পালন করে। খ্রিস্টান হিসেবে বড়দিনের উৎসব এবং অন্যসব খ্রিস্টীয় উৎসব পালন করে। যিশুকে সর্বশক্তিমান রূপে বিশ্বাস করেও তাতারা রাবুগা বা সালজং দেবতাকে বিসর্জন দিতে অপারগ। মোটকথা, জীবনাচরণে নানাবিধ সঙ্কটে পতিত এই জাতিসত্তা। আদিধর্মের দেবদেবীদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরাণ, উপপুরাণ রূপকথা, কৃত্যাদি নির্ভর নৃত্যগীত, নাট্য গারোদের উন্নত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গারোদের মধ্যে এককালে Head hunting প্রথা প্রচলিত ছিল। Head hunting তাদের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার জ্ঞাপক হলেও গারোরা অতিথিপরায়ণ, শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী। সম্পত্তি আইন মাতৃতান্ত্রিক হলেও বহির্জগতে গারোরা পিতৃসুলভ মূল্যবোধেরই ধারক। মোদ্দা কথা, একটি জাতিসত্তা হিসেবে গারোদের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপক ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

জনসংখ্যা

১৯৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের গারোদের জনসংখ্যা ১ লাখ ২ হাজার বলে জানা যায়। এর মধ্যে মধুপুরে গড়ে ২০ হাজার ময়মনসিংহে ৫০ হাজার এবং অন্যান্য অঞ্চলে বাকি গারো সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে। বাংলাদেশ ও ভারতে মোট গারোদের সংখ্যা ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৮৪২ বলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে জানা যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের সরকারি নথিপত্রে ১ লাখ ১৬ হাজার গারো সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিয়ে প্রথা

মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে বিয়ের রীতিও তাদের নিজস্ব সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। গারো সামাজিক প্রথামতে একই গোত্রে বিয়ে সম্পাদন করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বহির্গোত্রে বিয়ে প্রচলিত। বিয়ের পর স্বামীকে স্ত্রীর গৃহে বসবাস করতে হয়। গারোদের সমাজে মনোগামী বিয়ের রীতিই অধিক লক্ষণীয়; *'প্যারালাল কাজিন'* 'Perallel Cousin Marriage Syestem' বিয়ে নিষিদ্ধ হলেও *'ক্রসকাজিন বিয়ে'* (Cross Cousin Marriage Syestem) অনুমোদিত রয়েছে। ছেলেমেয়ে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই তাদের বিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পিতা-মাতা বা গুরুজনেরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মনোমিলনের বিয়ের রীতিও গারো সমাজে দেখা যায়। গারোদের সাধারণত তিন ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে। গারো ভাষায় এগুলো হচ্ছে- *ওয়াক ওফা, তুনাফাই* এবং *চান্দিলা। ওয়াক ওফা বিয়ে* বা Settled Marriage অনুষ্ঠিত হয় পিতা-মাতা বা গুরুজনদের মধ্যস্থতায়। *তুনাফাই* বিয়েকে প্রেমঘটিত বা Love Marriage বিয়ে বলা চলে এবং *চান্দিলা* বিয়েকে জোর জবরদস্তিমূলক বা Forced Marriage বলা হয়। এ ধরনের বিয়েতে মেয়েরা ছেলেদের পছন্দ করে বা বেছে নেয় এবং একত্রে পানাহার করলেই তাদের বিয়ের স্বীকারোক্তি আছে বলে ধরে নেয়া হয়। গারোদের বিয়ে যৌতুকমুক্ত। এদের বিয়েতে কন্যাকে কোনো পণ দিতে হয় না; স্বামীকেও কোনো যৌতুক দেয়ার রীতি নেই। তবে বিয়ের উৎসবে নানা ধরনের উপহার দেয়ার রীতি আছে। গারো ভাষায় যাকে *'আজৎ'* বলা হয়। সাধারণত উপহার হিসেবে মোরগ, ছাগল, শূকর, পান ও সুপারি ইত্যাদি দেয়া তাদের চিরাচরিত রীতি। গারোদের মধ্যে বহুপত্নী গ্রহণের রীতি স্বীকৃত থাকায় সহোদর দুই বোনকে একসঙ্গে স্ত্রী হিসেবে রাখার প্রচলন এবং বিধবার পুনর্বিবাহের রীতি রয়েছে। অন্যান্য সমাজের মতো গারো সমাজেও বিয়ে বিচ্ছেদের রীতি-স্বীকৃত থাকলেও তা খুব কমই ঘটে থাকে। স্ত্রী স্বামীকে তালাক (বিচ্ছেদ) দিতে পারে। কাজেই কখনো যদি বিচ্ছেদ ঘটে যায়, সেক্ষেত্রে গ্রামীণ সালিশের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা হয়। বিচ্ছেদের সালিশি কার্যক্রমে স্বামী বা স্ত্রীকে প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতে প্রমাণাদি সাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠীয় লোকজন অপর পক্ষকে জরিমানা দেয়ার শর্ত আরোপ করে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দিয়ে থাকে। এটি নিজেদের সামাজিক বিধি।

আবাসন

গারোরা তাদের ঐতিহ্যানুযায়ী পারিবারিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। পাহাড়ি গারোদের ঘরগুলো মাচার ওপর নির্মিত। এই ঘর কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি *মাচাং* ঘর। গারোদের বসবাস করার এই ঘরগুলো শুধু তাদের আবাসনের প্রয়োজন মেটায় তাই নয় বরং নির্মাণ কৌশলের কারণে এগুলো নান্দনিক সৌন্দর্যে গৃহের অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। সমতলে বসবাসকারী গারোদের আবাসনগুলো সাধারণত গাছ, বাঁশ ও ছন ইত্যাদি দিয়ে তৈরিকৃত কুঁড়েঘর বেষ্টিত। মাটির দেয়ালঘেরা ঘরগুলো অনেকটা ইটসুরকির পাকা দালানের মতো দেখায়। সেগুলো মজবুত, সুন্দর ও নিরাপদ।

সাম্প্রতিক কালে অবস্থাপন্ন গারোরা অবশ্য টিনের ঘর কিংবা আধাপাকা ঘরে বসবাস করে। অরণ্যচারিতা তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই হয়তো অতীতে গারোরা বিভিন্ন উপত্যকায় নদীর সন্নিকটে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের গ্রামগুলো গড়ে তুলতো। কেননা সহজেই শস্য উৎপাদন এবং পানির প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং নদীপথে যাতায়াত সহজতর ছিলো বলে তাদের কাছে নদীতীরবর্তী এলাকাই ছিল পছন্দের।

এ ছাড়া গারোদের মধ্যে *টংঘর* প্রথা চালু ছিল। মূলত জুম চাষ করে গারোরা জীবিকা নির্বাহ করত। জুমের ফসল পাহারা দেয়ার জন্য তারা জমির মাঝামাঝি স্থানে বড় খুঁটির ওপর উঁচুতে ছোটঘর তুলত। শূকর, বানর, হনুমান বা অন্যান্য বন্য জন্তু যাতে ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করতে না পারে এ জন্য উঁচুঘরে বসে পাহারা দিত। উঁচুঘরে বসে পাহারা দেয়ার এই প্রথাকে বলা হতো টংঘর প্রথা। তথ্যানুসন্ধানের সময় টংঘর সম্পর্কে তথ্য দিলেন মধুপুরের করপোশ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মিসেস মারিয়া চিরান (৬০)। তিনি জানালেন, *টংঘর* ছিল গারো প্রেমিকদের জন্য নির্ভরযোগ্য জায়গা। প্রেমিক টংঘরের মাচায় বসে বাঁশি বাজাত ; আর প্রেমিকা গারো যুবতী চুপে চুপে এসে টংঘরের খুঁটি ধরে ঝাঁকাত। গ্রামে কোনো মুরব্বি দেখলে সবকিছু বুঝে নেয়। পরে তাদের মধ্যে বিয়ের আয়োজন করা হয়। এভাবে শ্রম ও প্রণয় সমন্বিত হতো গারো জীবনে।

খাদ্যাভ্যাস

গারোদের খাদ্যাভ্যাস অনেকটা বাঙালিদের মতোই। তাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত ও মাংস। এরা *বিন্নি* ধান নামে এক বিশেষ শ্রেণির ধানের ভাত খেতে খুব পছন্দ করে। *বিন্নি* ধানের ভাত আঁঠালো এবং সুগন্ধযুক্ত। একটু খেলেই রসনা তৃপ্ত হয়, কিঞ্চিত নেশার ভাব হয়। এছাড়া গারোরা হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু-ছাগল, মাছ, কুচে, শূকর, হরিণ, কুকুর, সাপ, খরগোশের মাংস খেয়ে থাকে। বিভিন্ন

ধরনের শাকসবজিও খায় এরা। নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল এরা নিজেরাই উৎপাদন করে। প্রয়োজনীয় পশুপাখিও এরা নিজেদের গৃহে পালন করে থাকে।

দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে গারোদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাঙালিদের খাদ্যের সঙ্গে এদের খাদ্য বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তথ্যানুসন্ধানের সময় ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার সাপমারা হাতিলেট গ্রামে জরিপ চলাকালে দেখা যায়, তারা অন্যান্য বাঙালি পরিবারের মতো ব্রয়লারের মুরগির মাংস নিজেরা খাচ্ছে এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। পানীয়ের মধ্যে মদ অন্যতম। মদ তারা নিজেরাই তৈরি করেন। প্রতিটি উৎসব পার্বণে মদ তাদের অপরিহার্য পানীয়। এটা তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গও। পূজাপার্বণ, উৎসব, বিবাহ অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত, অতিথি আগমন এমনকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি সব পর্বেই মদের ব্যবহার অপরিহার্য। মদকে তারা *'চু'* বা *'পচাই'* বলে। এরা এদের নিজস্ব পদ্ধতিতে *চু* তৈরি করে। সাধারণত চাল, গম, ভুট্টা, যব, গাছগাছড়ার শিকড়, মূল, বন্য আলু, ফল ও ফুল, আখের গুড় ইত্যাদি দিয়েই দেশি মদ তৈরি হয়।

ভাত পচিয়ে তৈরি মদকে *চু* বলা হয়। এই মদের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। একটি কলসির আরেকটি মটকার মদ। কলসি বা তদসমতুল্য আকারের পাত্রে *চু* তৈরি করতে আড়াই থেকে চার-পাঁচ সের চালের ভাতের প্রয়োজন পড়ে। আর মটকায় বিশ-ত্রিশ সের চালের ভাত পচানো যায়। কলসির মদের স্থিতিকাল চার থেকে দশ-বার দিন আর মটকার মদ একমাস পর্যন্তও রাখা যায়। এই মটকায় তৈরি মদই উৎকৃষ্ট *চু*। গারো ভাষায় এটিকে *'চু বিচ্চি'* বা *'রসি'* বলে। এছাড়া *'আখাম বিচ্চি'* নামে পোড়া ভাত দিয়ে গারো আর এক প্রকার মদ তৈরি করে। নারী-পুরুষ যুবক, যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাই বসে একপাত্র থেকে নিজেদের তৈরি মদ পান করে থাকে। *চু* খেলে নেশা হয়। তবে পরিমিত পরিমাণে খেলে স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী বলে জানা গেল ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার হাতিলেট গ্রামের কলিম মৃ (৪৮) নামক গারোর কাছ থেকে। গারোরা জঙ্গল থেকে তোলা এক বিশেষ ধরনের আলু খেয়ে থাকে। লম্বা এবং দেখতে সাদা এই আলু গরম পানিতে সেদ্ধ করে সামান্য লবণ দিয়েই খাওয়া যায়। এরা ভাতের বদলেও অনেক সময় আলু খেয়ে থাকে। *চু*-এর সাথেও এই বন্য আলু খায় গারোরা। কচি বাঁশের *কোড়ল* দিয়ে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে গারোরা। শুঁটকি মাছ তাদের অন্যতম প্রিয়খাদ্য। এরা বিভিন্ন ধরনের মাছের শুঁটকি খেয়ে থাকে।

পাহাড়ি গারোরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। তবে সমতলে আধুনিক চাষপদ্ধতিই চলে। জুম চাষ গারো ছাড়াও অপরাপর পাহাড়ি জাতির মধ্যেও প্রচলিত। সাধারণত গারোরা কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে পর্বত-পাহাড়ের গায়ে ঢালু জায়গার ছোট-ছোট বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে এই জঙ্গল শুকায় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে তারা সেই জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সেই জঙ্গলের ছাই মাটিতে মিশে গিয়ে মাটিকে উর্বরা করে এবং শ্রাবণ মাস থেকে তাদের বীজ বপন শুরু হয়। দা কিংবা কোদাল দিয়ে মাটিতে গর্ত করে একই সঙ্গে লাউ-কুমড়ো, পেঁপে, তিল, সর্ষে, ধান, আনারস, তরমুজ ও অপরাপর ফলমূলের বীজ বপন করে থাকে। এ প্রক্রিয়াকেই সাধারণত জুম চাষ বলা হয়। হালচাষের রীতিও গারোদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দুই পাহড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিকে এরা *চালা* বলে থাকে। *চালা* ভূমিতে হালচাষের মাধ্যমেই ধান উৎপাদন করা হয়। এমনকি কোনো-কোনো স্থানে ধানের চারা রোপণ করার পদ্ধতিও দেখা যায়।

পেশা

মধুপুরে গারোরা প্রথম বাণিজ্যিকভাবে আনারস আবাদ শুরু করে। কিন্তু বিগত এক দশক ধরে লাভজনক বলে মধুপুরে আনারসসহ অন্যান্য প্রচলিত ফসলের পরিবর্তে কলার আবাদ ব্যাপকহারে সম্প্রসারিত হয়। বহিরাগত মহাজনরা গারো পল্লীগুলোতে গড়ে তুলেছে বড় বড় কৃষি খামার। বিশেষ করে বিশাল কলার বাগান। কলার পাশাপাশি আদা, হলুদ ও সবজির আবাদ বাড়ছে। পুরো চাষাবাদই তুলে নিয়েছে বহিরাগত মহাজনরা। এভাবে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে গারো জনগোষ্ঠী।

গারোরা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই মাঠে কাজ করে। কৃষিকাজ ছাড়াও তাঁত বুনে গারোরা। এ ছাড়া সুতা তৈরি, রং তৈরি করে থাকে তারা। বাঁশ-বেতের কাজেও তারা সিদ্ধহস্ত। বন থেকে কাঠ কাটা এবং সেই কাঠ স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করা তাদের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করেও তারা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। হাট-বাজারে গারো মেয়ে-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে বাজার-সওদা ও পণ্য বিক্রি করে। সন্তান লালন-পালনে গারো রমণীরা অত্যন্ত সহনশীল। মাঠের কাজের সময়ও তাদের পিঠে সন্তান বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়।

অলঙ্কারাদি

গহনা ও অলঙ্কারাদি পরার ব্যাপারে গারোদের রয়েছে বিশেষ ঐতিহ্য। গারোদের বিচিত্র ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি রয়েছে। তাদের বেশিরভাগ পোশাক তারা নিজেরাই তৈরি করে। পুরুষের পরিধেয় পোশাকের মধ্যে ধুতি থাকলেও তা অপেক্ষা *'নেংটি'* প্রধান। গারো ভাষায় যাকে *'গান্দি গান্না'* বলা হয়। গোষ্ঠী প্রধানরা উৎসব অনুষ্ঠানের সময় মাথায় পাগড়ি পরিধান করে। মহিলারা পরণে লুঙ্গির মতো *'গান্না দক্কা'* নামে টুকরো কাপড় পরিধান করে। এছাড়া বুকে ব্লাউজের ন্যায় কাপড় জড়িয়ে রাখে। তারা দেহের শোভাবর্ধনে লোহা, রূপা, তামার অলংকার ও আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করে। গারোদের পোশাক পরিচ্ছদেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী এবং বাঙালিদের চেয়ে স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। মহিলারা হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত লাল-কালো রঙ মিশ্রিত সেলাইবিহীন এক ধরনের কাপড় পরে। গারো ভাষায় এর নাম *'গান্না গিচ্চাক'*। এছাড়া কোমরের ওপরের অংশে গারো নারীরা বাহারি ব্লাউজ পরে। গারো নারীরা বিশেষ ধরনের গহনা পরে থাকে। প্রাচীন গহনাগাটির মধ্যে গলায় টঙ্কা, ছড়া, আধুলি ছড়া, সিকি ছড়া ইত্যাদি পরে। দুইকানে দুল, বড় রিং, হাতে চুড়ি বালা, রূপার তৈরি বইলা ইত্যাদি পড়ে। অবশ্য ইদানীং সব ধরনের অলংকারই পরে থাকে। অনেক গারো নারীই নাকে নাকফুলসহ আধুনিক গহনাদি পরে থাকে। উৎসবে গারো নারীরা সাজগোজ করে। এ সময় তারা বাহারি রঙে নিজেদের সাজায়। সাজগোজের পাশাপাশি মাথায় ময়ূর কিংবা মোরগের পালক পরে গারো মেয়েরা। ছেলেরা মাথায় পাগড়ি পরে। আর ছেলেরা সচরাচর গামছা/ধুতি পরিধান করে। অবশ্য ইদানীং বাঙালিদের মতো শার্টপ্যান্ট এবং সব ধরনের আধুনিক পোশাকও পরে অবস্থাসম্পন্ন গারোরা। মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

সংস্কৃতি-সংস্কার

গারোদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মৌখিকরীতির অনেক লোকসাহিত্যের অস্তিত্ব রয়েছে। এসব সাহিত্যগুলো বহুকাল থেকে মুখে মুখে প্রচলিত। সাহিত্য সমষ্টির মধ্যে কবিতা, রূপকথা, গান ও ছড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গারোদের প্রণয় উপাখ্যান ও নৃত্যে ব্যবহার্য সঙ্গীত খুবই উন্নত। গারোদের পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তারা সন্তানকে ঈষৎ উষ্ণ গরম পানি দিয়ে গোসল করায়। তারপর তারা ঘরের দরজায় জাল, মাঝখানে আগুনের কুণ্ড ও সন্তানের শিয়রে পচাপাতা রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস মতে এর কারণে নাকি অপদেবতারা সন্তানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। সন্তান জন্মের সাত দিন পরে তার নাম রাখা হয়। ফসল উৎপাদন ভালো হওয়ার জন্য গারোরা বছরে বিভিন্ন ধরনের পূজা পার্বণের আয়োজন করে থাকে। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গারোরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। এদের বিশ্বাস অসৎ জীবনযাপন করলে পরজন্মে পশুপক্ষী বা জীবজন্তু রূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। গারোরা মৃত্যুর পর মৃতদেহের সামনে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য উৎসর্গ করে। মৃত্যুর পরদিন রাতে মৃতদেহের সামনে একটি যূপকাষ্ঠে একটি ষাঁড় বা পাঁঠা

হত্যা করে। তাদের ধারণা মৃতপশুর আত্মা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সাহায্য করে। আদিম যুগে পশুর বদলে মানুষ হত্যা করা হতো। মৃতদেহ পোড়ার পর ছাই ও হাড় একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। কিছুদিন পরে এই ছাই ও হাড় জমিতে পোঁতা হয়। তাদের বিশ্বাস এতে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সন্দেহ নাই এ বিশ্বাস প্রাগৈতিহাসিক।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গারোদের সমাজ সংস্কৃতির সোর্সপার্সন রবিন্স বার্লিন তার লেখায় মান্দি বা গারোরা কোথা থেকে এসেছে এমন প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন 'কোনো জাতি গোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানতে হলে সেই গোষ্ঠীর ভাষার আদি অবস্থান কী ছিল তা নির্ণয় করতে পারলেই মোটামুটি সেই গোষ্ঠীর অবস্থান ও আগমন সম্পর্কে একটি ধারণা নির্ণয় করা সম্ভব হয়'। তিনি জানান ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত এলাকায় বেশকিছু ভাষার সাথে মান্দি ভাষা দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। নেপাল, বার্মা ও তিব্বতের বেশিরভাগ ভাষা এবং আসাম ও পার্বত্যাঞ্চলের বসবাসকারী লোকজনদের ভাষা ও দক্ষিণ চীনের কিছু লোকজনদের ভাষা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর নাম *টিবেটো-বার্মান।* এর অন্তর্ভুক্ত ভাষা হচ্ছে টিবেটান ও বার্মিজ এবং সেজন্যই এই ভাষাগোষ্ঠী *'টিবেটো-বার্মান'* নামে পরিচিত। টিবেটো বার্মান ভাষাসমূহের সঙ্গে চীনা ভাষার সম্পর্ক থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম হলো *'মান্দি ভাষা'* বা গারো ভাষা। এ ভাষা দুভাগে বিভক্ত; যথা– *আচিক কুচিক* ও *মান্দি কুচিক*।

ভাষা

পাহাড়ে বসবাসকারী গারোরা *আচিক কুচিক* ভাষায় কথা বলে; সমতলে বসবাসকারী গারোরা *মান্দি কুচিক* ভাষাটি ব্যবহার করে। অর্থাৎ এ দুটি ভাষার মধ্যে পাহাড়িদের ভাষা হলো প্রথমটি এবং সমতলীয়দের ভাষা হলো দ্বিতীয়টি। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গারোদের ভাষা মূলত *সিনোটিবেটান* ভাষার অন্তর্গত, যা *টিবেটো বার্মান* উপপরিবারের আসাম-বার্মা শাখার *বোডো* ভাষা উপগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে, গারোদের নিজস্ব কোনো লিপি বা অক্ষর নেই। ভারতের গারোরা আসামি অঞ্চলে রোমান হরফে এবং বাংলাদেশের গারোরা বাংলা হরফে গারো ভাষা লিখে নিজেদের ভাব ব্যক্ত করে। অবশ্য অনেকে মন্তব্য করেন যে, তাদের লিখিত ভাষার কোনো পরিচয় আজো পাওয়া যায়নি।

দেব-দেবী/ ধর্মাচার

গারোদের মতে তাদের প্রধান দেবতা *রাবুগা*। তার আদেশেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবী সৃষ্টির মূলে সহায়তা করেছেন নস্তু-নপাস্তু এবং মাচি। তাছাড়া প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরালেই রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রভাব। এইসব দেবদেবীই প্রকৃতিকে পরিচালনা করে থাকেন। তাদের মধ্যে *সালজং* (সূর্যদেব), *ছোছুম* (চন্দ্রদেবী), *নোরিংগ্রো নোজিজংজো* (তারকা), *গোয়েরা* (বজ্র), *নোরিচিত কিমরী বোক্রী* (বৃষ্টির দেবতা), *মেন* (মাটি বা পৃথিবী মাতা), *চোরাবুদি* (শস্য দেবতা), *রো কিম* (বীজের সার রক্ষক), নবাং (মৃতের রক্ষক) প্রভৃতির প্রাধান্য রয়েছে প্রভূত পরিমাণে। বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় এসব দেবদেবীর পূজা করা হয়।

ধর্মবিশ্বাসে গারোগণ প্রাণবাদী বা জড়োবাদী ইংরেজিতে যাকে বলা হয় *Animism.*[14] *Animism* এর সার কথা হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ। অর্থাৎ সবকিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা। ইতিপূর্বে এতদ্বিষয়ে আমরা খানিকটা আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছি।

সার্বিক বিবেচনায় গারোরা কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষ। কাজেই তাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠান কৃষি কর্মকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বণের মধ্যে– *আগালমাকা, গিচিপং, মিচিলতাতা, রংচুগালা ওয়াংগালা, দাওকারা* ইত্যাদির নাম করা যায়। বীজ বপন, ফসল তোলা, পোকা মাকড় কিংবা অপদেবতার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা, ফসলের জন্য বৃষ্টির আহ্বান ইত্যাদি কেন্দ্র করেই পূজা পার্বণের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া সন্তান লাভ, সন্তানের নামকরণ,

মহামারী-রোগ ব্যাধি থেকে অব্যাহতি পাওয়া, মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি ইত্যাদির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় দেবদেবীর কৃত্যমূলক পূজোৎসব পালন করে থাকে। ধর্মীয় উৎসব প্রকৃতপক্ষে তাদের জাতিসত্তার স্মারক চিহ্ন।

গারোদের আদি ধর্ম

আপাতদৃষ্টে গারো জাতিগোষ্ঠীর আদি ধর্মকে প্রতিমা পূজা অথবা জড়োপাসনা বলে মনে হতে পারে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে গারোদের আদি ধর্ম প্রতিমা পূজা কিংবা জড়োপাসনার মোড়কে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতোই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলোকে জড়োপাসনা বলে মনে হয় সেগুলো আসলে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভূত জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে গারোরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তিনিই যে এই বিশাল পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা তাও বিশ্বাস করে থাকে। উক্ত বিশ্বাস সর্বপ্রাণবাদী, বহুদেবত্ববাদী সব ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেই বিদ্যমান।

প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রিসীয় মানব একান্নবর্তী পরিবারের আদলে এক দেব পরিবার কর্তৃক বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের পুরাণ সৃষ্টি করে। সেই দেব পরিবারের সদস্যদের এক একজনকে এক এক দায়িত্বের জন্য পূজা করত। যেমন–জিউস পরিবার ও শিব পরিবার। গারোগণ আত্মার অবিনশ্বরতায় এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু স্বর্গ নরক সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। সম্ভবত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাল্পতার কারণেই তাদের ধর্মদর্শন বিকাশ লাভ করেনি। ফলে জীবনযাত্রার বাস্তব রূঢ়তাহেতুই তাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বর্গ নরকের পুরস্কার কিংবা শাস্তির ধারণায় ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে অন্যায় এবং পাপবোধকে তারা বিসর্জন দেয়নি, বরং এক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত আত্মসচেতনশীল জাতিসত্তা।

তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মেরই অনুরূপ। হিন্দু পুরাণ, খ্রিস্টীয় পুরাণ কিংবা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পুরাণের সঙ্গে তুলনায় গারোদের সৃষ্টিতত্ত্বকে কোনোক্রমেই তুচ্ছ করা যায় না। তাদের বিশ্বাস, আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলময় ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তী সময়ে অন্যতম প্রধান দেবতা *তাতারা রাবুগা* তার সহচর *নস্তু নপাস্তু* এবং অন্যান্য দেবদেবীর সহায়তায় পৃথিবী, আকাশ মণ্ডল, গ্রহ, নক্ষত্র, সাগর, পর্বতমালা, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। *তাতারা রাবুগা* গারোদের নিকট বিভিন্ন নামেও পরিচিত। শুধু পৃথিবী সৃষ্টি করেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। সেই সঙ্গে মানব সমাজের নানাবিধ কল্যাণচিন্তা এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধির কবল হতে মুক্ত করাও *তাতারা রাবুগার* দায়িত্ব। *তাতারা রাবুগা* ছাড়াও গারোদের উপাস্য প্রধান প্রধান দেবদেবীর নামের তালিকায় রয়েছে *চুরাবুদি, নস্তু নপাস্তু, সালজং, গোয়েরা, খাল্ কিমে, সুসিমে, অসিমা দিংসিমা, নাওয়াং* প্রভৃতি। *চুরাবুদির* দায়িত্ব হচ্ছে শস্যক্ষেত্রের ওপর নজর রাখা এবং ভালো শস্য ফলনে সাহায্য করা। তিনি *তাতারা রাবুগার* ভৃত্য হিসেবেও পরিচিত এবং যখনই *তাতারা রাবুগার* উদ্দেশ্যে কোনো উপাসনা করা হয় তখনই *চুরাবুদির* উদ্দেশ্যেও একটি শূকর উৎসর্গ করা হয়।

দেবী *নস্তু-নপাস্তু* তাতারা রাবুগার নির্দেশে পৃথিবী সৃষ্টির কাজে তাকে সাহায্য করেন। *সালজং* হচ্ছে ভূমি উর্বরকারী দেবতা। ভাষান্তরে সূর্যদেবতাকে গারোরা *সালজং* নামে অভিহিত করে থাকে। তার সহায়তা ব্যতিরেকে যেহেতু উত্তম ফসল ফলানো সম্ভব নয় সেহেতু তিনি কৃষিজীবী গারোদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত। ফসল কাটার অব্যবহিত পরে বার্ষিক ওয়ানগাল্লা উৎসব তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়ে থাকে।

অবশ্য আসল উপাসনা শস্য ক্ষেতে *ওয়ানগাল্লা* উৎসবের পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়। একটি মোরগ হত্যা করে সেটির রক্ত শস্য ক্ষেতে দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত বেদীর ওপর ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং সেই সঙ্গে কিছু মদ বেদীর সম্মুখস্থ মাটিতে ঢেলে দেয়া হয়। পরে পূজারিরা *ওয়ানগাল্লা* উৎসব আরম্ভ করার জন্য গ্রামে ফিরে আসে। *সালগিরা, সালগ্রা, রেংরা, বাল্‌সা* প্রভৃতি নামেও *সালজং* গারোদের নিকট পরিচিত।

গোয়েরা হচ্ছে শক্তির দেবতা এবং তিনিই বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের হেতু বলে পরিচিত। সুস্বাস্থ্য কামনায় অথবা দীর্ঘ রোগভোগের কবল হতে আরোগ্য কামনায়ও তার পূজা হয়ে থাকে। কোনো বৃক্ষ তলে তার উপাসনা করাই নিয়ম এবং উপাসনায় তার উদ্দেশ্যে একটি শূকর, একটি মোরগ ও একটি হাঁস উৎসর্গ করাই বিধি।

খাল কিমে হচ্ছে *গোয়েরার* ভাই এবং তার হাতেই মানুষের পরমায়ু ন্যস্ত বলে গারোদের বিশ্বাস। *আসং রিকআ* উৎসবে তার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হয়ে থাকে এবং গ্রামবাসীর নিরাপত্তা কামনা করা হয়। আসং অথবা উপাসনার পবিত্র পাথর তার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়ে থাকে এবং তার নামেই গ্রামবাসী নিজেদের বিপদ বালাই দূর করে থাকে। *খাল কিমের* পূজায় একটি ছাগল কিংবা একটি মোরগ অবশ্যই হত্যা করতে হয়।

সুসিমে হচ্ছে ধনসম্পদ প্রদানকারিণী দেবী এবং তিনিই অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব প্রভৃতির কারণ ও সেগুলির আরোগ্যদাত্রী। ভাষান্তরে চন্দ্রকেই গারোরা *সুসিমে* নামে অভিহিত করে থাকে। তার পূজায় একটি শূকর এবং একটি মোরগ উৎসর্গ করতে হয়। *আসিমা দিংসিমা* হচ্ছে *সুসিমের* মা, কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ অবদান নেই। তবে তার নাম উচ্চারণে গারোরা সাবধানতার সঙ্গে বিরত থাকে। কারণ তাদের সংস্কার রয়েছে *আসিমা দিংসিমার* নামোচ্চারণ করলে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। *নাওয়াং* হচ্ছে মানুষের জীবন হননকারী অপদেবতা এবং তিনিই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অনন্ত পথের যাত্রায় সাহায্য করে থাকেন। এ কাজে তিনি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। গারোরা তাকে পেটের পীড়া, উদরাময় প্রভৃতিরও কারণ বলে মনে করে থাকে।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান দেবদেবী বাদেও গারোদের উপাস্য অসংখ্য দেবদেবী রয়েছে যাদেরকে তারা বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। তবে নানা আচার-অনুষ্ঠানে অথবা পূজা-পার্বণে তাদের অস্তিত্বের কথা খুব কমই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক ব্যাপারে তাদের প্রত্যক্ষ অবদান খুবই গৌণ। শুধু পৌরাণিক গাথা, লোককাহিনী, যেমন *আজিয়া, দরুয়া* প্রভৃতির সময়েই তাদের নাম এবং অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গারোরা জন্মান্তরবাদে এবং আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। স্বর্গের সুখভোগ কিংবা নরকের শাস্তিভোগ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তবে আত্মার চিরন্তন আবাসভূমি যে এক অজ্ঞাত স্থানে এবং তা যে অনাবিল শান্তিময় তা তারা বিশ্বাস করে। সম্ভবত সেটাই তাদের স্বর্গ। *চিকমাং* পাহাড়কে গারোরা আত্মার অনন্ত যাত্রাপথের সাময়িক বিশ্রামস্থলরূপে মনে করে থাকে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকালে নেত্রকোণা জেলার গ্রেনার মারাক (৪৫) নামে উচ্চশিক্ষিত গারো এমন বিশ্বাসের কথা বলেন। চিকমাং পাহাড়টি গারো পাহাড়ের অন্যতম উঁচুশৃঙ্গ। সম্ভবত *নকরেক* শৃঙ্গের পরেই এর স্থান। বাংলায় এ শৃঙ্গটিকে গারোরা কৈলাস পাহাড় নামেও পরিচয় দিয়ে থাকে। তবে হিন্দু পুরাণ কথিত সেই কৈলাস পর্বত নয় যেটি হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে তিব্বত ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং হরগৌরীর চিরন্তন লীলাভূমি ও হিন্দুদের অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান।

চিকমাং ভাষান্তরে কৈলাস পাহাড়টি ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের দুর্গাপুর, কলমাকান্দা প্রভৃতি এলাকা হতে স্পষ্ট দেখা যায়। এর আকৃতি কতকটা পিরামিড সদৃশ, তবে পাহাড়টির পশ্চিমাংশ পূর্বাংশের তুলনায় বেশি খাড়া। পাহাড়টির আশপাশে কিংবা উপরিভাগে কোনো মনুষ্য বসতি নেই এবং সেখানে নানাবিধ ঔষধি গাছপালা প্রচুর জন্মায়। গারোদের বিশ্বাস মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিদেহী আত্মা প্রথমে *চিকমাং* পাহাড়ে গমন করে এবং সেখানে সাময়িক অবস্থান শুরু করে পরবর্তীকালে তার জাগতিক কর্মফলানুযায়ী সে মানবেতর প্রাণী অথবা বৃক্ষলতারূপে জন্মগ্রহণ করে কিংবা অনন্ত লোকে যাত্রা করে। পাপের অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে গারোদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই, তবে তারা তাৎক্ষণিক শাস্তি, যেমন জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক অপঘাতে মৃত্যুবরণ কিংবা দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি, যেমন কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে জন্মান্তরে মানবেতর কোনো ঘৃণ্য প্রাণীর দেহ পরিগ্রহণকেও গারোরা পাপের শাস্তি বলে মনে করে থাকে।

ধর্মান্তর

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যসব

সম্প্রদায়ের মতোই গারোদেরও নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক চাপে অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের পার্থিব জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে, সেই সঙ্গে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, স্বভাবের দিক দিয়ে গারোরা শান্তিপ্রিয় এবং তাদের স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। যেজন্য তারা বরাবরই বিচ্ছিন্ন এলাকা বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়িয়া এলাকাকেই বসবাসের জন্য শ্রেয় মনে করেছে যাতে বাইরের সভ্য জগতের সভ্য নামধারী কতিপয় ধূর্ত মানুষ তাদের নির্বিঘ্ন জীবনযাপনে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের এই নিরুপদ্রব জীবনযাপন মোটামুটি বহাল ছিল। কিন্তু উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পরে ব্রিটিশরা যখন গারো পাহাড় এলাকাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেন তখন থেকেই গারোদের ধর্মান্তর গ্রহণ শুরু হয়। অবশ্য ইতিপূর্বেই কিছু কিছু মিশনারি, গারোদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন এবং মোটামুটি ফলও পাওয়া যাচ্ছিল। তবে ঊনিশ শতাব্দীর শেষার্ধেই গারো পাহাড় এবং ময়মনসিংহ জেলার গারোদের মধ্যে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়।

বর্তমান নেত্রকোণা জেলার সুসং দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরিতে ১৮৯২ সালে ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠিত হলে গারোদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার আন্দোলন শুরু হয়। এ কাজে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্যাথলিক মিশনারিগণ ময়মনসিংহ জেলার গারোদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। ১৯২০ সালের পরে তা ব্যাপকতা লাভ করে এবং বহুসংখ্যক গারো ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষিত হন। বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন গারোই খ্রিস্টধর্মালম্বী।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় এই যে, ব্রিটিশ শাসনের বহুকাল পূর্বেই অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ৯ম, ১০ম শতক থেকেই এ উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব কালেই বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এই অঞ্চলের মানুষ জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়। কিন্তু উপরোক্ত ধর্মমতের কোনোটাই গারোদেরকে ধর্মান্তরিত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। খুব সম্ভবত গারোদের প্রতি উপরোক্ত ধর্মবিশ্বাসীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গিই এর মূল কারণ। তাদের ধর্মের স্বতন্ত্র বিকাশের সুযোগ দানের জন্যই ধর্মান্তরে বাধ্য করেনি। অন্যদিকে গারোরা দরিদ্র, অতীতে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো সুযোগ তারা পায়নি বললেই চলে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গারোরা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে খ্রিস্টান মিশনারিরা একান্ত আপনজনের দরদ নিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। শুধু তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করাই খ্রিস্টান মিশনারিদের চরম লক্ষ্য ছিল না। সামগ্রিকভাবে গারোদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এ কাজে তারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা গারো অঞ্চলের আনাচে-কানাচে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানাবিধ জনহিতকর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেন।

গারোদের বর্তমান অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং আধুনিক জীবনের জন্য খ্রিস্টান মিশনারিদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন যে, উন্নত দেশসমূহের নামে খ্রিস্টান গরিব বস্তিবাসীদের মধ্যে কাজ করে যতটা না সাফল্য ও সন্তোষ করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সফলতা এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় গারো অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করে। এবং তাদের জীবনমান উন্নত করার কাজে আত্মত্যাগে। কারণ, একবার ধর্মান্তরিত হলে এরা সত্যিকারেই ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠে।[১৯] খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকার কিছুসংখ্যক গারো হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু তা কোনো কালেই ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

টাঙ্গাইলের মধুপুর থানার জলছত্র এবং এর আশপাশের কিছুসংখ্যক গারো নিজেদের সনাতনপন্থী হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা বৈষ্ণব এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারী। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গুরুচরণ সিমসাং নামক জনৈক গারোর নেতৃত্বে তারা বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষিত হন। কিন্তু বিগত দিনে সেই এলাকা এবং অন্যান্য এলাকার গারোদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মমত তেমন প্রসার লাভ করেনি কিংবা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। সম্ভবত গারোদের প্রতি হিন্দুদের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিই এর প্রধান কারণ। ফলে ওইসব গারোরা ধর্মান্তরিত হয়েও হিন্দুদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি, এমনকি অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তারা একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি। অন্যদিকে হিন্দুরাও উদার মন নিয়ে তাদের গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে কোনো বৃহৎ জনসমাজের পরিবারভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের এক ছোট জনসমাজ গড়ে নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব কোনোমতে টিকিয়ে রেখেছে। আনুমানিক পঞ্চাশটি পরিবারের সাড়ে চারশো জনের মতো লোক নিয়ে গারো-হিন্দু সমাজ পূর্বোক্ত করুণ দশার মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।

ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক

গারো সম্প্রদায়ের আদি ধর্মের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সেই সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সুসমৃদ্ধ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হতে শুরু করে প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সেই সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ। গারোদের আদি ধর্মবিশ্বাসে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত বাদ্যবাজনা প্রভৃতি একটি প্রধান অংশ দখল করে রয়েছে। যে কোনো আচার-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে নৃত্যগীত গারো সমাজে অপরিহার্য। তাদের নৃত্যগীতের শ্রেষ্ঠ উৎসব ওয়ানগাল ার অন্যতম প্রধান দেবতা সালজং পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তেমনি *দরুয়া, কাথাদক আ,* প্রভৃতি লিরিকধর্মী গীতের মধ্যেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি এবং সৃষ্টি রহস্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোনো উৎসবে কথায় কথায় *আজিয়া* কিংবা *রে-রে* পরিবেশন করা গারোদের চিরাচরিত স্বভাব। এসব আজিয়া, রে-রে প্রভৃতির কোনো কোনো অংশ স্থূল রুচির পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু তার আবেদন সত্যিকারেই হৃদয়গ্রাহী।

আরেকটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গারোদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও সমৃদ্ধ। অনেকের ধারণা গারোদের এই সংবদ্ধ সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রাক-বৌদ্ধ যুগের। তবে ধর্মান্তরের ফলে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে গারোদের অনেকেই তাদের পোশাকে-আশাকে, আহারে-বিহারে পশ্চিমী প্রথা গ্রহণ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রভাবে তাদের জীবনযাত্রার ধরন উন্নততর হয়েছে, প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি পরিত্যাগ করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ওষুধের শরণাপন্ন হয়েছে। হয়েছে স্বাস্থ্য সচেতন। আধিদৈবিক শক্তির অনড় বিশ্বাস আগের মতো নিয়ন্ত্রকের আসনে নেই– রয়েছে প্রথা রূপে। সর্বোপরি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় পোশাক–পরিচ্ছদ, নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি বিসর্জন দিতে বসেছে তারা। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই তা এক উন্মূল সংস্কৃতির ধারক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারে গোঁড়া মিশনারিদের মনগড়া বিধিনিষেধ কম দায়ী নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা হয়তো অবান্তর হবে না, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা কেতা গ্রহণ করায় আপন ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, নৃত্যগীত, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ধর্ম আফিমস্বরূপ। আফিমের চেতনা বিলোপকারী ক্ষমতার মতোই নব্যধর্মের মন্ত্রাদি গারোদের ধর্মীয় চেতনা ও স্বাজাত্যবোধের বিলোপ সাধন করে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে অবলীলায় আত্মপরিচয় বিসর্জন দিয়ে বসে। সে জন্যই গারোদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচলন অর্থাৎ যাকে আধুনিকীকরণ বলা হয় তা সম্পূর্ণভাবে এসেছে মিশনারিদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সচেতন ও বিবেকবান মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করে, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো বৈরিতা থাকতে পারে না– কারণ ধর্ম সংস্কৃতিরই একটা অংশ। সুখের বিষয় দেরিতে হলেও সম্প্রতি কিছুসংখ্যক মিশনারি এ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা গারো সমাজের বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে খ্রিস্টধর্মের পাশাপাশি অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। হয়তো এতে শেষ রক্ষা হতেও পারে। কিন্তু গারোজাতি সত্তা তাদের অতীত সংস্কৃতির

যা কিছু বিসর্জন দিয়েছে তার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। গারোদের দেবদেবীর মধ্যে *তাতারা রাবুগা*-ই প্রধান।[২৩] তার আদেশেই *নস্তু নপান্তু* মাচির সহযোগিতায় পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাছাড়া গারো সমাজে *সালজং* (সূর্যদেব), *ছোছুম* (চন্দ্র), *নোরিংগ্রো নোজিংজু* (তারকারাজি), *গোয়েরা* (বজ্র), *নোরাচিত কিম্‌রী বোক্রী* (বৃষ্টি), *মেন* (মাটি বা পৃথিবী), *আছিমা দিংগছিমা* (ছোছুম বা চন্দ্রের মা), *কালকেম* (গোয়েরা বা বজ্রের ভাই), *চোরাবুদি* (শস্যদেবতা), *রোকিম* (বীজের সার-রক্ষক), *মিসিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ* (ধানের তত্ত্বাবধায়ক) এবং *নবাং* (মৃতের রক্ষক) প্রভৃতির প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে গারোরা এইসব দেবদেবীর পূজা করে থাকে।

গারো দেবতা

গারো দেবদেবীর মধ্যে *চুরাবুদি* (Chorabudi) হচ্ছে একটি প্রসন্ন আত্মার দেবতা। তিনি ফসলের রক্ষাকর্তা। শস্য পরিপক্বতার পূর্বে তার পূজার আয়োজন করা হয়। *নস্তু-নপান্তু* (Nostu-nopant̆) হচ্ছে সেই দেবতা যিনি *তাতারা রাবুগার* আদেশে *মাচির* সহযোগিতায় পৃথিবীকে সুদৃশ্যরূপে তৈরি করেন। যেহেতু তারা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না সেই হেতু *নস্তু নপান্তু* এবং *মাচির* উদ্দেশ্যে কোনোরূপ পূজা অর্পণ করা হয় না। গারোদের উর্বরতার দেবতা হচ্ছে *সালজং*। তিনি সূর্যের দ্বারা নিয়োগকৃৎ প্রতিনিধি। তিনি পূজিত হন সর্বদাই। কারণ সব শস্যই তার নিয়ন্ত্রণে এবং তার সহানুভূতি ব্যতীত কোনো কর্ষণ কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। গারোদের সর্ববৃহৎ বাৎসরিক উৎসব *ওয়ানগাল্লা* তার সম্মানেই উৎসর্গীকৃৎ হয়। এই দেবতা: Engsugipa-tengtotgipa, Salgiraa, Salgra, এবং rengra-balsa নামেও পরিচিত। *গোয়েরা* (Goera) হচ্ছে শক্তির দেবতা এবং বজ্র ও বিদ্যুতের উৎস বা কারণ। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে স্বাস্থ্য ও শক্তির কামনায় তার প্রার্থনা করা হয়। *কালকামে* (Kalkame) *গোয়েরার* ভাই। তিনি সেই দেবতা যার দুই হাতে সব মানুষের জীবন। *আসুংতাতা* বা *আসুংরোকা* উৎসবে তার প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উৎসবের পর তিনি আরণ্যক বিপদ-আপদ থেকে গ্রামবাসীর পরবর্তী বৎসর রক্ষা করেন। *সুসিমি* (Susime) হচ্ছে ধনসম্পদের দেবী। একইসঙ্গে অন্ধত্বের কারণ এবং অশিক্ষা থেকে মুক্তির দেবী। তিনি চন্দ্রদেবের প্রতিনিধি। গারোরা এই দেবতারও পূজা করে থাকে।

আসিমা দিনসিমা (Asima-Dinsima) *সুসিমির* মাতা। তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো কর্ম উপলক্ষে আবির্ভূত হন না। এবং তার পূজাও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। এই দেবতার অনেক নাম রয়েছে– তন্মধ্যে Norekbak, Norekdim, Sonakalie-kaburanche and Mikrongitok-kishang-sitok.

নাওয়ান (Nawang) হচ্ছে একটি খারাপ আত্মা যে স্বর্গের পথ থেকে মানুষের আত্মাকে বিতাড়িত করে। একইসঙ্গে জীবিত মানুষকেও খারাপ পথে পরিচালিত করার জন্য সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। একই সঙ্গে সে মানুষের পাকস্থলির ব্যথার কারণ। বমি এবং ডায়রিয়া তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। প্রায়ই সে মানুষের মৃত্যুশয্যায় বসে থাকে মৃত্যুর পর তার আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মরণশীল মানুষ তার আক্রোশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে লোহার তৈরি একটি অস্ত্র বানিয়ে রাখে। কিন্তু দুষ্ট দেবী মানুষের কাছ থেকে এটা ধার করে নিয়ে যায় এবং দূর থেকে তা নিক্ষেপ করে।

তাছাড়া পাহাড়-পর্বত নদনদীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে দেখা যায়। এইসব পূজা-পার্বণের সঙ্গে কখনো-কখনো কোনো সংস্কার সম্পৃক্ত থাকে। গারো সমাজে ধর্মের অন্যতম দিক মৃত মানুষের পূজা বা পূর্ব পুরুষের পূজা। তাদের ধারণা মৃত ব্যক্তিদের আত্মাবস্তুতে রয়েছে জীবন-সার বা Life Essence সেই জীবন-সার-পূজা-পার্বণের মাধ্যমে ধরে রাখতে পারলে তাদের সাংসারিক সব কাজে সফলতা অনিবার্য। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই গারো সমাজ মৃত ব্যক্তিদের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রস্তর স্থাপন করে থাকে। সেই প্রস্তরে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাবস্তু আশ্রয় গ্রহণ করে জীবিত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য। উল্লেখ করা যেতে পারে যে গারোদের প্রত্যেক পূজা পার্বণেই জীববলী, নৃত্য-গীত ও আনন্দ অনুষ্ঠান অপরিহার্য।

গারো নৃ-গোষ্ঠী একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেও তাদের সেসব সাংস্কৃতিক ঐহিত্য আজ বিলুপ্তির পথে। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে এদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনগ্রসর সমাজের বাসিন্দা হিসেবে তাদের সব সম্ভাবনাই যেন আজ লুপ্ত হতে বসেছে। অথচ এদের পুরাণে বিবৃত বিচিত্র অতিলৌকিকতার আড়ালে জীবন ও জগতের এক শাশ্বত রূপের পরিচয় বিদ্যমান।

গল্প

আবার ফুটবে আলো

আফরোজা পারভীন

সেনানিবাসের পাশের এই রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যেই চলতে দেখা যায় ওই মহিলাকে। ধবধবে ফর্সা টানা টানা চোখমুখের বছর পয়তালি শের ওই মহিলাকে দেখলে বোঝা যায় যেনতেন পরিবারের মেয়ে বা বউ নয় উনি। নিজে না বললেও চেহারা থেকেই ফুটে বের হয় আভিজাত্য। তবে মহিলার পোশাক-আশাকের অবস্থা বড়ই খারাপ । পরনের শাড়িটা যেন কতদিন ধরে ধোয়া হয়নি, মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। জট বেঁধে একাকার। উকুনও হয়েছে বোধহয় কিছু। মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে ক্রমাগত মাথা চুলকাতে দেখা যায় মহিলাকে। চুলকানোর ধরন দেখে মনে হয় টানাটানিতে বেশ কিছু চুল বুঝি উঠে যাবে মহিলার। মহিলার বেশবাস আর পোশাক-আশাক তার চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। মহিলাকে যারা দেখে তারাই সম্মানে রাস্তা ছেড়ে দেয় । মহিলা বিড় বিড় করে, এদিক-ওদিক তাকায়, চোখের ওপর হাত রেখে যেন কাকে খোঁজে তারপর আনমনে রাস্তা ধরে হাঁটে। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে সে চলে যায় রাস্তার মাঝ বরাবর। রাস্তার মাঝখান দিয়ে সে হাঁটছে আর দূরপাল্লার বাসগুলো ধেয়ে এসে তাকে দেখে ক্রমাগত হর্ন দিতে দিতে স্পিড কমাচ্ছে, তারপর একেবারে বাস থামিয়ে হেলপার নেমে হাত ধরে মহিলাকে নিয়ে এসে রাস্তার একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে, এ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই দেখা যয়। অবশ্য হাত ধরলে বা রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে বললে মহিলা কোনো সমস্যা করে না। সুবোধ বালিকার মতো সরে যায় একপাশে তারপর সে রাস্তা ধরেই সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। হাঁটে আর হাঁটে যতক্ষণ মেয়ে কাকলি খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে রাস্তায় এসে তাকে না থামায়। কাকলি এসে মহিলার হাত ধরে। দরদী কণ্ঠে বলে–

: কখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলে বলো তো। এতো চোখে চোখে রাখি তারপরও বেরিয়ে আসো। মুখটা শুকিয়ে কেমন আমসি হয়ে গেছে। কাল না তোমার অতোগুলো কাপড় ধুয়ে দিলাম। একটা কাপড় তো পরিয়েও দিলাম। তা তুমি সেই ধোয়া কাপড় ছেড়ে ময়লা কাপড় পরে বেরিয়েছ। লক্ষী মা আমার, সোনা আমার, এমন করে না। এমন করলে লোকে ভাবে আমি তোমার যত্ন নিই না। চলো দেখি। বেলা গড়িয়ে পাটে নেমেছে আর তোমার নাওয়া নেই খাওয়া নেই। আমি সারা গাঁ খুঁজে খুঁজে হয়রান। চলো তো মা।

মায়ের হাত ধরে কাকলি নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। মেয়ের হাত ধরে হাঁটে এক কালের ডাকসাইটে সুন্দরী আর অসম্ভব সাহসীকতার জন্য খ্যাত আমেনা বেগম। আমেনা বেগম স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। রাইফেল বন্দুক সবই সে চালাতে জানত। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে সে তথ্য আদান প্রদান করতো। এক মুক্তিযোদ্ধার প্রেমে পড়ে সে দেশ আর প্রেমকে একাকার করে ফেলেছিল। যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা কাশেমের সাথে আমেনার বিয়ে হয়। কাশেম এখনো বেঁচে আছে কিন্তু আমেনার সাথে নেই, এই যা। একজন মানুষকে যে এক জনের সাথে সারাজীবন থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নিয়ম সবার জন্য এক। সে নিয়ম সাধারণের জন্যও যা মুক্তিযোদ্ধার জন্যও তাই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। কাশেম অবশ্য লোক তেমন খারাপ না। দ্বিতীয় স্ত্রীর চোখ বাঁচিয়ে কিছু কিছু টাকা পয়সা, ঈদে পার্বণে কিছু কাপড় চোপড়, মাঝে মাঝে সামান্য কিছু বাজার সদাই কাকলিকে দিয়ে আসে। কাকলির ইচ্ছে হয় না নিতে, তবু নিতে হয়। সংসারের কঠোর বাস্তবতা অল্প বয়সী কাকলিকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সে বোঝে মস্তিষ্ক বিকৃত সহজ বাংলায় বললে পাগল নিয়ে আব্বা সারাজীবন সংসার করবেন এটা খুবই অযৌক্তিক। তিনি স্ত্রী সন্তান নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে তাকে বাহবা দেয়া যেত। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে কোনো মহা অন্যায় করে ফেলেছেন একথা ভাবে না কাকলি। তবে একথা ঠিক তার বাবার এমন অবস্থা হলে মা যে দ্বিতীয় বিয়ে করতে যেতেন না, এটা নিশ্চিত। কেন যে মেয়েরা এসব স্বার্থত্যাগ করে! এসব ভেবে রাগ হয় কাকলির। মেয়েরা কেন মানুষের মতো আচরণ করে না। পুরুষরা যদি নিজেদের সুবিধার ষোলআনা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে পারে তাহলে নারীই বা পারবে না কেন। এ দোষ মেয়েদের। পুরুষের প্রতি নয়, মেয়েদের প্রতি ক্ষোভ জমে কাকলির মনে।

কাকলি বাবার হাত থেকে টাকা নেবার সময় মাঝে মাঝে বলে–

: বাবা মায়ের চিকিৎসা দরকার। ভালো করে চিকিৎসা করালে মা ভালো হয়ে যাবেন

বাবা মাথা চুলকান, উসখুশ করেন। তারপর বলেন–

: কিন্তু সেতো অনেক টাকার দরকার। তাছাড়া লোকজনেরও সমস্যা। এমনিতেই দুই সংসার চালাতে গিয়ে আমার হিমশিম অবস্থা।

কাকলি দুই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। সেই বা কেন অযৌক্তিক কথা মেনে নেবে। মনের রাগ মনে পুষে রেখে শান্তভাবে কাকলি বলে–

: কিন্তু বাবা শুভর তো কঠিন অসুখ, আপনি কি তাকে চিকিৎসা না করিয়ে ফেলে রেখেছেন? তাছাড়া ছোট মায়েরও তো অপারেশান হয়েছে দুটো। তাতেও তো কম টাকা যায়নি।

এককালের মুক্তিযোদ্ধা কাশেম এবার রীতিমতো বিব্রত । তার সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি আর বিব্রতভাব। মেয়ে যে তাকে এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফেলবে ভাবেনি কাশেম।

: কিন্তু মা সে অসুখ আর এ অসুখ এক জিনিস না। ওসব অসুখ চিকিৎসা করালে সেরে যায়। কিন্তু এ অসুখ সারবার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

: নিশ্চয়তা নেই বলেই একজন মানুষকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখতে হবে? আপনার জীবন তো আপনি ঠিকই গুছিয়ে নিয়েছেন বাবা। কিন্তু মায়ের অবস্থা তো দিন দিন খারাপ হচ্ছে। দিনের পর দিন খায় না, দরজা খুলে একা একা রাস্তায় চলে যায় । বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। কখন বাস ট্রাকের নিচে পড়ে তার ঠিক আছে। নেহাৎ এ এলাকার লোক মাকে চেনে, খুবই মান্য করে, আমাদের দুঃখের ঘটনাটা জানে তাই ওরাই সাবধানে গাড়ি চালায়। কিন্তু সব ড্রাইভার কি মাকে চেনে নাকি সব সময় দেখে শুনে গাড়ি চালানো যায়! কবে যে কখন কি ঘটে আমি সারাক্ষণ সেই দুর্ভাবনায় থাকি।

কাশেমের উসখুশ বাড়ে। সে এই অপ্রিয় আলোচনা দ্রুত থামাতে চেষ্টা করে। বলে

: সেই জন্যই আমি চেয়েছিলাম আমেনাকে শেকল পরিয়ে রাখতে। তাহলে অন্তত বেঘোরে মারা পড়ার চিন্তাটা থাকতো না।

: মায়ের মারা পড়ার চিন্তা তাহলে আপনার আছে বাবা! ভালো। পায়ে শিকল দিয়ে আটকে রাখবেন তারপরও চিকিৎসা করাবেন না, আবার বলবেন বেঘোরে মারা পড়ার চিন্তা করছেন। ভালো বাবা, খুব ভালো। তবে আপনি জেনে রাখবেন আমি যতোদিন আছি মাকে কেউ শিকল দিয়ে বাঁধতে পারবে না। আমি বাঁধতে দেবো না। মায়ের জন্য কলেজ ছেড়েছি, প্রয়োজনে আরো অনেক কিছু ছাড়ব। তবে মায়ের হাত পায়ে শিকলের দাগ আমি বসতে দেবো না।

কাকলির কণ্ঠে স্পষ্ট ক্ষোভ আর প্রবল ঝাঁজ। সে ঝাঁজের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে কাশেমের পক্ষে। তাড়াতাড়ি টাকাটা কাকলির হাতে তুলে দিয়ে রাস্তায় নামে কাশেম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায় কাশেম। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। পঁয়তাল্লিশ বছরের কাশেমের জন্য কি দ্বিতীয় বিয়ে করা এতোই জরুরি ছিল যখন এককালের প্রেমিকা স্ত্রী আকস্মিক শকে বেসামাল। বেসামাল কিন্তু মারা তো যায়নি। কাশেমের যৌন ক্ষুধা কি

এতোই প্রবল হয়েছিল যে তার তাড়নায় অতো তাড়াতাড়ি তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে। তাও আবার স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানসহ। প্রতিটি জবাবই কাশেমের বিপক্ষে যায়। এক একটি জবাব পায় আর কাশেমের অপরাধের থলি স্ফীত হয়। আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কাশেম নিজেকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। আকস্মিক শকে স্ত্রীর মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শারীরিকভাবে তো সে অক্ষম হয়ে যায়নি। শারীরিকভাবে এখনো সক্ষম তার স্ত্রী। আর স্ত্রী যেমন শক পেয়েছিল একই রকম শক পাবার কথা কাশেমের। পারস্পরিক ভালোবাসা আর সেবা যত্ন আদান-প্রদানে সে শক হয়তো তারা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু আমেনাকে শোকের ওপর শক দিয়েছিল কাশেম। ছয়মাস না যেতেই বিয়ে করে বসেছিল। এর পরিণতি যা হবার হয়েছিল। বাবা বিয়ে করার পর অপ্রকৃতিস্থ মাকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল কাকলির পক্ষে। তাই কলেজ ছেড়ে এসে ধরল মায়ের সংসারের হার। কাঁধে তুলে নিল অপ্রকৃতিস্থ মায়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব। কিন্তু মায়ের দায় দায়িত্ব তুলে নিলেও দিন রাতের পুরোটা সময় সে বাড়িতে থাকতে পারে না। বাজার ঘাটের জন্য বাজারে দোকানে যেতে হয়, সংসার চালানোর জন্য দু একটা ছেলে মেয়েকে সে পড়ায়। সৎ মায়ের চোখ বাঁচিয়ে বাবা যে টাকা দেন ও টাকায় মা মেয়ের চলে না। তাই সংসার চালানোর জন্য বাড়তি কিছু রোজগারের ব্যবস্থা কাকলিকে করতেই হয়। বাইরে যাবার সময় ভালো করে দরজা বন্ধ করে রেখে যায় কাকলি। মাকে বারবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে যায়। কিন্তু মা যে কিছুই মনে রাখতে পারে না। কাকলি বেরোবার পরই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মা। কখন কোথায় যায় ঠিক নেই। ঘরে ফিরে মাকে না পেয়ে পাগল হয়ে ওঠে কাকলি। মাকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে। এ পাড়া সে পাড়া, পুকুর পাড়, নদীর ঘাট রেলস্টেশন পাকা সড়ক। আজও খুঁজতে খুঁজতে বড় রাস্তাতে এসে মাকে ফেরায় কাকলি।

মার হাত ধরে যেতে যেতে কাকলি আপন মনে কথা বলে–

: এমন করলে কি চলে মা, আমি বুঝিনা মা তুমি কেন এমন করো। তুমি এমন করলে যে তোমার একমাত্র আদরের মেয়েটার খুব কষ্ট হয় তাকি বোঝ না। তুমি আর এমন কোরো না লক্ষী সোনা মা আমার। বুঝেছ তো মা, বুঝেছ?

আমেনা ফ্যাল ফ্যাল করে কাকলির দিকে তাকায় তারপর শিশুর হাসি হাসে। সে হাসিতে কাকলির প্রায়ান্ধকার ভুবনটা আলোকিত হয়ে ওঠে।

মাকে নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে পানি গরম করে গোসল করায় কাকলি। লম্বা লম্বা চুলগুলোর একটা একটা করে জট ছাড়ায়। মিহি চিরুনি দিয়ে সে চুল আঁচড়ায় যত্নের সাথে। ঝপঝপ করে পড়ে উকুন। মায়ের পিঠের উপরে ছড়ানো কাকলির সাদা ওড়নাটা উকুনে উকুনে কালো হয়ে যায়। ভাত মেখে গালে তুলে খাওয়ায় কাকলি। অনেকটা ভাত খেয়ে ফেলে মা। না জানি মায়ের পেটে কতো ক্ষুধা। কাকলির দু'চোখ ভরে জল আসে। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে মা। ভাত দিয়ে ডিমের মতো বানিয়ে কাকলির মুখে তুলে দেয়। কাকলি প্রথমটা বুঝতে পারে না, তারপর বুঝতে পেরে গপ করে গিলে নেয় মায়ের হাতে বানানো ভাতের ডিম। প্রচণ্ড কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। তারপর মনে পড়ে ছেলে বেলায় মা তাকে আর ভাইয়াকে এভাবে নানান পাখির ডিম বানিয়ে খাওয়া তো। ভাইয়াটা বড় ফাঁকিবাজ ছিলো। অনেক বড় হবার পরও সে নিজ হাতে মেখে ভাত খেতো না। মা তাকে ডিম বানিয়ে বানিয়ে মুখে তুলে খাওয়াতেন। কাকলি ভাবে আর ফুলে ফুলে কাঁদে। মায়ের হাতে আর একটা ডিম

খাবার জন্য হা করে থাকে। কিন্তু আমেনা আর ডিম বানান না, মুখেও তুলে দেন না। বরং কাকলিকে কাঁদতে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। নিজেও আর খান না। কাকলি তাকে পানি খাইয়ে নিজ হাতে ওড়না দিয়ে মুখ মোছায়। তারপর মশারি টানিয়ে বাতি নিভিয়ে শুইয়ে দেয়।

বহুদিন পর গভীর প্রশান্তি নেমে আসে কাকলির মনে। মা-কি তবে সুস্থতার দিকে ফিরছে। মার যে সুস্থ হওয়া খুবই দরকার। নিজের জীবন নিজের ভবিষ্যৎ না হয় সে মায়ের জন্য বলিই দিলো। কিন্তু মায়ের নিজের জন্যই যে তার সেরে ওঠা দরকার। সেদিনের সে রাতে ভাইয়ার ডেডবডি দেখে সেই যে মা চিৎকার করে জ্ঞান হারালো তারপর জ্ঞান ফেরার পর থেকেই মা অপ্রকৃতিস্থ। আজ কেন যেন তার মনে হচ্ছে মার চোখের সামনে থেকে বোধের বন্ধ অস্পষ্টতার ধোঁয়াটে দেয়াল একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। হবে তার মা ভালো হবে, অবশ্যই ভালো হবে। অনেকদিন পর গভীর ঘুম নেমে আসে কাকলির দু' চোখের পাতায়। সে ঘুমে তলিয়ে যায় তার সমুদয় চৈতন্য।

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন আমেনা। ঘরের দরজা খুলে আস্তে আস্তে উঠোন পেরোন। নেমে আসেন রাস্তায়। আস্তে আস্তে বড় রাস্তা ধরে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন।

রাস্তা দিয়ে একের পর এক এগিয়ে আসছে রাতজাগা দূর পাল্লার গাড়ি, ভারি ট্রাক। এগিয়ে আসছে একটা আর্মি জিপ। আমেনা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত উঠান। ধীরে ধীরে থেমে যায় জিপ। গাড়ি থেকে একজন দরজা খুলে বলে, ওঠেন মা, ওঠেন। আমেনার হাত ধরে গাড়িতে উঠায়।

গাড়িতে বসা সদ্য এই স্টেশনে যোগদানকারী নতুন অফিসার বলে–

: কে উনি, ওনাকে এভাবে উঠাচ্ছেন কেন?

: উনি আমাদের একজন অফিসারের মা। বছর তিনেক আগে একটা অপারেশনে ওনার ছেলে মারা গেছে। সেই থেকে উনি অপ্রকৃতিস্থ। আর্মির গাড়ি দেখলে উনি মনে করেন ওনার ছেলে আছে গাড়িতে। হাত উঠান। আমরাও ওনাকে বাড়িতে পৌঁছে দি।

: ভেরি স্যাড

আর্মির গাড়ি চলতে থাকে।

কাকলি ঘুম থেকে উঠে মাকে দেখতে না পেয়ে যখন অস্থিরভাবে একটার পর একটা ঘর খুঁজছে ঠিক তখনই বাড়ির সামনে এসে থামে আর্মির গাড়ি। কাকলি শব্দ পায়। আবার শব্দটা মিলিয়ে যেতেও শোনে। ঠিক তখন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় আমেনা। কাকলি মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, মা তুমি নিজে আর কতো কষ্ট পাবে, আমাকে কতো কষ্ট দেবে?

কাকলির মনে হয় মা নিজহাতে তার চোখের পানি মুছিয়ে দিচ্ছে। আসলেই কি দিচ্ছে? কে জানে। তবে কাকলি মায়ের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে

: লক্ষী সোনা মা আমার, আর অমন করো না।

গল্প

ভালো থেকো

শহীদ খান

মিস্টার মামুন ইট উইল বি ভেরি সরো নিউজ ফর ইউ বাট আই অ্যাম বাউন্ট টু টেল ইউ দ্যাট ইউর ওয়াইফ উইল নট বি অ্যাবল টু বি এ মাদার ইন হার লাইফ।

আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাথাটা কাজ করছে না। এ কথা কী করে আমার স্ত্রীকে বলব? এর চেয়ে কঠিন কথা পৃথিবীতে আর হতে পারে না।

আমি কি দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করব?

করতে পারেন কিন্তু কোনো কাজ হবে না।

আমি কি একটু জানতে পারি কেন আমার স্ত্রী মা হতে পারবে না?

আপনার স্ত্রীর জরায়ুতে একটা টিউমার আছে। সেটাই মূল কারণ।

তার পরও জুলিকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাই। কোনো কাজ হয় না। জুলি অস্থির হয় সন্তানের জন্য। রাতে ঘুমায় না।

একদিন বলে ফেলি। আচ্ছা জুলি আমরা তো ভালো আছি, তাই না?

হুম আছি। তো। আচ্ছা হঠাৎ এ কথা বলছ কেন? তোমাকে সব সময় বিষণ্ন দেখি তো তাই।

তুমি তো জান কেন আমি বিষণ্ন হয়ে থাকি।

জুলি আসলে সত্য কথাটা কী...। বলে আমি থেমে যাই।

থেমে গেলে কেন? বল।

আমি জুলিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি। জুলি কষ্ট পেও না। আসলে আমরা কোনো দিন বাব-মা হতে পারব না।

তার বেশ কিছু দিন পর হঠাৎ জুলির পেটে ব্যথা দেখা দেয়। ডাক্তার ওষুধ দেয়। ব্যথা কমে না। কিছু দিন যেতেই আবারো ব্যথা। তার পর থেকে

ব্যথাটা মাঝেমধ্যেই দেখা দেয়। আবারো ব্যথাটা দেখা দিয়েছে।
চিন্তা করো না। একটু চোখ বুজে থাক দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বলে আমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ড্রইংরুমে চলে আসি। টিভি খুলি।
খালু। কাজের মেয়ে শেফালির কণ্ঠ।
বল? আমি উত্তর দিই।
খালাম্মা ডাকছেন।
মামুন ব্যথা তো কমছে না।
শেফালি কডলেসটা নিয়ে আয় তো। বলে আমি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিই।
হাসপাতালে ফোন করি। রিসিপশনের লোক ফোন ধরে। আমি ডিউটি ডাক্তারকে চাইলে সে ফোন দেয়।
ডাক্তার পারভীন বলছেন?
জি বলছি। বলুন।
আমার স্ত্রী ডাক্তার নাসিমার পেশেন্ট। ওর পেটে খুব ব্যথা। বিকালে দেখিয়েছিলাম। উনি ওষুধ দিয়েছিলেন কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ফোন করেছিলাম। উনি বললেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্লিনিকে ভর্তি করতে। আমি এখনই আমার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে আসছি। আর একটা কথা, রাতটুকুর জন্য আপনাদের ক্লিনিক কম্পাউন্ডে আমার গাড়িটা রাখা যাবে তো?
কোনো অসুবিধা নেই। আপনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসুন। আমি রিসিপশনে বলে দিচ্ছি গেটে দারোয়ানকে বলে রাখবে।
জুলিকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। সেই যে এসেছিলাম আজ চার-পাঁচ দিন হতে চলছে জুলির চিকিৎসার কোনো কূলকিনারা হচ্ছে না। জুলি মাঝেমধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। মামুন আমার কী হয়েছে? আমি কি আর ভালো হব না?
আমি দুই হাতে জুলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। সান্ত্বনা দিই। কী বোকার মতো কথা বলছ। তোমার কিছু হয়নি। একটা ছোট অপারেশন লাগবে। দরকার হলে তোমাকে আবার সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাব। ওখানকার চিকিৎসা অনেক ভালো। একদম মন খারাপ করবে না লক্ষ্মীটি। আমি হাতের আঙুল দিয়ে জুলির চোখের জল মুছে দিই।
এত রাতে এভাবে বারান্দায় বসে আছ? নারী কণ্ঠ। সাহানার গলার স্বর। সাহানা এখানকার ডাক্তার। তার নাইট শিফটে ডিউটি পড়েছে। সেদিন রাতে ডিউটি ডাক্তারের রুমে ঢুকে চমকে যাই। রাত তখন অনেক। ডিউটি ডাক্তার টেবিলে মাথা রেখে একটু ঝিমুচ্ছিলেন। ডাক্তার আমার স্ত্রীর ব্যথাটা আবার বেড়েছে। একটু আসবেন?
ডাক্তার টেবিল থেকে মাথা তুললেন। আমি তার চেহারার দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। এ কী, আমি কি সত্যি দেখছি? নাকি আমার ভুল? চোখ কচলিয়ে একটা হাই তুলে ডাক্তার আমার দিকে তাকান। তার টেবিলের ওপর নাম লেখা একটা বোর্ড। ডা. সাহানা। তাহলে তো আমার ভুল হচ্ছে না। সাহানা এবং আমি উভয়েই উভয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি।
আপনি মানে...। ডাক্তার সাহানা বলে।
জি আমি ২০৩-এর পেশেন্ট জুলির হাজব্যান্ড মামুনুর রশিদ।
সাহানা তার চেয়ারটা পেছনে ঠেলে বের হয়ে আসে। আমি দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াই। ডাক্তার বের হয়ে নার্সদের ওয়েটিং রুমে যান। মাসুদা আস তো ২০৩-এ যেতে হবে। পেশেন্টকে ইনজেকশন দিতে হবে।
সাহানা সেই আগের মতোই আছে? সেই সাহানা। একদিন যে ছিল আমার। যাকে না দেখলে আমার পেটের ভাত হজম হতো না। কোনো ছলছুতায় ছুটে যেতাম সাহানার হোস্টেলের গেটে। দারোয়ান দবিরকে আমি টাকা দিয়ে কব্জা করেছিলাম। আমি গেলেই দবির ভেতরে দৌড়ে যেত। এসেই আমাকে বলত চিন্তা করবেন না মামুন ভাই, আপা আসতেছে। সাহানা এলেই একটা রিকশা নিয়ে দুজন বেরিয়ে যেতাম। উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো। ঘণ্টায় রিকশাকে কন্টাক্ট করতাম। মফস্বল শহরটা আর কতটুকু হয়। ঘণ্টা দুই ঘুরলেই শেষ। তাই তো চলে যেতাম শহরের বাইরে। শহর থেকে অনেক দূরে। নদীর ধারে। সেখানে বসে থাকতাম।
তোমার পাগলামি আমার ভালো লাগে না মামুন।
আরে এতে পাগলামির কী দেখলে? আমরা তো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি। নদী দেখছি। গাছপালা দেখছি।
চল ওই চায়ের দোকানটায় বসে চা খাই।
সাহানা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখ কী সাঁঝ।
আকাশে মেঘ দেখলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। জানো মনে মনে আমি একটা পরিকল্পনা করেছি।
কী সেটা শুনি জনাব। আপনার তো সব আজব পরিকল্পনা।
বিয়ের পর আমরা হানিমুনে নেপালে যাব। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেঘ স্পর্শ করব।
মামুন তুমি এত কল্পনাবিলাসী না! বলে কাচভাঙা শব্দে হেসে ওঠে সাহানা। আমরা মাত্র ইন্টারে পড়ছি। আরো কত দিন বাকি আছে আমাদের পড়াশোনা শেষ করার। আর তুমি এখনই বলছ আমাদের বিয়ে আর হানিমুনের কথা। তোমার এসব কথা শুনলে না আমার ভীষণ ভয় করে। আমাদের স্বপ্ন কি কোনো দিন বাস্তবে রূপ নেবে?
ভয় করে? কেন? বলে আমি উচ্চ শব্দে হেসে উঠি।
সাহানার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ স্থির। সাহানার চোখে জল। ও কী তোমার চোখে জল কেন?
মামুন তোমাকে নিয়ে আমার খুব ভয় হয়। এত আবেগ ভালো না।
আমি সাহানার হাত চেপে ধরি।
নেন ধরেন চা। দোকানদার আমাদের হাতে কাপ তুলে দেয়।
মামুন চা খেয়ে চল। আর বসব না। বৃষ্টি নামবে।
আমাকে নিয়ে তোমার ভয়। আবার বৃষ্টিকে নিয়ে ভয়। এত ভয় কেন তোমার? জানো বৃষ্টি আমার খুব প্রিয়? চল আজ বৃষ্টিতে ভিজি।
আবার পাগলামি?
বৃষ্টিকে ভালোবাসলেও আমি পাগল?
তুমি টোটালিই একটা পাগল। আমি নির্ঘাত বলে দিতে পারি তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে। দরকার হলে লিখে নিতে পার। তোমার জন্য কষ্ট পেলে আমি ধন্য হব।
কী ব্যাপার! কথা বলছ না কেন? স্ত্রীর জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছ? সাহানার কথায় আমার তন্ময়তা কাটে।
সাহানা আমার ঘুম আসে না।
স্ত্রীকে খুব ভালোবাস তো তাই। প্রেম করে বিয়ে করেছ তাই না? বলতে সাহানা একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসে।
সাহানার মুখ থেকে প্রেম কথাটা শুনে আমি হো হো শব্দে হেসে উঠি। চোখে জল আসে। সাহানা আমি বুঝতে পারছি না কী করব? কেন আমার ওপর এত বড় একটা বিপদ এলো?
শুনেছি তুমি অনেক বড় ব্যবসায়ী। তোমার অনেক টাকা। আমি তো জানতাম তুমি কোনো দিনও টাকা চাইতে না। বলতে তুমি কোনো দিন টাকার পেছনে ছুটবে না।
সাহানা অনেক কিছুই তো চাইতাম। আবার অনেক কিছুই চাইতাম না। কিন্তু সব চাওয়া তো আর পাওয়া হয় না। আবার অনেক না চাওয়া জিনিসও এসে যায় কোনো না কোনোভাবে।
আমার একটা কথার জবাব দেবে?
বল।
সত্যি করে বল তো তুমি হঠাৎ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে কেন? আমি তোমায় কত খুঁজেছি। কোথাও পাইনি। আজ কত বছর পর আমাদের দেখা। সাহানার চোখে জল।
সত্যি কথা বললে তুমি খুব কষ্ট পাবে।
এখন আর কষ্টের দিন নেই। বলতে পার।
তোমার কাছ থেকে আমি যেন দূরে সরে যাই সে জন্য তোমার বড় ভাই আমার পেছনে সন্ত্রাসী লাগিয়ে দিয়েছিল। একদিন হামজা নামের সন্ত্রাসীটা আমার ওপর হামলা করে। তারা আমাকে কেবল মারধরই করেনি। শহর ছেড়ে যেতে বলে। তা না হলে আমার লাশ ফেলে দেবে এ কথা বলে হুমকি দেয়। বাঁচার জন্য সেদিন আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। আমি তো আর সিনেমার নায়ক নই যে একা লড়াই করে তোমাকে আপন করতে পারব। তার পরও তোমার ঠিকানায় আমি অনেক চিঠি দিয়েছি। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো চিঠির জবাব আমি পাইনি। সবচেয়ে দুঃখজনক কী জানো সাহানা?
কী?
আমার আর পড়াশোনা হয়নি। এমনকি ইন্টার পাস করাও হয়নি। এরপর আর কোনো দিন কলেজেও যাইনি। দুটি বছর পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এক মাস একটা মানসিক হাসপাতালে ছিলাম। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। বেঁচে গেলাম। তারপরই আমার গার্জেনরা আমাকে জুলির সঙ্গে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর জুলিকে সহ্য করতে পারতাম না। একসময় দেখলাম জুলি খুব ভালো মেয়ে। সাহানা আমার পাশ থেকে উঠে যায়। আমি সাহানার পেছন পেছন হাঁটি। সাহানার অফিসরুম পর্যন্ত যাই। রুমে ঢুকেই সাহানা দরজাটা বন্ধ করে দেয়।
চোখে ঘুম আসে না। জুলির কথা মনে পড়ে। বিয়ের পর দুটি বছর আমরা কোনো বাচ্চা নিইনি। বিয়ের পর ব্যবসা শুরু করি। ব্যবসাটা তড়তড়িয়ে বেড়ে

উঠতে থাকে। আমার ব্যবসায়ী বন্ধু একবার আমার হাত দেখে বলে ব্যবসা করে তুই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হবি। আর সেটা হবে তোর স্ত্রীর ভাগ্যে। কিছু দিনের মধ্যেই সেটা আমি টের পাই।
একদিন জুলি বলে, এই শোনো।
কী, বল। আমার এখনই বের হতে হবে।
তোমার পারমিশন না নিয়ে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি।
কী কাজ?
দুই মাস ধরে আমি ট্যাবলেট খাচ্ছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন কনসিভ করতে পারছি না।
আমি জুলির মুখটা দুই হাতে ধরে কপালে একটা চুমু খেয়ে বলি, মাত্র তো দুই মাস। আরো কয়েকটা দিন যেতে দাও। দেখবে একসঙ্গে দুইটা পেয়ে যাবে।
যা শয়তান! সব সময় দুষ্টুমি করে।
দুষ্টুমি না লক্ষ্মীটি, এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী।
তাই যেন হয়। বলতে বলতে আঁচল টেনে শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেয়। শোনো, আজ কিন্তু খালার বাসায় যাব। তাড়াতাড়ি এসো।
ঠিক আছে ম্যাডাম। আপনার আদেশ শিরোধার্য।
অফিসে ঢোকার পরপরই জুলির ফোন। মামুন আমার পেটের ব্যথাটা খুব বেড়েছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় আস। আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।
তারপরই জুলিকে ডাক্তার নাসিমার কাছে নিয়ে যাই।
এভাবে আমার পাশে বসে থাকলে ব্যবসার ক্ষতি হবে না? জুলি প্রায়ই আমার হাত ধরে বলে।
জুলি আগে তুমি সুস্থ হও।
আসলে তুমি আমাকে অনেক ভালোবাস। আচ্ছা আমার সুস্থ হতে যদি অনেক দিন লেগে যায়? আবার এমনও তো হতে পারে...। বলে জুলি আমার চোখ থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।
কী হতে পারে?
কত কিছুই হতে পারে। জুলির চোখে বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা। ধর আমি হারিয়ে গেলাম। কিন্তু তোমাকে তো বাঁচতে হবে। ব্যবসা ছাড়া কি চলবে। জুলি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে, কথা দাও আমার কিছু হলে তুমি অস্থির হবে না।
আমি প্রচণ্ড রেগে উঠি। জুলির হাত থেকে হাত সরিয়ে নিই। আমার চোখে জল এসে যায়। তুমি এসব কথা বলছ কেন?
ঠিক আছে। সরি। ক্ষমা চাইছি। আর বলব না। এবার বস আমার পাশে। আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।
আমি জুলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। জুলি চোখ বন্ধ করে। একটু পরে বলে, ওই যে একজন সুন্দরী মহিলা ডাক্তার আছে না, কী যেন নামটা?
কার কথা বলছ? ডাক্তার সাহানার কথা?
হ্যাঁ। তুমি কি তাকে চেন? আমাকে দেখতে এলে তোমার ব্যাপারে অনেক কথা বলে। বলে কি না আপনার হাজব্যান্ড খুব হ্যান্ডসাম। অনেক বড় ব্যবসায়ী। মানুষটাও মনে হয় ভালো। আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে। তাই না? আমি বলেছি অনেক ভালো। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন।
আমাকে ছাড়া ও এক দিনও থাকতে পারে না।
জুলি একটু ঘুমাও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
আমার ঘুম আসবে না। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আচ্ছা মামুন সত্যি করে বল তো আমি কি ভালো হতে পারব?
অবশ্যই ভালো হবে। বাজে চিন্তু করো না। তোমার যে সমস্যা এ ধরনের সমস্যা আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ মহিলার আছে। অপারেশন করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
তাহলে ডাক্তার কেন অপারেশন করছে না? তুমি তো বলেছিলে ডাক্তার বলেছে দুই দিনের মধ্যে অপারেশন করে ফেলবে। এখন তো পাঁচ-ছয় দিন হতে চলল কই ডাক্তার তো অপারেশন করছে না। কয়েকটা টেস্ট দিয়েছে সেগুলো দেখে ডাক্তার অপারেশন করবে।
কয়েক দিন ধরে সাহানা আসছে না। একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর কথা। নার্স বলেছে আপা ছুটি নিয়েছে, শরীর ভালো না বলে।
সেই রাতের পর থেকে আর সাহানা ক্লিনিকে আসেনি। তাও তো তিন-চার দিন হয়ে গেল। কী করব ভাবতে পারছি না। আমার ভাবনার টালমাটাল অবস্থা। ডাক্তার নাসিমার সঙ্গে কথা হয়েছে গতকালও। বলেছেন আর একটা টেস্টের পর তিনি কনফার্ম হবেন অপারেশন করবেন কি করবেন না। ডাক্তার নাসিমা বলেছিলেন, এমনও হতে পারে রোগীকে আমরা বাইরে রেফার করতে পারি। কারণ আমি যতটুকু জানি স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানোর মতো অ্যাবিলিটি আপনার আছে। তাই আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকি নেব না।
ডাক্তার ওর সমস্যাটা কী, জানতে পারি?
দেখি কাল রিপোর্ট দেখে আপনাকে বলব।
বারান্দার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এসব ভাবছি। আমি তো একটি কাঠের মানুষ হয়ে গেছি। এখন আর কোনো অনুভূতি নেই।
এভাবে বারান্দায় প্রতিদিন রাতে বসে থাক কেন? কেবিনে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক।
সাহানার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠি। ফিরে তাকাই। হালকা বাতাস এসে ঝাপটা মারছে সাহানার গায়ে। তাতে তার শাড়ি দুলছে। চুল উড়ছে। সাহানা শাড়ির আঁচল ঠিক করে। চুলে হাত বোলায়।
কি, বসবে না আমার পাশে?
কেন বসব না? তুমি কি আমার শত্রু? সাহানা একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসে।
অনেক দিন পর সেদিন তোমাকে এখানে দেখলাম। কথা বললাম। তার পর থেকেই দেখছি তুমি আর আসছ না। আমি জানি তোমার অসুখ-বিসুখ কিছুই না। আসলে তুমি আমার সামনে আসতে চাও না।
সবই তো বোঝ তাহলে আর বলছ কেন? আমাকে আরো কষ্ট দিতে?
আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? যাক সেসব কথা। দেখার পর থেকেই তোমার কথা জানতে ইচ্ছা করছে। যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে কি সত্য কথা বলবে?
বল কী জানতে চাও?
তোমার হাজব্যান্ড, সন্তান। এসব ব্যাপারে কিছু বল শুনি।
সাহানা আমার কথার জবাব দেয় না। আমি চেয়ার সরানোর শব্দ পাই। দেখি সাহানা উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যাচ্ছে?
নিচে একজন পেশেন্টকে দেখতে হবে।
আমি নিঃশব্দে সাহানার পেছন পেছন হাঁটি। সাহানা তার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্বাক হয়ে সাহানার রুমের সামনের একটা চেয়ারে বসে থাকি।
একজন সিস্টারকে জিজ্ঞেস করি, ডাক্তার সাহানার হাজব্যান্ড কী করেন? নিশ্চয়ই ডাক্তার?
উনি তো বিয়েই করেননি। অথচ দেখেন আপা দেখতে কত সুন্দরী। এখনো আপাকে বিয়ে করার জন্য কতজন যে ঘুরঘুর করছে। আপা কাউকে পাত্তা দেন না। বিয়ে করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
নার্স চলে যায়। আমি বসে থাকি। আমার চোখে বিন্দু বিন্দু জল।
এখনো বসে আছ? একটু পরে তো ভোর হবে। নিজের শরীর ঠিক না রাখলে স্ত্রীকে বাঁচাবে কী করে? বলতে বলতে সাহানা আমার পাশে বসে। ওই সময় চলে গেলে কেন? আমি তোমার পেছন পেছন গিয়েছিলাম। তুমি তো কোনো পেশেন্ট দেখতে যাওনি।
শোনো মামুন, তোমাকে এখন একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলব বলে এসেছি। আমি জানি তুমি খুব আবেগপ্রবণ মানুষ। জানি না এখনো আগের মতো তোমার আবেগ আছে কি না। বয়স বাড়লে মানুষের আবেগ কমে যায়। বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি আগের মতোই আবেগপ্রবণ আছ। আমার কথা ধৈর্যসহকারে শোনো।
একটু থেমে আবার বলতে থাকে সাহানা। তোমার স্ত্রীর লিউকিমিয়া হয়েছে এবং তা এমন পর্যায়ে আছে যে চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। নাসিমা ম্যাডাম অনেক আগেই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন তোমাকে। আমি নিষেধ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে পেশেন্টের হাজব্যান্ড আমার পরিচিত। আমি একসময় তাকে বুঝিয়ে বলব। আজ সত্য কথাটা বললাম। তার পরও তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যাংকক কিংবা সিঙ্গাপুরে যাও।
আমার শরীর কাঁপছে। আমি এসব কী শুনছি?
সাহানা আমার হাতের ওপর হাত রাখে। আর একটি কথা...। বলে থেমে যায় সাহানা।
থেমে গেলে কেন? বল?
ভাবছিলাম বলব না। বলেই ফেলি। তোমার সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখা হবে না। কারণ আমি এখানকার চাকরি থেকে রিজাইন করেছি। অনেক আগে একটা কোর্স করার জন্য কানাডায় আবেদন করেছিলাম। সব কিছু হয়ে গেছে। তারপর একটু থেমে বলে, যে ক'দিন স্ত্রী বেঁচে থাকে তাকে সময় দাও। ভালো থেকো।

গল্প

নীরব দহন

স্বপ্না রেজা

সাতটা পাখির ডাকের মতন বেজে উঠলো কলিংবেল। ঘুম নিজ থেকে যেতে না পারার কষ্ট বুকে নিয়েই বিছানা ছাড়ে মেঘা। ওড়না আশপাশে নেই। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তার ছুটি হয়। হয়তো আনাচে-কানাচে, চিপায় টিপায় লুকিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে। মেঘার ভ্রুক্ষেপ নেই। তাড়া নেই গায়ে চড়াবার। চার আঙুলের বিরক্তির ভাঁজ কপালজুড়ে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে দরজার মুখে দাঁড় করায়। চারটা সিটকিনি দরজার বুকজুড়ে। আধবোজা চোখে ওসব খোলে। বাড়ির কেউ এই মূল্যবান কাজ করবার জন্য নেই, বহুবার বুঝে নিতে হয়েছে মেঘাকে। সম্ভবত সে কারণেই পাখির ডাক মেঘার কানেই পৌঁছায়। দরজা খুলে পান খাওয়া ঠোঁটের হাসি দেখতে হলো। ময়নার মা হাসছে। হাসির কারণ কী, এমন বিস্ময়মখা প্রশ্ন ততক্ষণে মেঘার মুখে লেপন হয়ে গেছে।

হাসছো যে?

সকালবেলায় আমরা দু'জনকে দেখতে পাই। কথা শেষ করে আবারও হাসে ময়নার মা। এতে হাসির কী হলো!

মেঘা, তোমার আর আমার মধ্যে অনেক মিল আছে। সেইটা ভেবেই হাসছি। মেঘাদের বাসায় অনেক বছর কাজ করার সুবাদে বেশ শুদ্ধভাবে কথা বলা শিখেছে ময়নার মা। আবার ছোটবেলা থেকে মেঘাকে পেলেপুলে আসার কারণে ময়নার

মা, মেঘাকে নামধরে ডাকে আর তুমি সম্বোধন করে। মেঘার পরিচিতজন, স্বজনরা বেশ এনজয় করে ব্যাপারটা। সমাজতত্ত্বে ফাঁকফোকরের সন্ধান খোঁজে। মেঘার তা নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। ব্যাখ্যাও নেই। ভালোবাসার ঐটুকুন মর্যাদা দিতে মেঘার সমস্যা হয় না। বরং প্রতিনিয়ত অনেক খারাপ লাগা, খারাপ থাকার মাঝে, এ বেশ ভালো লাগা, ভালো থাকা। মিলটা কোথায় জানতে চায় মেঘা,

যেমন?

তুমি দরজা খোলো, বাড়ির সবাই ঘুমায়। আমি কাজে আসি, বাড়ির সবাই ঘুমায়। সব্বাইর উপায় আছে আমাদের নাই! বুদ্ধিমতীর মতন ময়নার মার কথা। সাথে হাসির ধরন পাল্টে যায়। ব্যঙ্গ নয়, নির্মলও নয়। কিছুটা বিরক্তের। বড়দের স্কুলে যখন একদিন মনে হলো, ময়নার বাবাকে একটা চিঠি লিখি, তখন বড়দের স্কুলে যেয়ে চিঠি লেখার খুব ইচ্ছা হলো। গেলাম গালভর্তি পান ঠুসে শিখার চেষ্টাও করলাম। হইলো না। কথা বলতে বলতে রান্না ঘরের বাসনকোসন ধরাধরি শুরু করে দিয়েছে ময়নার মা। ঝনঝন শব্দ। কথা বলা শেষ হয়নি। মেঘার ঘুমের মধ্যে বড় দাগের যন্ত্রণা দিলেও, ময়নার মার কথার শেষটুকু শুনতে মেঘা রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছায়। ময়নার মা মুখ থেকে একগাল পিক জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে। কখনো এমন অভ্যেস তার চোখে পড়েনি। বলে, গ্রামে আরাম, আয়াসে ময়নার বাপ যাত্রা দেখে বেড়ায়, দোকানে বসে রেডিওর গান শোনে আর পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে। খবর পাওয়ার পর চিঠি লেখা শিখতে আর মন চাইলো না। মরদের মরদ দেইখা লাভ কী?

তাহলে তুমি কী ময়নার বাপকে চিঠি লেখা শেখার জন্যই বড়দের স্কুলে যেতে? ময়নার মা এবার বিচারপতির ভূমিকা নেয়। বিজ্ঞ ভাব। চকচক করে ওঠে চোখ। মেঘাকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা, দ্যাখো, বিয়ে-শাদী হয় নাই তোমার। ঐসব বুঝবা না। চেষ্টা করাও বৃথা। শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে ময়নার মা তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ময়নার মার কথায় যতি পড়ে গেছে। মেজাজটাও বোধহয় তিতো হয়েছে। কথা বলা অনর্থক। উল্টাপাল্টা কথা বলে হয়তো মেঘার মেজাজ বিগড়ে দিতে পারে। নিজের বিছানা যেয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করে মেঘা। ঘুম নেই। পাশের ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ আছড়ে পড়ে মেঘার কানে। নিশ্চিন্ত ঘুমের জোয়ার। এই জোয়ার বলে দেয়, বাড়ির প্রায় সবাই বেশ সুখী। মেঘার ঘুম নেই। তাই বোধহয় নিজেকে সুখী ভাবতে পারে না।

মহল্লার আঠারো বছর বয়সী নায়ক, ইদানীং মেঘার সাথে কথা বলার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকে। গলি থেকে মূল রাস্তায় উঠতেই নায়কের সাথে দেখা হয়। প্রায় প্রতিদিনই। নায়কের ছুটে আসা এবং কুশল নেবার কায়দায়, নিজেকে নির্লিপ্ত রাখা সম্ভব হয়। প্রায় প্রতিদিনই। নায়কের ছুটে আসা এবং কুশল নেবার কায়দায়, নিজেকে নিলিপ্ত রাখা সম্ভব হয় না। 'কেমন আছেন' এই প্রশ্নের উত্তরের মাঝেই যেন নায়কের দিন শুরু। অতএব উত্তর দিয়ে রেহাই নিতে হয় মেঘাকে। উত্তরটা ভালো হওয়া চাই। খারাপ হলে, সেই খারাপ বিশ্লেষণে নায়ক ব্যতিব্যস্ত হয়। আজও দেখা নায়কের সঙ্গে। খুব সকালে ময়নার মার কারণে ঘুম ভেঙে যাওয়ার বিরক্তি মনদেহ থেকে পুরোপুরি যায়নি মেঘার। নায়ক জানতে চাইবার আগেই মেঘা বলে ফেলে, আমি ভালো আছি। সব খবর ভালো আমার। নিজ থেকে বলা কথা শেষ করে মেঘা খেয়াল করে, নায়ক শান্ত। প্রশ্নের কোনো লক্ষণ নেই। আজ বেশ অন্যরকম। মেঘা অবাক। কাউকে নিজের অবাক হওয়াকে বুঝতে দিতে চায় না মেঘা। মৃদু হেসে নায়কের পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। তাও নায়ক নিশ্চুপ। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি তার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেখা লাল বাসে চড়ে বসে মেঘা। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে, নায়ক বাসের দিকে অপলক চেয়ে। বিস্ময়ঘেরা আজকের সকাল। যেন মেঘা আজ নায়কের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনবার অপেক্ষায় ছিল। অথচ প্রশ্ন আসেনি।

ক্লাসে অহরহ অন্যমনস্ক হয়ে পড়া নতুন কিছু নয় মেঘার। আজ ময়নার মা আর নায়ক তার মাথায় চড়ে ক্লাসে এসেছে। একমাস বাকি ফাইনাল পরীক্ষার। কিছুতেই মন বসাতে পারছে না মেঘা। ক্লাস সাসপেন্ড হয়ে যাবে আর দু'তিন ক্লাসের পর। সবাই খুব সিরিয়াস, মেঘা বাদে। নোটের স্তূপে সব সহপাঠী প্রায় তলিয়ে আছে, যাচ্ছে। ফটোকপি, নাকমুখ দিয়ে লিখে কপি করা ইত্যাদি পরীক্ষাজনিত ভাইরাসে মোটামুটি সবাই আক্রান্ত। মেঘা, ভাইরাসমুক্ত। সহপাঠী জুনাল, মেঘার অন্যমনস্কতায় আচড় দেয়,

এ্যাই ! কী ভাবিস ! রফিক স্যার তোকে খেয়াল করছে!

স্যারের কী সমস্যা?

তুই ফেল করলে, তার কিচ্ছু যায় আসবে না! কিন্তু তোর প্রতি তার ধারণাটা ভালো হচ্ছে না। অমনোযোগী স্টুডেন্ট ভাবছে।

ভাবুক।

মেঘার হাইস্পিড মনোভাবের কাছে হার মানে জুনাল। রফিক স্যার মেঘার কাছে এসে দাঁড়ায়

মেঘা, তুমি কী আমার লেকচার ফলো করেছো?

মেঘা বেশ জোরে মাথা ডান বাম করে। স্যারের চোখের পুরু চশমা, মেঘার ইশারা আচরণে নাকের নিচে খানিক নেমে আসে। বিস্ময়ের দারুণ রোদে স্যার যেন ঘেমে উঠলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে কপালে জটলা বেঁধেছে।

তোমার দু'দিন বাদে এক্সাম।

জানি স্যার।

ক্লাসে এসে লেকচার ফলো না করলে লস আছে।

তাও জানি স্যার।

তাহলে!

স্যার, আমার মাথায় ময়নার মা আর নায়ক। কিছুতেই ওরা সরছে না। মেঘার সরল কথায় স্যার হোঁচট খায়।

সাথে কৌতূহল।

ওরা কারা?

মেঘা খেয়াল করে, স্যার শুধু একা নয়, পুরো ক্লাসই কৌতূহলে দুলছে। জুনালের চোখ দু'টো এক লাফে কপালে। একজন আমাদের বাসায় কাজ করে। আরেকজন মহল্লার ছেলে। খুব সহজ কায়দায় মেঘার বলা। পুরো ক্লাস হেসে উঠলো। রফিক স্যার হাসলেন না। জুনালও না । রফিক স্যার এই দুই বাক্যে মেঘার অন্যমনস্কতার পুরো ইতিহাসে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনিও প্রচণ্ড উপভোগ করলেন, প্রকাশ করলেন না। কিছু মানুষ আছেন, যারা ভাব নিয়ে চলেন। নিজেকে স্বতন্ত্র অবস্থায় রেখে ব্যতিক্রম উপাধিতে পরিচিতি লাখে মরিয়া হন। রফিক স্যার সেই গোত্রের। ক্লাস শেষে তুমি আমার রুমে এসো। আদেশ স্যারের। জুনাল বিব্রত। মেঘাকে ভালোবাসার এক শক্ত পরিচিতি আছে জুনালের। আশপাশ থেকে কয়েকজন সহপাঠী এরই মধ্যে কলমের গুঁতো দিয়ে দিয়েছে জুনালের শরীরে। রসময় আচরণ। তারা অপেক্ষায় আছে রহস্য উন্মোচনের।

ক্লাস শেষে জুনাল, মেঘার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় ডিপার্টমেন্টের খানিকটা দূরে ফাঁকা জায়গায়। মেঘা বেশ বিরক্ত। উত্তেজিত হয়ে পড়ে মেঘা।

সমস্যা কী তোর জুনাল! উত্তেজনার সাথে পাল্লা দৌড় জুনালের,

কী হয়েছে তোর! নায়ক কে? কেন তুই এত অন্যমনস্ক হয়ে থাকছিস? জুনালের প্রশ্নে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে মেঘার। অস্বস্তির তীক্ষ্ণতায় সরু হয়ে ওঠে মেঘার কণ্ঠস্বর,

তুই আমাকে ভালোবাসিস বলেই ভেবে নিয়েছিস, আমার পুরোটাই তোকে পড়তে দেবো জুনাল! সরি জুনাল! নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় মেঘা। হতবিহ্বল জুনাল। হন হন করে হেঁটে যায় মেঘা। কি হয়, জুনাল আর মেঘাকে পেছন থেকে আর টেনে ধরে না। অন্যদিনের মতন মেঘাও পেছন ফির আর জুনালকে দেখে হাত নাড়ে না। 'না' শব্দটার সহজ অনুপ্রবেশ ঘটে যায় দু'জনার মধ্যে।

রফিক স্যারের রুমের দরজার মুখে এসে মেঘা মৃদুস্বরে আসার অনুমতি চায়। স্যার যেন তারই অপেক্ষায়। পঞ্চাশ বছর বয়সী রফিক স্যার দেবানন্দ স্টাইলে পোশাক গায়ে চড়ান। হেয়ার স্টাইলও তেমন।

বোসো। বসতে বলার মধ্যে বেশ জোর। পারলে ধরে বসান। না বসে উপায় নেই। রফিক স্যার তার কথাকে ট্রেনে তুলে দিলেন। ট্রেন চলতে শুরু করলো।

পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট। তত্ত্ব ভালোভাবে না জানলে, সাবজেক্ট উতরাবে কীভাবে?

জুনালের সাথে মন খারাপ করে এসে, চুনের গন্ধময় রুমে এমন কাঠখোট্টা আলাপ অসহ্য। মেঘার বিরক্তবোধ সহজে চোখে পড়ে, তার চেহারার ধরনের কারণে। নড়েচড়ে বসে মেঘা

উত্তর দেয়, স্যার কো-রিলেশন বুঝতে আমার পরিসংখ্যান তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। আর আমি সাবজেক্ট উতরাতে চাই না। রহস্য উদ্ঘাটন করতে চাই। রফিক স্যার বোধ হয় এমন বেয়াদবময় চোট এরআগে আর পাননি। গ্রীষ্মের রোদের কড়া অস্বস্তিতে স্যুট টাই পরা মানুষটি শরীর থেকে একটানে কোট খুলে ফেলতে বাধ্য হলেন। চোখ বৃত্তের মতো কেন্দ্রীয়ভূত হয়ে দেখছে মেঘাকে।

মানে?!

আমি যা বলি, তার অনেক মানে আমার জানা নেই স্যার। আমি কি উঠবো স্যার?

তোমার বোধহয় কোনো সমস্যা হচ্ছে, মেঘা।

উঠতে পারলো না মেঘা।

সবাই আমার সমস্যা বোঝে, আমি ছাড়া। আর এটাই আমার বড় সমস্যা স্যার। মেঘার মুখের কথা কেড়ে নেয় রফিক স্যার।

ময়নার মা আর নায়কের কি যেন বলছিলে?

স্যারের কথায় মেঘার চোখ কপালে দাপাদাপি শুরু করে দেয়। এ দুটো মানুষের কথা মনে রাখার কী কারণ বুঝতে পারে না মেঘা।

প্রাসঙ্গিকতা বদলায়।

স্যার ওই দুটো মানুষ, পরিসংখ্যানেরও পর বোঝে না। মেঘার উত্তরে কিছুটা অপ্রস্তুত রফিক স্যার।

খেয়াল করেছি, তোমার ভাবনার ধরন ভিন্ন। নিজেকে স্বতন্ত্র রাখা ভালো। তবে তার কষ্টবোধটা বেশি। তোমার মাথা ভালো। একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করলে অনেকের চাইতেও ভালো রিজাল্ট হতে পারে, মানো?

মাথা একবার ডান বাম করে মেঘা। তারপর বলে,

বললাম তো স্যার, আমি আমাকে ছাড়া সবাইকে বুঝি। মেঘার কথার ভেতর প্রবেশের সুযোগ নেই। তাই কথা চালিয়ে নেয়া কষ্টকর। যতি বসিয়ে দেন রফিক স্যার। কিন্তু দৃষ্টি তার অপলক। মেঘা খেয়াল করে স্যারের আবেদনময়ী চাহনি মেঘার সব শরীর ছুঁয়ে যায়। মুখে বলছেন না তেমন কিছু, কিন্তু চেহারাজুড়ে মেখে আছেন। বিশ্রী লাগে। রুম থেকে বের হয়ে এক গাল থুথু ফেলে।

মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে রিকশা নেয় মেঘা। আজ বাসে ফিরতে ভালো লাগছে না। একা হতে প্রবল ইচ্ছেটা বুকের ভেতর দলা পাকিয়ে আছে। নীলক্ষেত দিয়ে ঘুরে যেতে হবে মগবাজার। বেশি সময় পাওয়া যাবে একাকী থাকার। প্রচণ্ড জ্যাম গায়ে লেগে আছে। লাগুক। রিকশার চাকাও ঘুরে না। না ঘুরুক। কোথা থেকে উড়ে এলো জুনাল। একেবারে রিকশার মুখে।

আমি কি তোর সাথে যেতে পারি? জুনালের আকুতিময় প্রশ্ন।

কোনো দরকার আছে? মেঘার পাল্টা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জুনাল রিকশায় চড়ে বসে।

শোন মেঘা, তোকে আমি ভালোবাসি। তোর সব কিছু জানার তাগাদা আমার থাকবেই। তোরও আছে। তুইও নিশ্চয়ই জানতে চাস আমার সব কথা।

না, চাই না। বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে মেঘা।

মিথ্যে বলছিস। জুনালের কথায় গম্ভীর হয়ে যায় মেঘা।

জুনাল, আমি আমার নিজস্বতাকে বেশি ভালোবাসি।

ওকে। মানছি। ব্যক্তির যেমন নিজস্বতা আছে, তেমনি প্রতিটি সম্পর্কে নিজস্বতা আছে। সেটা তো মানবি! আর নিজস্বতা মানে কিন্তু একধরনের স্বার্থপরতা। আমার ভালো লাগে না মেঘা!

জুনাল, আমি এখন টিউশনিতে যাচ্ছি। প্লিজ! একটু নিরিবিলি থাকি! তুই প্লিজ যা! মেঘার কথায় কষ্ট পায় জুনাল। লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে যায় জুনাল। একটু হলেই

অ্যাকসিডেন্ট হতো। মেঘা চমকে ওঠে। জুনাল ফিরবার পথে পা বাড়ায়। মেঘার মনে হলো জুনাল পায়ে ব্যথা পেয়েছে। ডাকে। ততক্ষণে ডাক না পৌঁছানোর মতন দূরত্বে চলে গেছে জুনাল। কী হলো মেঘার, সেও নেমে পড়ে রিকশা থেকে। রিকশাচালকের হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দেয়। তারপর প্রায় দৌড়। জুনালের পাশে এসে হাঁপাতে শুরু করে। কষ্ট তখনো চাক বেঁধে আছে জুনালের। আগুন নয়, অভিমানের পোড়ে খুব সহজে জুনাল। মেঘা, জুনালের হাত ধরে।

ওভাবে লাফ দিলি কেন?

তোর কী?

আমার আবার কী, কিছুই না। কাঁধ ঝেড়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা মেঘার। এই বাড়তি আচরণ প্রকৃত নয়, নকল। জুনালও বোঝে। জুনালের আবারো প্রশ্ন,

নায়ক কে? মেঘা, জুনালকে পড়তে চেষ্টা করে। জুনালও প্রস্তুত পড়তে দিতে। পড়ে বোঝাপড়া ভালো, না পড়ার চাইতে। মেঘা পাল্টা প্রশ্ন করে,

জানতে চাইলি না যে রফিক স্যার কেন আমাকে ডেকেছিল? স্যার তোর পরিচিত, আমাদের শিক্ষক, আমাদের পড়ান, তাই অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই, তাই? জুনাল, আমরা অদেখা নিয়েই বেশি মাতি। আমাদের সন্দেহ অদেখার মাঝেই কমপ্লানের বাড়ন্ত শিশু হয়ে যায়। ওতে বাড় নয়, ভার বাড়ে। তোকে আমি আর দশ জনার চাইতে ভিন্ন ভেবেছিলাম। ঘুরে ফিরে সবাই আমরা এক। নায়ককে আমি নিজেও এখনো চিনে উঠতে পারিনি। আঠারো বছরের এক যুবক আমাকে দেখার জন্য ছুটে আসে গলির মাথায়। ভালো আছি এই খবরটুকু পেয়ে আশ্বস্ত হয়। এই তো।

জুনাল বুঝে উঠতে পারে না, পরের কোনো কথা দিয়ে প্রসঙ্গ ধরে রাখা সম্ভব। আঠারো বছরের এক কিশোর, তেইশ বছরের এক তরুণীকে ভালোবাসে, সেও কি সহ্য করার মতন জুনালের। অন্তত জুনাল সহ্য করতে পারছে না, এটাই সত্য। মানুষের অন্তর নামক জায়গাটা ভাগে সন্তুষ্ট থাকে না। দিতে পুরোটা না পারলেও, চায় পুরোটা। দেয়া নেয়ার ভারসাম্য রক্ষা খুব কম মানুষই পারে। জুনাল সেই দলে। ভালোবাসায় পুরো ডুব দিতে পারে না মেঘা। আশপাশের জীবন, ঘরের ভেতর তার আসবাবপত্রের মতন অবস্থান, সব কিছুই সংশয় ঘেরা। সংশয় থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন বড্ড। আজ আর টিউশনিতে যাওয়া হলো না। প্রায়ই মন ভালো থাকে না মেঘার। যাওয়া হয় না টিউশনিতে। ছুটে যাবে হয়তো নিজের খচর আর সংসারের মোট খরচের আংশিক খরচের টাকা আয়ের এই সুযোগটি।

পাশে নেই জুনাল। একা ফেরা মেঘার। গলির মুখে মানুষের জটলা। সঙ্গে কোলাহল। রিকশাগুলো অন্যদিনের মতন লাইন করে দাঁড়িয়ে নেই। কেমন বিষণ্ন সব। সন্ধ্যার মৃদু আলোয় জটলার ভেতর ময়নার মাকে আবিষ্কার করে মেঘা। ময়নার মা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে আছে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেঘার পা সেই দিকে এগোয়। কাছে পৌঁছাতেই চোখে পড়ে, রাস্তায় পড়ে থাকা নায়কের নিথর দেহ। আধোবোজা চোখে যেন নায়ক, মেঘাকেই দেখছে।

আহা! জানো এই পোলাডা একটা মাইয়্যারে বাঁচাইতে নিজে প্রাণ দিছে! স্কুলে পড়ে ওই মাইয়্যারে কয়টা পোলা ধইরা নিতে গেলে, এই পোলা তাগো বাধা দেয়! হেই পোলারা ওরে মাইরা ফালাইয়া গেছে! ময়নার মা এক নিঃশ্বাসে মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা দিল।

চোখে জমে থাকা জল এতোটা, বোঝেনি মেঘা আগে। আফসোস, কেন আজ নায়কের সঙ্গে তার কথা হলো না। ভালো নেই মেঘা। এই কথাটা বলা হলো না নায়ককে।

ব্যক্তিত্ব

যাত্রার যাত্রাপথে নির্ভীক যাত্রী মিলন কান্তি দে

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

বর্তমান সময়টা বড় দোদুল্যমান। নাম, খ্যাতি কিংবা অর্থ প্রতিপত্তি লাভের জন্য প্রচার-প্রচারণায় টিকে থাকতে মরিয়া কম-বেশি সবাই। তবু এরই মাঝে কেউ না কেউ তো থাকে সব সহযাত্রীকে নিয়ে গন্তব্য অভিমুখে পৌঁছে যেতে শক্ত হাতে হাল ধরে। অসীম ধৈর্য আর অপার সম্ভাবনার স্বপ্ন বাস্তাবায়নে তাদের এ শক্ত অবস্থান। তেমনই এক ব্যক্তিত্ব সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার। অসংখ্য নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচকদের বিকাশ এবং প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে 'থিয়েটার' নামক ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা সম্পাদনা এবং প্রকাশনা করে চলেছেন তিন যুগেরও অধিক সময় জুড়ে। রামেন্দু মজুমদার যা পেরেছেন কিংবা পারছেন, সবাই যে তা পারবেন বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু দৃষ্টান্ত তো অনুসরণ করাই চলে। রোগ যদি সংক্রমিত হতে পারে, তবে স্বাস্থ্য সম্প্রসারিত হতে বাধা কোথায়! অনেকটা তেমনই অবস্থান যাত্রাব্যক্তিত্ব মিলন কান্তি দের।

স্বচক্ষে দেখেছেন যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসকে। 'জীবন যতদিন যাত্রা আঁকড়ে বাঁচাও ততদিন'– এ দৃষ্টান্ত মিলন কান্তি দে ভোলেননি বলেই আজও তিনি

যাত্রামঞ্চে হয় 'ঈশা খাঁ' নয় একক অভিনেতা চরিত্রে 'অমলেন্দু বিশ্বাস'। যাত্রাপালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের প্রায় ২০০ যাত্রাপালা রচনার প্রেক্ষাপট আত্মস্থ করেছেন বলেই তিনি লিখে চলেছেন একের পর এক যাত্রাপালা : 'এই দেশ এই মাটি', 'মায়ের প্রাণ', 'দাতা হাতেম তাই', 'বিদ্রোহী নজরুল', 'বাংলার মহানায়ক' প্রভৃতি। স্বচক্ষে দেখেছেন ১৯৭৩ সালে বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে বাংলাদেশ জয় করলেন নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস। এর দুই বছর পরই ১৯৭৫ সালের ১৩ জুলাই বাংলাদেশ পরিষদ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের (অধুনালুপ্ত) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যাত্রাশিল্পের প্রথম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করে মিলনবাবু যাত্রার জয়যাত্রা সম্প্রসারণ করলেন নগরকেন্দ্রিক নাগরিক সমাজে। যাত্রাকে নিয়ে আসতে হবে সমকালীন সমাজে– এ বিবেচনায় সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে চিত্রালী পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন প্রথম যাত্রা সাংবাদিক, ঠিক তেমনি যাত্রা মালিক-অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলা-কুশলীদের কথা পত্রিকার পাতায় বিশাল করে লেখার সুবাদে তিনিই প্রথম যাত্রাবিষয়ক প্রাবন্ধিক। স্কুল বয়সে যার অভিনয়ে হাতেখড়ি, পরবর্তীতে পেশাদার যাত্রাদলে অভিনয় করতে ঢুকে স্কুল খুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করলেন বর্ণপরিচিত থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞানের নানান অলিগলি। অমলেন্দু বিশ্বাসের মতো আধুনিক এবং উদার মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন মূলমন্ত্র– 'টাইপ চরিত্র হয়ে থাকবে না, যত রজনী তত চরিত্র, যত চরিত্র তত গল্প, যত গল্প তত রসাস্বাদন। মধুসূদনের মোহভঙ্গ, হিটলারের দাম্ভিকতার ক্ষয়, লেনিনের সাম্যের জয়, নজরুলের বিদ্রোহ, বিদ্যাসাগরের করুণা– সব ভাবরস মিলেমিশেই একটা কিছু হয়ে ওঠা। এই হয়ে ওঠাটা দাঁড়াবে শানিত চর্চায় আর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখায়।' যাত্রাসম্রাটের ভাবিষ্য তিনি যেন গুরুরই ইচ্ছার দুরন্ত প্রকাশ। কর্মভাবনা এবং পথচলায় অসংখ্য যাত্রাপালাগানের অসংখ্য চরিত্রের মতো তিনি কখনো অভিনেতা, কখনো নির্দেশক, কখনো পালাকার-সংগঠক-সাংবাদিক-লেখক-শিক্ষক আবার কখনো সম্পাদক। বর্ণিল পথে নিমগ্ন চিত্তে পথ চলেছেন যিনি, তিনি তিনিই, তিনি যাত্রাশিল্পের নবতরঙ্গ যাত্রানট মিলন কান্তি দে।

১৯৭১-এর ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা থেকে দেয়াল পত্রিকা 'মঞ্চশ্রী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে অভিনয়ের পাশাপাশি তার লেখালেখির জীবন শুরু। ২৫ মার্চ পর্যন্ত ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এসএম সুলতানের মতো বরেণ্য চিত্রশিল্পী এ দেয়াল পত্রিকায় বাণী দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে এ পত্রিকায় তিনি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে : 'এদেশ ছাড়বি কিনা বল, নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল'।

জল নয় বরং মিষ্টির জন্য বিখ্যাত যে বিক্রমপুর সেই বিক্রমপুরের সন্তান নিশীকান্ত চ্যাটার্জী (১৮৫২-১৯১০) যিনি সর্বপ্রথম যাত্রায় গবেষণা করে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন, তার সেই দুর্লভ গবেষণাপত্রটিও রয়েছে মিলন কান্তি দের সংগ্রহশালায়। নিশীকান্ত চ্যাটার্জী পিএইচডি লাভ করেন ১৮৮২ সালে। এর বহু বছর পর বাংলাদেশে তপন বাগচী ২০০৬ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাত্রা বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বাঙালির এ সংস্কৃতিমাধ্যম নিয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এবং পিএইচডি লাভ করেছেন সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্রিস্টিনা নিগ্রেন। তপন বাগচী ও নিগ্রেন দুজনই তাদের গবেষণায় মিলন কান্তি দের সহায়তা পেয়েছেন প্রচুর। নিশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দেহ অবসানের অনেক পরে আমাদের মিলন বাবুর জন্ম। নইলে তপন বাগচী এবং ক্রিস্টিনার মতো তিনিও তার গবেষণাকর্ম সম্পন্নের জন্য হয়তো মিলন কান্তি দের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হতেন। গবেষকদের গবেষণাকর্মে তথ্য-উপাত্ত, দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়েই শুধু মিলন দের দায়িত্ব শেষ নয়। বরং গবেষকদের গবেষণাকর্মকে অধিক মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে জানানো তার অবশ্যকরণীয় একটি কাজ। কবি জয়দেব সেই কবেই লিখে গেছেন, ভালো কাজ করার মানুষ সুলভ কিন্তু চিনিয়ে দেবার মানুষ দুর্লভ। এ দুর্লভ মানুষদের একজন মিলন কান্তি দে।

দেয়া মানে যেমন নেয়া নয়, তেমনি উত্তর মানে কিন্তু প্রশ্ন নয়। তথাপি মুখ থাকলেই যদি কথা বলা যায়, তবে কান থাকার কারণে না শুনে উপায় কী! ফলে বিগত ২০ বছরেও যে যাত্রাপালার ত্রিসীমানায় যায়নি, সে যদি বলে অশ্লীলতার কারণে যাত্রা দুই চোখে দেখা যায় না, সে কথাও যেমন শোনার, আবার ২৫ বছর যাত্রার গণ্ডি না পেরোনো কেউ যদি বলে, যাত্রা বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য, তবে তাও গ্রহণ করার। না করে উপায় কী! ভদ্রসমাজে তো যাত্রাপালার ভাঁড়কে এনে লোক হাসানোর কোনো মানে নেই। যে ভাঁড় অন্তত বলতে পারত, কানা ছাড়া চোখার পথ চলার কী দরকার! যাত্রা বিষয়ে কার কতটুকু কী করণীয় এ মাত্রাবোধ স্বাধীন বাংলাদেশে পাওয়া গেল না বলেই যাত্রাশিল্প মাধ্যম হোঁচট খেল বার বার। মিলন কান্তি দের পত্রিকায় লেখা নিবন্ধ, ঈদ সংখ্যার প্রবন্ধ, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যার বিশেষ রচনা, শিল্পকলা একাডেমির স্মরণিকায় গুছ রচনা, সেমিনারের প্রবন্ধ, 'যাত্রালোক' সম্পাদনা প্রভৃতির মিশ্রকে সংমিশ্রণ করলে ফুটে ওঠে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের গতিপথের মানচিত্র।

মানচিত্র, স্থিরচিত্র কিংবা চালচিত্র নয়, বরং ২০১২ সালে মিলন কান্তি দে নতুন করে সম্পাদনা করে বাজারে বের করেন যাত্রাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'যাত্রালোক'। এ পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে স্মৃতিচারণ, অনুসংবাদ, একবাক্যের সংবাদ, রম্য সংবাদ, সাংস্কৃতিকজনদের বিশেষণ প্রদান এবং শহর থেকে দূরে অনেক দূরে পোড় খাওয়া যাত্রাশিল্পীদের জীবনালেখ্য উপস্থাপন। মে-২০১৪ সংখ্যা যাত্রালোকের আহ্বানে যাত্রা বিষয়ে প্রথমবারের মতো কথা বলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকেরের উপাধিতে যিনি 'ফার্স্ট লেডি অব বাংলাদেশ থিয়েটার', সেই কিংবদন্তি অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার। আজকে সুস্থ কিন্তু ২০০৬ সালে অসুস্থ ফেরদৌসী মজুমদার যখন সিঙ্গাপুরে হসপিটালে রোগের বিরুদ্ধে লড়ছেন, তখন ২০০৬ সালে বিশ্ব নাট্যদিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত যাত্রাশিল্পীরা সে খবর শোনামাত্র বিচলিত হয়ে পড়লেন। যাত্রাশিল্পীদের পক্ষ হয়ে মিলন কান্তি দে সিঙ্গাপুরে ইমেইলে এক চিঠি পাঠালেন রামেন্দু মজুমদার বরাবর। আবেগপূর্ণ চিঠিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন 'দিদি' যেন সুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। অন্যদিকে ২০০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় জাদুঘরে আইটিআই বাংলাদেশে সেমিনার ও সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন শ্রদ্ধেয় রামেন্দু মজুমদার, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! আমরা অভিনন্দন জানাই আপনার সরকার শতাব্দীপ্রাচীন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করেছে। এবার আমি দাবি জানাচ্ছি ১৯৩৩ সালের যাত্রাশিল্প পরিপন্থী বেঙ্গল প্লেসেস অব পাবলিক অ্যামিউজমেন্ট অ্যাক্ট যেন প্রত্যাহার করা হয়।' যাত্রার মানুষ মিলন বাবু মঞ্চের মানুষের ভূমিকাকে সগৌরবে তুলে ধরেছেন লেখনীর মধ্য দিয়ে পত্রিকার পাতায় পাতায়।

পত্রিকার পাতায় পাতায় মিলন কান্তি দের লেখনীতে যাত্রাপালার কত স্মৃতি, কত বর্ণিল গৌরবগাথা, কত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, কতই না আক্ষেপ-অভিযোগ আর ইতিহাসের পরম্পরা! আজকের শাঁখারীবাজারের শাঁখারীরা বল্লাল সেনের সঙ্গে ঢাকায় এলেন সতের শতকে। বছরজুড়ে উৎসব আর উৎসব উদযাপনের প্রধান অনুষঙ্গ যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা। উৎসবে যাত্রাপালা মঞ্চায়নের ছড়াছড়ি। মঞ্চায়নের স্থানগুলো ছিল পানিটোলা, পোস্তগোলা, ফরাসগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, বাদামতলী। বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার যাত্রাদল ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশালের নট্ট কোম্পানির যাত্রানুষ্ঠান শাঁখারীবাজারে আলোচনার ঢেউ তুলল।

সমুদ্রের ঢেউ শুধু বাতাসের ধাক্কায় আসে না। বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয় সমুদ্রের খাদের গভীরতা। খাদ যত বড়, ঢেউও তত বড়। সঙ্গে বাতাস যুক্ত হলে তো কথাই নেই। ব্রিটিশের শোষণ এবং শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন অবিভক্ত ভারতজুড়ে। নাট্যমঞ্চে এলো নীল চাষিদের ওপর ব্রিটিশ বেনিয়াদের নির্মম অত্যাচার এবং বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীল দর্পণ নাটক'। ১৮৬১ সালে এ নাটক প্রথম মঞ্চায়ন হয় ঢাকা শহরে। ওই একই সময়ে অত্যাচারী কংসের বিরুদ্ধে এবং বৃন্দাবনের লীলা অবলম্বনে কৃষ্ণাশ্রয়ী কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) রচিত যাত্রাপালা 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস' মঞ্চায়ন হচ্ছে কেরানীগঞ্জ, একরামপুর, রূপগঞ্জ তথা ঢাকাজুড়ে। যাত্রাপালা যে বই আকারে প্রকাশিত হতে পারে তারও প্রমাণ কৃষ্ণকমলের এ পালাগুলো, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ সালে।

যাত্রাপালার আবেদন চিরায়ত। স্বদেশি যাত্রার যুগে মুকুন্দ দাস ইংরেজবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে গ্রেপ্তার হলেন, তার 'মাতৃপূজা'সহ বেশকিছু বই বাজেয়াপ্ত হলো। মুকুন্দ দাসকে ঠেকানোর জন্য স্যার উইলিংডন যে কালাকানুন জারি করেছিলেন, তার দাপটে এবং বেত্রাঘাতে পাকিস্তান আমলে তো বটেই, স্বাধীন

বাংলাদেশেও ৪২ বছরজুড়ে যাত্রাশিল্প আক্রান্ত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে নানানভ াবে, নানান পথে। নানান ভাবে, নানান পথে যে যাত্রাপালা মঞ্চায়ন হয়েছে ঢাকাসহ সারা পূর্ববঙ্গে তার বিস্তৃত বিবরণ দেখি মিলন বাবুর প্রকাশিত লেখার পরতে পরতে। দৈনিক সমকালের 'কালের খেয়া'য় ২৯ অক্টোবর, ২০১০-এ প্রকাশিত 'ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা' কিংবা দৈনিক জনকণ্ঠে ২০১৩ সালের ৪ আগস্ট ঈদুল ফিতর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলাদেশের যাত্রাদল' লেখাগুলোই তার আস্ত দলিল। পঞ্চাশের দশকে চট্টগ্রামের বাবুল অপেরার সর্বপ্রথম যাত্রার আসরে মেয়ে চরিত্রে মেয়েকে দিয়ে অভিনয় করানো, যাত্রার 'ফার্স্ট লেডি' মঞ্জুশ্রী মুখার্জীর (১৯৩৭-১৯৮৮) আত্মপ্রকাশ। ষাটের দশকে বন্ধু তুষার দাশগুপ্তের অনুরোধে নাটকের মানুষ অমলেন্দু বিশ্বাসের (১৯২৫-১৯৮৭) যাত্রার মানুষ হয়ে ওঠা এবং মঞ্জুশ্রী মুখার্জীর সঙ্গে রোমান্টিক জুটি গড়ে তোলা– এ রকম কত কথাই যে জানা যায় লেখনী পড়ে, তা অভাবনীয়। একদিকে নাট্যজগতের প্রাণপুরুষ মুনির চৌধুরী 'মানুষ' নাটক লিখে দাঙ্গার আগুন নেভাচ্ছেন, অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'ধর্মের বলি' যাত্রাপালা লিখে একই কাজ করছেন। একদিকে যখন নাটক রচিত হচ্ছে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান নিয়ে 'রক্তাক্ত প্রান্তর', তখন একই আদর্শিক চেতনায় যাত্রাপালা রচিত হচ্ছে 'সোহরাব-রুস্তম।' পূর্ব পাকিস্তানে যখন প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তি আঘাত হানা শুরু করেছে প্রগতিশীল শক্তির ওপর, তখন যাত্রাপালা 'চণ্ডমুকুল' রচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হচ্ছে স্পেনের কমিউনিজমকে গ্রাস করতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কিভাবে তাতিয়ে তুলছে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি। আইয়ুবের মার্শাল ল যখন জারি হচ্ছে, তখন যাত্রাপালায় 'রূপবান' গেয়ে উঠছে– 'বাড়িরও না দক্ষিণ পাশে/ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে'। বাজারের দিক দিয়ে বিখ্যাত আজকের যে কারওয়ান বাজার যেখানে টিভি চ্যানেলের হাট, সেখানে সে সময় যাত্রাপালা মঞ্চায়ন এক নিয়মিত ব্যাপার। বাজারের মসজিদটির পেছনে পালপাড়ায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হচ্ছে যাত্রাপালা 'দেবীদুর্গা' কিংবা 'অসুরবধ'। আবার কারওয়ান বাজারের সোলজার বিড়ির ফ্যাক্টরির কাছে কাঁচাবাজারের মসজিদের নির্মাতা শায়েস্তা খানের একজন খাজা আম্বরখানের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে যাত্রা 'খাজা বাবা।' কারওয়ান বাজারে 'খাজা বাবা' যাত্রাপালা যেমন দেখছেন মিলন কান্তি দে, তেমনি দেখছেন রামপুরা ব্রিজের ওপারে মেরুল কাঁচাবাজারসংলগ্ন নিমতলায় চৈত্র মাসে ভক্তিমূলক যাত্রাপালা। পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা, জ্ঞানার্জন এবং সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে যাত্রাপালার ভূমিকা যে কত বড় তা মিলনবাবু বুঝে গেলেন ওই সময়ে, যৌবনের প্রারম্ভে।

যৌবনের প্রারম্ভে কিংবা আজকের এ বার্ধক্যবেলায় দাঁড়িয়েও মিলন কান্তি দের লেখকসত্তা যে কত বিচক্ষণ, যাত্রাপালা যে কতটা দূরদৃষ্টসম্পন্ন তা বোঝা যায় ২০১১ সালের ২৪ মার্চ দৈনিক সমকালে 'আগুন ঝরেছিল যাত্রাশিল্পেও' শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটি পড়লে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণে লেখার একটি অংশ তুলে ধরা হলো। তিনি লিখছেন : '২৫ মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানাসংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে বাবুল অপেরার যাত্রা চলছিল 'চাঁদ সুলতানা'। এই পালায় যমুনা বাঈয়ের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন শক্তিময়ী অভিনেত্রী জাহানারা বেগম। সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা মুরাদের উদ্দেশে তার একটি সংলাপ ছিল– 'জাহাঁপনা কি অতর্কিতে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে চান? কেন আপনার সৈন্য দলকে লেলিয়ে দিয়েছেন নিরীহ জনতার ওপর? কত মসজিদ মন্দির ধ্বংস হয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, খবর রাখেন কিছু?' ঘটনার কী অভাবিত, কী ভয়ানক সমান্তরাল যোগাযোগ! ওই একই রাতে একই সময় ঢাকা শহরের রাজপথে ঘুমন্ত নরনারীর ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি খান সেনারা।'

স্বাধীনতা লাভের পর নাটকের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে নাট্যকর্মীরা ১৯৭২ সালে গড়ে তুলছেন একে একে আরণ্যক, নাট্যচক্র, থিয়েটার, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বরলিপি, আবাহনী, স্বদেশ সংসদের মতো ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল। মুক্তিযুদ্ধফেরত তারুণ্যের আলোয় নতুন অঙ্গীকারে উদ্ভাসিত হলো নাটমঞ্চ। অন্যদিকে একই সময় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের শ্যামগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করেছে যাত্রাদল সবুজ অপেরা। '৭৩ সালে চট্টগ্রামে যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নাট্যদল চট্টগ্রাম-৭৩, তখন চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা যাত্রাপালায় আনছে মাইকেল মধুসূদন, গীতশ্রী অপেরার পালা লেনিন, হিটলার। '৭৪-এর দৃষ্টান্ত গড়ছেন তুষার দাশগুপ্ত শিল্পী থেকে যাত্রাদলের মালিক হয়ে, তার প্রতিষ্ঠিত দল তুষার অপেরা। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাত্রায় নারী শিল্পী থেকে দল মালিকের খাতায় নাম লেখালেন খুলনার বটিয়াঘাটার আরতি মল্লিক। দলের নাম আরতি অপেরা। এদিকে স্বাধীনতা লাভের আগে চট্টগ্রাম বেতারে নিয়মিত আবৃত্তি করা, ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের বাবুল অপেরায় যোগ দিয়ে যাত্রার ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল খুলে শিক্ষকতা করা, পালা মঞ্চায়নের আগে চমৎকারভাবে এক স্টাইলে কাহিনী উপস্থাপন, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় কর্ম সম্পাদনের পর মিলন কান্তি দে স্বাধীন দেশে যাত্রার হাল ধরলেন নতুন রূপে নতুন ভাবে। মালিক-শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুললেন ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক সংগঠন যাত্রাশিল্পী-কুশলী-কর্মচারী ইউনিয়ন। এ উদ্যোগ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, সাল ১৯৭৯। পরে ১৯৮৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ, এ সংগঠনের কার্যক্রম এখনো অব্যাহত।

অব্যাহত গতিতে ছুটে চলা বাংলাদেশের যাত্রা সংস্কৃতি যে বিশ্বজনীন, তার একটা আবহ পাওয়া যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ থেকে ১৫ জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত প্রায় মাসব্যাপী জাতীয় যাত্রা উৎসবের স্মরণিকায়, নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমানের লেখা একটি প্রবন্ধে। শিরোনাম– 'যাত্রা: নাট্যকর্মীর দৃষ্টিকোণ' থেকে। আতাউর রহমান তার লেখায় দেখিয়েছেন তার দেখা ব্রিটেনের রয়েল শেক্সপিয়ার দলের পরিবেশিত 'ম্যাকবেথ' উপস্থাপনা আর বাংলাদেশের যাত্রা উপস্থাপনা কতটা সাদৃশ্যময়। অভিনয় ভঙ্গিমা, মঞ্চের নিরাভরণ সজ্জা, ন্যূনতম প্রপসের ব্যবহার, বিবেকের আদলে দর্শকদের সাথে একত্রীকরণ, শক্তিশালী কস্টিউমের ব্যবহার সব মিলেমিশে একাকার। এ স্মরণিকায় কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন– 'যাত্রা বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে।' চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আলমগীর কবির সতর্কতার উদ্দেশ্যে লিখেছেন– 'যাত্রা কেবল বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই নয়, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাসের সাথে একমাত্র নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র। এ কারণেই আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তিসঙ্গত দাবি সত্ত্বেও এর মাধ্যমগত শুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হতে দেয়া অনুচিত হবে।'

আলমগীর কবিরের সতর্কতামূলক পূর্বাভাস সত্ত্বেও যাত্রা মাধ্যমের শুদ্ধতা ধরে রাখা গেল না। কেন গেল না- কিভাবে জটলা বাঁধল, এ ব্যাপারে মিলন বাবুর লেখা বক্তৃতা-বিবৃতি অসংখ্য। সব যাচাই-বাছাই করে দেখলে এই পথ-বিভ্রান্তি নানানভাবে নানানপথে। স্বাধীনতা লাভের ১০ বছর পর্যন্ত যাত্রার পরিবেশনা ছিল অনেকটা নান্দনিক। যাত্রাদলে শিক্ষিত, মার্জিত রুচির মালিকদের বিনিয়োগ ছিল। নায়েকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বায়নার অর্থ ছিল সম্মানজনক। লগ্নিকৃত পুঁজি লাভসহ ফেরত আসত। যাত্রার অভিনয়শিল্পী কলাকুশলী নিয়মিত বেতন-ভাতা পেত। বনে আগুন লাগলে যেমন বাতাসের অভাব হয় না, তেমনি লাভজনক যাত্রাশিল্পে নতুন নতুন মালিকের আগমনেরও ব্যাঘাত ঘটল না। অর্থ লগ্নির ক্ষমতা নিয়ে যারা নতুন মালিকানায় এলো তারা কেউ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ঘাটের ইজারাদার, কেউ চিংড়ি ঘেরের মালিক, রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা ও সুদখোর মহাজন। তাদের রুচিতে না আছে শিক্ষা, না আছে শিল্পচর্চার জ্ঞান, না আছে শিল্পীদের পরিচর্যা করার মতো অনুশীলনী দক্ষতা, না আছে সাহিত্য-ভাষার জ্ঞান। উল্টোদিকে আছে রুচির বদলে বিকৃতরুচি। পালাবদলের বড় ধাক্কাটা লাগল গানে এবং নাচে। এক সময় যেখানে নাচ হতো উচ্চাঙ্গ রীতিতে নারায়ণ নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, ছোরা নৃত্য, গীতি আলেখ্য। আধুনিক গান বলতে যেখানে গাওয়া হতো 'আষাঢ়-শ্রাবণ মানেনা তো মন' কিংবা 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা' অথবা 'নাচ ময়ূরী নাচ রে' প্রভৃতি, সেখানে হঠাৎ করে শুরু হলো আধুনিক নৃত্যগীতের নামে রিদিমপূর্ণ হিন্দি গান আর গানের প্যারোডি। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে শেরেবাংলানগরে আয়োজিত মাসব্যাপী শিল্প প্রদর্শনীতে সেই যে প্রিন্সরূপী লাকী খানের বীভৎস নাচের উন্মাদনার শুরু, সেই শুরুর উন্মাদনা বাড়ল বৈ থামল না, থামল না আজ পর্যন্ত। মাঝখান থেকে যাত্রানুরাগী দর্শক বঞ্চিত হয়, ছিটকে যায় যাত্রাপালার প্রকৃত রসাস্বাদন থেকে। মিঠা জলের মাছ তো আর নোনা জলে মিশে থাকতে পারে না। যাত্রার অশ্লীলতাকে বড় করে দেখিয়ে, সামনে এনে যাত্রার ওপর পড়তে থাকে খড়্গাঘাতের মতো সরকারি নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞা কত নিদারুণ এবং নৃশংস, তার চিত্র মিলনকান্তি দে তুলে ধরেন ২০০৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির

উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে তার উত্থাপিত প্রবন্ধে। 'বর্তমান সময়ে যাত্রার প্রবহ: সংকট ও সমাধান'– প্রবন্ধে মিলন বাবু লেখেন, '৯১-এর ৯ নভেম্বর থেকে '৯৬-এর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দফায় দফায় ৬ বার যাত্রা বন্ধের আদেশ দেয়া হয়। ওই শাসন আমলে দেশে যাত্রা প্রদর্শনী বন্ধ ছিল ১০১৪ দিন। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার টাকারও বেশি। যাত্রা বন্ধ, হাজার হাজার শিল্পীর আহাজারি, অবর্ণনীয় দুর্ভোগ, অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপন– এভাবেই বাংলার এক ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে ধ্বংসের অতলে ঠেলে দেয়া হয়েছিল সেদিন। যাত্রাশিল্পীরা একবার সেই সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিল– 'এই যে বার বার যাত্রা বন্ধ করে দিচ্ছেন, আমরা শিল্পীরা কোথায় যাব, ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়াব কোথায়'। মন্ত্রী মুচকি হেসে কটাক্ষ করে উত্তরে বলেছিলেন– 'কেন, পুরুষ শিল্পীরা যাবে হাঁস-মুরগির খামারে আর মেয়েরা গার্মেন্টে।' গার্মেন্টে যাব না পালা মঞ্চায়নে ফিরব– সিদ্ধান্তটা যখন নিতে হবে যাত্রাশিল্পীদের, তখন নতুন যুদ্ধে মিলনকান্তি দে। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সব মালিক-ম্যানেজার-শিল্পী-কলাকুশলী নিয়ে তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন বাংলাদেশজুড়ে। যাত্রা মঞ্চায়নের অনুমতি দিতে হবে, দলের লাইসেন্স দিতে হবে, সব জেলায় যাত্রা অনুমতির সুযোগ এবং সার্বিক নিরাপত্তা দিতে হবে। মিলনকান্তি দে তার যুদ্ধ যাত্রায় শক্তির উৎস হিসেবে পেলেন কামাল লোহানী, রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, সারা যাকের, লিয়াকত আলী লাকীর মতো নাট্যব্যক্তিত্বদের। যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের হাতে হাত ধরল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। দীর্ঘ দুঃখরজনীর অবসানে প্রভাতের স্নিগ্ধ ভোরের দেখা মিলল বর্তমান সরকারের সুবিবেচনা এবং শিল্পকলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সার্বিক পরিকল্পনায়। প্রথমবারের মতো গেজেটভুক্ত হলো যাত্রা-নীতিমালা। প্রথম দিকে নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। এখন আর যাত্রা দলের লাইসেন্স জটিলতা নেই। শিল্পকলা একাডেমি থেকে নিবন্ধন হলেই চলছে। কম-বেশি ছোটখাটো বাধা-বিঘ্ন ছাড়া আবার বেগবান হলো যাত্রা।

বেগবান মিলনকান্তি দে শুধু আন্দোলন নিয়েই থাকেননি বরং ১৯৯৩ সালে শিল্পকলা একাডেমি থেকে উপাধি লাভ করলেন 'যাত্রাব্যক্তিত্ব'। একই বছরে গঠন করলেন নিজের যাত্রাদল দেশ অপেরা। শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত যাত্রা ও নাটক কর্মশালায় হলেন অন্যতম প্রশিক্ষক। আইটিআই বাংলাদেশ কেন্দ্রের সেমিনারে উত্থাপন করলেন প্রবন্ধ '৯৪-এ। বৃক্ষরোপণ, পানিতে আর্সেনিক, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, সার ও কীটনাশক ব্যবহার, শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করার মতো শিক্ষা ও জনসচেতনতা তৈরিতে যাত্রাকে প্রয়োগ করলেন বেসরকারি সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায়। যাত্রা বিষয়ে সহায়ক কাগজ ছাড়াই দুই ঘণ্টার একক বক্তৃতা দিয়ে নারায়ণগঞ্জবাসীর দৃষ্টি কাড়লেন ২০০৩ সালে। ২০০৪ সালে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের আহ্বানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা বিষয়ে মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মশালার দায়িত্ব পালন করেন। ইউনিসেফের উদ্যোগে যাত্রার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির কাজ করলেন ২০০৪ সালে সমন্বয়কারী হিসেবে। থিয়েটার স্কুলে যাত্রার প্রশিক্ষণে যুক্ত হলেন ২০০৭ সাল থেকে। দুই বাংলার মধ্যে একক অভিনয়ের যাত্রাপালা 'আমি অমলেন্দু বিশ্বাস' রচনা ও অভিনয়ে একক কৃতিত্ব এলো ২০০৮ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগের আমন্ত্রণে অতিথি শিক্ষক হলেন একই সালে। যাত্রা-পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করলেন ২০১০ সালে। দীর্ঘ সংগ্রামের অবসানে সরকারিভাবে প্রথমবারের মতো 'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির একজন গর্বিত সদস্য হলেন ২০১২ সালে। 'বাংলার মহানায়ক' নামে যাত্রাপালার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন উপস্থাপন তার সংগ্রামী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। শিল্পকলা একাডেমির প্রত্নযাত্রা 'ঈশা খাঁ'র নির্দেশনাও তার।

তিনি যে পালাগুলো রচনা করেছেন তার সংখ্যা পাঁচের মতো হলেও এর বৈশিষ্ট্য– খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের জীবন কাহিনী, তাদের সংগ্রাম, তাদের আদর্শ। আলো জ্বললেই আঁধার পালায় বলেই মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের প্রতি তার এত আগ্রহ। পালা নির্দেশনায় প্রথমত অভিনয় নির্ভরতা এবং দ্বিতীয়ত স্পষ্ট উচ্চারণ তার প্রথম চাওয়া। আজ পর্যন্ত তার নির্দেশিত-অভিনীত পালার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। প্রসঙ্গত, থিয়েটারে অভিনয় না করে নির্দেশনা দেয়ার নিয়ম থাকলেও যাত্রাপালায় নির্দেশককে অবশ্যই অভিনয় শিল্পী হতে হবে। মিলনকান্তি দের অভিনীত যাত্রাপালার সংখ্যা ১০০ কাছাকাছি। চরিত্র বুঝে সব রস থেকে প্রয়োজনীয় রস দিয়ে রসস্বাদন করে চরিত্রকে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করাই তার কাছে অভিনয়ের বিশ্বস্ততা ধরে রাখা। ব্রজেন্দ্র কুমার দের 'আঁধারের মুসাফির' যাত্রাপালায় দেশপ্রেমিক নবাব হেতম খাঁর নেতৃত্ব, নির্মল মুখার্জীর 'মা হলো বন্দি' পালায় দরিদ্র চাষী মুকুন্দ হালদারের ক্ষুব্ধ মানসিক যন্ত্রণা, দেবেন নাথের 'লালন ফকির' যাত্রাপালায় দীনু চাঁড়ালের তথাকথিত সমাজপ্রতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'আনারকলি' পালায় সম্রাট আকবরের বিশালতা, ব্রজেন দের 'সোহরাব রুস্তম' পালায় মৌলানা চরিত্রের বীভৎসতা, শান্তিরঞ্জন দে রচিত 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' পালায় তাতার খাঁ'র পৈশাচিকতা এবং শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' পালায় গোলাম হোসেনের চাতুর্যপূর্ণ কৌতুকাভিনয়ে অভিনেতা মিলনকান্তি দে বাস্তবের মতোই বিচিত্র ও অসীম কৌতূহলী। আগামী বছর একুশে বইমেলায় ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে মিলনকান্তি দে রচিত গ্রন্থ 'যাত্রাশিল্পের গল্পকথা'। গল্প কথা নয় বরং বাস্তবতা হলো যাত্রা সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হিসেবে ১৯৮৬ সালে সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৯ সালে সিএটি কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল ইবসেন অ্যাওয়ার্ড মিলনকান্তি দের সংগ্রামী জীবনে সাফল্যের এক নতুন সংযোজন।

সংযোজনের তালিকায় ২০১৩ সালে যাত্রাশিল্পের এক বড় অর্জন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় শিল্পকলা একাডেমি রেপার্টরি যাত্রাদল গঠন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নির্দেশনা দেন বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী সুলতান সেলিম। এই পালায় মিলনকান্তি দে কাবুল অধিপতি আহম্মদ শাহ আবদালী চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন। রেপার্টরি যাত্রাদলের পথচলা যদি অব্যাহত থাকে, ড. গওহর রিজভীর বক্তব্য অনুসারে 'বাংলার মহানায়ক' যাত্রাপালাটি যদি সত্যি সত্যি ৬৪ জেলায় মঞ্চায়নের ধারাবাহিকতা অর্জন করে, তবে তা হবে এক অর্থে যাত্রার পথচলাকে সুষমামণ্ডিত করা।

বিগত সময়ে যাত্রাবিষয়ক সেমিনারে যত প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে প্রবন্ধকার লেখা শেষ করেছে বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ তুলে ধরে। যদি সেই ধারা অক্ষুণ্ন রেখে প্রবন্ধ উপস্থাপনা শেষ করতে হয়, তবে মিলনকান্তি দের সঙ্গে রয়েছে আন্তরিকতাপূর্ণ বোঝাপড়া। ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্পকে স্বাধীন বাংলাদেশে সংস্কৃতিজন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নতুন আলোড়নে আলোড়িত করেছেন অমলেন্দু বিশ্বাস। অমলেন্দু বিশ্বাসের অবর্তমানে রয়েছে স্ত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং মিলনকান্তি দের মতো তার যোগ্য ভাবশিষ্য। অমলেন্দু বিশ্বাসের স্বপ্ন বাস্তবায়নে, তার নামাঙ্কিত পদক প্রদান, সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন, জন্ম-প্রয়াণ দিনে পত্রিকায় লেখনীর মধ্যদিয়ে স্মরণ, অনুষ্ঠান উদযাপন প্রভৃতি কর্মসম্পাদনায় মিলনকান্তি দে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসের যোগ্য উত্তরসূরী। এখন ধারাবাহিকতার প্রশ্নে ছোট্ট জিজ্ঞাসা, মিলনকান্তি দে কি পেরেছেন যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করে যেতে! একাডেমিক অর্থে আবার ভাব ও আদর্শগত অর্থে। যদি না হয়ে থাকে তবে কি এখনই সেই সময় নয় যে, মিলনকান্তি দে পারেন এ বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোনিবেশ করতে! নাম, যশ কিংবা অর্থ প্রতিপত্তির মোহে হঠাৎ দু-একটি কাজ করে ধূমকেতুর মতো আলোর রোশনাই ছড়ানো যায় বটে, কিন্তু তাতে করে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিংবা যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের মতো ধ্রুবতারা হওয়া যায় না। আর তা হতে গেলে দরকার হয় শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা এবং শিল্প সৃজনের আজীবনের তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা আছে বলেই যাত্রাশিল্পে অমলেন্দু বিশ্বাসের পর মিলনকান্তি দে আজ আমাদের আলোচ্য। তৃষ্ণা সম্প্রসারিত হতে হবে ভবিষ্যৎ যাত্রা প্রজন্মের মধ্যে। এ দায় শিষ্যের মঙ্গল কামনায় গুরুর দায়। শিল্পের যাত্রাপথ গুরু-শিষ্য পরম্পরা। উপযুক্ত শিষ্যের হাতে যাত্রার যাত্রাপথের আলোকশিখা যতক্ষণ না মিলনকান্তি দে তুলে দিতে পারছেন যোগ্য উত্তরসূরীর হাতে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভীক যাত্রী হয়েও মিলনকান্তি দের মুক্তি নেই। মুক্তি নেই- কারণ প্রয়াত অমলেন্দু বিশ্বাস কিংবা জাগ্রত মিলনকান্তি দের মতো নির্ভীক যাত্রীরা আছেন বলেই যাত্রার যাত্রাপথ রুদ্ধ হতে পারেনি, পারবেও না।

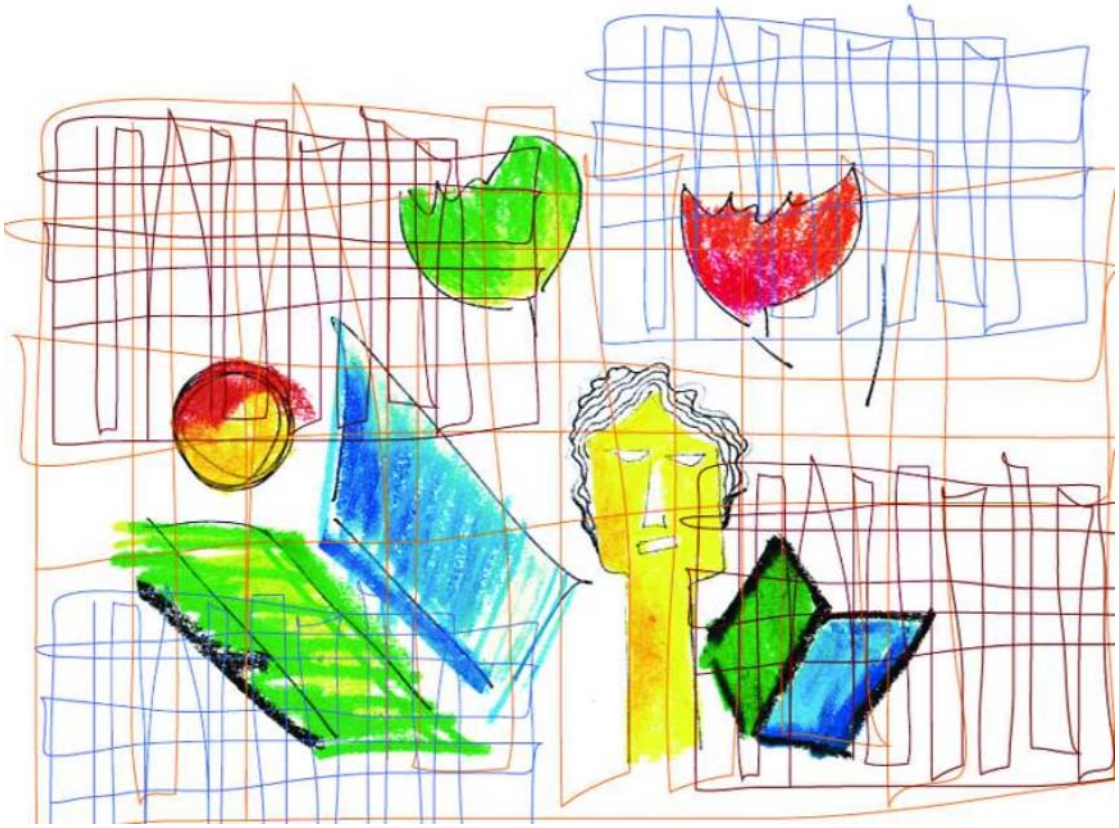

অনুবাদ গল্প

পুরনো বাড়ি

মূল : লু স্যুন
ভাষান্তর : মনির তালুকদার

বিশ বছর আগে যে বাড়ি ছেড়েছি– সেই বাড়িতে ফেরার জন্য তিক্ত শীতের মধ্যে সাতশো মাইলের বেশি পথ পেরিয়ে এসেছি।

তখন শীতের শেষ। পুরনো বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দিনটা ঘোলাটে হয়ে আসে। বজরার ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। বাঁশের ছইয়ের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে দূরে ও কাছে নীলাকাশের নিচে ছড়ানো-ছিটানো জীবনের স্পন্দনহীন কয়েকটি জনশূন্য গ্রাম। মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

বিশ বছর ধরে যে বাড়িটি আমার স্বপ্নের ভেতর– এটা নিশ্চয়ই সেই পুরনো বাড়ি নয়।

যে পুরনো বাড়িটি আমি মনে রেখেছি, সেটা কোনোমতেই এ রকম নয়। আমার পুরনো বাড়ি দেখতে অনেক মনোরম ছিল। কিন্তু তার মোহ বা সৌন্দর্য বলতে হলে কোনো পরিষ্কার ধারণাই আমার নেই– নেই বর্ণনা করার মতো কোনো ভাষা। এখন মনে হয়, এর সব কিছুই তাতে ছিল। আমি যুক্তি খাড়া করি; বাড়ি সব সময়ই এ রকম ছিল, খুব একটা উন্নতি না হলেও। তবে যতখানি খারাপ ভেবেছি, ততটা নয়। শুধু আমার মন বদলেছে– কেননা কোনো মোহ ছাড়াই গ্রামে ফিরছি।

এবার ফিরে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে

বিদায় নেয়া। বহু বছর আগে আমাদের গোষ্ঠী যে পুরনো বাড়িতে বাস করেছে, তা ইতোমধ্যে আরেক পরিবারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। বছর না ঘুরতেই তা আবার হাত বদল হবে।
নববর্ষের আগেই বহু চেনা পুরনো বাড়িকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানাতে হচ্ছে আমাকে। পুরনো শহর থেকে বহু দূরে কর্মস্থলে নিয়ে আসতে হবে আমার পরিবারকে।
পরদিন ভোরে আমি বাড়ির দরজায় পৌঁছি। বাড়ির ছাদে হাওয়ায় কাঁপছে কিছু বিবর্ণ ঘাস। ওই বাড়ির হাত বদল হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবত আমার গোষ্ঠীর অনেকেই অন্যত্র সরে গেছে। সে কারণে একটা রহস্যময় নীরবতা। বাড়িতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই স্বাগত জানানোর জন্য দরজায় বেরিয়ে আসেন আমার স্নেহময়ী মা। তার পেছনে ছুটতে ছুটতে আসে আমার আট বছরের ভাইপো হোংজু।
মা খুশি হলেও এক ধরনের দুঃখবোধ ঢাকার চেষ্টা করছেন। আপাতত মালপত্র সরানো বন্ধ করে তিনি আমাকে বসার ব্যবস্থা করলেন এবং চা খেতে বললেন। আমার ভাইপো হোংজু আমাকে এর আগে কখনো দেখেনি। তাই দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জু আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।
শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বিদায় নেয়ার জন্য তো কথা বলতেই হয়। আমি মাকে বললাম, অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়েছি– এর পাশাপাশি বেশকিছু আসবাবপত্রও কিনেছি। তবে বাকি আরো কিছু জিনিস কেনার জন্য বাড়ির সব আসবাবপত্র বিক্রি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মা সায় দিয়ে বললেন, জিনিসপত্র বাঁধার কাজ প্রায় শেষের পথে। মা বললেন, যেসব আসবাবপত্র সহজে সরানো যাবে না, তার অর্ধেক বিক্রি হয়ে গেছে। শুধু খদ্দেরদের কাছ থেকে পুরো টাকা পাওয়া মুশকিল।
মা বললেন, 'তুমি দু-এক দিন বিশ্রাম নাও। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা কর। তারপর আমরা যেতে পারব।'
'ঠিক আছে।'
'ইয়ুনথুর কথা মনে আছে? যতবার সে আসে, ততবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তোমাকে আবার দেখতে চায়। আমি তাকে তোমার বাড়ি ফেরার তারিখটা বলেছি। সে হয়তো যে কোনো সময় এসে পড়বে।' এ সময় আমার মনের ভেতর একটি অদ্ভুত ছবি ভেসে ওঠে। নীলাকাশে সোনালি চাঁদ ঝুলে আছে। নিচে বালুকাময় ক্ষেতে যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজ তরমুজ গাছের সারি। এর মাঝে গলায় রুপালি চকচকে চেনওয়ালা এগারো কি বারো বছরের একটি ছেলে নিড়ানি হাতে সর্বশক্তি দিয়ে একটি খাটাশকে দ্রুত আঘাত করে যাচ্ছে। আর সেটা আঘাত এড়িয়ে দ্রুত তার পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।
সেই বালক ইয়ুনথু। তার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা তখন তার বয়স ছিল দশের সামান্য ওপর। তবে সেটা ৩০ বছর আগের কথা। বাবা তখনো জীবিত। তখন আমাদের পরিবারের অবস্থাও সচ্ছল ছিল, আর সত্যি কথা বলতে কী, আমি বখাটে ছেলে ছিলাম। সে বছর পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগের আয়োজন করা আমাদের পরিবারের পালা ছিল। ত্রিশ বছরে একবার আসে বলেই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। বছরের প্রথম মাসে পূর্বপুরুষদের মূর্তির উদ্দেশে ভোগ দেয়া হতো। ভোগের পাত্র খুব সুন্দর ও দামি বলে এবং পূজারির সংখ্যা বেশি হওয়ায় চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের পরিবারে মাত্র একজন খণ্ডকালীন কামলা ছিল। অনেক কাজ করতে হবে বলে সে বাবাকে জানায় ভোগের পাত্রের ওপর নজর রাখার জন্য ছেলে ইয়ুনথুকে নিয়ে আসবে।
বাবা রাজি হলে আমার খুব খুশি লেগেছিল। আমি বহুদিন ইয়ুনথুর কথা শুনেছি এবং জানতাম সে আমারই প্রায় সমবয়সী। তার জন্ম বাড়তি মাসে। ভাগ্য গণনার সময় দেখা যায় পাঁচটি উপাদানের মধ্যে তার ভাগ্যে মাটি নেই। তাই তার বাবা তার নাম রেখেছেন ইয়ুনথু (বাড়তি মাটি)। সে ফাঁদ বানিয়ে ছোট পাখি ধরতে পারে।
আমি প্রতিদিন নববর্ষের আশায় থাকি। নববর্ষেই ইয়ুনথু আসবে। অবশেষে বছরের শেষে একদিন মা বললেন, ইয়ুনথু এসেছে। তাকে দেখার জন্য আমি ছুটে যাই। সে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলগাল লাল মুখ, মাথায় রঙিন টুপি এবং গলায় উজ্জ্বল রুপালি চেন। বোঝা যায় তার বাবা ভালোবাসায় অন্ধ। ছেলে মরে যাবে বলে দেব-দেবীর কাছে কসম খেয়ে গলায় রুপালি কবচ দিয়েছে। সে খুব লাজুক। কিন্তু একমাত্র আমাকেই ভয় পেত না। কেউ না থাকলে সে আমার সঙ্গে কথা বলত। সে সময় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে যাই।
এখন ঠিক আমার মনে পড়ছে না, তখন কী নিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু মনে পড়ে ইয়ুনথুর মনোবল ছিল উঁচু। শহরে আসা অবধি সে নতুন অনেক কিছু শিখেছে।
পরদিন আমি তাকে পাখি ধরে দিতে বলি। সে বলল, হবে না। শুধু বরফ পড়লে হবে। বরফের পর আমি মাটিতে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিই। তারপর ছোট্ট একটা লাঠি দিয়ে বিরাট একটা ঝুড়ি খাড়া করে দিই। নিচে ছড়ানো থাকে কিছু ধান। পাখিরা ধান খেতে এলে লাঠির সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে টান দিলেই ঝুড়ির ভেতর আটকা পড়ে। কত রকমের পাখি, বুনো রঙিন পাখি– কবুতর, নীল পাখি, নানা রঙের, নানা আকারের পাখি...।
সেই থেকে আমি বরফের আশায় থাকি। ইয়ুনথু আরেক দিন বলে, 'এখন খুব ঠাণ্ডা। আসতে হবে। দিনের বেলা বালুকাময় ভূমিতে আমরা ঝিনুক কুড়াতে যাব। কত রংবেরঙের ঝিনুক, লাল, সবুজ, পাজি এবং 'বুদ্ধের হাত'। সন্ধ্যায় যখন বাবার সঙ্গে তরমুজ দেখতে যাই তখন তুমিও যাবে।'
'সে কি চোর ধরার জন্য?'
'না। যদি তৃষ্ণায় পথচারীরা একটি তরমুজ তুলে নেয়, আমাদের লোকজন সেটাকে চুরি মনে করে না। আমাদের দেখতে হয় খাটাশ, শজারু আছে কি না। চাঁদনি রাতে যখন তরমুজ খেতে শুরু করে, তখন শব্দ পাওয়া যায়। তখনই তুমি নিড়ানি হাতে চুপি চুপি সেখানে যাবে...'
তখন খাটাশ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না, এখনো তা পরিষ্কার নয়। বুঝতে পারি এটা ছোট্ট কুকুরের মতো, ভয়ঙ্কর কিছু একটা।
'ওগুলো কি মানুষকে কামড়ায় না?'
'তোমার হাতে নিড়ানি আছে। তুমি যাবে দেখতে পেলে আঘাত করবে। ওটা খুব ধূর্ত প্রাণী। তোমার দিকে ছুটে এসে পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে। এর লোম তেলের মতো খুবই পিছলে।'
আমি কখনো জানতাম না এসব অদ্ভুত জিনিস আছে। বালুকাবেলায় রংধনুর বিভিন্ন রঙের ঝিনুক আছে, তরমুজের বিপদ আছে। শুধু জানতাম ওগুলো মুদি দোকানে বিক্রি হয়।
'আমাদের বালুকাবেলায় জোয়ারের সময় প্রচুর মাছ আসে, ব্যাঙের মতো দুই পা-ওয়ালা...'
ইয়ুনথুর মন ছিল ওইসব অদ্ভুত জিনিসের মধ্যে, যা আমার পুরনো বন্ধুদের হিসাবের বাইরে। তারা ওইসবের কিছুই জানত না। ইয়ুনথু সাগরতীরে বাস করত। তাই তারা আমার মতোই দেয়ালের বাইরে শুধু আকাশ দেখতে পেত।
দুঃখজনকভাবে নববর্ষের এক মাস পর ইয়ুনথুকে বাড়ি চলে যেতে হয়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি, সে রান্নাঘরে লুকায়। না যাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। সবশেষে তার বাবা তাকে নিয়ে যায়। পরে তার বাবার হাতে সে আমার জন্য উপহার হিসেবে এক প্যাকেট ঝিনুক আর কিছু সুন্দর পালক পাঠায়। আমিও দু-এক বার উপহার পাঠিয়েছি; কিন্তু আর কখনো আমাদের দেখা হয়নি।
মায়ের মুখে তার কথা শুনতেই ছেলেবেলার কথা আমার মনে বিজলির মতো চমকে ওঠে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পুরনো সুন্দর বাড়ি।
আমি বললাম, 'খুব ভালো! সে-সে কেমন আছে?'
মা বললেন, 'সে?... না, সে খুব ভালো নেই।' তারপর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'ওই লোকগুলো আবার আসছে। তারা আমাদের আসবাবপত্র কিনতে চায়। আসলে তারা দু-একটা চুরি করতে চায়। আমাকে গিয়ে তাদের ওপর অবশ্যই নজর রাখতে হবে।'
মা উঠে চলে গেলেন। বাইরে কয়েকজন মহিলার গান শোনা যাচ্ছে। হোংজুকে কাছে ডেকে আমি কথা শুরু করে দিই। সে লিখতে পারে কি না। এখান থেকে চলে গেলে খুশি হবে কি না।
'আমরা কি রেলে চড়ে যাব?'
'হ্যাঁ।'
'নৌকা?'
'প্রথমে আমরা নৌকায় যাব।'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'ওহ। এই রকম। লম্বা গোঁফওয়ালা।'
থতমত খেয়ে তাকিয়ে দেখি পঞ্চাশ বছরের এক মহিলা। চোখ ও গালের মাঝখানের হাড় উঁচু, ঠোঁট জোড়া পাতলা। নিতম্বের ওপর হাত রেখে, স্কার্ট নয়, প্যান্ট পরা পা জোড়া ফাঁক করে জ্যামিতি বক্সের কম্পাসের মতো সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
আমি বোকা বনে যাই।
'তুমি আমাকে চেন? তোমাকে আমি কোলে রেখেছি। তোমাকে অনেক আদর করেছি, মনে নেই?'
আমার আরো বোকা বনে যাওয়ার দশা।
ভাগ্য ভালো, ঠিক তখনই মা এসে বললেন, 'সে অনেক দিন বাইরে, তাই ভুলে যাওয়ার জন্য তাকে মাফ করে দাও।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার মনে রাখা উচিত, ইনি রাস্তার উল্টো পাশের মিসেস ইয়াং... তার বিন কার্ডের দোকান আছে।'
তখনই আমার মনে পড়ে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন মিসেস ইয়াং নামে একজন রাস্তার উল্টো পাশের বিন কার্ডের দোকানে সারা দিন বসে থাকত। লোকজন তার নাম দিয়েছিল 'বিনকার্ড সুন্দরী।' সে মুখে মেকআপ নিত। এখনকার মতো তার চোয়ালের হাড় এত উঁচু বা ঠোঁটজোড়া পাতলা ছিল না। তা ছাড়া সে সারা দিন বসে থাকত, তাই কখনো কম্পাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাইনি। তখন লোকজন বলত, তার কারণেই বিনকার্ড দোকানে বেচাকেনা বেশ ভালো হতো। বোধ হয় বয়সের কারণে আমার ওপর তার কোনো ছাপ পড়েনি। তাই পরে তাকে পুরোপুরি ভুলে গেছি। যা হোক, কম্পাস আমার দিকে বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে তাকায়, যেভাবে নেপোলিয়নের নাম না শোনা ফরাসি বা ওয়াশিংটনের নাম না শোনা মার্কিনির দিকে কেউ তাকায়।
বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলে, 'তুমি ভুলে গেছ? স্বাভাবিক, আমি তোমার হিসাবের বাইরে...'
দাঁড়িয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলাম, 'না, না, অবশ্যই নয়... আমি...'
'তাহলে আমার কথা শোনো, মাস্টার শ্যুন। তোমার টাকা-পয়সা হয়েছে। তা ছাড়া ওগুলো খুব ভারী, তাই ওই পুরনো আসবাবপত্র তোমার আর দরকার নেই। তার চেয়ে বরং আমি নিয়ে যাই। আমাদের মতো গরিব লোকদেরই ওসব প্রয়োজন।'
'আমার টাকা-পয়সা হয়নি।... আমাকে ওইসব আসবাবপত্র বিক্রি করতে হবে যাতে আরো কিছু...'
'আহ, রাখ ওসব কথা। তুমি এখন সরকারি কর্মচারী আর বলছ তোমার টাকা-পয়সা নেই। তোমার তিনজন রক্ষিতা আছে। যখনই বাইরে যাও আটজন বেহারা তোমার পালকি বহন করে। তবু তুমি বলবে তুমি ধনী নও? হ্যাঁ। আমার কাছে কিছুই লুকাতে পারবে না।'
কিছু বলার নেই মনে করে আমি চুপ করে থাকি। 'মুখ খোল। লোকের যত টাকা হয়, তত তারা কঞ্জুস হয়, যত কঞ্জুস হয়, তত টাকা পায়...' বলেই কম্পাস রাগে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। চলে যেতে যেতে সে মায়ের একজোড়া হাতমোজা তুলে কোমরে গোঁজে।
এরপর আশপাশের বহু আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসে। তাদের সঙ্গে দেখা করার ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু বাঁধার কাজ করতে থাকি। তাতে তিন-চার দিন চলে যায়।
এক শীতের বিকালে দুপুরের খাওয়ার পর বসে চা খাচ্ছি। শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। দেখার জন্য মাথা ঘুরে তাকাই। প্রথম দেখাতেই মন বিগড়ে যায়। আমি দ্রুত উঠে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাই।
এই সেই ইয়ুনথু। প্রথম দেখাতেই চিনতে পারলেও এ ইয়ুনথু সেই ইয়ুনথু নয়। তার শরীর দ্বিগুণ হয়েছে। একসময়ের গোলগাল মুখ হলদে হয়ে গেছে, গভীর ভাঁজ পড়েছে।
চোখজোড়া তার বাবার মতো হয়ে গেছে, ফোলা ও লাল। সেসব কৃষকের মতো, যারা সারা দিন সাগরতীরে সাগরের হাওয়ায় কাজ

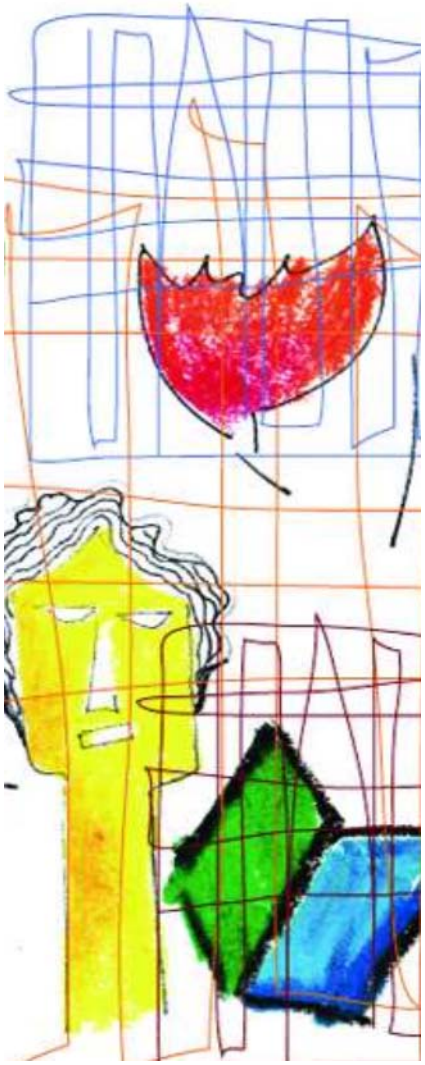

করে। তার মাথায় একটা জীর্ণ টুপি এবং গায়ে একটা পাতলা প্যাডেড জ্যাকেট। ফলে সে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙা ও লম্বা পাইপ। তার হাতজোড়ো আর আগের মতো লাল নয়, পাইন গাছের ছালের মতো পুরু ও খসখসে।
খুশিতে কী বলতে হবে বুঝতে পারিনি। শুধু বলতে পারলাম, 'ওহ! ইয়ুনথু, তুমি?...'
এরপর কত কথা বলতে চেয়েছি, সব কিছু মালার মতো বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, বড় পাখি, উচ্ছি রিঙ্গা মাছ, ঝিনুক, খাটাশ... কিন্তু কথা আটকে গেছে, ভাবনা আর কথা হয়ে বেরোচ্ছে না।
সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি। তার ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু একটি কথাও সে বলল না। তারপর বিনয়ের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলল, 'হুজুর।...'
আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না।
ইয়ুনথু মাথা ফিরিয়ে বলল, 'শুইশেং, হুজুরকে সালাম কর।' তারপর সে পেছনে লুকানো একটি ছেলেকে সামনে নিয়ে আসে। যেন ঠিক বিশ বছর আগের ইয়ুনথু। একটু ফ্যাকাশে, একটু পাতলা এবং গলায় রুপার চেন নেই। সে বলল, 'এটা আমার পাঁচ নাম্বার। কখনো সে লোকজনের সঙ্গে মেলে না, তাই একটু লাজুক ও ভিন্ন প্রকৃতির।'
বোধ হয় আমাদের গল্প শুনতে পেয়ে মা নেমে এলেন হোংজুকে সঙ্গে করে।
ইয়ুনথু বলল, 'বেগম সাহেবা, আপনার চিঠি পেয়েছি কয়েক দিন আগে। হুজুর ফিরে আসছেন জেনে কত খুশি হয়েছি...'
মা মজা করে বললেন, 'এত ভদ্রতা কিসের? আগে তোমরা খেলার সাথী ছিলে না? তুমি বরং আগের মতো তাকে দাদা ডাক।'
'ওহ, আপনি সত্যিই... সেটা খুব খারাপ ব্যাপার হবে। তখন ছোট ছিলাম বলে বুঝতে পারিনি।' বলতে বলতে সালাম করার জন্য শুইশেংকে সামনে ঠেলে দেয়...। কিন্তু লাজুক ছেলে বাপের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।
মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও তো শুইশেং? তোমার পাঁচ নাম্বার? আমরা সবাই অচেনা। এ জন্য তাকে দোষ দিতে পার না। হোংজু বরং তাকে খেলতে নিয়ে যাক।'
এ কথা শুনেই শুইশেংয়ের কাছে গেল হোংজু। সেও সহজেই বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। মা ইয়ুনথুকে বসতে বললেই সে কাচুমাচু হয়ে বসল। তারপর লম্বা পাইপ টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে কাগজের ঠোঙাটি বাড়িয়ে দিল এবং ইয়ুনথু বলল, 'শীতকালে আনার মতো তেমন কিছু নেই। কিন্তু এ মটরশুঁটিগুলো আমরা নিজেরাই শুকিয়েছি, হুজুর যদি দয়া করেন।'
দিনকাল কেমন যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে সে শুধু মাথা নাড়ল। সে বলল, 'দিনকাল খারাপ যাচ্ছে, এমনকি আমার ছয় নাম্বারটা পর্যন্ত কাজ করতে

পারে, তবু ভালো করে খাওয়াটা জোটে না... কোনো নিরাপত্তা নেই, সব ধরনের লোক পয়সা চায়, কোনো নিয়মকানুন নেই... ফসলও ভালো হয় না। ফসল ফলিয়ে বাজারে নিয়ে গেলে খাজনা দিয়ে আর টাকা থাকে না। আর বিক্রি না করলে জিনিস নষ্ট হয়ে যায়...'

সে মাথা নেড়েই চলেছে। সারা মুখে ভাঁজ পড়ে গেলেও একটুকুও নড়ছে না। যেন সে পাথরের মূর্তি। তার খুব গোসা, কিন্তু বোঝাতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর পাইপ তুলে নিয়ে সে নীরবে পাইপ টানতে থাকে।

তার সঙ্গে কথা বলে মা বুঝতে পারলেন, বাড়িতে তার অনেক কাজ তাই পরদিন চলে যেতে হবে। তার দুপুরের খাওয়া হয়নি বলে মা বললেন রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই খেয়ে আসতে। সে বাইরে যেতেই তার কষ্ট নিয়ে আমি ও মা দুজনেই মাথা নাড়ালাম, বহু ছেলেমেয়ে, দুর্ভিক্ষ, খাজনা, সৈন্য, দুর্বৃত্ত, বদ-মাতবর, আমলা সবাই তাকে মমির মতো শুকিয়ে ফেলেছে। মা বললেন, 'যা আমরা নেব না, তা তাকে দেয়া উচিত, সে খুশিমতো সবকিছু বেচে নেবে।'

সেই বিকালে সে কিছু কিছু জিনিস বেচে নেয়, তার মধ্যে ছিল চারটি চেয়ার, দুটো লম্বা টেবিল, একটা ধূপদানি, মোমবাতি এবং একটি দাঁড়িপাল্লা। সে চুলার ছাইগুলোও চেয়ে নিল। সে বলল, আমরা চলে যাওয়ার পর সে ওইগুলো নৌকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

সে রাতে আমরা আবার আলাপ করি। তবে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরদিন সকালে সে শুইশেংকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

আরো নয় দিন পর আমাদের যাওয়ার সময় হয়, সকালে ইয়ুনথু আসে। শুইশেং আর তার সঙ্গে আসেনি, সে শুধু পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে নৌকা দেখার জন্য। সারা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়, সে ক্ষেত্রে আমাদের কথা বলার কোনো সময় ছিল না। লোকজনও এসেছে বেশকিছু, কেউ বিদায় জানাতে, কেউ জিনিসপত্র নিতে, কেউ দুটোই করতে। নৌকায় চড়তে চড়তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তার মধ্যে সে বাড়ির জীর্ণ পুরনো, ছোট-বড়, হালকা-পাতলা সব জিনিস সাফ হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় যখন যাত্রা শুরু করি, তখন নদীর উভয় তীরের সবুজ পাহাড় কালো হয়ে এসেছে, নৌকার পেছনে সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

হোংজু এবং আমি জানালা দিয়ে বাইরে অস্পষ্ট দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে 'চাচা আমরা কখন ফিরে যাব?'

ফিরে যাব! তুমি কি বেরুনোর আগেই ফিরে যাবার কথা বলতে চাও?

উদ্বেগে কালো চোখজোড়া বড় করে সে তাকায়, তারপর বলে, কিন্তু শুইশেং যে আমাকে ওদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছে...

মা এবং আমার দুজনেরই খারাপ লাগে। আবার ইয়ুনথুর কথাও ওঠে। মা বললেন, বাঁধাছাঁদা শুরু হওয়ার পর থেকে বিনকার্ড দোকানের মিসেস ইয়াং প্রতিদিন আসত। পরশু সে ছাইয়ের

স্তূপ থেকে এক ডজন থালাবাসন বের করে। তার যুক্তি ছিল, ইয়ুনথু ওখানে সেগুলো লুকিয়েছে, যাতে যখন ছাই নিতে আসবে, তখন সেগুলো সে নিয়ে যেতে পারবে। ওইগুলো খুঁজে পাওয়ার পর মিসেস ইয়াং নিজে নিজে খুব খুশি হয়ে ওঠে। তার ওই পা নিয়ে তিনি কত জোরে দৌড়াতে পারেন তা এক দেখার বিষয় ছিল। ধীরে ধীরে আমার পুরনো বাড়ি পেছনে চলে যাচ্ছে। পাহাড়-নদী দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি বুঝতে পারি, আমার চারদিকে গড়ে উঠেছিল বাধার দেয়াল, যা সঙ্গীদের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করেছে। এ অবস্থা আমাকে পুরোপুরি মনমরা করে দেয়। আগে তরমুজের ক্ষেতে গলায় রুপার চেনওয়ালা সেই ছোট্ট নায়কের উপস্থিতি ছিল দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল। এখন তা হঠাৎ হারিয়ে গেছে, আমার মনোবেদন বেড়েছে।

মা এবং হোংজু ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি শুয়ে থাকি। শুনতে পাই নৌকার নিচে জলের কলধ্বনি। বুঝতে পারি আমি নিজের পথে এগিয়ে চলেছি। আমার মনে হলো, ইয়ুনথু এবং আমার মধ্যে বাধার প্রাচীর গড়ে উঠলেও শিশুদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। হোংজু এই মাত্র শুইশেংয়ের কথা ভাবছিল। আমার বিশ্বাস, তারা আমাদের মতো হবে না, নিজেদের মধ্যে বাধার দেয়াল গড়ে উঠতে দেবে না। কিন্তু আমার তাদের পছন্দ হবে না, কেননা তারা সগোত্রীয় হতে চায়, পেতে চায় আমার মতো বাঁধাধরা জীবন। বোকা বলা পর্যন্ত ইয়ুনথুর মতো কষ্ট করতে চায় না, বা অন্যদের মতো তুচ্ছ প্রমোদেও গা ভাসিয়ে দিতে চায় না। তাদের নতুন জীবন প্রয়োজন, যে জীবন আমরা ভোগ করতে পারি না।

এ আশার আলোয় আমার হঠাৎ ভয় ধরে যায়। ইয়ুনথু যখন ধূপদানি এবং মোমবাতির কথা বলেছে, তখন গোপনে আমার খুব হাসি পায়। সে এখনো মূর্তিপূজা করে এবং মন থেকে তা মুছে ফেলতে পারে না। যে আশার কথা বলেছে, তা আমার তৈরি মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র পার্থক্য, সে যা চায় তা হাতের কাছাকাছি আর আমি যা চাই তা সহজে পাওয়ার নয়।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ বালুতট, উপরে গভীর নীলাকাশে গোলাকার সোনালি চাঁদ। আমার মনে হয় আশা আছে কি নেই বলা যায় না। এটা পৃথিবীর ওপর পথগুলোর মতো। আসলে পথ দিয়ে পৃথিবীর শুরু হয়নি। কিন্তু অনেক লোক যখন একই পথ দিয়ে যায়, তখন পথ তৈরি হয়ে যায়।

লেখক পরিচিতি

আধুনিক চীনা সাহিত্যের স্থপতি কবি লু স্যুন (১৮৮১-১৯৩৬) ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে ম্যাক্সিম গোর্কির সমসাময়িক। তার রচনাগুলোর সৃজনশীলতা, জীবনজিজ্ঞাসা, বোধ ও চেতনা, সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনামূলক বস্তুবাদের প্রক্রিয়াও মিলে যায় গোর্কির সঙ্গে। প্রথম জীবনে লু স্যুন ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রী। পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্ট হয়েছেন। তার প্রথম দিককার রচনা মূলত ছোটগল্প।

১৯১৮ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় তার 'এক পাগলের ডায়রি'। শুধু লু স্যুনের নয়, আধুনিক চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে সেটাই প্রথম ছোটগল্প। তারপর 'আ কিউ-এর সত্য ঘটনা', 'নববর্ষে আত্মদান'—এর মতো কয়েকটি গল্প লেখেন, যা চীনের পুরনো অন্ধকার সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে আক্রমণ করে। হয়তো এ কারণেই জীবনের বোধ আর ব্যাপ্তির জন্যই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারেন, 'আমার গল্পগুলো শিল্পকর্ম নয়।'

চীনা জনগণের সাহিত্যের ঐতিহ্যে লু স্যুনের রচনাগুলো মূল্যবান সম্পদ এবং তা শুধু চীনা মানচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিপ্লব-পূর্ব চীনের যে সমাজচিত্র তার গল্পে রূপলাভ করেছে, সে চিত্র পুঁজিবাদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ পৃথিবীর সে কালো সমাজে আজও দারুণভাবে দৃশ্যমান। তার প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রেই এটি সামান সত্য।

www.alfatahbd.com

আলোকিত মানুষের লক্ষ্যে
শিক্ষার্থীদের কল্যাণে
আল ফাতাহ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
আল ফাতাহ পাবলিকেশন্সের পক্ষ থেকে জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ঈদ
মুবারক

আন্তর্জাতিক গৌরবময় সম্মাননা অর্জনে
আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স

BID

বিশ্বের ১১৬টি দেশের বিভিন্ন প্রকাশনা, কোম্পানি ও সংস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ গুণগতমান, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, উন্নত গ্রাহক সেবা, সফল নেতৃত্ব, উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতার শ্রেষ্ঠ আদর্শের স্বীকৃতিস্বরূপ Business Initiative Directions (BID) কর্তৃক '17 International Quality Convention GENEVA 2015' অনুষ্ঠানে **আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স** অর্জন করেছে 'সেঞ্চুরি ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি ইআরএ (ERA) অ্যাওয়ার্ড'।

আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এ সাঈদ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে 'সেঞ্চুরি ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি ইআরএ (ERA) অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' গ্রহণ করছেন।

AL FATAH PUBLICATIONS
Corporate Office : 260 Malibag (4th floor), Dhaka-1217 ; Ph : 8323010, Email : alfatahpb@gmail.com
Sales : 34 North Brook Hall Road, Distribution : 14 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka; Ph : 7111500

ISO 9001 : 2008

কবিতা

যে রমণী ভালোবেসেছিল

জাফরুল আহসান

যে রমণী ভালোবেসেছিল ভালোবাসা দেবে বলে
প্রিয়তমা সেও বন্ধ কবাটে কড়া নাড়ে ছলে
চারিদিকে শুধু ভুলের পসরা সাজানো গোছানো
গঞ্জনা আর ঘৃণার প্রলোপে রমণী জড়ানো।

রমণীর চোখে ব্যাকুল ঈর্ষা ভুল তৃষ্ণায়
লালচে অধর কেঁপে কেঁপে ওঠে নীল বেদনায়
অনাবাদি জমি চাষ করে যাই খুলি কামনার গিঁঠ
ফলে না ফসল বীজের ভেতর বিষাক্ত কীট।

তবে কি আমার দৃষ্টিতে ভুল চিহ্ন লেগে আছে
সত্য সন্ধানে কার কাছে যাব? ভুল হয় পাছে
যে রমণী ভালোবেসেছিল ভালোবাসা দেবে বলে
তার হৃদয়ের বসতভিটাটি জ্বলে কী অনলে।

তপস্যা

গোলাম কিবরিয়া পিনু

তুমুল ঝগড়ার মধ্যে
জামা-কাপড়ের রং চটে গেল–

নদী ও ঝরনার কলধ্বনি আর থাকল না
মাংসপেশির মধ্যে পড়ল টান
গান হয়ে উঠল গাধার কর্কশ শব্দ
এভাবে কাটাতে পারি কি অব্দ?

আমাদের প্রশস্ততা
আমাদের বিশ্বস্ততা
কোন্ মাংসে জারিত হলো
এই অমাবস্যায়!
দিন কাটবে এখন কোন্ তপস্যায়?

এ হৃদয় মাধবীলতার

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী

পদচিহ্নহীন পথে যেন প্রিয় পদরেখা
এ হৃদয় মাধবীলতার, তমসুকে লেখা
মনন-পিয়াসী বুনো শিকারির প্রশস্ত ঘরে
এ হৃদয় যেন গোপন ক্যামেরায় অনায়াসে ধরা পড়ে
এ হৃদয় শুধু কাব্য-কলি কাব্য কথকতার
এ হৃদয় যেন মায়াবী হরিণ, এ হৃদয় মাধবীলতার।

এ হৃদয় যেন তামাটে মাটিতে আকাপথের ধারের মুখ
মাধবীলতার নন্দিত ছায়া দাঁড়িয়ে থাকে সম্মুখ
মেঘের আকাশে অপ্রকাশিত রোদ মাধবীলতার চিঠি
জোনাকির মতো আঁধারে জ্বলে গোপনে মিটিমিটি

বৃষ্টিভেজা ঘাসের সকালে পদচিহ্নহীন পথে
যেন এলো মাধবীলতা অধরা পুষ্পরথে
যেন এলো রক্তকণিকার ভেতর দিয়ে জলপাই বীজ
এ হৃদয় যেন মাধবীলতার, আমি যেন তার মনোসিজ।

মহেশখালীর মুখ

মিজান মনির

সমুদ্রের গর্জন দূর পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে
ছড়িয়ে পড়ে তামাম লোকালয়ে- জেলেদের ছোট্ট নৌকো
দোল খায় ঢেউয়ের পরতে পরতে,
তেমনি সারাক্ষণ দোলা দেয় হৃদয়ে আমার মহেশখালীর চিহ্ন।
পাহাড়ের সব নীল অশ্রু-ঝরনাধারার মতো গড়িয়ে পড়ছে নীচে
মিশে যেতে সমুদ্রের সাথে।
তদ্রূপ অশ্রু ঝরে গড়াগড়ি করে বুকে আমার
শুধু মহেশখালীর রূপের লাবণ্যময়ী ভালোবাসার টানে।
পাহাড়ের শুষ্ক ঠোঁটে আনমনা হয়ে খেলা করে মেঘের ছায়া,
সূর্যাস্তের ক্লান্ত আলো
সমুদ্রের গর্জনের সাথে মিশে যায়
রূপালী সৈকতের কাছে।
এমনি আনমনা থাকে দু'নয়ন আমার
কেবল ভাসে শুধু মহেশখালীর মুখ।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে সকলকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

বদর উদ্দিন আহমদ কামরান

সাবেক মেয়র

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

সভাপতি

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ

কবিতা

মানুষবিষয়ক

সোহরাব পাশা

সব আখ্যানের অন্তরালে থাকে দীর্ঘ হাইফেন

মানুষের আত্মপরিচয় সে মানুষ
মানুষ ধারণ করে দিন আর রাত্রির স্বভাব
খুন করার আগেও সে স্বপ্ন-সৌন্দর্যের চর্চা করে
কারণ নিজের মৃত্যুকে মানুষ বিশ্বাস করে না,
যদিও তার শুদ্ধ পাঠ থাকে 'মানুষ মরণশীল'।
অন্ধদের পৃথিবী দেখেও স্বীকার করে না নিজের ভূগোল
ভুল স্বপ্ন মানুষকে অন্ধকারে রাখে;
এবং মানুষই প্রথম রাত্রির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়
হেঁটে যায় পবিত্র সকালে।

মানুষ প্রকৃতি

আসলাম সানী

মানুষই ধরতে পারে না– মানুষের কারসাজি! আর–
প্রকৃতির খেলা– সে তো বর্ণিল,
নদী-জল-বায়ু, মেঘের কত কারিশমা দেখি

বৃক্ষ-ফুল-লতা-গুল্ম, সাগরের উচ্ছলতা
ধ্যানমগ্ন পাহাড় উদ্যত শিরে দাঁড়ায়
ভূমিকম্পে– সেও ভীত-ত্রস্ত।

সময়-অসময় কবিতার ভাঙা-গড়া–

সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত,
সরল অঙ্কেও কত জটিল ভাগ-গুণ-লসাগু।

দেহের অ্যালজেব্রা সেই তো জানে–
মানুষের চেয়ে গভীর প্রকৃতির সীমা-পরিসীমা রহস্য অসীম?

যদি তোমার কোন ঈশ্বর থাকে

প্রবীর চন্দ

আগুন ছুড়োনা আর কোন গায়ে
দিও না কোন পেট্রোল, ককটেল কোন পথচারীর
শরীর ও মনে। বরং
হাতে নাও জল; কৃষক যেমন জল দেয় রাতদিন ধরে
বোরো ধান ক্ষেতে নেমে আসা দিগন্ত পারে
তুমিও ভুল পথ থেকে নেমে আসো, মমতার হাত ধরে
পলাশের বনে,
সেখানে ভালোবাসা জন্ম নেয় এই মাসে
শুঁয়ো থেকে প্রজাপতি হয় এবং জাতকের চোখে
ফুটে ওঠে মেঘের ঝরনাধারা, রঙ ধনু হাসি
গাছে গাছে ফুল, লতিকায় প্রেম, সবুজ-বীথি
দিগন্ত থেকে উড়ে আসে কবিতার
মিহিদানা...
তুমি আগুন ছুড়ো না কোন ট্রাকে, কোন বাসে, বরং
দহন যন্ত্রণা মনে করে, তুমি ক্ষমা চাও তারস্বরে
পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপী তুমি
হাঁটু গেড়ে কেঁদে ওঠো
যদি তোমার কোন ঈশ্বর থাকে।

অসময়ের ভাবনা

মাসুদ অর্ণব

শরতের কবিতা লিখব ভাবতে ভাবতে
হেমন্ত ভাঙা দরজায় কড়া নাড়ে।
হেমন্তের কবিতা লিখব ভাবতে ভাবতে
শীতে হয়ে যাই জবুথবু।
শীতের কবিতা লিখব ভাবতে ভাবতে
বসন্ত বসন খুলে দাঁড়ায়।

কালক্ষেপণে সব ঋতু হয়ে যায় অন্যের ঘরনি;
দূরে থেকে ধরে রাখার নাম
দেয়া যেতে পারে পরকীয়া
এ বিষয়ে বিশদ জানা যায় অন্যের ঘরে গিয়া।

পবিত্র মাহে রমজান সিয়াম সাধনার মাস, সকল অনাচার থেকে সংযম ও মুক্তি লাভের উত্তম উপায় এ মাস। মহান বিধাতার পরম রহমত, মাগফেরাত ও নাজাত লাভের জন্য সবাই ইসলামের আলোকে আলোকিত হোন। আনন্দে উদ্বেলিত হোন সমাগত পবিত্র ঈদুল ফিতর-এ। সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা সহ মুসলিম উম্মাহ'র ও টাঙ্গাইল পৌরবাসীকে জানাচ্ছি-

ঈদ মোবারক

টাঙ্গাইল পৌরসভা

পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা করুন

- θ নিয়মিত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন, পৌরসভার উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- θ আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- θ আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- θ পানির অপচয় রোধ করুন।
- θ ঘর-বাড়ি নির্মাণে পৌরসভার অনুমতি গ্রহন করুন।
- θ টাঙ্গাইল পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত রিক্সা-অটোরিক্সা চালাবেন না।
- θ রিক্সা-অটোরিক্সা'র চালকগণ টাঙ্গাইল পৌরসভার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবেন না।
- θ যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে যানজটের সৃষ্টি করবেন না।
- θ পৌরসভার জমি অবৈধভাবে দখল করবেন না।
- θ রাস্তার উপর অবৈধ দোকান গড়ে তুলবেন না।
- θ দোকানের পাশে ষ্ট্যান্ডবোর্ড স্থাপন করে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

মনে রাখবেন-এ পৌরসভা আপনার।
একে সুন্দর করার দায়িত্বও আপনার।

মানবেন্দ্র পাল মিল্টন
মেয়র(ভারপ্রাপ্ত)
টাঙ্গাইল পৌরসভা।

প্রবন্ধ

গুন্টার গ্রাস ও তার টিন ড্রাম

ড. রাশিদ আসকারী

স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে, জাজ-সঙ্গীত শুনে, প্রিয় পানীয় 'নোবেল' গ্রাপপার পেগে চুমুক দিয়ে দিয়েই ৮৭ বছরের একটা দীর্ঘ ইনিংস খেলছেন গুন্টার গ্রাস (১৯২৭-২০১৫) হেসে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন মনে হলেও তার কর্মযোগ কিন্তু নেহাত কম নয়, কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাজ্ঞজনের ভাবনায় গ্রাস 'নীরবতা ভঙ্গকারী' এক অকুতোভয় কলমযোদ্ধা। ওরহান পামুক, জন আরভিং কিংবা সালমান রুশদির মতো জাঁদরেল লেখকরাও কুর্নিশ করেছেন সদ্যপ্রয়াত এই সাহিত্যিককে। তার জনপ্রিয়তা এবং তাকে নিয়ে বিতর্কের পাল্লা কোনোটাই কম ভারী না হলেও দিন শেষে সব ম্লান হয়ে যায় তার লেখার গুরুত্বের কাছে। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে দুই জার্মানিরা পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়েও তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন 'জার্মানির বিবেক' (Conscience of Germany)। জার্মানির সর্বাধিক পরিচিত লেখক বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিসহ সারা পৃথিবীর সাহিত্যাঙ্গনের তোলপাড় সৃষ্টি করেন। অবশেষে শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে টিন ড্রাম (The Tim Drum) বাজিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক সাহিত্য পুরস্কার নোবেল জয় করে আনেন। গ্রাসের নোবেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে, বিজ্ঞ নোবেল কমিটি মনে করে জার্মান সাহিত্য শতাব্দীপ্রাচীন ভাষিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পর এক নতুন সূচনার মুখ দেখল। গ্রাসের সাহিত্যকর্মের

আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান

জয়বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক
অনাবিল সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে

৯ নং বল্লা ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনসাধারণকে জানাই-

ঈদ মোবারক

হাজী চান মাহমুদ পাকিরা
চেয়ারম্যান, ৯ নং বল্লা ইউনিয়ন পরিষদ ও সভাপতি, বল্লা বাজার শিল্প ও বণিক সমিতি
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

পবিত্র ঈদুল ফিতর প্রতিটি মানুষের জীবনে নিয়ে
আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

এক মাস সিয়াম-সাধনা শেষে বৃহতম এ উৎসবের দিনটি উপলক্ষে দৈনিক যায়যায়দিনের সকল কর্তকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, কলাকৌশলী, ফ্রেন্ডস ফোরামের সকল সদস্যসহ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ও বরিশাল বিভাগ ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সকল সদস্যদের জানাই

অভিনন্দন ও মোবারকবাদ

আলহাজ্ব ইমান আলী শরীফ বাবুল
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় কমিটি।
বিভাগীয় সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।
সাধারণ সম্পাদক
বরিশাল বিভাগ ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন।
আহ্বায়ক
ফ্রেন্ডস ফোরাম, বরিশাল জেলা কমিটি।

অনেকখানিই তাক করেছে নাৎসি শাসনামল, যুদ্ধের বিভীষিকা এবং জার্মান জাতিগত অপরাধবোধ। নাৎসি অতীতের সঙ্গে জার্মানির জটিল বহুমাত্রিক সম্পর্ক তিনি মূর্ত করে তুলতে পেরেছিলেন তার রচনার মধ্য দিয়ে। তার প্রথম উপন্যাস The Tin Drum (১৯৫৯) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই গ্রাস পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। উপন্যাসটি যা এখনো তার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত, বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক পুনর্গঠন এবং স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এটি রচনার সময় পর্যন্ত জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে থার্ড রাইখ, বিশেষ করে হলোকাস্ট নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিল। গ্রাস তার উপন্যাসে দৃষ্টান্তসহযোগে থিওডর অডর্নো-কথিত 'অতীতের ভেতর দিয়ে কাজ করা' তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি নিরন্তর তার দেশবাসীকে কালিমালিপ্ত নাৎসি অতীত থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। থার্ড রাইখের দীর্ঘ অন্ধকারের নিচে থাকার অভিজ্ঞতাই মূলত তাকে ১৯৯০ সালে জার্মানি একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিল। সুইডিশ একাডেমির বিবেচনায় (১৯৯৯) গ্রাস এমনই একজন লেখক 'যার আনন্দময় কালো উপকথাগুলো ইতিহাসের বিস্মৃত বদন অঙ্কন করে।'

গ্রাসের জনপ্রিয়তম উপন্যাস The Tin Drum যদিও প্রকাশের পরপরই অশ্লীলতা ও ব্লাসফেমির অভিযোগে আক্রান্ত হয়েছিল, কালক্রমে তা সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে এবং ইউরোপীয় 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর ভিত্তিভূমি হিসেবে অভিনন্দিত হয়। এটি তার ড্যানজিগ ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ, অন্য দুটি : Cat and Mouse এবং Dog years। এট্রিলজির ভেতরে এমনকি সমকালীন ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে জাদুবাস্তবতার চাবি-টেক্সট হলো দ্য টিন ড্রাম। তবে ডগ ইয়ার্সেও তার জের বেশ খানিকটা থেকেই যায়। জাদুবাস্তবতার ব্যাপারটি মুখ্যত দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্য ভুবনের একটি একান্ত বিষয় হিসেবে বিকশিত হলেও গ্রাসের টিন ড্রাম ইউরোপেও এর বাদ্য বাজার বেশ সরবেই। রূপক এবং সমকালীন বিষয়াবলির এক শৈল্পিক বুনন উপন্যাসটিকে একটি বিশ শতকের ক্লসিকে উন্নীত করে।

গুন্টার গ্রাসের জাদুবাস্তবতা নিয়ে একটি ডিসকোর্স নির্মাণ বা নির্মাণের আগে জাদুবাস্তবতা প্রপঞ্চটির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে একটি প্রাক-ধারণা আবশ্যক। প্রখ্যাত জার্মান আর্ট ক্রিটিক ফ্রাঞ্জ রো ১৯২৫ সালে প্রথমবারের মতো 'জাদুবাস্তবতা' শব্দটি ব্যবহার করেন ঐক্ষিক শিল্পকলার (Visual art) ক্ষেত্রে। তিনি এমন এক শৈলীর কথা বলার চেষ্টা করেন যা জাগতিক বিষয়াবলির চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে চরম বাস্তববাদ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং ভেতরকার রহস্য উদঘাটনের জন্য দৈনন্দিন বাস্তবতার সঙ্গে জাদুবাস্তব উপাদানের মিশেল দিয়ে এক রহস্যে ঘেরা জগৎ সৃষ্টি করে। জাদুবাস্তবতা পুরোপুরি জাদু নয় আবার পুরোপুরি বাস্তবও নয়। এটা এক নতুন ধরনের বাস্তবতা। আর তা বাস্তবতার প্রচলিত ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রো 'জাদুবাস্তব' অভিধাটি এক বিশেষ চিত্রকলার বয়ানে ব্যবহার করেন যা অভিব্যক্তিবাদের (Expressionism) অসংযত প্রয়োগের পর বাস্তববাদে (Realism) প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল বস্তুর আন্তর বাস্তবতা প্রকাশের জন্য বস্তুর বহিঃকাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। রো-এর মতে জাদুবাস্তবতা কোনো বিষয়ের বাইরের দিকটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করে যার মাধ্যমে বিষয়টির অন্তর্গত চৈতন্যের দিকটি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।

রো শনাক্ত করেছেন জাদুবাস্তবতার যথাযথ খুঁটিনাটি, এর মসৃণ ফটোগ্রাফিক স্পষ্টতা এবং যৌক্তিক জগতের 'জাদুময়' প্রকৃতির রূপায়ণ। রো বিশ্বাস করতেন যে জাদুবাস্তবতা পরাবাস্তববাদের (Surrealism) সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বেশ আলাদাও বা রো-এর জাদুবাস্তবতার তত্ত্ব নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ভীষণভাবে দোলা দেয়। এবং এটি একটি শিল্প আন্দোলনের মাত্রিকতা লাভ করে কারণ, বাস্তব চিত্রকলার সঙ্গে অবাস্তব জাদুকরী উপাদানের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে গভীরতর বাস্তবতার অন্বেষণ এই শিল্পরীতির অন্বিষ্ট হওয়ায় পরবর্তীতে এর সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ললিতকলার অন্যান্য শাখায়ও বিশেষ করে কথাসাহিত্যে এক নতুন বাস্তবতার (a new objectivity) সন্ধান দেয়। তাই সাম্প্রতিককালের জাদুবাস্তবতার ব্যবহার ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি প্রসারিত হয়েছে এর আর্থসীমা। সেই সঙ্গে ঘটেছে এর অর্থান্তর। প্রপঞ্চটিকে সংজ্ঞায়িত করার জটিলতা নিয়ে মেক্সিকান সমালোচক লুই লিয়েল চমৎকারভাবে রসিকতা করেছেন : 'তুমি যদি ব্যাখ্যাই করতে পারলে, তাহলে সেটা আর জাদুবাস্তবতা নয়।' তাই বলে লিয়েল নিজেও কিন্তু জাদুবাস্তবতার সংজ্ঞা দিতে ছাড়েননি। তার ভাষায় : 'জাদুবাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে না ভেবেই প্রত্যেক লেখক মানুষের মধ্যে দেখা বাস্তবতাকে প্রকাশ করেন। আমার কাছে জাদুবাস্তবতা হলো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি।' তিনি আর্তুর পিয়েত্রির একটি বিখ্যাত উক্তিকে তার জাদুবাস্তব ভাবনার মূল সুর হিসেবে গণ্য করতেন যেখানে বলা হয়েছে : 'মানুষ বাস্তব ঘটনাবলি পরিবেষ্টিত একটি রহস্য।' এ রহস্যময়তা ও বাস্তবতাই জাদুবাস্তব সাহিত্যধারার মৌল বিষয়।

রো-এর জাদুবাস্তব শিল্পকলার রেসিপি ইউরোপ থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় প্রবেশ করে বস্তুত অনুবাদের বাহনে চেপে। রূপ পাল্টে হয়ে ওঠে সাহিত্যিক জাদুবাস্তবতা। রো-এর বই ১৯২৭ সালে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হলে বছরখানেকের মধ্যেই জাদুবাস্তবতা বুয়েন্স আয়ার্সের সাহিত্যচক্রের ইউরোপীয় লেখকদের গদ্যে ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে। হোহে লুই বোর্হেস ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের জাদুবাস্তবতার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন, বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তার প্রথম জাদুবাস্তব গ্রন্থ Historia universal de la infamia-এর মাধ্যমে। শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি প্যারিস, বার্লিনের সঙ্গে আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার লেখকদের যোগাযোগ ছিল এবং পরাবাস্তববাদের (Surrealism) মতো শিল্প-সাহিত্যিক আন্দোলনগুলো তাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করত। তাই খুব সহজেই জাদুবাস্তবতা দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্য ভুবনে স্থিত ও বিকশিত হওয়া শুরু করে। বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক মাত্রিকতা প্রাপ্ত হলেও জাদুবাস্তবতা জন্মসূত্রে একটি হিস্পানি (Hispanic) সাহিত্যধারা যা বস্তুত স্পেনীয় সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিক-বাস্তব ঐতিহ্যের অনুবর্তন। তবে সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা কি ল্যাটিন আমেরিকার একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি নাকি উত্তরাধুনিক বিশ্বের এক সর্বজনীন সৃষ্টি– ভাবা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে এন্তার মতভেদ থাকতে পারে। তবে সেটি কোনো বড় কথা নয়। মোদ্দা কথা হলো, জাদুবাস্তব নামধেয় এ অদ্ভুত কথাসাহিত্যিক রীতিটি ল্যাটিন আমেরিকায়ই প্রথমত সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং পরে অনুবাদ আর সাহিত্যিক আত্মসাৎকরণের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়। এভাবে জাদুবাস্তবতা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনেক অ-স্পেনীয় লেখকও জাদুবাস্তব রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গুন্টার গ্রাস যাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

জাদুবাস্তব কথাসাহিত্যের কোনো স্থির রূপরেখা দাঁড় করানো সম্ভব না হলেও কিছু প্রধান প্রবণতা তো চিহ্নিত করা যেতেই পারে।

এক. অবাস্তব/উদ্ভট/অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত উপাদান : জাদুবাস্তবতা ভিন্নতর বাস্তব সুরে অবাস্তব ঘটনাবলির ছবি আঁকে। এটি রূপকথা, নীতিকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীকে সমকালিক সামাজিক বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিক করে তোলে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ওপর আরোপিত বৈশিষ্ট্যাবলি যেমন– শূন্যে ভাসমানতা, টেলিপ্যাথি এবং স্পর্শহীন সঞ্চালন আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার গভীরতা মাপতে সাহায্য করে।

দুই. বাস্তবানুগ সেটিং : নিরেট বাস্তব পটভূমিতে কাল্পনিক উপাদানের অস্তিত্ব জাদুবাস্তবতার ভিত্তি সরবরাহ করে। লেখকরা নতুন পৃথিবী রচনা করেন না, কিন্তু এ পৃথিবীর উদ্ভটত্ব প্রকাশ করেন। যেমন– গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তার One hundred years of Solitude উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার এক যুগলবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যেখানে অতিপ্রাকৃতিক জগৎ প্রাকৃতিক পরিচিত জগতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

তিন. লেখকী বাকসংযম : অস্থির কল্পজগৎ সম্পর্কে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান ইচ্ছাকৃতভাবে ঠেকিয়ে রাখাকেই বলা যেতে পারে লেখকী বাকসংযম (Authorial reticence)। ন্যারেটর নিঃস্পৃহ। কাল্পনিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির কারণে গল্প যৌক্তিকভাবে এগিয়ে চলে যেন অসাধারণ কিছুই ঘটেনি।

চার. প্রাচুর্য (Plentitude) : একটি জটিল, অনুপুঙ্খ এবং অতিরঞ্জনমূলক ন্যারেটিভ রীতি

বিশুদ্ধ চিনির প্রতিশ্রুতি...

এস. আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডা. লিঃ

এস. আলম সিমেন্ট লিঃ
সেরা প্রযুক্তির সেরা উপহার

জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরী
এস. আলম ভেজিটেবল অয়েল লিঃ

এস. আলম স্টিলস লিঃ

এস. আলম লাক্সারি চেয়ার কোচ সার্ভিস লিঃ

এস. আলম হ্যাচারি লিঃ

S. ALAM GROUP
এস. আলম গ্রুপ
www.s.alamgroupbd.com

কর্পোরেট অফিস:
এস. আলম ভবন, ২১১৯, আছাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

থাকে কিউবীয় জাদুবাস্তব লেখক কার্পেনতিয়র বারোকের (baroque) সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'The Baroque and the Marvelous Real' প্রবন্ধে তিনি বারোক বলতে বিভ্রান্তিকর অনুপুঙ্খের অসাধারণ প্রাচুর্যের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, কাঠামো নিয়ম বিসর্জনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

পাঁচ. হাইব্রিডিটি (Hiybridity) : জাদুবাস্তব গল্প-কাঠামো বৈশিষ্ট্যসূচকভাবেই বাস্তবতার বিবিধ সংকর স্তর নিযুক্ত করে যা শহুরে এবং গ্রাম্য এবং পশ্চিমা ও দেশজের মতো বৈপরীত্যের মাঝে অংশ নেয়। উদাহরণস্বরূপ– জুলিও কর্তাজারের La noche boca arriba উপন্যাসে একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একই স্থানে, শতাব্দীপৃথক দুই ভিন্ন সময়ে দুটো বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তার স্বপ্নজগৎ এ দুটো বাস্তব জগৎকে যুক্ত করে। জাদুর এক সামান্য পরশ বাস্তবতার বিবিধ স্তরের সংযোগসেতুকে সম্ভবপর করে তোলে।

ছয়. মেটাফিকশন (Metafiction) : জাদুবাস্তবতার এ দিকটি সাহিত্যে পাঠকের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাস্তবতার ওপর উপন্যাসের অভিঘাত, ফিকশনের ওপর বাস্তবতার এবং এ দুয়ের মধ্যে পাঠকের ভূমিকা অনুসন্ধান করাই বস্তুত মেটাফিকশনের কাজ। অধিকন্তু, একটি মুখ্য জাদুবাস্তব প্রপঞ্চ 'textualization'-এর বাস্তবায়নে দুই ভাবে কাজ করে এ মেটাফিকশন শৈলী প্রথমত যখন একজন কাল্পনিক পাঠক পড়ার সময় গল্পের ভেতরের গল্পে ঢুকে পড়ে এবং পাঠক হিসেবে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে আত্মসচেতন করে। দ্বিতীয়ত, যখন গ্রন্থিক-বিশ্ব পাঠকের বিশ্বের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

সাত. রহস্যের বর্ধিত সচেতনতা (Heightened awareness of mystery) : এটি জাদুবাস্তবতার একটি প্রধান দিক যেটি নিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই একমত। জাদুবাস্তব সাহিত্য একটি তীক্ষ্ণতর/তীব্রতর মাত্রায় পঠিত হতে চায়। যেমন মার্কেজের One Hundred of Solitude পঠনের ক্ষেত্রে পাঠককে অবশ্যই জীবনের গূঢ় রহস্যের অর্থ খোঁজার জন্য প্রথাগত গল্প-কাঠামো, যুক্তিগ্রাহ্যতা– প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে রহস্যের এক বর্ধিত সচেতনতার স্তরে উঠতে হবে।

আট. রাজনৈতিক সমালোচনা (Political Critique) : জাদুবাস্তবতা সমাজ, বিশেষত এলিট শ্রেণির এক প্রচ্ছন্ন সমালোচনা ধারণ করে। এটি প্রধানত ভৌগোলিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিকীকৃত শ্রেণিসংশ্লিষ্ট একটি সাহিত্যরীতি। সুতরাং জাদুবাস্তবতার 'বিকল্প বিশ্ব' (alternative world) বাস্তববাদ, স্বভাববাদ, আধুনিকতাবাদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা সংশোধনের জন্য কাজ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাদুবাস্তব টেক্সট 'নাশকতামূলক টেক্সট', সামাজিকভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক। বিকল্পরূপে, সামাজিকভাবে কর্তৃত্বময় শক্তিগুলো তাদের 'পাওয়ার ডিসকোর্স' থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যও জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ ঘটাতে পারে।

নয়. উত্তরাধুনিকতাবাদ (Postmodernism) : জাদুবাস্তবতা এবং উত্তরাধুনিকতাবাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ধারণা দুটো পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের মধ্যেই আত্মবাচকতা, মেটাফিকশন, সারগ্রহিতা, আতিরেক্য, আধিক্য, পরিত্যাগ, আন্তগ্রন্থিকতা, প্যারডি, চরিত্র এবং আখ্যানের অবলুপ্তি, সীমানামোচন, পাঠকের বিস্থিতিকরণ প্রভৃতি প্রবণতা লক্ষণীয়। অধিকন্তু জাদুবাস্তবতা এবং উত্তরাধুনিকতাবাদ উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কিছু সাধারণ বিষয়ে একমত, যেখানে সময় ও মনোযোগের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-শৃঙ্খলা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল জাদুবাস্তব যুক্তি-শৃঙ্খলা যেমন– পাঠকের টেক্সটুয়ালাইজেশন এবং মেটাফিকশন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

গুন্টার গ্রাসের দ্য টিন ড্রাম অস্কার মাতজেরাত নামক এক ক্ষুদ্রকায় ড্রামবাদকের পরাবাস্তব জীবনের স্মৃতিনির্ভর। এ অদম্য বাদকের চিৎকার দিয়ে গ্লাস ভেঙে ফেলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তার দৈহিক বিকাশ একটি তিন বছর বয়সী বালকের দেহের মতো হলেও তার চিন্তায় ভিন্ন জগৎ থেকে বাণী সংগ্রহের এক অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল। তবে তার দৈহিক ক্ষুদ্রত্ব কখনই তার কাল্পনিক তীর্থযাত্রার পথে বাদ সাধেনি। আর ঠিক সেখানেই এ চমৎকার উপন্যাসটির ন্যারেটিভ এগিয় চলে। ক্ষুদে অস্কারের গল্প জটিল আবর্তে নিমজ্জিত হয় যখন সে দুজনকে বাবা হিসেবে পায় (একজন পোলিশ এবং অন্যজন জার্মান নাৎসি)। গ্রাস আমাদের নিয়ে যান এক বিচিত্রতা, হাস্যরস, সহিংসতা এবং উদ্ভটত্বের পৃথিবীর ভেতর দিয়ে। আমরা দেখি প্রেমিক, বিনোদনকারী বামন, খৃস্টবৎ দলনেতা নাৎসি পশু, জাজ-তারকা এবং একজন অভিযুক্ত খুনি অস্কারের বিজয়োল্লাস এবং যন্ত্রণাগুলোর ভেতরকার চিত্র। ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ এবং এর থেকে নিষ্কৃতির চিত্র অঙ্কনকারী উপন্যাস টিন ড্রাম কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর মনে হলেও সব সময় এক চোখ ধাঁধানো উপন্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যার গুরুত্ব কখনো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে না। মোটা দাগে টিন ড্রামকে জাদুবাস্তব উপন্যাস হিসেবে গ্রাহ্য করা হলেও তা নিয়ে কিছু প্রশ্নও আছে, বিশেষ করে জাদুবাস্তবতার মুখ্য দুটো বিষয়– লেখকী বাকসংযম (Authorial reticence) এবং দ্বিধার ধারণ (concept of hesitation)-এর অনুপস্থিতির কারণে শুধু তাই নয়, উপন্যাসটি কোনো কোনো অবস্থায় জাদুবাস্তবতার উক্ত দুটো অপরিহার্য উপাদানের বিরোধিতাও করে। উপন্যাসটির ঘনিষ্ঠ পঠননির্ভর নিরীক্ষা প্রমাণ করে যে লেখকী বাকসংযম নামক বিশিষ্ট জাদুবাস্তব বয়ানশৈলী এখানে অবহেলিত হয়েছে কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

জাদুবাস্তবতার নীতিমালার সঙ্গে বড্ড বেমানানভাবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অস্কার তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার কারণে পাঠক তা সন্দেহ করতে শুরু করে। এ নিরবচ্ছিন্ন দ্বিধা চূড়ান্তভাবে উপন্যাসটির জাদুবাস্তব হয়ে ওঠার বিপরীতে কাজ করে। তাই বলে টিন ড্রামকে জাদুবাস্তব উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা না করার পেছনে এটি তেমন জোরালো যুক্তি নয়। বরং এটিকে জাদুবাস্তব উপন্যাসের ধারায় এক নতুন মাত্রিকতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, দক্ষিণ আমেরিকার কথাসাহিত্যে জাত এবং বিকশিত জাদুবাস্তবতায় যেসব প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠেছিল তা ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে এসে একেবারেই অবিকৃত থাকবে, এমনটি ভাবলে কনটিনেন্টাল সাহিত্যধারার প্রবল সৃষ্টিশীলতার দিকটির প্রতি অবিচার করা হয়। বস্তুত গুন্টার গ্রাসের দ্য টিন ড্রাম ইউরোপীয় জাদুবাস্তব কথাসাহিত্যের জগতে একটি প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস। এতে জাদুবাস্তবতা নতুন আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছে। তা ছাড়া ফ্লোবেয়ারের (গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার) হাতে বিয়েলিস্ট উপন্যাসের যে ধারা পুরো ইউরোপকে নাড়া দিয়েছে, সেই প্রাবল্যের প্রভাব ম্যাজিক রিয়েলিজমেও যে খানিকটা পড়বে না তা ভাবা সঙ্গত নয়। আর তাই টিন ড্রামে Authorial reticence-এর ব্যাপারটা একটু অগতানুগতিকভাবে এসেছে এবং ক্ষুদে অস্কারকে দেখা গেছে খানিকটা ব্যাখ্যাপ্রবণ হতে। তবে অস্কার ইউরোপীয় জাদুবাস্তব চরিত্রের এক অনুপম নিদর্শন।

অস্কার মাতজেরাত ১৯২৪ সালে পূর্ণ বিকশিত মন ও মগজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তিন বছর বয়সে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে আর শারীরিকভাবে বড় হবে না। একটি অদ্ভুত জ্ঞানী শিশুর পরিপ্রেক্ষিত থেকে সে সবাইকে তার গল্প বলে। সে দাবি করে যে সে সব কিছু মনে রাখতে পারে এবং চেঁচিয়ে কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারে। চমৎকার এক কাব্যিক বয়ানশৈলীতে এ উপন্যাসে জার্মান ইতিহাসের এক অন্ধকারতম অধ্যায় ফুটে উঠেছে। অন্য যে কোনো জাদুবাস্তব লেখকের মতো, যারা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে চান, গ্রাস নাৎসি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো বিদ্রূপাত্মকভাবে সমালোচনা করেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অস্কার জাদুবাস্তব উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচকভাবেই একজন অবিশ্বস্ত ন্যারেটর। তার সুস্থতা কিংবা অসুস্থতার বিষয়গুলা কখনই পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। সে তার গল্প বলে উত্তম পুরুষেই, আবার কখনো কখনো নাম পুরুষে অবতীর্ণ হয়, এমনকি একই বাক্সে। অবিশ্বস্ত ব্যাখ্যাতা হিসেবে তার আত্মজীবনীর বয়ানেও সে স্ববিরোধী হয়ে ওঠে যা প্রতিভাত হয় পোলিশ ডাকঘরের প্রতিরক্ষা, তার পিতাসহ কলজাইচেকের ভাগ্য, মারিয়ার পুত্র কার্ট-এর ওপর তার পৈতৃক আধিপত্য প্রভৃতি বিষয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবরণের মধ্য দিয়ে। এ আত্মবিরোধিতা, অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার প্রেত অস্কারকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায় উপন্যাসের এক

মমতাজ
গোল্ড নং-১
৫ মিনিটে রং
ইনস্ট্যান্ট এ্যাকটিভ কালার মেহেদী
সৌন্দর্য্যের রং কে সুরক্ষিত রাখতে মমতাজ গোল্ড নং-১
মেহেদী এখন নতুন টপ সীল টিউবে
পি এইচ
মান নিয়ন্ত্রিত মেহেদী
mumtaz herbal products www: mumtazherbal.com
মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস
জয়া
ব্রাইডাল মেহেদী
শতভাগ লাল...
অটুট মান নিখাঁদ রং...
ইনস্ট্যান্ট এ্যাকটিভ কালার মেহেদী
৫ মিনিটে রং
শতভাগ লাল...
পি এইচ
মান নিয়ন্ত্রিত মেহেদী
মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস
mumtaz herbal products www: mumtazherbal.com

ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায়, ইতিহাসের এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে। জাদুবাস্তবতার ক্যানভাসে এ নিরন্তর টানাপড়েন অনবদ্য হয়ে ওঠে।

কথাসাহিত্যে জাদুবাস্তবতা সাধারণত দুই রূপে আবির্ভূত হয়– লোকসাহিত্যিক (folkloric) এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological)। প্রথমটি উপন্যাসের সেটিং যে সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে সেখান থেকেই, তারা জড় বিশ্বাস, জীবনাচরণ প্রভৃতি থেকেই রসদ সংগ্রহ করে। অন্যদিকে পরেরটি, অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক কিংবা বৌদ্ধিক জাদুবাস্তবতা সেসব উৎস থেকেই তার প্রেরণা সংগ্রহ করে, যেগুলোর সঙ্গে উপন্যাসটির সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের কিংবা লেখকের নিজের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। গুন্টার গ্রাস অত্যন্ত সফলভাবে জাদুবাস্তবতার এ দুটো শাখার সম্মিলন ঘটিয়েছেন তার টিন ড্রাম উপন্যাসে এবং জ্বালানি সংকট, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক, ক্রমহ্রাসমান জন্মহার, তৃতীয় বিশ্ব প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সংকটের ব্যাপারে তার সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করেছেন।

টিন ড্রাম উপন্যাসটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানির ড্যানজিগ অঞ্চলে জন্ম নেয়া ক্ষুদ্রকায় কাল্পনিক ড্রামবাদক অস্কারের চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অদ্ভুত স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অস্কার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের গোপন ভাবনার কথা বলে দিতে পারে। একেবারেই শিশু থাকা অবস্থায় সে জানতে পারে যে তার পিতামাতা তাকে তার তৃতীয় জন্মদিনে একটি বাদ্যযন্ত্র উপহার দিতে যাচ্ছেন। সে আরো শুনতে পায় যে তাকে যৌবনকালে পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে একটি মুদি দোকান দেয়া হবে। সে মুহূর্তেই ক্ষুদ্র অস্কার পূর্ণবয়স্ক না হতে মনস্থির করে এবং তৃতীয় জন্মদিনে বাদ্যযন্ত্রটি উপহার হিসেবে নেয়ার পর থেকে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। বাদ্যযন্ত্রটি পেয়ে সে এক অসাধারণ প্রশান্তি লাভ করে এবং নতুন খেলনাটি তার যোগাযোগের প্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। উপন্যাসটি অস্কারের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার এক কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জির বিবরণের মতো। একটি তিন বছর বয়সী প্রতিভাবান অথচ পাগলাটে চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবল পরাক্রমশালী নাৎসিদের ক্ষমতারোহণে গল্প এখানে জাদুবাস্তব পরিবেশে বিধৃত হয়েছে।

জাদুবাস্তব উপন্যাসে এক ধরনের অন্তঃপ্রবাহী পোস্ট-কলোনিয়াল সুর রয়েছে যা টিন ড্রামেও প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের আত্মগর্বী আলোকপর্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জড়বাদিতার একটি জুতসই কাউন্টার-ডিসকোর্স দাঁড় করানোর তাগিদ থেকে এবং এক ধরনের নতুন বাস্তবতা বিনির্মাণের প্রেরণা থেকেই মূলত বিকশিত হয়েছে জাদুবাস্তবতা। প্রচলিত 'চিরায়ত' বাস্তবতার মহান আখ্যানকে বিনির্মাণ করার জন্য ভেলকিবাজি জুড়ে দিয়ে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে 'শ্রদ্ধেয়' বস্তুবাদী উপন্যাসের ধারাকে। এটি এক ধরনের প্রতিবাদ (resistance)। এ অর্থে সালমান রুশদির The empire writes back তত্ত্বের কথাসাহিত্যিক রূপায়ণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে জাদুবাস্তব সাহিত্যকে। দীর্ঘকাল সপ্রতাপে রাজত্ব করা কলোনিয়াল সাহিত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, কেন্দ্রের শৈল্পিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে প্রান্তে বিকশিত পোস্ট-কলোনিয়াল এ সাহিত্য স্রোত– সব আধিপত্য, সব বৈষম্য, সব শুদ্ধতা, সব সর্বজনীনতাকে প্লাবিত করে এক নতুন কণ্ঠস্বরের সাধনা করতে চায়। এখানে 'সুকৃতি'র চেয়ে 'বিকৃতি'ই বড় হয়ে ওঠে। মহান আখ্যানের চেয়ে ক্ষুদ্র উপাখ্যানই আস্থাবান হয়ে ওঠে। টিন ড্রামের ক্ষুদে অস্কার এ রকম এক সাহিত্যিক বিকৃতির নাম, যা কথিত সুকৃতির সুপরিচিত মুখশ্রীকে বিপরিচিত (defamiliarize) করেছে। ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী কর্তৃত্বকে (hegemony) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে বিকলাঙ্গতা দিয়ে। বামন অস্কারের বিকৃত দেহ এবং কুৎসিত কুঁজ নাৎসি জার্মানির কদর্যতার এবং জার্মানির স্কন্ধবাহিত ইতিহাসের বোঝার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। বর্ণবাদী নাৎসি আদর্শের এক সাহিত্যিক চিকিৎসা হিসেবে গ্রাসের টিন ড্রামকে বিবেচনা করা হয়। কুখ্যাত থার্ড রাইখের সব নির্যাতন ও নিধনের বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরব প্রতিবাদের শিল্পপ্রতীক টিন ড্রামের ক্ষুদে অস্কার। তার বোধ-বিশ্বাস, আচরণ-আচরণ, কাজকর্ম সব কিছুই যেন ব্যূহ বেঁধে ভেংচি কাটে নাৎসি জার্মানিকে। তাই আকৃতিতে জাদুবাস্তব হলেও টিন ড্রাম প্রকৃতিতে যুদ্ধোত্তর জার্মানির পুনর্গঠনে এক মহান সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখককে দিতে পেরেছে অবিনাশী প্রতিষ্ঠা। ইন্ডিপেনডেন্ট জার্মান কালচারাল কাউন্সিল লেখকের মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যথার্থই বলেছেন : 'গ্রাস একজন লেখকের চেয়েও অনেক বেশি... সমাজের জন্য একজন ভূকম্পলিখ (Seismograph)।'

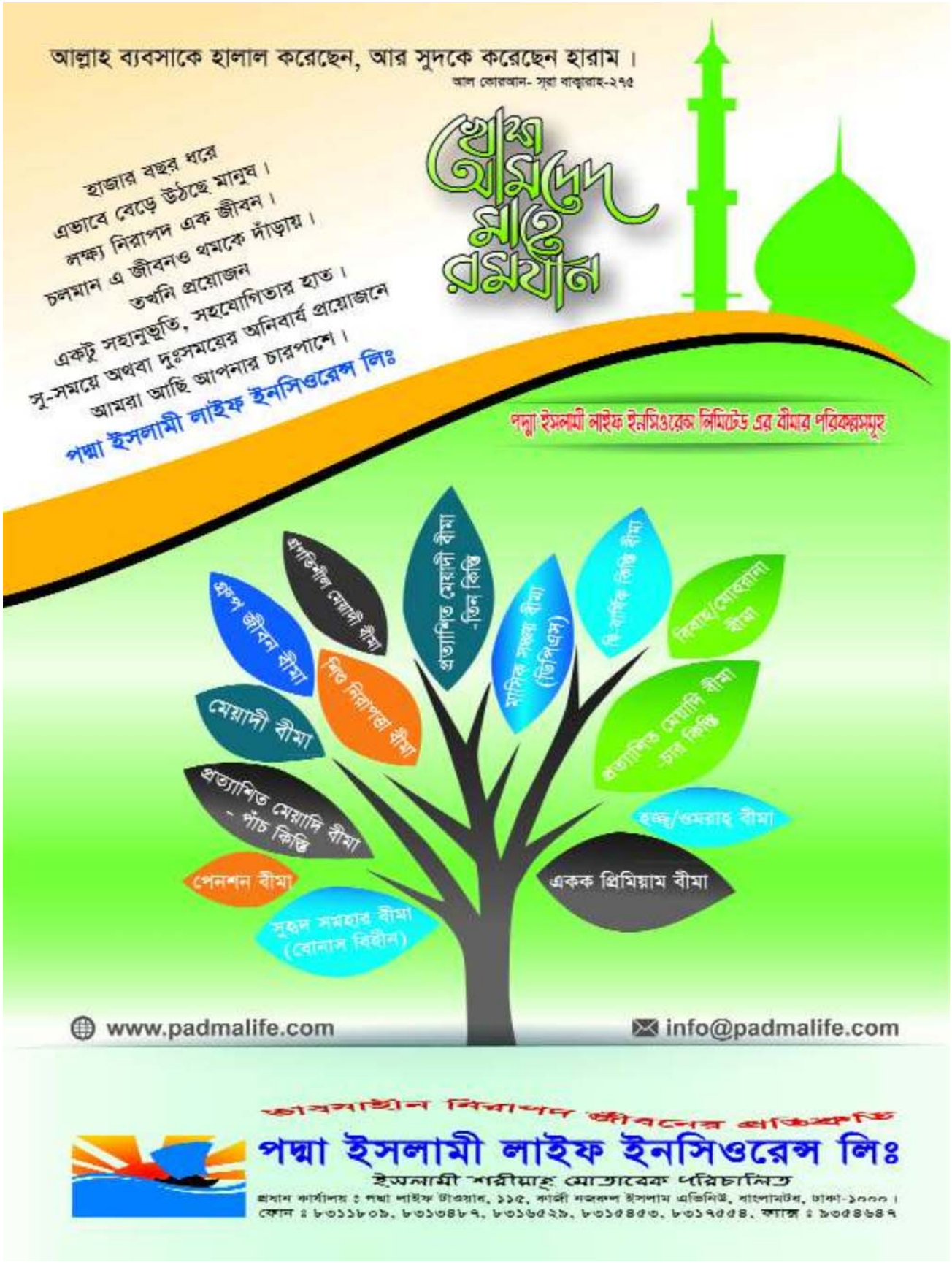
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।
আল কোরআন- সূরা বাক্বারাহ-২৭৫
হাজার বছর ধরে
এভাবে বেড়ে উঠছে মানুষ।
লক্ষ্য নিরাপদ এক জীবন।
চলমান এ জীবনও থমকে দাঁড়ায়।
তখনি প্রয়োজন
একটু সহানুভূতি, সহযোগিতার হাত।
সু-সময়ে অথবা দুঃসময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে
আমরা আছি আপনার চারপাশে।
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ
খোশ আমদেদ মাহে রমযান
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড এর বীমার পরিকল্পনাসমূহ
প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা -তিন কিস্তি
প্রভিশনাল মেয়াদী বীমা
ক্ষুদ্র জীবন বীমা
মেয়াদী বীমা
শিশু নিরাপত্তা বীমা
মাসিক সঞ্চয় বীমা (ডিপিএস)
ত্রি-বার্ষিক কিস্তি বীমা
বিবাহ/মোহরানা বীমা
প্রত্যাশিত মেয়াদি বীমা -চার কিস্তি
প্রত্যাশিত মেয়াদি বীমা - পাঁচ কিস্তি
হজ্জ/ওমরাহ বীমা
পেনশন বীমা
একক প্রিমিয়াম বীমা
সুহৃদ সমবায় বীমা (বোনাস বিহীন)
www.padmalife.com
info@padmalife.com
কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত
প্রধান কার্যালয় : পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১১৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৮৩১১৮০৯, ৮৩১৩৪৮৭, ৮৩১৬৫২৯, ৮৩১৫৪৫৩, ৮৩১৭৫৫৪, ফ্যাক্স : ৯৩৫৪৬৪৭

উপন্যাস

ব্যর্থ দিন ব্যর্থ রাত

সালাম সালেহ উদদীন

বাইরে মাঘের শীত জেঁকে বসলেও ঘরের ভেতরটা বেশ উষ্ণ। দরোজা জানালা বন্ধ থাকার কারণে শীতের মাত্রা কম। প্রকাশ ভয়ানক রকম উত্তেজিত হলেও শীত তাকে অনেকটা কাবু করে রেখেছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক সময় তার উত্তেজনা বাড়ে। হয়তো ঋতুর প্রভাব তার ভেতর কাজ করে। অনেকটা মরা কটাল ভরা কটালের মতো। জোয়ার ভাটার দেশের নদ-নদী-সমুদ্রের মতো– এই ভাটা এই জোয়ার। রাত যত গভীর হতে থাকে তার উত্তেজনা তত বাড়ে।

প্রকাশ তার ডাকনাম হলেও কখনই নিজেকে সে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। অনেকটা ভেতরমুখী চরিত্রের সে। ফলে জীবনের অনেক কিছুই অবলীলায় চাপা থেকে যায়। প্রকাশ অনেকটা স্বাধীনচেতা হওয়ার কারণে অনেকের সঙ্গেই তার বিরোধ লাগে। কখনো কখনো এই বিরোধ শত্রুতায়ও রূপ নেয়।

জীবনে আপস করতে না পারলে পদে পদে বাধা। জীবন চলার ক্ষেত্রে বাধা, জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা। এত সব বাধা অতিক্রম করা কঠিন। এই কঠিন সত্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে প্রকাশের জীবনে। আপসহীন নীতিতে অটল থাকা রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষার মতো। এই অগ্নিপরীক্ষা দেয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষা দেয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এক কথা নয়।

প্রকাশ জীবনে যতটি পরীক্ষা দিয়েছে ঠিক ততটিতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কি না তা আজ তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটিই আজ সে দিতে চায়। এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে সে বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। আর উত্তীর্ণ হতে পারলে হয়তো সে এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পাবে, না হয় গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। যে অন্ধকার হয়ত তার জীবনের জন্য অনিবার্য। কারো কারো জীবন অন্ধকারে ঢাকা থাকে। এক অন্ধকার কাটে তো আরেক অন্ধকার এসে জীবনকে ঢেকে দেয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্ধকার ভেদ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার কারো কারো জীবনে কেবল আলোর ছড়াছড়ি। আলোর পর আলো এসে জীবনকে উদ্ভাসিত উজ্জীবিত করে রাখে। জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে তরতর করে এগিয়ে যায়। এই আলো-আঁধারির খেলাই জীবন। প্রকাশ জীবনকে এভাবেই দেখার চেষ্টা করে। প্রকাশ এও মনে করে তার জীবন আঁধারে ঢাকা। এই আঁধারের কেন্দ্রবিন্দু একজনই। যে তাকে দীর্ঘদিন আলো থেকে দূরে রেখেছে। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে কেবল তার কারণেই প্রকাশের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকাশ এর একটা যৌক্তিক মীমাংসা চায়। এই মীমাংসা তাকেই করতে হবে, যে কোনো উপায়ে।

এলিট

NO Side Effects

প্যাওয়ার গোল্ড মেহেদী

হাত রঙিন তো মন রঙিন...

এলিট মেহেদী কিনে SMS করে জিতে নিন
আকর্ষনীয় সব পুরস্কার।
বিস্তারিত প্যাকেটের ভিতরে লেখা দেখুন
*শর্ত প্রযোজ্য

গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী রঙের
সেরা গ্যারান্টি

একমাত্র এলিট মেহেদী দিচ্ছে গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী
রং এর সাথে নো সাইড এফেক্টস এর গ্যারান্টি।

কাউকে কেন্দ্র করে তার জীবন থেমে যাক অথবা প্রগাঢ় অন্ধকারে ঢেকে থাক এটা সে চায় না। আর এই না চাওয়ার কারণেই মধ্যরাতে তার এই কষ্ট-কসরত। যেভাবে সে সংসার জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, বাস্তবে তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। এর জন্য সে কত ভাগ দায়ী, আর কত ভাগ পরিবারের অন্য সদস্যরা ওই বিচার-বিশ্লেষণেও আজ আসতে চাচ্ছে না। সব কিছু ছাপিয়ে তার সামনে একটি বিষয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তা হলো তার জীবনকে যে বিপন্ন ও দুর্বিষহ করে তুলেছে, তাকে সে বাঁচতে দেবে না। এর পরিণাম যাই হোক না কেন। এ কথাটার সরল অর্থ হচ্ছে, যে তার জীবনের প্রধান শত্রু তাকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

২.

প্রকাশ এই সমাজের কোনো চিহ্নিত অপরাধী নয়। হত্যা, সন্ত্রাস, প্রতারণা, জালিয়াতি, গুম-অপহরণ কিংবা পাচারের সঙ্গেও সে জড়িত নয়। বড় ধরনের অপরাধ কীভাবে করতে হয় কিংবা তার সঙ্গে অবলীলায় জড়িয়ে যেতে হয় তাও সে জানে না। বড় ধরনের অপরাধ তো দূরের কথা জীবনে ছোটখাটো অপরাধও সে করেনি। এমন এক ব্যক্তির পক্ষে কোনো বড় ধরনের ফৌজদারি অপরাধ করা সম্ভব কি না সেটাও রীতিমতো ভাবনার বিষয়। একজন গোবেচারা মানুষ হিসেবেই প্রকাশকে সবাই চেনে, জানে। সে মানুষের ক্ষতি করেছে এটাও তার পরিচিত ঘনিষ্ঠজনেরা বলতে পারবে না। এমন এক ব্যক্তি কী করে বড় ধরনের অপরাধ করতে পারবে– সেটাও এক বিরাট প্রশ্ন। প্রশ্ন বড় হোক আর ছোট তার কেন্দ্রবিন্দু একটাই আর তা হলো তার উদ্দেশ্য সফল করা। যে যে কাজে অভ্যস্ত নয় সে কাজটি তার পক্ষে করা কঠিন। ওই কাজ করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তার পরও প্রকাশ দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার আত্মবিশ্বাস সে একদিন সফল হবেই। কোনো কাজের ব্যাপারে যাদের আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড তারা সাধারণত ব্যর্থ হয় না। এ ধরনের নীতিধর্মী কথা হয় শুভ কাজের ক্ষেত্রে, না হয় মানবিক কাজের ক্ষেত্রে মানায়। কিন্তু অশুভ কাজ, খারাপ কাজের ক্ষেত্রে কি এ ধরনের কথা খাটে? অশুভ কিংবা অপরাধমূলক কাজ করতে গেলেও যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস দরকার এ কথাটা নতুন করে তাকে ভাবিয়ে তোলে। তার এও মনে হয়, কাজ তো কাজই তার আর শুভ অশুভ, ভালো-মন্দ কী। যে কোনো কাজ সুচারুরূপে সফলভাবে করতে গেলে বুদ্ধি-কৌশল-শ্রম সবই লাগে। বরং অপরাধমূলক কাজে এসবের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে হয়। এসব কথা যখন তার চিন্তায় আসে তখন প্রকৃত কাজের কথা সে ভুলে যায়। প্রকৃত কাজ হচ্ছে একজন মানুষকে তার হত্যা করতে হবে, মাত্র একজন মানুষকে– যে তার জীবন বিষিয়ে তুলেছে। এ কাজটি তার জন্য অনেক কঠিন। কারণ সে জীবনে কাউকে চড়-থাপড় মারেনি। অন্য অর্থে শারীরিকভাবে আঘাত করেনি। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় তার দ্বারা কেউ রক্তাক্তও হয়নি। সহজ কথায় অপরাধচর্চায় সে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের সাদামাটা একজন স্বাধীনচেতা মানুষ যে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত, অন্যের দুঃখে দুঃখিত ও কাতর হয়, যাবতীয় মানবিক গুণ যার মধ্যে রয়েছে সে কী করে মানুষ খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়, এটাই সে নিজে ভেবে পায় না। ভাবনা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, এ সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত যে সে একজনকে খুন করবে। সে এটা জানে যে খুন করে মানুষের কী পরিণতি হয়। জীবনের প্রতি যাদের বেশি মায়া তারা খুন করে পালিয়ে বেড়ায় আত্মরক্ষার জন্য। খুন করার পর যারা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, যাদের ভেতর অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয়, তারা থানায় বা কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে। খুনের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়। এর পাশাপাশি খুনি হিসেবে সমাজে ধিক্কারের বিষয়টি তো আছেই। যে দাগি

অপরাধী বা সিরিয়াল কিলার, খুন করা যার নেশা তার ভেতর কোনো অনুশোচনা নেই। কিন্তু যে এ ধরনের অপরাধে অভ্যস্ত নয়, সে যদি খুন করে জীবনের কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাহলে তার পরিণতি কী হবে। এসব সাধারণ ভাবনা তার মধ্যে কাজ করছে। তার পরও প্রকাশ তার সিদ্ধান্তে অনড়। এই খুন করার মাধ্যমে একদিকে সে অপার আনন্দ খুঁজে পেতে চায় অন্যদিকে এর মাধ্যমে সে জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়; যা তার জীবনের জন্য অতীব জরুরি।

মাস্টার বেডরুম থেকে সে আস্তে আস্তে ড্রইংরুমে চলে এলো। অতঃপর জানালা খুলে দিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। বাইরের তীব্র শীতালু বাতাস তাকে যেন হঠাৎ আক্রমণ করল। তার শরীর প্রথমে কেঁপে এবং পরে কাঁটা দিয়ে উঠল। যখন সে পরিবেশগত পরিস্থিতির শিকার হলো, তখন তার মনে হলো শরীরের সব শক্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছে এবং তার সবল হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে। যেন সে রোগগ্রস্ত কোনো মানুষ, যে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। শীত-কম্পন অবস্থায় তার পরও সে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এ মুহূর্তে সে তার কর্তব্যকর্ম ভুলে গেল। কী কারণে সে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে আছে এবং মাস্টার বেডরুম থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে এসব এখন তার মনোযোগের মধ্যে নেই। সে রাতের আকাশের দিকে তাকাল, নিজেকে নয় আকাশটাকেই আজ তার কাছে বেশি অসহায় মনে হচ্ছে। আকাশে চাঁদ, তারকারাজি সবই আছে। জানালা দিয়ে কিছু কিছু দেখাও যাচ্ছে, যা তার মনে সাময়িক আনন্দও এনে দিচ্ছে। শীতের বাতাস তার শরীরে কাঁপন ধরালেও এ মুহূর্তে তার ভীষণ ভালো লাগছে। তার ইচ্ছা করছে রাতের আকাশে উড়ে বেড়াতে। কোনো দুর্বল বস্তুর ওপর মানুষের আকর্ষণ কম থাকে। রাতের আকাশ যদি দুর্বল, বিবর্ণ, ফেকাসে হয় তবে তার প্রতি দুর্বলতা জন্মাবে কেন? আসলে প্রকাশ নিজের দুর্বলতাকে আকাশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আকাশের বিশালতা সম্পর্কে হয়তো প্রকাশের কোনো ধারণাই নেই। আকাশ সৃষ্টিকর্তার এমন এক সৃষ্টি যা কেবল রহস্যে খেয়াই নয়, এ আকাশ মানব জাতির ভীরুতা, দুর্বলতা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা সব কিছুই ধারণ করতে পারে। আকাশের বিশালতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে সে। তবে গভীর রাতে আকাশ দেখা এবং এ নিয়ে গবেষণার মধ্যে কী আছে, তা সে জানে না। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতও শক্তিশালী হয়েছিল, অসম্ভব হিংস্রতাও তার মধ্যে কাজ করছিল। তার পেশিতে পেশিতে রক্তের খেলাও শুরু হয়েছিল। যেন আজ রাতেই সেই বহুল প্রত্যাশিত ও পরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সে সেরে ফেলবে, যার জন্য সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অপেক্ষা করছে। রাতের পরিবেশও তার সহায়ক ছিল। সে প্রস্তুতি নিয়ে মাস্টার বেডরুমেও গিয়েছিল, তার পরও সে ব্যর্থ হলো। আজকের সুযোগ সে যখন কাজে লাগাতে পারেনি, ভবিষ্যতে পারবে কি না সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। এসব কথা মনে হলে তার জিদ আবার বেড়ে যায়, শরীরের সব শক্তি হঠাৎ দুই হাতে চলে আসে, জরুরি কাজটি করার জন্য তার হাতও নিসপিস করতে থাকে। এ মোক্ষম সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্য সে আবার মাস্টার বেডরুমের দিকে যায়। তার স্ত্রী পলি শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। সে গভীর ঘুমে নিমগ্ন। তার গলা টিপে শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করার এই তো সময়। তার স্ত্রীর শরীর খুব বলিষ্ঠ। গলা টিপে ধরতে গেলে যদি সে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে যায় এবং বুঝতে পারে তাকে হত্যা করার জন্য তার স্বামী এই কাজ করছে। তখন সে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। প্রথমে আত্মরক্ষার জন্য সে প্রকাশকে জোরে লাথি মারবে। লাথির আঘাত এতই তীব্র হবে যে প্রকাশ পাশের দেয়ালে ছিটকে পড়বে। সে পিঠে, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাবে এবং সে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে।

এই মোক্ষম সুযোগটা কাজে লাগাবে তার স্ত্রী। সে তখন আরো হিংস্র আকার ধারণ করবে এবং রান্নাঘর থেকে বঁটি এনে স্বামীকে ক্ষতবিক্ষত করবে। রক্তে ভেসে যাবে বাসার মেঝে, ছোপ ছোপ রক্ত লেগে থাকবে বিছানা, বালিশ ও দেয়ালে। আকাশের দেহ নিথর পড়ে থাকলে সে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে, তারপর বাসায় গচ্ছিত স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাগে ভরে একমাত্র মেয়ে নম্রতাকে নিয়ে ভেগে যাবে। আশপাশের লোকজন ও পুলিশ জেনে যাওয়ার আগেই তাকে এ কাজ করতে হবে। ভবন থেকে দ্রুত সটকে পড়ার সময় দারোয়ান যদি টের পায় তবে সঙ্গে সঙ্গে ওকে কয়েকটা হাজার টাকার নোট ধরিয়ে দিতে হবে। তারপর সে চলে যাবে ঢাকার বাইরে রংপুর তার বান্ধবীর বাড়িতে। ওই নিভৃত জায়গা থেকে পুলিশ কখনই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। প্রকাশ আজ এসব কী ভাবছে? এ যে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। স্ত্রীকে খুন করতে গিয়ে সে নিজেই খুন হয়ে যাবে! তার রক্তাক্ত নিথর লাশ মেঝেতে পড়ে থাকবে! এসব কথা ভাবতে গিয়ে সে ভয়ে আস্তে আস্তে আবার ড্রইংরুমের জানালার কাছে চলে এলো। শীতে ও হত্যাজনিত ভয়ে দুটোতেই সে কাঁপতে লাগল। তার শরীরে ঘাম দেখা দিল। সে জানালার গ্রিল শক্ত করে ধরল। সে তার স্ত্রীকে হত্যায় উদ্যত হয়নি। তার হন্তারক দুই হাত তার গলাও স্পর্শ করেনি। সে কেবল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিল। চিন্তা করার সময় বিপরীত চিত্রই ভেসে উঠেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় তার এ অবস্থা– তাহলে সে কীভাবে হত্যার মতো সাহসী ও নিষ্ঠুর কাজে প্রবৃত্ত হবে। এ প্রশ্ন যখন তার মধ্যে আবার ঘুরপাক খেতে লাগল, তখন তার মনে আরো একটি প্রশ্ন উদয় হলো, সেটাকে সে জীবনের প্রধান প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত ও বিবেচনা করতে চায়। আর তা হলো কেন তার স্ত্রীকে সে হত্যা করতে চাচ্ছে? এই কেনর উত্তর তার জানা আছে বলেই তো সে সারা রাত ঘুমহীন থেকে স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করছে। এই কেনর উত্তর জানা আছে বলেই তো সে আজ গভীর রাতে হিংস্র পাষণ্ডের ভূমিকায়, হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছে।

৩.

এই সমাজে কেউ ঠুনকো কারণে স্ত্রীর ওপর চড়াও হয় না। তাকে অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যায় প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষ করে হত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজের পরিকল্পনা যদি কেউ নেয় তাহলে তার পেছনে শক্তিশালী কারণ থাকে। তার স্ত্রীকে হত্যার পেছনেও তেমন শক্তিশালী কারণ রয়েছে। তার পরেও নিজেকে প্রশ্ন করে অনেকটা বোকা সেজে গেল সে। কার্যকারণ ছাড়া তো এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পেছনেই কারণ রয়েছে। যুক্তিবিশারদরা অন্তত তা-ই মনে করেন। গ্রিল ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে, আজ জানালার গ্রিলই তার প্রধান অবলম্বন। যদি সে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে না থাকত তাহলে হয়তো সে মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। সে এখন বুঝতে পারল, তার পিপাসা লেগেছে। গলা শুকানোর কারণে তার শ্বাস ঘন হয়ে আসছে। এ মুহূর্তে পানি পান না করলে হয়তো সে মারা যাবে। জানালার গ্রিল ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পেছনে আসে সে। তারপর টেবিল থেকে পানি নিয়ে পান করে। পানি পান করার পরও তার তৃষ্ণা মেটে না। যেন কোনো ঝরনার মধ্যে মুখ দিয়ে থাকতে হবে তাকে। তার এই অনন্ত তৃষ্ণার কারণ সে নিজে আবিষ্কার করতে পারে না। পরপর দুই গ্লাস পানি পান করে সে হাঁপাতে থাকে। যেন সে বড় ধরনের কোনো অপরাধ করার পর এই প্রান্তিক অবস্থায় পৌঁছেছে। সে আবার জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়াল। অবশেষে তার এ ধারণা হলো যে ভয়ংকর কোনো শারীরিক বিপর্যয়ের কারণে তার সারা শরীর অবশ হয়ে পড়েছে। দুই হাত ধরে সে যে জানালা ধরে আছে তা একেবারেই অবশ। যে দুই পায়ে সে দাঁড়িয়ে আছে তা-ও ভারসাম্য

হারিয়ে ফেলেছে। কোনোভাবেই বুক ধরফড়ানি থামছে না। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এখনই মারা যাবে। তার মনটাও অস্থির হয়ে উঠল। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় শীতের মধ্যেও ঘর্মাক্ত শরীরে সে দ্বিতীয়বার আকাশ দেখার চেষ্টা করল। ঝাপসা চোখে মনোযোগহীনভাবে আকাশের দিকে তাকাল সে। পুবাকাশ ফরসা হতে চলেছে, মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নাগরিক পাখিদের আওয়াজও কোথাও কোথাও শোনা গেল। প্রকাশ বুঝতে পারল, রাত শেষ হয়ে গেছে। তার আজকের রাতের মিশন একেবারেই ব্যর্থ। 'অপারেশন সাকসেস' হওয়ার আজ আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করা শুরু করলে নানা অপরাধমূলক ও রহস্যময় ঘটনা ঘটার সুযোগ একেবারেই সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ পৃথিবীর যত সব বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে রাতের আঁধারেই। তাই রাত বা রাতের অন্ধকার চির রহস্যময় একটি বিষয়। এ রহস্য ভেদ করা হয়তো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আজ যেমন সম্ভব হলো না প্রকাশের পক্ষেও। প্রকাশ মনে করছে আজকের রাতের মতো মোক্ষম সুযোগ আর আসবে না। এ সুযোগ জীবনেও হয়তো সে পাবে না। মানুষ সারা জীবনে সুযোগ পায় চার কি পাঁচ বার। সুযোগ পেলেই হবে না, সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। যে সুযোগ কাজে লাগাতে পারে তার উন্নতি অনিবার্য। কারণ সুযোগ হচ্ছে জীবনের উত্থানের সিঁড়ি। জীবন উপভোগের ক্ষেত্রেও সুযোগ দরকার। কেউ কেউ আবার বলেন, ভাগ্যই সুযোগ এনে দেয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সুযোগ এমনি এমনি চলে আসে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ও মনে করে ভাগ্য বলে কিছু নেই। পৃথিবীতে সব কিছুই চেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। ওর জীবনে আরো বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটেছে। কোনো কোনো কাজের জন্য সে এক নাগাড়ে দশবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কাজটি হাসিল করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে ওর স্পষ্ট কথা, চেষ্টা করে যেখানে কোনো কাজ হাসিল করা যায় না সেখানে পুরোপরি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তার জীবন চলবে কি? চলেওনি। সে যখন চেষ্টা থামিয়ে দিয়েছিল তখন জীবনও প্রায় থেমে গিয়েছিল। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই আপন চেষ্টার মাধ্যমে বেঁচে আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এ চেষ্টা সংগ্রাম জন্মের পর থেকেই বিরামহীন। মানুষ যদি প্রচুর বিত্তবৈভবের অর্থের মালিক না হয়, তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে তাকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম করে যেতে হয়। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পৃথিবীতে কত মানুষ যে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ যে সে পলিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো, এটা তার জীবনের বড় ধরনের পরাজয়। আজ তো পরিবেশ তার পক্ষেই ছিল, তা হলে কে তাকে বাধাগ্রস্ত করল? দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করলেও একজন হন্তারকের যে মানসিকতা, যা রাতের বেলা তীব্র ছিল, সে মানসিকতা এখনো সে পরিত্যাগ করতে পারেনি। সে মনে করে পলিকে গলা টিপে হত্যার এখনো সুযোগ রয়েছে। এ কথা মনে হওয়াতেই তার হাত নিসপিস করে উঠল। শরীরের সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে হাতে এসে ভর করলে প্রকাশ ড্রইংরুমের জানালা ছেড়ে বেডরুমে গেল। পলি আগের মতো চিৎ হয়ে শুয়ে এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাশে ওড়না বালিশ পড়ে আছে। গলায় ওড়না পেঁচিয়ে কিংবা বালিশ চাপা দিয়েও শ্বাস রোধ করা যায়। একজনকে হত্যা করতে চাইলে তো অবলম্বনের শেষ নেই। যে কোনো মাধ্যমে যে কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যায়। পলি এমনভাবে শুয়ে আছে যে সে গলাটা প্রকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইচ্ছা করলেই প্রকাশ এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। সে পলির গলাবরাবর দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তে তার ভেতর প্রচণ্ড উত্তেজনা কাজ করছে। এ উত্তেজনা পলির সঙ্গে যখন সে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখনকার উত্তেজনা নয়। এ

উত্তেজনা হচ্ছে একজন হত্যা-উদ্যত নিষ্ঠুর মানুষের, যে তার স্ত্রীকে হত্যা করতে চায়। যেন হত্যা করতে পারলেই তার জীবনে অপার শান্তি, স্নিগ্ধতা, অনাবিলতা চলে আসবে। তার জীবন চলার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা পলি। এ বাধা তাকে দূর করতেই হবে। পলিকে হত্যার জন্য আজকের রাতটি যখন সে বেছে নিয়েছিল তখন প্রথমেই সে হোঁচট খেয়েছিল। কারণ প্রতিদিন পলি রাত ১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সে ঘুমাতে দেরি করছে। কেন দেরি করছে এর উত্তর প্রকাশের জানা নেই। ওর মনে হলো পলি তার হত্যা পরিকল্পনা জেনে ফেলেছে। কেমন আক্রোশের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকাশকে কিছুই বলেনি। প্রকাশের সন্দেহ ঘনীভূত হলেও সে তার পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসে না। সে পলির ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ঘুমের ব্যাপারে পলি সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাকে ঘুমকাতুরে নারীও বলা যেতে পারে।

ঘুমের ব্যাপারে নানা ব্যাখ্যা ও মত থাকতে পারে। এমনও মানুষ রয়েছে যার সারা রাত ঘুম হয় না। বিছানায় এ পাশ-ও পাশ করতে থাকে। নানা চিন্তা, ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তি, শূন্যতা- নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক সংকট ও সমস্যা, বিরহকাতরতা ইত্যাদি কারণে একজন মানুষ ঘুমহীন থাকতে পারে। শারীরিক জটিলতার কারণেও অনেকের ঘুম হয় না। অন্য এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে, বিছানায় গিয়ে তারা নানা চিন্তায় মগ্ন কিংবা আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরও ঘুম হয় না। বাধ্য হয়ে জীবনের হিসাব মেলাতে হয়। কেউ কেউ দিনের হিসাবও মেলায়। এভাবে হিসাব মেলাতে মেলাতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এ শ্রেণিই উত্তম। কারণ রাতের খাবারের পরপরই এরা ঘুমিয়ে পড়ে না। আর তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত যারা তারা বেশ আয়েশি। আয়েশি এ কারণে যে এই শ্রেণির মানুষ রাতের খাবারের পরপরই বিছানায় যায়। বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। কেবল ঘুমিয়ে পড়ে বলা ভুল হবে, গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। জরুরি কোনো কাজে ডাকাডাকি করলেও এদের ঘুম ভাঙানো যায় না। এরাই মূলত ঘুমকাতুরে। এ ঘুমকাতুরেদের আয়েশি জীবনের পাশাপাশি বিপদও রয়েছে। এরা অনেক সময় চুলায় রান্না রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এর ফলে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। কেবল ঘুমের কারণে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সচেতন নয়। এই শহরে ঘুমকাতুরেদের একজন পলি। ঘুমের কারণে সংসার জীবনে নানা অঘটন ঘটেছে। সংসার শুরুর প্রথম দিকে, অর্থাৎ সংসারের প্রতি যখন সে মনোযোগী ছিল– সে দুধ পুড়িয়েছে, অন্তত দশ দিন, ভাত পুড়িয়েছে মাসে অন্তত পাঁচবার। একবার তো পানি ফুটাতে গিয়ে, সব পানি বাষ্প হয়ে উবে গেল এবং হাঁড়িতে আগুন লেগে ভয়ভয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। আর একবার তো নম্রতা বিছানা থেকে পড়ে জোরে কান্না শুরু করল, সে এত জোরে কান্না শুরু করল যে আশপাশের লোকজন টের পেল, অথচ পলি গভীর ঘুমে নিমগ্ন। যার ঘুম এত গভীর তাকে তো যে কোনো সময় গলা টিপে হত্যা করা যায়। এ সুযোগটাই আজ সে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। রাতের পরিবেশও তার পক্ষে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যর্থ হলো। তার জীবনের যতগুলো ব্যর্থতা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা হিসেবে আজকের রাত যোগ হবে। এ ব্যর্থতা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে।

৪.

রাত শেষ হয়ে গেল এবং নিজের ব্যর্থতা স্পষ্ট হওয়ার পরও কেন সে এ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাচ্ছে, তা সে ভেবে পেল না। এখন আর খুনের সময় নয়, সমস্ত সুযোগ সে আগেই হাতছাড়া করে ফেলেছে, তার পরও মাস্টার বেডরুমে সে পলির গলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হত্যার জন্য যে গলা ছিল তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। আসলে তার ভেতর এতটাই আদিমতা, হিংস্রতা কাজ করছিল যে সারা রাত হত্যার বিষয়টিই তার মাথায় ছিল।

একমাত্র আদরের ধন ভালোবাসার মানিক নম্রতা যে পলির পাশেই ঘুমাচ্ছে এ বিষয়টি তার মাথায় ছিলই না। নম্রতাও কিছুটা ওর মায়ের মতো। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। রাতের বেলা বিরক্ত করে না। আজকে মাস্টার বেডরুমটি ছিল ভয়াবহ অন্ধকার। এ অন্ধকার ভেদ করে বিছানায় কে শোয়া আছে, আর কে শোয়া নেই তা চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। পলির যেহেতু নাক ডাকার অভ্যাস রয়েছে, তাই ওকে চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু অন্ধকারে নম্রতাকে খুঁজতে সময় লাগবে। সময় লাগুক কিংবা না লাগুক সেটা বড় বিষয় নয়। নম্রতা যে পলির পাশেই শোয়া এ কথা সে কী করে ভুলে গেল এটাই সে ভেবে পায় না। ভোর হয়ে যাওয়ার কারণে হত্যাপ্রচেষ্টা যখন তার মাথার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে উধাও হতে থাকে তখন তার নজর গিয়ে পড়ে নম্রতার ওপর। মেয়েটা অনেক মায়াবী, বুদ্ধিমতী ও মিষ্টি চেহারার। শিশু বয়সেই তার ভেতর দূরদর্শিতা রয়েছে। ও কথা বলে পরিণত বয়সের মানুষের মতো। ছোটখাটো সহযোগিতামূলক কাজও করে একইভাবে। নম্রতার এসব বিষয় প্রকাশ যতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখে ও বিবেচনা করে ওর নানা আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করে, পলি ঠিক তার উল্টো। নম্রতার ব্যাপারে ওর তেমন মনোযোগ নেই। উপরন্তু ঠুনকো কারণে নম্রতাকে সে ধমকাবে, মারবে। কেবল নম্রতাকে কেন্দ্র করেই পলির সঙ্গে প্রকাশের অন্তত ২০ দিন বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে, অনেক সময় যা রূপ নিয়েছে হাতাহাতিতেও। পলি যখন নম্রতার গায়ে হাত তোলে আর নম্রতা 'আব্বু আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আম্মি আমাকে মেরে ফেলল' বলে চিৎকার শুরু করে দেয় তখন প্রকাশের রক্তের মধ্যে হোলিখেলা শুরু হয়। উত্তেজনায় সে রি রি করতে থাকে। তার ইচ্ছা হয় এ মুহূর্তেই পলিকে বাসা থেকে বের করে দিতে অথবা খুন করতে। কারণ প্রকাশ মনে করে নম্রতার গায়ে হাত তোলা মানে তার গায়ে হাত তোলা। নম্রতাকে আঘাত করা মানে তাকে আঘাত করা। কারণ নম্রতার ধমনিতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এ যে তারই রক্ত। নম্রতার জন্মের সময় থেকেই পলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। পলি চেয়েছিল সন্তান পরে নিতে, আর প্রকাশ চেয়েছিল আগেই সন্তান হোক। কারণ সন্তান না হলে সংসারে পরিপূর্ণতা আসে না। পলির কেন সন্তান নিতে অনাগ্রহ এটা প্রকাশ বুঝতে পারে না। বরং সে বরাবর শুনে আসছে মাতৃত্বের স্বাদ নেয়ার জন্য, বিবাহিত জীবনে পরিপূর্ণতা আনার জন্য প্রত্যেক নারীই সন্তান চায়। এই চাওয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য যে কোনো বিবাহিত নারীই সন্তান নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে ব্যতিক্রম দেখল কেবল পলিকে।

পলি চেয়েছিল পুত্রসন্তান আর প্রকাশ চেয়েছিল কন্যাসন্তান। এই চাওয়া নিয়েও বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। বিরোধ এতটাই তুঙ্গে উঠেছিল যে তখন থেকেই দুজনে আলাদা বিছানায় ঘুমাতে শুরু করে। স্বামী-স্ত্রী যখন আলাদা বিছানায় ঘুমায় কোনো ধরনের সমঝোতাহীনভাবে তখন তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে দূরত্ব বাড়তে থাকে। মানসিক ও শারীরিক সম্পর্কে আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে থাকে। দুজনের সম্পর্ক হয়ে পড়ে পানসে, অনাকর্ষণীয় ও আবেদনহীন। তখন একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে মতবিরোধ, মনোমালিন্য প্রকট হয়ে ওঠে এবং সকাল-বিকাল তা ঝগড়ায় রূপ নেয়। অবশেষে ফল দাঁড়ায় এমন যে একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। সংসার জীবনে নাভিশ্বাস ওঠে। প্রকাশ ও পলির ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। এক ছাদের নিচে থাকলেও একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। সংসারের একচ্ছত্র আধিপত্য চায় দুজনই। অথচ সংসার হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতা আর ত্যাগের ব্যাপার। 'আমি যা বলব তাই হবে, আমি যা করব সেটাই ঠিক' স্বামী কিংবা স্ত্রীর এ ধরনের মানসিকতা সংসার জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। একসময় সংসার ভেঙে যায়।

প্রকাশ শেষবারের মতো পলির পাশে যখন দাঁড়ায় তখন রাতের আবেশ আর নেই। বাইরে সকাল হওয়ার কোলাহল শোনা যায়। মানুষ প্রাতঃভ্রমণ অথবা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত পায়ে পড়ছে। প্রকাশের পরিপূর্ণ মনোযোগ এখন একমাত্র কন্যা নম্রতার দিকে। নম্রতা ঘুমাচ্ছে। সারা রাত তার মনোযোগ ছিল পলির দিকে। নম্রতা যে পলির পাশেই ঘুমাচ্ছে এটা যেন সে ভুলে গিয়েছিল। অন্যান্য দিন নম্রতা গভীর রাতে উঠে প্রকাশের বিছানায় চলে যায়। অর্ধেক রাত সে আব্বুর সঙ্গে ঘুমায়। আর যেদিন গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারে না, সেদিন পলির রুমেই টানা ঘুমে রাত কাভার করে দেয়। আজও রাত কাভার করে দিল। প্রকাশের কাছে আশ্চর্য লাগছে, একবারও তার নম্রতার কথা মনে হলো

না, এমনকি নম্রতা যে পলির পাশেই শুয়ে আছে তাও সে খেয়াল করল না। সে কেবল খুনের নেশায় মত্ত হয়ে থাকল। সন্তানকে নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মাই স্বপ্ন দেখে। নম্রতাকে নিয়েও প্রকাশের স্বপ্নের শেষ নেই। মেয়ে বড় হবে, তাকে লেখাপড়া শেখাবে, ভবিষ্যতে সে একজন বড় শিল্পী হবে। ঘরে ঘরে জনে জনে ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে। পিতা হিসেবে সে গর্বিত বোধ করবে। কেবল মেয়েকেই নয়, মানুষ তাকে বাহবা দেবে, ধন্য ধন্য বলবে। গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। নম্রতাকে ওই জায়গায় নিতে হলে তো স্বাভাবিকতা ও সুস্থ পরিবেশ দরকার। এটা নিশ্চিত করতে হবে বাবা-মাকেই। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে পলির যে সম্পর্ক, তা সুতোয় ঝুলে আছে, সুতোটা কেবল কাটার অপেক্ষায়। সুতোটা হয়তো একদিন কেটে যাবে। প্রকাশ মনে করে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ সুতোটা সে নিজেই কাটবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে।

পলিকে সে খুন করতে চায়। খুন করতে চায় বলাটা ভুল হবে। আজ সারা রাতই সে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ওকে খুন করার পর তার জীবন যে স্বাভাবিক ধারায় চলবে না এটাও সে জানে। সে কেন, পৃথিবীতে কোনো খুনির জীবনই স্বাভাবিক ধারায় চলে না। সরাসরি যারা খুনি হয় তাদের জেল-ফাঁসি হয়েছে না হয় তারা পালিয়ে বেড়িয়েছে। আর যার খুনের কাহিনী ফাঁস হয়নি, যিনি অপেশাদার খুনি, সে সারা জীবন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। যারা পেশাদার খুনি বা সিরিয়াল কিলার তাদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। খুন করা এমন একটি অপরাধ, যে অপরাধ আড়াল করা কিংবা ওই অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ না করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে মোটেও সে চিন্তিত নয়। এখন তার মাথায় একটা বিষয়ই কাজ করছে, পলিকে খুন করলে নম্রতার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে। খুন করার পর যদি সে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে, বিচার হলে ফাঁসিতে ঝুলতেও হবে। তখন নম্রতার কী হবে। ওর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। ও কার কাছে থাকবে, কিভাবে বেড়ে উঠবে, লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে কি না, ভবিষ্যতে সঙ্গীতশিল্পী হতে পারবে কি না– এসব তার ভাবনার মধ্যে কাজ করতে থাকল। সে আস্তে আস্তে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে নম্রতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোলে তুলে নিল। আবেগমথিত হয়ে ওকে আদর করতে লাগল। যেন নম্রতাকে রেখে সারা জীবনের জন্য দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। অথবা খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে নম্রতা জেগে গেল। আব্বু কেন তাকে এভাবে কোলে নিয়ে আদর করছে তা বুঝতে পারছে না ও। নম্রতার প্রশ্ন– 'আব্বু তোমার কী হয়েছে? আম্মু কি তোমাকে বকা দিয়েছে।' নম্রতার কথা শুনে প্রকাশ আপ্লুত হয়ে যায়, ওর চোখে আবারো পানি চলে আসে। প্রকাশ ওকে নিয়ে ড্রইংরুমে যায়, জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং ভোরের আকাশ শেষবারের মতো দেখার চেষ্টা করে। নম্রতাকে বলে, 'দেখ আম্মি আকাশে পাখি উড়ছে। তুমি না পাখি পালতে চেয়েছিলে। আমরা এবার খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দেব এবং আকাশে ওড়া পাখিকে বন্দি করব।' নম্রতা বলল, 'তাহলে তো অনেক মজা হবে।' 'হ্যাঁ, মজা করার জন্যই আমরা এটা করব। এটা আমাদের করতেই হবে।'

৫.

পলি এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠে না। ও সাধারণত সাতটার পরে ওঠে। ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্যই প্রকাশ চাকরিজীবী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। যারা বুদ্ধিমান এবং সংসারের ব্যাপারে কৌশলী ও বাস্তববাদী তারা চাকরিজীবী মেয়ে বিয়ে করে। দুজনের আয়ে যেভাবে সংসার স্বচ্ছন্দে চলে একজনের আয়ে ঠিক সেভাবে চলে না। যার কারণে বিয়ের পাত্রী খোঁজার সময় চাকরিজীবী মেয়েদের প্রতি ছেলেদের ঝোঁক বেশি। ইদানীং চাকরিজীবী মেয়েদের বিয়ের বাজারে চাহিদাও বেশি। তবে সাধারণ মেয়েদের তুলনায় চাকরিজীবী মেয়েরা পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন। কারণ এক ধরনের ছেলে চাকরিজীবী মেয়ে খোঁজে অর্থনৈতিকভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য; যার সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে স্ত্রী উপার্জন করবে আর স্বামী পায়ের ওপর পা তুলে খাবে। এ ধরনের পুরুষের সংখ্যাও এ শহরে কম নেই। স্বামী বেকার হলে সংসারের আপদ-ঝামেলা আরো বেড়ে যায়। সারাক্ষণ স্ত্রীর কথায় ওঠবস করা লাগে, না হয় মতবিরোধ, ঝগড়া লেগেই থাকে। আবার স্বামী-স্ত্রী যদি উভয়ে চাকরিজীবী হয় সে ক্ষেত্রে সংসার অধিক সচ্ছল হয়, তবে অন্যত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়। সন্তানদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কেউ না থাকলে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। স্বামী-স্ত্রী যার যার পেশায় ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারে না। সন্তানদের মানসিক বিকাশ থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অনেক পরিবারের সন্তানই উচ্ছন্নে যায় বাবা-মায়ের মনোযোগহীনতা, উদাসীনতা আর পেশাগত জীবনে অতি ব্যস্ত থাকার কারণে।

তবে ইদানীং চাকরিজীবী বেশির ভাগ নারীর ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক প্রণবতা দেখা দিয়েছে। চাকরিজীবী নারীরা তাদের উপার্জনের টাকা সংসার, স্বামী-সন্তানদের পেছনে ব্যয় করে না। এমনকি স্ত্রী কত বেতন পায় তাও বেশির ভাগ স্বামী জানে না। উপরন্তু স্বামীর কাছ থেকে মোবাইলের টাকা, যাতায়াত ভাড়া ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ, পোশাক-আশাক সবই নেয়। যারা এ চরিত্রের চাকরিজীবী মহিলা, প্রকাশ তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ তারা চাকরি করছে কিন্তু সংসারে কোনো অবদান রাখছে না। এই আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নারী যে পরিবারে রয়েছে সে পরিবারে সুখ থাকার কথা নয়। পলিও এই রকমের। নিজের ভালোমন্দ, স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। পলি যদি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, প্রকাশ তাহলে তার ব্যাপারে ওই কঠিন ও নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তটি নিত না। পলি সংসারের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন আর সে সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলেও যাচ্ছে না। প্রকাশ মনে করে, ও যদি বাসা থেকে চিরতরে চলে যেত তাহলে তার জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটত। প্রকাশ জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারত। কিন্তু পলির মানসিকতা এমন যে সে সংসারে থেকেই লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে আর প্রকাশের জীবনকে বিষিয়ে তুলবে।

প্রত্যেক পুরুষই স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যাশা নিয়ে বিয়ে করে। একই ভাবে নারীরও স্বপ্ন-প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু সময়, সমাজ, পরিবার এমন যে নারী-পুরুষের বা স্বামী-স্ত্রীর বেশিরভাগ স্বপ্নই মাঠে মারা যায়। অর্থাৎ সংসার জীবন জটিল এক আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্দেহ অবিশ্বাস লোভ স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতা এসব সংসার জীবনে এখন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকাল যারা আট-দশ বছর টানা প্রেম করে বিয়ে করছে তাদের সংসারও তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। প্রেমময় মোহময় রঙিন জীবন থেকে সংসার জীবনে প্রবেশ করে তারা ভিন্ন এক জীবন, ভিন্ন এক মানুষকে দেখছে। যে মানুষটির সঙ্গে আগের মানুষটির কোনো মিল নেই। যেন মানুষটি হঠাৎ করেই বদলে গেছে। এই বদলে যাওয়ার কারণ যতটা না পারিবারিক তার চেয়ে বেশি সামাজিক। সমাজ বদলে যাওয়ার কারণে পরিবারও বদলে গেছে, বদল ঘটেছে ব্যক্তিরও। সঙ্গত কারণে প্রকাশের ভেতরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বাসর রাতে যে পলিকে সে আদর করে বুকে টেনে নিয়েছিল, মায়া-মমতা-ভালোবাসায় ওর হৃদয়পূর্ণ করেছিল, সে পলিকে সে হত্যা করতে চাচ্ছে। পলিই আজ তার জীবনের প্রধান শত্রু। প্রকাশ শুনেছে, যারা ভালোবেসে বিয়ে করে তাদের বিয়ে ৮০ ভাগই টেকে না। অথচ ও তো প্রেম করে বিয়ে করেনি। পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ে হয়েছিল। তা হলে তার জীবন এমন হলো কেন?

পলিকে খুন করার পর তার আরো একটি কাজ বাকি থাকবে, সে ঘটককে খুঁজে বের করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে কেন সে মিথ্যার ফুলঝুরি সাজিয়ে তার ভেতর স্বপ্ন জাগ্রত করেছিল। কেন সে পলিকে কেন্দ্র করে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল। প্রকাশ জেনেছে ঘটক রবিউল এখন আর ঢাকায় থাকে না। ঘটকালি পেশাও সে ছেড়ে দিয়েছে। সে এলাকায় অর্থাৎ কুমিল্লার চান্দিনাতে মুদি দোকান দিয়েছে। প্রথম কাজটি সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় কাজের জন্য সে প্রয়োজনে চান্দিনা যাবে এবং রবিউলকে খুঁজে বের করে প্রকাশের ব্যক্তিগত আদালতে দাঁড় করাবে যে আদালতের বিচারক সে নিজে।

ভোর হলে নম্রতাকে সে নিজের রুমে নিয়ে আসে, তারপর ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মেয়েটার প্রতি পলি একেবারেই অমনোযোগী। ওর আচরণে মনে হবে নম্রতা ওর নিজের মেয়ে নয়, সতীনের মেয়েকে সে দায় ঠেকে লালন-পালন করছে। গ্রামের বাড়ি থেকে এক কিশোরী কাজের মেয়ে তাসলিমাকে নিয়ে এসেছে প্রকাশ। মেয়েটা খুব কর্মঠ ও বিশ্বস্ত। অন্যদশজন মেয়ের মতো সে নয়। বিশেষ করে নম্রতার দিকে বেশ মনোযোগী। তবে ওর একটা বাজে অভ্যাস সকালে ঘুম থেকে ওকে ডেকে ওঠাতে হয়। সকালে সেজেগুজে পলি অফিসে যাওয়ার পর যথাসময়ে ফিরবে না। অফিস পাঁচটায় শেষ হলে সে হয়তো ফিরবে রাত ৮-৯-১০টায়। কোনো কোনো দিন রাত এগারোটায়ও ফেরে। পলি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সে ওই অফিসের মালিকের ব্যক্তিগত সহকারী। ব্যক্তিগত সহকারী চাকরিটা নারীদের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। প্রথমত, অফিসের বেশিরভাগ বসই ব্যক্তিগত সহকারীকে নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে। অফিশিয়াল ফায় ফরমাস খাটার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাও পূরণ করতে হয়। যে পুরুষের নারীর শরীরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে– তারাই সাধারণত সুন্দরী মহিলা রাখেন ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। আর যারা নারী বিদ্বেষী অথবা নারীকে দেখে সম্মানের চোখে তারা হয় পুরুষ সহকারী রাখেন, না হয় নারীর প্রতি অশোভন আচরণ করেন না।

পলির বস কামুক প্রকৃতির পুরুষ। মধ্য বয়সী। যে নারী তার টার্গেটে পড়েছে তার রেহাই নেই। পলির আগে নাকি তার আরো দুজন নারী ব্যক্তিগত সহকারী ছিল। একজন তিন মাস অন্যজন ছয় মাস চাকরি করেছে। এরপর পলির আগমন। পলির চাকরি ৮ বছর চলছে। বিয়ের আগে থেকেই পলি এই অফিসে কাজ করে। বিয়ের আগে সে অফিস নির্বাহীর কাজ করত। প্রকাশ তখন অফিস ঘুরেও দেখে গিয়েছে। বিয়ের এক বছরের মাথায় ওর পদোন্নতি হয়। অফিসের এক অনুষ্ঠানে বিশেষ নজরে পড়ে ওমর ফারুকের। যিনি এই অফিসের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এক্সপোর্ট, ইমপোর্টের ব্যবসা ফারুক সাহেবের। যে অনুষ্ঠানে পলি তার নজর কেড়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে পলি জর্জেটের শাড়ি পরেছিল। তার শরীরের লোভনীয় অংশ বেশ ফুটে উঠেছিল। নাভির নিচে শাড়ি পরায় নাভি হয়ে উঠেছিল আকর্ষণের আধার আর পলির বুক উন্নত হওয়াতে ফারুক সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পলি। স্বাস্থ্য মাঝারি। শাড়ি পরলে ওকে অন্যরকম লাগে। যেন কোনো নায়িকার আগমন ঘটেছে অফিসে। এর আগে অফিসের কোনো অনুষ্ঠানে নিজেকে এভাবে ফুটিয়ে তোলেনি সে। এরপর থেকেই ফারুক সাহেবের নজরে পড়ে সে এবং পলির রাতারাতি পদোন্নতি হয় এবং বেতনও বেড়ে যায়।

৬.

কথায় আছে, নারী অর্থ, দামি উপহার ও মুখরোচক দামি খাবার পেলে সব কিছু ভুলে যায়। আর ক্ষমতা পেলে নারী কেন সব মানুষই পরিবর্তন হয়। এই কারণে ধনী ও ক্ষমতাবানদের গরিব বন্ধুরা সব সময় তাদের সমালোচনা করে। ফারুক সাহেবের নজরে পড়ার পর পলির ভেতরেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। একজন সাদামাটা ছা-পোষা চাকরিজীবী থেকে সে একজন কর্মকর্তার ভাব ধারণ করল। এটা কেবল পোশাকে নয়, আচরণেও। এর প্রভাব পরিবারেও পড়তে লাগল। প্রকাশ ছোটখাটো ব্যবসা করে। বেশ কিছুদিন হলো তার ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে। যার কারণে ব্যবসার প্রতি মনোযোগ কমে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে বাসায় থাকে। নম্রতাকে বাসার পাশের এক কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করিয়েছে প্লে গ্রুপে। প্রকাশই ওকে আনা নেয়া করে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাবার প্রতি নম্রতা আসক্তি ও ভালোবাসা অনেক গুণ বেড়েছে। যখন যা

আবদার করে তখনই তা কিনে দেয়। নম্রতাকে নিয়ে প্রকাশ যে স্বপ্ন দেখছে তার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। সন্তানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য অথবা পরিবার সন্তানকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য বাবা-মায়ের উভয়েরই বিশেষ সহযোগিতা ও মনোযোগ প্রয়োজন। যে কোনো একজনের মনোযোগহীনতায় সন্তানকেন্দ্রিক স্বপ্নের বাস্তবায়ন না ঘটতেও পারে, বিশেষ করে মা যদি সন্তানের প্রতি উদাসীন থাকে। বাঙালি সমাজে সাধারণত মায়েরা উদাসীন থাকে না, এমনটি সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণও করে না। যে মায়েরা করে তাদের একদিকে যেমন আদর্শ মা হিসেবে অভিহিত করা হয় না অন্যদিকে তাদের যে নিষ্ঠুর দজ্জাল হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাদের বলা হয় 'মা জাতির, নারী জাতির কলঙ্ক'।

পলি ইদানীং সংসার ও নম্রতার প্রতি যে মাত্রায় উদাসীন তাতে তাকে কী হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়– তা প্রকাশ ভেবে পাচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে, পলির চলাফেরা ও আচরণে সে বিস্মিত হচ্ছে। পলি যে হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেছে, এ কথা সে ঘনিষ্ঠজনদের বলতে পারছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ঘনিষ্ঠজনদের ব্যাপারে বদনাম করা তার নীতি বিরুদ্ধ এবং স্বভাবজাত নয়। বন্ধুরা যখন অন্যের বদনাম করে অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় তখন প্রকাশ বলতে গেলে নীরব থাকে। প্রকাশের এক বন্ধু সজীব। বন্ধুদের আড্ডায় তার দুটো বিষয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি হচ্ছে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেয়ার মতো করে অন্যের বদনাম করা এবং পাশাপাশি নিজেকে জাহির করা। সজীবের বাপ-দাদারা কে কত বছর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিল, এলাকায় তাদের বংশের পরিবারের কী ধরনের দাপট। তারা উচ্চ বংশের মানুষ এসব কথা সারাক্ষণ বলে বেড়ায়। অর্থাৎ অন্যের বদনাম করা এবং আত্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। সজীবের মতো এই ধরনের মানুষকে কেবল বন্ধুরাই নয়, সমাজের অন্যরাও মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে না। সজীব প্রায়ই স্ত্রীর বদনাম করে। তার স্ত্রী মানুষ ভালো কিন্তু ঘ্রাণহীন ফুল। এই সমাজে যাদের কোনো আবেদন নেই। এই ধরনের কথা সজীব প্রায়ই বলে। ও এও বলে, 'আমি কেন অন্য নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলি, তার অন্যতম কারণ আমার স্ত্রী। বর্তমান সমাজ বাস্তবতার কারণেই কেবল শরীর পাওয়ার জন্য অন্য নারীকে বিয়ে করা বোকামো। আজকাল নারীরাও সস্তায় শরীর বিলিয়ে দেয়। যারা বিলিয়ে দেয় তারা খুবই অ্যাকটিভ। আমার কিছুই করতে হয় না ওরাই সব করে। এখানকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা এ ব্যাপারে বেশ আধুনিক ও উদার। ওদের টাকা দরকার আর আমার দরকার শরীর। উভয়ের চাহিদাই মিটছে।' সজীবের এসব খোলামেলা কথা প্রকাশের ভালো লাগে না। একটি জাতীয় পত্রিকার এক সম্পাদক এক ঘরোয়া আড্ডায় বলেছিলেন, স্ত্রী বিয়ের প্রথম অবস্থায় কেবল স্ত্রী, তারপর দ্বিতীয় অবস্থায় বন্ধু। সংসারের তৃতীয় স্তরে গিয়ে বড় বোন, চতুর্থ স্তরে গিয়ে খালাম্মা এবং জীবনের শেষ স্তরে গিয়ে মা। ওই সম্পাদকের ব্যাখ্যার মধ্যে এক ধরনের যুক্তি রয়েছে। বিয়ের প্রথম পাঁচ বছরে স্ত্রীরা শরীরী ব্যাপারে খুব আকর্ষণ অনুভব করে, যেন বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। তারপর এক বা দুই সন্তানের জননী হওয়ার পর অন্যরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সংসার, সন্তান লালন-পালন খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক বাইরে ঘুরতে যাওয়া এসবের মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শরীরী আবেদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে। বেশিরভাগ বিবাহিত মহিলা এই ধরনের ছকবাঁধা জীবনযাপন করে। এর বাইরে যারা তারা স্বামী-সন্তান সংসারের ব্যাপারে উদাসীন। এই ধরনের মহিলারা বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতেও সময় কাটাতে অভ্যস্ত। এরা নিজের ভেতরে রোমান্টিকতা জিইয়ে

রাখতে চায়। বাইরে নিজেকে প্রদর্শন করে একজন আবেদনময়ী মহিলা হিসেবে। অনেক সময় বন্ধু মহলে এদের নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। কে তার শরীর ও মন দখল করবে এই নিয়ে চলে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ধীরে ধীরে পলি এখন এই শ্রেণির নারীর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। প্রকাশ নম্রতাকে স্কুল থেকে এনে লাঞ্চের পর বাসা থেকে বের হলো। ও চলে গেল ওর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। নিয়মমাফিক পলির সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় ফেরার কথা। দেখা গেল, প্রকাশ রাত আটটার মধ্যে বাসায় ফিরেছে, পলির ফেরার নাম নেই। সে দশটার দিকে বাসায় ফিরল। দেরিতে বাসায় ফিরলেও তার ভেতর কোনো অপরাধবোধ কিংবা অনুশোচনা কাজ করে না। আমার দেরি হয়ে গেল। তোমরা খেয়েছ কিনা– এমন কথাও কোনো দিন মুখে আনে না। নম্রতা সারাদিন কী করেছে, মায়ের জন্য মন খারাপ ছিল কিনা, ঠিকমতো খেয়েছে কিনা– এসব কিছুই জিজ্ঞাসা করে না সে। তবে পলির চোখমুখ দেখলে বোঝা যায় সে বাইরে থেকে আনন্দ-ফুর্তি করে, রাতের খাবার খেয়ে বাসায় ফিরেছে। প্রায় দিনই সে দেরি করে বাসায় ফেরে। প্রকাশের প্রশ্ন–

– তোমার অফিস কয়টা পর্যন্ত।

– সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে।

– কৈইফিয়ত নয় জানতে চাচ্ছি, আমি মনে করি এটা জানার অধিকার আমার আছে।

– তুমি তো ব্যবসা করতে গিয়ে ডাব্বা মেরেছ। ঠিকমতো সংসার চালাতে পারো না। এখন তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আবার এখন আমার ওপর খবরদারি করছ। তোমাকে না বলেছি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না।

– তুমি প্রতিদিন অফিস থেকে দেরি করে আসো, এটাও কি আমি বলতে পারব না।

– দেরি করে আসি না। কাজের কারণেই দেরি হয়। অনেক সময় বসের পার্টি থাকে সেখানে অ্যাটেন্ট করতে হয়। তুমি তো জীবনে চাকরি করোনি এটা তুমি বুঝবে না। চাকরি করতে গেলে এমনই হয়। বসের মন জুগিয়ে চলতে হয়।

– একজন নারীর পক্ষে বসের মন জুগিয়ে চলাটা কঠিন, যদি সে নারী সত্য ও ন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

এই কথার দ্বারা তুমি কী বোঝাতে চেয়েছ।

-বলতে চাচ্ছি, ইদানীংকার বসদের মানসিকতা ভিন্ন। তারা নারী সহকারীর সান্নিধ্য সাহচার্য পেতে চায়; অফিসের কাজের বাইরেও। তারা জড়িয়ে যেতে চায় অন্য সম্পর্কেও।

–তুমি আসলে ইতর, ছোটলোক। একজন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে অনায়াসেই বাজে কথা বলতে পারলে। অবশ্য সংকীর্ণমনা যারা, তারা যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পারে। যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে।

–তুমি আমাকে যাই বল, আমি দেখব ব্যক্তি সৎ কিনা। তার মধ্যে নীতি-আদর্শ আছে কিনা।

– তোমার নীতি কথা সততার কথা আমার শোনার সময় নেই। আমি এখন ক্লান্ত, ফ্রেস হয়ে ঘুমাতে যাবো।

–খাবে না।

–বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি, বললাম না অফিসে পার্টি ছিল।

পলির কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারে না প্রকাশ, নম্রতাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ও শুনেছে শত কাজের ফাঁকেও চাকরিজীবী নারীরা সংসারে সময় দেয়। স্বামীর প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে ভোর থেকে পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করে। প্রয়োজনে নিজের খাবার নিয়ে যায়। স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে অফিসের কাজের ফাঁকে ফোনে কথা বলে। খোঁজ-খবর নেয়। পারিবারিক কোনো বিশেষ সমস্যা দেখা দিলে অফিস থেকে আগেভাগে বাসায় চলে আসে কিংবা ছুটি নেয়। অথচ পলির মধ্যে এ ধরনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে না। সে সকালবেলা সেজে একেকদিন একেক পোশাকে অফিসে যাবে এবং প্রায় প্রতিদিনই দেরি করে ফিরবে। চাকরির প্রথম জীবনে সে ছিল একেবারেই সাদামাঠা। সাধারণ নারীদের মতো

অফিসে যেত। ফিরতও সময়মতো। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে পলিও বদলে যেতে থাকে। তার ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কেবল তাই নয় ধীরে ধীরে তার ভেতর রুক্ষতা বাসা বাঁধে এবং সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এর ফলে যতটা না অসুবিধা হয় প্রকাশের তার চেয়ে বেশি অসুবিধা হয় নম্রতার। ও দিনে দিনে মায়ের আদর স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পলি নম্রতার সঙ্গে মাঝেমধ্যে এমন আচরণ করে যেন মনে হয় সে তার মা নয়। ঠুনকো কারণে নম্রতাকে মারবে ধমকাবে। এটা প্রকাশের একেবারে অপছন্দ। নম্রতা এমনই এক মেয়ে তাকে শুধু আদর করা যায়, মারা যায় না।

৭.

প্রকাশ ফরিদপুরের সদরপুরের ছেলে। পুরো নাম আবিদ হোসেন প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স মাস্টার্স করেছে সে। সূর্য সেন হলের ছাত্র ছিল। ক্যাম্পাসের বন্ধুরা তাকে গোবেচারা হিসেবেই জানত। অত্যন্ত নিরীহ গোছের প্রকাশ নিজেকে প্রকাশ করত কম। তবে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা থাকার কারণে নিজস্ব মত ও পছন্দের ওপরই সে চলত। কেউ তার রুচি ও পছন্দের বিরুদ্ধে কথা বললে সে হঠাৎ করে খেপে যেত। এই খ্যাপা কখনো কখনো চরম আকার ধারণ করত। এর ফলে অন্যের সমস্যা যতটা না হতো তার চেয়ে বেশি হতো নিজের। মেজাজ খিচড়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমনও দেখা গেছে টানা তিনদিনেও তার মেজাজ ভালো হয়নি। এটা তার চরিত্রের অত্যন্ত বাজে ও বিপজ্জনক দিক। তার এই রগচটা স্বভাবটা অনেক সময়ে চরম দুর্ব্যবহারেও রূপ নেয়। অনেকে মনে করেন সাদামাঠা সরল চরিত্রের আড়ালে এটাই তার আসল চরিত্র। মানুষ যখন রেগে যায় কিংবা তার স্বার্থে বড় ধরনের আঘাত লাগে তখন তার প্রকৃত চরিত্র ফুটে ওঠে। সুতরাং সাদা বা সরল চোখের মানুষের প্রকৃত চরিত্র নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রকাশ পরোপকারী ও মানবতাবাদী। সত্য ও ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে সে জীবনের পথ চলতে চায়। এই কারণে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্রোতে তাকে চলতে হয়েছে সারাজীবন।

তার শারীরিক কারণে নয়, চারিত্রিক কারণে হয়তো মেয়েরা তাকে পছন্দ করে না। চারিত্রিক কারণ বলতে বোঝায় মেয়েদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার অক্ষমতা। কোনো মেয়ে যদি যেচে ওর সঙ্গে কথা বলে তবে ওর ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যায়। যা জিজ্ঞেস করে তার উত্তর দিতে পারে না। তার ভেতরে এক ধরনের 'নারী ভীতি' কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা যেখানে উপযাচক হয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে খাতির জমায়– এসব ক্ষেত্রে প্রকাশ একেবারেই ব্যতিক্রম। সে কারণে কোনো মেয়ের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে নারীর ব্যাপারে তার আগ্রহ একেবারে কম তা নয়।

এক শ্রেণির পুরুষ রয়েছে, তাদের নারীর ব্যাপারে অতি মাত্রায় আগ্রহ রয়েছে এবং তারা লজ্জার মাথা খেয়ে নারীর কাছে যায়, কথা বলে সম্পর্ক তৈরি করে। আরেক শ্রেণির পুরুষ রয়েছে, যাদের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকলেও নারীর কাছে যেতে ভয় পায় তাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা। অন্য আরেক শ্রেণির রয়েছে নারীর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা। তারা পারতপক্ষে নারীর ছায়াও মাড়াতে চায় না। ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো তারা নারীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছে অথবা পারিবারিক ও সামাজিক কারণে তাদের নারীর প্রতি নেতিবাচক বা ঘৃণাসূচক ধারণা তৈরি হয়েছে– যার কারণে তারা নারী থেকে দূরে থাকে।

প্রকাশের নারী সম্পর্কে কোনো বাজে ধারণা নেই বরং এক ধরনের আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা না থাকার কারণে এবং ভেতরে ভেতরে লজ্জা কাজ করার কারণে তারও বহিঃপ্রকাশ সে ঘটাতে পারেনি। সে যখন তিতুমীর কলেজে পড়ত তখন শিলা নামের একটি মেয়েকে ভালো লাগত। শিলাকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে কেবল

দেখত। শিলাকে উদ্দেশ্য করে বেশ কয়েকটি প্রেমপত্রও লিখেছে অগোছালো ভাষায়। কারণ বাংলা ভাষায় সে কোনো দিনই দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। সে অনেকবার ভেবেছে চিঠিগুলো শিলাকে সে দেবে। কিন্তু সে সাহস সে পায়নি। শিলাকে চিঠি দেয়ার মধ্যে সে হয়তো এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেত। ফলাফল তার পক্ষে আসত না। কারণ শিলা কলেজের বেশ কয়েক জন স্মার্ট-সুদর্শন ছেলের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা মারে। ওই ধরনের ছেলেদের বাদ নিয়ে কেবল চিঠির কারণে ও প্রকাশের কাছে চলে আসবে– এটা কখনো যৌক্তিক কিংবা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ যুগের মেয়েরা এমন নয়। তারপরেও শিলাকে নিয়ে সে কারণে-অকারণে ভাবত। হঠাৎ যদি কোথাও শিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, প্রকাশের ভেতরে অস্থিরতা শুরু হতো। শিলা তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে মুচকি হেসে যদি বলত, কেমন আছে প্রকাশ। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যেত। সারারাত ওর ঘুম হতো না। মাঝরাতে ঘুম ভর করলে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখত ও। শিলা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অজানার উদ্দেশে। বলছে– 'প্রকাশ তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে না পরলেও তুমি আমার, শুধু আমার।'

প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে– এ এক স্বর্গরাজ্য। ফুলশোভিত রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটছে। চারদিকে কেবল নানা রঙের ফুলের গাছ। এ যেন ফুলের রাজ্য, ফুলের গালিচা। চারদিক থেকে পাখি ডেকে উঠছে। এমন সব পাখি ডাকছে– এমন সুমধুর কণ্ঠে ডাক সে জীবনেও শোনেনি। শিলা ওর হাত ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। রাস্তা থেকে ফুলের পাপড়ি তুলে ওর মাথার ওপর ছুড়ে মারছে। প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে সামনে একটি বাংলো। বাংলোটির চারপাশে এমনভাবে ফুলের গাছ– যেন বাংলোটিকে আলাদাভাবে ফুল দিয়ে সাজানোর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতিই বাংলোকে এমনভাবে সাজিয়েছে। চারদিকে তাকাল প্রকাশ। এমন মোহনীয় দৃশ্য দেখা তো দূরের কথা, কোনোদিন সে কল্পনাও করেনি। তার জীবন আজ ধন্য, সার্থক। সে বহুবার স্বর্গের বর্ণনা শুনেছে, আরব্য উপন্যাসের কোনো কোনো জায়গার বর্ণনাও শুনেছে। কিন্তু এমন জায়গার কথা সে কখনো শোনেনি। এটা হয়তো শিলা আর তার জন্যই সৃষ্টিকর্তা বানিয়েছে, অপার আনন্দ উপভোগ করার জন্য। সে দেখতে পাচ্ছে, শিলা তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাংলোর দিকে। শিলার কোমল হাতের স্পর্শে সে শিহরিত হচ্ছে, ওর হাসি এবং চারদিকের পরিবেশ ওর ভেতরে উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার এই উন্মাদনা বেশিক্ষণ থাকে না– তার ঘুম ভেঙে যায়। উত্তেজনায় রিরি করতে থাকে সে। তার সারা শরীরে ঘাম দেখা দেয়। কী স্বপ্ন দেখল সে। সে যেন প্রেমকুঞ্জে ভ্রমণ করেছে এবং স্বর্গীয় আনন্দ পেয়েছে। এই আনন্দের রেশ হয়তো সে কোনোদিনই কাটাতে পারবে না।

প্রকাশ জানে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন তার জীবনে কোনোদিনই ঘটবে না। তাতে কী। শিলাকে নিয়ে সে যে এমন এক সুখকর স্বপ্ন দেখতে পেরেছে সে জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। এই স্বপ্নের ঘোর সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পারার কথাও নয়। কারণ মানুষ এমন আনন্দঘন উপভোগ্য স্বপ্ন হয়তো জীবনে একবারই দেখে। কারো কারো জীবনে সে সৌভাগ্যও জোটে না। এমন অনেক মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে তারা সুখ-স্বপ্ন দেখবে তো দূরের কথা রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নে তাদের জীবন কাটে। এই দিনকে বিবেচনা করলে সে সৌভাগ্যবান। শিলাকে সে পাক না পাক এমন স্বপ্ন সে প্রতি রাতে দেখতে চায়। স্বপ্নের জীবনই হোক তার প্রকৃত জীবন। স্বপ্নই হোক তার জীবনে প্রকৃত সুখ। যদিও স্বপ্নের কোনো ভিত্তি নেই।

পরের দিক বেশ পরিপাটি হয়ে কলেজে গেল প্রকাশ। না শিলাকে সে দেখতে পেল না। শিলা কেন কলেজে আসেনি, তাও সে কাউকে জিজ্ঞেস করল না। তার অনুসন্ধানী চোখ কেবল শিলাকে খুঁজতে লাগল। এভাবে সাতদিন চলে গেল। শিলার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। ২১ দিনের মাথায়ও জানতে পারল শিলার বিয়ে হয়ে গেছে এবং আমেরিকা প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে সেখানে চলে গেছে। এ সংবাদ তার বিশ্বাস হলো না। এভাবে হুট করে কেউ আমেরিকা যেতে পারে না। আবার তার এও মনে হলো, বিয়ে তার আগেই হয়েছিল এবং আমেরিকা যাওয়ার প্রক্রিয়াও সে আগে থেকেই শুরু করেছিল। এটা কারো কাছে প্রকাশ না করার কারণে কেউ জানতে পারেনি এবং বিষয়টি সবার কাছে অবাক লেগেছে। শিলার হঠাৎ চলে যাওয়ায় ঠিক কতজনের হৃদয় খান খান হয়েছে তা প্রকাশ জানে না, তবে সে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে। সে এও মনে করে এই আঘাত পাওয়ার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ শিলার সঙ্গে তার এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না, সে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে আক্ষেপ করা যায় কিংবা তাকে অভিসম্পাদ দেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে শিলার কোনো দোষ নেই। শিলাকে কেন্দ্র করে যদি কেউ কল্পনার জাল বোনে, স্বপ্ন দেখে, তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কারো ভেতর যদি তীব্র হয়ে ওঠে– তা হলে সে দোষ কি শিলার? শিলার স্বপক্ষে যত যুক্তিই দেখানো হোক না কেন– শিলার অনুপস্থিতিতে প্রকাশ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না।

৮.

শিলাকে ভুলতে তার অনেক সময় লাগে। এটা তার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। যে ঘটনা মনে হলে সে আজও আনমনা হয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে। অনার্স প্রথম বর্ষে যখন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়, তখন রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে। স্বপ্নে বিভোর হওয়া একজন তরুণ প্রকাশও। একদিকে উচ্চশিক্ষা নেয়ার স্বপ্ন অন্যদিকে সুন্দরী প্রেমিকা পাওয়ার স্বপ্ন। দুই স্বপ্নই বাস্তবায়ন করতে চায় প্রকাশ। বিভাগের একটি মেয়েকে পছন্দ হয় তার। মেয়েটির নাম সুরভি। সুরভি কেবল নামেই নয়, চারদিকে সৌরভ ছড়ানোর ক্ষমতা তার রয়েছে। হাল ফ্যাশনের পোশাক পরে ও। বব ছাঁট চুল। চুলের সঙ্গে মুখের সামঞ্জস্য এমন যে ও খুবই মায়াবী মনে হয়। সুরভি যখন হেঁটে যায় সবাই তাকিয়ে থাকে। সবাই ওকে নিয়ে ঘুরতে চায়, ওকে দামি হোটেলে নিয়ে খাওয়াতে চায়। কিন্তু প্রকাশ তো আগের মতোই, মেয়েদের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। নারী বিষয়ে যার প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে অথচ নারীর কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না, প্রকাশ করতে পারে না হৃদয়ের আকুতি– এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। শিলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশের মানসিকতা যা ছিল, সুরভির ক্ষেত্রেও তাই। একবার সাংস্কৃতিক সংগঠন 'দৃষ্টি' আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে গান গাইল সুরভি। গানে মোহিত হলো সবাই। সবচেয়ে বেশি মোহিত হলো প্রকাশ। সে আজ অন্য এক সুরভিকে আবিষ্কার করল। 'এই স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বাঁধনে জড়ালে গো বন্ধু' 'মোরা আর জীবনের হংস মিথুন ছিলাম, ছিলাম নদীরও চরে।' তারই সহপাঠী, তারই স্বপ্নরানী এমন চমৎকার গান গাইতে পারে, এটা প্রকাশের জানা ছিল না। এরপর থেকে সুরভিকে কেন্দ্র করে তার ভেতর ভয়ঙ্কর এক উন্মাদনা কাজ করতে লাগল। ক্যাম্পাসে যেখানেই সুরভি থাকে সেখানেই প্রকাশ গিয়ে হাজির হয়। তার গান যে ওকে মোহিত মুগ্ধ করেছে– এ সাধারণ কথাটাও সে সুরভিকে বলতে পারল না। তবে প্রকাশের অভিব্যক্তি চালচলন দেখে সুরভি বুঝতে পেরেছে প্রকাশ তাকে পছন্দ করে।

সুরভির একদিনের এক কাণ্ড প্রকাশের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ সুরভি প্রকাশকে টিএসসির বারান্দায় নিয়ে এলো। তারপর বলল, আমি জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো, পছন্দ করো আমার গানও। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে গান শোনাব। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে শুরু করেছে। ঝির ঝির বৃষ্টি নামছে। দুজনে বারান্দার এক কোণায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। বন্ধুরা যদি কেউ টিএসসিতে আসেও তবুও ওদের খুব সহজে আবিষ্কার করতে পারবে না। সুরভি প্রকাশের কাছ ঘেঁষে বসল, ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, ওর গালে একটি টিপ্পনি কাটল। বলল, প্রকাশ, তোমাকে আমার খুব পছন্দ। কিন্তু তোমার সমস্যা সব সময় গোমরা মুখে থাকো। নাম তোমার প্রকাশ কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে পারো না। সুরভির কথা শুনে ও ওর দিকে মায়াবী দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওকে কিছুই বলে না। এই দৃশ্য দেখে সুরভির মনে হলো, কোনো বোবা লোকের সঙ্গে সে বৃষ্টিমুখর দিনে আড্ডা দিচ্ছে তাকে গান শোনাচ্ছে। যে মুখের ভাষা তো দূরের কথা ইশারা ভাষাও হয়তো বোঝে না।

সুরভি এবার বলল, আমি সম্ভবত বোকা লোকের পাল্লায় পড়েছি, তারপরেও বোকাদের আমার ভালো লাগে, ওদের সুন্দর একটা মন আছে। জানি প্রকাশ তুমি কিছু বলবে না– এবার গান শোন, বর্ষার গান। তোমার ভালো লাগবে। সুরভি প্রকাশকে পর পর চারটি গান শোনাল। গান শুনে প্রকাশ হাত তালিও দিল না বাহবাও দিল না। কেবল পলকহীন চোখে সুরভির দিকে তাকিয়ে থাকল। সুরভি শিল্পী মানুষ। প্রকাশের এই তাকানো সে বুঝতে পারে। প্রকাশ কেন তার কাছাকাছি থাকতে চায় এটাও সে বোঝে। তাই ও সিদ্ধান্ত নিল বিষয়টি আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। একটি সহজ-সরল ছেলে ওকে কেন্দ্র করে কষ্ট পাক, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বুনুক এটা হতে দেয়া যায় না। কেবল একজন ক্লাস মেট হিসেবে নয় একজন শিল্পী হিসেবেও এটা করতে দেয়া উচিত নয়। তাই একদিন সুরভি জামিলের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে, প্রকাশ এ হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড জামিল মুশতাক। রোডস অ্যান্ড হাই ওয়ের ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছে। অতপর জামিলের উদ্দেশে বলে, প্রকাশ আমার ক্লাস মেট। আমাকে খুব পছন্দ করে। ক্যাম্পাসে আজকাল এমন সহজ-সরল ছেলে নেই। পরিচয়ের পর প্রকাশ কেবল আমতা আমতা করতে থাকে। কীভাবে যে দুজনের সামনে থেকে পালিয়ে যাবে, সে পথ খুঁজতে থাকে। তার জীবনে দ্বিতীয়বার স্বপ্নভঙ্গ হলো সুরভিকে কেন্দ্র করে। এরপর থেকে প্রকাশ একেবারেই চুপসে গেল। কোনো সরব মানুষ হঠাৎ চুপসে গেলে তার ধরন হয় এক রকম, আর যদি কোনো নীরব মানুষ চুপসে যায়, অর্থাৎ আরো নীরব হয়ে যায়, তবে তার জীবনে আর কী অবশিষ্ট থাকে। প্রকাশের অবস্থা অনেকটা সেরকম হলো। হঠাৎ কখনো যদি সুরভি তাকে ডাকে, তবে সে কাছে যায় কিন্তু কোনো ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। সুরভি যা জিজ্ঞাসা করে ঠিক তার উত্তর দেয় সে। তার পরেও সুরভিকে দেখে দেখে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কাটিয়ে দিল প্রকাশ। জীবনে দ্বিতীয় কোনো সুরভির দেখা পেল না।

৯.

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নারী ও প্রেম বিষয়ে যে অন্তর্মুখী এবং যার মন এসবকে কেন্দ্র করে সব সময় দ্বিধা জড়ানো তার পক্ষে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা কিংবা প্রেম করে বিয়ে করা কঠিন। আধুনিক যুগে রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেও এই শ্রেণির তরুণের অভাব নেই। এই অন্তর্মুখী চরিত্র ব্যক্তির জীবনের জন্য নিরাপদ একথা অন্তত প্রকাশের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ তার যদি এ ব্যাপারে অদম্য কৌতূহল না থাকত তা হলে কথা ছিল। কৌতূহল বা আগ্রহ কারো সামনে প্রকাশ না করে ভেতরে ভেতরে ক্ষরিত হওয়া কিংবা দহনজ্বালায় ভোগা সবচেয়ে কষ্টদায়ক। এই শ্রেণির তরুণদের কেউ কেউ আবার মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হতাশাগ্রস্ত জীবন কাটাতে হয় অনেককেই। যে কোনো কিছুরই অবদমন ভালো নয়, এর ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ডেকে আনে। সমাজ উদার ও আধুনিক না হলে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হলে ব্যক্তির অবদমনের মাত্রা বেড়ে যায়। প্রকাশের বেলায় অনেকটা তাই ঘটেছে। কলেজ জীবনে যেমন শিলাকে কিছুই বলতে পারেনি, একই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সুরভিকে কিছুই বলতে পারেনি। এই না পারাটাকে প্রকাশ নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বলে মনে করে। এই ব্যর্থতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাট চুকে যাওয়ার পর পারিবারিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হলো প্রকাশকে। পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা শুরু হলো। সে বরাবরই চেয়েছিল শিলা অথবা সুরভির মতো কোনো মেয়ে। কিন্তু চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। আত্মীয়-বন্ধুদের পক্ষ থেকে যতই পাত্রী দেখানো হোক না কেন, প্রকাশ তার পছন্দ মতো পাত্র পায় না। প্রকাশের বাবা ইয়াকুব আলী প্রেসের ব্যবসা করতেন। তার ব্যবসা যখন বেশ রমরমা ঠিক তখনই বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসা শুরু করে প্রকাশ। ছেলে ব্যবসায়ী এ কথা শুনে পাত্রীপক্ষ বেশ ঝুঁকে পড়ে। পাত্রীপক্ষ মনে করেন চাকরিজীবী পাত্রের চেয়ে ব্যবসায়ী পাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া অতি উত্তম। কারণ ব্যবসায়ী পরিবারে টানাপড়েন থাকে না। তা ছাড়া চাকরির টাকা মানে হিসাবের টাকা। পাত্রী পক্ষের ধারণা অর্থনৈতিক বিষয়ে যখন এমন, তখন প্রকাশের জন্য পাত্রী পেতে তেমন বেগ পেতে হলো না। কিন্তু সমস্যা প্রকাশ নিজেই। কী ধরনের মেয়ে তার পছন্দ বিষয়টি স্পষ্ট করে অভিভাবকদের বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করছে না সে। এ বিষয়ে লাজুক লাজুকভাব তার মধ্যে সব সময়েই কাজ করে। অবস্থা এমন যে বিয়ে করাটা তার জন্য মহা দায় ঠেকা এক কাজ। এই কাজে প্রকাশ না জড়ালেই ভালো হয়। প্রকাশের মানসিকতা বিয়েকে কেন্দ্র করে ঠিক এমন নয়, এটা মনে করছেন তার আত্মীয়-স্বজনরা। প্রকাশ বরাবরই চেয়েছিল একজন নারী বন্ধু। যে তার প্রেমিকা হবে, হবে স্ত্রী। যার সঙ্গে সে জীবনের সব ধরনের কথা শেয়ার করবে। সরল কথায় যা বোঝায়, তা হলো সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সময়-অসময়ের বন্ধু। তেমন একজনকেই সে খুঁজছে। এটা তার জীবনে জুটবে কিনা সে জানেনা। চেষ্টা করতে দোষ কী। প্রেমের বিয়ে যখন ভাগ্যে জোটেনি তখন খুঁজে খুঁজেই মনের মতো পাত্রীকে বের করতে হবে। অনেকেই বলে বিয়ে হচ্ছে ভাগ্য পরীক্ষা। কারণ বিয়ে মানুষের জীবনকে পাল্টে দেয়। যদিও প্রকাশ ভাগ্যে বিশ্বাস করে না, তারপরেও সে চেষ্টা করে খোঁজখবর নিয়ে তার পছন্দমতো পাত্রী খুঁজে বের করবেই। প্রকাশ কম কথা বলা মানুষ হলেও দেখতে বেশ সুদর্শন। সুতরাং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারিবারিক কারণে তার পাত্রী পাওয়া কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে একটাই শর্ত পাত্রী তার পছন্দের হতে হবে। শিলা কিংবা সুরভির মতো হলে আরো ভালো হয়, তা হলে ওরা ওর জীবনে জীবন্ত হয়ে ধরা দেবে। তাই সে মনে মনে ওদের আদলের মেয়েই খুঁজছে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিয়েছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের নিয়েই। পাত্রী দেখার আগে যেভাবে পাত্রীর বর্ণনা দেয়া হয়, তাতে প্রকাশের মনে হয় এর চেয়ে সুন্দরী আকর্ষণীয় পাত্রী দেশে আর নেই। কিন্তু সে যখন পাত্রী দেখতে যায় তখন ঘটে বিপরীত ঘটনা। প্রকাশ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যেসব পাত্রী গত এক বছরে তাকে দেখানো হয়েছে, কোনোটাই তার পছন্দ নয়। যারা পাত্রী দেখায় তারা বলে এক আর হয় অন্যরকম। এই কারণে বিয়ের ব্যাপারে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছে। সে যখন রাস্তায় চলাচল করে তখন চোখ ধাঁধানো সুন্দরী মেয়েদের দেখতে পায়। আর যখন পাত্রী দেখতে যায় তখন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিয়েকে নগ্নভাবে যদি দেখা হয় তবে এটা একটা যৌন চুক্তি এবং পণ্যের আদান-প্রদান বা কেনা-বেচা। উৎকৃষ্ট পণ্যের দাম উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্ট পণ্যের দাম নিকৃষ্ট। এর সরল অর্থ হচ্ছে ভালো পাত্রীর জন্য ভালো বর। মাঝারি পাত্রীর জন্য মাঝারি বর। আর যেসব পাত্রীর চেহারা স্বাস্থ্য খারাপ অর্থাৎ অনাকর্ষণীয় তাদের ভাগ্যে পাত্রই জোটে না। এই কারণে বলা হয় 'কালো মেয়ের কপাল ভালো নয়।' যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালো মেয়ের প্রশংসা করেছেন, কালো হরিণ চোখের কথা বলেছেন। গুণের কথা আলাদা, বিয়ের বাজারে কালো মেয়েদের বাজারমূল্য নেই। পুরনো হলেও সত্য মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। নারীর প্রধান যোগ্যতা তার সৌন্দর্য। সুন্দর মুখের কদর সর্বত্র। আর এই সুন্দর মুখই প্রকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। তবে ও আশাবাদী একদিন না একদিন শিলা অথবা সুরভির মতো মেয়েকে সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাবে। সে জন্য হয়তো তাকে আরো অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষার পালা কবে শেষ হবে তাও সে জানে না। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিবে তাই, পাইলেও পাইতে পারো মানিক রতন।' বিয়ের বাজারে কি এভাবে মানিক রতন পাওয়া যায়। এই প্রশ্ন প্রকাশের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল। এর মধ্যে সান্ত্বনাও আছে আবার হতাশাও আছে। তবে এটাও সে বিশ্বাস করে বর্তমান যুগে মানিক রতন পাওয়া খুবই কঠিন।

১০.

প্রেমপ্রত্যাশী কিংবা প্রেমে আসক্ত কোনো তরুণের মধ্যে যেমন অদ্ভুত শিহরণ জাগে, একই ভাবে বিয়েপ্রত্যাশী কোনো তরুণের মাঝেও একই ধরনের শিহরণ জাগার কথা। কারণ বিয়ের প্রথম অবস্থায় সংসার প্রেম এসবের চেয়ে নর-নারীর শরীরই প্রধান হয়ে ওঠে। বিয়ের সময় শরীরী ক্ষেত্রে যে পুরুষ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে,

তার সংসার টেকেনি। নতুন জামাই শারীরিকভাবে সক্ষম কি অক্ষম বাসর রাতের পরেই এই প্রশ্ন সামনে চলে আসে। পুরুষের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সারারাত কীভাবে নতুন বউয়ের শরীর দখল করে থাকবে। এ ক্ষেত্রে যারা শিক্ষিত সচেতন নারী তারা খুব বিরক্ত হয়। তারা এটাও ভাবে, দুটো নতুন জীবনের শুরু যদি কেবল শরীর দিয়ে হয় তা হলে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গৌণ হয়ে যায়। বিয়ের মাধ্যমে দুটি জীবনের যে যাত্রা শুরু, ভবিষ্যৎ পথচলা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা পারস্পরিক সমঝোতা এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় না। সম্ভবত এ কারণেই বিয়েকে 'যৌন চুক্তি' বলা হয়। বিয়ের ব্যাপারে প্রকাশ ঠিক এভাবে ভাবছে না। শরীরের বিষয়টি সে গৌণ করে দেখতে চাচ্ছে এই কারণে যে, শিলা বা সুরভিকে তার যে কথাগুলো বলার ছিল, ওই কথাগুলো বাসর রাতে নতুন বউকে বলতে চায় সে। কারণ জীবন চলার ক্ষেত্রে কথাগুলো খুবই জরুরি। প্রকাশ মনে করে বিয়ের প্রধান দিক হওয়া উচিত জীবন চলার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সমঝোতা, প্রেম-ভালোবাসা না গড়ে ওঠে তা হলে কেবল শরীরী উন্মাদনা দিয়ে বেশিদূর এগুনো যায় না। ভালোবাসাহীন সংসারে শরীরী আবেদন শেষ হয়ে গেলে এবং সংসারে অর্থনৈতিক টানাপড়েন থাকলে সেই সংসারে অশান্তি দেখা দেবেই। প্রকাশ মনে করে ভালোবাসার মাধ্যমে বিয়ে না করেও সংসারে ভালোবাসা সৃষ্টি করা যায়, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা আর ত্যাগের মানসিকতা থাকে। ছাত্রজীবনে প্রকাশ কোনো নারীর ভালোবাসা পায়নি, এটা যেমন সত্য একই ভাবে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ সে ওই ধরনের ভালোবাসা পাবে– এ ব্যাপারে ও শতভাগ আশাবাদী। কারণ সে তার ভালো ব্যবহার, তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে স্ত্রীকে আকৃষ্ট করবে। সে কখনো তাকে অসম্মান বা অমর্যাদা করবে না। কারণ স্ত্রী হচ্ছে জীবনের অংশীদার। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা কেবল যাকেই বলা যায়। এসব কথা প্রকাশ যখন ভাবছে। পাশাপাশি এও ভাবছে, স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে সব বিষয়ে কি শেয়ার করা উচিত। নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় বলে তো কিছু থাকে। যা স্ত্রী কেন পৃথিবীর কারো সঙ্গেই শেয়ার করা যায় না। অন্যদিকে স্ত্রীরা কি তাদের ব্যক্তিগত সব কথা স্বামীদের বলে, নাকি তারা বেশিরভাগই গোপন করেন। বিয়ে, দাম্পত্য সম্পর্ক, পারিবারিক বিষয়-আশয় এসব নিয়ে কেন আজ প্রকাশ ভাবছে? সে কি আজ অধিক মাত্রায় বেসামাল হয়ে গেল। বিয়ের কোনো নাম-গন্ধ নেই, পাত্রীর কোনো খোঁজ-খবর নেই, অনেকটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতো অবস্থা প্রকাশের। তবে খুব দ্রুত বিয়ের বিষয়টি সুরাহা করতে চায় সে। কারণ জীবনের নতুন অধ্যায়ে গিয়ে সে নতুনভাবে সাজাতে চায়।

শিলা কিংবা সুরভির মাধ্যমে যে আশা তার পূরণ হয়নি, বিয়ের মাধ্যমে সে আশা সে পূরণ করতে চায়। বিশটি মেয়ের মধ্যে অন্তত একটি মেয়ে তো ওই রকম পাওয়া যাবে। যদি তা-ই না হয়, তাহলে মানুষ সংসার করছে কীভাবে, আর কীভাবেই মনের মতো স্ত্রী পাচ্ছে।

চার পাশের মানুষজন, যারা প্রকাশকে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের দেখানো একটি মেয়ে ও তার পছন্দ হলো না। কারণ তারা প্রথম শ্রেণির পাত্রীর ধারে-কাছেও যেতে পারে না। এ পর্যন্ত তারা যা দেখিয়েছে, বেশিরভাগই তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির। অনাকর্ষণীয় শারীরিক গঠনের কারণে উচ্চশিক্ষা না থাকায় পরিবার অর্থবিত্তে ক্ষমতায় পূর্ণ না হওয়ার কারণে ওইসব পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। কারো কারো বয়স ত্রিশও অতিক্রম করেছে। আর যাই হোক কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে রক্ষা করার জন্য তো অবতার হয়ে পৃথিবীতে আসেনি যে যাকে তাকে বিয়ে করবে। কথাটির মধ্যে বর্ণবাদের, উঁচু-নিচুর গন্ধ থাকতে পারে। তবে এটাই সত্য। যে পাত্র যত যোগ্য, সুদর্শন, ধনী এবং সামাজিক মর্যাদার আসনে

অধিষ্ঠিত তাদের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা ও অভিজাত ঘরের পাত্রীর অভাব নেই। সমস্যা কেবল বিকাশের মতো মধ্যম শ্রেণির পাত্রের ক্ষেত্রে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ওর বন্ধুরা যারা প্রেম করে বিয়ে করেছে, তারা একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। কারণ ওদের পাত্রী খোঁজার মতো বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না। অনেকে আবার ভাগ্যগুণে সুন্দরী পাত্রীও পেয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রকাশের একটা সনাতন ধারণা ছিল, বাস্তব জগতে এসে সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার আগে ও ভেবেছিল, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছেলে বিয়ে করতে চাইলে পাত্রীর অভাব হবে না। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। পাত্রপক্ষের যেমন ভাবনা রয়েছে, পাত্রী ভালো হবে কিনা, তার আচার-ব্যবহার কেমন হবে, সংসারের সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা, স্বামীর প্রতি অনুগত থাকবে কিনা। অন্যদিকে পাত্রীপক্ষ ভাবে ছেলে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিনা, ছেলের চরিত্র কেমন অন্য নারীর প্রতি আসক্ত কিনা, ছেলে মদ্যপ কিনা কিংবা অন্য কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিনা। লোভের বশবর্তী হয়ে মেয়েকে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন করবে কিনা, নিষ্ঠুর হলে হত্যাও করতে পারে, মেয়ে বিয়ে দেয়ার আগে এসব কথা ভাবে পাত্রীপক্ষ। যার কারণে বিয়ে বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে গেছে। বাসর রাতে খুনের ঘটনা এ দেশেই ঘটেছে। বিয়ের ২৪ ঘণ্টার মাথায়, সাতদিনের মাথায় তালাক ও খুনের ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। বিয়েকেন্দ্রিক পরিস্থিতি যখন এমন জটিল তখন পাত্র কিংবা পাত্রীপক্ষ সাত-পাঁচ ভেবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সামনে এগোয় এবং বিয়ের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে।

এ পর্যন্ত অন্তত ২০টি পাত্রী দেখেছে প্রকাশ। এর ১৭টি তার পছন্দ হয়নি। সে বিত্ত-বৈভব চায় না, চায় না শ্বশুরবাড়ির বিশেষ অর্থনৈতিক সহযোগিতা। কারণ সে মনে করে এসব তার নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ। এর ফলে তার ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। তবে স্বেচ্ছায় যদি শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে কোনো উপহার দেয় সেটা ভিন্ন কথা। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকাটা সে কখনো পছন্দ করত না। সে বরাবরই চলে ইচ্ছামাফিক, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। বিশৃঙ্খল জীবনযাপন তার একেবারেই পছন্দ নয়। প্রকাশ মনে করে মানুষের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তার জীবন যদি আত্মনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে সে প্রকৃত মানুষ নয়। মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত এটা মানুষকেই প্রতিনিয়ত প্রমাণ করতে হবে। তার ধারণা যে ভালো মানুষ নন, সে ভালো স্বামী নন। ভালো স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অবশেষে আত্মীয়-বন্ধুদের মাধ্যমে পাত্রী দেখা সে বন্ধ করে দিল। সে নারী খোঁজার জন্য রাস্তায় বের হলো। বেশ কয়েকদিন শহরের নারীপ্রধান এলাকায় ঘোরাঘুরি করল। হাল ফ্যাশনের বহু মেয়ে দেখল সে, তার দুই-চারটাকে পছন্দও হলো। ওই পর্যন্তই কারণ অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সাহস ও মানসিকতা কোনোটাই তার নেই। সুতরাং এই পথেও প্রকাশের সুখ নেই, জীবনের সমাধান নেই, কেবল আক্ষেপ আছে। এ পথে দিন কয়েক ঘোরাফেরা করেও ভাবল, পত্রিকায় 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়। এ বিষয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করল। বন্ধুটি তাকে হতাশ করল, বলল, পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেসব পাত্রী পাওয়া যায় সেগুলো তোর পছন্দ হবে না। কারণ কোনো না কোনো খুঁত ছাড়া পাত্রীপক্ষ বিজ্ঞাপন করেন না। বন্ধুর কথায় প্রকাশ এ ব্যাপারে আর আগ্রহ প্রকাশ করে না।

১১.

অবশেষে একদিন ওদের বাড়িতে এক আত্মীয় আসে। প্রকাশের মায়ের পক্ষের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। প্রকাশের বাবা-মায়ের সঙ্গে ওর বিয়ের

ব্যাপারে আলাপ করে ভদ্রলোক। অবশেষে তিনি যা বললেন তার সারকথা হচ্ছে, একজন ভালো ঘটক তার জানা-শোনা আছে। ঘটকালি তার পেশা নয়। নেশা এবং এটাকে তিনি সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব হিসেবে মনে করেন। ঘটকের নাম রবিউল। রবিউল এ পর্যন্ত অন্তত ৫০টি বিয়ে দিয়েছে এবং প্রত্যেক দম্পতিই সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। এই ৫০ জুটির একটিরও বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটেনি বলে রবিউল প্রকাশ্যে গর্ব করে বলে। রবিউল বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অর্থ নেন না। তবে কেউ যদি খুশি হয়ে তাকে কোনো কিছু উপহার দেন, তবে তা সে সানন্দে গ্রহণ করেন। রবিউল সদা হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টভাষী এবং মধ্য বয়সী ব্যক্তি। রবিউলের ওপর আস্থা রাখা যায়। দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি প্রকাশের পরিবারের সামনে রবিউল সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক বয়ান দিল যে, প্রকাশের বিয়ের ব্যাপারে সবাই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

এ ঘটনার দিন সাতেক পরে প্রকাশদের তাজমহল রোডের বাসায় ঘটক রবিউলের আগমন ঘটল। পেশাদার ঘটকের মতোই পাত্র-পাত্রীর ছবি অ্যালবাম ও বায়োডাটা রয়েছে তার কাছে। তবে প্রকাশের বাবা-মাকে তিনি বাছাইকৃত তিনটি ছবি ও বায়োডাটা দেখালেন। যে মেয়েটি একহারা গড়নের বেশ লম্বা ফর্সা এবং আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী সে মেয়েকে দেখে পছন্দ করল সবাই। প্রকাশ যখন ছবিটি দেখল তখন সে অবাক হলো, মেয়েটি দেখতে অনেকটাই সুরভির মতো। বিশেষ করে ওর চোখ দুটো বেশ আকর্ষণীয়। ছবি দেখে প্রকাশের মনে হলো মেয়েটি হয়তো সুরভির ছোট বোন। সুরভিকে সে জীবনে পায়নি কিন্তু তার বোনকে যদি স্ত্রী হিসেবে পায়, তাতে মন্দ কী। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে। এ পর্যন্ত যারাই মেয়েটি ছবি দেখেছে কেউ দ্বিমত করেনি। মেয়ের বাবা সরকারি আমলা ছিলেন। লালমাটিয়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকলেও এই শহরের একাধিক জায়গায় জমি রয়েছে। মেয়েটির দুর্বলতা হচ্ছে সে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। ডিগ্রি পাস করেছে লালমাটিয়া কলেজ থেকে। পাস করার পর পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে চাকরিতে ঢোকে। কারণ চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে। মেয়ের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনায়, ঘটক রবিউলের বাড়িও সেখানেই। এমন একটি সুন্দরী মেয়ের কলেজজীবনেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ চাকরিরত অবস্থায়ও বিয়ে হয়নি। কেন এ ধরনের সন্দেহজনক প্রশ্ন যখন প্রকাশের পরিবার ঘটকের সামনে ছুড়ে দিল, তখন ঘটকের একটাই উত্তর মেয়ের পাত্র পছন্দ হয় না। অনেক উচ্চপদের সরকারি কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার দেখানো হয়েছে। কোনো পুরুষকেই তার কাছে আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ববান মনে হয় না। ঘটকের এই বক্তব্যের মধ্যে কতটা যুক্তি রয়েছে আর কতটা মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে তা প্রকাশের পরিবার নির্ণয় করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রকাশের সন্দেহও বেড়ে যায়। তারপরেও প্রকাশ মেয়েটি দেখতে চায়। প্রকাশ বলল, মেয়েটিকে সে উন্মুক্ত জায়গায় দেখবে, সংসদ ভবনের সামনে হলে ভালো হয়। ঘটক বলল, তিনি এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না। আগে মেয়ের পরিবার ও মেয়েকে প্রকাশের ছবি, বায়োডাটা দেখাতে হবে। তারা যদি ওকে পছন্দ করেন, তবে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা ও পাত্রী দেখার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। অবশেষে পাত্রীর পরিবারের কাছে প্রকাশের ছবি, বায়োডাটা পৌঁছাল। এর চারদিন পর খবর এলো যে পাত্রী প্রকাশকে পছন্দ করেছে।

দুদিন পর ঘটক রবিউল বাসায় এসে খুশিতে আত্মহারা। এটা তার ঘটকালির কৌশল বা অপকৌশল কিনা প্রকাশের পরিবারের কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। তার একটা কথা সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর একমাত্র মেয়ে শাহনাজ আক্তার পলিকে গত পাঁচ বছরে অন্তত ২০টি ছেলেকে দেখিয়েছি, সে কাউকেই পছন্দ করেনি। প্রকাশকে তার পছন্দ হয়েছে। কী কারণে

প্রকাশকে পছন্দ হয়েছে এর যথার্থ উত্তর পলির কাছ থেকে পাওয়া যায় না। অবশেষে পারিবারিক আনুষ্ঠানিকতা ও দেখাদেখির আগে এক মেঘমুক্ত বিকালে পলির সঙ্গে সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউতে দেখা হলো প্রকাশের। পলিকে দেখে অবাক হলো। যেন এমন একটি মেয়েকেই সে খুঁজছিল। সুরভির সঙ্গে তার চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে সুরভির চেয়েও লম্বা এবং ওর ফিগার আকর্ষণীয়। প্রকাশের সঙ্গে পলির তেমন কথা হলো না। তবে প্রকাশকে দেখে হাসল। ওর খুব রহস্যময় ঠেকল ওর হাসি। এত সুন্দর মেয়ের কেন ঘটকের মাধ্যমে বিয়ে হবে– এই প্রশ্ন প্রকাশের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল। পলিকে খুবই শান্ত, বিনয়ী, নিরহংকারী, ভদ্র মনে হলো। ওর এও মনে হলো, পলি সারাজীবনই তার বাধ্যগত অনুগত থাকবে। স্বামীর মতের বাইরে সে কোনো কাজ করবে না। পলি উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল, এটা গভীরভাবে লক্ষ্য করল প্রকাশ। আজ প্রকাশের খুব করে সুরভির কথা মনে পড়ছে। সুরভির ছায়াই যেন পলি। পলির সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা চলে, তখন তার কানে এমন কথা এসেছিল যে, পলির আগে বিয়ে হয়েছিল। বিষয়টি পারিবারিকভাবে গোপন রাখা হয়েছে। এই তথ্য জানার পর কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল প্রকাশ এবং পলির ব্যাপারে তার আগ্রহে ভাটা পড়েছিল। বিষয়টি যখন ঘটককে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বলল, সৈয়দ সাব আমার পাশের গ্রামের। তাকে আমি ত্রিশ বছর ধরে চিনি, জানি। তার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমি জানব না। আগেই বলেছি, মেয়েটি খুব স্বাধীনচেতা এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ পুরুষদের সে পাত্তা দেয় না। তবে উগ্র নয়। ঘটকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশের পরিবার বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। মেয়ে যেহেতু চাকরিজীবী এবং সৈয়দ পরিবারের, বনেদি তাই বিয়েতে ১০ লাখ ১০ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়।

দেনমোহরের ব্যাপারে প্রকাশের মা আপত্তি তোলে। কারণ দেনমোহরের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। যেসব পাত্রীপক্ষ তাদের পরিবার ও মেয়ের সামাজিক মর্যাদা পাত্রপক্ষের সামনে উপস্থাপন করে বেশি টাকা দেনমোহর ধার্য করে তাদের বেশিরভাগেরই অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। এক শ্রেণির পরিবারের এটা একটা ব্যবসাও। তারা সুকৌশলে বেশি টাকা দেনমোহর ধার্য করেন এবং কিছুদিন সংসার করার পর নানা অজুহাতে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়ার চেষ্টা করেন। অথবা ওইসব পাত্রী পাত্রপক্ষকে এমন এক পারিবারিক প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যায় নানা অশান্তির মাধ্যমে পড়ে পাত্রপক্ষ তালাক দিতে বাধ্য হন। ফলে যদি ২০ লাখ টাকা দেনমোহর ধরা হয় তবে পুরো টাকাই পাত্রীকে বা স্ত্রীকে দিতে হয়। ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারে সাধারণ এমন ব্যবসায়িক ফাঁদ রচনার সুযোগ থাকে না। তারা সহনীয় পর্যায়ে দেনমোহর ধরেন– যা পাত্রপক্ষ দেয়ার সক্ষমতা রাখেন। এদিক চিন্তা করলে প্রকাশের বিয়েতে যে দেনমোহর ধরা করা হয়েছে তাতে পাত্রীপক্ষের অর্থকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক মানসিকতাই ফুটে উঠেছে।

প্রকাশের বাবার এ ক্ষেত্রে ঘোর আপত্তি। তিনি মনে করেন দেনমোহর সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা হতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এ বিপুল অর্থ সম্পূর্ণ বেমানান। উচ্চমূল্যের দেনমোহর অথবা যৌতুক দাবি করলে বিয়ে ভেঙে যায়। এমন কি বিয়ের আসর থেকেও বরপক্ষ উঠে যায়। আর এসবই বাণিজ্যিক কারণে। এই বিবেচনায় প্রকাশের বিয়েটাও ভেঙে যেত, কেবল প্রকাশের প্রবল ইচ্ছার কারণে বিয়েটা হলো। এর মধ্যে নতুন আরো এক শর্ত আরোপ হলো। বিয়ের সময় মেয়েকে সব বিদেশি পোশাক, কসমেটিকস ও অন্যান্য সামগ্রী দিতে হবে। আগে যেমন মেয়েকে পণ দিয়ে বরপক্ষকে

তুলে আনতে হতো। পলির পরিবারের বিষয়টি অনেকটাই তাই। কেবল ১০ লাখ ২ টাকা দেনমোহরই নয়, ২০ ভরি গয়না দিতে হবে। এসব কথায় মনে হলো, বিয়েটা সম্পূর্ণ একটা বাণিজ্যিক চুক্তি। এ ধরনের চুক্তি প্রকাশের নীতিবিরোধী। ও মনে করে বিয়ের মাধ্যমে দুটি জীবন এক হবে, দুটি আত্মা, মন মিলে যাবে, এক মোহনায় চলে আসবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুজনে সুখে-দুঃখে থাকবে। এটাই প্রকৃত দাম্পত্য সম্পর্ক। কিন্তু বিয়ের বাজারে এসে এ কী দেখছে সে। ছাত্রজীবন থেকেই সে দেখে আসছে যৌতুকের কারণে কেবল বিয়েই ভেঙে যাচ্ছে না, স্ত্রীকে নির্যাতন, হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এসব বিষয় যখন সে চিন্তা করত তখন তার মনটা কুঁচকে যেত। মানুষের লোভের মাত্রাটা সে সাধারণ বোধের মধ্যে আনতে পারত না। মানুষ কেন মানুষকে নির্যাতন করে, কেন হত্যা করে এটা তার সাধারণ বুদ্ধিতে ধরত না। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, সৌজন্যবোধ, দরদ ও ভালোবাসা কেন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে যান্ত্রিক ও নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুরতা প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে লোভ। এই লোভের চিত্রই সে তার বিয়েতে দেখতে পেল। পলি ও পলির পরিবারের দেনা-পাওনাজনিত আচরণের কারণে প্রকাশ ও তার পরিবার এ বিয়েতে রাজি ছিল না।

১২.

দুটো কারণে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো। প্রথমত, প্রকাশের জন্য পছন্দসই পাত্রী পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, পলিকে প্রকাশের খুবই পছন্দ। তাই ২০ ভরি গয়না ও ১০ লাখ ১০ টাকা দেনমোহরের ব্যাপারে প্রকাশের পরিবার রাজি হয়ে গেল।

বাসর রাত ভালো কাটলেও দিন কয়েক পর প্রকাশ তার সুন্দরী নববধূর কাছ থেকে হোঁচট খেল। পলি এক রাতে কথার ফাঁকে বলল, আমি কিন্তু তোমার পরিবারের সদস্যদের বাধ্যগত হতে পারব না। আমি চলব আমার মতো করে। কারণ এখন নারী স্বাধীনতার যুগ চলছে। বউকে যা বলবে তাই শুনবে ওই যুগের অবসান হয়েছে অনেক আগেই। এমনকি তোমার কথামতোও আমি চলব না। স্ত্রী মানে কেনা গোলাম নয়। স্বামী এবং স্বামীর পরিবার যা বলবে তাই শুনতে হবে এই পুরনো ধারণার অবসান হয়েছে অনেক আগেই।

পলির কথায় প্রকাশের মাথায় আগুন ধরে গেল। আর যাই হোক এমন স্ত্রী তো সে প্রত্যাশা করেনি। যেসব নারী অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা বা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ওর ধারণা তারাও বিয়ের প্রথম অবস্থায় এমন কথা বলবে না। বিয়ের প্রথম থেকেই যেসব পুরুষের স্বপ্নভঙ্গ হয় প্রকাশ কি তাদের দলে পড়ে গেল? এতদিন তাহলে নারী ও বিয়েকেন্দ্রিক তার যে ধারণা ছিল তা পুরোপুরি ভুল। সে পলির সঙ্গে তর্কে জড়াতে চায় না। নতুন বউয়ের সঙ্গে তর্কে জড়ানো অশোভন। সে এতদিন যে শিলা ও সুরভির কথা চিন্তা করে অন্য নারীদের পরিমাপ করেছিল, এটা তাহলে ভুল। তার এক বন্ধু তাকে বলেছিল– 'বিয়ে যখন অতি আগ্রহ করে করতে যাচ্ছিস, দুদিন পরেই টের পাবি নারী জাতি কী জিনিস। পৃথিবীতে সব নারীর স্বার্থকেন্দ্রিক চরিত্র প্রায় একই।' বন্ধুর কথাটি প্রকাশের কাছে তত্ত্বকথা হিসেবে মনে হয়েছিল। অবশ্য ও কথাটা হেসে হেসে বলেছিল। প্রকাশ ওর কথা একেবারেই আমলে নেয়নি। প্রকাশ অন্যত্র পড়েছিল– 'একজন পুরুষের স্বর্গসময় বিয়ের আগ পর্যন্ত। কেউ যদি জীবিত থেকেই নরকে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তার দ্রুত বিয়ে করা উচিত।' এসব কথা তার কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে– এই কারণে যে, সে চারদিকে সুখী দম্পতিদেরও দেখছে। এই উদাহরণ তো খুব দূরের নয়। তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পারিবারিক কোনো বিষয়েই ঝগড়া হয়নি। কেবল তাই নয়, তার যে ছোট চাচা, খুব মেজাজি স্বভাবের, কই তার সঙ্গেও তো চাচির কোনোদিন বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে বলে মনে হয়নি। তাহলে সব নারী এক হলো কী করে? আর সব নারী যদি এক হয় তাহলে সমাজ টিকে আছে কী করে।

প্রকাশ শুনেছে বাসর রাত হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে সুখী ও সুন্দর রাত। এই রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবেগ রোমান্টিকতা যেমন জেগে ওঠে একই ভাবে তারা একে অন্যকে নিবিষ্টভাবে পেতে চায়। একই সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে জীবনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা বলে। সুখে-দুঃখে একসঙ্গে পথচলার পরিকল্পনা করে। আবার অনেক নবদম্পতি রয়েছে তারা শরীরী বিষয়-আশয়ে প্রাধান্য না দিয়ে সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দেয়– এই রাতকে স্মরণীয় করার জন্য। প্রকাশের খালাতো বোন ইমা বেশ ফ্রি। রাখঢাক না রেখে সব সময় খোলামেলা কথা বলে। ইমার যখন বিয়ে হয় তখন সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছে। কথাটা এক কান দুই কান হয়ে প্রকাশের কানেও পৌঁছে। ইমার স্বামী জহিরুল বেশ কামুক প্রকৃতির রোমাঞ্চহীন পুরুষ। বাসর রাতে ইমার সঙ্গে ভালোমন্দ স্বপ্ন সম্ভাবনা আশা-প্রত্যাশার কোনো কথা বলেনি। কোনো রোমান্টিক আচরণও করেনি। একরকম বোবা লোকের মতো থেকে সারারাত কেবল শরীর দখল করে রেখেছিল। ইমার চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বাসর রাতের শরীরী সুখ পাওয়ার পর নববধূ আনন্দিত হয়, স্বামী কর্মবীর এই ধরনের কথাও গোপনে গোপনে বাড়ির মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। আর এ উল্টো ঘটনা ঘটলে বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে যায়। নববধূ বাপের বাড়ি গিয়ে আর ফেরে না। স্বামীর যৌন অক্ষমতার কারণে অবশেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এমন পরিবেশে কোনো কোনো স্ত্রী ঘর করে, যারা ত্যাগী মানবিক অথবা স্বামী যশখ্যাতি অর্থবিত্তের লোভে। কিন্তু ইমা তার স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিত ও রীতিমতো আতঙ্কিত। ওর মনে হয়েছে ওর স্বামী ওকে সারারাত ধর্ষণ করেছে। এরপর ইমার মানসিক বিপর্যয় ঘটতে থাকে। এই ধরনের ঘটনা যদি জহিরুল একদিন ঘটাতো তাহলে কথা ছিল। রাতের পর রাত সে একই কাজ করতে লাগল। যেন সে শরীরের জন্যই কেবল বিয়ে করেছে। নববধূর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কীভাবে প্রাধান্য দিতে হয় এর কিছুই যেন সে জানে না বা শেখেনি। হানিমুনে যাওয়া তো দূরের কথা। আশপাশেও কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা কোনোদিন পোষণ করেনি। কেবল শরীরের কারণে যদি কোনো পুরুষ বিয়ে করে এবং যাকে বিয়ে করে সে যদি উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী হয় তাহলে তার ওই স্বামীর সঙ্গে সংসার করার কথা নয়, শেষ পর্যন্ত ইমার বিয়ে টিকল না। কারণ কেবল শরীরের মধ্যে তো জীবন ও সংসার সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে আনন্দ-বিনোদনের সঙ্গ-সাহচার্যের আরো কত দিক রয়েছে। একজন স্বামী যদি ওইসব দিকের গুরুত্ব না দেয় তবে তাকে প্রকৃত স্বামী বলা যায় না। একতরফাভাবে স্বামীদের দোষ দিয়ে কী লাভ। বিয়ের প্রথমদিনেই পলি প্রকাশের সঙ্গে যে আচরণ করেছে এবং যেভাবে ওর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, তাতে পলির প্রতি তার আচরণ কেমন হবে সেটাই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'বিয়ে হচ্ছে ভাগ্য পরীক্ষা'– এ কথাটা বার বার তার কানে বাজতে লাগল। বিয়ের সাতদিন পর পলির আচরণ হঠাৎ বদলে গেল। এরপর থেকে পলি বলতে গেলে সারারাত ঘুমিয়েই কাটাতে লাগলো। যেন সে স্বামীর শূন্য কোনো বিছানায় ঘুমাচ্ছে। আবেগ, অনুরাগ, ভালোবাসা এমনকি কর্তব্যবোধও যেখানে উধাও।

স্ত্রী যতই উচ্চশিক্ষিত হোক, বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের রেওয়াজ হচ্ছে শ্বশুর-শাশুড়িকে নববধূ সালাম করবে এবং মা-বাবা অথবা আব্বা-আম্মা হিসেবে সম্বোধন করবে। তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। এই দিকটাও পলির মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত। বিয়ের সাতদিনের মাথায় অল্পশোকে কাতর অধিক শোকে পাথর হওয়ার মতো অবস্থা হলো প্রকাশের। সে কি কোনো ঘোরের মধ্যে থেকে ভুল করেছে, নাকি এটা তার নিয়তি তা সে নিশ্চিত হতে পারছে না। প্রকাশের আরো মনে হলো, পলি তার জীবনে এসেছে কতগুলো চুক্তি বা শর্ত নিয়ে। এর বাইরে সে চলবে না। তার এমনও মনে হচ্ছে কেউ তাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে। তাহলে যে ঘটক রবিউল বলেছিল, পলির কোনো পুরুষকেই পছন্দ হয় না। কারণ সে পছন্দমতো কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ পাচ্ছিল না। কেবল প্রকাশকে তার পছন্দ হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার প্রতিফলন তো সে দেখতে পাচ্ছে না। কেবল তাই নয়, প্রকাশের দুই বোন মান্যতা ও অনন্যা, তাদের সঙ্গেও পলির আচরণ শোভন নয়। একমাত্র ভাবীকে পেয়ে ওদের আহ্লাদিত

হওয়ারই কথা। এটাই সঙ্গত ও যৌক্তিক। পলির আচরণ ওদেরও ব্যথিত করল। প্রকাশদের পরিবারে কোনো চাকরিজীবী বউ নেই। চাকরিজীবী স্ত্রীরা এমন হয় কিনা তাও ওদের জানা নেই। অচেনা কেউ পরিবারে আত্মীয় হিসেবে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে সে আপন হয়ে ওঠে। অথবা সবাই তাকে আপন করে নেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই পরিবারের নববধূ একেবারেই ব্যতিক্রম। তার হামবড়া অহংকারী ভাব পরিবারের সবাইকেই ব্যথিত করল। অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই চারিত্রিক দিক থেকে পলি এরকম। বিয়ের সময় প্রকাশের চাচা আকরাম হোসেন তো বলেই ফেললেন, প্রকাশের বউয়ের মতো এত শান্ত-স্নিগ্ধ বউ সে জীবনেও দেখেনি। সত্যিকার অর্থেই প্রকাশ ভাগ্যবান। 'সবুরে মেওয়া ফলে'– বিয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশের ব্যাপারে তাই ঘটল। আসলে ভালো বউ পাওয়া কপালের ব্যাপার। প্রকাশের কপাল ভালো বলেই, ও এমন বউ পেয়েছে।

১৩.

বাবা ইয়াকুব আলী, মা সুরমা খাতুন দুই বোনকে নিয়ে প্রকাশদের সংসার। এক বোন মিরপুর বাঙলা কলেজে, অন্য বোন ইডেন কলেজে পড়ে। বোনদের খুব আদর করে প্রকাশ। বোনদের যে কোনো আবদার বরাবরই রক্ষা করে আসছে সে। প্রকাশ অন্তর্মুখী চরিত্রের হলেও পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে সে বেশ খোলামেলা। প্রকাশের বিয়ের ব্যাপারে যখন নানা জায়গা থেকে কথাবার্তা শুরু হয় এবং পাত্রী দেখার ধুম পড়ে যায়, তখন বোনদের আনন্দ আর ধরে না। তারা প্রকাশের বিয়েকে কেন্দ্র করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ নতুন ভাবী ঘরে আসবে, ঘর আলোকিত হবে, তা ছাড়া বাবা-মাকেও দেখাশোনা করতে পারবে।

প্রকাশদের পরিবারের একটা প্রধান দিক হচ্ছে, অবসর সময়ে সবাই একসঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠে। ভাই-বোনদের মধ্যে খুনসুটিও হয়। এসব ইয়াকুব আলী ও সুরমা খাতুন খুব উপভোগ করেন। ওদের ধারণা ছিল, নতুন বউ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুতেই নতুন মাত্রা পাবে, সবাই তাকে নিয়ে মাতামাতি করবে। সে ধারণার অপমৃত্যু হলো এক সপ্তাহের মধ্যে। তাজমহল রোডের মাঝবরাবর যে ছোট পার্ক, পার্কের দক্ষিণ পাশে প্রকাশদের বাসা। বাসা থেকে দুই মিনিট হাঁটলেই পার্ক। এ পার্কটি দীর্ঘদিন সংস্কারহীন ছিল, মানুষ চলাচলের এবং বসার অনুপযোগী ছিল। একটি বড় ভবনের চার তলায় ভাড়া থাকে প্রকাশরা। তিন বেডের বাসা। এক বেডে প্রকাশ থাকে, অন্য আরেক বেডে দুই বোন এবং আরেক বেডে বাবা-মা। এ বাসার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে সবাই ঘরকন্নার কাজ করতে পারদর্শী। এ বাসার প্রত্যেকেই রান্না করতে পারে এবং সকালে নাশতা ও চা-ও বানাতে সবাই অভ্যস্ত। ঢাকা শহরের অন্যান্য বাসায় যেটা দেখা যায়, বাসার পুরুষ সদস্যরা ঘরকন্নার কোনো কাজ তো করেই না, উপরন্তু তারা জগ থেকে পানি পর্যন্ত গ্লাসে ঢেলে পান করে না। সেদিক দিয়ে ইয়াকুব আলী ও প্রকাশ অন্য ধরনের। দুই বোন কলেজে চলে গেলে এবং সুরমা খাতুনের শরীর খারাপ থাকলে ইয়াকুব আলী কিংবা প্রকাশ নিজে ডিম পোচ করবে, চা বানাবে। পরিবারের মহিলা সদস্যরা যদি কোথাও বেড়াতে যায় তাহলে পিতা-পুত্র রান্না করে খাবে। তারা কখনই হোটেলের দ্বারস্থ হবে না। শহরের উঠতি মধ্যবিত্তরা বা উচ্চমধ্যবিত্তরা হয় কাজের বুয়ার ওপর নির্ভরশীল, না হয় তাদের রেস্টুরেন্ট বা ফাস্টফুডনির্ভর জীবন। বাসায় রান্নাবান্না হয় না বললেই চলে। এটা আধুনিক সংসারের লক্ষণ। এখন এটা নাগরিক পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ হয়েও দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শহরের যারা বনেদি মধ্যবিত্ত তারা এ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা মনে করে এসবের মধ্যে প্রাণ নেই। এর ফলে পারিবারিক আবহ ও সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। প্রকাশের বিয়ের আগ পর্যন্ত এ পরিবারের পরিবেশ ছিল একেবারেই শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ। কিন্তু এ বাসায় পলির প্রবেশের পর থেকেই পরিবেশ একেবারে পাল্টে গেল। একদিন ভোরবেলা প্রকাশ পলিকে চা বানাতে বলল, এ কথা শুনে পলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, এক গাদা লোকের চা বানানোর জন্য তো এ বাসায় আমি আসিনি, আমি কি কাজের বুয়া যে চা-নাশতা বানিয়ে জনে জনে সার্ভ করব! পলির এ কথায় প্রকাশ বিস্মিত হলো। বলল, এটা আমাদের বাসার কালচার সবাই কাজ ভাগাভাগি করে করি। আমাদের কোনো কাজের বুয়া নেই। পলি বলল, যাদের কাজের বুয়া রাখার সামর্থ্য নেই, যারা ছোটলোক, বনেদিপনা যাদের রক্তে মাংসে বংশে নেই, তারা তো কাজ ভাগাভাগি করে করবেই। আমাদের বাসায় তিন তিনটে কাজের বুয়া। মনে রাখবে, বুয়াগিরি করার জন্য এ বাসায় আমি আসিনি। এক গ্লাস পানিও আমি ঢেলে খেতে পারব না। আমার সকালের নাশতা রাতের খাবার টেবিলে সাজানো থাকবে। তোমাদের পক্ষে যদি এসব সম্ভব না হয় তাহলে আমার জন্য আলাদা কাজের বুয়া রেখে দাও। প্রকাশ পলির কথার কোনো উত্তর করে না। ও বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হলো ও বিয়ে করেনি খাল কেটে কুমির এনেছে। ওর কথামতো সকালবেলা চা-নাশতা টেবিলে থাকবে। সে অর্ধেক খাবে আর অর্ধেক রেখে অফিসের দিকে রওনা দেবে। সন্ধ্যার পর বাসায় এসে দুই ননদকে ডাকাডাকি শুরু করবে, নানা কাজের জন্য। নিজের কাপড়-চোপড় ধোয়া, স্ত্রী করা এসবের দায়িত্ব যেন প্রকাশের দুই বোনের। শ্বশুর যা বাজার করে তা পলির পছন্দ নয়। সে বরাবর দামি মাছ মাংস খেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এ বাসায় তার লেশমাত্র নেই। পলির কাছে মনে হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের টানাপড়েনের সংসার। তাই এদের খাবারও ওর পছন্দ নয়। ফল কথা এ পরিবারের সঙ্গে পলি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। যখন তখন যার তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সে। এক স্বর্গসম বাসা মাত্র কিছু দিনের মধ্যে নরকে পরিণত হলো। পলি প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার আগে প্রকাশের কাছে ২০০ টাকা চাইবে। এটা নাকি তার যাতায়াত ভাড়া। এ ছাড়া অন্যান্য হাতখরচ, পোশাক-আশাক সবই প্রকাশকে কিনে দিতে হবে। এর অন্যথা হলে পরিবারের সবার সামনে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। একবার ঈদে শাড়ি কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা চাইল পলি, প্রকাশ তাকে ৫ হাজার দিল। প্রকাশের মা-বাবার সামনে এসে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল পলি, প্রকাশও পাশে ছিল। টাকা সবার সামনে ছুড়ে ফেলল। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, চড়া কণ্ঠে বলল, ছোটলোকের সঙ্গে বিয়ে হলে এমনই হয়, যাদের জাত ছোট তাদের মন উদার হবে কীভাবে? তারা তো বউকে বস্তির মেয়ে মনে করবেই। পলির এ আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। আর যাই হোক এমন বউ তো তারা চায়নি।

১৪.

প্রকাশের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, এমনটাই ধারণা করছেন তার মা-বাবা। এ ঘটনায় সুরমা খাতুন অতীতচারী হয়ে পড়লেন, স্বামীর ব্যবসার আগে যখন তিনি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, তখন আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ওই সময়ে অনেক ঈদেই তিনি নতুন শাড়ি নেননি। স্বামী ইয়াকুব আলী অনেক পীড়াপীড়ি করলেও তিনি নিতেন না। এমনকি হাত খরচের জন্যও কোনো টাকা দিতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না। নিতান্ত দায়ঠেকা না হলে তিনি স্বামীর কাছে কোনো কিছু আবদার করতেন না। প্রেস ব্যবসায় আসার পর তার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। সংসারে সচ্ছলতা চলে আসে। এই সময়েও তিনি স্বামীর কাছে দামি পোশাক বা দামি অলঙ্কার দাবি করেননি। সুরমা খাতুন সংসারের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সে জন্য অবশ্য ইয়াকুব সাহেব তাকে বরাবরই দেখে আসছেন শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে। এর সঙ্গে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং আত্মার টান তো রয়েছেই। যে কোনো মানুষের এসব কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে যেমন অর্জন করেছেন সুরমা খাতুন। কিন্তু আজ কী দেখছেন তিনি। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত ও স্বাধীন হয়েছে, স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তাদের জীবনে ও নানা কর্মকাণ্ডে। তার মানে এই নয় যে, তারা স্বেচ্ছাচারী হবে, হবে বেআদব। লোভ ও নিষ্ঠুরতা তাদের পেয়ে বসবে। এসব চিন্তা করে তার আক্ষেপ বেড়ে যায়। তিনি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েন।

আজ এসব কথা সুরমা খাতুনের মনে হচ্ছে, বার বার মনে হচ্ছে তার পুত্রবধূর আচরণ দেখে। জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশকে মারধর

করা তো দূরের কথা কোনো কটুকথা কিংবা বকাবাজিও সুরমা খাতুন করেননি। শত বিপদে আপদে একমাত্র ছেলেকে ছায়ার মতো আগলে রেখেছেন। প্রকাশও সব সময় বাবা-মায়ের বাধ্যগত থেকেছে। একজন শান্ত-ভদ্র ছেলে হিসেবেই আত্মীয়-স্বজনরা প্রকাশকে চেনে, জানে। অথচ সে স্ত্রী পেয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। খালাতো বোন সুমির সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় পাকা করেছিল ইয়াকুব সাহেব। সুমি শ্যামবর্ণের এবং উচ্চতায় মাঝারি। কিন্তু তার গুণের শেষ নেই। বিয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সুরমা খাতুন বললেন, আত্মীয়ের সঙ্গে নতুন করে আত্মীয়তা না করাই ভালো, তাতে পারিবারিক জটিলতা বাড়ে, কখনো কখনো কাছের আত্মীয় দূরের হয়ে যায়। সুমির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে প্রকাশের মায়ের যেমন মত ছিল না, একইভাবে প্রকাশও তেমন আগ্রহী ছিল না। কারণ এর মধ্যে পলিকে সে দেখেছে, তার সঙ্গে কথাও হয়েছে। পলিকে কেন্দ্র করে সে নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখা শুরু করেছে। এ অবস্থায় সে সুমিকে নিয়ে ভাবতে চাচ্ছে না। কিন্তু বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই সুরমা খাতুন বুঝতে পারলেন সুমির সঙ্গে পলির চরিত্রগত পার্থক্য আকাশ-জমিন। এর মীমাংসা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। পলি রান্না নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সমালোচনা করবে। কারণ এ সংসারে বেশির ভাগ সময় রান্না করেন প্রকাশের মা। রান্নার সমালোচনা করা মানে শাশুড়ির সমালোচনা করা– এটা প্রকাশের পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন।

একদিন সকালে এ পরিবারে আরো এক অবাক করা ঘটনা ঘটে। অনন্যা চা বানিয়ে সবাইকে দেয়, একইভাবে ভাবীকেও দেয়। পলি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে থুথু ফেলে এবং চা সুদ্ধ কাপ মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলে, 'এটা কোনো চা হলো, কাজের বুয়ারাও এর চেয়ে ভালো চা বানায়। এত বড় হয়েছ, এখনো চা বানানো শেখনি।' ভাবীর এ আচরণে অনন্যা কেবল ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয় না, রীতিমতো কেঁদে ফেলে। পরিবারের সদস্যরা আরো একটি বিষয় বিস্ময়ে সঙ্গে লক্ষ্য করে, নববধূ খুব সেজেগুজে অফিসে যায়। অফিসে যাওয়ার আগে তার সাজতেই এক ঘণ্টা চলে যায়। তা ছাড়া যে পোশাক পরে অফিসে যায়, তা এ পরিবারের বউ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রকাশদের পরিবার অত্যন্ত মার্জিত ও উন্নত রুচির অধিকারী। পারিবারিকভাবে এ নিয়ে একদিন বৈঠক হলো, যে বৈঠকে প্রকাশও উপস্থিত ছিল।

অবশেষে সিদ্ধান্তটি এমন হলো যে, এসব বিষয়ে প্রকাশের মা একদিন পলির সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু পলির যেটা বড় ধরনের বাজে দিক তা হলো সে অফিস থেকে সময়মতো বাসায় ফিরবে না। প্রায় দিনই দেরি করে আসবে। এসে ক্লান্ত হয়ে নিজের রুমে ঢুকবে আর বের হবে না। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। প্রকাশ বাসায় থাকলে স্ত্রীর ফায়ফরমাশ খাটতে হয় ওকেই। একটু অন্যথা হলে হয় আজেবাজে কথা বলবে, না হয় ঝগড়া বাধিয়ে দেবে। আর যদি প্রকাশ বাসায় না থাকে তবে দুই বোনের যে কোনো একজনকে ডাকবে। ভাবীর ডাকে ওরা সব সময় তটস্থ থাকে। পলি যেন এ বাসার মূর্তিমান আতঙ্ক। বন্ধের দিন হলে তো কথাই নেই সারা দিন ঘুমাবে, না হয় ফোনে অনর্গল কথা বলবে। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলে, এ বিষয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করাও যাবে না।

পলির আচরণে ও চলাফেরায় পরিবারের সবার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। এ পরিবারের শান্তি বিনষ্টের একমাত্র কারণ পলি। কারণ এ পরিবারে প্রবেশের পর থেকেই সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। তাই অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে সুরমা খাতুন পলির সঙ্গে কথা বলবেন। প্রথমে তিনি ছোট মেয়ে অনন্যাকে দিয়ে পলিকে তার রুমে ডাকলেন। পলি এলো না। পরে কিছুক্ষণ পর বাধ্য হয়ে তিনিই গেলেন। বললেন, বউমা তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

–বলুন।

–তুমি এ পরিবারের সবার সঙ্গে যে আচরণ

করছ তা কি শোভন?

–আমি তো কারো সঙ্গে খারাপ আচরণ করিনি। বরং আপনারাই আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করছেন না।

–তার মানে?

–আমার প্রতি আপনাদের কোনো কেয়ার নেই। ভালো ভালো জিনিস আপনারা খাচ্ছেন, আর আমার জন্য প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট খাবার রাখছেন। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেন না। যেন আমি আপনাদের শত্রু।

–তুমি তো মুরুব্বিদের সম্মান কর না, মর্যাদা দাও না, পরিবারের সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কর।

–আপনার অভিযোগ মিথ্যা। আসলে আপনারা চাচ্ছেন না, এ সংসারে আমি থাকি।

–এটা তোমার সংসার।

–মিথ্যা কথা। আপনি এ সংসার থেকে তাড়ানোর একটা মতলব এঁটেছেন। আমি নিজেই চলে যাব। আপনাদের মতো ছোটলোকদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে থাকতে পারে না।

এ কথা বলেই পলি কান্না শুরু করে দিল। এরপর আধা ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু গুটিয়ে বাবার বাসায় চলে গেল। এ ঘটনায় পরিবারের সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশকে কেউ ফোন করল না, প্রকাশ ব্যবসার কাজে ভোরেই বাইরে চলে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় প্রকাশ বাসায় এলো। বাসার সবাই গম্ভীর। কারো মুখে হাসি নেই। পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন যে, কোনো শোকসন্তপ্ত পরিবারে সমবেদনা জানাতে সে এসেছে। প্রকাশ প্রথমে এসে নিজের রুমে গেল। রুমে ঢুকে অবাক হলো সে। কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র সব এলোমেলো, ওয়ার্ডরোবের তাক খোলা। প্রথমে ও ভেবেছিল ছুটির দিনে পলি বাথরুমে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার মনে হলো হয়তো সে বাইরে গেছে, কিছুক্ষণ পরই হয়তো ফিরে আসবে। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পলির মোবাইলে ফোন দিল প্রকাশ। মোবাইল বন্ধ। বিয়ের পর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পলির সঙ্গে কথা হয় না প্রকাশের। সে দ্বিতীয়বার যখন পলিকে ফোন করতে যাবে, তখন মায়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল। পাশে দাঁড়িয়ে সুরমা খাতুন। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, কাকে ফোন করছিস বাবা।

তোমার বউমাকে, বলল প্রকাশ। ফোনে পাচ্ছিস না এই তো, না পাওয়ারই কথা। কেন মা, মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল প্রকাশ। মা বললেন, বউমা তার বাপের বাড়ি চলে গেছে। মায়ের কথায় প্রকাশ অবাক হলো না, শুধু বলল– কেন? কবে আসবে? মা বললেন, তার কথায় বোঝা গেল 'ছোটলোকদের' বাসায় সে আর কোনো দিন আসবে না। এবার প্রকাশের বুঝতে অসুবিধা হলো না, নদীর জল অনেক গড়িয়ে গেছে। মাকে সে আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। তবে মা কর্তব্যের খাতিরে ছেলেকে সব খুলে বললেন।

সব কথা শুনে প্রকাশ কোনো মন্তব্য করল না। পলি যে এমন একটা কাণ্ড করতে পারে, তা সে আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। যাওয়ার আগে সে তার গহনা, পোশাক-আশাক নিয়ে গেছে, এমনকি প্রকাশ গোপন জায়গায় ২০ হাজার টাকা রেখেছিল তাও নিয়ে গেছে। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি কিংবা ঝগড়া হলে স্ত্রীরা সাধারণত স্বামীর কাছে অভিযোগ করে সত্য-মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। স্বামীকে তার পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী আলাদা সংসার করতে বাধ্য হয়। স্ত্রীর প্ররোচনা ও মিথ্যাচারের কাছে শেষ পর্যন্ত স্বামীকেও হেরে যেতে হয়। কিন্তু পলির বিষয়টি ভিন্ন, সে স্বামীকে না জানিয়ে হঠাৎ বাপের বাড়ি চলে গেছে, তাও আবার তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। এ ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভবিষ্যতে হয়তো সে এ সংসারে আসবে না। একদিকে পলির পরিবার প্রকাশদের পরিবারের চেয়ে অনেক সচ্ছল, অন্যদিকে পলি চাকরিজীবী, নিজের পায়ে দাঁড়ানো । স্বামী এবং তার পরিবারের মুখাপেক্ষী

তাকে না হলেও চলবে। এসব বিষয় মাথায় এনে হয়তো সে রাগের মাথায় নয়, ঠাণ্ডা মাথায় চলে গেছে। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের বউরা সাধারণত এমন হয় না। শেষ পর্যন্ত প্রকাশের ভাগ্যে এমনটা জুটল। একজন যে আরেকজনের মতো হয় না এটা প্রকাশ নিশ্চিত হলো, পলির মধ্যে সুরভির ছায়া আছে, কিন্তু সে সুরভি নয়। সংসার জীবনে এসে মেয়েরা বদলে যায় এটা খুবই স্বাভাবিক। আবার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ নিয়ে স্ত্রীরা সংসার করছে না? তাদের সঙ্গে সমঝোতামূলক সৌহার্দ্যমূলক আচরণ করছে না? সংসারের শুরুতেই পলি ব্যর্থ হলো কেন? এ ক্ষেত্রে পলির দোষ কতখানি আর প্রকাশের পরিবারের দোষই বা কতখানি? পলি স্বাধীনচেতা মহিলা, ভালো কথা; স্বাধীনচেতা মানে এই নয় যে, সে যাচ্ছেতাই করবে। তাই প্রকাশ এ ব্যাপারে মাথা ঘামাল না। পলিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ও কোনো আগ্রহ প্রকাশও করলো না।

১৫.

রাতে ইয়াকুব সাহেব একটি পারিবারিক মিটিং ডাকলেন। ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, পলিকে ফিরিয়ে আনা হবে। এ ক্ষেত্রে বাগড়া দিল প্রকাশ। প্রকাশ বলল, ও ফিরে এলে একই আচরণ করবে এবং একই ধরনের ঘটনা ঘটাবে। তাতে পরিবারের সবার মধ্যে অশান্তি বেড়ে যাবে। প্রকাশের কথা সবাই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করল। এরপর পলিকে পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কেউ আর আগ্রহী হয়ে উঠল না।

পরদিন পলির মা আতিকা আলী প্রকাশের মাকে ফোন করে বললেন, আপনারা আমার মেয়ের ওপর মানসিক নির্যাতন চালিয়েছেন, তাকে অবমূল্যায়ন ও অমর্যাদা করেছেন, আমার মেয়ে আর আপনাদের পরিবারে ফিরে যাবে না। পলির মায়ের কথার আগাগোড়া কিছুই সুরমা খাতুন বুঝতে পারলেন না। তার মনে হলো, বউ যা যা বলেছে, একই কথা তার মাও বলছেন।

পলির সঙ্গে অমৃতমধুর সম্পর্ক যা-ই হোক, দুজনে তো এক বিছানায় ঘুমিয়েছে। এর মধ্যে কি সবই বাজে অসুখকর স্মৃতি, কোনো মধুর সময়, আনন্দময় স্মৃতি কি নেই। পলির ব্যবহার যাই হোক, মানুষ হিসেবে যাই হোক, বিছানায় সে খুব সাড়া দেয়। এ ধরনের স্ত্রী হয়তো একশোতেও একটা পাওয়া যাবে না। নারীর বাইরের আচরণ ও সৌন্দর্য এবং বিছানার সৌন্দর্য এক নয়। নারী-পুরুষ দিনের বেলা যা-ই করুক না কেন, পারস্পরিক সম্পর্ক যে পর্যায়েই থাকুক না কেন– রাতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাই প্রকাশ যখন রাতে ঘুমাতে যায় তখন পলিকে গভীরভাবে অনুভব করে। খালি বিছানায় সারা রাত এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। পলিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর মজাই আলাদা। যেসব পুরুষ বিয়ের আগে গভীরভাবে কোনো নারীর সঙ্গ পায়নি, পায়নি শরীরী কোনো আনন্দ, তাদের কাছে নতুন বউয়ের শরীরী কদরই আলাদা। প্রথম দিকে তারা মহা ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। এ ঘোর কাটানো তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয়ে ওঠে না। পলি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যে আচরণই করুক না কেন, পলির শরীরী বিষয়টি সে কোনোভাবেই ভুলতে পারছে না। এ এক দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই পলিকে তার দরকার। কিন্তু পলি তো আর এ বাসায় ফিরে আসবে না। তাহলে প্রকাশ কি ঘরজামাই থাকবে– বাবা-মা, বোনদের ছেড়ে? এটাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তার জন্য করণীয় কী। কোন পথে হাঁটবে সে। আজ মনে হচ্ছে সবাইকেই তাকে দরকার। কাউকেই সে ছাড়তে চাচ্ছে না। এর মধ্যে সাত দিন পেরিয়ে গেল। পলির সঙ্গে প্রকাশের কোনো যোগাযোগ হলো না। ওর মনটা আনচান করে উঠল। রাতে বিছানায় ঘুমাতে গেলে ঘুম আসে না। চারদিকে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা। আবার এর সমাধানও সে বের করতে পারছে না। সে একবার ভাবল পলিকে ফোন করবে, তারপর কী যেন ভেবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল।

তার ব্যক্তিগত শরীরী স্বার্থের চেয়ে পরিবারের স্বার্থটিই বড় হয়ে দেখা দিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পলি প্রকাশের মাকে অপমান করেছে, অপমান করেছে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে। যেন অপমান করার জন্যই তার এ পরিবারে আগমন ঘটেছিল। এর জন্য মূলত প্রকাশ নিজেই দায়ী। কারণ তার আগ্রহ ও পছন্দ তীব্র না হলে এ বিয়ে হতো না। তার এক আত্মীয় বলেছিল চাকরিজীবী মেয়েরা প্রকৃত সংসারী হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া সারা দিন অফিস করার পর তাদের মেজাজ খিচড়ে যায়। এর পাশাপাশি যাতায়াতজনিত ধকল তো রয়েছেই। অন্যদিকে যারা সুন্দরী নারী, তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে আরো বেশি ধকল পোহাতে হয়। কেউ কেউ যৌন হয়রানির শিকারও হয়। ফলে চাকরিজীবী নারীদের মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। অবশ্য সব চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু একজন নববধূ হিসেবে পলির যে আচরণ, তা এর সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় কি? যদি না খায় তবে পলির প্রকৃত সমস্যা কী। ওকি কেবলই অহঙ্কারী ও উগ্র মেজাজি, নাকি ওর কোনো বড় ধরনের মানসিক সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়গুলো প্রকাশকে ভাবিয়ে তুলল। ও ঠিকমতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যায় না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। ও একটা বিষয় ভেবে পায় না, অভিযোগ করার জন্যও তো পলি ওকে একবার ফোন করতে পারত। না, পলির কোনো ফোন এলো না। ফোন না আসায় প্রকাশ ধরে নিতে বাধ্য হলো, পলি আর এ সংসারে ফিরে আসবে না। পাশাপাশি ওর এও মনে হলো, পলি সকালবেলা উগ্র প্রসাধন দিয়ে যেভাবে দীর্ঘক্ষণ সেজে অফিসে যেত, তাতে কি অফিসের কারো সঙ্গে ওর সম্পর্ক রয়েছে? সে সম্পর্কের কারণেই কি সে ঠুনকো অজুহাত তুলে বাসা থেকে রাগ করে চলে গিয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে। আসলে প্রকাশ এখন কোনোটাই ভাবতে চাচ্ছে না।

১৬.

ওর বিয়ের পরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। একটা রেস্টুরেন্টে বসে দুজনে চা পান করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তমাল বেশ স্মার্ট ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করত। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল ওর। বন্ধুদের ডেকে চা-নাশতা খাওয়া তো। আজ এত বছর পর দেখা তার সেই জৌলুস নেই। যেন জীবনসংগ্রামে পরাজিত এক সৈনিক। আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারে, তার স্ত্রীই আজ তাকে পথে বসিয়েছে। তমাল শেলীকে খুব ভালোবাসত। শেলী অনিন্দ্য সুন্দরী হওয়ার কারণে তমাল ছিল তার ব্যাপারে অন্ধ। শেলীকে সে খুব বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসের প্রতিদান সে দিয়েছে চরম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে। নিজের কিছু সঞ্চিত টাকা এবং গ্রাম থেকে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছিল তমাল। ফ্ল্যাটটি দিয়েছিল শেলীর নামে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে শেলী অন্য একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ল। তমাল যখন অফিসে থাকে কিংবা অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে যায়, তখন ওই তরুণকে ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে। দুজনে রাতও কাটিয়েছে এই ফ্ল্যাটে। এই বিষয় নিয়ে শেলীর সঙ্গে তমালের প্রায়ই ঝগড়া হয়। শেলীর দাবি হিমেল তার ভালো বন্ধু। সে তার বাসায় আসতেই পারে। শেলীর যুক্তি তমালের পছন্দ হয় না। একদিন হিমেলের সঙ্গে কথা হয় তমালের, তার ফ্ল্যাটে। হিমেলকে বাসায় আসতে নিষেধ করে সে। হিমেল কিছু বলার আগেই শেলী সামনে এসে দাঁড়ায়, অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলে, এই ফ্ল্যাটটি তো আমার। হিমেলকে নিষেধ করার তুমি কে? তুমি এই বাসা থেকে এখনই বের হয়ে যাও। শেলীর কথা শুনে তমালের মাথায় আগুন চড়ে যায়, সে শেলীর গায়ে হাত তোলে। শেলীকে রক্ষা করতে হিমেল এগিয়ে আসে। এরপর ত্রিমুখী হাতাহাতি শুরু হয়। একপর্যায়ে শেলী ও হিমেল দুজনে মিলে

তমালকে পিটিয়ে বাসা থেকে বের করে দেয়। ভালোবাসার মানুষের এমন আচরণে তমাল কেবল বিস্মিতই হয়নি, সে ভীষণভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এরপর থেকে তমাল রাস্তায় রাস্তায় বেসামাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তমাল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত, সেই চাকরিও সে ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে জীবনটা অর্থহীন মনে হচ্ছে। ওই ঘটনার এক বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তমাল স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। তার ঘটনা শুনে বন্ধুরা বলে, 'বউকে অন্ধের মতো ভালোবাসলে এমনই হয়।' নিজের ভালোবাসার মানুষ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিংবা কেউ যদি চরমভাবে প্রতারণার শিকার হয় তবে তার জীবন যে বিপন্ন হবে, এমন কি সে আত্মহননের পথও বেছে নিতে পারে– এটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এমন ঘটনা সমাজে প্রায়ই ঘটছে। যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আস্থার দেয়াল ধসে পড়ছে।

তমালের ঘটনা শোনার পর প্রকাশ কোনো মন্তব্য করে না। শুধু এটুকু বলে, ওরা ইচ্ছা করলে তোকে মেরে ফেলতে পারত। সৃষ্টিকর্তাই তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আসলে ভালো বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বউ ভালো না হলে চারদিকে বিপত্তি। কারণ তার কুপ্রভাব পরিবার থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও পড়ে। বদনামও কুড়াতে হয় মাঝে মাঝে। হয়তো কেউ অবলীলায় কোনো আড্ডায় বা ঘরোয়া সভায় বলে ফেলল, 'ওর বউ তো খারাপ।' বউ খারাপের অনেক তাৎপর্য বহন করে। বউ ভালো এর মধ্যেও অনেক তাৎপর্য রয়েছে। ভালোর ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাদা বা স্বচ্ছ। আর খারাপের ব্যাপারে কেবল রহস্য ও কৌতুহল কাজ করে। খারাপের মধ্যে খারাপ খুঁজে ফেরে। যা সুভাস ছড়ায় না, কেবল দুর্গন্ধ ছড়ায়। তমালের প্রশ্ন আমার কাহিনী শুনে তোর আর কোনো বক্তব্য নেই।

প্রকাশ বলল, নারী-পুরুষের জীবনের জন্য অনিবার্য অংশ, যদি পুরুষ তা মনে করে, আর যদি কেউ মনে করে এটা জীবনের বাড়তি আপদ, জঞ্জাল। এর চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকাই উত্তম। নারীর ক্ষেত্রে একেক পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেক রকম।

তমাল বলল, কথাটা ঠিক। তবে আমি বাকি জীবন একা থাকতে চাই। কারণ আমি দ্বিতীয় কোনো প্রতারকের খপ্পড়ে পড়তে চাই না। ভালো কথা, তোর খবর কী, বিয়ে তো নিশ্চয়ই করেছিস।

- হ্যাঁ করেছি।
- ভাবী কেমন দেখতে।
- ভালো, বেশ সুন্দরী, নায়িকাদের মতো ফিগার।
- তুই তা হলে সৌভাগ্যবান।
- হ্যাঁ, তা তো বটেই।
- আমার কপালটাই খারাপ প্রকাশ। শেলীকে আমি এত বিশ্বাস করতাম। আর ও আমার সঙ্গে এমন আচরণ করল?
- ওই যে বললাম ভালো বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। একথা বলে প্রকাশ হো হো করে হেসে উঠল।

তমাল এই হাসির অর্থ বুঝতে পারল না। এরপর যে যার গন্তব্যে চলে গেল। যাওয়ার আগে ফোন নাম্বার বিনিময় হলো। পাশাপাশি এও বলা হলো ভবিষ্যতে দুই বন্ধু আবার আড্ডা দেবে। একে অন্যের জীবনের গল্প বলবে, যে গল্প দুজনের জন্যই জরুরি। গল্প কখনো কখনো জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৭.

মা সুরমা খাতুন প্রকাশকে একদিন ডেকে বলল, যা হওয়ার তা হয়েছে, বউমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। এভাবে বউ বাপেরবাড়ি থাকলে আত্মীয়-স্বজনরা কী বলবে। মায়ের কথায় প্রকাশ বলল, ওকে ফিরিয়ে আনলে তো ও সবার সঙ্গে একই আচরণ করবে। তাতে সংসারে অশান্তি আরো বেড়ে যাবে। মা বললেন, তা হলে কী করতে চাস। আমাদের পরিবারে তো স্ত্রীকে তালাক দেয়ার রেওয়াজ নেই। এতে পরিবারের সম্মানহানি হয়। তালাক, ছাড়াছাড়ি এটাও এক ধরনের পারিবারিক অশান্তি। তুই বরং এবার পলিদের ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বল। ও কী বলতে চায় আগে শোন পরে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। মায়ের কথায় কিছুটা সায় দিল প্রকাশ। ছুটির দিনে এক সকালে ও গেল পলিদের বাসায়। পলির তখন সারা খাটে শরীর বিছিয়ে ঘুমাচ্ছিল। ও আস্তে আস্তে পলির কপালে হাত রাখল। পলি প্রথমে চমকে উঠল। ওর গভীর ঘুম হলেও প্রকাশ কপালে হাত রাখামাত্র কীভাবে জেগে গেল এটা এক বিস্ময়। পলি প্রকাশকে দেখে মুচকি হাসলো তারপর ওর হাতটা বুকের ওপর নিয়ে বলল, তুমি কখন এলে। একটি বারের জন্যও আমাকে মনে পড়েনি। প্রকাশ দেখতে পেল কেবল পলির আচরণই নয়, এ বাসায় সবার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজ সে প্রকৃত জামাই আদর পাচ্ছে। অবশেষে পরিবারের সবাই মিলে প্রকাশের সঙ্গে বসল, তাদের কথার সারমর্ম এই যে, পলি যেহেতু প্রকাশের পরিবারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না, সুতরাং ওর আলাদা বাসা নিয়েই থাকা উত্তম। ওদের প্রস্তাব শুনে প্রকাশ বলল, আমি বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করি।

পলি বলল, আলাপ করার কিছু নেই। তুমি আলাদা বাসা নাও, ওই নরকে আমি আর যাব না।

পলি, তার পরিবারকে নরক বলছে, এর কোনো ভিত্তি নেই, কারণ সে তার পরিবারের সদস্যদের ভালো করেই চেনে। তারপরেও এই কথার সে প্রতিবাদ করল না। পলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি যখন আলাদা বাসায় থাকতে চাইছ, তাই হবে। তবে বিষয়টি আমার পরিবারকে জানানো উচিত। আলোচনা শেষে পলি প্রকাশকে তার রুমে নিয়ে গেল এবং দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো। যেন কেউ কাউকে জীবনের এক মুহূর্তের জন্যও আর ছাড়তে চাচ্ছে না। তারা সারাদিন অন্তরঙ্গ সময় কাটালো। সন্ধ্যায় বাসায় আসতে চাইলে পলি বাধা দিল। অবশেষে রাতও থাকতে হলো। আজকের রাত পলির সঙ্গে কাটানোর পর প্রকাশের মনে হলো পলি তার জীবনের জন্য অনিবার্য। এই অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে সে পলিকে নিয়ে আলাদা থাকবে। প্রথম রাত পলির সঙ্গে কাটানোর পরও সে বাসায় আসতে পারল না। পর পর তিন রাত পলির সঙ্গে কাটাল প্রকাশ। এরপর সে পুরোপুরি পলির অনুগত হয়ে গেল। এ এক শরীরী ঘোর। এই ঘোর কাটানো হয়তো কোনো দিনই প্রকাশের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনদিন পর বাসায় ফিরল প্রকাশ। মাকে ওদের মতামতের কথা জানালে মা বললেন, সংসারে শান্তি আনতে চাইলে বউমার প্রস্তাবেই তোর রাজি হওয়া উচিত। প্রকাশ এ ব্যাপারে কোনো কথা বলল না। প্রকাশের পরিবারের সদস্যরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, প্রকাশ দুদিন পর আবার পলিদের বাসায় চলে গেল। এবার সে এলো সাতদিন পর। বলতে গেলে বিরতি দিয়ে দিয়ে সারা মাসই প্রকাশ পলিদের বাসায় গিয়ে থাকল, ছেলে আস্তে আস্তে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তার মানসিকতা আর আগের মতো নেই। আগে পলির বিরুদ্ধে নানা কথা বলত। এখন মা বউমা সম্পর্কে কোনো কথা উত্থাপন করলে চুপ হয়ে যায়।

একদিন সুরমা খাতুন প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করল,

– বউমা কি এ বাসায় আর আসবে না।

– ও তো আমাকে আলাদা বাসা নিতে বলেছে, তুমি কী বলো?

– আমি আর কী বলব, তোর যা ভালো মনে হয় তা-ই কর।

১৮.

ইচ্ছেয় হোক আর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হোক, শেষ পর্যন্ত প্রকাশকে আলাদা বাসা নিতে হলো। বাসাটি প্রকাশদের আগের বাসা থেকে খুব দূরে নয়। গ্রাম থেকে একটি কাজের মেয়েও আনা হলো। বিয়ের প্রথম থেকেই সন্তান নিতে চেয়েছিল প্রকাশ। কিন্তু পলি রাজি ছিল না। সে চাকরি করবে না সন্তান লালন-পালন করবে। এমন প্রশ্ন তুলে বিষয়টিকে বিলম্বিত করে সে। কিন্তু নতুন বাসা নেয়ার ছয় মাস পরই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পেটে সন্তান এলে সাধারণত মহিলারা পরিবর্তন হয়। অথচ পলির ক্ষেত্রে ঘটল অন্যরকম ঘটনা। বউমা অন্তঃসত্ত্বা শুনে একদিন প্রকাশের বাবা-মা তাকে দেখতে যায়। কিন্তু পলি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, এমন কি আপ্যায়নও করে না। তারা যে মিষ্টি ও ফল নিয়ে এসেছিলেন, তাও ফেরত নিয়ে যেতে বলেন। প্রকাশের বাবা-মা ঘটনাটি না বললেও কাজের মেয়ের মাধ্যমে ও পুরো ঘটনা জানতে পারে। পলি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কারণে ওকে কিছু বলে না সে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, এর কয়েকদিন পর অনন্যা আসে ভাবীকে দেখতে। প্রকাশ যখন বাসায় ঢুকছিল তখন অনন্যাকে বাসা থেকে কেঁদে বের হতে দেখল ও। ওর বুঝতে বাকি থাকল না, যে পলি আসলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ও আগের মতোই রয়েছে। নম্রতার জন্ম হওয়ার পরও প্রকাশের পরিবারের পক্ষ থেকে ওকে কেউ দেখতে আসেনি, পিছে পলি তাদের অপমান করে। কেবল তাই না, পলির বাবা-মারও এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই। অথচ তারা নিয়মিত এ বাসায় আসছে, থাকছে। পলির মা তো এ বাসায় প্রায় স্থায়ী। নম্রতা হওয়ার আগ থেকে তিনি এ বাসায় আছেন। তার মুখ থেকেও প্রকাশের মা-বাবার এই বাসায় আসার ব্যাপারে কোনো কথা শোনা গেল না। এভাবে কেটে গেল এক বছর।

নম্রতা যখন দুই বছরে পা দিয়েছে, তখন পলির প্রমোশন হয়। সে মালিকের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ পায় এবং তার বেতনও বেড়ে যায়। তার পোশাকে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। হাতে একাধিক স্মার্ট ফোন। ইদানীং সে প্রায় রাত করে বাসায় ফেরে। নম্রতা পুরোপুরি কাজের মেয়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাকে কিছু বললেই সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। গভীর রাত পর্যন্ত তার ফোন আসে। সে দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথাও বলে। একদিন তার মোবাইলে আপত্তিকর ম্যাসেজ পাওয়ার পর প্রকাশ হিংস্র হয়ে ওঠে। অবশ্য এ ব্যাপারে পলি নির্বিকার। ম্যাসেজে লেখা ছিল 'আজ তুমি আমাকে যেভাবে আনন্দ দিয়েছ, আদর করেছ, এমন আনন্দ-আদর জীবনেও পাইনি। এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' এ ম্যাসেজ পড়ার পর প্রকাশের মাথা খারাপ হয়ে যায়, স্ত্রীর শরীরের প্রতি তার ঘৃণা ধরে যায়। এক ছাদের নিচে থাকলেও তার আর তাৎপর্য থাকে না। প্রকাশ কখনো কখনো নম্রতাকে নিজের বিছানায় নিয়ে আসে। ওকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে।

পলির আরো একটি খারাপ অভ্যাস হচ্ছে, মানি ব্যাগ থেকে শুরু করে বাসার যে জায়গায় টাকা পাবে, সে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাও করা যাবে না। জিজ্ঞাসা করলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করবে সে। বাবা-মা বংশ তুলে গালাগালি দিতে শুরু করবে। যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ সে ঝগড়া করতেই থাকবে। তার ঝগড়ার মধ্যে ছোট জাতের, ছোট বংশের ছেলেকে সে বিয়ে করে জীবন নষ্ট করে ফেলেছে এসব কথা থাকবেই।

দিন যতই যাচ্ছে প্রকাশের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে পত্রিকায় এক সংবাদ পাঠ করে প্রকাশের ভেতর অন্য চিন্তা খেলা করতে থাকে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পরকীয়ার কারণে স্ত্রীকে খুন করেছেন এক ব্যক্তি। এই সংবাদ পাঠের পর তার মাথায়ও খুনের নেশা চেপে যায়। সে পলিকে খুন করার জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং প্রথম রাতে ব্যর্থ হয়ে নম্রতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। সে নম্রতাকে মা হারা করতে চায় না। আবার পলিকে হত্যা করে সে জেলেও যেতে চায় না। তাই প্রথম রাতের ব্যর্থতাকে চাপা দেয়ার জন্য সে পলির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে থাকে। সে তার জন্য দামি উপহার নিয়ে আসে। মানিব্যাগ ভর্তি করে টাকা রেখে পলির দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখে। এভাবে পলির সঙ্গে সে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু খুনের নেশা সে ছাড়তে পারে না। কাজের মেয়ের কাছে নম্রতাকে রেখে দুজনে ছাদে যায়। ছাদে যাওয়ার ব্যাপারে পলি রাজি হয় এই কারণে যে, ওইদিন পূর্ণিমা ছিল এবং আকাশব্যাপী জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছিল। এই জ্যোৎস্নার দেখার প্রলোভন দেখায় প্রকাশ। বিয়ের পর পর ওরা দুজন পূর্ণিমার রাতে একবার ছাদে উঠেছিল। জ্যোৎস্নাপাগল পলি খুব সহজেই রাজি হয়ে যায়। এই দিনও প্রকাশ একটি স্ত্রী হত্যার সংবাদ পাঠ করে– যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীকে জবাই করে লাশ টুকরো টুকরো করে। এই সংবাদ পাঠের পর প্রকাশের মাথায় আবার খুন চেপে যায়। কারণ পলির বিরুদ্ধে তার অভিযোগের অন্ত নেই। প্রথমত, সে তাকে তার বাবা-মা-বোনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, প্রকাশের সঙ্গে সে খুব কমই ভালো ব্যবহার করেছে। সর্বশেষ তার নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে। এছাড়াও সে একমাত্র কন্যা নম্রতার ব্যাপারে উদাসীন। এত অপরাধ যার তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাই আজ প্রবল জ্যোৎস্না রাতেই কাজটি সম্পন্ন করতে চায় সে। এই বাড়ির ছাদের রেলিং বেশি উঁচু নয়, আবার এক জায়গা ভাঙা। গল্পের ছলে ভাঙা জায়গায় নিয়ে চাঁদ দেখাতে দেখাতে জ্যোৎস্নার গল্প বলতে বলতে এক ফাঁকে ধাক্কা দিয়ে পলিকে সাত তলা থেকে ফেলে দেবে প্রকাশ। সে ঘোর সৃষ্টি করে ভাঙা রেলিংয়ের কাছে নিয়েও গেছে, কিন্তু ধাক্কা দেয়ার সাহস পেল না। তার চোখের সামনে নম্রতার ছবি ভেসে উঠল। নম্রতা পলিকে আম্মি বলে ডাকছে। আজো প্রকাশের সারা শরীর কাঁপতে লাগল, তার শরীরে ঘাম দেখা দিল। পলিকে ছাদে রেখেই সে দ্রুত বাসায় চলে এলো। হঠাৎ প্রকাশ কেন তাকে না জানিয়ে বাসায় চলে এলো, তার কারণও বুঝতে পারল না।

পলির প্রশ্ন–

–তুমি আমাকে রেখে চলে এলে যে।

–আমার শরীর খারাপ করছিল।

–আমাকে বললেই পারতে। চোরের মতো পালিয়ে আসার মানে কী। যে জ্যোৎস্নার মর্ম বোঝে না তার জ্যোৎস্না দেখা উচিত নয়। অবশ্য যার রুচি যেমন। প্রকাশ পলির কথার কোনো উত্তর করে না। ও ঘাপটি মেরে নিজের রুমে থাকে।

আজ পলি অনেক দিন পর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কিন্তু প্রকাশ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারল না। প্রকাশ কেন হঠাৎ জ্যোৎস্না দেখা বাদ দিয়ে বাসায় চলে এলো এ বিষয়টির হিসাব পলি কোনোভাবেই মেলাতে পারছে না। দুজনের দূরত্ব আবার বাড়তে থাকে। প্রকাশ বাবার সঙ্গে আলাদা হয়ে কম্পিউটার ব্যবসা শুরু করেছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। তার এখন অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। নিজের পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো নয়। অনেকটা পরিবারের অমতে সে পলির সঙ্গে আলাদা সংসার করছে। অথচ আলাদা সংসারে এসেও পলির সঙ্গে নানা বিষয়ে সকাল-বিকাল ঝগড়া লাগে। পলিকে সে স্ত্রী হিসেবে সহ্যই করতে পারছে না। এর একটা মীমাংসায় আসতে চায় সে। এ বিষয়ে তার এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে সে। বন্ধুটি বলে, এই মুহূর্তে স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে দেনমোহরের সাত লাখ টাকা দিতে হবে। গয়নার মাধ্যমে প্রকাশ তিন লাখ টাকা উসুল দেখিয়েছিল। অন্যদিকে নম্রতা ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত তার খোরপোশ দিতে হবে একই সঙ্গে পলির খোরপোশও দিতে হবে। প্রকাশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সে এই দিকেও অগ্রসর হতে পারছে না।

১৯.

ইদানীং তাজমহল রোডের ছোট্ট পার্কটিতে একা বসে থাকে প্রকাশ। সকালবেলা হাঁটতে এসে এখানে বসে সে। নানা কিসিমের পুরুষ, মহিলা বসে অথবা হাঁটে। পার্কের মাঝখানে হাসনাহেনা ফুলের গাছ। হাসনাহেনা দিনের বেলায় ফোটে না, ঘ্রাণও দেয় না। ছোটবেলায় শুনেছে, হাসনাহেনার ঘ্রাণের মাদকতায় রাতে সাপ পর্যন্ত চলে আসে। হাসনাহেনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রকাশ। তার এখন কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না সে। সংসারে যদি নম্রতা না থাকত, তাহলে তার এত চিন্তা ছিল না। নম্রতাই তার জীবনের একমাত্র ভরসা। পলিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে নম্রতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার সংসারের যন্ত্রণাও সে সহ্য করতে পারছে না। নম্রতা আর তার ভবিষ্যৎ যাই হোক, পলিকে সে খুন করবেই। জীবনে সে এই একটি খুনই করতে চায়, যে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

স্ত্রী হিসেবে কেমন মেয়ে সে চেয়েছিল। আজ তার মনে এই প্রশ্ন জাগছে। সে মূলত চেয়েছিল মেয়েটি শারীরিকভাবে সৎ হবে এবং হবে সংসারের প্রতি মনোযোগী। এর কোনোটাই সে পায়নি। যেসব স্বামী রক্ষণশীল কিংবা স্বামীর পরিবার রক্ষণশীল তারা বউকে চাকরি করতে দেয় না। এর কারণ দুটো, এক. তারা পরিবার ও সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। দুই. এদের একটা অংশ অন্য পুরুষের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, এমন কি ঘরও ভেঙে যায়।

প্রকাশের এক বন্ধুর বড় ভাইয়ের স্ত্রী একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক। এক তরুণের সঙ্গে তিনি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তরুণটি তাকে এমন ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়, অবশেষে দুজনে পালিয়ে যায়। বন্ধুটির বড় ভাই

ডেভেলপারের ব্যবসা করত। একদিন বাসায় এসে দেখে বাসার আলমারি খোলা এবং সবকিছু এলোমেলো। সে একটি জমি বায়না করার জন্য ব্যাংক থেকে পাঁচ লাখ টাকা তুলেছিল। ওই টাকাসহ নিজের অলংকার, কাপড়-চোপড়সহ ভেগে গিয়েছে। সংসারে রেখে গিয়েছে তিন সন্তান। বন্ধুটির ভাই পড়ল মহাবিপদে। সামাজিকভাবেও সে মুখ দেখাতে পারছে না। অবশ্য এক মাসের মাথায় ওই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ওই তরুণ টাকা ও অলংকার আত্মসাৎ করে এবং বন্ধুর ভাইয়ের স্ত্রীটিকে মহাবিপদে ফেলে চলে যায়। বন্ধুটির বড় ভাই তাকে আর ঘরে তোলে না। অবশেষে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে।

তিন সন্তান ও সংসারকে সামাল দিতে গিয়ে তিনি অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাতে তার সংসারে অশান্তি আরো বেড়ে যায়। নতুন বউ তার সন্তানদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে না। বিশেষ করে ছোট মেয়েটিকে সে প্রায়ই মারধর করে। এর মধ্যে পত্রিকায় সংবাদ বের হয়, সৎমা এক শিশুকে হত্যা করেছে। এই ঘটনায় প্রকাশের বন্ধুর ভাই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ায় বড় ভাইয়ের এসব ঘটনা প্রকাশকে বলে তার বন্ধু। প্রকাশের সংসার কেমন চলছে এই প্রশ্নের উত্তর সে তার বন্ধু আলিমকে দিতে পারে না, এড়িয়ে যায়। কারণ প্রকৃত ঘটনা সে জনে জনে বলতে পারবে না। এতে তারই মর্যাদা হানি হবে।

যে কোনো ঘটনাই মনের মধ্যে পুষে রাখা ভয়ঙ্কর। এতে মারাত্মকভাবে মানসিক বিপর্যয় ঘটে। যার কারণে কারো না কারো সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীকে সে হত্যা করতে চায় এটা তো কারো সঙ্গে শেয়ার করার বিষয় নয়। তা হলে তো ওই ব্যক্তি সাক্ষী হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়বার হত্যা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর তার মনে এই দ্বিধার জন্ম নিল যে, তারপক্ষে এই কঠিন কাজ হয়তো কখনো করা সম্ভব নয়। সে এও মনে করে চারপাশের স্বামীরা অবলীলায় স্ত্রীদের হত্যা করে চলেছে, কেউ কেউ হত্যার পর পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আবার কেউ থানায় বা আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিচ্ছে কেউ কেউ। কেউ হত্যা করছে যৌতুকের জন্য, কেউ হত্যা করছে স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে, আবার কেউ হত্যা করছে নিজে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ায় স্ত্রী বাধা দেয়ার কারণে। প্রকাশের প্রশ্ন, যারা এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা কি ওর মতো দীর্ঘদিন পরিকল্পনা নিয়ে এই অপরাধ করছে, নাকি তাৎক্ষণিকভাবে রাগ ও ক্ষোভের মাথায়, হিংস্র হয়ে স্ত্রীকে হত্যা করছে। প্রকাশ এও ভাবে যিনি স্ত্রীকে হত্যা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করে এই শহরেই বসবাস করছে– এমন একজন ব্যক্তির সান্নিধ্য তার পাওয়া দরকার। অথবা হত্যা করে যিনি জেলে আছে, হয়তো ফাঁসির আদেশ হবে, এমন একজনের সঙ্গে তার কথা বলা দরকার। তারা কী প্রক্রিয়ায় স্ত্রীকে হত্যা করেছে– হত্যার সময় তাদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল– এসব বিষয় তার জানা দরকার। অথবা যারা যখন তখন মানুষ হত্যা করে, যাদের বলা হয় কিলার অথবা সিরিয়াল কিলার তাদের সঙ্গে বৈঠক করা দরকার। এসব ভাবতে গিয়ে সে এও ভাবল, আজকাল তো কিলার ভাড়া পাওয়া যায়। ১০-২০ হাজার টাকা খরচ করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে তবে তো কেউ জানতেই পারবে না, কে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আজকাল তো শহরে যখন-তখন মানুষ হত্যার শিকার হচ্ছে। পলি যখন বাইরে কোথাও যাবে তখন ছিনতাইকারীর বেশে ওকে হত্যা করা হবে। অফিসে যাতায়াতের সময় এটা সম্ভব নয়, এই কারণে যে, ওর অফিসের মালিক গাড়িতে যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়েছে। কখনো কখনো মালিকের গাড়িতেই সে আসে।

যেদিন পলির ফিরতে রাত বেশি হয়ে যায়, সেদিন প্রকাশ জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মালিক তাকে অনেকদিন নামিয়ে

দিয়ে গেছে। কখনো কখনো রাত সাড়ে ১১টায় ও বাসায় এসেছে। প্রকাশ প্রশ্ন করেছে– তোমার এত রাত হলো যে?

–সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?

–যদি বলি দিতে হবে।

–আমি বাধ্য নই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নম্রতাকে রেখে আমি আবারো মায়ের কাছে চলে যাব। তোমার অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না।

–অত্যাচার আমি করছি না, তুমি করছ।

ওইদিন ঝগড়া তুঙ্গে উঠেছিল। বেসামাল হয়ে গিয়েছিল প্রকাশ। একবার ইচ্ছা করেছিল ধারালো বঁটি দিয়ে ওকে কুপিয়ে হত্যা করতে। কাজের মেয়ে তাসলিমা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, নম্রতাও জেগে ছিল। এই ঘটনায় নম্রতা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হবে আর স্বামী অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে– তা কী করে হয়। যারা একেবারেই নিরীহ স্বভাবের পুরুষ তারাও একসময় বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। প্রকাশও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। তাই আজ সে স্ত্রীকে খুন করার জন্য সন্ত্রাসী ভাড়া করার কথা ভাবছে। এই কাজ করার আগে সে ভাবল, পলির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে হবে। সে আস্তে আস্তে নমনীয় হয়ে উঠল। প্রথম কৌশল হিসেবে বিয়েবার্ষিকী পালন করার চিন্তা করল। প্রকাশ এও বলল, এবার বিয়েবার্ষিকীতে পলির আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে চায়। যদিও প্রকাশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, তারপরেও সে এই উদ্যোগ নিল। পলিও মহাখুশি। অনেকদিন হয় আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়নি। এই বাসায় প্রকাশের আত্মীয়-স্বজন কেউ আসতে পারছে না। অথচ পলির কোনো আত্মীয়-স্বজন এলে মাথা খারাপ হয়ে যায়– কীভাবে তাদের আপ্যায়ন করবে। তখন প্রকাশকে সবকিছু ডাবল কিনতে হয়। ফ্রিজে মাছ-মাংস থাকলেও নতুন করে কিনতে হয়। আত্মীয়দের সঙ্গে পলি মজা করে খায়, অথচ প্রকাশ অংশীদার হতে পারে না। তাকে কেউ ডাকে না।

এই ধরনের ঘটনা একবার ঘটেনি, বহুবার ঘটেছে। বিয়েবার্ষিকী ধুমধাম করে পালিত হলো, অথচ প্রকাশ তেমন একটা গুরুত্ব পেল না। তারপরেও সে খুশি এই ভেবে যে পলির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে। একবার বুড়িগঙ্গায় নৌকায় ঘুরল প্রকাশ। প্রস্তাবটি পলিরই। নম্রতা সঙ্গে যেতে চাইলেও পলি ওকে নিল না। দুজনেই নৌকায় ঘুরল। পলি সাঁতার জানে না। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রকাশ একবার ভাবল ওকে নৌকা থেকে নদীতে ফেলে দিলেই তো খেল খতম। নদীতে অন্ধকার নেমে এসেছে। ওকে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে মাঝিকে কিছু টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলবে। গরিব মানুষ টাকা পেলেই খুশি। নদীর চারদিকে যখন কোনো নৌকা ও মানুষ দেখা যাচ্ছিল না– তখন সে একবার উদ্যোগ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো সে। তার শরীর কাঁপতে লাগল। প্রকাশের এও মনে হলো, সে নিজেই হয়তো নদীতে পড়ে যাবে। পলির দিকে তাকাল, পলি নির্বিকার, একেবারেই স্বাভাবিক। আজকের মিশন যখন ব্যর্থ হলো তখন সে ভাবল সন্ত্রাসীদের দ্বারাই কাজটি করতে হবে।

মহল্লার এক সন্ত্রাসীর সঙ্গে কথা বলল সে। বিপ্লব নামের ওই সন্ত্রাসী তাকে বলল, ৫০ হাজার টাকা লাগবে। তবে যদি ধরা পড়ি তাহলে পুলিশের কাছে আপনার নাম বলবে। আর ধরা না পড়লে আপনার নাম কোনোদিনই ফাঁস হবে না। একদিকে টাকার অংকটা বেশি অন্যদিকে ধরা পড়লে নাম বলে দেবে– এই দুটো কারণে তার আগ্রহে আবার ভাটা পড়ল। এরপর সে এও ভাবল, পলি যত অন্যায় করুক তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। হাজার হলেও পলি তার স্ত্রী এবং সন্তানের মা। সন্তানের মাকে হত্যা করা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ। হঠাৎ তার মধ্যে এই মানবিক ও দার্শনিক ভাবের উদয় হলো কেন– তা সে নিজেই জানে না।

একদিন অজ্ঞাত নাম্বার থেকে ফোন আসে প্রকাশের মোবাইলে, টিঅ্যান্ডটি নাম্বার। যিনি

ফোন করেছেন তিনি বলেন, 'আপনাকে নিতান্ত ভদ্র লোক হিসেবে জানি। আপনার সৌভাগ্য যে সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছেন, পাশাপাশি আপনার দুর্ভাগ্য এই যে আপনার স্ত্রীর কোনো খোঁজ-খবরই আপনি রাখেন না। আপনার স্ত্রী কোথায় যায়, কী করে। আপনি কি স্ত্রীকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন? আপনার কি টাকার এতই অভাব'? বলেই লোকটি ফোন কেটে দেয়। ভদ্রলোক ফোন করে যা বলেছেন, এর সবই প্রকাশ জানে। তারপরেও তার মাথায় আবার খুন চেপে যায়। মানসিক স্বস্তি পাওয়ার জন্য তাকে এ কাজ করতে হবে। কিছুদিন আগে ওর এক বন্ধু বলেছিল- 'প্রকাশ কিছু মনে করিস না, ভাবীকে যেভাবে সেখানে দেখা যায়, যার তার সঙ্গে। তুই কি এ ব্যাপারে কোনো খেয়ালই রাখিস না। স্ত্রীদের বেশি স্বাধীনতা দিলে এমনটিই হয়।' এই দুটো ঘটনা যখন সে মেলায় তখন পলির মুখ তার দেখতে ইচ্ছা করে না। আজ রাতই হবে পলির জন্য শেষ রাত। আজ সে শেষবারের মতো চেষ্টা করবে। ছোটখাটো একটি পরিকল্পনাও সে করে ফেলল। আজ সে নম্রতাকে তার রুমে নিয়ে আসবে এবং নানা গল্পের ছলে তাকে ঘুম পাড়াবে। তারপর সে পলির সঙ্গে শোবে। হয়তো পলি আপত্তি করবে। কারণ দীর্ঘদিন পলির সঙ্গে রাত কাটায় না সে। পলি আপত্তি বা চেঁচামেচি করলেও ঘাপটি মেরে সে পলির পাশে শুয়ে থাকবে। সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে গল্প জমিয়ে দেবে। এটাই হবে পলির জীবনের শেষ গল্প। গল্প করতে করতে পলি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়বে। বিয়ের প্রথম জীবনে পলি তাই করত। ও ঘুমিয়ে পড়লে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এটা প্রকাশ শুরু থেকেই জানে। এরপর সে তাকে গলাটিপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করবে। হত্যার পর নম্রতা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে অজানার উদ্দেশে। কারণ নম্রতা তার জীবন ও স্বপ্ন। ওকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে। ওকে ছাড়া সে বাঁচবে না। পালিয়ে যাওয়ার সময় যদি ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তখন নম্রতার কী হবে? ও কার কাছে থাকবে। আবার ভাবে না, ওকে নিয়ে যাবে তবে রেখে যাবে প্রকাশের বাবা-মা, বোনদের কাছে ওরাই ওকে লালন-পালন করবে। কারণ নম্রতা জন্মের পর থেকে দাদা-দাদি, ফুফুদের আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত। পলিকে হত্যার পর নম্রতার চিন্তা ওর করতে হবে না। আগামীকাল থেকেই ওর এক ব্যবস্থা হবে। কিন্তু পলিকে সে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ পলির পাশে শুয়ে থাকল। পলির প্রশ্ন– আজ আবার এই রুমে এসেছ কেন?

আসলে পুরুষ হিসেবে তোমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। অথচ একজন ব্যক্তিত্ববান পুরুষই জীবনে চেয়েছিলাম। তা আর পেলাম কই। হা-হুতাশের মধ্যেই জীবন কাটল। যে ডাল ধরি সে ডালই ভেঙে যায়। পলির কথার কোনো অর্থ বোঝে না সে, বুঝতে চায়ও না। কারণ জীবনে কোনো মীমাংসায় এলো, মানুষ কথার অর্থ বুঝে উত্তর দেয়। এখানে মীমাংসার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। এবার প্রতিরোধের পালা। স্বামী হিসেবে তাকে যে বঞ্চিত করেছে, সে যে ব্যভিচারী স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, নারী স্বাধীনতার নামে- তার আজ একটা বিহিত করতেই হবে। কারণ হাতে আর সময় নেই। এই ধরনের মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে সে বেশিদিন বাঁচতে পারবে না।

২০.

দিন কয়েক আগে পত্রিকায় খবর বের হয়েছে, ঢাকার সাভারে স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামী আত্মহত্যা করেছে। এই পথ কি প্রকাশ আজ বেছে নেবে। পলিকে তার হত্যা করার কথা। দাম্পত্য জীবনের মীমাংসা সে এভাবেই করতে চায়। স্ত্রীকে হত্যা করে তারপর আত্মহত্যা করা– এটা কোনো মীমাংসা নয় বলে প্রকাশ মনে করে। বিয়ে নামক বন্ধন যে এত জটিল তা সে জানত না। এই জটিলতার সে আজ অবসান চায়। পলি অনেকক্ষণ বকবক করল এবং প্রকাশকে এই রুম থেকে চলে যেতে বাধ্য করল। প্রকাশের সঙ্গে তার ঘুমাতে ভালো লাগে না এবং ভবিষ্যতে আর কোনো দিনও

ঘুমাবে না। পলির অশ্লীল বকাবাজিতে যখন কান ঝালাপালা হয়ে গেল তখন সে বাধ্য হয়ে নিজের রুমে চলে এলো।

কাজের মেয়েটা ল্যাদা মেরে সেই কখন থেকে ঘুমিয়ে আছে। রুমে এসে সে নম্রতাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কানে এসে লাগছে। নম্রতার ওপর বেশ কয়েকদিন ঝড় বয়ে গেছে। কারণে-অকারণে মেয়েটাকে মেরেছে পলি। ও যে ওর মা- তা প্রকাশের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। পলিকে নিয়ে সমস্যা সর্বত্র। সে মূলত প্রকাশের পরিবারের কাউকে সহ্য করতে পারছে না। সহ্য করতে পারছে না প্রকাশ ও নম্রতাকেও। এই অবস্থায় ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য আর কোনো পথ খোলা নেই। নম্রতার ওপর যখন অত্যাচার শুরু হয়। তখন থেকে প্রকাশ নম্রতাকে সময় দেয়। ওকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায়। নম্রতা একদিন প্রকাশকে বলে– 'বাবা জানো, তুমি না থাকলে আম্মি আমাকে মারে, আর সারাক্ষণ টেলিফোনে কথা বলে। আম্মি আমাকে ভালোবাসে না। তুমি আমাকে রেখে কোথাও যাবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা।' যেদিন নম্রতা এই কথাগুলো বলে, ওইদিন প্রকাশ ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। আজ নম্রতা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রকাশ। সে যখন জেগে উঠল তখন রাত আড়াইটা। এর আগে সে কি পরিকল্পনা নিয়েছিল তা সে ভুলে গেল। নিজের রুমে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগল। এরপর ধীরে ধীরে তার মনে হলো যে সে প্রথমে পলির রুমে ঘুমিয়েছিল ওকে হত্যা করার জন্য, এরপর বাধ্য হয়ে সে নিজের রুমে চলে এসেছে।

সে জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে পড়ে এক প্রচণ্ড শীতের রাতে সে পলিকে হত্যা করার প্রথম পদক্ষেপ নেয়। আর এখন বর্ষাকাল। বাইরে অঝোর ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টির দৃশ্যে মানুষের মনে রোমান্টিকতা জেগে ওঠে। কারো কারো মন বিরহকাতর হয়ে ওঠে। এই বর্ষায় কারো কারো মন যে হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ ও হন্তারক হয়ে ওঠে– সে এক বিস্ময়। গাঢ় অন্ধকারে, ঝড়ের রাতে বৃষ্টিমুখর গভীর রাতে মানুষ যেমন মানবিক ও প্রেমিক হয়ে ওঠে, একইভাবে হন্তারকও হয়ে উঠতে পারে। প্রকাশক আজ হন্তারক হতে চায়। সে আস্তে আস্তে বেড রুমে ঢোকে। খাটজুড়ে শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছে পলি। হঠাৎ করে যে কেউ ওকে দেখলে বলবে-'মহিলাটি কী সুন্দর আর মায়াবী অসাধারণ ফিগারের অধিকারী।' কিন্তু ভেতরটা অত্যন্ত কুৎসিত। নানা জটিলতা আর অপরাধে ঠাসা, হিংস্রতা, নিচতায় ভরা। বেড রুমে আজ নম্রতা নেই। দরোজা বন্ধ করে ওকে ইচ্ছেমতো খুন করা যাবে। এ ব্যাপারে কেউ বাধা দিতে আসবে না। আজকের সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ও। জীবনে অনেক সুযোগ হাতছাড়া করেছে সে আর নয়। প্রথমে রুমের চারদিকে তাকায় সে। রুমের ভেতর অন্ধকার যেন জেকে বসেছে। বাইরের পৃথিবী অন্ধকার হওয়ার কারণে তার প্রভাব বেড রুমেও পড়েছে। অন্ধকারের মধ্যে পলির গলায় দু'হাতটা ঠিক মতো সেট করতে পারলেই হলো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দুই হাতে এনে ওকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে সে। হয়তো ধস্তাধস্তিও হতে পারে। গোঙানির শব্দও চারদিক ছড়িয়ে পড়তে পারে তাতে কী? তাকে আজকের রাতে অসীম সাহসিকতা নিয়ে কাজটি শেষ করতে হবে। একবার না পারিলে চেষ্টা করো বার বার। তাই সে আজ দৃঢ়চেতা মন ও শক্তিশালী হাত নিয়ে পলির পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তার একবার মনে হলো দরোজা-জানালা ভালো করে লাগিয়ে নিলেই কাজটি সমাপ্ত করা সহজ হবে। আবার এও ভাবল দরোজা-জানালা লাগাতে গিয়ে যদি পলি উঠে যায় এবং ঘটনাটি কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারে তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। নির্যাতনকারী হত্যা প্রচেষ্টাকারী হিসেবেও ওর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিতে পারে। কারণ এখন ওর পাশে দাঁড়ানোর মানুষের অভাব নেই। সৌন্দর্য এমন এক গুণ ও যোগ্যতা একজন মহিলার যদি তা থাকে তবে তার অন্য কিছু লাগে না। তারপরেও সে

আস্তে আস্তে পূর্ব ও দক্ষিণ পাশের জানালা দুটো বন্ধ করল। পলি যদি জেগে উঠে দেখে যে সে জানালা বন্ধ করছে তাহলে অজুহাত দেয়া যাবে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আর যদি সে দরোজা বন্ধ করতে যায় এবং পলি টের পায় তাহলে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। কারণ শারীরিকভাবে মিলিত হওয়ার জন্য দরোজা বন্ধ করার পরিবেশ ও সম্পর্ক কোনোটাই পলির সঙ্গে তার নেই। শেষ পর্যন্ত সে দরোজা বন্ধ না করেই অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। সে একেবারে পলির গলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। অন্ধকারে ওর গলা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রুমের আলো জ্বালিয়ে গলার অবস্থান নির্ণয় করবে, সেটা আরো বিপজ্জনক। সুতরাং অনুমানই তার প্রধান ভরসা। এবার তার মনে হচ্ছে পলি পাশ ফিরে ডান কাতে তার শরীরকে খাটের ওপর নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করল। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে গলা টিপে ধরা যতটা সহজ ডান বা বাম কাতে শুয়ে থাকলে তা সহজ নয়। তাই সে পলির চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার জন্য অপেক্ষা করল। তার মনে হলো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই খাটের কোণায় একটু বসল। তারপর পলিকে আবার লক্ষ করল। এবার মনে হলো সে আবার পাশ ফিরেছে এবং বাম কাতে শুয়ে আছে। ডান বা বাম কাতে থাকা অবস্থায় গলা টিপে ধরাটা সে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না ও । তাই তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে কখন সে চিৎ হয়ে শোবে, তার জন্য। দাঁড়িয়ে থেকে আবারো সে ক্লান্ত হয়ে গেল। রাত এখন ঠিক কতটা বাজে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছে না সে। বাইরে কোথাও শব্দ হচ্ছে। সম্ভবত প্রধান সড়কে গাড়ি চলাচলের শব্দ। একটা কুকুরও ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বাইরে কোথাও হয়তো চোর চুরি করার জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের বেলায় অপরাধী দেখে অথবা পরখ করে নাকি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। গ্রামে এমন একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। পলির হন্তারক হিসেবে তার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বলে কি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে– কুকুরটি এতটাই দূরদর্শী?
এবার সে পলির নড়াচড়া লক্ষ করল। হয়তো ও জেগে উঠবে এবং টয়লেটে যাবে। তাই প্রকাশ দ্রুত নিজের রুমে চলে এলো। না এটা তার বোঝার ভুল। পলি জেগে ওঠেনি, ও গভীর ঘুমে নিমগ্ন। আবার সে এসে পলির গলার কাছে দাঁড়ালো। এবার প্রকাশ নিশ্চিত হলো যে, পলি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার দুই হাত গলার কাছে আনল, এ কী তার দুই হাত কাঁপছে, শরীর কাঁপছে। সারা শরীরে ঘাম দেখা দিয়েছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার শরীর আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যাচ্ছে। যেন এখনই রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে তার স্ট্রোক করবে অথবা সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাবে। এসবই পুরনো আলামত। সে পঙ্গু লোকের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়ল। সে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় এলো, তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো এবং নম্রতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। সে কি হত্যায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য কাঁদছে, নাকি তার ভেতর কোনো অজানা দুঃখবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয়েছে তা সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারল না। তবে এটা সে নিশ্চিত হলো যে, তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন নম্রতা।
রাতের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হলো। মসজিদে মসজিদে আজান শুরু হলো। বিচ্ছিন্নভাবে পাখির কলকাকলিও কানে এলো। আস্তে আস্তে নাগরিক চেনা শব্দের জগৎ ভারী হয়ে উঠল। কান্না থামিয়ে প্রকাশ যখন পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় এলো, তখন তার মনে হলো তার মাথা ও বুক থেকে কোনো ভারী বস্তু অথবা বড় ধরনের জঞ্জাল অপসারিত হয়েছে। সে খুব হালকাবোধ করছে। ততক্ষণে পলি নয় কাজের মেয়ে তাসলিমা জেগে উঠেছে। প্রকাশের মনে হলো, সারারাত সে কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে। বন্ধ ঘরে না থেকে এখন তার বাইরে যাওয়া দরকার। তাই সে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। ছুটির দিন হলে পলি সকাল ১০টা ১১টা ছাড়া ঘুম থেকে ওঠে না। উঠে লাঞ্চের পর বাইরে যাবে, আসবে গভীর রাতে। কোথায় যায় কী করে প্রকাশ জানে না। তার জানার ইচ্ছাও নেই। প্রকাশ যখন বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন নম্রতার ঘুম ভেঙে গেল। ও বাবার সঙ্গে বাইরে যাওয়ার জন্য বায়না ধরল।
প্রকাশ নম্রতাকে ভালো করে সাজিয়ে দিতে বলল তাসলিমাকে। সঙ্গে পানি ও ব্যাগ দিতে বলল। কারণ প্রকাশ যখনই নম্রতাকে নিয়ে বাইরে যায় সঙ্গে পানি-ব্যাগ নিয়ে যায়। লাল পোশাকে নম্রতাকে বেশ মানায়। আজ ওকে অদ্ভুত লাগছে। চুলে বেণি করে দিয়েছে তাসলিমা। রাতে বৃষ্টি হলেও সকালের পরিবেশটা বেশ সুন্দর। একটা রিকশা নিয়ে প্রকাশ ধানমণ্ডি লেকে আসে। তার বাসার কাছে ছোট্ট পার্ক থাকা সত্ত্বেও সে নম্রতাকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় চন্দ্রিমা উদ্যানে যায়, কখনো কখনো আসে ধানমণ্ডি লেকে। শিশুমেলায়ও গিয়েছে কখনো কখনো। ধানমণ্ডি লেক সংস্কার করার পর এটাই তার এখন প্রিয় হয়ে উঠেছে। গাছপালা, লেক, পরিচ্ছন্ন রাস্তা ও হাঁটার জায়গা সবমিলিয়ে নাগরিক জটিলতা ও কোলাহলের মধ্যে এটা একটা চমৎকার জায়গা। এখানে এলে নম্রতাও খুশি হয়। এখানে পুরুষের চেয়ে সুন্দরী অধিক স্বাস্থ্যবতী মহিলাদের পদচারণা, হাঁটাচলা বেশি। তাদের কারণে লেকের পরিবেশটা আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে। আজ কেন যেন প্রকাশের অসম্ভব ভালো লাগছে, তার ভেতর কোনো ক্লান্তি, অবসন্নতা, জড়তা নেই। মন ও শরীর বেশ ফুরফুরে। নম্রতা তাকে দেখে হাসছে। আজ লেকের পানি, ফুল, গাছপালা ও প্রকৃতির সঙ্গে নম্রতা একাকার হয়ে গেছে। পাশ দিয়ে দুই স্বাস্থ্য সচেতন অথচ স্বাস্থ্যবতী নারী হেঁটে গেল। একজন নম্রতার গালে আদরের পরশ বুলিয়ে দিল। অন্যজন বলল, 'আপা দেখছ, মেয়েটি কী মিষ্টি সুন্দর। ওর মা না জানি কত সুন্দর?' কথাটা প্রকাশের কানে এসে বাড়ি খেলো। তার মনোজগতে আলোড়ন তুলল। একটু পরে আরো এক মহিলা নম্রতাকে ছুঁয়ে গেল। বলল, 'হাই সুইট গার্ল।' আরো একজন বলল– 'ধন্যি মায়ের ধন্যি বালিকা।' যে এই কথাটা বলল সে কি পলিকে চেনে, অথবা আগে থেকেই চেনে নম্রতাকে? এটা প্রকাশ ঠিক বুঝতে পারল না। মহিলা প্রকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল এবং হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হলো।

২১.

এর মধ্যে প্রকাশ দেখতে পেল এক হকার পত্রিকা বিক্রি করছে। ও একটি পত্রিকা কিনল, সময় কাটানোর জন্য। সামনে নম্রতা খেলা করছে। ও কখনো কাকের পেছনে ছুটছে, আবার কখনো শালিকের পেছনে। পাশে বসে প্রকাশ পত্রিকা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ তার একটি প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। 'পারিবারিক কলহ ও অশান্তির কারণে গত ছয় মাসে সারাদেশে ১০০ স্ত্রী খুন হয়েছেন স্বামীর হাতে। এর মধ্যে খোদ রাজধানীতেই ঘটেছে ৪০ খুনের ঘটনা।' রিপোর্টটি সে মনোযোগসহকারে পড়ে। রিপোর্টের শেষে মনোবিশ্লেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতামতও প্রকাশিত হয়েছে। ঝগড়া, অশান্তি ও হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ এড়ানোর জন্য তারা কাউন্সিলিংয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ও পরামর্শের ওপরও। বিশেষজ্ঞ মতামতে এও বলা হয়েছে– 'হত্যা কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমাধান নয়, তাতে জীবন জটিলতা, পারিবারিক জটিলতা বাড়ে, জীবন ও পরিবারকে বিপন্ন করে তোলে, এটা চূড়ান্তভাবে সামাজিক অবক্ষয়। উত্তম সমাধান হচ্ছে নির্যাতন, হত্যার পরিবর্তে স্বামী, স্ত্রীর তালাক অথবা সেপারেশন। তাতে অন্তত হত্যার মতো অপরাধ থেকে বিরত থাকা যায়, জীবনও রক্ষা পায়।'

২২.

রিপোর্ট পড়ে প্রকাশ পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে থাকে। তার সামনে খেলা করছে নম্রতা। গতরাতের ঘটনায় সে সফল হলে নম্রতা আজ মা হারা হতো। ওর চোখেমুখে এমন হাসি আর আনন্দ সে দেখতে পেত না। মা হারা মেয়ের ভবিষ্যৎ তার জানা আছে। বাবা যার মাকে হত্যা করেছে পরকীয়ার দায়ে, সে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনচলার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক নানা বাধা, দুর্নাম, অপবাদ কাজ করে, ছায়ার মতো পেছনে অনুসরণ করে। এসব সহ্য করে নম্রতাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হতো, অথবা তার জীবন থেমে যেত।
নম্রতা হাসছে, খেলছে, পাখির পেছনে দৌড়াচ্ছে, ফুলের কাছে, বৃক্ষের কাছে, লেকের কাছে যাচ্ছে– এটা তার জীবনের অপার আনন্দ। কারণ প্রকৃতির কাছে গেলে সে অন্যরকম হয়ে যায়। এটা লক্ষ্য করে মনের অজান্তে প্রকাশের চোখে জল চলে এলো। সে দৌড়ে গিয়ে নম্রতাকে জড়িয়ে ধরল, তার সব আবেগ, আদর-ভালোবাসা ঢেলে দিল ওর মধ্যে। নম্রতা দেখল, তার বাবার চোখে জল।

৬ জুলাই, ২০১৫

প্রবন্ধ

বাঙালি মুসলমানের দ্বিমুখী যাত্রা

মাহমুদুল বাসার

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের ওপর এখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব কাজ করে যাচ্ছে। অন্য ভাগের ওপর জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব, জিয়াউর রহমানের ধর্মব্যবসার অনেক প্রভাব কাজ করছে সুদৃঢ়ভাবে। অতীতেও এমন দ্বন্দ্ব ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতান নবীদের ওপর বাংলা ভাষায় কাব্য লিখে 'মোনাফেক' উপাধি পেয়েছিলেন। মধ্যযুগেও বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বাঙালি হিন্দুসমাজেও একটি প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত বাঙালি প্রগতিশীল হিন্দু অগ্রযাত্রার কাছে পরাস্ত হয়েছে। বাংলা ভাষার দুজন মহান কবি কৃত্তিবাস ও কাশিরাম দাস রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে এবং জনপ্রিয় করে বাঙালি হিন্দুসমাজের চিন্তাশক্তিকে অনেক দূর উৎকর্ষমণ্ডিত করে দিয়েছেন। বাঙালি হিন্দুসমাজের সামগ্রিক ভাবনা ছিল বাংলা ভাষা ও বাঙালিআনা নির্ভর, উনিশ শতকে সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি ভাষা ও কালচার সংযুক্ত হয়েছিল। বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করেই তাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের ব্যাপারটা ঠিক অমন ছিল না। মধ্যযুগের বিদ্রোহী কবি আবদুল হাকিমের প্রভাবটি উনিশ শতকে তেমন জোরালোভাবে কাজ করেনি। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী দুজনই সাম্প্রদায়িক। ধরে নিলাম, সাম্প্রদায়িক চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ বেশি। এর পরও বঙ্কিমের মনীষার সঙ্গে ইসমাইল হোসেন সিরাজী বা মীর মশাররফ হোসেনের মনীষা তুলনাই হতে পারে না, গাছে মাছে পার্থক্য। ঈর্ষা দিয়ে, ধর্মীয় পিছুটান দিয়ে, হীনমন্যতা দিয়ে কোনো ব্যক্তি তার সমাজকে বড় করে তুলতে পারেনি।

কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজেও একটি অংশে চমৎকার প্রগতিশীলতা ছিলা যদিও তা জয়ী হতে পারেনি। বাঙালি মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য যে পবিত্র কোরআনের বাংলা প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। উদার, সেক্যুলার চিন্তা বরাবর বাঙালি হিন্দুসমাজের মধ্যে বেশি ছিল। অনেক বিলম্বে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, ডা. লুৎফর রহমান ও সাধক এয়াকুব আলী চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটেছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদক বাঙালি হিন্দুসমাজকে যে উপকার করেছে, পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি হওয়ায়, তাকে পবিত্র ও আখিরাতের ভাষা বলে অন্ধবিশ্বাসী হওয়ায়, বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিক ভাষা মনে করায় বাঙালি মুসলমান সমাজ অগ্রগতিতে সে সুবিধাটি করতে পারেনি। মাইকেল ও বিদ্যাসাগর যতই আধুনিক ও ইংরেজি পণ্ডিত হোন, তাদের সৃষ্টিশীলতার গোড়াপত্তন করে দিয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহ্য। দুজনই প্রাচ্য বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় করেছিলেন। দুজনই শেক্সপিয়রের ভক্ত ছিলেন। শেক্সপিয়রের প্রভাব দুজনই নিজেদের চিন্তার মধ্যে ধারণ করেছিলেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রথমত অন্ধ ধর্মবিশ্বাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে অপবিত্র ভাষা মনে করতে থাকে, অন্যদিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রোশবশত ইংরেজি ভাষা ও কালচার চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়ে কূপমণ্ডুক হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের মতো একজন বস্তুবাদী লেখক আজও বাঙালি মুসলমান সমাজে জন্ম নিয়েছে কি না সন্দেহ। সত্যেন বসু, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানী আজও বাঙালি মুসলমান সমাজে জন্ম নেয়নি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রভাবিত ও উৎসাহিত ছিলেন। গোটা বাঙালি সমাজে 'ঠাকুর' পরিবারের অসামান্য অবদান আছে। শহীদ মুনীর চৌধুরী 'মীর মানস' গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর শৈল্পিক উৎকর্ষগত আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ধরা যাক উনিশ শতকের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি এবং হিন্দুমেলা দুটোই ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, তবুও হিন্দুমেলায় বাংলা ভাষার চর্চা হতো, বিজ্ঞান ও যুক্তির চর্চা হতো; কিন্তু মোহামেডান লিটারারি সোসাইটিতে তা হতো না। বাঙালি হিন্দুসমাজও অভিজাত ও অনভিজাতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তবুও তাদের ভাষা ছিল বাংলা। মানসিক যোগাযোগের মাধ্যম ছি মাতৃভাষা। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের উঁচুবিত্ত ও অভিজাত অংশটি ছিল উর্দুভাষী আর নিম্নবিত্ত, বিরাট কৃষক সম্প্রদায় ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অভিজাত অংশটি নিজেদের মনে করত 'আশরাফ' আর কৃষক তথা গরিব বাঙালি মুসলমানদের মনে করত 'আতরাফ'। বরাবর অভিজাত অংশটি বাঙালিবিরোধী ছিল, বাঙালির উত্থানবিরোধী ছি। দীর্ঘকাল খাজা নাজিমউদ্দিনরা বাঙালি জাতির উত্থানের বিরোধিতা করেছেন। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'উর্দু হবে পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা।' তার মৃত্যুর পর পুনরায় খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৫২ সালে বললেন, 'কায়েদে আজমের ঘোষণা মোতাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই বহাল থাকবে।' উর্দুভাষী অভিজাত অংশটি কখনো বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটতে দেয়নি। নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন ইংরেজভক্ত, রক্ষণশীল মুসলমান। সৈয়দ আমির আলীও তাই ছিলেন। দুজনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, গবেষক, মুক্তচিন্তার লেখক ড. সালাহউদ্দীন আহমদ তার গবেষণায় বাঙালি মুসলমান সমাজের দ্বিমুখী ধারার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন তার গবেষণার। বাঙালি মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার পাশাপাশি একটি ছোট অংশের মধ্যে পাশ্চাত্য ধারার উদারতা ছিল। দুজন প্রভাবশালী মুসলমান মনীষীর চিন্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন ড. আহমদ। এদের একজন আবদুল রহীম ও অন্যজন দেলওয়ার হোসেন।

ড. আহমদ বলেছেন, নবম শতাব্দীর দিকে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলামের কট্টর খোলস ভেদ করে জন্ম নিয়েছিল যুক্তিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়। মুতাজিলা দার্শনিকরা প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদী দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসকে কিভাবে যুক্তির সঙ্গে সমন্বিত করা যায়, এ চিরন্তন প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সনাতন ইসলামের গোড়া সমর্থকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে চিন্তার ক্ষেত্রে এ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও এ ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এবং মুসলিম মনোজাগতিক ঐতিহ্যে এর একটা বিশিষ্ট স্থান সব সময় রয়ে গেছে। (ড. সালাহউদ্দীন আহমদ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ–২০১২, পৃষ্ঠা ২৩)।

এ ধারারই উত্তরসূরি আবদুল রহীম ও দেলওয়ার হোসেন। একটি সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি দিয়ে উন্নত করা যায় না, এটা ভালোভাবে বুঝেছিলেন আবদুল রহীম ও দেলওয়ার হোসেন। তাদের জীবনী আলোচনা করলে এ চিত্রটি বের হয়ে আসে। জনাব রহীম ১৭৮৫ সালে উত্তর ভারতরে গোরখপুর শহরে তাঁতি পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কবিতার প্রতিও তার আগ্রহ ছিল। এ জন্য তিনি মনের অন্দর থেকে সর্বপ্রকার গোঁড়ামি বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন। ইসলামের শিয়া-সুন্নি বিতর্কে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রথমে লক্ষ্ণৌ, তারপর দিল্লি। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। তিনি আরবি-ফারসি ভাষার অসংখ্য প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করেন। কালক্রমে আবদুল রহীম মুক্তচিন্তার ধারক ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। ড. সালাহউদ্দীন আহমদ বলেন, 'তার মতে, পরমেশ্ব বা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা ইমাম বা ধর্মগুরুদেব সৃষ্ট। আবদুল রহীম বিশ্বজগতের সার্বিক বা প্রাকৃতিক বিধানে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যতিক্রমধর্মী মত পোষণের জন্য আবদুল রহীমকে তার সমসাময়িকরা 'দাহরি' নামে অভিহিত করেছিলেন। 'দাহরি' একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো একজন জড়বাদী এবং যিনি রসুল এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করেন না। আবদুল রহীম মনে করতেন যে সূর্য হচ্ছে সকল সৃষ্টির উৎস।' (ওই : পৃষ্ঠ ২৪)।

১৮১০ সালে আবদুল রহীম কলকাতা চলে এসেছিলেন। বাকি জীবন এখানে কাটিয়ে দেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে তার প্রভাবে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত মওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী। মওলানা ওবায়দীর বন্ধু ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে মুক্তচিন্তার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩)। তিনি ১৮৬১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাস করেন। তিনি উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। সমকালীন ইউরোপের যুক্তিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার চিন্তার মধ্যে মৌলিকতা ছিল। তিনি মুসলমান সমাজের কঠোর অনুশাসন পরিবর্তনের কথা বলেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট সেন্সরের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের অবনতির কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে নিহিত। দেলওয়ার হোসেন মাদ্রাসার মোল্লাপন্থী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। দেলওয়ার হোসেন মাদ্রাসা তুলে দিয়ে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ড. সালাহউদ্দীন আহমদ 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য' বইয়ের এক জায়গায় বলেন, 'দেলওয়ার হোসেনের সময়কালে বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল নগরবাসী শিক্ষিত শ্রেণির হাতে, যারা অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। এরা নিজেদের 'আশরাফ' বা অভিজাত বংশীয় মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনসাধারণকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এই গ্রামীণ মুসলমান শ্রেণি ছিল অশিক্ষিত এবং দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। একদিকে যেমন তারা হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাতে শোষিত হচ্ছিল, অন্যদিকে তারা অর্ধশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মোড়ল এবং ঘোর সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ অবাঙালি উর্দুভাষী মোল্লাদের খপ্পরে পড়েছিলেন। শহরবাসী স্বার্থপর মুসলিম 'আশরাফ' শ্রেণির লোকেরা কিংবা হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি কেউ এসব নিম্নশ্রেণির বিপন্ন মানুষকে কোনো রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। এ সময় গ্রামাঞ্চলের বাঙালি মুসলিম কৃষক শ্রেণির মধ্যে থেকে তিতুমীর, শরিয়াতুল্লাহ, দুদু মিয়ার মতো নেতাদের আবির্ভাব হয়। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হলেও তারা ছিলেন অসাধারণ দৃঢ়চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোনো বোধশক্তি ছিল না বলা যায়। প্রধানত আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে তারা কেবল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মাধ্যমে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাই তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।'

মূলত দেলওয়ার হোসেনদের মুক্তচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল বিশ শতকের শিখা গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে। আর আবুল হাশিমরা দেলওয়ার হোসেনদের প্রভাবে পথ ধরে বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বপন করেছিলেন। তারই ফসল ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ। এ ফসল বিনষ্ট হয় ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টের পর। এ ধারা এখনো শক্তিশালী।

গল্প

দম্পতি

নূর কামরুন নাহার

ওরা হেঁটে গেল। এভাবে কেউ হেঁটে যায়! কোনো দম্পতি!

আমার জ্বলে গেল। আমার জ্বলে গেল কারণ ওই মহিলার পাশে পাশে যে লোকটা হেঁটে গেল তার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক।

এটা সরকারি কোয়ার্টার এলাকা। শহরের খুব অভিজাত এলাকায় এ কোয়ার্টার। এখানে যারা থাকে সবাই হাই অফিশিয়াল। অনেক বড় সুন্দর লোভনীয় কোয়ার্টার এগুলো। এসব কোয়ার্টার এলাকায় নাকি পরকীয়া, বাড়িতে-বাড়িতে প্রেম খুব স্বাভাবিক ঘটনা। একসঙ্গে অনেক দিন থাকতে থাকতে একটা আবেগ আর মায়া নাকি এমনিতেই জন্ম নেয়। তাই যদি হয় তবে ওই লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্কও স্বাভাবিক আর লোকটা ওই মহিলার সঙ্গে হেঁটে গেলে আমার জ্বলে যাবে এটাও স্বাভাবিকের বাইরের ঘটনা নয়। বউটা এসেছে মাসখানেক। তার পর থেকেই দেখছি ওদের এই হেঁটে যাওয়া। সব দিন আমার দেখতে হয় না। কারণ আমিও সব দিন থাকি না। থাকলেও দেখি না। দেখার প্রয়োজন হয় না। ওরা হেঁটে গেলেই বুঝতে পারি। বউটার পায়ের হাইহিলের খটখট আওয়াজ শোনা যায়। তারপর কোনো দিন ওদের কথার গুঞ্জরন, কোনো দিন হাসি। হেঁটে যাওয়া ছাড়াও দোতলা থেকেই প্রায়ই শব্দ শোনা। হি হি হা হা কখনো বউটার একার হাসি। কখনো ওদের সমস্বরের।

লোকটার নাম রঞ্জু, আমার নাম মনিরা। বউটা মানে যে মহিলাটার সঙ্গে রঞ্জু হেঁটে গেল ওর নাম আশা। ওরা দোতলায় থাকে। আমরা এক তলায়। দোতলার কোয়ার্টারটা রঞ্জুর নামে। আর এক তলারটা আমার নামে। আমাদের এ কোয়ার্টারটা বাউন্ডারির একবারে শেষ মাথায়। আমার এক তলায় বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে একটা বাগান। বাগানের পরে কোয়ার্টারের ভেতরের রাস্তা। তারপরেই ওই বাউন্ডারি দেয়াল। সবার বাসার সামনেই এ রকম বাগান আছে। ছোট করে তার দিয়ে ছোট গাছ দিয়ে ঘেরা এ বাগানে বিভিন্ন ফুলগাছ। আমার বাগানটা সন্ধ্যামালতী দিয়ে ঘেরা। নানা রঙের সন্ধ্যামালতী ফুটে থাকে। বাগানের ভেতরে পাতাবাহার, জবা, গন্ধরাজ লাগিয়েছি। আমি আবার দু-একটা শখের সবজিগাছও লাগিয়েছি। আমার দরজার মুখোমুখি কোয়ার্টারের রাস্তায় একটা কামিনীগাছ। প্রতিদিন ফুল ঝরিয়ে সাদা করে রাখে। কামিনীর একটু দূরে একটা কাঠগোলাপ গাছ। ওটাও ফুল ঝরিয়ে আঙিনাটা আলো করে রাখে।

দোতলার দম্পতি যেন নতুন সংসার শুরু করেছে। বউটা আসার আগে নতুন করে বাসাটা রং করা হয়েছে। ঝকঝকে তকতকে বাসায় বউটা এসে উঠেছে। আমার গাড়িটার পাশে এখন মাঝে মাঝেই ওদের ঝকঝকে গাড়িটা এসে দাঁড়ায়। গাড়ি ওদের আগেও ছিল কিন্তু রঞ্জু বলা যায় ব্যবহার করত না। ড্রাইভার ছিল না। ক্বচিৎ রঞ্জু নিজে ড্রাইভ করত। এখন ড্রাইভার রাখা হয়েছে। আর বউটা এসেই নতুন নতুন লেটেস্ট আধুনিক ফার্নিচার কিনছে। তারপর দুজনে ঘটা করে ঘর সাজাচ্ছে। নতুন পর্দা লাগিয়েছে। নতুন ঝাড়বাতি। বেডরুমে আলোর নতুন লাইট লাগানো হয়েছে। খুব ঝলমলে আর উজ্জ্বল আলো। দূর থেকে চোখে পড়ে। জানালা দিয়ে আলো বাইরে এসে আমাদের সামনের আঙিনাটাও উজ্জ্বল করে রাখে। নিচে পড়ে থাকা কাঠগোলাপ ফুলগুলোও দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

দোতলায় ওরা এখন দুজন থাকে। এত দিন লোকটা একলা থাকত। বউটা সুন্দরী, বিদুষী। তবে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে বউটা খুব পেশাগত উন্নতি চায়, যাকে বলে হাইলি ক্যারিয়ারিস্ট। এ কোয়ার্টারটা ওদের নামে বরাদ্দ হয়েছে চার বছর। কিন্তু তখন ওরা এখানে ওঠেনি। ওদের মেয়ে দুটো দেশের বাইরে পড়াশোনা করছে। দুজনেরই গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেছে। বউটাও দেশের বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে তিন বছর পড়াশোনা করে বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে মায়ের বাসায় থাকত। ওখানে থেকে বউটার পড়াশোনা করার সুবিধা ছিল। তারপর তিন বছর আগে যখন চলে গেল তখন লোকটা কোয়ার্টারে এসে ওঠে। আমি ওই লোকটাকে এখানে আসার অনেক আগে থেকেই চিনি। কারণ আমরা তো শুধু প্রতিবেশী নই, আমরা কলিগ। আমরা দুজনই উর্ধ্বতন পদের কর্মকর্তা। ফলে একই ফোরামে দেখা হয়ে যায়। তা ছাড়া অফিস থেকে বের হতে, ঢুকতে, লিফটে, অফিশিয়াল প্রোগ্রামে লোকটার সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। আমরা সৌজন্যের হাসি বিনিময় করেছি। লোকটা আমাকে জাহান আরা ম্যাডাম আর আমি লোকটাকে আজহার হোসেন এবং আমার উর্ধ্বতন পদের একজন স্যার হিসেবে জেনেছি। তারপর যখন লোকটা এখানে কোয়ার্টারে আমার প্রতিবেশী হয়ে এলো তখন তাকে নতুনভাবে দেখা হয়, নতুনভাবে জানা হয়।

লোকটা দোতলায় এমনভাবে পড়ে ছিল মনে হতো না কেউ ওখানে থাকে। ঘরে আলো জ্বলে কি জ্বলে না। আমার জানালার পাশের রাস্তা দিয়ে লোকটা যাওয়া-আসা করে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখি। গায়ে যেমন তেমন একটা ইস্ত্রিহীন শার্ট। লুজ প্যান্ট একটু যেন গোড়ালির ওপর টেনে থাকে। খুবই সাদামাটা, অনাকর্ষণীয়। এ অভিজাত কোয়ার্টার এলাকায় লোকটাকে মেলানো যায় না। এ পদের একজন লোক বলে তাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। অফিসে লোকটা সকালেই যায় কিন্তু অফিস ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে না। কোনো দিন রাতে লোকটার ফিরে আসার আওয়াজ পাই। স্যান্ডেল হেঁচড়ানো আওয়াজ তুলে যেন নিজেকে টেনে নিয়ে আসছে এমনভাবে লোকটা ঘরে ফিরে আসে। তারপর লোকটা রাতে বা সকালে কী খায় জানি না। নিজেই রান্না করে নাকি কোথাও থেকে খেয়ে আসে বুঝি না। ঘরটা পরিষ্কার করে কে? দুপুরে কোনো কাজের বুয়া কাজ করে যায় কি না তাও বুঝি না। মাঝে মাঝে আজহার হোসেন নামের লোকটার সঙ্গে আমার চোখাচোখি দেখা হয়ে যায়। আমরা সৌজন্য বিনিময় করি। তারপর দু-একটা কথা হয়। একদিন বিকেলে দেখি লোকটা আমার দরজার কাছে। আমিও তখন অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকব। সৌজন্য করে চা খেতে ডাকলে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। বুঝতে পারি চরম নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। চা খেতে খেতে গল্প হয়, বউটার কথা ওঠে। ছেলে দুটোর কথা ওঠে। একদিন সন্ধ্যায় নিজেই এসে চা খাওয়ার কথা বলে। চা খেতে খেতে ভালো করে তাকিয়ে দেখি। ঠিক যেন একটা ডুবন্ত মানুষের মতো দেখায়। বুঝতে পারি নিঃসঙ্গতায় লোকটা মারা যাচ্ছে। ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না। চেহারায় একটা অনাহারী ভাব।

নিজে থেকেই বলি, আজ রাতে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কী?

খেয়ে নেব কোথাও।

কোথায় খাবেন?

কোনো রেস্টুরেন্টে।

আজ রাতে আমার এখানে খাবেন।

খুশিতে লোকটার চোখ চকচক করে। বুঝি খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে। একদিন তরকারি রেঁধে পাঠাই। লোকটা গদগদ হয়ে যায়। একদিন নিজেই গিয়ে তরকারি দিয়ে আসি। ঘরের অবস্থা দেখে মায়া লাগে। লোকটাকে দেখে আরো মায়া লাগে। বউ অনেকেরই বাইরে থাকে। কিন্তু তারা কেউ এভাবে না খেয়ে শুকিয়ে থাকে না। তারা সেটা অন্যভাবে ম্যানেজ করে নেয়। হয়তো বুয়া রাখে, বাসায় কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকে তারা রেঁধে দেয়। অথবা কাছাকাছি কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের বাসায় মাসকাবারি টাকা দিয়ে খায়। এসব কিছুই না করলে নিদেনপক্ষে ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে খায়। কিন্তু লোকটা কোনো কিছুই করে না। দেখেই বুঝতে পারি ভালো হোটেলেও সে খায় না। কারো বাসায় গেলে হয়তো খেয়ে আসে। আর বাকি দিন জোড়াতালি দিয়ে কাটায়।

লোকটাকে মাঝে মাঝেই খাবার পাঠাই। ভালো কিছু রান্না করলে লোকটাকে না দিয়ে খেতে পারি না। লোকটাও লোভী হয়ে ওঠে। আমার হাতের রান্না ছাড়া যেন খেতেই পারে না। আমার হাজব্যান্ড আলম ব্যবসায়ী মানুষ সারা দিন ব্যস্ত থাকে। রাত করে ঘরে ফেরে। দুটো বাচ্চাকে পড়ানো ছাড়া সন্ধ্যাটা আমার ফাঁকাই থাকে। প্রায় সন্ধ্যাতেই লোকটা আসে চা খায়। আমিও খাই। তারপর লোকটা আমার কাছে রঞ্জু হয়ে যায়, আমি মনিরা। লোকটা প্রায়ই সব চোখ ফাঁকি দিয়ে আমার সিঁড়ির কাছ ঘেঁষে পেছনের দরজাটা দিয়ে আমার বাসায় ঢোকে। খুব নীরব সময়ে সুবিধামতো আমি লোকটার দোতলার ড্রয়িংরুমের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ি। এভাবে আমরা দুজন দুজনের হয়ে যাই। লোকটাকে আমি ভালো শার্ট, প্যান্ট, কাপড় কিনে দিই। লোকটা আমাকে খুব মানসিক সাপোর্ট দেয়। খুব উষ্ণতা দেয়। লোকটা আমাকে বলে, আমিই তার বউ। আমি তাকে বলি, আমার মনের মানুষ।

এখন ওরা হেঁটে গেল। বউটা খুব আস্তে আস্তে খুটখুট আওয়াজ তুলে হাঁটে। রঞ্জু বউয়ের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যায়। রোজ এভাবে গায়ে গা মিলিয়ে ওরা বাইরে যাচ্ছে। এটা-সেটা কিনে আনছে। সব সময় ওরা একসঙ্গে বের হচ্ছে একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ফিরে আসছে। তারপর হাসতে হাসতে ওগুলো নিয়ে দোতলায় উঠছে। ওরা বের হলে আশপাশের কোয়ার্টারের সবাই ওদের তাকিয়ে দেখে। যেন রঙিন কোনো বায়োস্কোপ দেখছে। বউটা এসেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যেমন সাজ পোশাক তেমন সবার সঙ্গে হাই হ্যালো। কোয়ার্টারের ভেতরে এখন ওদের গল্পই শুধু ঘুরছে। দুই বছর চার মাস পর বউটা এসেছে। বড় ডিগ্রি আর বড় বেতনের চাকরি নিয়ে এসেছে। বাচ্চা দুটো আসেনি। ওরা ওখানেই পড়াশোনা করছে। বউটা এসেই হুলুস্থুল করে বাড়িঘর সাজাচ্ছে। কয়েক দিন ধরে মাঝে মাঝেই বন্ধুদের সঙ্গে গেট টুগেদার করছে। বাড়ি সাজানো দেখাচ্ছে। বাসায় মাঝে মাঝেই বাবুর্চি এসে রান্না করে দিয়ে যাচ্ছে। খুব নাকি নামকরা বাবুর্চি। সুস্বাদু রান্নার গন্ধে আমার এক তলাও ম-ম করে। বন্ধুরা খায় গল্প করে। তখন ওদের সমস্বরের হাসি আমার এক তলাকে কাঁপিয়ে যায়। তারপর বউটা বন্ধুদের খুব হৈচৈ করে বিদায় দেয়। তখন ওরা দুজন দোতলা থেকে আমার জানালার সামনের কোয়ার্টারের রাস্তায় নেমে আসে। তখন আবার তাদের সমস্বরের হাসি রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে। আমার বাচ্চা দুটো সেদিন বলল, আম্মু আন্টি খুব হাসতে

পারে তাই না?
বাসায় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওরা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। সেদিন দেখা গেল আমাদের সামনের কমন বাগানে দাঁড়িয়ে বউটা ছবি তুলছে। বোঝা যায় দাম্পত্যের স্বাদ ওরা কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নিতে চাচ্ছে। আমি এক তলায় ঝিম মেরে পড়ে থাকি। আলমের সঙ্গে আমার কোনো দিন মন মেলেনি। কোনো দিন ও আমাকে বোঝেনি। তার পরও সেদিন আলমকে বলেছি আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমরা বাইরে খেতে যাব। আলম বাধ্য স্বামীর মতো চলে এসেছে। আমরা খুব ঘটা করে খেতে গেছি। যাওয়ার আগে দু-এক বার দোতলার জানালায় তাকিয়েছি। বার বার প্রার্থনা করেছি ওরা দেখুক। সেদিন আলমের সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছি। আলম আমাকে খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে। সব হচ্ছে কিন্তু আমার জ্বলে যাচ্ছে। আমার কানে হাসির শব্দ বাজে। নতুন দম্পতির কলরোল বাজে। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।
অফিসে রঞ্জুকে বলি, এভাবে কেউ হেঁটে যায়!
কিভাবে?
এই যে কাল সন্ধ্যায় হেঁটে গেলে।
কিভাবে হেঁটে গেলাম!
এই যে বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে।
তোমার বউ তো খুব আস্তে হাঁটে। তুমি তো এত আস্তে হাঁটো না।
তা হাঁটি না।
কোয়ার্টারের আর কোনো দম্পতিকে এভাবে হাঁটতে দেখেছ? তুমি তোমার স্বাভাবিক হাঁটা হাঁটবে। এমন আস্তে আস্তে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে মার্চপাস্ট করতে হবে কেন!
রঞ্জু কেমন করে হাঁটে, কতটা জোরে, ওর কোন সময়ের ভঙ্গিমা কী– এসব আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে। না, বউটাও জানে না। রঞ্জু আমাকে নিজেই বলেছে ওর বউ ওকে বুঝতে পারেনি। বুঝতে যে পারেনি তা আমিই তো বুঝি। বউটা শরীর ধরে রাখার জন্য ডায়েট করে, ঘরে ভালো কিছু রাঁধে না। আর রঞ্জুর ভালো খাবারে চরম আগ্রহ। বউটা ক্যারিয়ার নিয়ে পড়ে থাকে। আর রঞ্জু খুব উত্তপ্ত পুরুষ। আর বউটার যে অবজ্ঞা ছিল অবহেলা ছিল তা কি আমি দেখিনি। সেই ডুবন্ত মানুষ, রঞ্জুর সেই অনাহারী শুকনো চেহারা আমি কি ভুলে গেছি! রঞ্জু আমাকে বলেছে ওর বউ ওকে আমার মতো সুখী করতে পারেনি। যেমন আমি বিশ্বাস করি আলম আমাকে রঞ্জুর মতো সুখী করতে পারেনি। আলম আর আমি মনে ও শরীরে দুই দিক থেকেই একেবারে ভিন্ন। কিন্তু রঞ্জুর সঙ্গে আমি মিশেই বুঝতে পেরেছি আমাদের দুজনের শারীরিক ও মানসিক ক্যামেস্ট্রি এক। শুধু তাই নয়, আমাদের রুচি আর পছন্দও এক।
রঞ্জুর সঙ্গে মোবাইলে এখন কোনো কথা হয় না। অথচ আমরা ঘণ্টার ঘণ্টায় কথা বলেছি। দু-এক ঘণ্টা কথা না বললে রঞ্জুর নিঃশ্বাস নাকি আটকে যায়। সেদিন একটা ফোন করে দেখেছিলাম। রঞ্জু ফোন ধরেনি। অনেকক্ষণ পর একটা মেসেজ করেছে– আমি বাসায়। বাসায় থাকলে কি মানুষ পৃথিবীর কারো সঙ্গে কথা বলে না নাকি! আর বাসা মানে কি একটাই ঘর? এ ঘর ও ঘর নেই? কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু-এক মিনিট কি কথা বলা যায় না! ধরে নিচ্ছি আমার ফোনের সময় বউটা কাছে ছিল। কিন্তু একটু ফাঁক বুঝে রঞ্জু কি আমাকে একটা ফোন করতে পারে না। আমার জ্বলে যায়।
কী ব্যাপার! তুমি কি সারাক্ষণ বউয়ের কোলে বসে থাক? নাকি বউ তোমার কোলে বসে থাকে? না তা হবে কেন!
আমার ফোন ধরলে না যে।
ভীষণ সন্দেহ করে তাই কোনো ঝামেলায় যেতে চাই না।
ঝামেলায় যেতে চাও না মানে?
না, ধর যদি বুঝে ফেলে তাহলে তো দুজনে আর এত সহজে মেলামেশা করতে পারব না। তাই প্রথমে একটু সাবধান থাকছি।
এত সন্দেহ করে কেন?
ওটাই ওর স্বভাব
ওর স্বভাব না তোমার স্বভাব ভালো না সে জন্য করে।
আমি জানি রঞ্জুর বউ আমাকে সন্দেহ করে। অনেক দিন আগে হয়তো এই কোয়ার্টার এলাকার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর সুবাদে ওর বউ জানতে পেরেছে আমার সঙ্গে রঞ্জুর কিছু একটা আছে। এসব কোয়ার্টার এলাকায় প্রকাশ্য-গোপন অনেক কিছুই থাকে। যদিও আমি আর রঞ্জু প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি এমন কিছুই করি না যে কোয়ার্টারের দেয়ালগুলোও গল্প বলতে থাকবে। আর আমাদের এত সুবিধা যে রঞ্জু সিঁড়ি দিয়ে নেমে চুপ করে কখন আমার রুমে আর আমি এক তলা সিঁড়ি ভেঙে টুপ করে কখন ওর বাসায় ঢুকে যাই তা কেউ বুঝতেই পারে না। আর এখন মানুষ অনেক ব্যস্ত। মানুষ এখন এত কিছুতে নজর রাখতে পারে না। তবে আমরা যা করি তা খুবই বাড়াবাড়ি কিন্তু আমাদের সেটুকু করার সুযোগ আছে, সেটা করা আমাদের দুজনের জন্যই খুব প্রয়োজন ছিল আর প্রকৃতিও আমাদের খুব সহায়তা করে। যা হোক, বউ কিছু একটা জানতে পেরেছিল সেটা নিয়ে সে রঞ্জুর সঙ্গে ঝামেলা করেছিল। তা ছাড়া সাত দিনের শর্ট নোটিসে ওর বউ একবার এসেছিল। আমি তখন রঞ্জুকে এক জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে একটা টেক্সট্ করেছিলাম। ওর বউ আমার নাম্বারে ফোন করে বলেছিল– কে বলছেন?
আমি খুব স্টাইল করে বলেছিলাম– জাহান আরা বলছি
তারপর বউটা বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলেছিল– আপনি জাহান আরা? আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?
আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলাম– সেটা আপনার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয় না।
আমার কাছে ওর বউয়ের এ প্রশ্ন খুব অরুচিকর ঠেকেছিল। মহিলাকে আমি যতটা স্মার্ট মনে করেছিলাম আদতে তা নয়। ওই টেক্সট্টা কোনো আপত্তিকর ছিল না। অফিশিয়াল কোনো কাজে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো কলিগ এ ধরনের টেক্সট্ করতেই পারে। ব্যাপারটা নিয়ে আমি তাই কোনো মাথাই ঘামাইনি।
এখন যখন এ দম্পতির আবার নতুন করে দাম্পত্য শুরু হয়েছে পাশের কোয়ার্টারের সবার কাছে এ দোতলা একটা উৎসুকে পরিণত হয়েছে। ওরা কখন বের হয়, কখন ফেরে, কেমন করে হাসে। কোন বাগানে গিয়ে ছবি তোলে, সকালে কখন হাঁটে। ভদ্র মহিলা কোন ব্যায়ামের মেশিন কিনে আনে। তারপর কখন শরীরচর্চা করে। এগুলো সবই যখন খুব আলোচনার আর কৌতূহলের বিষয়, তখন আমি বুঝতে পারি বউটার কোথাও আমাকে দেখানোর একটা ব্যাপার আছে। আর আমাকে নিয়ে তার মনের গহনে জ্বালা-পোড়াও আছে। কারণ সন্দেহের একটা তীর তার আছেই। কারণ এই এত গন্ধ ছুটিয়ে, এত বন্ধুদের দাওয়াত আর মহাসমারোহে এই বাড়িঘর এমন পালিশ করে সাজালেও সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী হিসেবে বউটা কোনো দিন আমাকে সৌজন্য করেও ওদের বাসায় যেতে বলেনি। তবে দু-এক বার চোখাচোখি যখন দেখা হয়েছে বউটা খুব কৃত্রিম হাসি হেসে, খুব শুদ্ধ ভাষায় সুন্দর করে চোখেমুখে খুব উচ্ছ্বাস দেখিয়ে টেনে টেনে বলেছে– কী ভালো?
আর তখন রঞ্জু এমন সতর্কভাবে হেঁটে গেছে যে সামনে কোনো মানুষ আছে তা যেন সে জানেই না।
বউটা বেশ সুন্দরী। শরীরকে খুব ভালোভাবে বেঁধে রেখেছে। তার পরও বউটা খুব সাজে। টিনএজদের ছাঁচে আধুনিক লেটেস্ট পোশাক পরে। লেটেস্ট ফ্যাশানের সব কিছু ব্যবহার করে। সামনের জানালায় এলেও নিজেকে খুব গুছিয়ে আসে। সব সময় ফিটফাট থাকে। বউটাকে কখনই সাধারণ পোশাকে দেখা যায় না। কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় বের হলেও আধুনিক পোশাক এবং সঙ্গে স্যান্ডেল পর্যন্ত খুব ম্যাচিং। বুঝতে পারি বউটা ওর তরুণীর মতো শরীর, মেদহীন সমান পেট আমাকে দেখাতে চায়। সবাইকে ওসব সৌন্দর্য সে দেখাতে খুব পছন্দ করে। সবার প্রশংসা তার খুব কাম্য। আমার কম সৌন্দর্যও তাকে আশ্বস্ত রাখে না। আরো নিখুঁত, আরো শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে নিজেকে সব সময় মেলে ধরতে চায়। বউটা বেশ লম্বা তার পরও হাইহিল পরে। পাশাপাশি হেঁটে গেলে কখনো রঞ্জুর মাথা ছুঁয়ে বউটার মাথা উঁচু দেখা যায়। আমার খর্বতাকে ও ওর উচ্চতা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চায়। সেদিন কোয়ার্টারের একটা অনুষ্ঠানে আমাদের দেখা হয়েছিল। বউটা দেখলাম দুবার ইচ্ছা করে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি বুঝতে পারছিলাম ও আমার সঙ্গে ওর উচ্চতার তুলনা করে নিচ্ছে। আশপাশের মানুষকেও হয়তো দেখাচ্ছে। তবে আমার থেকে ওকে ফুটখানেক উঁচু দেখা যাওয়ার পরও ওর চোখে আমি স্বস্তি দেখিনি। আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়।
তোমার বউ এত সেজে থাকে কেন?
ও সাজতে পছন্দ করে।

তাই বলে সব সময়! নাকি তুমিই সাজিয়ে রাখতে পছন্দ কর?
কী যে বল!
আমার তো তাই মনে হয়। বউ একটা সুন্দরী তাকে পুতুলের মতো সাজিয়ে রেখে সবাইকে দেখানো– দেখেন, দেখেন কেমন একটা একটা সুন্দরী বউ আমার।
তোমার তো দেখি মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
না, না মাথা নষ্ট না। বউকে তো ঠিকই পূজা কর, ঠাকুর মানো। তুমি ঠিকই তোমার সুন্দরী, জ্ঞানী আর পদমর্যাদাবান বউয়ের সামাজিক অবস্থানের ক্রেডিট নিয়ে থাক।
তোমার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর তো।
না, মাথা আমার ঠাণ্ডা হবে না। এ তিন বছর কোথায় ছিল। আমি যে বাটি বাটি তরকারি পাঠালাম। জ্বর হলে গাঁ মুছিয়ে দিলাম। ও তখন কোথায় ছিল? তখন তো তোমাকে দেখেনি। ডিগ্রি নিতে ব্যস্ত ছিল।
আমি তো তোমাকেই ভালোবাসি। তোমাকেই বউ বলি।
বউ তোমাকে ভালোবাসেনি, কেয়ার করেনি তাতে তো তোমার এখন আর কোনো ক্ষোভ নেই। বউয়ের ডিগ্রি আর বেতনের গল্প কর আর বাজারে তোমার দাম বাড়ে।
মনটা তো তোমার কাছেই থাকে।
আচ্ছা তোমার বউ তো লম্বা, তো এত হাইহিল পরে কেন?
ওটা ওর অভ্যাস।
তোমার মাথা থেকে ওর মাথা উঁচু দেখা যায়, বিশ্রী লাগে।
আচ্ছা বাদ দাও ওসব, আমরা আমাদের গল্প করি।
না, বাদ না, ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু। তোমার বউ আসলে তোমাকে পাত্তা দিতে চায় না। সব কিছুতে যে ও তোমাকে ছাড়িয়ে এটা বোঝাতে চায়।
রঞ্জু আমাকে বার বার বোঝাতে চায় আমার জায়গাটা আমারই আছে ওটা কোনোভাবেই খোয়া যায়নি।
কিন্তু আমার মন মানতে চায় না। ভেতরে আমার আগুন জ্বলতেই থাকে। ওদের দুজনকে দেখলেই এখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। আমাকে দেখলেই বউটার হা হা হি হি বেড়ে যায়। পাশে জামাইয়ের কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়ায়, গায়ের সঙ্গে একেবারে রেপ্টে যায়। চোখে এমন একটা ভাব খেলা করে– দেখ আমরা কত সুখী। আর এই যে আমার লোক, তুমি পছন্দ কর, কই নিতে পারলে? পারলে? আর লোকটা বউ সঙ্গে থাকলে ম্যাও হয়ে যায়। একটা লোক এত ভান কিভাবে ধরে! কিভাবে এমন ধামাধরা হতে পারে! আশ্চর্য, মানুষ এত চোর হয়, এত হিপোক্রেট! তারপর রঞ্জুর প্রতি আমার এই তীব্র রাগ স্থায়ী হয় না। আমাকে কাছে পেলে ও ওর এই ম্যাও হয়ে থাকার এমন ব্যাখ্যা দেয়, এমন যুক্তি দাঁড় করায়, আমাকে ভালোবাসার কথা এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমাকে এমন আদর দেয় যে আমি পটে যাই। শুধু পটিই না মোমের মতো গলে যাই। তার পরও লোকটা আমার সঙ্গ আর শরীরের জন্য উন্মাদ হয়ে থাকে। আমি লোকটার শরীর আর মনের জন্য উন্মাদ হয়ে থাকি এবং সুযোগ বুঝে লোকটা এক তলায় আর আমি দোতলায় প্রবেশ করি। তখন আবার বউটার জন্য আমার খুব করুণা হয়। আহা! এত সাজগোজ, এত জ্ঞানীগুণী, এত ডিগ্রি, এত সুন্দরী, এত শরীর ধরে রাখা– কী লাভ হলো এত কসরতের?
বউটা বেশ রাগী। মাঝে মাঝে ওদের বাসায় ভাংচুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। রঞ্জু বলে ওর বউ মেজাজি। সামলানো নাকি খুব কঠিন। কিন্তু আমি জানি রঞ্জু কী চিজ! আমি তো জানি ওর অস্বচ্ছতা। ওর অনেক আচরণের কোনো ব্যাখ্যা ও আমাকে দিতে পারেনি। বউটার অবহেলা আর অবজ্ঞার কথা ও যতই বলুক আমিই ওর আশ্রয়, আমিই ওর অক্সিজেন কিন্তু ও যে আরো কোথাও যায় তা আমি বুঝি। আর যে কৃপণ। ওকে আমার চেয়ে কে বেশি চেনে?
বউটার সঙ্গে আজকাল আমার একটা খেলা চলে। বউটা আমাকে দেখেও অনেক সময় না দেখার ভান করে। আবার আমিও ওদের দেখি না এমন দেখাই। কিন্তু ওদের আমি সব সময় জানালার আড়াল থেকে দেখি। মাঝে মাঝে আমি যখন গাড়িতে উঠি দেখি দোতলার পর্দা খুব মৃদুভাবে নড়ছে। আমি বুঝি কেউ আমাকে দেখছে। মাঝে মাঝে ভাবী রঞ্জু। কারণ রঞ্জু আমাকে এভাবে দেখতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু পরে বুঝি রঞ্জু না। কারণ রঞ্জু হলে পরে আমাকে বলত– তোমাকে দেখলাম। এই রঙের ড্রেস পরেছ খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু রঞ্জু যেহেতু এগুলো বলে না তাহলে বউটাই আমাকে দেখে। আমরা এভাবে দুজন দুজনকে চোখে চোখে রাখি। কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে দিই না।
বউটার সঙ্গে এই খেলা, রঞ্জুর সঙ্গে এই খেলা খুব নিখুঁত ছিল। কিন্তু তার পরও দুর্ঘটনাটা ঘটল। বউটা সব বুঝে গেল। ভুলটা আমারই ছিল। বউটা গিয়েছিল তিন দিনের টুরে। এ সময় একদিন রঞ্জু আমার এক তলায়, আর আমি একদিন রঞ্জুর দোতলায় গিয়েছিলাম। ভুল করে আমার ব্রাটা ফেলে এসেছিলাম রঞ্জুর বাথরুমে। বউটা আবার দুই দিন পরেই একটু রাত করে ফিরে এসেছিল। আর রাতেই বউটা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল রঞ্জুকে। এটা কার? না, রঞ্জু বলেনি কার। আমিও কোনো দিন স্বীকার করব না ওটা আমার। ওটা কার বউটা নিশ্চিত করে জানে না। কিন্তু ওটা যে আমারই হবে তা নিশ্চিত করে বোঝে। বউটার এত দিন শুধু সন্দেহ ছিল, বউটা এখন নিশ্চিত। এখন তার বাঁকানো সুন্দর ভ্রু নাচিয়ে আর কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট দিয়ে সে আমার দিকে যতই বিদ্রূপের হাসি ছুড়ে দিক, রঞ্জু কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যতই দেখাক আমরা খুব সুখী দম্পতি, বুকের ভেতর ও এখন সত্যটা জানে। রঞ্জু কোথাও যায়। রঞ্জু আমার কাছে আসে। আমার কাছে আশ্রয় খোঁজে।
দুই দিন বউটাকে দেখি না। জানালায় কান পেতে রাখি বউটার হাইহিলের খুটখুট আওয়াজ আর পাশে মার্চপাস্ট করে ফিরে আসা লোকটার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। না, শুনি না। রাতে ওদের বেডরুমে কোনো বাতি দেখি না। কোনো হাসির শব্দ শোনা যায় না। ওদের বাসায় কোনো ভাংচুরের শব্দও পাই না। দোতলায় ওদের কোনো শব্দ পাই না। নিচ তলায় আমার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। তিন দিন পর রঞ্জুকে অফিসে ধরি।
কী, কোনো অগ্রগতি হলো?
হ্যাঁ, আশাকে ম্যানেজ করতে পেরেছি।
পাঁচ দিন পর সন্ধ্যায় ওরা হেঁটে যায়। আমার হঠাৎ খুব কষ্ট হয়। এভাবে কেউ হেঁটে যায়! হেঁটে যায় কোনো দম্পতি। রঞ্জু বেশ ব্যবধানে আগে আগে হাঁটছে। পেছনে বউটা। বউটার পরনে টকটকে লাল সালোয়ার-কামিজ। মুখে খুব সাজ। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। সব কিছু ম্যাচিং করা। কিন্তু বউটার মুখটা ঠিক যেন মরা মানুষের মুখ। প্রাণহীন সাদা। আমার খুব কষ্ট হয়।
এভাবে কেউ হাঁটে! হাঁটে কোনো দম্পতি?
রঞ্জু বউটাকে ম্যানেজ করেছে। বউটা নাকি আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। বউটা নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। অফিসে আমার নামে আমার বসের কাছে নালিশ করতে চেয়েছিল। কোয়ার্টারের সবাইকে জানিয়ে দেবে বলেছিল। প্রমাণ হিসেবে ব্রাটা সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে। তারপর বউটা আর কিছুই করেনি। রঞ্জু বউটাকে ম্যানেজ করেছে। রঞ্জু ওর বড় ডিগ্রির, বড় বেতনের সুন্দরী বউকে ম্যানেজ করেছে। কী বলে ম্যানেজ করেছে রঞ্জু? যা বলে, যা করে ও আমাকে পটিয়ে ফেলে, মোমের মতো গলিয়ে ফেলে! আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আমার মতো ওকে আর কে চেনে! ও যে আমাকে ছাড়াও চোখেমুখে নরম আন্তরিকতা আর চোখে উজ্জ্বল খুশির ঝলক নিয়ে আরো কোথাও বলে, 'বাঃ তোমার শজনে ডালটা তো ঠিক আমার মায়ের রান্নার মতো হয়েছে। ডাঁটার সঙ্গে চিংড়ি মাছ! কই, কেমন হলো আনো তো দেখি'– তা কি আমি বুঝি না? শুনেছি বউটা আবার একটা ডিগ্রি নিতে যাবে। তখন ও যে আবার তোমার হাতের রান্না ছাড়া আমি খেতে পারি না– এ কথা বলে লতি-শুঁটকি আর করলা-চিংড়ি ভাজি দিয়ে আমার ডাইনিং টেবিলে বসে ভাত খাবে, 'তোমার মতো অন্য কাউকে ভালোবাসব এটা কী করে সম্ভব বল'– এ কথা বলে আমার বেডরুমে, আমার বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে এটা কি আমি জানি না!
পাঁচ দিন পর ওরা সন্ধ্যায় হেঁটে যায়। রাতে দোতলার বেডরুমের উজ্জ্বল বাতিটা আমাদের সামনের জায়গাটা আবার আলো করে রাখে। যে আলোয় নিচে পড়ে থাকা কাঠগোলাপ ফুলগুলোও দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে মাগুরার ‘আকবরবাহিনী’

জাহিদ রহমান

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব আঞ্চলিকবাহিনী গড়ে ওঠে তার মধ্যে অন্যতম ‘আকবরবাহিনী’। এই গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানায়। শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান টুপিপাড়া গ্রামের মিয়া আকবর হোসেনের সুদক্ষ নেতৃত্বে এই বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তিনিই। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত পাক-হানাদার এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে পরিচালনা করেন অধিনায়ক আকবর হোসেন। তার সুদক্ষ কমান্ডেই বাহিনী পরিচালিত হয়। এই বাহিনীতে ছিল এক হাজারেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা। প্রাথমিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আকবর হোসেন অপরাপর সহযোদ্ধা মোল্লা নবুয়ত আলী এবং বন্ধু মৌলভী নাজায়েত খোন্দকারকে পাশে রেখে শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে এই বাহিনীকে সংগঠিত করেন। কিন্তু দ্রুতই ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজবাড়ী, ঝিনেদা, মাগুরাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদ্রোহ করে আসা সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, মুজাহিদ সদস্যরা এই বাহিনীতে যোগ দিলে এই বাহিনী আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরে আশপাশের বিভিন্ন থানা থেকে তরুণরা গোপনে এসে বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধকালে ত্রিশটিরও বেশি ছোট-বড় সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন এই বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা। এই বাহিনী কখনো সম্মুখ আবার কখনো গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে বিভিন্ন স্থানে পাক-বাহিনী এবং তাদের দোসরদের পরাস্ত করে।

এই বাহিনীর দুঃসাহসী সব যুদ্ধ মাগুরা, রাজবাড়ী, ঝিনেদার যুদ্ধ ইতিহাসকে গৌরাবান্বিত করেছে। এখনো সাধারণ মানুষের মুখে এই বাহিনীর গল্প শোনা যায়। আকবরবাহিনীর কারণেই একাত্তরে মাগুরার শ্রীপুর থানা কার্যত ছিল মুক্তাঞ্চল। পাক-বাহিনী এবং রাজাকাররা কখনো শ্রীপুরে তাই স্থায়ীভাবে সক্রিয় থাকতে পারেনি। কোনো ক্যাম্প গড়ে তুলতে পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়। তবে এই বাহিনী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের প্রতি এতটাই অবিচল ছিল, শুধু নিজ এলাকাতেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা নয় একই সাথে মাগুরা সদর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ঝিনেদার বিরাট অংশ পাক-হানাদার মুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ঝিনেদার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পাক-আর্মিদের ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে দখল করে নেয়। স্বভাবতই আকবরবাহিনী পাক-হানাদারদের কাছে ছিল এক মহাআতঙ্ক। এ কারণেই আকবরবাহিনীর প্রধান আকবর হোসেনকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কারও ঘোষণা করে পাক-হানদাররা। একাত্তরে এই বাহিনীর গড়ে ওঠা, শত্রু প্রতিরোধ, রণকৌশল, গেরিলা যুদ্ধ দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় যুদ্ধকালে ৮ নাম্বার সেক্টর কর্তৃক এই বাহিনী বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধ এবং আকবরবাহিনীর আত্মপ্রকাশ

আকবরবাহিনী যার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক আকবর হোসেনের জন্ম মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া গ্রামে। শ্রীপুর উপজেলা মাগুরা সদর উপজেলা থেকে পনেরো কিলোমিটার উত্তরে। প্রথম জীবনে আকবর হোসেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকরি নিলেও পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচারণের প্রতিবাদ করে ৫৪ সালের ৮ আগস্ট চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। এরপর তিনি স্থানীয় সাধারণ মানুষের সেবা করার অভিপ্রায়ে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের থানা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি নিজ ইউনিয়ন শ্রীকোলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং টানা ২৪ বছর স্বপদে থাকার অনন্য কৃতিত্ব দেখান। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আকবর হোসেন মিয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে নিজ থানা শ্রীপুরেই ছিলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর আওয়ামী লীগ নেতা আকবর হোসেন নিজের দলীয় কর্মী এবং এলাকার তরুণদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে তিনি তৈরিও হতে থাকেন। ২৫ মার্চ রাতে পাক আর্মিরা ঢাকায় নিরীহ বাঙালির ওপর অতর্কিত হামলা চালালে তিনি তৎক্ষণাৎ সহযোগীদের নিয়ে সভা করে থানা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন এবং সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে অনুরোধ করেন। দ্রুতই নিজ থানা শ্রীপুরের খামারপাড়া গ্রামের সহযোদ্ধা খন্দকার সুজায়েত আলী, মৌলভী নাজায়েত আলী, বরিশাট গ্রামের মোল্লা নবুয়ত আলীসহ শত শত তরুণদের সাথে নিয়ে মাগুরার সর্বত্র পাক-হানাদারদের প্রতিরোধের পরিকল্পনা নেন। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত তরুণদের বড় একটি দল নিয়ে প্রথমে মাগুরার আনসার ক্যাম্প দখলে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু করেন। মুহূর্তেই আকবর হোসেনের সাহসী নেতৃত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মুক্তিকামী মানুষের মাঝে তাকে ঘিরেই নতুন এক প্রাণের সঞ্চার হয়। মাগুরা, মহম্মদপুর, রাজবাড়ী, পাংশাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে তার সাহসী ভূমিকার কথা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে তরুণরা পালিয়ে এসে তার দলে যোগ দিতে থাকে। তার বাহিনী দ্রুতই মাগুরার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দেশপ্রেমিক সাধারণ জনতার কাছে এক অন্যরকম আস্থায় পরিণত হন। এদিকে তিনি সহসাই কাছে পান একদল সাহসী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা। যারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহ করে অস্ত্রসহ পালিয়ে এসে তার সাথে দেখা করেন তার বাহিনীতে যোগ দেন। ফলে অচিরেই তার বাহিনী দারুণভাবে সংগঠিত হয়ে পড়ে। একই সাথে তিনি কাছে পান সাহসী অকুতোভয় কিছু মুক্তিযোদ্ধা। তারা হলেন– মৌলভী খন্দকার নাজায়েত আলী (খামারপাড়া), মো. আনারুদ্দিন শেখ (শ্রীকোল, শ্রীপুর) জহরুল আলম মুকুল (শ্রীপুর সদর, মাগুরা), সেনাবাহিনীর মো. বদরুল আলম (বেলনগর, মাগুরা), চৌধুরী জহুরুল হক (বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরা), ইরাদুল আখতার ফয়েজ (টুপিপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), খন্দকার আবু হাসান (খামারপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), খন্দকার আবু হোসেন (খামারপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), সৈয়দ মারুফ আহমেদ (মাজাইল, শ্রীপুর, মাগুরা), নুরুল হোসেন মোল্লা (কাজলী, শ্রীপুর, মাগুরা), আবদুল মান্নান (বালিয়াডাঙ্গা, মাগুরা), শফি জোয়ার্দ্দার (খামারপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), মুন্সী গোলাম মোস্তফা (বারইপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), ওলিয়ার মৃধা (খামারপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা), আবদুল মালেক (আমতৈল, শ্রীপুর, মাগুরা), সিরাজুল ইসলাম খোকন (আমতৈল, শ্রীপুর, মাগুরা), ইন্তাজ আনসার (আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা), আবুল হোসেন (বালিয়াডাঙ্গা, মাগুরা), মনিরুল ইসলাম জেন্টেল (আমতৈল, শ্রীপুর, মাগুরা), হারেজ উদ্দিন (বগুড়া, শৈলকূপা, ঝিনেদা), আবদুল খালেক (গাড়াগঞ্জ, শৈলকূপা, ঝিনেদা), মো. সুলতান (কাচেরকোল, শৈলকূপা, ঝিনেদা), নওশের আলী (দ্বারিয়াপুর, শ্রীপুর, মাগুরা), মো. মোশাররফ হোসেন (আমতৈল, শ্রীপুর, মাগুরা), মো. আনোয়ার হোসেন (কাজলী, শ্রীপুর, মাগুরা) মো. আবদুর রশিদ (হরিন্দী, শ্রীপুর, মাগুরা), গোলাম মোস্তফা (তারাউজিয়াল, শ্রীপুর, মাগুরা), হাবিলদার জালাল উদ্দিন (বহরপুর, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী), আবদুর রাজ্জাক নান্নু (কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ), পুলিশ বাচ্চু মিয়া (বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী), গোলাম মওলা, (হবিতপুর, শৈলকূপা, ঝিনেদা), সায়েম উদ্দিন কালা (শ্রীপুর সদর, মাগুরা), হবিবর রহমান (গোপালপুর, শ্রীপুর. মাগুরা), আখতার সুলতান (বেস্টপুর, শ্রীপুর, মাগুরা), শেখ মুক্তাদির (শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা) মকসেদ আলী (শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা), মনোয়ার (নোহাটা, শ্রীপুর, মাগুরা), ইপিআর মনোয়ার হোসেন (বড়বাড়ি, বগুড়া, শৈলকূপা), ইপিআর সিরাজুল ইসলাম (নারুয়া, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী), মাহবুবর রহমান বাবু (সারঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, মাগুরা), মোল্লা মতিয়ার রহমান (কাজলী, শ্রীপুর, মাগুরা), হাফিজুর রহমান মাস্টার (খালিয়া, মোহাম্মদপুর, মাগুরা), আশরাফুল ইসলাম কালা (বরইচারা, শ্রীপুর, মাগুরা), নজরুল ইসলাম রাজু (হরিন্দী, শ্রীপুর, মাগুরা), আবদুস সাত্তার (পুলিশ) জোকা, শ্রীপুর, মাগুরা, হাফিজুর রহমান (কাজলী, শ্রীপুর, মাগুরা), ছোট কবীর (বরুনাতৈল, শ্রীপুর, মাগুরা), বড় কবীর (মাগুরা), নুরুল হুদা পল্টু, এফ এফ (জজকোর্ট পাড়া, মাগুরা) আবু ইশা (জজকোর্ট পাড়া, মাগুরা), সুধীর বিশ্বাস, এফএফসহ (পারনান্দুয়ালী মাগুরা) আরো অনেকে। যারা সাহসে বীরত্বে ছিলেন সবসময়ই অগ্রগামী। এদিকে প্রতিদিনই এই বাহিনীতে এসে যোগ দিতে থাকেন বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণরা। যুদ্ধের শুরুতে এই বাহিনী সংঘটিত হয় এবং পরে একটি পরিপূর্ণ বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বাহিনীতে শুধু শ্রীপুরই নয়– মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শৈলকূপা, পাংশা, বালিয়াকান্দি এবং রাজবাড়ী সদর থানার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সৈনিক-পুলিশ-আনসার এবং তরুণ অংশগ্রহণ করে। লোকমুখে খবর পেয়ে দেশের আরো অন্যান্য জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে এই বাহিনীতে যোগদান করে। গ্রামের অনেক সাধারণ কৃষক লাঙ্গল ফেলে এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ স্বাধীনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই বাহিনী 'আকবরবাহিনী' হিসেবেই জনমানুষ তথা সাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

এই বাহিনী গড়ে তুলতে যারা বিশেষভাবে অবদান রাখেন এবং সহযোগিতা করেন তারা হলেন– প্রয়াত শাহবুদ্দিন চেয়ারম্যান (নবগ্রাম), প্রয়াত খোন্দকার সুজায়েত আলী (খামারপাড়া), প্রয়াত খন্দকার নাজায়েত আলী (খামারপাড়া), প্রয়াত আবদুর রশিদ মিয়া (বিলনাথর), প্রয়াত কাজী ইউসুফ (আঠারোখাদা), প্রয়াত খন্দকার আবদুল মাজেদ (শিবরামপুর), প্রয়াত আবদুর রহিম জোয়ার্দ্দার (শ্রীপুর), প্রয়াত শাহাদত মোল্লা (কাবিলপুর), প্রয়াত মোকাররম আলী চৌধুরী, প্রয়াত নওশের আলী চৌধুরী

(সারঙ্গদিয়া), প্রয়াত ইন্তাজ বিশ্বাস (দ্বারিয়াপুর), প্রয়াত তৈয়ব মাস্টার (চৌগাছী), প্রয়াত হাফিজ মাস্টার (মোহাম্মদপুর), প্রয়াত সৈয়দ আলী মেম্বর অলংকারপুর, ফরিদপুর), প্রয়াত আবদুল জলিল বিশ্বাস (বেলনগর), প্রয়াত কামরুজ্জামান (মীনগ্রাম), প্রয়াত মমিন ফকির (খামারপাড়া), প্রয়াত ডা. সন্তোষ কুমার (খামারপাড়া), ডাক্তার আলী আহমেদ (দাইরপোল), প্রয়াত আলী হোসেন খাঁ (রামনগর), প্রয়াত আবু বক্কার (আলফাপুর), প্রয়াত মাসুদুর রহমান (বরিশাট ব্যাপারীপাড়া), প্রয়াত চেয়ারম্যান ইয়ার উদ্দিন মোল্লা (নাড়ুয়া, রাজবাড়ী), প্রয়াত ডা. হায়াত (পাংশা)। বেঁচে থাকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোল্লা নবুয়ত আলী (বরিশাট), মাস্টার কাজী ফয়জুর রহমান (তখলপুর), শাহাবুদ্দিন খাঁ (দাইরপোল), আবুল ফাত্তাহ (বেলনগর), আলী হোসেন মিয়া (খামারপাড়া), আবুল হোসেনসহ (বড়তলা) অন্যান্যরা।

আকবরবাহিনীর যুদ্ধ

একাত্তরে পাক-বাহিনীর সামনে দ্রুতই আকবরবাহিনী এক মহাআতঙ্ক হিসেবে পরিগণিত হয়। একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে পাক-হানাদারদের দুর্গ তছনচ করে ফেলে এই বাহিনীর সাহসী যোদ্ধারা। বিশেষ করে শ্রীপুর থানা দখল, শৈলকূপা থানা আক্রমণ, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির রামদিয়াতে পাকসহযোগী চাঁদ খাঁর বাড়ি আক্রমণ, ইছাখাদা ও মাগুরা আনসার ক্যাম্পে হামলা, আলফাপুরের যুদ্ধ এবং বিনোদপুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণে সবই অধিনায়ক আকবর হোসেনের সুদক্ষ দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অক্টোবরে বিনোদপুরের যুদ্ধে এই বাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা জহরুল আলম মুকুল গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ৫ জুন শ্রীপুরের নিকটবর্তী রাজবাড়ী মহকুমার বালিয়াকান্দি থানার রামদিয়াতে পাক-বাহিনীর অন্যতম সহযোগী চাঁদ খাঁর বাড়িতে এই অভিযান ছিল সর্বপ্রথম। শ্রীপুর থেকে এই বাহিনীর বড় একটি যোদ্ধা দল এই অভিযান চালাতে শ্রীপুর থেকে হেঁটে বালিয়াকান্দি থানার রামদিয়াতে আসে। অতঃপর আকবরবাহিনীর সাহসী যোদ্ধারা সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে বিহারী চাঁদ খাঁ ও তার সহযোগীদের খতম করতে সক্ষম হন। পরের দিন ৭ জুন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই বাহিনীর সফল অভিযানের খবরটি গুরুত্বসহকারে প্রচার হয় এবং এতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা দারুণভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। এরপর একের পর এই বাহিনী শৈলকূপা থানা, শ্রীপুর থানা আক্রমণ করে দখলে নেন। আলফাপুরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাক-হানাদারদের পরাস্ত করেন। এছাড়াও ইছাখাদা রাজাকার ক্যাম্প, মাগুরা আনসার ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে পাক-সেনাদের পরাস্ত করেন। তবে অক্টোবরে মাগুরার মহম্মদপুর থানার বিনোদপুরে রাজাকার ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে গিয়ে এই বাহিনীর চৌকস এবং সাহসী মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল আলম মুকুল শহীদ হন। প্রতিটি যুদ্ধেই আকবরবাহিনী নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করত। বিশেষ করে পাকিস্তানের আধুনিক সমরাস্ত্রের সামনে লোকায়ত সব কৌশল প্রয়োগ করে আকবরবাহিনীর যোদ্ধারা একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনত। এই কারণেই এ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল একেবারেই কম। এই বাহিনী পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আলফাপুর, মাশালিয়া, খামারপাড়া, কাজলী, গোয়ালপাড়া রণাঙ্গনে মুখোমুখি যুদ্ধ করে পাক-হানাদারদের জানমালের বহু ক্ষয়ক্ষতি করে। অনেক পাক-সেনার লাশ নদী দিয়ে ভেসে গেছে। অনেকে আহত হয়েছে। বহু পাক অফিসারও এসব যুদ্ধে মারা যায়। একজনের লাশ তারা লাঙ্গলবন্ধে কবরস্থ করে যায়। শ্রীপুরের নাকোলের যুদ্ধে একজন পাক কর্নেলসহ কয়েকজন পাক-সেনা নিহত হয়। আকবরবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে আধুনিক পাক সাঁজোয়া গাড়ি পাংচার হয়ে যায় যা তারা ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। সাঁজোয়া গাড়িটি সাহসী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা ঠেলে প্রায় দুই মাইল দূরে নিয়ে যায়। বিনোদপুর, বরিশাট, মাগুরার ইছাখাদা, মাগুরার আনসার ক্যাম্প, রাজাকার ও পাক-সেনাদের আস্তানাতেও এই বাহিনী তীব্র আঘাত হানে। মহম্মদপুর ও বিনোদপুর যুদ্ধে অনেক রাজাকার ও দোসররা আহত হয়। শ্রীপুর থানা তিনবার আক্রমণ করে থানার সব অস্ত্র পুলিশদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। টুপিপাড়াতে এ বাহিনী স্থায়ীভাবে ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। শ্রীপুর থানার ওসি (অফিসার ইনচার্জ) হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা আকরাম হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়, যা একটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। খামারপাড়াতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে পাঁচশ যুবককে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শ্রীপুর থানার চারপাশে যাতে আরো মুক্তিযোদ্ধার দল গড়ে ওঠে সে লক্ষ্যে শৈলকূপা থানা থেকে উদ্ধারকৃত ৫৭টি রাইফেলের বড় একটি অংশ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কামরুজ্জামান, বিশারত, উজির, মন্টু, আলম ও আকামতদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় যাতে তারাও বাহিনী গড়ে তুলতে পারে। এভাবে ঝিনাইদহের পানামির আফজাল ইপিআরকে অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ দিয়ে একটি দল গঠন করে দেয়া হয়। মাগুরার হাজীপুরেও একটি বড় মুক্তিযোদ্ধা দল খাড়া করে দেয়া হয়। একই ভাবে ফরিদপুর-রাজবাড়ীর জামালপুর, বহরপুর, ডুমাইন এলাকায় হাবিলদার জালালকে (বেঙ্গল রেজিমেন্ট) অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করে দেয়া হয়। বালিয়াকান্দি থানার সিরাজুল ইসলাম ইপিআরকে (সিগন্যাল) দিয়ে ওই অঞ্চলেও একটি দল দাঁড় করিয়ে দেন অধিনায়ক আকবর হোসেন। পাংশাতে মতিন সাহেবকেও একটি দলের অনুমতি দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এছাড়া ইপিআর মান্নানকে দিয়েও মাগুরার পূর্বাঞ্চলে আরো একটি দল করার স্বীকৃতি দেন। মাগুরা মহকুমার ও আশপাশে ভারতে থেকে আসা কমান্ডার ও তাদের দলের মুক্তি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) এবং সেনারা এবং মুজিববাহিনীর মুক্তিসেনারা মিলে একটা বড় দল হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে শ্রীপুর থানার চারপাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল, যেন পাক-সেনারা যে কোনো দিক থেকে আক্রমণ করলে এ বাহিনী যেন তাদের দ্রুত সহযোগিতা করতে পরে।

আকবরবাহিনীর স্বীকৃতি

মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনা এবং কৌশলের প্রতি আস্থা দেখিয়ে সেক্টর আটের সেনানায়ক মেজর আবুল মঞ্জুর সনদের মাধ্যমে এই বাহিনীকে 'শ্রীপুরবাহিনী' এবং মিয়া আকবর হোসেনকে বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। শ্রীপুরের আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন ক্যাপ্টেন এটিএম আবদুল ওয়াহাব এই স্বীকৃতি দানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। মুজিবনগর সরকার এই বাহিনীকে যুদ্ধকালেই স্বীকৃতি দেয়। শুধু এই নয়, সেক্টর আটের সেক্টর কমান্ডার মো. আবুল মঞ্জুর এবং এবং মেজর এমএন হুদা ব্যক্তিগতভাবে চিঠি প্রেরণ করে আকবর হাসেনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একাত্তরের ২৭ অক্টোবর মেজর এমএন হুদা চিঠিতে লেখেন– মি. আকবর, আপনাকে লিখতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত। কারণ আপনার দুঃসাহসিক বীরত্বে যে আঞ্চলিক বাহিনী সংগঠিত করেছেন এবং আমাদের উভয়ের চিরশত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন। আপনার গোলাবারুদের চাহিদা যথাসময়ে জেনেছি। মেজর মঞ্জুর এবং আমি উভয়েই অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে নিয়েছি। ইনশাল্লাহ্ অতি সত্বর আপনি আপনার চাহিদা ছাড়াও অধিক পাইবেন। গোপনীয়তার কারণে উপস্থিত এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। ইতোমধ্যে কিছু জরুরি প্রয়োজন মিটানোর মতো গোলাবারুদ ও মাইন পাঠাচ্ছি, যাতে বিশেষ করে আমাদের ছেলেরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। আমাদের ছেলেরা যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে তা গত রাতে আমি জেনেছি। যেসব ছেলেরা এমন দুঃসাহসিক যুদ্ধ করেছে তাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাই। মেহেরবানি করে এর আগে যতগুলো প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদনও পাঠাবেন। আরো খেয়াল রাখবেন, সব ঘটনার বিবরণ আমারে কাছে পাঠানো হয় তা যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। বিশেষ করে শত্রু সৈন্য হতাহতের ব্যাপারে। গণবাহিনীতে যে ছেলেদের পাঠানো হয়েছে তারা খুবই তরুণ ও অপরিপক্ব। তাদের কোনো বড় ধরনের তৎপরতায় সম্পৃক্ত করা উচিত নয়, আমাদের মুক্তিফৌজ হিসেবে সুনামের ওপর খুবই মন্দ প্রভাব ফেলবে। এ ব্যাপারে আপনি

বিশেষভাবে বোঝাবেন, তারা যেন অপারেশনের মিলিটারিদের ওপর নজর রাখে। বেসামরিক ব্যাপার তাদের সম্পৃক্ত করবেন না। আমাদের ছেলেরা যে মিলিটারি অপারেশনের ব্যাপারে ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হয়। আক্রমণ করে এবং বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুদের নাজেহাল করে। তারা যেন সম্মুখযুদ্ধে না যায়। তারা এ ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এছাড়া তারা উপযুক্ত অস্ত্রেও সজ্জিত নয়। তাদের কেবল শত্রুর ওপর রেইড করার কাজে নিয়োগ করবেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি গণবাহিনীর ছেলেরা এবং সৈনিকরা দেশের অভ্যন্তরে তাদের কর্মতৎপরতা হাসিল করতে পারে তাহলে অতিসত্বর দেশ স্বাধীন হবে। মি. আকবর, সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরা আমাদের ঘৃণ্য শত্রুদের নিপাত করতে ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হব ইনশাল্লাহ। আপনার বিশ্বস্ত, এমএন হুদা মেজর।

যুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদসহ আরো অনেকে আকবর হোসেনের সাথে যোগাযোগ করে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

এদিকে আকবরবাহিনী এতটাই সংগঠিত ছিল যে পাক-বাহিনীর সব রণকৌশলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ৭ ডিসেম্বর তারা গোটা মাগুরা মহকুমাকে স্বাধীন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। ওইদিন আকবরবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এসে মাগুরা নিজেদের দখলে নেয়।

একটি ইতিহাসের মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধে আকবর হোসেন এবং তার বাহিনীর অবদান অসামান্য। যুদ্ধের নয় মাস আকবর হোসেন যেভাবে যোগ্য, দক্ষ, সাহসী নেতৃত্ব দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল আঞ্চলিক বাহিনী পরিচালনা করেন তা দৃশ্যত বিরল এবং অভাবনীয়। যুদ্ধকালে তিনি একবারের জন্যও ভারতে যাননি। নিজ দেশের মাটিতে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু পাক-বাহিনী আর তার সহযোগীদের প্রতিরোধ বা পরাস্ত নয়, দস্যু ডাকাতদেরও এই বাহিনী শক্ত হাতে দমন করে এলাকার সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষা করেন। বিশেষ করে হিন্দুদের জানমাল রক্ষায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। শুধু এই নয়– যুদ্ধের পরে হিন্দুরা বাড়ি-ঘরে ফেরত এসে নিজেদের জমিতে চাষবাস করার সাহস না পেলে তিনি সম্প্রীতি বাড়ানোর লক্ষ্যে হিন্দু মুসলমানদের যৌথভাবে জমিতে চাষ করার উদ্যোগ নেন। এই প্রক্রিয়ায় একদিন শত শত হিন্দু মুসলামান একসঙ্গে জমিতে চাষ করার জন্য লাঙল নিয়ে বিলে নামেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে একাত্তরে আকবরবাহিনীর জন্ম না হলে মাগুরা মহকুমাতে পাক-বাহিনী কর্তৃক আরো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতো। আকবরবাহিনীর বীরযোদ্ধাদের কারণেই শ্রীপুর থানা ছিল মুক্তাঞ্চল এবং জনগণের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। শ্রীপুরে রাজাকারদের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল না। উল্টো শ্রীপুরে প্রবেশ করতেই রাজাকার ভয় পেত। এ কারণেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ভয়ার্ত মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছিল শ্রীপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে, পাড়া-মহল্লাতে।

২ মে না ফেরার দেশে চলে গেলেন আকবরবাহিনীর জন্মদাতা, মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি, স্পর্ধিত ইতিহাস অধিনায়ক আকবর হোসেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। বেশ কিছুদিন ধরেই অধিনায়ক আকবর হোসেন অসুস্থ ছিলেন। সর্বশেষ অসুস্থ অবস্থায় যশোরের কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি হন। ওখানেই ২ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওইদিনই তাকে আনা হয় নিজবাড়ী খামারপাড়াতে। পরের দিন সকাল ১১টায় হাজার হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং অনুসারীদের উপস্থিতিতে তার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয় খামারপাড়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় খামারপাড়ার পারিবারিক গোরস্থানে। তার জানাজায় সেদিন মানুষের ঢল নেমেছিল। শতসহস্র মুক্তিযোদ্ধা আর সাধারণ মানুষ ছুটে এসেছিলেন ঝিনেদা, যশোর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর অঞ্চল থেকে। প্রিয় অধিনায়ককে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন অগুনতি সাধারণ নারী-পুরুষ। জানাজায় সমবেত হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিই সেদিন প্রমাণ করে অধিনায়ক আকবর হোসেন কতটা সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় ছিলেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এই বাহিনীর স্মৃতি ধরে রাখতে এখন পর্যন্ত মাগুরাতে কোনো স্মৃতিস্মারক গড়ে তোলা হয়নি।

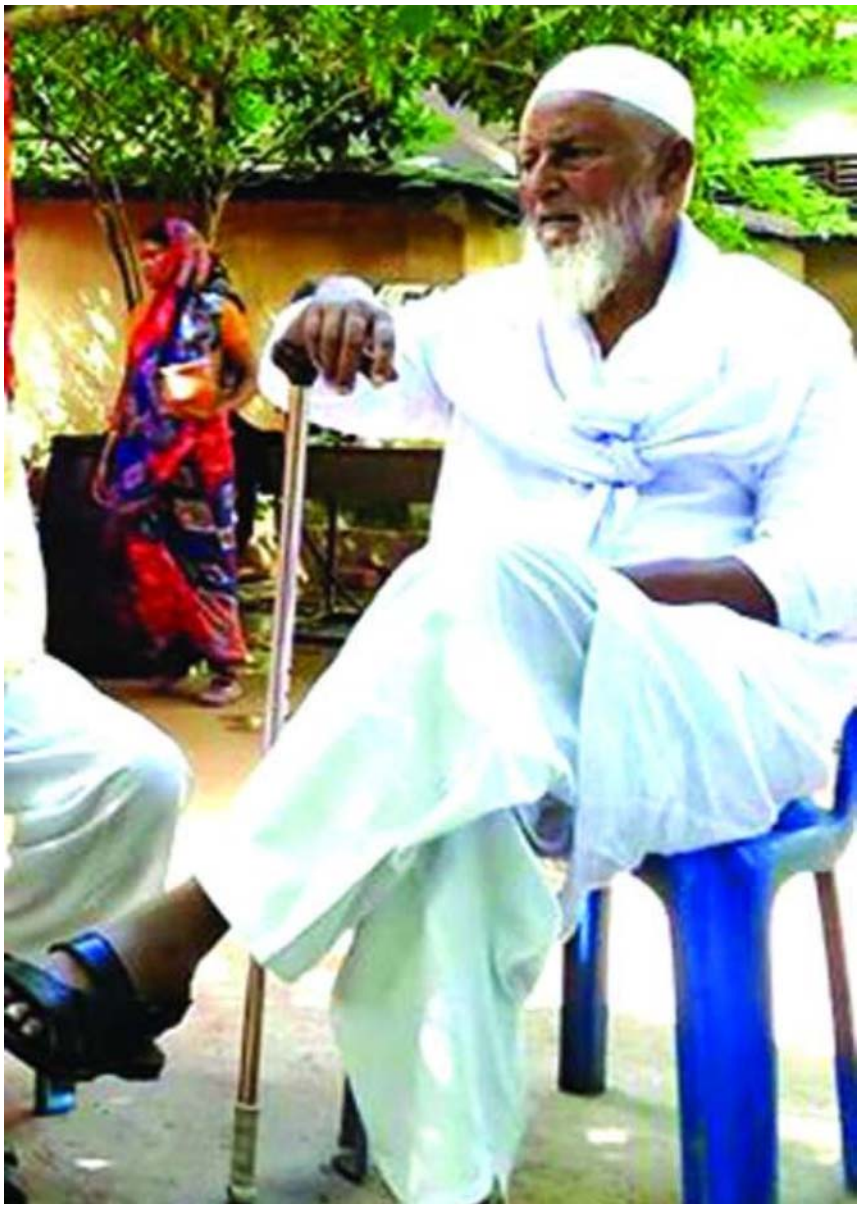

গল্প

নদী, নীল ও বুনোহাঁসের গল্প

মিল্টন বিশ্বাস

পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পর দু'সপ্তাহ চলে গেল। সালাম ভাইকে ঈদ সংখ্যার জন্য একটা গল্প দেব বলেছি। কিন্তু গল্পটা আর লেখা হয়ে ওঠে না। ভেবেছি গল্পের বিষয় হবে প্রেম। সেদিন শুক্রবার যমুনা ফিউচার পার্কের ব্লকবাস্টারের সামনে বসে চা পান করতে করতে এনামুল, টুটুল, রাসেল, আবিরের কাছে বিষয়টি জানালাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রেম নিয়ে গল্প লিখলে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে ফেসবুক, হোয়াটসআপ, স্কাইপের প্রসঙ্গ আনতে হবে। আর সেক্স ছাড়া বর্তমান প্রেম কোনো প্রেম না। পরদিন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রেম নিয়ে গল্প লিখলে বিষয়ের নতুনত্ব কীভাবে সম্ভব? অধিকাংশই জানাল– এখন একজন একাধিক প্রেম করে। ফেসবুক চ্যাটে তিন-চারজন, হোয়াটসআপে বেশি কিছু, আর যৌনতায় ধরাবাধা নিয়ম নেই। আরো কিছু আলোচনার পর একটি প্রেমের গল্প লেখা কঠিন থেকে কঠিনতর মনে হলো। তবু লিখতে হবে একটি গল্প। অনেক ভেবে-চিন্তে নিচের গল্পটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠালাম।

২.
নীল আজকে আভিভূত হয়ে পড়েছে। তার বুকের ভেতর প্লাবন। নদীর একটানা ঢেউ। ঢাকার এয়ারপোর্ট রোড ধরে হাঁটছে সে। এই রোডটা নীলের খুব প্রিয়। বিশেষ করে বনানী ক্রসিং থেকে এয়ারপোর্টে ঢোকার মুখ পর্যন্ত রাস্তায় চলতে চলতে অনেকদিন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। সে ভালোবেসেছে প্রশস্ত রাস্তাটাকে; দু'ধারে সাজানো গাছের ছিমছাম অন্ধকার তার ভালো লাগে। আজকে নদীর সাথে ওর দেখা হয়নি। তবু এলোমেলো হাঁটছে সে। আদুরে বৃষ্টি ঝরছে ওর কপালে, মাথায়, চশমার কালো ফ্রেম ভেদ করছে জলের কণা। নদী ওকে কথা দেয়নি। দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই; এসব সে ভালো করেই জানে। তবু সে এসেছে। এয়ারপোর্ট প্রান্তের কুড়িল ফ্লাইওভারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছিল একটা রিকশা নিয়ে ওর বিল্ডিংটা দেখে আসবে সে। যদিও কোনো ঠিকানা নেই তার কাছে। তবু বিশ্বাস তার বড় বড় দালান, লেক আর সাজানো বাড়ির কোনো একটাতে নদী আছে। একবার ভাবে আবার সিদ্ধান্ত বদলায়। কারণ নদী তাকে সতর্ক করেছে তার পরিবার জানলে ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর। যোগাযোগ রাখাও সম্ভব হবে না তাদের। নীল অবশ্য নাছরবান্দা। তার ভেতর এখন নতুন উদ্দীপনা। অনুপ্রেরণার বুনোহাঁস তাকে খাবলে খাচ্ছে। তার আশপাশে পরিচিত মুখ থাকতে পারে এটা সে ভুলে গেছে। কেউ তাতে চিনতে পারে এটাও খেয়াল নেই। নদীর সাথে পরিচয় তার অল্প কিছুদিনের। মে মাস গিয়ে জুন পড়েছে। ৮ মে ছিল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ নদীর খুব প্রিয়। বলা যায় বেঁচে থাকার পাথেয়। সেদিন বাংলা একাডেমিতে নীল শুনছিল- 'পুব সাগরের পার হতে কোন এলো পরবাসী'। নীলের ভবঘুরে জীবনে নদী সেই পরবাসী হয়ে এল। রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের এক মুহূর্তে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নদীর এক কলেজশিক্ষক। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা আর আড্ডা। হঠাৎ বাংলা একাডেমির বটগাছটাকে মনে হলো বিস্তৃত জলরাশি। ঝাঁকে ঝাঁকে বুনোহাঁসের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। নদী নীলের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করে সেদিন চলে গিয়েছিল। কিন্তু নীলের ভেতর তখন উথাল-পাথাল ঢেউ। নদীর রুচি, ওর চিন্তা, একান্ত করে বিশ্বকবিকে ভালোবাসা টের পেয়ে যায় নীল। সেদিন নদী চলে যাবার পর একাডেমির দেবদারু গাছগুলো জুড়ে চুটিয়ে বৃষ্টি নামে। অস্থির হাওয়া নীলকে আকাশে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তার মনে হয় এরকম একজনের জন্য মনটা তৃষিত হয়েছিল এতদিন? কি স্নিগ্ধ নদীর মনটা, কি আশ্চর্য ওর উপলব্ধি। নীল অবশ্য জানে ওই ছোট্ট শিশু দুটি নীলের এক ধরনের পরিচয় বহন করে। জীবনের বাস্তবতা বড় কঠিন। কঠিন ঢাকা শহরের জীবনও। তবু নিজেকে সামলাতে পারে না সে। বাসায় ফিরে আসে। ফোন দেয়– নদী ঠিকমতো পৌঁছাল কিনা জানতে চায়। সেই শুরু। তারপর প্রতিদিন চলতে থাকে ফেসবুক, হোয়াটসআপ চ্যাট। নদী নীলের কাছে আসে। নীল নদীর দিকে এগিয়ে চলে।
বইমেলা থেকে ফেরার পথে মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এর আগে গণজাগরণ মঞ্চের ব্লগারকে হত্যা করা হয়েছে। এজন্য মর্মান্তিক ওই ঘটনার পর নদী নীলকে সাবধান করে দেয়। প্রতিবাদ সভায় সামনে দাঁড়িয়ে নীল; মিছিলে নীল; টিভির পর্দায় নীল- দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয় নদী। ফোনে বারবার তাগাদা দেয়। এসব থেকে দূর থাক। কি করছ? কিন্তু নীল চায় নদীকে এসব প্রতিবাদ সভায় টেনে আনতে। ও অনুরোধ করে। শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় রোববার। রানী আর দীপকে সঙ্গে নিয়ে নদী চলে আসে। ওরা বসে থাকে নীরবে। অসংখ্য মানুষের আনাগোনা আর তারুণ্যের উদ্দীপনা দেখে নদী নীলের আরো কাছে আসে। ধীরে ধীরে বলে কোথায় নিয়ে চলেছ সংসারের মানুষটিকে? আমি কি সামলাতে পারব এতো সব? তোমার পথ চলা কেমন যেন উল্টাপাল্টা। লেখকরা এমন হয় কেন? তোমার বউ-বাচ্চা আছে কিন্তু তুমি একা থাকতে পছন্দ কর। এসব কেন বল তো নীল? সমাবেশের একপাশে বসে যখন ওদের দু'জনের জীবনের হিসাব-নিকাশ চলে তখন প্রকৃতির নানা রঙের মেলাকে সার্থক মনে হয়। সেজে উঠেছে বসন্ত প্রকৃতির রূপ। কিন্তু সেই সুন্দরের মধ্যে কীটের বিচরণ ওদের মস্তিষ্কে তীব্র দহন সৃষ্টি করে। তারপর সভা শেষে ভেতরে ক্ষোভ আর ভয় নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে এসে বসে। ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় এই নিরাপদ চত্বরে লেখকদের ওপর হামলা আসে কি করে? নিজের ক্ষুদ্র লেখক সত্তা নিয়ে নীল বিচলিত হয়। ভয় এসে দেহের স্নায়ুকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। নদী তাকে উৎসাহ দেয়- 'লিখতে হবে নীল। জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেখার জন্য কাউকে না কাউকে থাকতে হবে। এর আগে আমি তোমার সংসার, পরিবারের কথা চিন্তা করে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম আমরা একা নই। অনেকে আছে আমাদের প্রতিবাদের সঙ্গে। ভয় কি নীল?' নদীর কথাগুলো শুনে শিরার ভেতর রক্ত লাফ দিয়ে ওঠে। এভাবে আদর করে ওকে কেউ এসব কথা বলেনি। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। নদীর ছেলেমেয়ে দুটোকেও নীলের আপন মনে হয়। টিএসসি থেকে ট্যাক্সিক্যাবে উঠতে হয় ওদের। বাসার কাছাকাছি পৌঁছে দিতে গিয়ে নীল আজ নদীর হাত স্পর্শ করে। নদী নিজেকে ওর ভেতরে ছেড়ে দেয়। শক্ত করে চেপে ধরে নীলের হাত। ক্যাম্পাসে হাঁটার সময় হাত ধরতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু নীলের সে কথা বলার সাহস ছিল না। তাছাড়া সেখানে অনেকেই তার পরিচিত।

৩.
গত দশ বছর ধরে নীল পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে আসছে। ইতোমধ্যে তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের বাংলার শিক্ষক সে। তরুণ লিখিয়েদের মধ্যে প্রগতিশীল চেতনা বিস্তারে তার উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেও প্রশংসিত হয়েছে। বিনয়ী, সৎ ও সপ্রতিভ নীল বিবাহিত কিন্তু সাংসারিক জীবন থেকে এখন দূরে। লেখার কাজ আর বাজার করার ঝামেলা একসঙ্গে চালাতে না পেরে বৌ-বাচ্চা থেকে আলাদা হয়ে একটি ছয়তলার বাসার ছাদে আশ্রয় নিয়েছে সে। বাসাটি ছাদে হওয়ায় আকাশের পূর্ণ ছবির মগ্নতা তার ভেতর কবিত্ব জাগিয়ে তোলে। একাকী থাকে বলে নিজেকে এবং নিজের লেখা নিয়ে সারাক্ষণ ভাবতে পারে। নদীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে খুব ইচ্ছে হয়েছে ওকে নিয়ে বাসার ছাদে বসে গল্প করতে। জ্যোৎস্না রাত জেগে কাটিয়ে দিতে। নদীর সুন্দর একটা মন আছে। যা সংসারের ভেতরে থেকেও সতেজ; আলো ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। স্বামী ও দুই সন্তানের সংসারের দায় মেনে নিয়েও নিজের মতো করে সময় বের করে ও– কবিতা লেখে, গান শোনে। এজন্য নদীকে ভালো লাগে নীলের। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর হাত ধরে। সেদিন হাত ধরার পর নীল আর আগের মতো থাকতে পারে না। একটু দেখার জন্য ছুটে গেছে নদীর বাসার কাছে। নদী কখনো বের হয়েছে; আবার কখনো ওকে সময় দিতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে না জানিয়ে অন্যের সঙ্গে আড্ডা দেয়া সবসময় সম্ভব হয় না তার। তবু নদী পত্রিকায় লিখতে চায়। নিজের মেধা দিয়ে অন্যের কাছে পরিচিত হতে চায়। নীল ওকে অনেক উৎসাহ দেয়। এজন্য ওর ভালো লাগে তাকে। কিন্তু নীল ভাবাবেগে চলে। খুব বেশি মাখামাখি চায় সে। অন্যদিকে নদীকে আবেগ ও সংসার সামলে চলতে হয়। অনেক সময় নীল জোর করে। নদীকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরতে চায়। কিন্তু নদী সেই সময় দিতে পারে না।
বর্ষার শুরু থেকেই বৃষ্টির বিরাম নেই। একটানা চলছে শ্রাবণের ধারা। হোয়াটসআপে একটার পর একটা ছবি পাঠাচ্ছিল নদী। শুক্রবারের পর থেকে নীল নদীকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে আগুনের তাতে দগ্ধ হচ্ছে। ওইদিন সিএনজি অটোরিকশায় বাসার দিকে যাওয়ার সময় নদী ওর কাঁধে মাথা রেখেছে। আদর করে আকড়ে ধরেছে নীলের হাত। নীল এতটাই বিমোহিত হয়ে পড়ে যে গন্তব্যে পৌঁছালেও সে স্বাভাবিক হতে পারেনি। কারণ আগের দিন ভেবেছিল কোনোদিন একসঙ্গে রাস্তায় বের হলে নদীকে কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে বলবে। নির্ভরতা খুঁজে ফেরা নীলের ভেতর নদীর চেতনা ঢুকে যায়। সেদিন দুজনের ভাবনার অলিখিত মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। পরেরদিন নীল অপেক্ষা করে তার বাসায় নদী আসবে। ওরা দুজনে ছাদে ঘুরে-ফিরে বৃষ্টিতে ভিজবে। আর নিজেদের ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে শরীরের উষ্ণতা নিয়ে সারাদিন কাটাবে। কিন্তু নীলের সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। নদী ঠিকই এসেছিল; বসেছিল

নীলের বুকে মাথা রেখে। সেটা ছিল সান্ত্বনা খুঁজে ফেরা নিরাশ্রয় এক নারীর কাতরতা। ওর মা মারা গেছে আগের রাতে। স্বামী ওকে যেতে দেয়নি মৃত মায়ের মুখ দেখতে। রাগে, দুঃখে বাচ্চাদের ফেলে বাসা ছাড়ে নদী। রাস্তায় বের হয়ে প্রথমেই তার নীলের কথা মনে পড়ে। বিয়েটা করার পর নদীর বাবা-মা আফসোস করেছিল কার সাথে বিয়ে হলো একমাত্র আদরের কন্যার? কিন্তু নদী মেনে নিয়েছিল। সমঝোতা, সহনশীলতায় নিজেকে তৈরি করেছিল। হঠাৎ কি হলো অনিলের? সন্দেহ বাতিকে পরিণত হয়েছে সে। রাতদিন খবরদারি। কোথায় যাচ্ছে নদী? কি করছে? কার সাথে ফেসবুকে কথা বলছে ইত্যাদি। নদী সবকিছু ধৈর্য ধরে সহ্য করলেও মার মৃত্যু নিয়ে ব্যঙ্গ করাকে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সারাদিন নীলের বুকে শুয়ে থেকেও সন্ধ্যায় শিশু দুটির কথা ভেবে তাকে নিজের বাসায় ফিরতে হয়। তাছাড়া নীলের সঙ্গে থাকার সময় ও টের পেয়েছে কারা যেন কিছুক্ষণ পরপর নীলকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। নীল ইদানীং বড় বেশি রাজনৈতিক লেখা লিখছে। তার প্রতিক্রিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠী ওর পিছু নিয়েছে। নীলের বাসা থেকে বের হয়ে নদীর খুব নিজেকে অসহায় মনে হয়। নীলের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। নদীর নিজের আশ্রয়টা ভাঙতে শুরু করেছে। নিজের একটা চাকরি এখনো হয়নি। বাঁচানোর মতো ক্ষমতা থাকলে নীলকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেত। মরা মাকে গালি দেয়া সত্ত্বেও আবার অনিলের সঙ্গে আপস করতে হবে। হায়রে নদীর জীবন?

৪.

বারবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে কয়েকদিন ধরে নীলের মনের ভেতর অজানা শঙ্কা ঢুকেছে। ব্লগার অভিজিতের হত্যাকারী ধরা পড়েছে, হায়দার, রাজীবসহ আরো কয়েকজনের হন্তারকরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওকে গোয়েন্দা সংস্থা থেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সাবধানে চলা উচিত ওর। কিন্তু সবসময় বন্ধুদের নিয়ে চলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাছাড়া নদীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা ও কাউকে জানায়নি। ওর পক্ষে একা থাকা আনন্দের, একা চলা সুখের। সেদিন নদী ওকে এয়ারপোর্ট রোডের বেঙ্গল অফিসের পাশে আসতে বলে। জায়গাটি সুন্দর। ব্যস্ত সড়কের ধারে একটি কাবাব হাউস। সবুজ গাছগুলো দলবদ্ধ; ওরা জেগে থাকে; মানুষের গোপন কথা শোনে আর ব্যাকুল হয় প্রকাশের ইচ্ছা নিয়ে। নদী আজ নীল শাড়ি পড়েছে। জারুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল নীল। দূর থেকে নদীকে দেখে এগিয়ে যায়। হাত ধরে। পৃথিবীর সব সংকটকে, সব আশঙ্কাকে তার তুচ্ছ মনে হয়। নদী তার পরম নির্ভরতার আঙিনা হয়ে ওঠে। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। এদিকে মানুষের আনাগোনা কম। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় নদী। চোখ রাখে নীলের চোখে। আপ্লুত নীল জড়িয়ে ধরে নদীকে। নদী সামলে নিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দেয়। নীল ছিটকে যায়। বিমর্ষতা তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। নদী বলে, 'আবার সেই দেহ। দেহটা স্বামীর তোমাকে কতবার বলতে হবে।' দুজনে চুপ। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এভাবে চলত। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া গাছে একজোড়া ঘুঘু এসে বসে। ডাক শুনে ওদের চোখ চলে যায় সেদিকে। পাখি দুটি একে অপরকে ঠোঁট দিয়ে আদর করে, মুখ লুকায় একে অপরের পালকের গভীরে। নদী একবার ওদের দিকে, একবার নীলের দিকে তাকায়। কাছে এসে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে রাখে ঠোঁট। নিবিড় করে আলিঙ্গনে জড়ায় নীলকে। অভিভূত নীল নিজের ভেতর প্রবল শক্তি পায়। নির্ভার মনে হয় নিজেকে। আশ্চর্য এক জলের রেখা তরঙ্গের দোলা দিয়ে সারা শরীরকে মথিত করে তোলে। নদী ওর হাতের ভেতর হাত চেপে ফিস-ফিস করে 'ভালোবাসি, ভালোবাসি।' এ কথা কতবার শুনেছে সে। কতবার নদী তাকে ফেসবুক, হোয়াটসআপে পাঠিয়েছে। কিন্তু আজকের এই বিকাল অন্যরকম মনে হয়। রাস্তার গাড়িগুলো সাদা মেঘ হয়ে ওঠে। যেন ওদের চারদিকে আকাশের বিস্তার। শ্রাবণের মেঘ সেখানে মুখর হয়ে ভাসছে। নীলের জীবনে নদীর সঙ্গে সম্পর্কের এ এক আশ্চর্য বন্ধন। দেহের চেয়ে যেখানে মনের বাঁধন তীব্র। কখনো তার মনে হয়নি দেহহীন প্রেম সম্ভব। কিন্তু নদীর স্নিগ্ধ চোখের চাহনি ওকে বারবার ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ওর চোখের শাসন আর সোহাগ নীলকে দূরে যেতে দেয়নি।

এয়ারপোর্ট রোডে সন্ধ্যা নেমে আসে হইচই করে। প্রচণ্ড শব্দ করে দূরের মহাদেশে ছুটে চলে বিচিত্র বর্ণের বিভিন্ন ওজনের বিমান। নদীকে বাসার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে নীল ফিরছে একা। যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে তার রিকশা এগিয়ে চলেছে রামপুরার দিকে দিকে। আবার বৃষ্টি নামল। ঝিরঝির বৃষ্টি মেখে ইছামতির স্রোত ভালোবেসে নদীর সঙ্গে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর দিনটির কথা মনে পড়ে। সেদিন নদী কিশোরী হয়ে উঠেছিল। বারবার কাছে এসে ধাক্কা দিয়ে বলছিল– 'দেখ ওইদিকটা আমরা সাঁতার কেটে পার হতাম। দেখ ওই যে মাছরাঙা আমার প্রিয় পাখি। খুব ভালোবাসি। নীলকে যেমন। এই সুবল দা একটু আস্তে চালাও। আমরা অনেকক্ষণ ঘুরব।' কি যে তার কথার ফুলঝুরি। একের পর একটা গল্প। তার বাড়ির গল্প। তার বাল্যকালের গল্প। আম পারতে গিয়ে টিনের চাল থেকে তার পড়ে যাওয়া। গল্প আর শেষ হয় না। সেদিনও স্নিগ্ধ সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। বিদায় দিয়ে ঢাকায় রওনা দিতে হয় নীলকে। বাসে বসে নদীর চোখ-মুখের অভিব্যক্তিগুলো ঘুরে-ফিরে মনে আসছিল। আজও তেমনি। নীলের কোনোদিকে মনোযোগ নেই। রিকশা কোন দিকে যাচ্ছে তারও। দেহমনের সবটাই জুড়ে আছে নদী। হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে। তিনজন ওর হুট নামানো রিকশাটা ঘিরে ধরে। একজন বলে 'এই সে। মার শালাকে। ব্লগারের দোস্ত এইটা। মার।' ধারাল অস্ত্রের তীব্র আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে নীল। ওর জ্ঞান থাকার মুহূর্তে মনে পড়ে কিছুদিন আগে রামপুরা থেকে জঙ্গিগোষ্ঠীর একদল সদস্যকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে তারা এখনো নির্মূল হয়নি, এভাবে সক্রিয়। অবাক বিস্ময়ে সে দেখে মৃত্যুদূতরা ছুটে চলে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা চিৎকার করছে। মানুষ দেখছে কিছু করছে না। আকাশের ওপর দিয়ে তখন বুনোহাঁসের একটি দল এই শ্রাবণের মুখর দিনে প্রশান্ত পাখনায় ভেসে চলেছে। এয়ারপোর্ট ছেড়ে পশ্চিম দিকে উঠে একটি বিমান রুট অনুসরণ করে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। বিমানটির শব্দে নীলের আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়।

নদী বাসায় ফিরে শাড়ি খুলতে খুলতে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। আজ বিকালটা সুন্দর কেটেছে তার। কিন্তু নীলকে সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলেও পারত। পরে অবশ্য নীলকে আদর করেছে। নদীর মনে হয় নীল আদরের কাঙাল। একটু স্নেহ পেলে গলে যায়। হাত ধরে কাছে টেনে নিলে পৃথিবীর সব দুঃখ ভুলে যায়। ও একটা অদ্ভুত ছেলে। কি যে আবোলতাবোল কাজ করে না। বড় অস্থির মনে হয় ওকে। আজকে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ হঠাৎ আনমনা হচ্ছিল। কি যে ও বলে। আমার একদম ভালো লাগে না। কি সব হত্যা, জঙ্গিনিধন, জটিল সব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। সাহস দেখিয়ে কি লাভ ওর? প্রথম দিকে ভরসা দিয়েছি। এখন যেন আমার নিজেরই সাহস হারিয়ে গেছে। কেবল ভাবি আমার ছোট ঘরের সংসার ভালো। স্বামী-বাচ্চা নিয়ে বেঁচে থাকা ভালো। ওসব জটিল জীবন আমার নয়। কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি না কেন? ও বারবার টেনে নিয়ে যায়। ভেঙে ফেলে সব। এতো আপন মনে হয় কেন ওকে। রান্না করে রেস্ট নিচ্ছিল নদী। ১০টা বাজতে এলো। স্বামী ফিরেছে। খবর শোনার জন্য টিভি অন করে সে। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাচ্চাদের নিয়ে। কি যে চঞ্চল হয়েছে ছেলেটা; শুধু মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি। 'এই, এদিকে আয়। বস চুপ করে। খবর শুনতে দে।' ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রানী ও দীপ। হঠাৎ অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়ে নদী। একি নীলকে খুন করা হয়েছে। হাসপাতালে লোকে-লোকারণ্য। পেট ফেরে চাকু চলে গেছে। বের করতে পারেনি ডাক্তাররা। তার আগেই ওর মৃত্যু ঘটেছে। নদী কি করবে বুঝতে পারে না। ভাবে এক্ষুণি বের হবে সে? সব এলোমেলো হয়ে যায়। ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অনিল এগিয়ে আসে– কি হয়েছে? তোমার শরীর খারাপ কেন? নদী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ও উঠে দাঁড়াতে চায় পারে না, বসতে চায় কিন্তু তার আগে কোথা থেকে দমকা হাওয়া দিয়ে ঘরের ভেতর একরাশ নীল আলো ঢুকে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দ করে ওদের বিল্ডিংটার ওপর দিয়ে বোয়িং ৭৭৭ পূর্বদিকে চলে যায়। নদীর মনে হয় নীল ওই বিমানটার সাথে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। ওকে আর ধরা যাবে না। বিছানায় ছিটকে পড়ে সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে মর্মভেদী আর্তনাদ করে ওঠে নদী। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অনিল আর রানী আর দীপ।

ঈদ ফ্যাশন

ঈদ ফ্যাশনে রঙের বাহার

ঈদের আনন্দকে পরিপূর্ণ করতে চাই মনের মতো নতুন পোশাক। তাই ঈদের পোশাক নিয়ে চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, শার্ট, শিশুদের পোশাক ইত্যাদি সব পোশাকেই এবার থাকবে নানা রঙের বাহার। ঈদ ফ্যাশনের কথা জানাচ্ছেন– **তাইসির আদীব নূর**

বছরের মাঝামাঝি এ সময়ে পড়ছে প্রচণ্ড গরম, মাঝেমধ্যেই হচ্ছে বৃষ্টি। এ গরম আর বৃষ্টির মধ্যেই চলে এসেছে আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ সামনে রেখে শুরু হয়ে গেছে নতুন জামা-কাপড় কেনার হিড়িক। আর পাঞ্জাবির পর ছেলেদের ঈদ মানেই শার্ট, টি-শার্ট। নানা ধরনের শার্ট, টি-শার্ট ও পলো শার্ট পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর সব শপিংমলেই। এবারের ঈদ আয়োজনে ফ্যাশন হাউসগুলো গুরুত্ব দিয়েছে আবহাওয়ার বিষয়টি। গরম ও বৃষ্টির দিকে খেয়াল রেখে হাল ফ্যাশনের নানা অনুষঙ্গের মিশ্রণে তারা সাজিয়েছে নিজেদের আয়োজন। যেখানে স্থান পেয়েছে উজ্জ্বল রঙের হালকা কাপড়। শার্টের ক্ষেত্রে কাপড়ে এসেছে নতুনতম সেলাই, কলারেও এসেছে আধুনিকতার নতুন ছোঁয়া। টি-শার্টের বুকে লেগেছে নতুন নতুন ধারণার চিত্র। যাতে আধুনিকতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে

দেশীয় সংস্কৃতি। আছে পশ্চিমা আভিজাত্যের প্রতীকও।

মেঘ-বৃষ্টির এ সময়টাতে পোশাকও হওয়া চাই ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাই তো এবারের ঈদ ফ্যাশনে থাকছে বর্ষার পরশ। তরুণীদের এবারের ঈদে পছন্দের তালিকায় রয়েছে লং কামিজ। জর্জেট কিংবা চিকেনের ওপরে বাহারি নকশা। কিংবা কামিজের নিচের দিকটায় বাড়তি নশকাদার লেস। সঙ্গে থাকতে পারে অ্যামব্রয়ডারির কাজ। এমনটাই জানালেন ফ্যাশন ডিজাইনাররা। ফ্যাশন ডিজাইনাররা বলছেন, শর্ট কিংবা লং কামিজ দুটোরই চাহিদা রয়েছে এবারের ঈদে। সঙ্গে বাহারি কারুকাজ। সেই কাজটা হতে পারে পুঁতি-চুমকি কিংবা লেসেরও। থাকবে অ্যামব্রয়ডারির, ব্লক-বাটিকের নকশাও। সময়টা বর্ষাকাল হওয়ায়, তরুণদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে শর্ট পাঞ্জাবি, ফতুয়া, হাফহাতা শার্ট কিংবা টি-শার্ট। সঙ্গে জিনস-গ্যাভার্ডিনের প্যান্ট। পায়ে চটি জুতো। ব্যাস, মানিয়ে গেল। এবারের ঈদে ছেলেদের চাপা প্যান্টের রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে বাহারি নামখচিত টি-শার্ট। থাকছে ক্যাজুয়াল শার্টে চেকের ব্যবহার।

একই পোশাকে একাধিক রং তো বটেই থাকবে তার চেয়েও বেশি রঙের সমাবেশ। এবারের ঈদে প্রাধান্য পাবে লাল, কমলা, লেমন ইয়েলো, গাঢ় নীল, হালকা নীল, ফিরোজা, আকাশি, সবুজের বিভিন্ন শেড, গোলাপি, ম্যাজেন্টা, সাদা, কালো, হলুদ ইত্যাদি রংগুলো। এবারের ঈদে পোশাক তৈরি কাপড় হিসেবে সুতি ও তাঁতের কাপড়ই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। এন্ডি, বলাকা সিল্ক, মসলিনে করা হচ্ছে জমকালো কাজ। লিলেনের পোশাকও থাকছে এবারের ঈদ ফ্যাশনে। জর্জেটের মধ্যে সফট জর্জেটের ব্যবহার হচ্ছে বেশি। পোশাকের প্রিন্টে এবার থাকছে স্ক্রিন প্রিন্ট, টাইডাই ও বাটিকের প্রাধান্য। এমব্রয়ডারি, নকশি কাজ, অ্যাপ্লিক রয়েছে এবারের ঈদের প্রধান থিমে। ডিজাইনে থাকছে ফিউশনও। তবে আর দেরি কেন! দেশীয় পোশাকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক আপনার ঈদের আনন্দ।

বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রুচিশীলতাকে এক রেখায় এনে যখন একটি পোশাক তৈরি করা হয়, তখন স্বভাবত কারণেই সেই পোশাকের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন উৎসবের সময় দেখা যায় ফ্যাশন হাউসগুলোতে সব শ্রেণির নারী এবং পুরুষের ভিড়। অথচ বিগত দুই দশক আগেও এমনটা লক্ষ্য করা যায়নি। তাই বলা চলে, ফ্যাশন হাউসগুলো আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলেই ক্রেতারা সানন্দে দেশীয় ফেব্রিকে তৈরি পোশাক সংগ্রহ করছেন। সেসব পোশাক ও শাড়ি তৈরিতে দেশীয় প্রযুক্তি, নিজস্ব উদ্ভাবনী বোধ এবং ফ্যাশন চিন্তা সমন্বিত হয়ে যে পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছে তারই বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হলো আজকের ফ্যাশন জগৎ। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচ্য তা

লাল বেনারশী
লাল বেনারশী
১০-বি, এভিনিউ-১/৩৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৩০৮৮৮২৮১

হলো দেশীয় শাড়ি ও ড্রেসের সহনীয় দাম। ফ্যাশন ট্রেডে বর্তমানে দেশীয় ফেব্রিক্সের শার্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস এবং টি-শার্টের যেমন রয়েছে অসম্ভব চাহিদা, তেমনি টাঙ্গাইলের তাঁত, জামদানি শাড়িরও রয়েছে বিপুল কদর। ঋতুভিত্তিক উৎসব ছাড়াও যেমন রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী তেমনি জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আজ পোশাকের বুকে স্বমহিমায় জায়গা করে নিয়েছেন। একইভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বন্ধু দিবস, মা দিবস, বাবা দিবসও ড্রেসের অবয়বে নান্দনিক আদলে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায় অনন্য মহিমায়। ফ্যাশন হাউসগুলোতে ফ্যাশনপ্রেমীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ঈদ উৎসবে।

কামিজ বলুন আর কুর্তি বলুন, জমকালো একটি শাড়ি না হলে ঈদের আনন্দ অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় যেন! বাঙালি নারীর সাজসজ্জার পূর্ণতা মেলে তো শাড়িতেই। শাড়ির প্রতি ফ্যাশনপ্রেমী তরুণীদের আগ্রহ দিনদিন বাড়ছে বই কমছে না। উৎসব কিংবা নিছকই আড্ডা, সব ক্ষেত্রেই শাড়ির আবেদন চিরকালীন। ঈদের মতো বড় উৎসব হলে তো কথাই নেই। যত যা-ই কেনা হোক না কেন, হালফ্যাশনের একখানা শাড়িও কিন্তু থাকা চাই! নারীর জন্য যেমন শাড়ি, ফ্যাশনে বাঙালি পুরুষের স্টাইলে নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলতে তেমন রয়েছে পাঞ্জাবি। ঈদ তো বটেই, পাঞ্জাবি ছাড়া ছোটখাটো কোনো উৎসবের কথাও ভাবতে নারাজ ফ্যাশনপ্রেমী পুরুষরা। ঈদ এলেই তাই সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায় শাড়ি আর পাঞ্জাবির দোকানগুলোতে। কয়েকটি ফেব্রিকস মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এবারের ঈদের শাড়ি। ডিজাইনও এক মাধ্যমে আটকে থাকেনি। চুমকি, কারচুপির সঙ্গে মেশিন এমব্রয়ডারি যোগ হয়েছে। আরো বিশেষত্ব হলো সব ধরনের শাড়ির আঁচলে টারসেলের ব্যবহার। সুতির শাড়ি তো থাকছেই সঙ্গে রয়েছে জর্জেট, মসলিন, হাফ-সিল্ক, অ্যান্ডি আর পিওর সিল্ক। জামদানি আর কাতানও সেজেছে নতুন রূপে। শাড়ির উপকরণ, রং, ডিজাইন ও নকশায় যোগ হয়েছে বৈচিত্র্য। নতুনত্ব আনতে কয়েকটি ফেবিব্রকস একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন একই শাড়িতে জর্জেট, সিল্ক আর অ্যান্ডির ব্যবহার হয়েছে। শাড়ির আঁচল আর কুঁচিতে আলাদা ফেব্রিকস আর নকশা চোখে পড়ে। জামদানি শাড়ির বিভিন্ন মোটিভ উঠে এসেছে সিল্ক বা কাতানের পাড় আর জমিনে। ডিজাইনের মাধ্যম হিসেবে এসেছে স্ক্রিন প্রিন্ট, অ্যাপ্লিক, মেশিন এমব্রয়ডারি, টাইডাই ও হাতের কাজ। এখানেও শাড়িতে একসঙ্গে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। স্ক্রিন প্রিন্টের সঙ্গে মেশিন এমব্রয়ডারি আর অ্যাপ্লিকের একসঙ্গে ব্যবহার নতুনত্ব এনেছে। শাড়িতে উৎসবের জমকালো লুক এনেছে জরি, পুঁতি ও চুমকি এবং কারচুপির ব্যবহার। নতুনত্ব এসেছে জামদানিতেও। হাফসিল্কে জামদানিতে বসানো হয়েছে জমকালো পাথর বসানো পাড়। চিকন সুতার বুননে নানা নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জামদানি শাড়ির জমিনে। আঁচলের বাহারি টারসেলের ব্যবহার শাড়িতে নতুন লুক যোগ করেছে। গরমের কারণে এবার হালকা রংগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবির কাটিং ও নকশাতেও এসেছে নতুনত্ব। গলা, কলার, হাতা বা বুকের সামনে আছে নানা ধরনের নকশা। বেশিরভাগ পাঞ্জাবিতেই মেশিন এমব্রয়ডারির সঙ্গে আছে হাতের কারচুপির কাজ। অ্যাপ্লিকের ওপর কারচুপির কাজও নজরে পড়েছে। বেশ কয়েক বছর আগেও পাঞ্জাবির হাতায় একটু ভারি কাজ ছিল। কিন্তু গেল কয়েক বছর সে ধারা দেখা যায়নি। এবারের ঈদ ফ্যাশনে পুরনো সেই ধারা আবার ফিরে এসেছে। রঙের মধ্যে সবুজ, মেরুন, পার্পল, জলপাই, আকাশি নীল, অব হোয়াইট, পেস্ট ইত্যাদি বেশি দেখা গেছে। আর একরঙা স্লিম ফিট পাঞ্জাবিগুলোতে কলার, বুকপকেট ও হাতার কাছায় জুড়ে দেয়া হয়েছে ভিন্ন রঙের কাপড়। কোনো কোনো পাঞ্জাবিতে দেখা গেল কাঁধের ওপর ছোট্ট ফিতা বোতাম দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। আর কাঁধের নিচে বুকের সামান্য ওপরে দুটি ভিন্ন রঙের কাপড় জুড়ে দিয়ে নকশায় আনা হয়েছে বৈচিত্র্য। লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবিতে কলার ও বুকের দিকে থাকছে পুঁতি বা সুতার কাজ। আছে শেরওয়ানি, পাঠানি ও জমিদারি কাটের জমকালো পাঞ্জাবি। এসব পাঞ্জাবিতে গলার সঙ্গে মিলিয়ে হাতার নিচে কাজ করা। কোনোটির বোতাম লাগানো হয়েছে কাঁধের পাশ কেটে। প্রায় সব ধরনের পাঞ্জাবির সঙ্গেই কটির সরব উপস্থিতি আছে। এর মধ্য থেকেই বেছে নিন আপনার পছন্দের পাঞ্জাবিটি। শিশুদের কথা মাথায় রেখে ফ্যাশন ও বুটিক হাউসগুলোর আয়োজনের কমতি নেই। দুই থেকে ১২ বছর বয়সী মেয়েশিশুদের জন্য থাকছে সালোয়ার-কামিজ, ফ্রক, স্কার্ট-টপস, ফতুয়া, থ্রিপিস ও টি-শার্ট। আর ছেলেদের জন্য ফতুয়া, প্যান্ট, শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, শর্ট পাঞ্জাবি ইত্যাদি। মেয়েশিশুদের

মোহাম্মাদী

সিল্ক হাউজ

সেকশন # ১০, ব্লক # এ, লাইন # ৭, হাউজ # ১, মিরপুর, ঢাকা।

ফোন :৯০০৭৮৬৫, মোবাইল :০১৭১১১৬৭৬৬৮

পোশাকে নকশা ও কাটিংয়ে রয়েছে বিশেষ ভিন্নতা। অ্যালাইন কাট, হাতাকাটা পোশাক ছাড়াও ঘটি হাতার ফ্রক ও টপসের সংগ্রহ বেড়েছে। কামিজের লেইসের ওপর বিশেষ ডিজাইন থাকছে। অধিকাংশ পোশাকই হাতা ছাড়া বা ছোট হাতার। কাপড়ের ক্যানভাসে থাকছে নানা রঙের আঁকিবুঁকি। যে পুতুলটি নিয়ে খেলে, সেই 'বার্বি ডলে'র গোলাপি ঝালটের পোশাকটি যেমন আছে, তেমনি আছে জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র টম অ্যান্ড জেরি, ব্যাটম্যান, সুপারম্যানের মতো পোশাকে সাজার সুযোগ।

এবার ছেলেদের প্যান্টে রং লেগেছে। সময় যেমন পাল্টাচ্ছে, তেমনি পাল্টাচ্ছে ফ্যাশন ট্রেন্ড। এ কথা সত্যি যে, তরুণদের স্বপ্ন রঙিন হয়, সবসময় রঙিন স্বপ্ন দেখতেই ভালোবাসে তারা। তো মনের ভেতরেই যদি হরহামেশা হরেক রং খেলা করে, তবে পোশাকে নয় কেন? হ্যাঁ, তারুণ্যের পোশাকেও বাহারি রঙের ছোঁয়া লেগেছে। শার্ট বা টি-শার্টের কথা বলছি না, বলছি ছেলেদের রঙিন প্যান্টের কথা। এরই মধ্যে চালু হয়ে গেছে রঙিন প্যান্টের নতুন এই ট্রেন্ড। 'হট লুক' নামে এই ট্রেন্ডের জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলছে দিনে দিনে। রঙিন প্যান্ট এখন ফ্যাশন সচেতন তরুণদের প্রথম পছন্দ। সাথে থাকতে হবে পোলো টি-শার্ট কিংবা কাজ্যুয়াল শার্ট। এতে অন্যদের থেকে একটু আলাদা, স্মার্ট লুক পাওয়া যায়। বাজার ঘুরে আরো দেখা যায়, ছেলেদের ফ্যাশনে পরিবর্তনের ছোঁয়া জাগিয়ে তুলতে, নতুন কাট ও ডিজাইনের ভিত্তিতে সেজে উঠেছে রাজধানীর বিভিন্ন শপিংমল, মার্কেট ও বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস।

মেয়েদের ঈদ ফ্যাশনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ সালোয়ার-কামিজ। রঙিন আর জমকালো সালোয়ার-কামিজে ঈদ রাঙাতে মনে মনে তৈরি সবাই। ঈদের পোশাকে সাধারণত উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার প্রাধান্য পায়। এবার লাল থেকে শুরু করে নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি, কমলা, মেজেন্ডাসহ থাকছে সবকটা রঙেই। এক রঙা পোশাকের ফ্যাশন বদলে একই পোশাকে কয়েক রঙের ব্যবহার এখন বেশি জনপ্রিয়। তাই কখনো এক রঙা কামিজের বডিতে একই রঙের কয়েকটি শেডের কাজ করা হয়েছে। আবার কখনো দেয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত রঙের কাজ। কামিজের কাজের সঙ্গে রং মিলিয়ে করা হয়েছে সালোয়ার এবং ওড়নার ডিজাইন। যারা গাঢ় রঙে স্বাচ্ছন্দ্য নন, ফ্যাশন ডিজাইনাররা ভেবেছেন তাদের কথাও। কাপড় হিসেবে সবসময়ের মতো এবারো রয়েছে সুতির জয়জয়কার। পাশাপাশি এন্ডি কটন, তাঁত, হাফ সিল্ক, সিল্ক, মসলিনটাও চলছে বেশ। তবে রেগুলার ডিজাইনের পোশাকেই সবার আগ্রহ বেশি দেখা যাচ্ছে। বর্ষার মৌসুম হলেও গরমের ভাব থাকার কারণে আরামদায়ক কুর্তা ও ফতুয়ার ওপরও ঝুঁকছে তরুণীরা। জিন্সের সঙ্গে মানানসই এই পোশাকগুলো হতে পারে ঈদের বিকালের জন্য আদর্শ। এ সময় কোনোরকম সঙ্কেত ছাড়াই হানা দিতে পারে হঠাৎ বৃষ্টি। পোশাক ডিজাইনে তাই ঈদকে সামনে রেখে ভাবা হয়েছে ঋতু পরিবর্তনের কথাও। এ জন্যই এবারের ঈদের সালোয়ার-কামিজ তৈরি করা হয়েছে তাঁত, সিল্ক, হাফ সিল্ক, অরগ্যান্ডি, মসলিন ও শিপন কাপড়ে। ঈদের আরামদায়ক পোশাক হিসেবে সুতি কাপড়ও এখন অনেক জনপ্রিয়। এসব কামিজে থাকছে ব্লক, কারচুপি, অ্যাপ্লিক, ভরাট অ্যাপ্লিক ও এমব্রয়ডারির কাজ। ঈদ উপলক্ষে সালোয়ার-কামিজে জমকালো ভাব আনতে কামিজের কাজগুলো ভারি রাখা হচ্ছে। গলায় উজ্জ্বল রঙের সুতার কাজ থাকছে। কোনো কামিজের সম্পূর্ণ বডিতে আবার কোনোটির নিচের অংশে সুতার মোটা ও ভরাট ডিজাইন, পট্টি ও লেইস ব্যবহার করা হয়েছে। বাদ যাচ্ছে না পেছনের অংশও। কামিজের হাতায়ও থাকছে ভারি কাজ। সালোয়ার হচ্ছে কামিজের সঙ্গে কনট্রাস্ট করে। ওড়নায় থাকছে হালকা কাজ। লম্বা কাটিংয়ের কামিজের জায়গা এবার দখল করে নিয়েছে মাঝারি কাটিংয়ের কামিজগুলো। এবারের ঈদের বিশেষ সালোয়ার-কামিজগুলো লম্বায় হচ্ছে হাঁটুর মাঝ বরাবর। একছাঁটের এই কামিজগুলো হচ্ছে লুজ ফিটিংয়ের। জনপ্রিয়তা বেশি থ্রি-কোয়ার্টার হাতার। তবে ডিজাইন ও পছন্দভেদে থাকছে ফুল ও স্লিভলেস হাতাও। সালোয়ারের ক্ষেত্রে ক্রেতারা চাপা আকৃতির ও চুড়িদার সালোয়ার বেছে নিচ্ছেন বেশি। ফ্যাশনের পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে প্রতিটি ফ্যাশন হাউসই কামিজের কাটিং প্যাটার্নে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। আর এই পরিবর্তনের ব্যাপকতা চোখে পড়ার মতো। কামিজের কাটিং, কলার, লে-আউট, ছাপা, ব্লক, বুটিক, বাটিক, লেস ও চুমকির ব্যবহার প্রায় সবকিছুতে ইদানীং ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এখনকার তরুণীরা ট্র্যাডিশনাল পোশাকের পাশাপাশি এই নতুন ধারার ফ্যাশনের সঙ্গে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন। সাধ আর সাধ্যের সমন্বয়েই তৈরি হচ্ছে এই পোশাকগুলো। আপনার ঈদকে জমকালো ফ্যাশনের রঙে রাঙাতে দাম থাকছে হাতের নাগালেই। দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোয় ঈদের বিশেষ এই সালোয়ার-কামিজগুলোর দাম শুরু হচ্ছে দুই হাজার টাকা থেকে। তবে একটু বেশি ডিজাইন আর ভারি কাজ থাকছে যেসব এক্সক্লুসিভ সালোয়ার-কামিজে তার দাম রাখা হয়েছে চার থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে। ফ্যাশন হাউসগুলোর বাইরে অন্য শপিংমলগুলোতেও এর কাছাকাছি মূল্যেই পাবেন এবারের ঈদের জন্য আকর্ষণীয় জমকালো সালোয়ার-কামিজ। ঈদ উপলক্ষে রাজধানীর ছোট-বড় সব শপিংমলেই রয়েছে নানা ডিজাইন ও রঙের সালোয়ার-কামিজের সমাহার।

দিয়া শাড়ী

DIA SAREE'S

An Exclusive Sharee House

সেক্টর- ১০, ব্লক-এ, সড়ক নং-৮, বাড়ী নং- ১৪, মিরপুর বেনারশী পল্লী গেট # ৩,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ (মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামের পাশে)

ফোন: ৮০৬১৬৯২, মোবা: ০১৫৫২৪৮০১৫৬, ০১৮২২৮২৮৯৭৫

www.facebook/diasaree's, E-mail: diasaree1975@yahoo.com

রূপচর্চা

ঈদের সাজগোজ

ঈদ মানেই আনন্দ, আর আনন্দে ও প্রকাশভঙ্গিতে থাকে উৎসবের আমেজ। ছোট বড় সবার কাছে ঈদ একটু বাড়তি আনন্দ, একটু বাড়তি প্রস্তুতি। ঈদের সাজ হওয়া চাই স্বাভাবিক, যা আপনার ঈদের আনন্দ ও স্নিগ্ধতাকে ফুটিয়ে তুলবে। ঈদের সাজগোজ নিয়ে লিখেছেন **শাজিয়া তাইয়্যেবা**

ত্বকের যত্ন : রোদ, বৃষ্টি, গাড়ি জ্যাম সবকিছু উপেক্ষা করে ঈদের মার্কেটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে ত্বকের যত্ন নেয়া খুব একটা হয়ে ওঠেনি। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ঈদ। অপেক্ষার পালা শেষ হওয়ার সময়। আর এ ঈদ আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে খুশির বারতা নিয়ে আসে। আর তাই এখন থেকে বাড়তি যত্ন না নিলে নতুন জামা-কাপড় পরে আর বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করলেও ঈদটাই মাটি হয়ে যাবে। আর যারা বিভিন্ন কাজে সারা মাস ব্যস্ত ছিলেন তাদেরও এখন থেকেই যত্ন নিতে হবে। সবার আগে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। যেহেতু খুব গরম এবং সঙ্গে ঘাম হচ্ছে বেশি। এ ছাড়া আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেশি, তাই এখন থেকেই ত্বকের যত্ন নিতে হবে।

প্রাকৃতিক ফেসওয়াশ : ১ চা চামচ মেথি গুঁড়া, ১ চা চামচ মুগ ডালের গুঁড়া, ১ চা চামচ শুকনো কমলা লেবুর খোসা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মুখে ফেসওয়াশের মতো করে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

টোনিং : ১ কাপ তুলসী পাতা, ১ কাপ নিমপাতা,

তাওছিফ বেনারশী ফ্যাশন

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়।

সেকশন-১০, ব্লক-এ, লেন-২, বাড়ী-১২/এ, গেট নং-১, মিরপুর বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা ঃ ০১৯৩০০১৯৬৬২

তাওছিফ বেনারশী ফ্যাশন -২

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়।

সেকশন-১০, ব্লক-এ, লেন-৮, বাড়ী-১০, গেট নং-৩, মিরপুর বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা ঃ ০১৯৬৪৮৮১৩৭৩

জেরিন সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়। এছাড়াও পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, সাটিং, থ্রি-পিছ এর থান কাপড় পাওয়া যায়।

সেকশন-১০, ব্লক-এ, লেন-৬, বাড়ী-২, মিরপুর বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা ঃ ০১৭২০৮৩৬২৮৪

তাওছিফ ফ্যাশন

এই প্রথম মিরপুর বেনারশী পল্লবীতে তাওছিফ ফ্যাশন নিয়ে এলো একটি নতুন সংযোজন, ইষ্টিজ ও আন ইষ্টিজ কামিজ সুট লওন ওড়না ব্লাউজ ও পেটিকোট এর একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান।

সেকশন-১০, ব্লক-এ, লেন-৬, বাড়ী-৩, সেকশন ৩, মিরপুর গেট-২ বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা ঃ ০১৯৫৪৪৭৪১৩৪
০১৬৭৯৪১৮৫০৩৫

১ কাপ পুদিনা পাতা সমপরিমাণে পানি মিশিয়ে জ্বাল করে নিতে হবে। এরপর ঠাণ্ডা করে বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। এটি টোনার হিসেবে ব্যবহার করলে খুব উপকার পাবেন।

একবার এ টোনার তৈরি করার পর ৭ দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্যাক লাগাতে হবে।

শুষ্ক ত্বক : শুষ্ক ত্বকের জন্য ১ চা চামচ তিল বাটা, ১ চা চামচ কাঠ বাদাম বাটা, ১ চা চামচ ডিমের কুসুম ও ১ চা চামচ চালের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে মুখে ২০ মিনিট রাখার পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

তৈলাক্ত ত্বক : ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি, ১ টেবিল চামচ শসার রস, ১ চা চামচ অ্যালোভেরার জেল ও ৩ ফোঁটা লেবুর রস ভালো করে মিশিয়ে ২০ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলতে হবে।

স্বাভাবিক ত্বক : ১ চা চামচ পাকা পেঁপে, ১ চা চামচ আপেলের রস, ১ চা চামচ ক্যান্ডলিন পাউডার ও ১ চা চামচ ডিমের সাদা অংশ ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগাতে হবে। ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এ প্যাকটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

মিশ্র ত্বক : ১ চা চামচ তুলসী পাতা বাটা, ১ চা চামচ পুদিনা পাতা বাটা, ১ চা চামচ কেলামাইন পাউডার সামান্য পরিমাণে কর্পূর ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে।

গলা, ঘাড় ও পিঠ : মসুরের ডাল পেস্ট, ১টা গাজর পেস্ট, ১ চা চামচ মাখন, ১ টেবিল চামচ পাতি লেবুর রস লাগিয়ে ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাত আমাদের যেমন প্রয়োজনীয় অঙ্গ তেমনি কোমল হাতও মসৃণ আঙুল সৌন্দর্যে যোগ করে নতুন মাত্রা। এ ঈদে অন্য সময়ের চেয়ে তেল-

মশলা, চর্বির ব্যবহার বেশি হয়। হাতই ব্যবহৃত হয় বেশি। তেল-চর্বির দাগ প্রায় সময়ই হাতে লাগে। তাই বারবার হাতে পানি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে হাত অনেক শুষ্ক হয়ে যায়।

ক্লিনজিং : কুসুম গরম পানিতে দুই টেবিল চামচ লেবুর রস, দুই টেবিল চামচ লিকুইড সোপ মিশিয়ে হাত ১০ মিনিট পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। এরপর নেল ব্রাশ দিয়ে নখ পরিষ্কার করে নিন।

প্যাক : অর্ধেক আনারসের রসের সঙ্গে একটি লেবুর রস, দু'চামচ মধু ও পরিমাণমতো কেওলিন পাউডার মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি দুই হাতে ভালো করে লাগান। শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ময়েশ্চারাইজিং : ডিমের ৩টা কুসুম, ছোলার ডালের বেসন, ২ টেবিল চামচ নারিকেল তেল ভালোভাবে মিশ্রণ করে দুই হাতে ১৫ মিনিট লাগিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

নখের যত্ন : নখের সুন্দর গড়নের জন্য সপ্তাহে একবার ম্যানিকিউর অর্থাৎ হাতের নখের পরিচর্যা করা উচিত। নখের হলুদ দাগ তুলতে আলুর রসে লেবুর রস মিশিয়ে লাগান।

নখের ম্যাসাজ : সপ্তাহে দুইবার তিন চামচ অলিভঅয়েল একটু গরম করে নিয়ে হাতের ও পায়ের আঙুল, নখে মেখে নিন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন। ভিটামিন 'ই' নখের জন্য খুব উপকারী। ভিটামিন 'ই' সমৃদ্ধ ক্যাপসুল নখের ওপর ভেঙে ম্যাসাজ করুন, এতে ব্লাড সার্কুলেশন ভালো হয়। নখে দাগ থাকবে না। সঙ্গে নখ মজবুত হবে।

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক

ডন টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স

সুদক্ষ মাস্টার দ্বারা স্কুল ড্রেস তৈরী করা হয়।

স্যুট, সাফারী, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী তৈরীতে স্পেশালিস্ট

ডন টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স

১০-বি, এভিনিউ-১/৩৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন ঃ ৮০৫১২২৯ মোবাইল : ০১৭২১-৪৪৪১০২

পায়ের যত্ন

স্ক্রাবিং : গোসলের সময় নিয়মিত স্ক্রাবিং করুন পায়ের পাতা। দুধ-চালের গুঁড়া মিশিয়ে স্ক্রাবিং করুন।

প্যাক : অলিভঅয়েল, মুলতানি মাটি এবং বাঁধাকপির সেদ্ধ মিশ্রণ করে পায়ের পাতায় লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। সপ্তাহে দুই দিন এ প্যাক লাগাতে হবে।

অনেকে মনে করেন ঈদের আগে বাড়তি যত্ন নিয়ে লাভ নেই। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বরং ঈদের আগে ভালো সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে গিয়ে মেনিকিউর করে নিলে সব থেকে ভালো হয়। কারণ যত্ন নিলে যত কাজই করা হোক না কেন হাত মসৃণ থাকবে। এ ঈদে তেল-চর্বির ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। তাই রান্নাঘরে হাল্কা গরম পানির ব্যবস্থা রাখলে গরম পানিতে হাত ধুয়ে নিলে চর্বি সরে যাবে। এরপর ভালো হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নিলে হাত পরিষ্কার হয়ে যাবে। যতবার হাত ধোবেন ততবারই হাতে ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত। তাতে হাতের ত্বক রুক্ষ হবে না। আমি মনে করি ঈদের অন্তত দুই দিন আগে কোনো ভালো সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে গিয়ে মেনিকিউর করা উচিত। সেই সঙ্গে পায়ের জন্যই বাড়তি যত্ন হিসেবে পেডিকিউরও করা উচিত। না হলে পায়ের সৌন্দর্য কমে যাবে।

আর যদি সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় না পাওয়া যায় তাহলে ঘরে বসেই হাত, নখ ও পায়ের বাড়তি যত্ন নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

প্রথমে একটি ছোট গামলায় হাল্কা গরম পানিতে লবণ, শ্যাম্পু (ক্ষারবিহীন) দিন। এতে ১০ মিনিট হাত এবং পা ডুবিয়ে রাখুন। এই ঈদে নখ যারা বড় রাখেন তারা একটু খাটো করে কেটে নিলে ভালো হয়। নখ কাটতে চাইলে হাত-পা ভিজানোর আগেই কেটে নেবেন। পানিতে ভিজানোর আগেই নখ ছোট করে কেটে ফাইল করে নেবেন। এরপর হাত-পা ভিজানোর পর নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হবে। পায়ের গোড়ালির জন্য ঝামা ব্যবহার করতে হবে। এরপর লেবু দিয়ে হাত ও পায়ের নখ আলতো করে ঘষে নিন। হলদেটে ভাব থাকলে কমে যাবে।

চন্দন ও মুলতানি মাটি দিয়ে প্যাক বানিয়ে হাত-পায়ে লাগাতে পারেন। এতে ঔজ্জ্বল্য বাড়বে। ১০ মিনিট রেখে হাল্কা পানি দিয়ে মুছে ময়েশ্চারাইজার লাগালে উপকার পাবেন।

চুল : যেহেতু এখন গরম তাই মাথার স্ক্যাপ খুব সহজেই তৈলাক্ত হয়ে যায়। তাই এ সময় যদি শ্যাম্পুর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নেয়া যায় তাহলে তৈলাক্ত ভাব কমে যাবে। আর চুলের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্য সপ্তাহে ১ দিন নিচের প্যাকটি ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : আমলকী, মেথি সমান পরিমাণে ভিজিয়ে রেখে পেস্ট তৈরি করে পুরো চুলেও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখতে হবে। আর সেই সঙ্গে প্যাকটি লাগানোর পর রিঠা ভেজানো পানি দিয়ে শ্যাম্পু করতে হবে। আর রিঠাই হচ্ছে প্যাকটির জন্য উপকারী শ্যাম্পু।

BANGLADESH
Since-1982
সানমুন
টেইলার্স (প্রাঃ) লিঃ
www.sunmoontailors.com | Sunmoon Tailors-PVT.LTD

রসনা

মজাদার ঈদ রেসিপি

ঈদ আমাদের সবচাইতে বড় আনন্দের দিন। মুসলিম ধর্মের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ। ঈদের দিন বাড়িতে অতিথি আসবে, আর অতিথি অ্যাপায়নে চাই মজাদার সুস্বাদু রেসিপি। ঈদে মজাদার এ রেসিপিগুলো দিয়েছেন **তাসলিমা হক**

ব্রেড চিকেন রোল

উপকরণ : মুরগির মাংসের কিমা আধা কাপ, আদা রসুন বাটা আধা চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনে জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, কাবাব মসলা আধা চা চামচ, হলুদ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, পাউরুটি স্লাইস ১০-১২ পিস, ফেটানো ডিম ২টি, তেল ভাজার জন্য লবণ স্বাদমতো, ব্রেড ১ কাপ।

উপকরণ : ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে মাংসের কিমা লবণ আদা রসুন পেঁয়াজ ধনে জিরা,

কাবাব মসলা ভালোভাবে কষিয়ে পুর তৈরি করুন। পাউরুটি পানি বা দুধে ভিজিয়ে হাত দিয়ে চেপে পানি ঝরিয়ে রুটির ভেতর পুর ভরে গোল রোল বানিয়ে ফেটানো ডিমে চুবিয়ে ব্রেডক্রামে গড়িয়ে গরম ডুবো তেলে হাল্কা বাদামি করে ভেজে তেল ঝরিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কিমা সেমাই

উপকরণ : সেমাই ১০০ গ্রাম, মুরগির মাংসের কিমা ১ কাপ, আদা বাটা ২ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, তেল বা ঘি ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ।
প্রস্তুত প্রণালী : সেমাই সেদ্ধ করে নিন। যেন খুব বেশি নরম না হয়। মুরগির মাংসে সামান্য আদা বাটা, রসুন বাটা ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি, মাংসের কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে হালকা লাল করে ভেজে সেমাই দিয়ে নেড়ে নামিয়ে ফেলুন।

মজাদার তেহারি

উপকরণ : খাসি বা গরুর মাংস ২ কেজি, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ, রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, পোস্তদানা বাটা ১ টেবিল চামচ, পিয়াজ কুচি আধা কাপ, টক দই ১ কাপ,

তেজপাতা ৪টি, দারুচিনি ৬ টুকরা, এলাচি ৮টি, লবঙ্গ ৮টি, বেরেস্তা ১ কাপ, দুধ ১ কাপ, মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, ঘি আধা কাপ, সরিষার তেল আধা কাপ, কেওড়া ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি : চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। মাংসের সঙ্গে পরিমাণমতো আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, সরিষার তেল, পিয়াজ কুচি, মরিচ গুঁড়া, লবণ ও আধা কাপ টক দই দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রাখুন। অর্ধেক গরম মসলা ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে মাংস রান্না করে নিন। ঝোল কমে এলে কিছু বেরেস্তা ও গরম মসলার গুঁড়া দিয়ে নামান। অন্য পাত্রে ঘি গরম করে গরম মসলার ফোড়ন দিয়ে চাল, পোস্তদানা বাটা, আধা টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। এতে ৬ কাপ গরম পানি ও টক দই দিয়ে ১০ মিনিট অল্প জ্বালে রাখুন। এবার এই পোলাওয়ের মধ্যে রান্না করা মাংস, কাঁচা মরিচ ও কিছু বেরেস্তা দিয়ে ২০-২৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিকেন বিরিয়ানি

উপকরণ : বাসমতি চাল আধা কেজি, মুরগি ৮০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, পিয়াজ বাটা আধা কাপ, জিরা বাটা ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, টক দই আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো। কালো গোলমরিচ গুঁড়া এক চিমটি, শাহী জিরা আধা চা চামচ, জর্দার রং সামান্য, পুদিনা পাতা ২ টেবিল চামচ, এলাচ ৫টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ১টি, লবঙ্গ ৩টি, ঘি আধা কাপ, চিনি ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, বেরেস্তা আধা কাপ, কাজু, পেস্তা, কাঠবাদাম কুচি সব মিলিয়ে ১ টেবিল চামচ।
প্রস্তুত প্রণালি : চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। বড় হাঁড়িতে চালের সাড়ে তিন গুণ পানি দিয়ে পুদিনা পাতা, শাহী জিরা ও লবণ দিন। পানি ফুটলে চাল দিন। ভাত একটু শক্ত থাকতে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। ভাতের

সঙ্গে আধা কাপ ঘি মেখে ঠাণ্ডা করুন। মুরগি ৪ টুকরা করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে টক দই, আধা কাপ বেরেস্তা ও আধা কাপ ঘিসহ অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। হাঁড়িতে মাংস ঢেলে চুলায় দিন। মাখা মাখা করে রান্না করে নিন। এবার এতে ভাত দিয়ে নেড়ে দমে রাখুন ২০ মিনিট। কিছু ভাত তুলে জর্দার রং মেখে হাঁড়িতে দিয়ে দিন। বেরেস্তা, কাজু, পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শাহী রেজালা

উপকরণ: মাংস-৫ কেজি, দই-১ কেজি, ঘি-১ কেজি, পেঁয়াজ-দেড় কেজি, এলাচ-৪টি, দারুচিনি-১ ইঞ্চি-১০টি, লবঙ্গ-৮টি, আদা বাটা-১ টেবিল চামচ, রসুন-১ চা চামচ, চিনি-স্বাদমতো, পোস্তদানা-১ টেবিল চামচ, কিশমিশ-১ টেবিল

/FizzupBangladesh
ঈদ মোবারক
১০০% রিফ্রেশিং
দি ক্লিয়ার লেমন
Carbonated Beverage
FizzUp
Clear Lemon
250ml
GLOBE SOFT DRINKS LTD.
AST BEVERAGE LTD.
Member of Globe Pharma Group of Companies Ltd.

চামচ, দুধ-১ লিটার আলুবোখারা-৫টি, কাঁচা মরিচ-১২৫ গ্রাম।
প্রস্তুত প্রণালি : মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে দই মাখিয়ে রাখুন। পিয়াজ দুটুকরো করুন। ঘিয়ে পিয়াজ ও গরম মসলা দিয়ে ভেজে আদা ও রসুন দিয়ে ভেজে মাংস দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হলে ঘিয়ের ওপর পড়লে পোস্তদানা বাটা, কিশমিশ এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়ে দুধ আলু বোখারা দিয়ে দমে রাখুন।

চিকেন চিজ বল

উপকরণ: মুরগির মাংস বাটা ৪ কাপ, পিয়াজ

বাটা ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, চিজ ঝুরি ২ কাপ, ব্রেডক্রাম ১ কাপ, ডিম ২টি, কাঁচা মরিচ বাটা আধা চা চামচ, কাবাব মসলা আধা চা চামচ, দারুচিনি-এলাচ গুঁড়া সামান্য, স্বাদ লবণ সামান্য, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য, কাঠি ১০-১২টি।
উপকরণ : মুরগির বাটা মাংসের সঙ্গে লবণ ও সব মসলা ভালো করে মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে নিন। ডিম ফেটিয়ে রাখুন। ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করুন, একে একে বলগুলো ডিমে চুবিয়ে বেডক্রামে গড়িয়ে গরম ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে তেল ঝরিয়ে কাঠিতে ভরে টমেটো সস বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন মুখরোচক মজাদার চিকেন চিজ বল।

গরুর ভুনা চাপ

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, টক দই আধা কাপ, আদা, রসুন বাটা দেড় টেবিল চামচ, পিয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, পিয়াজ বাটা ২ চা

চামচ, ধনে-জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, দারুচিনি-এলাচ বাটা সামান্য, হলুদ মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, কাবাব মশলা ১ চা চামচ, গোলমরিচ বাটা আধা চা চামচ, জায়ফল জয়ত্রী বাটা আধা চা চামচ, গুঁড়া গরম মসলা ১ চা চামচ, তেল বা ঘি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।
প্রস্তুত প্রণালি : মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে মাংস টকদই পিয়াজ বাটা ও সব মসলা মেখে কাটা চামচ দিয়ে কেচে ২০-৩০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।
মেরিনেট করা মাংস চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে সেদ্ধ করে নিন। মাংস সেদ্ধ করে পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে রাখুন। এবার একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে গরম ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে তেল ঝরিয়ে ট্রেতে ঢেলে পিয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন গরুর ভুনা চাপ।

বিফ সালাদ

উপকরণ : গরুর মাংস এক কাপ, ক্যাপসিকাম দুইটি, পিয়াজ দুইটি, শসা একটা, টমেটো দুইটা, পুদিনাপাতা পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ কুচি এক টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ, ভিনেগার দুই টেবিল চামচ, লেবু, গাজর দুইটি, লেবুর রস দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, রসুন ছেঁচা এক চা চামচ, অলিভ অয়েল এক টেবিল চামচ, সয়া সস এক টেবিল চামচ, সরিষা গুঁড়া আধা চা চামচ।
প্রস্তুত প্রণালি : গরুর মাংস পাতলা করে কেটে। সয়া সস্, লেবুর রস, গোল মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট রেখে দিতে হবে, এবার মাংস প্যানে অল্প তেলে ভেজে নিতে হবে। টমেটো, ক্যাপসিকাম, শসা, পিয়াজ কিউব করে কেটে নিতে হবে। একটি বাটিতে অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে তার মধ্যে মাংস দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

কবিতার

হৃদয়ে মন্দির

সুজন হাজারী

উৎসবের মানে বুঝি ভেতরে ঈশ্বরের আরাধনা
পূজারীর ঘর কাবা মন্দিরে আমার হৃদয় ছোঁয়া
স্বদেশ মাতার বুকের গভীরের ওম, বানজলে প্রবাহিত
নরম পলির উর্বর অতীত।
সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কের অধ্যায়, চাঁদের বুকে কালিমালিপ্ত
কালোছাপ আঁকা আপসহীন দুর্জয় এ মাটিতে পড়েনি বিন্দুমাত্র চিহ্ন।

ফেসবুকে পোস্ট করা স্ট্যাটাসে দেখি ঘৃণিত ঘটনাটি
বসন খোলা নারীরা আহত না প্রকৃতার্থে মানবতা পরাহত
জনস্রোতে শামিল সবার ভেতরে অপঘাতের খিকথিকে
পোড়া ঘা বিক্ষত সংস্কৃতি।
হারামখোর যৌন সন্ত্রাসীর অশুভ পাঁয়তারা
সারাদেশে প্রতিরোধের গণজাগরণ, চপল দুহিতারা রাজপথে।
নদী ও নারীরা প্রগতির উজান জলধারা জলপদ্ম ভাটফুল
ঘাস পোশাকের সবুজ লতাপাতা।

ভোরের দোয়েল, বসন্তের মধুকণ্ঠী গায়িকা কোকিল
বাবার লাল চক্ষুর আড়ালে মায়ের শাসন লুকানো আমার আজন্ম
ভালোবাসা পয়লা বৈশাখ।

লালন সুফির অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, রবী ঠাকুরের
শেষের কবিতার নায়িকার পরনে লাল পাড় সবুজ শাড়ি
আমার পতাকার রঙে রাঙা, কপালে অরুণিমা সিঁদুরের টিপ
জীবনানন্দের চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

রুদ্রের গান আকাশের ঠিকানায় চিঠি, আবুল হাসানের রাজা যায়
রাজা আসে, টিএসসির মোড়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা সাজ সাজ রবে
বোশখের মেলা, শাহবাগে প্রজন্ম একাত্তরের প্রতিবাদ মিছিল
লাকী আকতারের কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্রের স্লোগান জয়বাংলা ...।

আত্মগত

মামুন মুস্তাফা

এই জ্যৈষ্ঠে তুমি বটপাতা ছুঁলে
ছুঁয়ে দেখলে না তৃষ্ণার কলস, রুঠাফাটা মন।
এখন গাছেদের মাথার ওপরে গ্রীষ্মের দুপুর,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ।
মেরুবাতাসে কাঁপছে চিবুক? হে মায়া!

আজ শুধু ক্রান্তবেলা, জলফোঁটা চুষে নেয়
শুষ্ক ভূমিশয্যা। জৈবিক মানুষ দাঁড়াতে পারে না।
এ রহস্যের কিনারা প্রাণগন্ধহীন গরমের রাতে।
তুলোর বালিশে শুঁঠ হয়ে পড়ে থাকে
দুটো মানবশরীর। ছাড়ো আলিঙ্গন।

কোনো কথা লিখবে না অটবীর পাতা
তবুও তো ফিরে আসে ফাউন্টেন পেন
এই মধুমাসে! লেখে সে প্রাকৃতকথা–

জ্যৈষ্ঠের সিঁড়ি ভাঙে ক্লান্ত জনপদ
বাতিল ডিঙার মতো পড়ে আছি
স্রোতহীন তোমার উজানে।

কবিতা

স্মৃতিকাতরতা

বদরুল হায়দার

রীতিমতো ইতিহাস টেনে ধরে স্মৃতিকাতরতা। রাত শেষে
দিন আসে, পাশে বসে সকাল। রঙিন উদাসে গোধূলির
কপালে ভালোবাসারা হয় রসের মাতাল।

বেলা শেষে রাগ গলে রোদ হয় সোনা। আনমনা
সূর্যের হারানো লালে সমমনা দুঃখেরা টানে রাতের বেদনা।

শতায়ুর স্বপ্নচোখে বায়ুবাহিত সুখের অভিমুখে টানে
সুখের অসুখ। বাড়ে রাতারাতি মতানৈক্যের অচিন
বিরুদ্ধ একক।

ভরা দুপুরের রোদের আদরে বোকা হচ্ছে সরলতা।
বৃথা অপরাধের শূন্যতা বাক অমরতা মেখে দেখে যায়
না পারার অপারগতা।

যাত্রী ছাউনিতে অপেক্ষারা ঘাটতি কাহিনী শেষে
অন্তর সাগরে ঝাপটা অতিথি সেজে দুর্যোগের
নামকরণের দোষে হয়েছে অস্বাভাবিক।

তীর্থচোখে অবাক বিস্ময়ে দিবসের চক্রযানে
সব অভিযোগে যোগ করে আন্তরিক।

সম্প্রীতির উৎস উজানে স্মৃতি ডুবে প্রীতিডোরে।

সুখী হও

ইদ্রিস সরকার

শুভ্রতার আশৈশব এ কলঙ্ক আমি, ভুল
জীবনের কেন্দ্রস্থল ছেড়ে আজ রাতে চলে যাব
পতনের কাছে
তোমরা সুন্দর হবে সুখী হবে সুখের সংসার হবে
সুখী হও সুখে থাকো

সভ্যতার কাছে পরাজিত এই অন্ধকার আমি, ভুল
দুর্দিনের ত্রিতল প্রাসাদ ছেড়ে আজ রাতে চলে যাব
পতনের নিচে
ফুল শুভ্র হবে ফুল শুভ্র থেকে আরো শুভ্রতর হবে
ফুল শুভ্র হও সুখী হও

সুখকর আশৈশব এই দুঃখ আমি, ভুল
জীবনের সবকটি গৃহ ছেড়ে আজ রাতে চলে যাব
পতনের পাশে
বৃক্ষ সবল হবে সাহসী হবে সভ্য নম্র হবে
বৃক্ষ সবল হও বিলাসী হও

আমরা এ তিনজন ভুল দর্প ছেড়ে আজ রাতে
শরীরের পতন মেখে বহুদূরে চলে যাব পতনের
তৃতীয় আঁধারে।

জীবনযাপন-৫৩

রজতকান্তি বর্মণ

বহুদিন পরে আজ
অনুভবে আশা কলকল
বাতাসে ঘুরে ঘুরে ওড়ে
ভালোবাসা অবিরল।

বহুদিন পরে আজ
আকাশে ঝলমলে রোদ্দুর
সুখের মৃদু আভা
চোখ মেলে দেখা যায় যদ্দুর।

বহুদিন পরে আজ
যাবতীয় সব অসম্ভবে
আশা রেখো তপতী আবারও
সব, সবকিছু হবে।

কবিতার

ফেলে আসা দিন

নাহার ফরিদ খান

জীবনের উত্তরণে দেখি নীলের নক্ষত্ররা
মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে
সময়ের আনন্দযজ্ঞেও আত্মাহুতি
ফেলে আসা দিনের
ফেলে আসা সোনালি প্রহরগুলো
জাগায় সুখের মাতম।
শ্রাবণের ধারার মতো গেছে যেদিন
স্মৃতিময়তার সুবাস ছড়ায়
জীবনের পরতে পরতে সুখ-দুঃখের
নোটগুলো টুকে রাখা
অন্তরের আস্তিনে।
দিন চলে যায়, ফেরেনা তো হায়
ধবল চাঁদ হয়ে থাকে স্মৃতির জানালায়।
পদচিহ্ন ফেলে ফেলে গেছি কালের বুকে
নাগরিক প্রচ্ছদে বিজ্ঞপ্তির মতো সুখে
নিয়নের আলোর মতো
উদ্ভাসিত ফেলে আসা দিনগুলো
পরিণত মননে খুঁজে ফিরি, ট্রেন চলে যায়–
ফিরে আসে আবার পুরনো শহর, নগর
স্টেশনে। বারে বারে আসে।
দিন চলে যায়, ফেরেনা তো হায়
ধবল চাঁদ হয়ে থাকে স্মৃতির জানালায়।

নাভির ভেতর

নীহার মোশারফ

দখিনা হাওয়ায় দাঁড়ালে
বৃষ্টিছাঁট লাগে হৃদয়ের পরতে
শ্রাবণধারায় এমনই তো হয়
আকাশ বিধবা থাকে না তখন
বুকের ভেতর আড়ালে-আবডালে
নীপফুল দোল খায়
পৌলমি পাশে নেই।
নিঝুম নাভির ভেতর মোচড়ানো সুখ
দু'চোখ আঁধার দেখে, বিনাশী প্রহর
চাঁদের জোছনায় নদীর শরীর ঝকমক করে
রসিকের প্রেমে মগ্ন থাকে সে
এ কেমন আস্কারায় সঁপে দেয় সব?
উঠোন থেকে উঠোন গড়ায়
চোখের পরে চোখ
বনের পাখি পোষ মানলেও
বশে আসে না তার বন্য জীবন

নামলো ধারা

পদ্মনাভ অধিকারী

আকাশে আকাশে সঘন মেঘের তাড়া
নির্জীব ভুবনে তার পড়েছে সাড়া-

মেঘে বাজায়ে ডম্বরু
নামলো ধারা
তৃপ্ত হলো মন মরু,
ছুটে চলেছে সেই মেঘের নতুন জল
বাজছে যেন অনূঢ়ার পায়ের মল!
যে জলেতেই ভরলো খেত-জলাধার
ভেঙে বাঁধ সব বাধার।

কদমে বর্ষায় যেন ছন্দের উৎসব
সরস মাটিতে অবুঝ সবুজের উদ্ভব,
বাজছে যখন সব মনে মধুর সুর
উৎসবের দিন কতোদূর আর কতোদূর-

কবিতার

রগ গার্ডেনে কিছুটা সময়

নির্মল চক্রবর্তী

দার্জিলিং থেকে রাতে টুম্পা বলল
এবার যেতে চাই রগ গার্ডেন, টাইগার হিল
সেই সাথে মিরকীর লোকে ও
ঘন কুয়াশার মধ্যে তজয় প্রসাদের স্টিয়ারিং হাতে বন্ধুর পথ চলা
তার নিপুণ হাতের ড্রাইভ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
পাহাড়ি রাস্তায়
সব যেন অবাক বিস্ময়
মেঘে ঢাকা পাহাড়, চা বাগান
কুয়াশা, মাচার মতো ছোট ছোট ঘর
ঝাউগাছ তোমার অনুপস্থিতি বার বার মনে পড়ে
তেনজীন রগ, অবিরাম ঝর্ণাধারা
দ্রুতলয়ে যখন ছুটে চলে চোখ জুড়ানো সবুজের অতিথিরা
তখন তোমাকে ভীষণ মনে পড়ে
সেল ফোন বলে কথা বল
সুদূরের প্রেয়সীর সাথে
তোমাকে খুঁজে পাইনি কখনো
আবার অনুভব করেছি তুমি তো
সবুজ প্রকৃতির সাথে মিছে গ্যাছে
যেখানে শুধু তুমি।

ভেসে যায় হীরের পৃথিবী

মিজানুর রহমান বেলাল

কতদিন সুখপাখি উড়তে দেখেনি দুঃখের কনডেম্ড সেলে
দীর্ঘশ্বাস যাপন উৎসবে ঝরাপাতার শনশন শব্দ শান্ত শায়িত।

স্মৃতি চর্চার দায়ে কয়েদি জীবন কাব্যপ্রণোদনা করেছে ধারণ
জীর্ণ ময়লা মলাটের জমিন জুড়ে বেদনার যে বীজ বন্দনা;
হৈ চৈ মগজের অদৃশ্য অভিশাপে হয়তো আর মুক্তি পাবে না।

যদি তাজা বৃদ্ধাঙ্গুলির ইশারায় কাব্যকুহকের কূল ভেঙে যায়;
ভাঙ্গাগড়ার মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসির মঞ্চে সুখ সব হিম হয়,
তবুও গার্হস্থ্য গোরস্থানে উৎসব করবে সবুজ জোছনা।

জীবনের খোলা জানালায় কাব্যপ্রণোদনা যে এক গুপ্ত রহস্য
পাঁজরে বেঁধে শাদা শাদা কাব্যবন্দনায় ভেসে যায় হীরের পৃথিবী।

খুঁজি

তাহমিনা কোরাইশী

তোমার সাঁচে ঢালতে পারিনি আমার অনুশাসন
হলো না আর গাঁট বন্ধন
কেবলই অচেনা লাগে আকাশের রংধনুরং
সময়ের তরী ছোটে দ্রুত
জল শুকিয়ে চর পড়ে নদী
যেখানে ছিল পাড়ঘেঁষা কাশবন
দুরন্ত বাতাসের খিলখিল হাসি
আজো অনুরণ তোলে পাঁজরে।
জমছে ইট সুরকির পাঁজা রড সিমেন্টে ঠাসা
নদী হয়ে যায় অট্টালিকা
কিঞ্চিত ভাগ সময়ের দুরূহ শ্রমকে দেয় বল!
তাই তো লুট হয়ে যায় লাবণ্য কথন
পঞ্চব্যঞ্জনের ঝাঁঝালো ঝাঁজে
গৃহের বিবিধ উপকরণে নাকাল সময়
খুঁজি পুরনো খাতার পাতা
সেই বৃক্ষরাজি ছায়াঘেরা গলিপথটিও
যেখানে ছিল আমাদের নিত্য লুকোচুরি খেলা
আজ ওই পথে দাঁড়িয়ে দেখি মহাসড়কে আমি
যেন এক হরিণ শাবক।

সময় দিয়েছে হাতকড়া-বিত্তের বৃত্তাকারক্ষণ
ভাবিনি তখন, এভাবেই কারাবাসী হবে এ জীবন!

অনুভব

মানস বিশ্বাস

প্রতিদিনের সুর আর নিমগ্ন ধ্যানকে উপেক্ষা করে
এখন বেশ ভালো আছি।
কিছু দূরে যুবকেরা গান করে, শিশুরা ন্যাংটো
শরীরে খেলা করে গাছের পাতায় পাতায়
দোলা দোলা হাওয়া দুলে।
রংভরা মন নিয়ে ওদের স্বপ্নরাও ওড়াওড়ি করে
ওই যে পায়ে পায়ে কাদামাটি, সবুজে রাঙা
ভরা বর্ষার গাঁ
কত জল, কত ঢেউ
আমার মতো এসো না একদিন
জলে ডোবা আলপথ ধরে কোন বৃক্ষতলে
নিভে যাওয়া মার চোখে, সেই নিশিথ জোছনা
আবার নতুন করে চিনে নিতে।

ঘ্রাণ

এমরান হাসান

সাহসী ঘোড়া এক।
যুদ্ধসঙ্গীত শোনাতে শোনাতে যায় যীশুর দরোজায়।
ধুলোয় কেবল প্রতিধ্বনিত করুণ কণ্ঠস্বর
অক্ষরের সাহচর্য ছিঁড়েছে প্রথাবদ্ধ আকালে
প্রতীচ্য শহরের ঘুমে আকাশের রং উদ্বায়ী কেমন
ঘরে-সংসারে দৃশ্যমান জলভূমির রূপতত্ত্ব
শৌখিন মৃত্তিকা-শরীর ঘিরে আঁধারে হ্রেষাস্বর।

য্যানো কেউ নেই।
অথচ যে ছিল প্রস্থানের মতো হত্যাযুগের ধ্যানে
প্রণয়ের লোভে সে সরে গ্যাছে প্রজাপতি মোহে

সীমাবদ্ধ অভিনয়ে কত আর ফেরাব সংঘাত?

ভয়ার্ত চোখে মুদ্রিত শুধু দণ্ডিত বিস্ময়
গ্রীবার ইশতেহারে ছিল কি প্রামাণ্য জৌলুস?

প্রবন্ধ

জয় বাংলা মানে কী?

মো. রহমত উল্লাহ্

বাংলা একাডেমির অভিধান অনুসারে 'জয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সাফল্য, বিজয়, যুদ্ধাদি দ্বারা অধিকার, পরাভূত করা, দমন, শত্রু দমন, ... (victory, win, conquer, success, defeat of an enemy, victory or triumph over the opponent ...). Joy– আনন্দ, ফুর্তি, খুশি। বিজয় অর্থ : জয়, জিৎ, প্রতিপক্ষকে দমিত বা পরাজিত করা (victory, triumph, conquest, success, ...). জয়-এর বিপরীতার্থক শব্দ পরাজয়, পরাভব, হার, ... (defeat). গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে জয় শব্দটি অন্যান্য দু-একটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুবই সুন্দর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন– জয়কেতু– জয়পতাকা/বিজয়ের নিশান, জয়ধ্বনি– জয়জয়কার/বিজয়ের আওয়াজ (shouts of victory), জয়তু– জয় হোক, জয়তি– জয়যুক্ত হয়, জয়পত্র– জয়লাভের সনদ, জয়মাল্য– বিজয়ের মালা, জয়বাংলা– বাংলার জয় (victory of Bangla)। সংসদ বাংলা অভিধান এবং

জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান অনুসারে বাঙলা (বাংলা) শব্দটির অর্থ বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ভাষা এবং বাঙালি অর্থ : বঙ্গদেশের বাংলাভাষী মানুষ। তাহলে জয়+বাংলা= জয় বাংলা'র অর্থ দাঁড়ায় বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয়। আমাদের অস্তিত্বে এ জয় বাংলা শব্দের/স্লোগানের ব্যবহার ও কার্যকারিতা আরো অনেক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

১৬ এপ্রিল, ১৯৪২ 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা বাঙালির হোক, বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক'।– বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ অবিনাশী পঙ্‌ক্তিমালা; ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' গঠনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আহ্বান; ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ জিন্নাহর ঘোষণা : 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'– এর প্রতিবাদে উচ্চারিত 'না'; ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ঘোষণা– 'আমরা বাঙালি'; এ সব কিছুরই মূল ধ্বনি ছিল জয় বাংলা/বাংলার জয়। বাংলার জয়ের জন্য লড়াই করতে করতে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এ বাংলার মানুষ। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করে নিজেদের আত্মপরিচয়। প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামোর। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিবাদী চেতনা ও সাম্যবাদী আদর্শের সুযোগ্য অনুসারী মহাবিদ্রোহী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। আরো চাঙ্গা হতে থাকে বাঙালির বাঙালিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন। এ আন্দোলন ঠেকানোর জন্য পাকিস্তান সরকার শুরু করে গ্রেপ্তার অভিযান। ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয় মওলানা ভাসানীকে এবং ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় আরো অনেককেই। এসব গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে আপামর জনতা। 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।' ... স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে রাজপথ।

বাঙালির বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্মগত অধিকার অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রয়াসে পাকবাহিনী ব্যবহার করে মারণাস্ত্রের ভাষা। '৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় প্রতিবাদী মিছিল। শহীদ হন রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, অহিউল্লাহ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন শফিকুর রহমান। '৫২-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রথম শহীদ মিনার। আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার! সূচিত হয় বাংলা ও বাঙালির প্রাথমিক জয়। যার মূল কথা ছিল বাংলা ভাষার জয়। অর্থাৎ জয় বাংলা।

এ বিজয়ের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট বাতিলের দাবি। বিশেষ করে 'দেশ ও কৃষ্টি' শীর্ষক পাঠ্যবইয়ে বাঙালি জাতিসত্তাবিরোধী তথ্য অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে বিক্ষুব্ধ জনতা। '৬২-এর ৭ ফেব্রুয়ারি আবার গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবকে। 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব। স্বৈরাচারের পতন চাই, শেখ মুজিবের মুক্তি চাই। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' ... স্লোগানে স্লোগানে আবারো প্রকম্পিত হয় রাজপথ। আবারো বিদ্রোহী কবির সেই 'ভাঙার গান'।। যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিসত্তার/বাঙালির জয়। অর্থাৎ জয় বাংলা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' দাবি। সে দাবিগুলোর অন্যতম ছিল এই বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। মূল চেতনা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা/জয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে সরাসরি উচ্চারিত হয় 'জয় বাংলা' ধ্বনি, যা ছিল ১৯২৪ সালে রচিত বিদ্রোহী কবির 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতায়–

"ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ।
'জয় বাঙলা'র পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ্
জয় যুগে-যুগে-আসা সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!"

সাত কোটি কণ্ঠে বেজে ওঠে বাঙালির হৃদয়ে লালিত 'জয় বাংলা' স্লোগান। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক। '৬৬ সালের ৮ মে আবার গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। সারা বাংলায় সেই একই স্লোগান জয় বাংলা, জয় শেখ মুজিব। '৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে জেলফটক থেকেই পুনরায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। ছয় দফা দাবির সঙ্গে যুক্ত হয় শেখ মুজিবের মুক্তিসহ আরো পাঁচ দফা দাবি। ১১ দফা দাবি আদায়ে মরণপণ আন্দোলনে নামে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। প্রিয় নেতার মুক্তির দাবিতে 'জয় বাংলা' স্লোগানে ফেটে পড়ে বিক্ষুব্ধ বাংলার মানুষ। 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব। জয় বাংলা, জয় শেখ মুজিব। আইয়ুব খানের পতন চাই, শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।' এ দাবিতেই '৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। মুক্তি লাভ করেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। '৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ। 'জয় বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত হয় 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান। রেসকোর্স ময়দান থেকে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' প্রতিধ্বনিত হয় সারা বাংলায়। '৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'! যেন পিতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অনাগত সন্তানের নাম। যে নাম লেখা ছিল তার প্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একাধিক প্রবন্ধ-কবিতায়। যেমন–

'শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট মেলায়
বাংলাদেশও মাত্‌ল কি রে?'
[কবিতা : পথের দিশা]
'নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম
চির মনোরম চির মধুর।'
[কবিতা : বাংলাদেশ বন্দনা]
'এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালির–আমাদের।'
[প্রবন্ধ : বাঙালির বাঙলা]

সরাসরি এ নামকরণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের গণ্ডি অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত 'জয় বাংলা' স্লোগান হয়ে যায় সব মুক্তিকামী মানুষের। '৭০ সালের ২৮ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মারা গেছে, স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলার আরো ১০ লাখ প্রাণ দেবে।' '৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬৯ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আওয়ামী লীগ জয় করে ১৬৭ আসন। প্রমাণিত হয়, বাঙালি জাতির বজ্রকঠিন ঐক্য। আরো অপরিসীম হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু মুজিবের মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র 'জয় বাংলা'র শক্তি! যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্ম-বর্ণ-মতভেদ নির্বিশেষে আমাদের একাত্ম হওয়ার মূলমন্ত্র, বাংলার মানুষের বুকের গভীরে বাঙালিত্ব জাগানোর সফল হাতিয়ার, সাধারণ বাঙালিকে বিশ্বসেরা বীর বাঙালিতে পরিণত করার কার্যকর দাওয়াই।

'৭১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বক্তব্যে বলেন, 'বিশ্বের কোনো শক্তিই আর বাঙালিদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আটকে রাখতে পারবে না। শহীদদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিব না। জয় বাংলা।' '৭১ সালের ১ মার্চ গঠিত হয় 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।

স্লোগানে স্লোগানে আন্দোলিত হয় ঢাকাসহ সারা দেশ। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো', 'জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা ...'। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব '৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলন করেন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। সেই সঙ্গে বার বার উচ্চারিত হয় 'জয় বাংলা' স্লোগান। ভঙ্গ করা হয় কারফিউ। 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' ধ্বনিতে উদ্বেলিত বাঙালি। পাকবাহিনীর হামলায় রাজপথে হতাহত হয় অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষ! '৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে পরিবেশন করা হয় বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'– বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। সেই সঙ্গে উত্তোলন করা হয় আমাদের জাতীয় পতাকা। প্রচার করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। সবার কণ্ঠে একই আওয়াজ 'জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা...'। '৭১ সালের ৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবের কণ্ঠে ফুটে ওঠে পিতার ভাষা–

'সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য আমি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে কোনো মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য জনতাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এই মর্মে নির্দেশ দান করছি যে, হরতালজনিত পরিস্থিতির জন্য যেসকল সরকারি ও বেসরকারি অফিসে এখন পর্যন্ত মাসিক বেতন হয়নি, সেসব অফিস শুধুমাত্র বেতন দেওয়ার জন্য আগামী দুই দিনের হরতাল চলাকালে বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকবে। সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত চেক ভাঙ্গাবার ও শুধু বাংলাদেশের মধ্যে লেনদেনের জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতিও একই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।' অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতে থাকে তার আদেশ-নির্দেশ। সাত কোটি প্রাণ এক করে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির পিতা। তার প্রিয় 'জয় বাংলা' স্লোগান হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির মটো (MOTTO – A short sentence or phrase used as a guiding principle)। মুক্তি ও বিজয়ের মূলমন্ত্র 'জয় বাংলা' মটোকে বুকের গভীরে ধারণ করে সমস্বরে উচ্চারণ করে, মরণের ভয়কে জয় করে, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে সমগ্র জাতি। '৭১ সালের ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসেন ৩২৫ জন বাঙালি। বস্তবে রূপ নেয় ১৯২৪ সালে রচিত বিদ্রোহী কবির সেই 'ভাঙার গান' কবিতা–

'কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্ কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!
...
লাথি মার্ ভাঙ রে তালা!
যত সব বন্দিশালায়–
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি।'

সবাই প্রহর গুনতে থাকে ঊর্ধ্বে ওঠার ইঙ্গিতবহ পিতার তর্জনী নির্দেশের অপেক্ষায়! ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসভায় বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদান করেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ–

'... দাবায়া রাখবার পারবা না! ... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। ... এরপর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়! ... আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি ... প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন। আমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' মূলত এরপর আর অবশিষ্ট থাকে না বাংলাকে জয় করার ঘোষণা ও পরিকল্পনা। সেদিন পিতার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয় আরো ১০টি আদেশ–

'১. সরকারি খাজনা বন্ধ।
২. সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং কোর্ট-কাচারি বন্ধ।
৩. রেলওয়ে ও বন্দরের কাজ চালু থাকবে। তবে সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র বহন চলবে না।
৪. বেতার ও টিভিতে সংবাদ ও বিবৃতি প্রচার হবে।
৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কেবল আন্তজেলা ট্রাঙ্কল চালু থাকবে।
৬. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ।
৭. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যাংক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো যাবে না।
৮. প্রতিদিন সমস্ত অট্টালিকায় কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।
৯. হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও পরিস্থিতির মোকাবেলায় আংশিক অথবা পূর্ণ হরতাল আহ্বান করা হবে।
১০. স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতি মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে।'

তখন জাতির পিতা যেন অলিখিত সরকারপ্রধান। শুধু সাধারণ মানুষ নয়; তার সফল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল হয়ে আনুগত্য স্বীকার করেন দল-মত নির্বিশেষে (জামায়াতে ইসলামীসহ অনুরূপ কয়েকটি ছোট্ট দল ছাড়া) ছোট-বড় নবীন-প্রবীণ সব নেতা-কর্মী ও সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি। ন্যাপ-প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী '৭১ সালের ৯ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন, 'আমার তিনটি ছেলে, তার মধ্যে একটি মুজিব'। তিনি একইভাবে ১১ মার্চ টাঙ্গাইলের এক জনসভায় বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালির নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন।' '৭১ সালের ১৯ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চলে ৯০ মিনিট। 'জয় বাংলা' স্লোগানের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও তিনি কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন। তিনি জানতেন, তার প্রিয় 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিকামী মানুষের রক্তের স্পন্দন, মুক্তির মন্ত্র। তখন তার সম্পর্কে 'দি নিউজ উইক' পত্রিকার মন্তব্য– 'উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি এ তিনটি ভাষাতেই সাবলীল মুজিব নিজেকে নিয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে ভান করতেন না। তিনি প্রকৌশলী নন, রাজনীতির কবি। বাঙালির প্রযুক্তির চেয়ে শিল্পকলার প্রতি প্রবণতা বেশি। আর তাই তার শৈলীই যথার্থ সেই অঞ্চলের সকল শ্রেণি ও মতাদর্শকে একতাবদ্ধ করার প্রয়োজনে।' বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বিশ্বনন্দিত নেতা। তার 'জয় বাংলা' ধ্বনিতেই সর্বত্র পরিচিত আমাদের এই বাংলা।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুরু করে গণহত্যা। রাত ১২টার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ এখন থেকে স্বাধীন। এ ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত দেড়টায় তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনারা। শুরু হয় সরাসরি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। রণাঙ্গনে পরিণত হয় বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটি। জনককে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাগারে। থেকে যায় জনকের আদেশ।

[The independence of Bangladesh was declared by Sheikh Mujibur Rahman through a message on 26 March 1971 just before he was arrested at about 1:30 a.m. (as per Radio Pakistan's news on 29 March 1971). This declaration of independence marks the beginning of the Bangladesh Liberation War. Declaration of Independence signed by Sheikh Mujibur Rahman was :

"Today Bangladesh is a sovereign and independent country. On Thursday night, West Pakistani armed forces suddenly attacked the police barracks at Razarbagh and the EPR headquarters at

Pilkhana in Dhaka. Many innocent and unarmed have been killed in Dhaka city and other places of Bangladesh. Violent clashes between E.P.R. and Police on the one hand and the armed forces of Pakistan on the other, are going on. The Bengalis are fighting the enemy with great courage for an independent Bangladesh. May Allah aid us in our fight for freedom. Joy Bangla!"]
(Sources : Wikipedia and Bangladesh Genocide Archive)
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman also read out a wireless message, moments after the crackdown began, declaring the independence of Bangladesh as 25 March gave way to 26 March. His declaration was transmitted over wireless to the country :
''THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TO-DAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL PON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR RIGHT MUST GO ON UNTIL THELAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH. FINAL VICTORY IS OURS.''
৭ মার্চে দেয়া জনকের দিকনির্দেশনা অনুসারে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে দেশের সব মানুষ এই বাংলাকে জয় করার জন্য, শত্রুমুক্ত করার জন্য, 'জয় বাংলা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণপণ যুদ্ধে। সবার বুকে স্পন্দিত ও মুখে উচ্চারিত আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত 'জয় বাংলা' স্লোগান ছিল এই যুদ্ধেরও প্রধান হাতিয়ার। ২৬ মার্চ রাত ৮টায় এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া বলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের শত্রু।' বাংলার সর্বাধিনায়ক বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশের একমাত্র নিয়ন্ত্রক বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। সেদিন তার কণ্ঠেও ছিল জয় বাংলা স্লোগান।
"On behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman; I hereby proclaim the independence of Bangladesh. ... May Allah help us, Joy Bangla."
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মারতে মারতে এবং মরতে মরতে মুক্তিকামী মানুষ বার বার উচ্চারণ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান। 'জয় বাংলা' নামে রণাঙ্গন থেকে তখন প্রকাশিত হতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সঠিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তিনি কারাগারে থাকায় তার একান্ত সহযোগী সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে গঠন করা হয় 'মুজিবনগর সরকার'। কর্নেল এমএজি ওসমানী ছিলেন সেই সরকারের সসস্ত্রবাহিনীর প্রধান। সবার বুকে ও মুখে ছিল জয় বাংলা স্লোগান।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'জয় বাংলার লোক' অভিহিত করেই আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের লাখ লাখ নিরীহ মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করেছে পাকিস্তানের সমর্থক বাহিনী। অবশেষে বীর বাঙালির নয় মাসের মরণপণ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনারা করে শর্তহীন আত্মসমর্পণ। বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সাহিত্যের কবি নজরুল ও রাজনীতির কবি মুজিবের চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রমাণিত হয় বিদ্রোহী কবির সেই কথা :
"বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– 'বাঙালির বাঙলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে।"
'৭২ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক শেষে ১০ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশের রক্তাক্ত মাটিতে পা রাখেন বিশ্বনন্দিত বিজয়ী বীর বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সবার কণ্ঠে সেদিন 'জয় বাংলা'ই ছিল প্রিয় নেতাকে বরণ করার স্বাগত স্লোগান।
৩০ লাখ শহীদের প্রাণ, হাজার হজার মা-বোনের সতীত্ব আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা জয় করি 'বাংলা', অর্জন করি 'জয় বাংলা' মটো। 'জয় বাংলা' আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সফল হাতিয়ার! মূলত এ হাতিয়ারের বলেই আমরা পরাভূত করেছি পাহাড়সমান প্রতিপক্ষ। জয় করেছি আমাদের আসল পরিচয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মায়ের মুখের বাংলা ভাষা ও মাতৃভূমি বাংলাদেশ। কিন্তু তা সঠিকভাবে জানে না আমাদের নবীন প্রজন্ম!
বন্ধু তুমি জানো কি
জয় বাংলা মানে কী?
কোন্ চেতনায় কথা দুটি বুকে ধরে রেখেছি!
হৃদয়জুড়ে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকেছি ॥

জয় বাংলা মানে বাংলা ভাষার জয়
জয় বাংলা মানে বাংলাদেশের জয়।
জয় বাংলা মন্ত্র দিয়ে সাত কোটি এক হয়েছি ॥

জয় বাংলা মানে বাঙালিদের জয়
জয় বাংলা মানে কুচক্রীদের ভয়।
জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে বীর বাঙালি হয়েছি ॥

জয় বাংলা মানে মুক্তিসেনার জয়।
জয় বাংলা মানে তাদের পরাজয়।
জয় বাংলা অস্ত্র দিয়ে জয় পতাকা এনেছি ॥

জয় বাংলা শুধু 'জিন্দা' থাকা নয়
জয় বাংলা হলো অগ্রগতিময়।
জয় বাংলা বলে সবই জয়ের শপথ নিয়েছি ॥
(যেহেতু আমি একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার; সেহেতু আমার লেখা এ গানটি যে কোনো ভালো গায়ক ভালো সুর দিয়ে গাইতে পারেন বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনসহ সর্বত্র।)
নবীন প্রজন্মকে এমনি করে গানে গল্পে কথায় কবিতায় জানিয়ে দিতে হবে 'জয় বাংলা'র পরিপূর্ণ অর্থ। জয় বাংলা মানে সেসব মানুষের জয়, যারা এ বাংলার মাটি ও মানুষকে শোষণ-নির্যাতন মুক্ত করার প্রত্যয়ে যুগে যুগে লড়াই করে হটিয়ে দিয়েছে ... আর্য, সুলতান, মুঘল, পাঠান, মারাঠা, বর্গি, ইংরেজ, নীলকর, কাবুলিওয়ালা, জমিদার, ... পাকবাহিনীসহ নানান অপশক্তিকে। বুঝিয়ে দিতে হবে কেন 'জয় বাংলা' আমাদের জাতীয় মটো (Motto)। বলতে হবে, আমাদের আন্দোলনে-সংগ্রামে-যুদ্ধে কোথাও কোনো দিন বাঙালিরা বলেনি 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' (?)/'বাংলাদেশ চিরজীবী হোক' (?)। এহেন কথা কোনো দিন উচ্চারণ করেননি বাংলাদেশের স্বপ্নস্রষ্টা আমাদের জাতীয় কবি (রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বীকৃত) কাজী নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তেলাপোকার মতো, কচ্ছপের মতো বেঁচে থাকতে চাননি তারা। আমাদের দেননি কেবল জিন্দা থাকার মতবাদ। দিয়েছেন সার্বিক জয় ও মুক্তির মন্ত্র– 'জয় বাংলা'। শিখিয়েছেন সব ভালোতে জয়ী হওয়ার কৌশল। শুধু আমাদেরই নয়, সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন– একটি ব্যাপক অর্থবোধক শক্তিশালী মটোকে বুকে ধারণ ও মুখে উচ্চারণ করে : কিভাবে জাগ্রত করা যায় বিবেক, শানিত করা যায় চেতনা; বৃদ্ধি করা যায় রক্তের গতি, হৃদয়ের স্পন্দন, মনের সৎসাহস; জয় করা যায় না পারার ভয়; থাকা যায় ঐক্যবদ্ধ; পরাস্ত করা যায় শত্রু; অতিক্রম করা যায় প্রতিকূলতা, সুনিশ্চিত করা যায় অগ্রগতি, সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সত্য, সম্পাদন করা যায় সকল ভালো। (A motto is a must to win.) এ জন্যই একাত্তরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পরেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বার বার তর্জনী উর্ধ্বমুখী করে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন 'জয় বাংলা'। শুধু এ দেশে নয় বিদেশে গিয়েও প্রকাশ করতেন

আমাদের 'জয় বাংলা' মটো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে '৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদান করেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানেও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন 'জয় বাংলা'। তার বজ্রকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বার বার 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করেছিল সে দেশের উপস্থিত জনতা! কে জানত, বঙ্গবন্ধুর চোখে সেদিন ভেসে উঠেছিল কি না রবিঠাকুরের কল্পিত সোনার বাংলা তথা কবি নজরুলের কাঙ্ক্ষিত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ মিলিত স্বাধীন বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র!

স্বাধীনতার চেতনা ছাড়াও 'জয় বাংলা' এবং 'বাংলাদেশ' এ দুটি শব্দের জন্য কবি নজরুলের কাছে ঋণী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাই কবি নজরুলকে ভারত থেকে নিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি।

কী উচ্চারণ করেছিল '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটবিদ্ধ পিতার অসীম সাহসী বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা অপরাভব রক্তের প্রতিটি বিন্দু? যিনি বলেছিলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও তিনি কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন!

খুনিরা জানত না 'কাজী নজরুল' আর 'শেখ মুজিব' যেমন অমর পুরুষ, 'জয় বাংলা' তেমনি তাদের অমর বাণী। কিন্তু আমরা কি তেমন করে বুকে ধরে রাখতে পেরেছি, মুখে উচ্চারণ করতে পেরেছি, কাজে পরিণত করতে পেরেছি অমর পুরুষের সেই অমর বাণী? পারিনি বলেই আজ আমরা হারাতে বসেছি আমাদের জাতীয় ঐক্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অগ্রগতির পন্থা। তাই তো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার মনে নিত্য ঘুরপাক খায় নানান কথা, নানান প্রশ্ন–

১.
মরণ নামক অস্ত্র দিয়ে
মনের বলে পাক হটালাম
বিশ্ব অবাক করে দিয়ে
জয় পতাকা ছিনিয়ে নিলাম।

২.
পাকসেনারা হটলে পরে
স্বসেনাদের শাসন পেলাম
স্বৈরাচারীর জাঁতাকলে
বারে বারে পিষ্ট হলাম!
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?

যার ডাকে দেশ স্বাধীন হলো
তার বুকেতেই বুলেট খেলাম
খুনের বিচার চাইতে মানা
এ বেআইনি আইন পেলাম!
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?

যুগে যুগে লড়াই করে
'বীর বাঙালি' খেতাব পেলাম
সেই খেতাবের পাতায় আবার
কালো কালির লেপন পেলাম!
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?

'জয় কথাটা পরের কথা' (?)
এমন বুলি শুনতে পেলাম
'জিন্দা ...' নামক থুথুটাকে
মুখে নিতে বাধ্য হলাম!
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?

ঐক্যটা যেই ভেঙে গেল
নিজেই নিজের শত্রু হলাম
এত ত্যাগের বিনিময়ে
নৈরাজ্য ভর রাজ্য পেলাম!
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?
এ জন্য কি যুদ্ধে গেলাম?...

'জয়' কি আমাদের কথা নয়? ... রাজ্য জয় করেন। ... বাংলা জয় করেন। ... এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ... কে কাস্তে/নৌকা/দাঁড়িপাল্লা/ ধানের শীষ/লাঙ্গল/বটগাছ মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। যুগ যুগ ধরে এমন হাজারো ক্ষেত্রে আমরা গর্বসহকারে ব্যবহার করছি 'জয়' শব্দটি। জয় শব্দে ভরপুর আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যভাণ্ডার। শুধু 'জয়ধ্বনি' কবিতায় তিনি ২৪ বার লিখেছেন জয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কবিতায় তিনি লিখেছেন–

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয়গান!'

'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়!
জয় নব উত্থান! ...
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!'

'জয় মানুষের জয়!'

'ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়
জয় নব উত্থান!'

'ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়!'

'মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা গাই!'
(অসমাপ্ত)

এ জয় শব্দযোগে রয়েছে আমাদের অনেক নাম। যেমন– আলহাজ মো. জয়নুল আবেদিন, জয়নগর, জয়পুরহাট, জয়ন্তিকা, ...। এতে কোনো সমালোচনা নেই, বিতর্ক নেই। অথচ বিতর্কিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চলে, 'জয়' শব্দের সঙ্গে 'বাংলা' শব্দটি যুক্ত করে জয় বাংলা বলতে গেলেই! বলা হয়, জয় হিন্দু শব্দ! জয় বাংলা ডেড স্লোগান! মূলত জয় বাংলার ঐক্যের কাছে যে পরাজিত, জয় বাংলা স্লোগানকে এখনো যে ভয় পায়, বাংলা ভাষাকে যে নিজের ভাষা মনে করে না, বাংলাদেশকে যে স্বাধীন ভাবতে কষ্ট পায়, যে মানতে পারে না বাঙালি জাতির অস্তিত্ব; সর্বোপরি 'বাংলা'র মাটি ও মানুষের জয় যার কাছে প্রত্যাশিত নয় এবং 'বাংলা'র মাটি ও মানুষের জয়ের আনন্দ যার কাছে বেদনাময়; কেবল তার কাছেই বিতর্কিত 'জয় বাংলা'! তার জন্য আমরা কি ত্যাগ করব আমাদের 'জয় বাংলা' মটো? যে স্লোগানের শক্তিতে আমরা সবাই মিলে অর্জন করেছি বাংলার স্বাধীনতা; কোনো একক দলকে দিয়ে দেব কেন সেই 'জয় বাংলা' স্লোগানের সব কৃতিত্ব? অপ্রিয় লোকে মধু খায় বলে আমরা কি খাব না মধু? দিনাজপুর জেলা ভারতেও আছে বলে আমরা কি ভারত বলব আমাদের দিনাজপুরকে? বাঙালিরা ভারত, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইতালিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক হয়ে আছে বলে আমরা কি হীনমন্যতায় অস্বীকার করব আমাদের স্বাধীন বাঙালি জাতিসত্তা? নাকি বিজয়ী বীরের মতো কৃতিত্বে-সফলতায় বার বার বাঙালিত্ব প্রকাশ করে ছাপিয়ে দেব অন্যদের অস্তিত্ব? আমার নামে আরো হাজারো ভালো/মন্দ মানুষ ছিল বলে, আছে বলে, আমি কি বাদ দিয়ে দেব নিজের নাম? ভারতে কাশ্মীরি আছে বলে নিজেদের জাতীয় পরিচয় কি অস্বীকার করছে পাকিস্তানের কাশ্মীরিরা? তাহলে আমরা সমস্বরে বলব না কেন– আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা, বাংলা আমাদের দেশ, জয় বাংলা আমাদের মটো। জয় বাংলা আমাদের ঐক্যের বন্ধন, অগ্রগতির পাথেয়, জয়ের শক্তি। খেলাধুলাসহ বিভিন্ন শুভ প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশকে হারিয়ে দিয়ে, সুশিক্ষা অর্জন করে, পরীক্ষায় A+ পেয়ে, সব শুভ কামনা করে, অমঙ্গল পরাজিত করে, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে, সুখ-শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে, নোবেল পুরস্কার জয় করে, বার বার 'জয় বাংলা' বলে একসঙ্গে নেচে উঠব আমরা! মহান শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও শোক দিবসসহ সব জাতীয় দিবসে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতেই প্রকাশ করব আমাদের আনন্দ/শোক/প্রতিবাদ! মনে রাখতে হবে– সেই পরাজিত ইংরেজ শোষকদের 'V' বাঙালিদের জয়ের সংকেত নয়। বাঙালিদের জয়ের সংকেত ঊর্ধ্বে ওঠার ইঙ্গিতবহ 'ঊর্ধ্বমুখী তর্জনী'। বাঙালিদের সার্বিক জয়ের বজ্রধ্বনি 'জয় বাংলা'। বাঙালি জাতির আদি-অন্ত ঐক্যের একমাত্র সফল জাতীয় মটো 'জয় বাংলা'। অপরিসীম অর্থবহ এ জয় বাংলা মটোর ভিত্তিতে যতবার ঐক্যবদ্ধ হবে ততবারই অসাধ্য সাধন করবে বিশ্বসেরা এই বীর বাঙালি জাতি।

ভ্রমণ

হারিয়ে যাওয়ার দিনগুলো

সালেহ আহমাদ

ভ্রমণপিপাসু একটা মনের অস্তিত্ব বুকের ভেতরে আছে, এটা টের পাই যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। মোহম্মদ গোমেজ আলী নামে বিজ্ঞান বিভাগের এক স্যার এলেন। তার কথাবার্তা, চালচলন ছিল অন্যান্য স্যারগণের চেয়ে ভিন্নতর। কথা-বার্তায়, পোশাকে-আশাকে। গোমেজ আলী স্যার আসার পর ক্রমেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করল। সামনের খেলার মাঠ প্রাণ ফিরে পেতে থাকল। কমনরুম প্রাণ পেল। বার্ষিক নাটক মঞ্চস্থ হলো। শিক্ষার্থীদের নতুন ইউনিফর্ম হলো। অজপাড়া গাঁয়ের স্কুলের সার্বিক চিত্র পাল্টে গেল। একদিন শুনলাম, ছাত্রদের নিয়ে স্টাডি ট্যুরে যাওয়া হবে। যারা আগ্রহী তাদের নাম রেজিস্ট্রেশনের নোটিশ এলো। নিজ গায়ের দু'সহপাঠীর সাথে নাম লিখালাম। চলে গেলাম সিলেটের শ্রীমঙ্গলে। জীবনের প্রথম দেখা চা বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে শুধু বিমোহিত নয় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আসলে হারিয়ে যাওয়া শুরু হলো। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন করে হারিয়ে গেলাম সম্প্রতি।

চৈত্রের শেষদিকে টেলিফোন পেলাম আমেরিকা প্রবাসী বাল্যবন্ধু বিজয়ের। বলল, ১৪ এপ্রিল ও' আসছে। ঢাকায় নয়, চাটগাঁয়ে নামবে। ১ বৈশাখ কাটাবে সেখানে। আমি তো সেই নাচের বুড়ি, শুনেছি ঢোলের বাড়ি। ক্যালেন্ডার দেখলাম। বৃহস্পতি সরকারি ছুটি। পরবর্তী রোববার-সোমবার ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পাঠালাম। ছুটি গৃহীত হলো। ১৩ তারিখ রাতেই হারিয়ে যেতে পথে পা রাখলাম।

বিড়ম্বনা দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। সাড়ে ন'টার বাস ছাড়ল সাড়ে দশটায়। বিরক্তি -টিরুক্তি সব ঝেড়ে-মুছে জানালার বাইরে মাথা নিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। ভাবলাম অবশেষে হারিয়ে যাওয়ার মিশন শুরু হলো। কালিয়াকৈর এসেই নতুন বিড়ম্বনা। এ

বিড়ম্বনার নাম জ্যাম। এতদিন জেনেছি জ্যামের নগরী ঢাকা। ভুল ভাঙল- জ্যাম সবখানে। নৌবাহিনীতে কর্মরত বন্ধু জাহাঙ্গীরকে বলে রেখেছিলাম- আমি আসছি, বিজয় আসছে। ও বলেছিল নো প্রবলেম। অনেক দিন পর তিন বন্ধুর মিলন হবে। খুশিতে মোবাইলেই হৈ-হুল্লোর করতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম আনন্দের আতিশয্যে নাচতে শুরু করেছে জাহাঙ্গীর। তিন ঘণ্টা বিলম্বে চাটগাঁয়ে থামল বাস। এবার নৌবাহিনীর ফ্লিট ক্লাব। ওখানেই জাহাঙ্গীর থাকার ব্যবস্থা করেছে। জাহাঙ্গীর অপেক্ষা করছিল। হাতঘড়ি দেখলাম, দশটা বেজে গেছে। তার মানে ত্রিশ মিনিট আগে বিজয়কে নিয়ে আসা বিমান বলাকার চাকা পতেঙ্গার রানওয়ে ছুঁয়েছে। কাস্টম চেকিংয়ে এক ঘণ্টা লাগবে। তার অর্ধেকটা সময় চলে গেছে। জাহাঙ্গীর বলল, কুইক। গাড়িতে ওঠলাম। স্টার্ট দিতেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে ওঠল। বিজয়ের ফোন। কোনো সম্ভাষণ, কুশল বিনিময় নয়। সরাসরি বিজয় বলল, শালারা আমি আমেরিকা থেকে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছি। আর তোরা কেউ টাঙ্গাইল থেকে, কেউ এ শহর থেকে এখনো আসতে পারলি না। তোদের কপালে খারাপি আছে। একটা সিগারেট ধরালাম। এটা শেষ হওয়ার আগে আমার দৃষ্টি সীমানায় না এলে, ঢাকায় ফিরে যেতে প্রস্তুতি নিয়ে প্লেনে চড়ে বসব। কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল বিজয়। সেই একরোখা বিজয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি, বোঝা গেল। জাহাঙ্গীরকে বিজয়ের কথা বলতেই ও কিছুটা হাসল। বলল, দৃষ্টি সীমানার কথা বলেছে তো। দৃষ্টির সামনের কথা তো বলেনি। সমস্যা নেই। আর এক প্রস্থ হাসল জাহাঙ্গীর। দ্রুত গতিতে গাড়ি চলতে থাকল। পতেঙ্গা যাওয়ার কামাল আতার্তুক রোড বেশ ফাঁকাই মনে হলো। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিজয়ের মুখোমুখি হলাম।

দেখলাম বিজয়ের চোখে বেশ রাগ রাগ ভাব। রাগ পতেঙ্গা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের ওপর। বিজয় বলল, আমেরিকান বিজয় একটা মাত্র ব্যাগ নিয়ে এসেছে। এই ব্যাগটা চেক করতে এক ঘণ্টা লাগে! পৃথিবীর কোনো এয়ারপোর্টে এমন নেই। শুধু এ কারণেই বাইরের কোনো পর্যটক বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে না। বেশিরভাগ বাঙালিরাও না। এ শালাদের কারণেই বিমানের বারটা বেজে যাচ্ছে। শালারা সমস্যা না থাকলেও বলবে এ সমস্যা, ও সমস্যা-একশ ডলার লাগবে। বিজয়কে তো চেনে না। আমি বলেছি, একশ ডলার! পাছা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। আরো বললাম আপনাদের চাকরি খেয়েই আমেরিকা ফিরে যাব। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য সুফল মিলল সাথে সাথেই। স্যার বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলল। সাপের দল লেজ গুটাল। জানিস তোরা শালা যারা এদেশে বসবাস করিস, সবাই শক্তের ভক্ত, নরমের জম। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, এগারটা বেজে গেল, জাহাঙ্গীর শালা তুই পান্তা খাওয়াবি কখন? -চল সব রেডি, জাহাঙ্গীর বলল।

ফিরে এলাম ফ্লিট ক্লাবে। চমৎকার সব ব্যবস্থা। ভালো লাগল। তার চেয়েও ভালো লাগল জাহাঙ্গীরের কলিগদের আন্তরিকতা। ডিসিপ্লিন বাহিনীর সদস্যরা এতটা অতিথিপরায়ণ, জানা ছিল না। গোসল করেই ঢুকলাম ডাইনিংয়ে। খাব মাত্র তিনজন। অথচ পুরো টেবিল ভরা খাবার। পান্তার ডিস, ইলিশ ফ্রাই, গরুর ভুনা, চিংড়ির শুঁটকি, আলু ভর্তা, টক দই, নারিকেল, জিলাফি। বললাম, জাহাঙ্গীর এগুলোয় আমার হবে না। আমি বৈশাখী বাঙালি নই। আমি সারা বছরের বাঙালি। আমার কাঁচা মরিচ-পিঁয়াজ লাগবে।

-নো প্রবলেম সে ব্যবস্থাও আছে। ভেতরে ঢুকে এক বাটি কাঁচা মরিচ-পিঁয়াজ নিয়ে এলো জাহাঙ্গীর। পান্তা খেতে খেতে মনে হলো, চাটগাঁয়ে নয় বাড়িতে বসে পান্তা খাচ্ছি। পুরোপুরি ঘরোয়া পরিবেশ বিবেচনায় এলো। বৈশাখের বাঁধ ভাঙা আনন্দ নিয়ে খেলাম পেটপুরে।

লিভিংরুমে ফিরেই বিজয় বলল, কিভাবে প্রোগ্রাম সাজিয়েছিস তোরা।

-এখন যাব পোর্টে। বিকালে বৈশাখী মেলায়। সন্ধায় হজরত বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার শরিফ। কালকে রাঙামাটি, পরশু বান্দরবান, তার পরদিন কক্সবাজার, তারপর সেন্টমার্টিনস হয়ে ছেড়া দ্বীপ। পরেরদিন চাটগাঁয়ে কাটাব ছুটি। রাতে ঢাকার উদ্দেশে নিশিথার ধরব চেপে টুটি।

- ফাইন। তোদের প্রোগ্রাম আমার পছন্দ হলো। থ্যাঙ্ক ইউ বোথ। জাহাঙ্গীর বলল, আমি কিন্তু আজকেই তোদের সাথে আছি।

-কেন?

-সাতদিনের জন্য সাগরে যাব। কোনোভাবেই ছুটি ম্যানেজ করতে পারলাম না। তোদের কী সরি বলতে হবে। গাড়ি ম্যানেজ করা আছে কোনো সমস্যা নেই।

নো ফ্রেন্ড গাড়ি নয় বাস। সাধারণ মানুষের একজন হয়ে ভ্রমণ করব। বিজয় কী বলিস।

-আমিও এ কথাই বলতে চেয়েছিলাম। তবে রাতে কিন্তু এখানে এসে থাকব। হোটেলে আমার ঘুম হয় না। বাজে অভ্যাসটা জেগে ওঠে। এটা ভেবেই বোতল-টোতল কিছুই নিয়ে আসিনি।

বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য সি-পোর্ট। প্রথমেই নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ দেখলাম। স্থল বাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র দেখার সুযোগ এ দেশের মানুষ শুধু নয় কোনো দেশের মানুষই পায় না। সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। নৌবাহিনীর বেলায় এটা সম্ভব নয়। বিশাল এ যুদ্ধজাহাজ লুকিয়ে রাখার জো নেই। বিএনএস বঙ্গবন্ধু, বিএনএস আবুবকর, ওমর ফারুক, ধলেশ্বরী, নীল সাগর দেখলাম। জাহাঙ্গীরকে বললাম ভেতরে দেখার সুযোগ হবে কি?

-কেন হবে না। গত মাসে কমিশনপ্রাপ্ত বিজয়-য়ে তোদের নিয়ে যাব।

-বিজয়! বিএনএস বঙ্গবন্ধু নয় কেন? জিজ্ঞেস করলাম জাহাঙ্গীরকে।

- বিজয়ের নামে 'বিজয়' সর্বশেষ প্রযুক্তিসম্পন্ন। হাসল জাহাঙ্গীর। বিজয় বলল, তাহলে তো আমার নামে নাম যুদ্ধজাহাজ দেখতেই হয়।

বিজয়ের কর্মকর্তা মাইন উদ্দিন সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন। নাবিকরা কোথায় থাকে, কেমন কক্ষে ঘুমায়, তাদের খাওয়ার কক্ষ, রান্নার কক্ষ, যুদ্ধাস্ত্র কোথায় থাকে। হেলিকপ্টারে কেমন করে তৈল নেয়া হয়, জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা কেমন করে মেরামত হয়, সবই দেখালেন মাইন উদ্দিন। বিজয়কে দেখলাম। ওর চোখ কপালে ওঠে গেছে। অবাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীর ভাবলেশহীন। তার কাছে এগুলো অতি সাধারণ বিষয়। প্রতিটা তলাতেই বিনোদন রুম রয়েছে। সেখানে টেলিভিশন দেখার সুযোগ রয়েছে। টেলিভিশনে স্যাটেলাইট সংযোগ আছে। মাইন উদ্দিন বললেন, আমরা যখন যে দেশে অবস্থান করি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো টেলিভিশনের মনিটরে চলে আসে। শরীর ফিট রাখার জন্য জিমনেশিয়ামও রয়েছে। পানির সমতল বিনোদন রুমে বসলাম। চানাচুর, আমের জুস দিয়ে আপ্যায়িত করল আমাদের। দূর থেকে বেসামরিক জাহাজ দেখেছি অনেক। সেনা দিবসে সদরঘাটে যুদ্ধজাহাজও দেখেছি। এমনভাবে দেখা হয়নি কখনো। দিনের পর দিন সাগরে থাকার গল্পও শুনলাম। এক সময় নাবিক হওয়ার স্বপ্ন ছিল। দিনের পর দিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এমন ভাবনায় নাবিক হওয়ার স্বপ্নটা ভেতর থেকে হারিয়ে যায়। আজ মাইন উদ্দিন সাহেবের মুখ থেকে দেশ থেকে দেশান্তর হয়ে নতুন নতুন জায়গায়, নতুন নতুন শহরে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর গল্প শুনে নতুন করে নাবিক হওয়ার স্বপ্ন মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল। যদিও জানি এখন আর এসব ভেবে কোনো ফায়দা হবে না। সময়ের ইতি ঘটেছে। হাতে টিকিট নিয়ে একা একা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন চলে গেছে। বিজয় থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছে হলো না। তবু ফিরতে হলো। রবিঠাকুরের ভাষায় 'তবু যেতে হয় ,তবু যেতে দিতে হয়।'

সি-পোর্ট থেকে সরাসরি বৈশাখী মেলায় এলাম। নৌবাহিনী কলোনি এলাকায় বৈশাখী মেলা দেখে আমার ভেতরে যতটুকু উন্মাদনা সৃষ্টির কথা ছিল, ততটুকু উন্মাদনা সৃষ্টি হলো না। শহরের সাজানো গোছানো বৈশাখী মেলা। এমন মেলা দেখে আমার মতো বাঙালির মন ভরল না। পুরোটাই কৃত্রিম মনে হলো। পুতুলের মতো সাজানো ফুটফুটে বাচ্চারাই মেলার প্রাণ হিসেবে ঘোরাফিরা করছে। সাজু-গুজু করা কিশোরীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এটা স্বতঃস্ফূর্ত- মেলা নয়। বৈশাখী মেলার প্রাণ বাঁশের বাঁশি নেই। বাঁশের বাঁশিতে লাগানো বেলুন ফুলিয়ে কেউ সুর সৃষ্টি করছে না। মাটির তৈরি খেলনা নেই। মাটির খেলনা কিনতে গিয়ে ভেঙে ফেলে দোকানির সাথে কারো বচসা হচ্ছে না। হাতে চালানো দোলনা নেই। দোলনায় বাচ্চাদের কিচির-মিচির নেই। চড়কিতে উঠে বাচ্চারা হৈ চৈ করছে না। বৈশাখী মেলার চিরন্তন আইটেম সাজ, বিন্নির দোকান চোখে পড়ল না। ফিরে এলাম একরাশ ভারীমন নিয়ে। চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করে দেখলাম দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে চট্টগ্রামের স্পষ্ট একটা পার্থক্য রয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চল

বিশেষ করে পহেলা বৈশাখের নামে রাজধানীতে যে নগ্ন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, চাটগাঁ তা থেকে মুক্ত। ঢাকায় দেখা যায় 'শিকড়ের টানে' ব্যানার করে পশুর মুখোশ পরে যুবক-যুবতীরা পশু সাজে। বারো আউলিয়ার শহরের মানুষ সব সময়ই ব্যতিক্রম। এ শহরে পশু সাজার প্রবণতা চোখে পড়ল না। ঢাকা শহরে যা হচ্ছে, যেভাবে চলছে তাতে আমি নিশ্চিত, ক'বছরের মধ্যে পেছনে বানরের লেজ পড়ে সত্যিকারের শিকড়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে, বানরের পোশাক পরে মুক্ত আকাশের নিচে বানর হয়ে মানুষের চিত্তরঞ্জন করবে। বড় বড় মার্কেটের কিছু কিছু দোকানে মনকাড়া রঙের ব্যানার দেখলাম। ভালো লাগল। বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে রীতিমতো হতাশ হতে হলো। অসম্ভব অগোছালো সবকিছু পবিত্র জায়গায় যে পবিত্র পরিবেশ থাকা দরকার, তার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ল না। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পুকুরের। নানা রকম আবর্জনায় পূর্ণ। বয়সের ভারে ন্যুব্জ কচ্ছপগুলোকে কেউই এতটুকু শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। খাওয়ার লোভ দেখিয়ে তীরে এনে কেউ গা হাতায়, কেউ বা পা ধরে। মানুষের হাতের স্পর্শে কচ্ছপের গা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এসব দেখার কেউ আছে বলে মনে হলো না। ওজু করে মাজারে উঠলাম। মুহূর্তেই মনটা ভালো হয়ে গেল। অনুভব করলাম দেহ মনের সব ক্লান্তি এক নিমিষেই উধাও। পবিত্র অঙ্গনের ফল হাতে হাতেই পেলাম। প্রার্থনা করলাম পরিবারের সবার জন্য। নিচে নামার সাথে সাথেই মেয়ের ফোন পেলাম। বলল, আব্বু আমার জন্য দোয়া করেছ? মেয়ের কথা শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ভাবলাম, মেয়ে বলে কী! ফিরে এলাম ফ্লিট ক্লাবে। বিজয়কে নিয়ে পরিকল্পনা আঁটতে বসে গেলাম কালকের রাঙামাটি সফর নিয়ে।

পরদিনের গন্তব্য রাঙামাটি। বাস ছাড়বে সকাল সাতটায়। বাসে উঠে ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো। যাত্রীদের মাঝে আমি আর বিজয়ই কেবল বাঙালি। বাকি সবাই আদিবাসী। বেশির ভাগের বয়স পঁচিশের নিচে। তারা গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। তাদের বলার ভাষা শুনে আমার মনে হলো, আমি বাংলাদেশে নয়, ভিন্ন দেশে রয়েছি। হাসি ছাড়া তাদের কথা বলা, বলার ধরন সবই অপরিচিত। তাদের বলা বাক্যের মর্মার্থ উদ্ধার করতে আমরা ব্যর্থ। পরদিন বান্দরবান গিয়েও একই অনুভূতির দেখা পেয়েছিলাম। দু'ঘণ্টায় রাঙামাটি পৌঁছানোর কথা থাকলেও দশটায় রাঙামাটি শহরের সুধামাটির সুগন্ধ মাখা বাতাসে নিশ্বাস নিলাম।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই গেলাম ঝুলন্ত ব্রিজে। ঝুলন্ত ব্রিজে দাঁড়িয়ে লন্ডনের টেমস নদীর ঝুলন্ত ব্রিজটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। নির্মাণশৈলিতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। যারা টেমসের ঝুলন্ত ব্রিজ দেখেনি, কিন্তু নাম শুনেছে, তাদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর একটা প্রচেষ্টা, আমার এমনি মনে হলো।

বছরের অধিকাংশ সময়ই ব্রিজটা পানির নিচে থাকে। তাই সতর্কবাণী হিসেবে কর্তৃপক্ষ লিখে রেখেছে, পঁচিশজনের বেশি পর্যটকের একসাথে ব্রিজে ওঠা নিষেধ। নিষেধ মানছে না কেউ। বৈশাখের প্রচণ্ড খরতাপ অপেক্ষা করে শ শ পর্যটক দেখছে, দেশের একমাত্র ঝুলন্ত ব্রিজ। আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক এখান থেকে যন্ত্রচালিত নৌকায় সুবলং হয়ে বৌদ্ধবিহার ও রাজবাড়ী দর্শন। দুইজন বহনযোগ্য নৌকা না থাকায় ছয় আসনবিশিষ্ট নৌকা ভাড়া করতে হলো। নৌকায় ওঠার পূর্ব মুহূর্তে পরিচয় হলো ইশ্বরদির মুকুল সাহেবের সঙ্গে। দুই সন্তানের জনক মুকুল চট্টগ্রামে ব্যবসা করেন। তার পত্নী মিসেস জাহেদা খানম চট্টগ্রামের এক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ছেলে রাফি টুঙ্গির আইইউটিতে পড়ে। মেয়ে রাহা জয়পুরহাট মহিলা ক্যাডেট কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। অল্পক্ষণেই মুকুলের সাহেবের পরিবার বেশ কাছে চলে এলো। মুকুল সাহেব বললেন, বাচ্চাদের ইচ্ছে তারা সুবলং যাবে। নৌকাপথে বেশ দূরের পথ। আপনারা যদি আপনাদের সাথে যেতে প্রস্তাব করেন তাহলে প্রচ্ছন্ন চিত্তে সে প্রস্তাব গ্রহণ করব। বললাম কেন নয়, অবশ্যই প্রস্তাব করব। চলুন এক সাথেই বেড়িয়ে আসি। এরই মাঝে এগিয়ে এলো বরগুনার রফিক সাহেব। পাঁচ ও তিন বছরের দু'মেয়ে, পত্নী নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। তিনি ও নৌকায় সহযাত্রী হতে আগ্রহী হলেন। আমরা আনন্দচিত্তেই রাজি হয়ে গেলাম। চট্টগ্রাম থেকে বের হওয়া এক পত্রিকার দু'যুব সাংবাদিক এসে বলল, আমাদেরও সুবলং, বৌদ্ধবিহার দেখার খুব ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দুজনেরই প্রথম সফর। সব কিছু অচেনা, অজানা। শুধু এ কারণেই আপনাদের সহযাত্রী হতে ইচ্ছুক। জানিনে আপনারা সহযাত্রী হিসেবে আমাদের গ্রহণ করবেন কিনা। সাংবাদিক না হলেও পত্রিকার সাথে আমার গাঁটছড়া অনেক দিনের। আনন্দ চিত্তেই বললাম, নো প্রবলেম, তোমরাও আমাদের সাথে যাচ্ছ। বিজয়কে বললাম, তুই ওনাদের সাথে গল্প কর, আমি দশ আসনবিশিষ্ট নৌকার ব্যবস্থা করে আসি। দশজনের লটবহর নিয়ে নৌকা সুবলং-এর পথে চলতে শুরু করল। হাসি-গল্পে মশগুল হলেও সবার দৃষ্টি বাইরে। আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার নীল আকাশ। আকাশের নীল পানিতে মিশে গেছে। শান্ত নীল পানি কেটে কেটে নৌকা চলছে। ছবি তোলার ধুম পড়ল। মুকুল সাহেবের পরিবারই এদিক থেকে এগিয়ে। মিষ্টি মেয়ে রাহার ক্যামেরার হাত দারুণ। বাবা, মা, ভাইয়ের ছবি তুলতে সে, যে রকম অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করল, তা দেখে আমি বিমোহিত হলাম। আমার মনে হলো, চেষ্টা করলে ফটো শিল্পী হিসেবে রাহার নামডাক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে সময় নেবে না। রাহাকে বললাম, মুকুল সাহেব তোমার বাবা এটা আমার মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

-কেন আঙ্কেল, বলল রাহা।

-তোমার বাবার প্রত্যাশা, তুমি ডাক্তার হও। আমার ধারণা তুমি ফটোগ্রাফিতে আরো ভালো করবে। আমার মেয়ে হলে এ পথেই তোমাকে উৎসাহিত করতাম। পাশ থেকে মুকুল সাহেব বললেন, জো হুকুম জাহাপনা- দিয়ে দিলাম রাহাকে।

-আপনি বললেই তো হবে না। ভাবিজি রাজি হবে কিনা। অবশ্য রাজি হওয়ারই কথা -অঙ্গ সৌষ্ঠবে আমি বেটার। হাসির রোল পড়ল।

যতটা ভালো লাগার কথা সুবলং, ততটা ভালো লাগল না। তবে ঘন নীল শান্ত পানির ওপর দিয়ে নৌকা ভ্রমণ খারাপ হলো না। একটা বিষয় ভেবে খারাপ লাগল, কোথাও এতটুকু জায়গা দেখলাম না, যেখানে ফসল ফলানো যায়। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দূর থেকে মনে হলো স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িঘরগুলো পানিতে ভাসছে। বৌদ্ধবিহারের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল, বিশাল জলাভূমির মাঝে বেশ কটা মোটা মোটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাথাবিহীন মৃত গাছগুলোর বয়স শ'য়ের ওপরে হবে, এমনই ধারণা করল সবাই। নৌকার চালককে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো দেখতে একটা বাড়ির মতো। এটা কার বাড়ি ছিল? চালক বলল, চাকমা রাজার। কাপ্তাইয়ের বাঁধ দেয়ার সময়ই বাড়িটি ডুবে যায়।

আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল। আমি ধলেশ্বরী পাড়ের মানুষ। একাধিক বার বাড়ি ভেঙে গেছে। সেই কষ্টের কথা মনে হলো। নদীভাঙা প্রাকৃতিক ব্যাপার। মেনে নিতে হয়। সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে বিদ্যুতের প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনে ডুবে গেছে হাজার হাজার বাড়ি। বাদ যায়নি রাজবাড়ীও। শুধু বাড়ি-ঘর নয়, স্থায়ীভাবে ডুবে গেছে আদিবাসীদের চাষাবাসের জমি। বাঙালিদের প্রতি কেন আদিবাসীরা বিরূপ কিছুটা হলেও অনুধাবন করলাম।

বৌদ্ধবিহারের ঘাটে নৌকা বাঁধা পড়ল। মিসেস জাহিদা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে তার পিত্তথলিতে পাথরজনিত একটা অপারেশন হয়েছে। ভদ্র মহিলার পক্ষে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। মুকুল সাহেব বলল, সালেহ ভাই রাহা এখন আপনার মেয়ে। মেয়েকে সবকিছু দেখানোর দায়িত্ব আপনার। বললাম, বুকভরা আনন্দ নিয়েই রাহার দায়িত্ব নিলাম। রাজবাড়ীর চত্বরে প্রবেশ করতেই রাহা বলল, আঙ্কেল এখানে আশপাশে বাড়িঘর নেই? বললাম কেন? রাহা বলল, আমার খুব প্রয়োজন। প্রয়োজনটা কী বুঝতে দেরি হলো না। বললাম নো প্রবলেম ব্যবস্থা করছি। বৌদ্ধবিহারের মূল ভবনের নিচ তলায় বেশ ক'টা কক্ষে পর্দা ঝুলছে। দরজায় নক করায় একজন ভানতে বেরিয়ে এলো। বললাম আমার মেয়েটার বাথরুমের প্রয়োজন। দয়া করে যদি বলেন, এখানে বাথরুম কোথায়, তো কৃতার্থ হই। ভানতের কথায় আমি শিউরে উঠলাম। ভানতে বললেন, আপনার মেয়ের বাথরুম লেগেছে, তাতে আমার কী। খুঁজে দেখুন। অবাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হলো। একটা বাচ্চা মেয়ের বাথরুম লেগেছে, এটা একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কাছে কোনো ব্যাপারই না! আমি পাশের রুমে গিয়ে নক করলাম। অন্য একজন ভানতে বেরিয়ে এসে একই রকম ব্যবহার করল। বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ

পুরহিতগণের বিষয়ে এতদিন যা জেনে এসেছি, এক মুহূর্তে তা নীল আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি রাহার দিকে তাকালাম। রাহার সুন্দর মুখটি কালো হয়ে গেছে। ভেতরে অস্থিরতা টের পেলাম। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখলাম, সাধারণ এক বাঙালি যাচ্ছে সে পথে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল, ওখানে যান। রাফিকে বললাম, রাহাকে ওখানে নিয়ে যাও। আমি এখানে দাঁড়াই। ভয় পেও না। রাহা, রাফি চলে গেল। আমি ভাবলাম, এখানকার মানুষগুলো এত নির্মমতা দেখাল কেন। 'অহিংসা পরম ধর্ম' মহামতি গৌতম বুদ্ধের এ অমোঘ বাণী যারা প্রচার করেন, তাদের ভেতরটা তো সাগরের মতো বিশাল হওয়া উচিত। কোথায় সেই বিশালতা! বৌদ্ধমন্দির দেখার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটল। এখানে কী ঘটল, সে ভাবনায় নয়, কী ঘটতে চলেছে, সেই ভাবনায় আমাকে পেয়ে বসল। রাহা রাফি ফিরে এলো। আঙ্কেল চলুন মন্দিরে যাই। আমার মনোভাব জানাতেই রাহা বলল, তাহলে তো আমাদেরও যাওয়া হবে না। এত দূর থেকে এলাম। ছোট্ট মেয়েটির মনোভাব বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো।

বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠে কিছুটা চমকে গেলাম। খুবই সাজানো গোছানো ঝকঝকে, তকতকে। নির্মাণশৈলীও অপূর্ব। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে যায়। বাঙালিদের তুলনায় আদিবাসীদের পদচারণা অনেক বেশি। দু'দিন আগে এখানে সাগাই উৎসব হয়ে গেছে তা বোঝার উপায় নেই। কালকে হজরত বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারের স্মৃতি সামনে এসে দাঁড়াল। অসম্ভব অগোছালো। রাঙামাটির বৌদ্ধবিহার তার পুরো উল্টো।

আমরা ধর্ম ভালোবাসি, এটা যতটা প্রচার করি, ততটা কাজে-কর্মে প্রমাণ রাখি না। বৌদ্ধমন্দিরে এসে এমনই মনে হলো। নতুন গন্তব্যের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। নতুন গন্তব্য রাজবাড়ী। নৌকা থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে বেশ ওপরে উঠতে হলো। দুপুরে খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত ভাবটা স্পষ্ট অনুভব হলো। ক্লান্তিটা আরো বেড়ে গেল, যখন দেখলাম রাজবাড়ীর কোনো অস্তিত্ব নেই। জানলাম ক'মাস আগে পুরো বাড়িটাই পুড়ে গেছে। কিছু সংখ্যক গাছপালা বলছে এখানে রাজবাড়ি ছিল। সামনে ছোট একটা খেলার মাঠ। সে মাঠে ক্রিকেট খেলছিল বিশজনের মতো আদিবাসী কিশোর। বাসে এবং রাঙামাটির অন্যান্য জায়গায় যেমন আদিবাসী দেখেছি, তাদের চেয়ে এদের অনেক উচ্চবংশীয় বলে মনে হলো। ইচ্ছে হলো কিশোরদের সাথে কথা বলার। আমার ইচ্ছের ঘুড়ি হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় মাটিতে পড়ে গেল। কিশোররা আমাকে পাত্তাই দিল না। ওদের মুখচ্ছবি দেখে আমি বৃটিশ শাসনামলে ফিরে গেলাম। শুনেছি সে সময় উচ্চ জাতের হিন্দুরা মুসলমানদের দেখে নাক সিঁটকা তো। সেই দৃশ্যচিত্র এ কিশোরদের চোখে-মুখে দেখতে পেলাম। নৌকায় ফিরে এ নিয়ে কথা হলো। মুকুল সাহেব বললেন, আগত সময় আমাদের জন্য কী বার্তা বয়ে আনবে, আমরা কেউ জানিনে। রফিক সাহেব কিছু বললেন না। যুবক সাংবাদিক দু'জন বলল, কঠিন সময় আগত। বিজয় বলল, আমার মাথাব্যথা নেই। আমিতো আমেরিকান। নিজেদের নিরাপদ রাখতে অন্যদেশের সব কিছু ভেঙে চুরমার করাই আমাদের কাজ।

সন্ধ্যা সমাগত। পেটে চু চু ব্যাথা টের পেলাম। মনে হলো দুপুরে খাওয়া হয়নি। সবাই মিলে বসে গেলাম একটা হোটেলে। রাঙামাটি থেকে বিদায়ের পালা। কাউকে বিদায় জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বিশেষ করে মুকুল সাহেবে পরিবারকে। বিদায় নিয়ে সামনে পা ফেলতেই নতুন কথার সূত্র ধরে আবার কথা হয়। কথা শেষে বিদায়, আবার কথা। এভাবে অনেকটা সময় কাটানোর পরে রিকশায় বসে গেলাম। একবারের জন্যও পেছন ফেরা হলো না। বাস যখন ছাড়ল তখন পশ্চিম আকাশের লাল আভাও মিলিয়ে যাওয়ার পথে। এক সময়

রাঙামাটি শহরও দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেই সব কিছু আড়াল হয় না। এতদিন পরও মনে হচ্ছে মুকুল সাহেব, মিসেস মুকুল, রাহা, রাফি, রফিক সাহেব দৃষ্টির সামনেই আছে।

ভ্রমণের তৃতীয় দিন সকাল ১১টায় বান্দরবান এলাম। চিটাগং-কক্সবাজার সড়ক থেকে বান্দরবান রোডে যেতেই মনটা অন্যরকম হতে থাকল। রাস্তার পাশে মাইল স্ট্যান্ডে লেখা বান্দরবান ২২ কিলোমিটার। কিন্তু যতই যাচ্ছি সমতল ভূমি পিছু ছাড়ছে না। হতাশ হতে থাকি। এ তো আমার নিজের গাঁ বলেই মনে হলো। রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘরের সাথে আমার গাঁয়ের বাড়িঘরের কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। দু'পাশে পাহাড়, আঁকাবাঁকা রাস্তা। কখনো উঁচুতে উঠছি, আবার নামছি। কখনো পিঠ সিটের সাথে মিশে যাবে। কখনো মাথা ঝুঁকে পড়বে সামনে। এমন প্রত্যাশা আলোর মুখ দেখতে না পাওয়ায় হতাশা কাজ করছে বুঝতে পারলাম। অবশেষে হতাশা কাটতে থাকল। হতাশা কাটতে সময় নিল ত্রিশ মিনিট। আমার জন্মভূমি এতটা রূপসী এই প্রথম দেখলাম। আমি উল্লসিত হলাম। উল্লাস করতে করতেই বান্দরবানে পা রাখলাম। বিজয়কে দেখলাম। ও আমার চেয়েও বেশি উল্লসিত। আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে আমেরিকাকে গুড বাই বলে বান্দরবানে বাড়ি করি। বললাম, আমারও এমন ইচ্ছে হচ্ছে। রাঙামাটির চেয়ে বান্দরবান আমার বেশি ভালো লাগল। মেঘালয়ের বাঘমারা জেলা শহরে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। পাহাড়ের উপরে বাঘমারা জেলা শহর। বাঘমারা দেখে আমার মনে হয়েছিল, এমন একটা শহর যদি আমার দেশে থাকত। তাহলে ওই শহরে স্থায়ীনিবাস গড়ে তুলতাম। পাহাড়ের চূড়ায় বসে গল্প লিখতাম। এখানে এসে আমার কেবলই মনে হতে থাকল, বাঘমারার মতো উন্নত স্থাপনা এখানে নেই। তবুও বাঘমারার চেয়ে বান্দরবান অধিক সুন্দর অধিক আকর্ষণীয়।

একটা হোটেলে চা খেয়ে রওনা হলাম। বিজয় বলেছে, প্রথমে শঙ্খ নদী, তারপর স্বর্ণ মন্দির দেখে যাব শৈল প্রপাতে। সেখান থেকে নীলগিরি নীলাচলে। সময়ের অভাবে চিম্বুক দেখার ইচ্ছে বাদ দিতে হলো। যাওয়ার রাস্তা না থাকায় দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় কেওকারাডং কে দর্শন তালিকা থেকে পূর্বেই কেটে দিয়েছি।

শঙ্খ নদীর দু'ধার দেখে আমরা বিমোহিত। আমার মনে হতে থাকল, আমি শঙ্খ নদীর দু'তীর দেখছিনে। যেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হতাশও হলাম। শঙ্খ নদীতে পানি নেই। আমার ধারণা ছিল, পাহাড়ি নদী। সারা বছরই স্রোতের কলকল শব্দে কোলাহলমুখর থাকে শঙ্খ। আমার ধারণা মিথ্যে হলো। কিছুটা হতাশ হৃদয়ে ছুটলাম গোল্ডেন ট্যাম্পল দেখতে।

শঙ্খ নদীর পাড় ছেড়ে রাস্তয় উঠতেই স্বর্ণ মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিতে এলো। বৈশাখের প্রখর রোদে দূর থেকে মনে হলো বিশাল আকারের এক টুকরা স্বর্ণ-

ঝলমল করছে। সোনালি আলোকছটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যতই সামনে যাচ্ছিলাম স্বর্ণ মন্দিরের রূপ ততই আমাদের বিমোহিত করছিল। মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছানো মাত্রই বিজয় বলে উঠল, ওয়াও। এত সুন্দর, জমকালো মন্দির আমি নেপালেও দেখিনি। মাঝারি উচ্চতার একটি পাহাড়ের ওপর তৈরি করা হয়েছে মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে মাঝামাঝি যেতেই দেখলাম, বেশ ক'জন আদিবাসী কিশোরী নেমে আসছে। তাদের চোখে মুখে আনন্দ খেলা করছে। এত খুশির কারণ কী, জিজ্ঞেস করতেই কোরাসের মতো সবাই সাগাই উৎসবের কথা বলল। বললাম, তোমাদের একটা ছবি নেয়া যাবে। এক কিশোরী বলল, ছবি তুলতে হলে আমাদের টাকা দিতে হবে। টাকা দেয়ার কথা বলেই সবাই একসাথে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে একজন বলল, না বাবা টাকার দরকার নেই। বরং ছবি তোলার শর্ত হলো, আপনাদের গায়ে পানি ছিটানোর সুযোগ দিতে হবে। আমি রাজি হয়ে বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। তবে ছবি তোলার বিনিময়ে নয়। তোমাদের ছিটানো পানিতে ভিজে আমি তোমাদের আনন্দ অনুষ্ঠানের একজন হতে চাই। আমার কথা শেষ হলো না। তার আগেই সবার হাতে থাকা বোতল থেকে মুশলধারে বৃষ্টি হতে থাকল। দুজনই ভিজে গেলাম। ভিজতে থাকা অবস্থায় কিশোরীদের দেখলাম। মহাআনন্দে তাদের চোখ-মুখ হাসছে। চমকিত হলাম। ভাবলাম, ছোট ছোট দেহ মনে এত আনন্দ রাখে কোথায়! আমাদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাউকে দেখিনি, আনন্দরসে এমন সিক্ত হতে। আমার ছবি তোলা হলো না। পানি শেষ হতেই সবাই দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকল। সেলুলয়েডের ফিতেয় কিশোরীদের আনন্দবিগলিত মুখের ছবি বন্দি করা হলো না ঠিক। তবে বুকের ভেতরে স্থায়ীভাবেই ওই হাসিমাখা মুখগুলো ঠাঁই করে নিয়েছে।

স্বর্ণ মন্দিরের স্থাপত্যকলা দেখে বিজয় বিগলিত কণ্ঠে বলল, সিলিকন ভ্যালিও স্বর্ণ মন্দিরের কাছে হার মানবে। ছুঁয়ে দেখার প্রবল ইচ্ছে জাগ্রত হলো। দশ টাকার টিকিট নিয়ে গেট পেরোতে হবে। টিকিট নিয়ে বসে আছেন এক ভানতে। গেরুয়া পোশাক পরা ভানতের বয়স পঁচিশের বেশি নয়। তরতাজা যুবক। বললাম, ইয়ংম্যান মন্দির ছুঁতে চাই। আমার ইচ্ছের বাস্তবায়নের দিকে তিনি গেলেন না। বললেন, আপনার দৃষ্টিতে আমি ইয়ংম্যান ঠিকই। তবে আমরা ধর্মীয় ব্যক্তি। যেমন আপনাদের মওলানা। তাই আমাদের ভানতে সম্বোধন করাই উত্তম। আমি মোহিত হলাম ভানতের বিনয় মাখানো কথায়। কালকে রাঙামাটিতে ভানতেগণের যেরূপ আমি দেখেছি। এ ভানতের সাথে তাদের মিলাতে পারলাম না। মানসিক ব্যবধান অনেক। বললাম, তা ঠিক। তবে আপনার বয়সটা এতই কম যে, ভানতে শব্দটা আমার মুখ দিয়ে আসছিল না। আমার কথায় কিছু না বলে মৃদু হাসলেন। হাসিও অপূর্ব। নাম জেনে নিলাম-অরুণ সেন। ভানতে অরুণ বলল, দশ টাকা লাগবে মাথাপিছু। দূর থেকে যে স্বর্ণ টুকরাটা দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম। সেই স্বর্ণ টুকরাটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম। ভালো লাগায় দেহ-মন কেঁপে ওঠে প্রথমবারের মতো টের পেলাম। রাঙামাটিতে যে বৌদ্ধমূর্তি দেখেছিলাম, স্বর্ণ মন্দিরের বৌদ্ধমূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। গ্লাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ মূর্তিগুলো আরো জীবন্ত। আরো উজ্জ্বল। ভানতে অরুণ সেনকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম। প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হলো। বেশ কয়েকজনকে দেখলাম তেঁতুল বিক্রি করছে। পাশে ছোট একটা হোটেলের ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললাম আমাদের এক জাগ তেঁতুলের শরবত করে দাও। তেঁতুলের শরবত খেলাম। এক কথায় অপূর্ব। পান করার সাথে সাথেই সব অবসন্নতা কেটে গেল। মনে হলো প্রশান্তিময় ঘুম থেকে ওঠা হলো মাত্রই।

এবারের গন্তব্য শৈলপ্রপাত। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে সাজিয়েছে বান্দরবান। শহর ছেড়ে যতই অগ্রসর হচ্ছিলাম, নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্র দেখে আমাদের ভেতরে ততই আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। উঁচু-নিচু সর্পিল রাস্তায় ছুটে চলতে দৃষ্টি ঝাপসা হচ্ছিল। শরীর দুলছিল। সিএনজি ঘুরছিল একদিকে। শরীর ঘুরছিল উল্টোদিকে। বিচিত্র পথের এ বৈচিত্র্যতার স্বাদ শেষ হলো যখন শৈলপ্রপাত দেখলাম। কোথায় প্রপাত? নিচে ক্ষীণ ধারার জলস্রোত। ছোট ধরনের বৃষ্টি হলেও এর চেয়ে অধিক স্রোত দেখা যায় যত্রতত্র। রাস্তার উভয় পাশে আদিবাসী মহিলাদের পরিচালিত বার্মিজ কাপড়ের দোকান। সেখানে ক্রেতাদের জটলা। জটলা বলা এ অর্থে তারা কেনাকাটার চেয়ে আদিবাসী মেয়েদের ছবি তুলতেই আগ্রহী বলে প্রতীয়মান হলো। আদিবাসী মেয়েদের ছবি তোলায় কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। মুখে কিছু না বললেও কেউ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, কেউ বা পেছন ফিরে প্রতিবাদ করছে। ছবি তোলার সন্ত্রাস বলেই আমার মনে হলো। আমার ভালো লাগল না। শৈলপ্রপাত সম্পর্কে বিজয় মন্তব্য করল, এটা পর্যটকদের সাথে বিশাল একটা ধাপ্পা। রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। কিছুটা ভেতরে যেতেই এক আদিবাসী যুবকের সাক্ষাৎ পেলাম। কথা বলার ইচ্ছে হলো। কয়টা কথা বলার পর মনে হলো, বাঙালির প্রতি তার ক্ষোভের অন্ত নেই। কারণ জিজ্ঞেস করায় যা শুনলাম, তাতে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। যুবক বলল, আমাদের মেয়েদের ছবি তুলতে আপনাদের আগ্রহের শেষ নেই। একবার লক্ষ্য করেছেন তাদের পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। গাল ঢুকে গেছে চোয়ালের ভেতর। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি আপনার চোখে পড়েছে, যেখানে আমাদের বাচ্চারা পড়তে পারে? আমাদের বুকের ওপর আপনারা বসে গেছেন। বাপ দাদার জমিগুলো আমাদের নেই। এসব কেন হচ্ছে, বলতে পারেন? আরো কিছু কথা বলল। সেসব কথার প্রেক্ষিতে বললাম, একজন বাংলাদেশি এভাবে কথা বলে না। কিংবা একজন সুনাগরিকের ভাষা এমন নয়। জবাবে যুবক বলল, সন্ত্রাসী বলবেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলবেন, বলুন। নেলসন ম্যান্ডেলাকেও আমেরিকানরা সন্ত্রাসী বলেছে। শেখ মুজিবকেও পাকিস্তানিরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ত্রাসী বলা হয়েছে। যুবকের কথায় আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। কিছুটা ভয়ও পেলাম। আর কিছু বলার সাহস হলো না। ফিরে এলাম শৈলপ্রপাতের আঙিনায়। ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। বিদেশিদের আনাগোনা বেড়েছে। সৈয়দ মোহম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক বলেছেন, পনের বছর পর পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের অংশ থাকবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। ভাবলাম সৈয়দ মোহম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীকের কথা অমূলক নয়। বাংলাদেশের তৃতীয় উচ্চতম পাহাড় নীলাচলে উঠতে উঠতেও ওই যুবকের কথাগুলো বুকের ভেতরে আঘাত করছিল।

মই বেয়ে ওপরে ওঠার মতো পথ দিয়ে যখন ওপরে উঠছিলাম, তখন পিঠ লেগে যাচ্ছিল সিটের পেছনে। ড্রাইভারের কথা কানে এলো, স্যার নিচে তাকাবেন না। ভয় পাবেন। বললাম, আমি সাহসী নই। তার অর্থ এই নয় যে, দু'হাজারফিট ওপর থেকে নিচে তাকালে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। আমি নিচে তাকাতে থাকি বারবার। প্রতিক্ষণেই মনে হচ্ছিল নিচের ছোট ছোট পাহাড়গুলো আরো ছোট হচ্ছে। দূরে চলে যাচ্ছে। আকাশ চলে আসছে মাথার ওপরে। অবশেষে নীলাচলে পা রাখলাম। নীলাচলের শীর্ষদেশে পা রেখেই আমার মনে হলো, আমার জন্য সব চমক অপেক্ষা করছিল এখানে। ড্রাইভারের কথায় নীলাচলই দেশের সর্বোচ্চ পাহাড়। নীলাচলের ওপর পা রাখা মাত্রই আমার মনে হলো, কেবলই মনে হতে থাকল, আকাশছোঁয়া হাওয়ায় আমি সিক্ত হচ্ছি। অবাক বিস্ময়ে চারদিক তাকাতেই আমার আনন্দসব উপচে পড়তে থাকল। ড্রাইভার পেছন থেকে বলল, স্যার আপনাদের কপাল খারাপ।

-কেন?

-আকাশে কালোমেঘ নেই। তাহলে পরনের কাপড় ভিজে যেত। ড্রাইভারের কথায় ভেতরে দুঃখবোধ অনুভব করলাম। বৃষ্টিতে ভেজা আমার চিরদিনের অভ্যেস। উড়ন্ত মেঘে ভেজা হতো নতুন অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলাম। নীলগিরি থেকে দেখলাম চারদিক। দৃষ্টির শেষ সীমানায় আকাশ ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না। ছোট ছোট অনেক বাচ্চা নিয়ে যেমন মা কুকুর বিড়াল ঘুরে বেড়ায়, আমার মনে হলো ঠিক তেমন করে নীলগিরি নীলাচল অনেক বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীলাচল ও আমাদের নিয়ে ঘুরছে মহাশূন্যে। চোখ ধাঁধানো সব দৃশ্য দেখে দেহমনে অবারিত শান্তি নেমে এলো। পর্যটন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলাম। তারা নীলাচলের শীর্ষ দেশে ছোট একটা রেস্ট হাউস নির্মাণ ছাড়াও বাচ্চাদের কিছু খেলার রাইড তৈরি করেছে। সেখানে অনেক বাচ্চারা মনের আনন্দে খেলা করছে। তাদের চোখ হাসছে, ঠোঁট হাসছে। আমার মনে হলো তাদের হাসির সঙ্গে পুরো ধরাই হাসছে। ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু ফিরলাম। কারণ কালকের গন্তব্য কক্সবাজার।

কক্সবাজার যখন এলাম, তখন এগারটা বেজে গেছে। পর্যটন শহর কক্সবাজার। শহরটা সুন্দর

বলে পর্যটন শহর নয়, সূর্যডোবা দেখা যায় এ কারণেই কক্সবাজার পর্যটন শহর। শুধু সূর্যডোবা দেখতেই হাজারো পর্যটকের ভিড় এখানে প্রতিদিন। আমি আর বিজয়েরও কক্সবাজারের পর্যটক হওয়ার কারণ দুটো। সূর্যডোবা দেখার সাথে দীর্ঘ সময় নিয়ে সমুদ্রস্নান। হোটেল থেকে দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলাম। বিজয় বলল, শালা তুই কিন্তু সাইনোর রোগী। বেশিক্ষণ পানিতে থাকিসনে। বললাম, সাগর বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। লোনা জলে কখনো কারো ঠাণ্ডা লেগেছে শুনেছিস! পরিকল্পনা অবস্থাতেই সূর্যডোবা দেখা। সূর্যডোবা দেখলাম। আমার মনে হলো এ তো সূর্যডোবা নয় আগুনের বিশাল এক কুণ্ডলীর সাগরে ডুবে যাওয়া। সারাদিন সাগর পাড়ে অনেক মানুষ দেখলাম। মনে হলো হোটেলের সব মানুষই সাগরপাড়ে। কিন্তু বিকাল বেলায় দেখা গেল বেলাভূমি যেন পল্টনের মাঠ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ভাবলাম এত মানুষ এলো কোথা থেকে? মজার ব্যাপার হলো সমুদ্রস্নানেও জ্যাম সৃষ্টি হলো। গায়ে গা লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। বিজয়কে বললাম তোর আমেরিকায় কি এমন দৃশ্য দেখেছিস কখনো।

-এই জন্যইতো কক্সবাজার আসা। বিজয় বলল এর পরের পালা জাহাজ ভ্রমণ। অর্থাৎ সেন্ট মার্টিনস হয়ে ছেড়াদ্বীপ।

সেন্টমার্টিনসে যেতে হলে প্রথমে যেতে হবে টেকনাফ। সেখান থেকে জাহাজে সেন্টমার্টিনস। সেন্টমার্টিনস থেকে স্পিড বোট কিংবা ট্রলারে ছেড়াদ্বীপ। টেকনাফ থেকে জাহাজ ছাড়বে সকাল ন'টায়। অতএব কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হলো। যদিও কক্সবাজারে কাকের দেখা পাইনি। কেন পাইনি! বাতাসে শুঁটকির গন্ধ অথচ কাক নেই! কেন? তবে কী কাকেরাও বুঝতে পেরেছে পর্যটন শহরে তাদের থাকা চলবে না! সকাল ৬'টায় বাসে উঠলাম। চোখে ঘুম ঘুম ভাব থাকায় কক্সবাজার- টেকনাফ পথের দুই ধারের দৃশ্যচিত্র আমার উপভোগ করা হলো না। সেন্টমার্টিনসগামী জাহাজ ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে ৮টা বেজে ২০। তার মানে জাহাজ ছাড়তে আরো চল্লিশ মিনিট। এক সহযাত্রী বলল সাড়ে ন'টার আগে কখনো জাহাজ ছাড়ে না। অর্থাৎ আমাদের হাতে অতিরিক্ত সময় আছে এক ঘণ্টার ওপরে। বিজয়কে নিয়ে হাঁটতে থাকলাম নদীর তীর ঘেঁষে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম নদীর ওই পাড়ের গ্রামের নাম কী? জবাব পেলাম ওটা বার্মার একটি গ্রাম। আমি বিস্মিত হলাম। আমি নাফ নদীর ধারে! সেই কবে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়েছি পূর্ব পাকিস্তান আর বার্মার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে নাফ নদী। সেই নাফ নদীর ধারে রয়েছি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। নাফ নদীর গাঢ় সবুজ পানি দেখে মন ভরে গেল। পা ভিজিয়ে বসলাম। পানি খুব ঠাণ্ডা। বুঝতে পারলাম সাগর খুব কাছে এ কারণে নাফের পানি সাগরের মতোই ঠাণ্ডা। চোখ পড়ল কিছুটা দূরে। দেখলাম সারি সারি অনেক মাছ ধরার ট্রলার। অনেক জেলে জাল মেরামত করছে। অনেকে জাল রোদে দিয়ে অলস সময় পার করছে। তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তেমন কথা হলো না। কারণ তারা চাটগাঁ এর আঞ্চলিক ভাষার বাইরে আসতে পারেনি। যে টুকু বুঝলাম তাতে তাদের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। নাফ মাছ শূন্য। একে তো মাছ শূন্য অপরদিকে মিয়ানমার পুলিশের অত্যাচার। টাকা ছাড়া তারা মাছ ধরতে দেয় না। আবার অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী হাতে ধরিয়ে দেয়। এ অবৈধ সামগ্রীর মাঝে পর্ণো ছবির সিডি থাকে। থাকে ইয়াবা ট্যাবলেট । মোট কথা নাফ থেকে মাছ ধরা যাদের প্রধান পেশা তারা ভালো নেই। হাতঘড়ি দেখলাম জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। সেন্টমার্টিনে যখন জাহাজের নোঙ্গর পড়ল তখন মাথার ওপর সূর্য। সেন্ট মার্টিনসের মাটিতে পা রাখার আগেই উঠে পড়লাম ছেড়াদ্বীপে যাওয়ার স্পিড বোটে। যেন সাগর থেকে সাগরে যাত্রা। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এমনই। মাত্র দশ মিনিটেই ছেড়াদ্বীপের পানির নিচে থাকা পিচ্ছিল পাথরে পা রাখতে হলো। কেন নাম হলো ছেড়াদ্বীপ এ বিষয়টা জানা ছিল না। চারদিক দেখে বুঝলাম ছেড়াদ্বীপ আসলে সেন্টমার্টিনসের অংশ। হয়তো সাগরের রহস্যময়তায় সেন্টমার্টিনসের দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে বঙ্গোপসাগর। দু'ভাগ হয়েছে সেন্টমার্টিনস। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থল ভূমির একটি অংশ নাম লিখিয়েছে ছেড়াদ্বীপ হিসেবে। এখানে উল্লেখ দুটো দ্বীপ নিয়ে ছেড়াদ্বীপ। একই ভূখণ্ডে কয়েকশ একরের ভূমিতে এক পাশে দারুচিনি দ্বীপ এবং অপর পাশে প্রবাল দ্বীপ। ছেড়াদ্বীপ এখনো স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতা অর্জন করেনি। তাহলে এখান থেকে সূর্যোদয় দেখার সুযোগ সৃষ্টি হতো।

দারুচিনি দ্বীপ ঘাস জাতীয় গাছপালায় ঢাকা। প্রবাল দ্বীপের মনকাড়া কালো প্রবাল দেখে মনপ্রাণ জুড়ানো সময়ের ব্যাপার মাত্র। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অসংখ্য পর্যটক হেঁটে বেড়াচ্ছে। কারো মুখে বিরুক্তিভাব নাই।

ছেড়াদ্বীপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সাগর থেকে কেবলই ধরে আনা চিংড়িসহ বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক মাছের ভাজি। একশ থেকে তিনশ টাকায় মজাদার এ ভাজি পর্যটকদের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। ছেড়াদ্বীপের প্রধান আকর্ষণের কথা বলেই চলে যাব সেন্ট মার্টিনসে। ছেড়াদ্বীপটা আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর সেরা বিস্ময়। এ দ্বীপের দক্ষিণ পাশে দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে বামে ডানে সামনে তিন দিকেই মহাসমুদ্র। মনে হবে মহাসোপানে দাঁড়িয়ে। এমনটা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। পৃথিবীর সব যন্ত্রণা ভোলার জায়গা ছেড়াদ্বীপের দক্ষিণ পাশের ছোট্ট একটু ভূমিখণ্ড। এমন একটা জায়গা থেকে কোনো পর্যটকেরই ফিরতে ইচ্ছে করে না। আমাদের কী করেছিল? কখ্খনো না। তবুও ফিরতে হলো।

ফিরে এলাম সেন্টমার্টিনসে বিকালে। যে বিশাল আনন্দ গায়ে মেখে ছেড়াদ্বীপ থেকে ফিরলাম তা মিলিয়ে যেতে সময় নিল মাত্র কয়েক মিনিট। অসম্ভব দরিদ্র মানুষের বসবাসের জায়গা সেন্টমার্টিনস। ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে মনে হলো এরা সবাই পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের আসমানি। পিঠের সাথে পেট লেগে যাওয়া। মানুষগুলোকে দেখে মনে হলো সবাই আসমানির বাবা রহিম উদ্দিন। রাস্তাঘাট নেই। বাড়িঘরের বেশির ভাগই পাতার ছাউনি। জনপ্রিয় কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের বাড়ি 'সমুদ্র বিলাস' এর সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছে আশপাশের পাতার ঘরের কারণে। আমার মনে হলো সেন্টমার্টিনস আসলে একটা বিশাল বস্তি। যেখানে শিক্ষা নেই চিকিৎসা নেই সুস্থ নিশ্বাস নেয়ার পরিবেশ নেই।

সেন্টমার্টিনসের মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক এমনটাও আমার মনে হলো না। একবার মনে হলো পর্যটকরা যেন তাদের সাথে তামাশা করতেই আসে। আবার মনে হলো তা হবে কেন। পর্যটকদের কারণেই মানুষগুলো বেঁচে আছে। ক্ষেত নেই খামার নেই স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা নেই। পর্যটকদের কাছে টুকটাক খাবার বিক্রি করা, ভ্যান চালানোই তাদের পেশা। মাছধরা হতে পারতো তাদের জীবন নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। হয়তো তাতে করে জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আসত। কিন্তু সাগরে মাছ ধরার মতো ট্রলার কেনা বা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মোট কথা দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জড়িত সেন্টমার্টিনসবাসী। দেশের নাগরিক হিসেবে খুব অপরাধী মনে হলো। ইচ্ছে হলো সাথে সাথেই সেন্টমার্টিনস ত্যাগ করার। কিন্তু জাহাজ তো পরদিন বিকালে। বাধ্য হয়েই রাত কাটাতে হলো সেন্টমার্টিনসে।

ভাঙা হৃদয়ে উঠতে হলো টেকনাফগামী জাহাজে। কত কথাই না মনে হতে থাকল। সেন্টমার্টিনসের অনাহারী রুগ্‌ণ মানুষগুলোর প্রতিচ্ছবি ভেতরে আঘাত করতে থাকল। এ জায়গাটার নাম শুনে অনেকে কাতর হয় দেখতে। আমিও হয়েছিলাম। আশা ভঙ্গ হলো। আমার মতো যাদের প্রত্যাশা পূরণ হলো না তারা দ্বিতীয়বার আসবে না আমি নিশ্চিত। অথচ সেন্টমার্টিনস হতে পারত বারবার ফিরে আসার মতো একটা পর্যটন কেন্দ্র। তার জন্য যা করা প্রয়োজন তা কেন করা হচ্ছে না আমার বোধগম্য হলো না।

মনে হলো পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের দিনগুলোর কথা। একটা সপ্তাহ কত দ্রুত চলে গেল। সমাজ সংসারের কথা একবারের জন্যও মনে হয়নি। সংসারের প্রয়োজন বিরক্তির সুর হয়ে শ্রবণইন্দ্রিয়ে আঘাত করেনি। উচ্ছল উচ্ছলতায় সময় ভুলে গিয়েছিলাম। অন্যভাবে সময়কে নিজের মতো করে সাজিয়েছিলাম। ইচ্ছেমতো সে সাজানো সময় ব্যবহার করেছি। আবার সময় নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার পথে ছুট ফিরতে হচ্ছে। সেখানে ফেরা মাত্রই সময় আবার প্রতারণা করতে শুরু করবে। তবুও তো ফিরতে হবে। বাঁধা পড়তে হবে সময়ের কঠিন রুটিনে।

আরো একটা কথা বারবার মনে হতে লাগল- আবার কবে হারিয়ে যাওয়ার মিশন শুরু হবে। আবার কবে কখন সময় নিজের মুঠোয় চলে আসবে?

নারী

নারী ও তার বিধাতা পুরুষ

জহিরুল হক

বিশ্বজুড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র নারী-পুরুষের মধ্যে শক্তির আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক বিরাজমান। এ সম্পর্ককে 'সম্পর্ক' না বলে বলা যায়– জেন্ডার বা লিঙ্গবৈষম্য। প্রাথমিকভাবে এ বৈষম্যের সূত্রপাত পরিবার থেকে। এ ভূভাগে একটি শিশুর জন্মের আগে থেকে পরিবারের সদস্যরা এই বৈষম্য শুরু করে। অনাগত শিশুটির জেন্ডার সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে এ বৈষম্যের সৃষ্টি। বর্তমানকালে নারীর গর্ভের সন্তানটি মেয়ে না ছেলে আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে তা বোঝার সহজ উপায় আছে। নারীর গর্ভের সন্তানটি যদি মেয়ে হয়, তাহলেও অধিকাংশ নারী অখুশি হয়! কারণ ওই নারীরা দেখেছে, সমাজে তাদের অধিকার কী! আর এ ক্ষেত্রে পুরুষ তো অখুশি হয়ই। শিক্ষিত পুরুষ মুখে হয়তো বলে– মেয়ে বা ছেলে উভয়ই সমান কিন্তু অন্তরে ধারণ করে এ কথা– 'আহ্! যদি একটি ছেলে হতো।' স্বামী কর্তৃক নারী কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো মনে মনে বিদ্বেষের শিকার হয়। পরিবারের অন্যরাও নারীর কন্যাসন্তান জন্মের সম্ভাবনাকে সুখকরভাবে নেয় না।

কন্যা সন্তানটি জন্ম নেয়ার পর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে উঠতে পরিবারের ও সমাজের অবহেলার শিকার হয়। একটি পুত্রসন্তানকে পরিবারে ও সমাজে যেভাবে জোরে কথা বলতে বা যে

কোনো সময় যে কারো সঙ্গে কথা বলতে ও যে কোনো স্থানে বেড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়, কন্যাসন্তানটিকে সেভাবে কথা বলতে কিংবা বেড়ানোর সুযোগ দেয়া হয় না। একটু বড় হলেই মা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যখন ওই পরিবারে আরেকটি সন্তান অর্থাৎ পুত্র জন্ম নেয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের আর আনন্দের শেষ থাকে না। কারণ বংশের উত্তরাধিকারী সৃষ্টি হয়ে গেল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা ছেলেদের মতো উত্তরাধিকারী হয় না। পরিবারে ছেলেটি মেয়েটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তা খাবার বেলায় হোক, জামা-কাপড় পরার বেলায় হোক, চলা-ফেরার স্বাধীনতার ব্যাপারে হোক– সবসময় ছেলেটি আগে। ছেলেটি বাইরে খেলাধুলা, নানা জায়গায় চলাফেরার মধ্য দিয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারলেও মেয়েটি পেছনে পড়ে যায়। সমাজের আর দশটি পরিবারের মেয়েদের দেখে মেয়েটি বুঝতে পারে সে মেয়ে, তার জীবন ছেলেদের মতো স্বাধীন নয়। আবার ছেলেটি বড় হলে পরিবারে ও বোনটির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে।

শৈশবে বাবা-মা মেয়েটিকে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্লীলতা-অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। বাবা-মা বা পরিবারের কোনো অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন সদস্য মেয়েটিকে বলে, 'এ মেয়ে তুমি ন্যাংটা কেন, প্যান্ট পরে এসো।' মেয়েটির প্রতি এই যে শিক্ষা তা-ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণ। প্রকৃতপক্ষে, মেয়েটিকে আরোপিত শিক্ষায় লজ্জায় ফেলে দেয়া হয়। সে বুঝতে পারে, তার শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ খারাপ, যা মানুষের মধ্যে দেখানো উচিত নয়। এভাবে বলে মেয়েটিকে ছোট করা হয়। সে ছেলেটি থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে। অথচ ছেলেটি ন্যাংটা হয়ে বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেও বাবা-মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কারো পবিত্রতা নষ্ট হয়। কিংবা কারো কাছে দৃষ্টিকটু লাগে না।

মেয়েটি যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করে, তখন প্রাথমিকভাবে অন্যদের সহায়তায় স্কুলে যায়। কিন্তু একটু বড় হয়ে যখন সে একাকী পথ চলতে শুরু করে, তখন অধিক জনসংখ্যা ও বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে রাস্তা-ঘাট, শপিং মলে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকা সমাজের আর ১০টা পরিবারের অপদার্থ ছেলেদের বা অসম্মানজনকভাবে জোরজবরদস্তি করে সব কিছু অর্জন করার মানসিকতাসম্পন্ন বখাটেদের নানা কটুক্তি ও কনুইয়ের খোঁচা বা হাতের স্পর্শ নিয়েই তাকে চলতে হয়। কোনো মেয়ে ছেলেদের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলে তাকে কটুক্তি শুনতে হয় বা নির্যাতিত হতে হয়। একটি মেয়ে যখন রাস্তায় হাঁটে তখন রাস্তার কোনো ছেলেকে কখনো কখনো দেখা যায় তার পেছনে পেছনে কিংবা সমান্তরালভাবে হাঁটতে। কোনো বিবেকবান মানুষ যদি পরীক্ষামূলভাবে একটি মেয়ের রাস্তায় চলাচলের সময় তার অবস্থাটি বোঝার জন্য কোনো ছেলে বা কোনো বয়স্ক পুরুষদের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলেই বুঝতে পারবে যে কী পরিমাণ চোখ মেয়েটির দিকে পড়ছে। এসব চোখের দৃষ্টির মধ্যে বেশি-রভাগেরই থাকে ক্ষুধা বা কোনো না কোনো অশ্লীল ইঙ্গিত। এভাবে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বা প্রাথমিক পেরিয়ে মেয়েটি যখন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে, তখন কখনো তার সহপাঠী বা কখনো কোনো তথাকথিত পণ্ডিত কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। কখনো গুরু ও শিষ্যের এই সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতির মধ্য দিয়ে হলেও প্রকৃতপক্ষে মেয়েটি নিজের অজান্তেই মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। কোনো কোনো মেয়ে ছেলেদের উত্যক্তকরণের কারণে বাধ্য হয়ে প্রেমে পড়ে নিজের নির্যাতনের পথ ত্বরান্বিত করে দেয়। প্রেমের ক্ষেত্রে নির্যাতিত মেয়েরাই বেশি হয়। কখনো কখনো ছেলেদের নির্যাতনে পড়ে মেয়েদের জীবনটাই এলোমেলো হয়ে যায়।

বাইরে চলাফেরার সময় ছেলেরা যে কোনো পোশাক পরতে পারে কিন্তু একটি বড় মেয়ে সময় ও আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিংবা বহির্বিশ্বের নারীদের অনুকরণে নতুন ডিজাইনের কোনো পোশাক পরলেই ছেলেদের দ্বারা নানা কটুক্তির শিকার হয়। কখনো কখনো এমনও দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবী নামধারী কলাম লেখকেরা দ্বিতীয় লিঙ্গকে কালো কাপড়ে বন্দি করতে ইচ্ছুক শাস্ত্রান্ধদের মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেয়েদের পোশাক নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। কে কী পরবে, সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; অথচ তারা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে মেয়েদের পোশাক পরা সম্পর্কে উপদেশ দিলেও বর্তমান কালে ছেলেদের পশ্চাৎভাগের কাপড় যে নিচে ঝুলে থাকে সেদিকে চোখ পড়লেও ছেলেরা পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি বলে স্বজাতির গ্লানি লুকিয়ে রেখে কোনো কথা বলেন না।

নারীর প্রতি যৌনতার নীরব সন্ত্রাস শুরু হয় বিয়ের আগে থেকে। বিয়েতে সুন্দর ও অসুন্দর মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সুন্দরীকে নিয়ে সমাজের শক্তিমান পুরুষেরা টানাটানি করলেও অসুন্দরী বৈষম্যের শিকার হয়। বিয়েতে যৌতুকও একটি অপমানজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যৌতুক একটি মারাত্মক জেন্ডার বৈষম্য। যার মাধ্যমে নারীকে ছোটো করা হয়। স্কুলে বা কলেজে পড়াকালীন মেয়েদের বিয়ে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পুরোপুরিই স্বাধীনতা হারিয়ে ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়। তা শুধু স্কুল বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় নয়, লেখাপড়ার পরেও যখন বিয়ে হয়, তখন থেকেই মেয়েটি পুরোপুরি স্বাধীনতা হারায়। বাবার বাড়িতে মেয়েটি যে স্বাধীনতা নিয়ে উচ্ছল-উজ্জ্বল তরুণী হিসেবে বেড়ে উঠেছিল, সেই স্বাধীনতা আর তার থাকে না। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি তার ওপরে নানা রকম কর্তৃত্ব ফলাতে থাকে। বিয়ের পরে ছেলেদের নিজস্ব পরিবেশ বজায় থাকলেও মেয়েরা এক ধরনের বন্দি জীবন নিয়ে শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা বাবা-মায়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় অন্য ঠিকানায়! এ যে কত বড় ত্যাগ তা ভাষায়ই প্রকাশ করা যায় না! অপরিচিত পরিবেশে অধিকাংশ মেয়েই বিড়ম্বনা ও অসহায়ত্বের শিকার হয়!

বিবাহিত জীবনে ছেলেরা একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করলেও স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক টিকে থাকে। তেমন কোনো লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় না। কিন্তু কোনো বিবাহিত নারী কোনো ছেলে বা পরপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা তো দূরে থাক, চাকরি স্থলের কোনো সহকর্মীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেও নানা সন্দেহ থেকে কখনোবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। ছেলেরা একাধিক মেয়ের সঙ্গে যৌনতা করেও পবিত্র থেকে থাকে। অথচ নারীর চরিত্র ছেলেদের কাছে অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আর এ কথায় কোনো স্বামী নামধারী পুরুষ দ্বিমত পোষণ করলেও বলতে হয়, মানুষ অনবরত কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাঁচতে পারে না। সংসার জীবনের আনন্দ ও বেদনার ঘানি টানতে টানতে প্রত্যেককেই ডানে-বামে একটু শ্বাস-নিঃশ্বাস ফেলতে কিংবা তাকাতেই হয়। পুরুষকে সন্দেহ করে নারী কিছুই করতে পারে না, কিন্তু নারীর এই ডানে-বামে তাকানোকে কোনো পুরুষই সুখকরভাবে নেয় না।

নারী-পুরুষের নামকরণের ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রীর নামের শেষে স্বামী নিজের নামটি লাগিয়ে দেয়। আর এ নিয়ে স্বামীরই আগ্রহ থাকে বেশি। বাবা কর্তৃক দেয়া নাম অধিকাংশ স্বামীই রাখে না। যেমন কারো বাবার দেয়া নাম যদি থাকে সাবরিনা হক, আর স্বামীর নাম যদি থাকে জাকির হোসেন, তখন স্বামী তার নামটি স্ত্রীর নামের শেষে যোগ করে দিয়ে করে সাবরিনা হোসেন। এটা নারীকে আটকানোর একটা পুরুষতান্ত্রিক হীন মানসিকতা। যা নারীরা সংসার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মেনে নেয়। তাছাড়া আমাদের দেশে এই সেদিনও কোনো মানুষের নাগরিকত্ব সনদ নিতে গেলে, পার্সপোর্ট করতে গেলে, পরীক্ষা কিংবা চাকরির দরখাস্ত দিতে গেলে শুধু বাবার নাম লিখতে হতো, মায়ের নাম লেখার প্রয়োজন পড়ত না। এটা একটি অমানবিক পুরুষতান্ত্রিক ব্যাপার ছিল। বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাবার নামের পরে মায়ের নাম লেখা হয়। আবার বাবা-রা যখন মেয়ের নাম রাখে, তখন মেয়ের নামকরণের ক্ষেত্রে মায়ের চেয়ে বাবার কর্তৃত্বই বেশি প্রকাশ পায়। বাবা নিজের নামের অংশজুড়ে দেয় মেয়ের নামের সঙ্গে। কিন্তু সন্তানের নামের সঙ্গে থাকা উচিত মা-বাবা দুজনের নাম। যেমন– সাবরিনা জাকিয়া হক 'মিতা'। এখানে 'সাবরিনা জাকিয়া হক' মেয়েটির প্রকৃত নাম, 'সাবরিনা' তার নিজের অংশ, 'জাকিয়া' মা, আর 'হক' বাবা, 'মিতা' মেয়েটির

ডাক নাম। কিংবা এমনও হতে পারে নামকরণের ক্ষেত্রে বাবা-মা কারো নামই থাকবে না। মেয়েটি শুধু স্বাধীনভাবে তার নিজের নামেই পরিচিত হবে। তার যোগ্যতা দিয়ে সম্মানজনক কোনো কাজের মাধ্যমে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে জায়গা করে নেবে।

বিবাহিত নারীর চাকরি করেও স্বাধীন সত্তা থাকে না। কখনো কখনো চাকরিজীবী স্ত্রীদের বেতন স্বামীরা নিয়ে নেয়। প্রয়োজনে স্বামীর কাছ থেকে এনেই স্ত্রীকে খরচ করতে হয়। তবে কেউ কেউ বলে, তারা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এক হাত দিয়েই সংসারের খরচ চালায়। এটা কতটা যৌক্তিক তা অবশ্য বিচার্য বিষয়। তবে এক হাত দিয়ে খরচ করার প্রস্তাব স্ত্রীকে তো স্বামীই দিয়ে থাকে। তাছাড়া চাকরি স্থলও মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। সেখানেও তারা কোনো সহকর্মী বা চাকরিদাতার নানা রকমের বৈষম্য-বঞ্চনা বা অন্যায় আচরণের শিকার হয়।

চাকরি স্থলের মতো পরিবারেও বাবার মৃত্যুর পরে বিবাহিত মেয়েরা ভাইদের বঞ্চনার শিকার হয়। কখনো কখনো ভাইয়েরা বোনদের সম্পত্তি বিনামূল্যে দলিল করে নিয়ে নেয়। আবার কখনো বোন ভাইদের কাছে স্বল্প মূল্যে জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ভাইদের কাছে বিবাহিত মেয়েদের বাবার সম্পত্তি চাওয়া যেন অপরাধের ব্যাপার। এমন কি কখনো কখনো ভাইয়েরা বিধবা বোনকে এ কথা বলে থাকে, 'তোমার আবার সম্পত্তির দরকার কী, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক।' কখনো কখনো বোন অন্ধ হলেও তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। আবার অসুস্থ বোনকে চিকিৎসা করিয়ে বোনের কাছ থেকে ভাই সম্পত্তি লিখে নেয়। আর বোন যদি মৃত্যুবরণ করে, তখন ওই ভাই বলে বেড়ায়, বোন তাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছে। বাবার বাড়ি থেকে সম্পত্তির অংশ না আনতে পারলে নারীরা কখনো কখনো স্বামীদের কাছে নির্যাতনের শিকার হয়। বিয়ের পরে বিয়ের আগের প্রেমিক পুরুষটি আর প্রেমিক থাকে না সে হয়ে ওঠে নারীর একাচ্ছত্র প্রভু বা রূপকার্থে বিধাতা। বিয়ের আগে ছেলেরা মেয়েদের জয় করার জন্য সুন্দর সুন্দর কথা বললেও বিয়ের পরে দেখা যায় তাদের অন্য রূপ। বিয়ের পরে নারী-পুরুষের অবাধ যৌনতা স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রথম দিকে নারীর ঠোঁট-চুল-চোখ সর্বোপরি মুখমণ্ডল পুরুষের কাছে যতটা আবেদনময়ী থাকে, যত দিন যায় ততই আবেদন কমতে থাকে। তখন নতুন করে যৌতুকের ব্যাপারটি আবার চলে আসে। সাংসারিক জীবনে যৌতুকের কারণে দেশজুড়ে অসংখ্য নারী প্রতিবছর প্রাণ হারায়! আর যারা বেঁচে থাকে তাদের জীবনে একটা টানাপড়েন চলতে থাকে। বিবাহিত জীবনে অবাধ যৌনতার সনদপ্রাপ্তির ফলে নারী-পুরুষের সুখ লাভের পাশাপাশি এক ধরনের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে। সুখ লাভ আর ক্ষুধা নিবৃত্তির একপর্যায়ে নারী গর্ভধারণ করে। এই যৌনসম্ভোগ ও গর্ভধারণ প্রক্রিয়াও একটা নিষ্ঠুর রাজনীতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে অতৃপ্ত রেখেই যৌনমিলন থেকে উঠে পড়ে। এতে নারী যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মনোবিকলগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো নারীকে অনিচ্ছায় অত্যধিক যৌনতায় বাধ্য করা হয়। তখনও নারীর প্রতি অত্যাচার করা হয়। সব নারীই হয়তো মা হতে চায়। কিন্তু নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনতার ফলে নারী যে গর্ভবতী হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে। বিয়ের আগে যেসব মেয়ে ছেলেদের জোরাজুরির কাছে বাধ্য হয়ে বা প্রেমের শিকার হয়ে যৌনমিলনে রাজি হয়, তাদের বেশিরভাগই ছেলেদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। আবার কখনো কখনো অল্প বয়সের কোনো হাহাকার জাগানো রূপসী বা সুন্দরীকে কোনো নষ্ট ছেলে প্রেমে প্রলুব্ধ করে বা ফুসলিয়ে বিয়ে করে স্ত্রী হারানোর নানা শঙ্কায় থাকে। নিজে অধার্মিক হয়েও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিয়ের পরে মেয়েটিকে ঘেরাটোপ-ঘুরকা-গিলাফ-কাপড়ের-ঢাকনা বা বোরকা পরিয়ে অন্যদের সঙ্গে যাতে কোনো সম্পর্ক করতে না পারে, সে জন্য মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই গর্ভবতী করে ফেলে।

অধিকাংশ পুরুষ যৌনমিলনের মধ্যদিয়ে নারীকে গর্ভবতী করেই খোশমেজাজে থাকে। কিন্তু নারী গর্ভবতী হওার পরে সন্তান জন্ম দেয়ার আগ পর্যন্ত নিজের শরীর নিয়ে একটা কারাগারে বসবাস করে। আশপাশের মানুষ তাকে যতই সাহস দিক না কেন, সে একরকম মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে। গর্ভবতী নারীর গর্ভকালীন যেভাবে যত্ন নেয়া উচিত, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী বা পরিবার পালন না করেও তার প্রতি অবিচার করে। নারী গর্ভবতী হলে ধীরে ধীরে তার গর্ভের আকার বৃদ্ধি পায়। তখন উঁচু উদর নিয়ে নারীসমাজের সর্বস্তরের পুরুষ কর্তৃক উপহাসের পাত্রী হয়। পুরুষরা নারীকে নিয়ে তখন দূরে বসে বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা শুরু করে। এতে তারা এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করে। পুরুষদের অমানবিক আচরণের কারণে নারীরা কখনো কখনো বিব্রত বোধ করে বাড়ানো উদরটি কোনো অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেই বাইরে চলাচল করে থাকে। ব্যাপারটি তখন এমন হয় যে, ওই নারী অসভ্য পুরুষসমাজে পুরুষ কতৃক গর্ভধারণ করে যেন অপরাধ করে ফেলেছে! গর্ভবতী নারীর কখনো কখনো স্বামীর অত্যাচারে-অনাদরে-অবহেলায়-অচিকিৎসায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। কোনো কোনো লেখক নারীর সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকে রূপকার্থে কবিতা সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। নারীর সন্তান জন্মদানের ব্যাপারটি কবির কবিতা সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেও নারীকে ছোটো করা হয়। কবিতা সৃষ্টি ও নারীর সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সন্তান জন্মদান করার সময় নারীরা আবার ডাক্তার কর্তৃক অবিচারের শিকার হয়। একটি সন্তানসম্ভাবা মুমূর্ষু নারীকে অপারেশন থিয়েটারে রেখে লোভী ও ডাকাত চরিত্রের অমানবিক পুরুষেরা কিংবা মানুষ চিকিৎসার বেশধারী পশু ডাক্তাররা দরকষাকষি শুরু করে। সব ক্ষেত্রে যে এ কথা প্রযোজ্য, তা নয়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে বিপদে ফেলে সিজারিয়ানের কথা বলে তার নিজের কিংবা স্বামী বা পরিবারের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়। এটা বড় ধরনের নারী নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা বা বর্বরতা!

নারী জন্ম, লেখাপড়া, বিয়ে, সন্তান জন্মদানের পরে দীর্ঘ সংসার জীবনযাপন করে বা জীবনযাপনের নামে অন্যের গড়ে দেয়া জীবনযাপন করে যখন বৃদ্ধা হয়, তখন বাবার অনুপস্থিতে ছেলেরাই তার অভিভাবক সাজে, কখনো কখনো কর্তৃত্ব করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই মায়ের বা বাবার সমস্যা আন্তরিকভাবে দেখে, তাদের যত্ন নেয়। কখনো কখনো সমাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বৃদ্ধার কথার চেয়ে একটি পুরুষের বা বালকের কথার মূল্য বেশি হয়। পুরুষের কোনো আলোচনায় নারীরা অংশগ্রহণ করলে কখনো কখনো এভাবে বলা হয়, 'মহিলাদের কথা আর কী শোনার আছে।' কিংবা 'এখানে আবার মহিলারা কথা বলে কেন?' কিংবা 'মহিলাদের কথা কী শুনব।' 'মহিলাদের কথা না বলাই ভালো।' পুরুষ নারীকে বলতে চায়: তুমি ডানে তাকিও না, তুমি বামে তাকিও না, তুমি আমার দিকে তাকাও, ওই অজানা-অচেনা পুরুষের দিকে তাকিও না।– এসব কথায় মনে হয় নারীরা সব অত্যাচার-অবিচার, আদেশ-নিষেধ, বৈষম্য মেনে নিলেই পুরুষরা খুশি।

দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি, পরিবার থেকে শুরু করে রাস্তা–ঘাট-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-বাসে-অফিসে সমাজের সর্বত্র মেয়েদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। এসব বৈষম্য পরিবারে করে বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন, স্বামী ও তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, স্কুল-কলেজে করে সহপাঠী কিংবা অন্য বিভাগের কোনো নষ্ট শিক্ষার্থী বা শিক্ষক, রাস্তা-ঘাটে করে দুষ্ট ছেলের দল ও নানা নষ্ট পুরুষ, অফিসে সুন্দর কথার মাধ্যমে কৌশলে করেন সভাপতি সাহেব কিংবা কোনো সহকর্মী, বাসে ওঠার সময় মেয়েদের জায়গা নেই বলে বৈষম্য করে কনডাক্টর আর বাসে ওঠার পরে মেয়েদের জায়গায় বসে থেকে করে নানা নারী বিদ্বেষী অকালকুষ্মাণ্ড বা কাণ্ডজ্ঞানহীন পুরুষ। সর্বোপরি জীবন সায়াহ্নে এলে একজন পুরুষের মৃত্যু সমাজে যেভাবে গুরুত্ব পায়, একজন নারীর মৃত্যু সেভাবে পায় না। নারীর মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া সম্পত্তিও উত্তরাধিকারী মেয়েরা ন্যায্যভাবে পায় না। সে ক্ষেত্রেও মৃত নারীর প্রতি অবিচার করা হয়। আর সব ধর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মা-বাবার মৃত্যুর পরে বাবার মৃত্যুবার্ষিকী যেভাবে ঘটা করে পুত্রসন্তানরা পালন করে থাকে, মা তাদের কাছে সেভাবে গুরুত্ব পায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্তই নারী পুরুষ কর্তৃক জেন্ডার বা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার।

গল্প

সাইনবোর্ড

হোসনে আরা মণি

‘ছোলের বিয়াত আসি বৌ লে ঢলাঢলি! তাও আবার কলপাড়ত!’

রুহিতনের মাথা গনগনে উত্তাপে বনবন, দু’চোখে লহুর মাতম, কানে বাষ্পের উদ্গীরণ। ‘বেজম্মা হারামি ছোল বিয়া দিবার আসেও দুডা দিন সামলে চলবার পারে না! আর ঐ বারভাতারি মাগী? অর এত্ত কামড়ন যে যকন যেটি মরদে ডাকবি তকন সেটি....’ নাহ্, রুহিতন আর কিছু বলতে পারে না। রাগের সাথে ক্ষোভ, বঞ্চনার ব্যথা ও অসূয়া মিশে তার অনিয়ন্ত্রিত আবেগে এখন এমন এক মাত্রা যুক্ত হয় যে কীভাবে সে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে তা বুঝতে না পেরে বুঝি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তার স্থানুবৎ মূর্তি দেখে প্রতিবেশী হামিদের মা কাছে এসে গলা খাটো করে অথচ রুহিতনের সতিন যেন ঠিক শুনতে পায় এমন স্বরে বলে, ‘অর কী দোষ ক! সুয়ামী ডাকলি তো অর যাওয়াই লাগবি। তা এ্যাগলে কাম দিনত আবার কলপাড়ত কি কেউ করে? কে কোন ফাঁস দিয়া দ্যাখে! আর খোলা আসমানের তলে এ্যাগলে কাম করাও তো পাপ। তয় মরদরা তো অবুঝই হয়, তর সয়না। অরগেরক বুঝায়-শুনায় সবুর করানোও তো মায়্যালোকের এক কাম।’

‘হ হ, এ্যাডে সেই মায়্যালোক! কামের মধ্যে ঐ একখান কামই তো করবার পারে। অড্যে দিয়াই

ঐ আলুর দোষঅলা হারামিক বাইন্ধা থুইছে।' ঢেঁকিঘরের পেছন থেকে রমিছার ফ্যাচফেচে কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। আবুল মিয়ার কোন সাড়া-শব্দ আপাতত পাওয়া যায় না। আসলে সে এখন ঘরের ভেতর কাঁথামুড়ি দিয়ে রুহিতনের বাক্যবান থেকে কানকে বাঁচিয়ে একটু আগে পাওয়া সুখের অবসাদকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। গত রাতটা বড় কষ্টে কেটেছে তার। বড়পক্ষের ছেলের বিয়ের দাওয়াত পেয়ে বাপের কর্তব্য করতে সে ছোটপক্ষ আর তার দুই ছেলে নিয়ে গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ ঢাকা থেকে এসেছে। বাড়িতে শোয়ার ঘর একটাই। মেহমান এলে পৈঠায় বিছানা পেতে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। তবে যা একচিলতে পৈঠা তাতে দুজনের বেশি তিনজন হলে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া চলে না। আর যার ঘুমের মাঝে গড়াগড়ি দেয়ার অভ্যাস সে ঐ পৈঠায় শুলে সকালে নিশ্চিত নিজেকে মাঝ উঠানে আবিষ্কার করবে। তবে এ বাড়ির উঠোনটাতেও শোয়ার মতো ফাঁকা জায়গা রুহিতন ছেড়ে রাখেনি। ওখানেও সে উপরে লাউ-কুমড়োর জালি দিয়ে নিচে করেছে হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়। আড়াই শতক জমির ভিটে। এর প্রতি ইঞ্চিকে রুহিতন কোন না কোন কাজে লাগিয়ে ছেড়েছে। একখানা দোচালা টিনের শোয়ার ঘরে রুহিতনের চারপায়া, মাচান, হাঁড়ি-কুড়ি এসব। এর লাগোয়া একটা একচালা বেঁধে হয়েছে ঢেঁকিঘর, রসুইঘর ইত্যাদি। ঢেঁকিটা যে রুহিতন কি জন্য কোত্থেকে এনেছে! ঘোরতর সংসারী রুহিতনের ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয় যেন সে কত জমিঅলা বড় গেরস্থ! রমিছাকে নিয়ে আবুল এই শোয়ার ঘরটাতে ঠাঁই পাবে– এমনই ছিল আবুলের প্রত্যাশা। হাজার হলেও সে রুবেলের বাপ। এই যে রুবেলের বিয়েতে রুহিতন তাকে দাওয়াত করেছে সে তো এজন্যই যে বিয়েতে রুবেলের বাপের পরিচয়টা বড় দরকার। রুবেলকে কেউ যাতে বেজন্মা বলে ঠাউরাতে না পারে সেজন্যই না রুহিতন তাকে এখনো স্বামী বলে মানে। তাহলে কেন সে শোয়ার ঘরে ঠাঁই পাবে না? কেন তাকে ঢেঁকিঘরে ঢেঁকির তলায় শুয়ে রাত কাটাতে হয়? রুবেলের বিয়ে উপলক্ষে রুহিতনের বাপের বাড়ির লোকে ঘর ভরেছে, আবুলের বাপের পক্ষেরও কেউ কেউ এসেছে। তবে তাদের সংখ্যা রুহিতনের বাপের বাড়ির তুলনায় কম।

এ নিয়েও আবুলের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। যাহোক, রুহিতন এসব মেহমানদের মধ্য থেকে মহিলাদের জন্য শোয়ার ঘরে বন্দোবস্ত করেছে আর পুরুষদের ঠাঁই করেছে পৈঠায় ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে। রমিছাকেও কালরাতে রুহিতন তার শোয়ার ঘরে নিয়েছিল। আর আবুলকে তার ছোটপক্ষের দুই ছেলেসহ থাকতে দিয়েছিল ঢেঁকিঘরে। এ রকম অবিচারে কার না মেজাজ খাট্টা হয়!– 'ছোলের বিয়াত দাওয়াত কর‍্যা লে আসি এই তোর ব্যাভার!' ঢেঁকিঘরটা অবশ্য মন্দ নয়; দিব্যি লেপাপোছা তকতকে পরিষ্কার। বছরেও যে ঢেঁকিতে পাড় পড়ে না তার আবার যত্ন কত! কিন্তু যত পরিষ্কার ঘরই হোক, চাই কি বিছানায় ফুল-গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়া হোক; রমিছা ছাড়াত আবুলের ঘুম আসতে চায় না। একটা কোলভরা নাদুস-নুদুস মেয়েমানুষের গায়ের পরে ঠ্যাং না তুলে আবুল মিয়া ঘুমায় কী করে? তাছাড়া ঘুমুবার আগে তার রোজই যে ঘুমের দাওয়াই চাই তা বিহনে সে কী করে দু'চোখের পাতা এক করে?

সকালে আবুলের ঘুম ভেঙেছিল অতৃপ্তি আর আধখেঁচড়া মেজাজ নিয়ে। ঘুমের অসম্পূর্ণতার প্রতিক্রিয়া তো ছিলই, আরো ছিল তার মধ্যযৌবনের গনগনে আঁচের সাথে অপমানবোধের দাহ। সকালে যখন রমিছার মুখে শুনতে পেল যে রুহিতন তাকে শোয়ার ঘরে ঢুকালেও খাটে ঠাঁই দেয়নি, বরং ঘরের মেঝেতে পাতা ঢালাও বিছানার এককোণে তাকে কোনোমতে পড়ে থাকতে হয়েছে তখন তার মেজাজ হলো আরো খাট্টা। হঠাৎ তার মাথায় গেলরাতের অতৃপ্ত চাহিদা মিটিয়ে নেয়ার সাধ জাগে, আর সেই সাথে রুহিতনকে বেশ একটু দেখিয়ে দেয়ার ইচ্ছেও। এক হ্যাঁচকা টানে রমিছাকে তখনই সে পেড়ে ফেলে আর কি। কিন্তু মুশকিল এই যে একেতো এটা বিয়ে বাড়ি, তার ওপর বাড়িটা রুহিতনের। রাতের বেলা যে ঠেঁকিঘরে তাকে শুতে দেয়া হয়েছিল তাও তো এখন আর ফাঁকা পড়ে নেই। ওখানে এখন শুরু হয়েছে পিঠে তৈরির আয়োজন। আর শোয়ার ঘরে ঢোকার কথা তো ভাবাই যায় না। ওটা হলো রুহিতনের আসল ঘর। ওখানে ঢুকে দিনদুপুরে দরজায় খিল দিলে রুহিতন একবাড়ি লোকের সামনে যে চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে আসবে না তার নিশ্চয়তা কী? তাছাড়া সে ঘরটাও ফাঁকা পেলেতো!

আইডিয়া! কলঘর।

কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী গেদুর বৌয়ের সাথে কল নিয়ে ক্যাচাল হওয়ার পর জেদি রুহিতন সমিতি থেকে লোন তুলে একটা আস্ত কল তার ঢেঁকিঘরের পাশে বসিয়েছিল। এতকাল ওটার চারপাশ গুয়াগাছের শাখা-পাতা দিয়ে ঘিরে গোছল ও 'ছোট কাজের' জায়গা করা ছিল। এই মাসদুয়েক আগে ছেলের বিয়ের প্রস্তুতি

হিসেবে রুহিতন ওটাকে তিন ইঞ্চি পুরু দেয়ালে ঘিরে বেশ একটা পাকা কলঘর বানিয়ে ফেলেছে। রমিছাকে নিয়ে ওখানে ঢুকলে.....। রমিছা আর আবুলকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে রুহিতনের মন যখন তাদেরকে ইতিউতি খুঁজে চলছে তখনই তার চোখ যায় কলঘরের দিকে। ঘরটা বেশ কিছুক্ষণ হলো বন্ধ। এর মধ্যে দু-তিনজন প্রয়োজন সারতে গিয়ে দরজা বন্ধ পেয়ে ফিরে এসেছে। 'কোন মুখপোড়া না মুখপুড়ি ভেত্রে ঢুকে ঘুম পাড়িচ্ছে, কে জানে!' বিরক্ত রুহিতন একজনকে ডেকে বলে, 'দরজায় দুডা থাবা দেতো মদিনা। এই কাজ-কামের বাড়িত কলপাড় অতক্ষণ বন্ধ থাকলে চলে?' মদিনা দরজায় খুব জোরে থাবা দেয়। টিনের দরজা চড়-কিল খেয়ে এমন জোরে কঁকাতে থাকে যে রুহিতনের মনে হয়, 'এইরে! অডারখান দিয়াও তো অইল বিপদ, দরজাই না ভাঙে!' ততক্ষণে কলঘরের সামনে আরো অনেকে জড়ো হয়েছে। অতক্ষণের সাধারণ কৌতূহল তখন চেঁচামেচিপূর্ণ উদ্বেগে পরিবর্তিত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে রুহিতনকে হাতের কাজ ফেলে উঠে আসতে হলো। তবে সব কৌতূহল ও উদ্বেগের যখন অবসান হলো অর্থাৎ আবুল ও রমিছা যখন এই হেমন্তের সকালে ঘামেভেজা-শরমমাখা চেহারা নিয়ে একজোড়ে বেরিয়ে এলো তখন রুহিতনের যে চেহারা হলো তা দেখলে শত্রুর মনেও করুণা জাগে। অতবড় দাপুটে নারী হঠাৎ যেন পাহাড়ধসের মতোই বিধ্বস্ত হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে বড় ক্ষণিকের তরে। নরম-শরম রমিছা তার সারা অবয়বের অভিব্যক্তিতে বিজয়িনীর ব্রীড়া ছড়িয়ে, সকলের চক্ষুকে চড়কগাছ বানিয়ে যখন ঢেঁকিঘরের পেছনে পালাল তখন যেন রুহিতনের হুশ হলো। এরপর সে যা করে ও বলে তা আবুল মিয়ার জন্য নতুন ঘটনা নয়। রমিছাকে বিয়ে করে ঢাকায় ঘর নেয়ার পর থেকে সে এসব কথা বহুৎ শুনেছে। তা রুহিতনের এসব মিঠে-কড়া কথার টানেই হোক কি ছেলে রুবেলের মায়ায়– আবুল মিয়া কিন্তু বছরে একবার হলেও এদের খোঁজখবর করতে গ্রামে আসত। এসে অবশ্য কুশলাদির সাথে রুহিতনের আয়-উপার্জনের খবরটাও নিতে চেষ্টা করত। রুহিতনকে আদরের স্বরে কত কী বলে মন ভজানেরও চেষ্টায় থাকত। গাঁয়ের লোকে মন্দ বলবে ভেবে রুহিতন তাকে শোয়ার ঘরে ঠাঁই দিত বটে কিন্তু গায়ে হাত রাখতে গেলে যে ভঙ্গি করত তাতে করে আবুল মিয়ার মনে হতো যে রমিছাকে বিয়ে করে সে উচিৎ কাজই করেছে। এমন মেয়েমানুষ নিয়ে কোন পুরুষ কাল কাটাবে যে কিনা স্বামীর চাহিদারই তোয়াক্কা করে না? রমিছার রূপ দেখে আবুল মজেনি। মজানোর মতো রূপ রমিছার নেই। রুহিতনেরও না। তবে কিনা আবুল মিয়ার মতো লোকের ভাগ্যে তো আর পপি-শাবনূর জুটবে না। তাই মন্দের ভালো রমিছাকে নিয়েই সে খুশি। সত্যি, এমন সরেস বৌ খুব কম পুরুষের কপালেই জোটে। শুধু হাতটা ধরে একবার টান দিলেই হয়– দিব্যি রেডি। এককালে রুহিতনও অবশ্য খুব খারাপ ছিল না কিন্তু একটা জেদের বশে রমিছাকে বিয়ে করার পর থেকে সে সেই যে শালগাছের মতন শক্ত খাম্বা হয়ে গেলতো তারে নোয়ায় সাধ্যি কার? রুবেলের যখন তিন বছর বয়স তখন আবুল দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, আর আজ রুবেলের বয়স সতের। তার মানে এই চোদ্দ বছর হলো রমিছাকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু আজো ওসময় রমিছার ভাব দেখলে আবুলের মনে হয় যেন সে বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়িতে বৌয়েরে একলা পেয়ে চেপে ধরেছে। তেমনি ছটফটানি অথচ গলাগলা ভাব। ইস্! এই কায়দাটা যদি রুহিতন জানত, তাহলে কি আর তার এই দশা হতো? আর রুহিতনের বাপ যদি সেদিন জামাইয়ের হাতে হাজার পঞ্চাশেক নগদ গুঁজে দিত তাহলে কি আর আবুল রমিছার কথা ভাবত? রাত এগারোটা পর্যন্ত কারওয়ানবাজারে মুরগি বিক্রি করে ঘরে ফিরে সে তখন রুহিতনের হাতের বিখ্যাত 'আলু সানা' দিয়েই ভাত খেত। ভাবতে ভাবতে একটা শ্লেষের হাসি হঠাৎ আবুলের ঠোঁটে খেলে যায়। ঘাপটি মেরে শুয়ে থেকে সে রুহিতনের বিছুটিমাখা কটূক্তি শুনতে শুনতে মনে মনে বলে, 'মোক যতই তুই গালাস রে মাগী, তাতে হামার ই ছিঁড়াও না যায়। হামি তোর ভাতার। হোক আলুর দোষঅলা ভাতার, মোক তুই অস্বীকার করার পারবু না। তোর গর্ভত যে ব্যাটা পয়দা হইছে তাই এই আলুর দোষেরই পয়দা। দেখিস সে তোরে জনমভর ক্যাংকরে জ্বালায়। সতরো বছর বয়সত পয়লা বিয়া, কামাই নাই এক পয়সা, বিয়ার খায়েশ ষোলআনা। মাও গতরখ্যাট্যে সংসার চলায় আর ছোল পাড়ার ছুঁড়িক লজেন্স খিলায়! হু হু! বিয়া দিয়া চরিত্তির ভালো করবি? এতই সস্তা? তাইলে তো হামি তোক বিয়া কর্যই.....। একনো ব্যাটার মাও! দ্যাক ওই ব্যাটা তোর বড় গলা ক্যাংকরে খাটো করে!'

এ পর্যন্ত ভেবে আবুল মিয়া দারুণ খুশি হয়। এমনকি রুহিতনকে দেখিয়ে বা জানিয়ে রমিছাকে নিয়ে আরেক কিস্তি মৌজ কখন কোথায় করা যায় তাও সে ভাবতে থাকে। একটা বিড়ি ধরিয়ে তাতে সুখটান দিতে দিতে সে মনে মনে বলে, 'অত সোজা না রুহিতন, ব্যাটাছোলের পরে জিদ করা, পতিশোধ নেয়া অত সোজা না। মরদ চিরকালই মরদ। কিন্তুক মায়্যাছেলে? মায়া দিয়া বানান মায়্যামাইনষের শরীল– মুখত যতই রাগ ঝাড়ুক, কামের কাম কিছুই করবার পারে না। আর মা হলেতো কতাই নাই– প্যাটের ছোল ইবলিস হলেও কয় সোনার চান। তাই কই রুহিতন, যেদিন তুই মা হলু, সেইদিনই হামার কাছ হারে গেছু। হামার রক্ত তোর নাড়িছেঁড়া ধন, হামার আর হারের কী আছে ক?'

বরযাত্রা করার সময় হয়েছে। নিয়মমত এখন বর তার মায়ের হাতের দুধভাত মুখে দিয়ে বাপকে কদমবুছি করে যাত্রা করবে। বাপও অবশ্য ছেলের সাথে যেতে পারে কিন্তু রুহিতন আবুল মিয়াকে বরযাত্রায় পাঠানোর পক্ষে নয়। ছেলের বিয়েতে ছেলের বাপকে সে দাওয়াত করে এনেছে, এতেই তার কর্তব্য পালন হয়েছে। বেইমান, স্বার্থপর, দায়িত্ববোধহীন লোকটাকে এর চেয়ে বেশি পাত্তা দেয়ার ঠেকা তার পড়েনি। রুহিতনের যা ভাবভঙ্গি– তাতে মনে হয় 'যেনু ছোল সে একলাই পয়দা করিছে। যেনু আবুল মিয়ার তাতে কোনো ভূমিকাই ছিল না। না হয় আবুল রুবেলের ভরণপোষণের দায় পোহায়নি, না হয় সে তারে কোলে-পিঠে করে সোহাগ-শাসন দিয়ে বড় করেনি, তাই বলে কি সে পর হয়ে গেল? রুবেলের তো সে বাপ, নাকি? আর বাপ তো দুনিয়াতে একজনই হয়– তা সে ভরণপোষণ দিলেও বাপ, না দিলেও বাপ। এত বড় দুনিয়াতে বাপ বলে ডাকার আরাকটা লোক খুঁজে বার করুক তো দেখি কেমন পারে।' কিন্তু আবুলের এসব যুক্তি রুহিতনের কাছে ধোপে টেকে না। তার একটাই কথা– যে বাপ খাওয়ায়নি, পরায়নি, ছোলের বিয়াত তার মাতব্বরি খাটবে না। রুহিতন তার গায়ে খাটা পয়সা খরচ করে ব্যাটার বিয়ে দিচ্ছে, রুহিতনের মতেই তাই সব হবে।

কিন্তু এখন দুধভাত খাওয়ার পর্বে আবুল মিয়ার ডাক পড়ে। বাপকে এখন কদমবুছি করবে ব্যাটা। অগত্যা আবুল মিয়াকে বিছানা ছাড়তে হয়। রুহিতনের মুখ এখন বিরাম নিয়েছে। মুখের বদলে চোখ ঝরছে। ব্যাটার মুখে তোলা দুধভাতের সাথে তার চোখের বৃষ্টি যেন মিশে না যায় এজন্য সে বারবার চোখ মুছছে। এটা আনন্দাশ্রু কিনা সে বোধ আবুল মিয়ার নেই। কিন্তু দৃশ্যটা দেখে সে হঠাৎ থমকে যায়। রুবেলের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে তার পা দুটো যেন হঠাৎ আটকে যায়। কেন জানি তার এখন মনে হয়– নাহ্, রুবেলের কদমবুছি পাওয়ার যোগ্য পা তার নয়। কে যেন তার ভেতর থেকে বলে ওঠে, খালি জন্ম দিলেই বাপের সম্মান প্রাপ্য হয় না আবুল, সম্মানের সম্মানীটা আগে পরিশোধ করে রাখতে হয়।

খুব ধীরে ধীরে আবুল সেখান থেকে কেটে পড়ে। বরযাত্রাকালে বরের বাপকে দেখতে না পেয়ে কয়েকজন বর্ষিয়সী প্রশ্ন করলে এবং রুবেলও উৎসুক চোখে ইতিউতি তাকাতে শুরু করলে রুহিতন শেষবারের মতো আঁচলে চোখ মুছে পরিষ্কার শুকনো চোখে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, হামাক দুইবার ছেলাম কর–একবার মাওয়ের, আরাকবার বাপের। যে সাইনবোর্ড এ্যাদ্দিন তোর পিঠে ঝুল্যে থুইছিলাম, আজকের পর হামি তাও মুছে ফেলামো। খালি সাইনবোর্ডে ইজ্জত বাঁচে না– এ শিক্ষে আজ হামার হইছে।

কী বুঝে ছেলে গম্ভীর মুখে মাকে দুইবার সালাম করে, তারপর আর কোনোদিকে না তাকিয়ে বৌ আনতে রওনা হয়।

গল্প

অসমাপ্ত দুপুর

আসাদুজ্জামান

কাকের চোখের মতো একটি ক্ষীণ আলো তাপানুকূল কক্ষটিকে একবারে সাপের লেজের মতো পেঁচিয়ে রেখেছে। যেখানে ঝলমলে আলো থাকার কথা সেখানে অন্ধকারের উপচানো ঢেউ এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে। বাড়ছে হাওয়া। লু হাওয়া। কিন্তু এখানে হিম ঠাণ্ডা। ইদানীং ঢাকা কেমন যেন খরখরে হয়ে উঠেছে। অনেকটা বিদেশ বিদেশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নাগরিক ঢাকায় কোনো বৈকালিক ফুসরত নেই। সব কিছু এলামেলো ধেধিয়ে তাতিয়ে চলছে। বাতাসে একটি শুষ্ক প্রলেপ। জলীয় বাষ্প আর অম্লযান হাওয়া হয়ে গেছে। যেমনটা না গ্রামের চকচকে লাউডগা শহরে এসে রঙ দিলেও চোখ মেলে নেতিয়ে পড়ে। শহরটার পুরনো ভবনগুলোর রং চটে গেছে আবার পাশেই উঠছে নতুন নতুন কাচের ভবন। নতুনে পুরাতনের খিচুড়ি। অনেকে আবার বলেন পুবপাশের ম্যানহাটন। পশ্চিমে সেনাছাউনির পেছনে অবসরপ্রাপ্তদের বাসাবাড়ি। মাঝখানে সরু বস্তিও আছে। তবে সবচেয়ে দামি কবরস্থান পায়ে হাঁটার দূরত্বে। তার পাশে রহিমা বা লাবণ্য। কৃষ্ণকলি বা ক্যামেলিয়া তার পছন্দের প্রবরকে নিয়ে উঠেছে। কবরস্থানের পাশঘেঁষে আছে একটি আবাসিক আধুনিক আপ্যায়ন কেন্দ্র। রাতের ঢাকার অন্যরূপ সেখানে গালিচাপড়া খুলে একবারে পাঙ্গাসের মতো হা করে থাকে। রাতে উচ্চৈঃস্বরে কলরব হয়। তবে তা বাংলা নয়

বহুজাতিক ভাষায়। নাচ-গান হয়। জীবনের এক উত্তাল আর উদ্দাম স্রোত বয়ে যায়। কিছু ভিনদেশি সেখানে থাকে। চেনা যায় না কে কার। শুধুই শব্দ ভিতরে এবং বাইরে। ভাঙনের শব্দও আছে তবে কেউ গায়ে মাখে না। এর পাশে কাকলী একদা এখানে কোকিলের কুহুতান শোনা যেত। দূরে ছিল বনবনানী। একটু ভিতরে ঢুকলে এখনো সুনসান নীরবতার প্রলেপ হাত ছানি দিয়ে ডাকে। পাতানো কপোত কপোতিরা এদিকটাকে অভয়ারণ্য হিসেবে বেছে নেয়।

ঢাকার নাভিকেন্দ্র ধনী আর গরিবের ভেদ রেখার পাশ ঘেঁষে যেখানে খাড়াখাড়ি একটি দাগ পড়েছে সেখান থেকে উড়াল সেতুর নিচ দিয়ে যে রাস্তাটি বেঁকে আমতলী নামের পিচ করা পথে থেমেছে; সেখানে এখনো আছে সারি সারি আমগাছ। পাশ ঘেঁষে পোড়ো বাড়িতে রাজউকের পুরনো বয়া দলিলে চিহ্নিত এক মৌজার নাম আমতলি। এখানে বস্তি ছিল। ছিল আমগাছ। নদীর করাল গ্রাসে জামিন খুইয়ে একদল শিকস্তিতাড়িত মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। বস্তিটি ভেঙে-চুরে দিয়ে গড়ে উঠেছে বাবুই বাসা। একছাদে অনেক পরিবার। কেউ কেউ বলে টাকাওয়ালাদের ঘুপচি। একটুকরো পরস্পর সংলগ্ন কিন্তু একবারেই বিলগ্ন মানুষকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকা। অনেক দূরের মানুষের জড়ানো পেঁচানো জীবনযাপন। কিন্তু গতিশীল ব্যস্ততা। একদা এখানে প্রতাপশালী চেয়ারম্যান ছিলেন। তাই অনেকে বলেন, বিশেষত বাসের কন্ডাক্টররা বলে বেশি। ঠিকানা চেনানোর জন্য বলে চেয়ারম্যান বাড়ি। চেয়ারম্যান মরে ভূত হয়েছে অনেক আগে। তবে তার হাড্ডি এখন মিলবে না কেননা হাঁটা পথে বনানী কবরস্থানের বর্গফুটের মূল্য এখন কোটি টাকা। কবরের দাম এত বেড়েছে। যে বেওয়ারিশ লাশই ভালো। ঢাকার যান্ত্রিকজীবন আর লাশের ভার নিতে রাজি নয়।

বায়ে ঘুরে একটু নিরিবিলিতে একটি পুরনো ভবন ঘষে-মেজে একটি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র বানানো হয়েছে সেখানে ওরা দুজন। পাতানো দুজনে দুজনার। কাজ ফাঁকি দিয়ে কপোত কপোতির মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। যেন শীত মৌসুমে সাপেরা যেমন প্রজনন ঋতুর আগ্রহে খিঁচিয়ে ওঠা নিরিবিলি খোঁজে। প্রবরের জন্য দৈহিক আর প্রণয়নীর জন্য ওপরে ওঠার সিঁড়ি। অনেকটা ওপর নীচ নিচ উপর। কুমড়ার মতো ফাঁপানো। বিষ নেই ফোসফাস নেই। ফণা নেই। ঢোঁড়া সাপের জিহ্বার মতো নেতানো।

এই ভরদুপুরে ক্ষ্যাপাটে শরীর আর ভিতরের দহন মিলেমিশে একাকার। এক দফা কচলাকচলি করে ওরা ঝেড়ে কেশে বেরিয়ে এলো। মেয়েটি নির্বেদ। হাসছে। যাকে দেখে তার সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ে। মেয়েটির কানে মুঠো ফোনের তার। কারো কথা না শোনার একটি আরোপিত ভান। ছেলেটি বাঁ দিকে ফিরে আছে। একটি সংকোচ তাকে তাড়া করে ফিরছে। খচখচে ভাব। পরনে আধা অঙ্গবাস। দুজনে হেলান দেয়া কফির দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কফি নয় কোকের বোতলে হুইস্কি পুরে একটা ঘোর আনার চেষ্টা করছে।

হাসান মানে ছেলেটি একটু উদাস চোখে কেশে দিয়ে, মুখ তুলে তাকালো পাতানো প্রেয়সীর দিকে।

বাঁয়ে ঘুরে একটি অস্ফুট প্রশ্ন, আচ্ছা তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন?

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল, বাজে বকছ কেন, আমি তো ভাবী নই আমি তো এমনিতেই আসি তারপরেও পটানোর চেষ্টা করছ কেন? অমন করে বলছ কেন কৃষ্ণকলি।

এই ধুর হাবারাম কোথাকার। ধরেই নেতিয়ে পড়েছে। আমি তো ইংরেজি মাধ্যমের কৃষ্ণকলি কেন বলো আমাকে ক্যামিলিয়া বলতে পারো না। আসলে এগুলো কোনোটাই ওর নাম নয়। ওদের এমনটিই হয়। সঙ্গী বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম ও বদলে যায়। রহিমা প্রবরটি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই করেছে লাবণ্য। কেননা সে নিজেকে শেষের কবিতার অমিত ভাবে যদিও সে কখনই রবীন্দ্রনাথের কোনো কিছু পড়েনি।

ভাপা পিঠার মতো ঠোঁট ফুলিয়ে পাটিগণিতের বাংলা ৯-এর মতো ভ্যাংচি কেটে রহিমা এমন একটা ভাব করল যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। বোরিং। তারপর প্রবরের জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, দেখ না আমাদের প্রধান নির্বাহী বলেছেন পুরুষরা যদি পৃথিবী থেকে এসে থাকে তাহলে মেয়েরা এসেছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। তাই ওদের প্রক্ষালন কেন্দ্র আলাদা হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি থাকে কিন্তু অনেক দূরে। নিজের স্ত্রী ও মেয়েদের ফেলে এসে ফারজানাকে নিয়ে কি তার মহোষধ এখন সবাইকেই আপনজন বানাতে চায়। কিন্তু কম টাকায় নয়। নোট চাই তো! বিয়েটা হচ্ছে না কেন? বাংলাদেশে প্রবাসীদের বিয়ে করা বেশ মুশকিল। কী সারক্রাস্টিক। ভেতরে ফাঁকা বাইরে ভরা। তাই তো দেখছি ঘরে এবং বাইরে।

হাসানের স্বগতোক্তি।

এবার কথাটি হাসান বলতে না চাইলেও এমনিতেই থুতুরমতো সড়াৎ করে বেরিয়ে এলো। রহিমা বলে উঠল, এই তুমি দরিদ্র মানুষের মতো ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত ভাব করছ কেন? আমার মা=বাবাও তো আলাদা থাকে।

মায়ের কত ছেলে বন্ধু।

হাসান জোরে শ্বাস নেয়। তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে যায়।

নিরালম্ব। ভায়ুভূত।

কফি ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

রহিমা বলে যান তো নাসার স্পেসক্রাফটে একটি মেয়ে একবার একা গেছে।

জেনেছি এবারে জার্মানির পরে মেয়েরা ফ্রান্সের সরকার প্রধান হতে যাচ্ছে। ছেলেটি বলে।

হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে রহিমা নামের কৃষ্ণকলি বা ক্যামিলিয়া বনে যাওয়া মেয়েটি।

ও একটি নিপুণ শিকারি। ওর কলম কখনো এদিক-ওদিক যায় না। যাকে ধরে তাকে ছিঁড়েভুড়ে ফেলে।

এ দফায় শেষ হলো অভিসার। হাঁপাতে হাঁপাতে আদম কেনাবেচা বিভাগের দক্ষ খেলোয়াড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দরজায় সটান দাঁড়ানো দারোয়ানকে কেশে একটা ধমক দিল।

তোরা যে কবে ভালো হবি, পোশাকের নিয়মকানুন মানিস না কেন?

পেছন থেকে থেকে খেকিয়ে কুকুরীর মতো ঠেকুর তুলে রহিমা বলল।

অফিসের মধ্যে তো আমরা কিছুই মানি না। তখন তো কিছুই বল না। এখন ওর সঙ্গে আইন দেখাচ্ছো কেন?

হাসান বলল, আমাদের মেয়েগুলো তো খুলে ঝুলে আসতে চায়।

পারলে একবারে ন্যাংটা হয়ে চলে আসত। কিছু বলতে পারি না আবার নাকি নারীবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করে না ফেলে।

মেল শভিনিজম হয়তো চালু করে ফেলবে।

হাত ধরে ঝুলে থাকা রহিমা বলল।

স্যার আপনার মাথায় নতুন টোপর পরার সময় হয়ে এসেছে।

হাসান বাইরের আলো জালাবার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু জ্বালাতে পারে না। ঠিকমতো ধরতে পারে না কোনটা রেখে কোনটা ধরবে। আধো আলো আধো ছায়াতে প্রক্ষালণের দিকে হেঁটে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফেলে লাবণ্যের সঙ্গে। তখন সে রহিমার মুটো ফোনে ও আলোতে প্রক্ষালণের দিকে ছোটে। হোঁচট খেতে উঠে দাঁড়ায়।

এই ওটা কি চাপলে। ছবি তুলে রাখনি তো।

হাসান খ্যাক খ্যাক করে ধমকে ওঠে। ধমক দিতে উদ্যত হয়। উল্টে রহিমা তাকে ঠোঁট বাকিয়ে দেয়। হাসান বলে ওঠে মানে কী?

তুমি ভুল করেছ আমি শুধরে দিয়েছি।

তুমি না স্যার বলতে বলতে অজ্ঞান। এখন অমন করছ কেন?

রহিমা বলল ওটা তো অফিসের কথা। তা না হলে সবার সামনে ধরা খেয়ে যাব না। দেখনা আমি কতকিছু করি আমার তো সাঁই সাঁই করে পদোন্নতি হচ্ছে। ছবি তুলে রাখলাম পদোন্নতি নিশ্চিত করলাম।

আমার জন্য একজনকে বেশ টস টসা দেখে কমলা লেবুর মতো একটা ছেলে দিলে পিএস হিসেবে। ও না আবার ভাবীকে কিছু বলে দেয়। আমি তো অনেক কিছু করি যাকে তাকে নাম ধরে ডাকি। কই কিছু তো হয় না।

হাসান বলল, আর বলো না আমার রক্তচাপ বেড়ে যাবে।

চিকিৎসক ধরতে পারছে না। রোগ তো মনের, শরীর দেখিয়ে কী লাভ।

রহিমা থেকে লাবণ্য হয়ে যাওয়া মেয়েটি ফিক করে হেসে দেয়। সহিস ঘোড়া চালায় না ঘোড়ায় সহিস চালায়। অস্ফুটে রহিমা বলে আমাদের সম্পর্কটি আসলে কেমন। তোমার তো মনোচিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কেন শল্যচিকিৎসকের কাছে যাও।

বেরুবার সময় উঁচু লম্বা প্রহরী বলল, শালা ভালোমতো খেয়েছে এই জন্য আইন শেখায়।

বউর হাতে চড় খায় আর আমাদের ধমকায়।
দেশটা যে কোথায় গেল। এবারে বাড়িতে গিয়ে ধানের কাজে পরবাসী খাটব আর এ শহরে আসব না।
রহিমা বলে, 'এত বক বক করছ কেন?'
এরকম আজকাল অনেকেই করে। টাকা আর ক্ষমতার দুটোর মিলন হলে একবারে বরবাদ হয়ে যায়।
হাসান বলে ফালতু কোথাকার।
হঠাৎ করে হাসানের রক্তচাপ বেড়ে যায়।
আহলিকার গৃহসম্রাজ্ঞী বেঁকে বসে রাতের বেলায় রহিমার ঘন ঘন মুঠো দূরাভাষে আলাপনের কারণে বিগড়ে গ্যাছে কাগজিক দলিলটি। বিয়ে নামের শারীরিক সঙ্গমের ছাড়পত্র। এতে অবশ্য রোজগেরে গিন্নির হাপিতিশ্যি নেই।
একটি ভাঙন এগিয়ে আসছে। অনেকটা হাসানদের ওদের দেশের বাড়ি যমুনার ভাঙনের মতো। যেখানে পোয়াতি নদী স্রোতের ক্ষুধায় চাঙ্গ চাঙ্গ মাটি শব্দ করে গিলে খায়।
হাসানের বাবার উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়।
ছেলেটি আমার এমন হয়ে গেল কেন?
ও কি বদলে গেল! ওকে কতবার বললাম বাবা ঠাটবাট একটু থামা।
তোর যে কী হবে।
বলতে বলতে সে চশমা বার বার মোছে আর পিছনে ফিরে তাকায়।
এই প্রজন্ম না ঘরকা না ঘটকা। কোথাও দাঁড়াতে চায় না।
নাশতার টেবিলে হাসানকে ডেকে বাবা বলে, শোনো বাবা আমি তো ব্যাংকার আমার সব সন্তানগুলো গোছালো। আর তোর পোশাক-আশাক গোছালো কিন্তু ভিতরটা এত অগোছালো কেন।
বাবার এ প্রশ্ন হাসানকে ভড়কে দেয়। হতচকিত হয়ে পড়ে সে।
বাবা শাসানি দিয়ে বলে, তুই অন্য কোথাও চাকরি নে।
আমি খুঁজছি।
বাবার চোখে উদ্বেগ আর দুর্ভাবনার চিহ্নগুলো পষ্ট হয়ে ওঠে। মা ফোঁপাতে থাকে আমরা তো বাঙালি। বাবা তুই একটু কথা শোন, বউমা তো গোছালো। তোরা ভাগ হয়ে যাচ্ছিস কেন?
ওরা গাড়িতে চেপে উত্তরা থেকে ধানমণ্ডির একটি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দিল হাসানকে। সেখানে এক দফা দুই পরিবারে ভীষণ ফ্যাদা প্যাচাল লেগেছে। ক্রমান্বয়ে হাসানের শরীর খারাপ হতে থাকে। যে সেবিকা তার হৃদযন্ত্রের মাপ নেয় সে তার অ্যাপ্রোণের তলায় পরে আছে জিন্সের প্যান্ট ও টাইট গেঞ্জি। কিন্তু মাথায় পরা হিজাব। এই রোগের মধ্যে হাসানের চোখ তার শীরের বিশেষ অঙ্গগুলোকে তাক করে ফেলে।
মনে মনে বলে, আসলে মানুষের যৌনতা সর্পিল। সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে। রোগ -বালাইও মানে না।
চিকিৎসক অনেকগুলো পরীক্ষা দিল কিন্তু হাসানের রোগ ধরা পড়ে না।
হামিদা হাসানের স্ত্রী।
সে রোজগেরে গিন্নি। বেঁকে বসেছে। চোখে ভারী চশমা। শিক্ষয়ত্রীর মতো পোচপাচ। সে বলে থাকব না হাতে টাকা আছে। অবিশ্বস্ত সম্পর্ক কোনো সম্পর্কই নয়।
ওর সঙ্গে আর নয়।
সে দারুণ হিসেবি। মাইক্রো ফিন্যান্স। মাইক্রোক্রেডিট নয়।
অন্যের সামনে কথা বলে মেপে। একটু লাজুক। কথা বলার সময়ে অধরে জমে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তবে হাসানের সঙ্গে কথা বলার সময় তার অধিকার বোধ চাগান দিয়ে ওঠে।
সে রোগ শয্যায় হাসানের দিকে নিরপরাধ বিড়াল চোখে আড়ে তাকায়।
এই তুমি ইদানীং জামার রং না মুছে চলে আস কেন?
অনেক রাতের অফিস, কী কর? তোমরা সামনে, ওই যে ছেড়িটা অত রাতে কী করে? ওর মাকে তুমি চেন।
হাসানের বাবা ওদের এই কথাবার্তা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে।
তার ইদানীং পেছন চিন্তার রোগে ধরেছে।
স্মৃতিগুলো ঘনঘন ধাক্কা দিচ্ছে। শেষ বিকেলে চিনি ছাড়া চা খেতে গিয়ে হাসানের মায়ের সঙ্গে আলাপনে মাতে। বড় ছেলের নাম ধরে স্ত্রীকে আবিরের মা বলে ডাকে।
বলে শোন আবিরের মা, সেই ছোটবেলায় নদী যখন ভাঙতো। ভাঙনের আগেই অনেক দূরে ফাটল ধরত। আমরা খেলার সময় দেখতাম। একবার এই ফাটলে আমার পা আটকে গিয়েছিল। তারপর একদিন শব্দ করে চাঙ্গর চাঙ্গর মাটি নদী গিলে ফেলত। আর এটা হতো শেষ রাতের দিকে। কিন্তু অন্ধকারেও বিপন্ন মানুষ নিজেরা সবার আগে গরু-বাছুর আর মূল্যবান জিনিসপত্র সরাতে ভুলত না।
হাসানের মা তার স্বামীর এই অলুক্ষণে কথায় রেগে যায়। বলে প্যাতর প্যাতর রাখেন। যা হওয়ার তাই হবে।
এ অলুক্ষণে কথা তুমি আমাকে আরো বলেছ। যখন তোমার এটা মনে পড়ে তখন আমাদের একটি না একটি সমস্যা হয়।
হাসানের বাবা থামে না।
তারপরে পরিবারগুলো দূরে গিয়ে ঘর বাঁধতো। কোন এক নদী থেকে কোদাল বা খোন্তা দিয়ে চাঙ্গর চাঙ্গর মাটি তুলত। নতুন গাছ লাগাত। নতুন শিশুরা আসত।
হাসানের মাও মুখ চালায় আনমনে বলে, কি সুন্দর ছিল আমাদের দিনগুলো। সুন্দর সরিষার মাঠ ছিল। তুমি আমাকে সরিষার ফুল এনে দিতে। শহরে তোমার চাকরি হলো। আমরা শহরে এলাম। ছেলেদের একজন ডাক্তার একজন ব্যাংকার।
তোমার দুশ্চিন্তার ফোঁড়া আর কখনো ফাটল না। ছেলের জন্য আমি ভালো বউ আনব। ছেলের গাড়ি ছিনতাই হয়েছে তো কী হয়েছে আবার গাড়ি কিনে দেব। এবারে ওদের কাছ থেকে বাগাব।
এবার ওরা দুজন পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে একজন বাম দিকে আর একজন ডান দিকে ফিরে।
মুঠো ফোনে লাবণ্যের ফোন। হিঃ হিঃ হাসি স্যার আপনার আর ভাবীর বিচ্ছেদ অনেকে জেনে গেছে। আর আমি তো আর একটি বাগিয়েছি। এখন চাইলেও আপনি আমাকে পাচ্ছেন না।
তো বলুন তো রক্তচাপের খরর কী?
হাসান এবার সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বলল, ফোন রাখ?
ফাজলামো কর। মানুষ আসলে একাকী। আমি একাই থাকতে চাই।
তুমি কি ঝুলে পড়েছ না কাউকে ফাঁসিয়ে দিয়েছ। অফিসের পিছন কক্ষে বেশ কয়েকজন মিলেঝিলে একবারে আড্ডায় মশগুল। বিষয় কে নির্বাহী প্রধান হবে। একজন বলে উঠলে, ওই যে লাল কুত্তাটা আছে না, আমি ওর পদ নিতে চাই। কিন্তু আমাদের দেয় না আর মেয়েরা পেয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কি চমৎকার এইচ আর অর হেইচ এম হার মেজেস্ট্রি। বললে ভালো হয়। আর যে হিজাব পরে না যে মেয়েটা। ও তো পাঙ্খাগজানো খ্রিস্টান ছেলেটির সঙ্গে লিভ টুগেদার করে।
দেখিছিস ওর চোখ। ভান ধরে থাকে যেন কিচ্ছু বোঝে না। মহাব্যবস্থাপক যার ফরাসি বান্ধবী চলে যাওয়ায় ছেলেসহ মানে বোনাসসহ একজন নতুন গৃহসম্রাজ্ঞী পেয়েছে, সে বলে ওঠে রহিমা বোধ হয় গর্ভবতী হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন বাচ্চাটা কার?
পাশে গন্ধগকুল নামের বিপণনের কর্মী দিনে চাকরি রাতে অন্য ব্যবসার মেয়েটি বলে ওঠে কেন যে আমি আরো আগে এসেছি। বছরে দুটো পদোন্নতি। আমি ব্যাংক থেকে এসেছি, খদ্দের ফাঁসানোর মজাটাই আলাদা। সে বলে ওঠে এই কোম্পানি টিকবে তো?
এটা তো করপোরেট এজমালি সম্পত্তি।
আমরা মর্জার পদক্ষেপে হেঁটে যাই কিছুই হয় না। আমার না শর্টস পরে আসতে ইচ্ছে হয়।
প্রধান নির্বাহী কিছুই বলে না। উনি তো প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত এর ধান্ধা শুধু মাই রেমিট্যান্স। টাকা কোথায়। ফারজানা না ইসাবেলা।
আর এই এডমিনের পাগলটা একবার বলেছিল যখন আমরা উচ্চৈঃস্বরে বোর্ড সভার আশপাশে ইচ্ছে করে হেসে উঠেছিলাম। আই অ্যাম ওয়াচিং দেখিস ওর চাকরি আগে যাবে।
অংশভাগীদের চোখে শঙ্কা। কি যে হবে। চলতে পারব তো। রহিমা বা লাবণ্য হতে পারে কৃষ্ণকলি বা ক্যামেলিয়া। বলে ওঠে আমরা ভিজি কিন্তু চুল ভেজে না।
খেলা করি অবিরাম সবিরাম।
এ জন্যই তো লাবণ্য চাকরির তিন বছরের মধ্যেই সহকারী ব্যবস্থাপক। নামও বদলালো চাকরিও বদলালো।
হাসান ছিনতাই হওয়া গাড়ির শোকে পাগল প্রায়। একদিন জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল একমনে সে সতর্ক চালক। একজোড়া সঙ্গমরত কুকুর সামনে পড়ে গেল। গাড়ি কুকুরিকে পিষে ফেলল। কুকুরটি দৌড়ে পালালো। দুপুরটি অসমাপ্ত রয়ে গেল।

বিশেষ রচনা

পলাশী যুদ্ধের খলনায়করা

জোবায়ের আলী জুয়েল

২৩ জুন বাঙালির কলঙ্কের ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনারা পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সঙ্গে মাত্র এক ঘণ্টার প্রহসনের যুদ্ধে পরাজিত হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে চক্রান্ত করে যারা সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেছিলেন বা নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন পরবর্তীকালে তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল মর্মান্তিকভাবে। এদের কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, কেউ দীর্ঘদিন কুষ্ঠ রোগে ভুগে মারা গেছেন, কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে। কেউ মারা গেছেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। কাউকে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। কেউ নিজের গলায় নিজেই ক্ষুর বসিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতায় অনেকেরই অস্বাভাবিক ও নিষ্ঠুরতম মৃত্যু হয়েছে। ইতিহাস কী নির্মম ও সত্য। পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা এসবই প্রমাণ করে। পলাশীর এসব ষড়যন্ত্রকারী কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তা তুলে ধরা হলো–

১. মীরজাফর : ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি। মীরজাফরকে লোকে ক্লাইভের গর্দভ বলে জানত। মীরজাফর নবাব আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শাহখানমকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সম্পর্কে তিনি ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার

মীরজাফর আলী খান

ঘষেটী বেগম

রবার্ট ক্লাইভ

নিকটাত্মীয়। তিনি ছিলেন একজন বোকা, রাজনীতি জ্ঞানবিহীন একজন সেনাপতি মাত্র। মীরজাফর কোরআন শরিফ ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন তার বাংলার সিংহাসনের ওপর কোনো মোহ নেই। পরবর্তীতে এ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের হাতেই কুষ্ঠ ব্যাধি দেখা দেয়। মীরজাফরের মৃত্যু হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। তিনি এ দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই ১৭৬৫ সালে ৭৪ বছর বয়সে মারা যান। তার মৃত্যুর আগে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহারাজ নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত এনে তাকে পান করতে দিয়েছিলেন। বলাবহুল্য, এ চরণামৃত মুখে করেই তার মৃত্যু হয়।

২. ইয়ার লতিফ : ইয়ার লতিফ খান ছিলেন নবাব সিরাজের একজন সেনাপতি। তিনি পলাশী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের মাঠে তার বাহিনী মীরজাফর, রায়দুর্লভের বাহিনীর ন্যায় পুত্তলির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। যুদ্ধের পর ইয়ার লতিফ নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক ইতিহাসবিদের ধারণা ইংরেজরা তাকে গোপনে হত্যা করেছিল।

৩. রায়দুর্লভ : রায়দুর্লভ ছিলেন নবাবের একজন সেনাপতি। তিনিও মীরজাফরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে তার বাহিনী মীরজাফরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্রে থেকে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৭৬৫ সালে মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী রায়দুর্লভের গলায় বালির বস্তা বেঁধে মুঙ্গেরের দুর্গশীর্ষ থেকে জীবন্ত দেহ নিক্ষেপ করেন গঙ্গার বুকে। এভাবেই গঙ্গায় সমাধি হয় তার।

৪. জগৎশেঠ : ইতিহাসের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রকারী রাজস্থানের কুসীদজীবী ব্যবসায়ী ফতেহ চাঁদের বংশধর ছিলেন জগৎশেঠ হিসেবে পরিচিত মাহতাব চাঁদ। প্রথমত তারা নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, পরে মীরজাফর ও অন্যদের এতে যুক্ত করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিলেন এই জগদ্বিখ্যাত মাড়োয়ারি জগৎশেঠ। জগৎশেঠের পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ৪০ লাখ টাকা। অর্থাৎ বর্তমানের মুদ্রামানে ৯০০ কোটি টাকা। মুর্শিদাবাগের টাঁকশাল ছিল জগৎশেঠের একক এখতিয়ার। তার আসল নাম ছিল স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ। জগৎশেঠের পিতামহের নাম ছিল ফতেহ চাঁদ জগৎশেঠ। জগৎশেঠের মৃত্যু হয় রায়দুর্লভের মতোই। বক্সারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠকে গলায় বালির বস্তা বেঁধে মুঙ্গেরের দুর্গ প্রাকার থেকে নবাব মীর কাশিমের আদেশে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে ডুবিয়ে মারা হয়। বাংলার ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী অধ্যায় যেমন ন্যক্কারজনক তেমনি এ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ও আমাদের রয়েছে।

৫. উমিচাঁদ : পলাশীর যুদ্ধের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী ছিলেন এই উমিচাঁদ। ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী সিরাজের পতন হলে তাকে নবাব সম্পত্তির চার আনা অংশ দিতে হবে বলে ইংরেজদের সঙ্গে এক জাল চুক্তিপত্র সই করেন এই উমিচাঁদ। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি ওয়াটস ছিলেন এ চুক্তিপত্রের প্রধান ব্যক্তি। লাল ও সাদা কাগজে এ দুটি চুক্তিপত্রের সই হয়। সিরাজের পতনের পর ওয়াটস-প্রদত্ত এ চুক্তি জাল বলে প্রমাণিত হয়। উমিচাঁদ নবাবের ধনরত্ন ও সম্পদ থেকে মোট ৪০ লাখ টাকা টাকার দাবিদার ছিলেন, যা বর্তমান মুদ্রামানে ৯০০ কোটি টাকার সমান। উমিচাঁদ এ জাল দলিলের জন্য সিরাজের সম্পত্তির কোনো অর্থ পাননি। মূলত ওয়াটসই ছিলেন এ জাল দলিলের উদ্ভাবক। এ অর্থের শোকে উমিচাঁদ বদ্ধপাগল হয়ে রাস্তায় নেমে যান। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে মুর্শিদাবাদের পথে-প্রান্তরে আকাশের দিকে মুখ করে লাফ দিতে দিতে 'লাল কাগজ ও সাদা কাগজ' বলে চিৎকার করে বেড়াতেন। এভাবে উমিচাঁদ চিৎকার করতে করতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকস্মাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কী নিদারুণ ও দুর্বিষহ তার এ মৃত্যু।

৬. রাজা রাজাবল্লভ : আমাদের ঢাকার রাজা ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের একত্রে সহযোগী ছিলেন ঢাকার এই কুখ্যাত ষড়যন্ত্রকারী রাজা রাজবল্লভ। তারও শেষ পর্যন্ত হয় অস্বাভাবিক মৃত্যু। এক অপঘাতে তিনি

নিদারুণভাবে নিহত হন। পরে তার সমুদয় কীর্তি পদ্মা নদী গ্রাস করে কীর্তিনাশা নাম ধারণ করে।

৭. মহারাজা নন্দকুমার : পলাশীর ষড়যন্ত্রের পর নন্দকুমারকে মীরজাফর দেওয়ান নিযুক্ত করে সব সময় তাকে নিজের কাছে রাখতেন। নন্দকুমার ভূষিত ছিলেন মহারাজা উপাধিতে। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সাজানো মিথ্যা মামলায় আসামির কাঠগড়ায় তার বিচার হয়। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, তাকে শেষ পর্যন্ত এ বিচারের রায়ে শেওড়াগাছে ঝুলতে হয় ফাঁসিকাষ্ঠে। মহারাজা নন্দকুমারের সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মীরজাফর তার শেষ জীবনে যাবতীয় কাজকর্ম নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে করতেন। তার অন্তিম শয্যায় নন্দকুমারই তার মুখে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত তুলে দিয়েছিলেন।

৮. ঘষেটী বেগম : ঘষেটী বেগম ছিলেন আলীবর্দী খানের কন্যা। সিরাজের খালা ঘষেটী বেগম তার পোষ্য ছেলেকে সব সময় বাংলার সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। সে জন্য সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পরই ঘষেটী বেগমকে প্রাসাদে বন্দি করে রাখেন। এ ছাড়া ঘষেটী বেগম প্রচুর অবৈধ ধনসম্পদেরও মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে পলাশী যুদ্ধে সিরাজের পতন ও মৃত্যুর পরে মীরজাফরের পুত্র মিরন ঘষেটী বেগমকে ঢাকার জিঞ্জিরায় বন্দি করে রাখেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঘষেটী বেগমকে জিঞ্জিরার কাছে খরস্রোতা বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় তুলে নৌকা ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। ঘষেটী বেগমের আর্তনাদ-আহাজারি নদীর কিনার থেকে নিশুতি রাতে পথচারীরা শুনতে পেয়েছিল।

৯. মিরন : মিরন পলাশী ষড়যন্ত্র-পরবর্তী প্রধানতম নায়ক ছিলেন। তার পুরো নাম মীর মোহাম্মদ আলী খান। সিরাজের মূল হত্যাকারী, সিরাজের মা আমেনা বেগম, ভাই মির্জা মেহেদিকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন মিরন। তারই নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করেন। শুধু হত্যা নয়, সিরাজউদ্দৌলার লাশকে মিরন ক্ষতবিক্ষত করে তারই প্রিয় হাতির পিঠে বেঁধে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর প্রদক্ষিণ করিয়েছিলেন; যাতে সবাই এ বীভৎস দৃশ্য দেখে পরবর্তীতে বাংলার বুকে বিদ্রোহ করতে না পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সিরাজের মা আমেনা বেগম তার ছেলের লাশ দেখার জন্য দৌড়ে হাতির কাছে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং সে সময় মিরনের দুর্বৃত্তরা সিরাজের মাকে কিল, চড় ও ঘুষি মেরে আবার জেলখানায় বন্দি করে রাখেন। হাতিটা কিন্তু সে সময় সিরাজের লাশ তার পিঠে নিয়ে আমেনা বেগমের সামনে বসে পড়ে।

মিরনের মৃত্যু ঘটে বজ্রাঘাতে। মীরজাফর তখনো বাংলার নবাব। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই পিতার কানে সে সংবাদ পৌঁছেছিল। তিনি মিরনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। মুর্শিদাবাদে মিরনের লাশ নিয়ে আসা হলো। কী বীভৎস বিকৃত পোড়া লাশ। পিতাকে না দেখতে দিয়ে লাশ দাফন করা হলো। এভাবেই মিরনের মৃত্যু।

ইতিহাস বলে, মিরনকে আততায়ীর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড় আর ঘন ঘন বজ্রপাতের সময় মদ্যপ মিরনের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। এটা আর কিছুই নয় আসল ঘটনাকে চাপা দেয়ার একটা কৌশলমাত্র। মিরনকে হত্যা করেন ইংরেজদের নির্দেশে মেজর ওয়ালস। তবে তার এ ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইংরেজরা বজ্রাঘাতে মিরনের মৃত্যুর মিথ্যা গল্প বানিয়েছিল।

১০. মোহাম্মদী বেগম : মোহাম্মদী বেগ ছিলেন নবাব আলীবর্দী খাঁর পোষ্য। আলীবর্দী খাঁর আমল থেকেই তার পরিবারের একজন সদস্যরূপে তার স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গেও তার বিশেষ সখ্য ছিল। সিরাজউদ্দৌলাকে মিরনের নির্দেশে হত্যা করেছিলেন মোহাম্মদী বেগ, যাকে আলীবর্দী খাঁ কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন। মোহাম্মদী বেগ একটা খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। দিনটি ছিল ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই। নবাব সিরাজ এ সময় তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাননি। তিনি কেবল তার কাছ থেকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কুখ্যাত মোহাম্মদী বেগ সিরাজের সেই অন্তিম ইচ্ছাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মোহাম্মদী বেগ দাম্পত্য কলহে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় একটি কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। এভাবেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

১১. ওয়াটসন : ওয়াটসন ছিলেন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি। পলাশীর ষড়যন্ত্রকারী ওয়াটসন ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কোনো ওষুধে ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২. ওয়াটস : পলাশী যুদ্ধে ওয়াটস ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি রমণী সেজে পালকিতে চড়ে মীরজাফরের বাড়ি গিয়ে চুক্তিতে তার স্বাক্ষর এনেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির কাছ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় ইংল্যান্ডে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

১৩. স্ক্রাফটন : পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী সিরাজের সম্পদের লুটপাটের পেছনে স্ক্রাফটন বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার বিপুল ধনসম্পন লুণ্ঠন করে বিলেতে যাওয়ার পথে জাহাজডুবি হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৪. রবার্ট ক্লাইভ : পলাশী যুদ্ধের পর হীরাঝিল প্রাসাদের ধনাগারটি লুটের বখরা বাবদ ক্লাইভ পান ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এ ছাড়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাকে আরও ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা দেন মীরজাফর। স্ক্রাফটনের বিবৃতি থেকে জানা যায়, রবার্ট ক্লাইভ ৩০টি নৌকা বোঝাই করে ধনরত্ন নিয়ে যান ইংল্যান্ডে। বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, হত্যা-রাহাজানি, ঘুষ, জালিয়াতি, নারী ধর্ষণ, বাংলার নবাব পরিবারকে হত্যার জন্য লন্ডনের হাউস অব কমন্স সভায় ক্লাইভের বিচার হয়। বিচারের রায়ে ক্লাইভের ফাঁসির হুকুম হয়। এ ফাঁসির দণ্ড থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। বহুকষ্টে তিনি মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পান। বরার্ট ক্লাইভের মৃত্যুও মর্মান্তিকভাবে হয়েছিল। পলাশী ষড়যন্ত্রের ঘটনা তাকে পরবর্তীতে কোনো দিন মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে দেয়নি। স্বজনদের ওপর ক্ষোভে, অভিমানে ইংরেজপক্ষের মূলনায়ক রবার্ট ক্লাইভ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজের গলায় নিজে ক্ষুর চালিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

১৫. মীর কাশিম : নবাব মীর কাশিম ছিলেন মীরজাফরের জামাই। ভগবানগোলায় পলাতক ছদ্মবেশী নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মীর কাশিমই সর্বপ্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি বাংলার নবাব হন এবং ইংরেজদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

বহু প্রস্তুতি, বহু প্রচেষ্টা, যুদ্ধ-সংগ্রাম করে ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার পরে তিনি বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে ছুটে বেড়াতে থাকেন। জঙ্গলেই তার দুই পুত্র ইংরেজদের হাতে নিহত হন।

১৭৭৭ সালের ৬ জুন মীর কাশিম দিল্লির রাজপথে এক বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকেন। এক কালের লাখ লাখ নর-নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহাসম্মানিত নবাব মীর কাশিম আলী খানের দেশ উদ্ধারের সব প্রচেষ্টা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় এবং অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, তার দেহের পোশাক দিয়েই তার অন্তিম শয্যা রচিত হয়। কী নির্মম নিয়তি ও অদৃষ্ট! কারণ ইতিহাস কোনো ষড়যন্ত্রকারীকেই ক্ষমা করে না।

এভাবেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের কিছুকালের মধ্যেই বিভিন্ন পন্থায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলাশীর ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস– এ শিক্ষাই আমাদের মনে রাখার অঙ্গীকার করা উচিত।

তথ্যসূত্র

১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস : আবদুর রহিম

২. অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্টরি অব ইন্ডিয়া : আরসি মজুমদার ও কালিশঙ্কর দত্ত

৩. ইতিহাসের অন্তরালে : ফারুক মাহমুদ

৪. আলীবর্দী অ্যান্ড হিজ টাইম : কেকে দত্ত

৫. সিরাজউদ্দৌলা : অক্ষয়কুমার মৈত্র

৬. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বাংলার মসনদ : ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক

৭. মুর্শিদাবাদ কাহিনী : নিখিলনাথ রায়, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

বিশেষ রচনা

স্পেনের ইতিহাসে করুণ কাহিনী

ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক

১৪৯২ সালে মুসলমানরা ফার্দিনান্দ-ইসাবেলার খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ করলে খ্রিস্টানরা সন্ধির কোনো অংশই মানল না। ইহুদি ও মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করতে লাগল। ১৫৬৮ সালে মুসলমানদের অবস্থা হলো অসহনীয়। যে জমিতে তারা একদা শাসন করেছে তাদের সম্পত্তি ও অধিকারকে পদদলিত করে তাদের জঘন্য দাসত্বে পর্যবসিত করে তারা সন্তুষ্ট থাকেনি। ইতিহাসবিদ লেনপুল লেখেন, 'খ্রিস্টানরা তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন কামনা করছিল– তাদের গৌরবময় স্থানের স্মৃতিকে পর্যন্ত তারা ধ্বংস করতে চায়।' এ সময় মস্তিষ্ক বিকৃত ও ধর্মান্ধ দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে। গ্রানাডার আর্চবিশপও ছিলেন একই ধরনের ভয়ংকর ও ধর্মান্ধ। তিনি রাজার কাছ থেকে একটা হুকুমনামা হাসিল করলেন যাতে বলা হলো, মুসলমানদের তাদের ভাষা, রীতিনীতি, রেওয়াজ, চালচলন এবং তাদের সব ধরনের প্রতিষ্ঠান একই দিনে ছাড়তে হবে। লেনপুল লেখেন, মুসলমান বিধর্মীদের তাদের সৌন্দর্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়তে বলা হলো। বলা হলো, তাদের হ্যাট পরতে হবে

(ইসলামবিরোধী কামাল আতাতুর্ক এই হ্যাটের পক্ষে একনায়কসুলভ ফরমান জারি করেছিলেন। বর্তমান লেখক), পরতে হবে খ্রিস্টানি পোশাক। কোনো গোসল করা চলবে না এবং তাদের বিজয়ীদের অর্থাৎ খ্রিস্টানদের ময়লা ধারণ করতে হবে (এরাই কি তবে সভ্য ইউরোপ যার গর্ব বুশ গং করেন, সভ্য ও অসভ্যের লড়াইয়ে বুশ নাকি সভ্য সমাজের নেতা। বর্তমান লেখক)। তাদের নিজেদের ভাষা ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে নিজস্ব রীতিনীতি-রেওয়াজ-চালচলন এবং অনুষ্ঠানগুলো। এমনকি তাদের নাম বদলাতে হবে, স্প্যানিশ ভাষা বলতে হবে, স্প্যানিশদের মতো চালচলন কতে হবে এবং নিজেদের স্প্যানিশ বলতে হবে। একটি জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিজাতীয়করণ, বিশেষ করে আলমনজুর (হাজিব আলসুর নামে প্রখ্যাত উজির ও বিজয়ী বীর) ও আবেন সেরাজেমের (বনু-সারাজ) বংশধরদের পক্ষে হজম করা কঠিন। কোণঠাসা হয়ে, দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানরা বিদ্রোহ করল। এটা ছিল একটা আপসহীন সংগ্রাম। তিন বছরের অবিরত লড়াইয়ের পর বিদ্রোহ দমন করলেন অস্ট্রিয়ার কুখ্যাত জারজ রাজকুমার ডন জুয়ান। ইনি সম্রাট পঞ্চম চার্লসের জারজ সন্তান, তার প্রেমিকা বারবারা ব্রমবার্গের গর্ভে। ডন জুয়ান পাইকারি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান। পুরুষ, নারী ও শিশুদের তার চোখের সামনে টুকরো টুকরো করা হয়। আলপুজারাসের গ্রাম ও উপত্যকাগুলো মানুষের কবরে পর্যবসিত হলো। হতভাগ্য মানুষ যারা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয় তাদের ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করা হয়। এসব ঘটনা ১৫৭০ সালের দিকের। উল্লেখ্য যে ১৫৭১ সালে লেপান্টের নৌযুদ্ধে তুর্কি নৌবাহিনী স্পেন, ভেনিস ও পোরে কোয়ালিশন নৌবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। 'নন-ভায়োলেন্ট' যিশুর ভায়োলেন্ট পোপ এই কোয়ালিশনের শরিকদার। মিলিটান্ট ক্রিস্টিয়ানিটি মূর্তমান হলো। ডন জুয়ান খ্রিস্টান কোয়ালিশন বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এ যুদ্ধ ও ১৫২৫ সালে স্থলযুদ্ধে তুর্কিদের ব্যর্থ ভিয়েনা অবরোধ, তুর্কিদের ইউরোপের আরো পশ্চিমে প্রবেশে আটকায়। টুরসের জলযুদ্ধে যেমন ফ্রান্সের মাঝে গিয়ে আরব-বারবাররা আটকে যায় উত্তর ইউরোপে প্রবেশ করতে, তুর্কিদের ব্যাপারে তাই হলো ভিয়েনা ও লেপান্টে। তবে আরবরা সিসিলিসহ দক্ষিণ ইতালিতে রাজত্ব করেছিল। এত হত্যা, এত বহিষ্কারের পরও বহুসংখ্যক 'মরিস কোস' (যা মুসলমানদের এখন বলা হতে লাগল, এর অর্থ 'ছোট মুর' অর্থাৎ 'ছোট মুসলমান') রয়ে গেল। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে ভ্যালেনসিয়া ও মরসিয়াতে। ১৬১০ সালে স্পেনের রাজা তৃতীয় ফিলিপ তার বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করলেন। পাঁচ লাখের বেশি মুসলমানকে জোর করে আফ্রিকায় বহিষ্কার করা হলো। তাদের সেখানে অর্থ-খাবার ছাড়াই উপকূলে ফেলে আসা হলো। যারা স্পেনের ভেতরে ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ, তাদের নির্দয়ভাবে ফ্রান্সের সীমান্তে বিতাড়িত করা হলো। এরা এককালে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী জাতির অংশ ছিল। পথে যারা স্প্যানিশদের নির্মমতা ও রাস্তার কষ্ট সহ্য করে বাঁচল, তারা জাহাজে করে মুসলিম দেশে চলে গেল।

এভাবে স্পেনের মাটি থেকে একটা সাহসী, কর্মঠ, প্রতিভাবান ও শিক্ষিত গোষ্ঠীকে বিতাড়ন করা হলো। এরা এ আইবেরিয়ান উপদ্বীপে জীবনের সঞ্চার করেছিল যা পূর্ববর্তী শাসনামলে ছিল মৃতপ্রায় অনুর্বর। মুসলমানরা আন্দালুসিয়াকে একটা বাগিচায় পরিণত করে। যখন ইউরোপের চারদিকে ছিল অন্ধকার, তারা জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল আন্দালুসিয়ায়। তারা সেখানে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়, সভ্যতাকে উৎসাহিত করে, প্রতিষ্ঠা করে বীরের রীতিনীতি (সিভালরি)। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তারা আধুনিক ইউরোপের জন্ম দেয় (পৃষ্ঠা ৫৬৩)। মুসলমানদের বিতাড়ন করে আন্দালুসিয়া কী পেল? যে আন্দালুসিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী সংস্কৃতি, বিদ্যা ও কলার কেন্দ্র ছিল, এখন অনুর্বর হয়ে গেল। স্পেন হয়ে পড়ল জ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটা বিরানভূমি। কন্ডি, যিনি নিজেই একজন স্প্যানিশ, বলেছেন, "যেসব দেশে মুসলমানদের উপস্থিতি ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্য ছড়িয়েছিল, সেখানে এখন অনন্তকালীন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। প্রকৃতি বদলায় না; এলাকা এখনো হাসছে; কিন্তু জনগণ ও তাদের ধর্ম গেছে বদলে। এ বিরানভূমিতে কিছু ক্ষতবিক্ষত ইমারত এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের ওপর। কিন্তু এসব ইমারত থেকে, এসব শীতল ধ্বংসস্তূপ থেকে সত্যের আওয়াজ আসে– 'সম্মান ও গৌরব পরাজিত আরবদের, পতন ও দুঃখ বিজয়ী স্প্যানিশদের জন্য'।"

ধর্মান্ধ, গোঁড়া ও মৌলবাদী খ্রিস্টানরা যে কী জঘন্য কাজ করেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিহাসবিদ লেনপুলের মন্তব্যে। তিনি লেখেন, "ভ্রান্তির দ্বারা চালিত স্প্যানিশরা বোঝেনি তারা কী করেছে। মুসলমানদের বহিষ্কার তাদের খুশি করেছে; এর চেয়ে চাকচিক্যময় ও রোমাঞ্চকর অনেক দিন হয়নি। লো পে ডি ভেগা গাইল 'ন্যায়বিচার' নামক গীত যা দিয়ে তৃতীয় ফিলিপ আফ্রিকায় বহিষ্কার করল মুসলমানদের। ভেলাজকুয়েজ এটাকে তুলিতে আঁকল স্মৃতিস্বরূপ। এমনকি নরম ও সহ্য শক্তিধারী সারভেনটেজ ('ডন কুইটজোট'-এর লেখক) এটাকে সঠিক বলে প্রমাণের চেষ্টা করলেন। তারা বুঝতে পারলেন না যে তারা তাদের সোনার হাঁসকে মেরে ফেলেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেন ছিল সভ্যতার কেন্দ্র। কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রতিটি মার্জিত সংস্কৃতি ছিল আবাস। মুসলমানদের চর্চিত সভ্যতার ধারেকাছেও ছিল না ইউরোপের আর কোনো দেশ। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা এবং পঞ্চম চার্লসের সাম্রাজ্যের স্বল্পকালীন জাঁকজমকের ছিল না দীর্ঘ গৌরব। মুসলমানদের বিতাড়ন করা হলো। কিছু দিনের জন্য খ্রিস্টান স্পেন চাঁদের মতো ধার করা আলো দ্বারা বিকিরণ করল; তার পরে এলো গ্রহণ, আর তার অন্ধকারে স্পেন হাতড়াচ্ছে সেই থেকে। মুসলমানদের সত্যিকারের স্মৃতিচিহ্ন দেখা যাবে সম্পূর্ণ অনুর্বর বিরানভূমিতে, যেখানে মুসলমানরা একসময় শ্যামল বাগিচা তৈরি করেছিল। জলপাই ও সোনালি ফসল ফলাত। বোবা ও মূর্খ জনগণের ভেতর সেখানে একসময় ছিল বুদ্ধি ও বিদ্যা। মুসলমানদের সত্যিকারের স্মৃতি রয়েছে দেশের সাধারণ স্থবিরতা ও জনগণের নীচতায়, যা জাতিগুলোর ভেতর আশাহীনভাবে খুবই নিম্নে, আর স্প্যানিশরা এ অবমাননার যোগ্য।" মুরসইন স্পেন। ক্যাসটিলিয়ান খ্রিস্টান সেনারা গ্রানাডায় ২ জানুয়ারি, ১৪৯২ সালে প্রবেশ করল।

ফিলিপ কে হিট্টি 'হিস্টরি অব দি অ্যারাবস' গ্রন্থে লেখেন, ক্যাথলিক ধর্মীয় রাজা-রানী ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা আত্মসমর্পণের ওয়াদার শর্ত পালনে ব্যর্থ হলেন। রানীর ধর্মীয় কনফেসর কার্ডিনাল জি মেনেজ ডি সিমনে রোসের নেতৃত্বে ১৪৯৯ সালে জোর করে খ্রিস্টান অভিযান শুরু হয়। কার্ডিনাল প্রথমে আরবিতে ইসলামসংক্রান্ত বই-পুস্তক প্রচার বন্ধ করার প্রচেষ্টায় সেসব পোড়াতে লাগলেন। গ্রানাডা আরবি পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর স্থান হলো। তারপর ইনকুইজিসন ধর্ম আদালত বসানো হলো, আর খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গ্রানাডার পতনের পর যেসব মুসলমান সেখানে রয়ে গেল সবাইকে বলা হলো, 'মরিস কোস' (অর্থ 'ছোট মুরস'), আগে শুধু ধর্মান্তরিত স্প্যানিশ মুসলমানদের যে নামে ডাকা হতো। 'মুর' শব্দটা 'মরি টেনিয়া' থেকে এসেছে, যা রোমানরা দিয়েছে। আর এর অধিবাসীদের বলত 'মউরি' যে শব্দটা সম্ভবত ফিনিশীয় 'পশ্চিম' অর্থে। এ থেকে স্প্যানিশ 'মরো', ইংরেজি 'মুর'। উত্তর আফ্রিকার বারবার উপজাতিরা প্রকৃত 'মুর' তবে স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সব মুসলমানকে এ নামে অভিহিত করা হয়। ম্যাগেলান ১৫২১ সালে ফিলিপাইন অঞ্চলে পৌঁছলে, ফিলিপাইন নামে স্প্যানিশরা দেয় রাজা ফিলিপের নাম অনুসারে, সেখানকার মুসলমানদের 'মুর' বলে তারা। মুসলিম স্প্যানিশরা রোমান ভাষার উপভাষা বলত, তবে আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করত। মরিস কোসরা যে সাহিত্য রেখে গেছেন তা নানা প্রকারের ও ভাষাগত দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সাহিত্যের নাম 'আলজামিয়াডো' যা আরবি 'আল-আজামিয়া' অর্থাৎ 'বিদেশি ভাষা' শব্দাবলি থেকে এসেছে। এর একটা সংগ্রহ আরবদের এক পুরনো বাড়ির মেঝেতে পাওয়া যায়, সেখানে সম্ভবত এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ইনকুইজিসনের ধর্মীয় কর্মকর্তাদের চোখ এড়াতে। (হিট্টি, পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৫৬)।

হিট্টি লেখেন, সবাই না হলেও অনেক মরিস কোস স্প্যানিশ রক্তের। কিন্তু সবাইকে 'স্মরণ' করিয়ে দেয়া হলো যে তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন খ্রিস্টান এবং তারা অবশ্যই খ্রিস্টান হবে

আনুষ্ঠানিকভাবে, না হয় পরিণতির সম্মুখীন হবে। মোডেজারদের ('মোডেজার' হলো আরবদের সংস্কৃতি গ্রহণকারী খ্রিস্টানরা) মরিস কোসদের সঙ্গে একই কাতারে নেয়া হলো এবং অনেকেই হয়ে গেলেন ভেতরে মুসলমান, বাইরে খ্রিস্টান, আবার গোপনে ইসলাম পালনকারী। কেউ কেউ খ্রিস্টান বিবাহ পদ্ধতি পালন করে ঘরে ফিরে গোপনে মুসলিম মতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে; অনেকেই বাইরের জন্য খ্রিস্টান নাম রাখে, আর ঘরের জন্য আরবি নাম। (ওই, পৃষ্ঠা ৫৫৬)।

হিট্টি লেখেন, ১৫০১ সালের দিকে একটি রাজকীয় হুকুমনামায় বলা হয়– ক্যাসটাইল ও লিওনের সব মুসলমানের ধর্মকে প্রত্যাহার করতে অথবা স্পেন পরিত্যাগ করতে হবে। তবে এটা তেমন জোরালোভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ১৫২৬ সালে আরাগনের মুসলমানদের একই বিকল্পের মুখোমুখি হতে হলো। ১৫৫৬ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ একটা আইন জারি করলেন যাতে বাকি সব মুসলমানকেই তাদের ভাষা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জীবনযাত্রা প্রণালি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে বলা হলো।

তিনি স্প্যানিশ বাথগুলো (মুসলিম হাম্মামখানা) ধ্বংসের নির্দেশ দিলেন কারণ এসব বিধর্মীদের চিহ্ন। গ্রানাডায় দ্বিতীয়বারের মতো মুসলিম বিদ্রোহ হলো এবং পাশের পাহাড়গুলোয় ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তা দমন করা হলো। বহিষ্কারের শেষ হুকুমে দস্তখত দিলেন সম্রাট তৃতীয় ফিলিপ ১৬০৯ সালে, যার পরিণতিতে বাস্তবে সব মুসলমানকে পাইকারিভাবে জোরপূর্বক স্পেনের মাটি থেকে বহিষ্কার করা হলো। প্রায় পাঁচ লাখ এই ভাগ্যে বাঁধা পড়ে, আফ্রিকার তীরভূমিতে পৌঁছে অথবা জাহাজে চড়ে ইসলামের দূরবর্তী দেশে চলে যায়। এসব মরিস কোস থেকেই মরক্কোন করসেরস (সামুদ্রিক প্রতিরোধ সশস্ত্রবাহিনী) গঠিত হয়। গ্রানাডার পতন থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হিসাব করা হয় যে প্রায় ৩০ লাখ মুসলমানকে হয় বহিষ্কার অথবা হত্যা করা হয়েছে। স্পেনে মুসলিম সমস্যা চিরতরের জন্য সমাধান করা হলো। এটা একটা ব্যতিক্রম বিষয় হলো এ জন্য যে আরব সভ্যতা যেখানেই গেছে সেখানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লেনপুল তার 'মুরস ইন স্পেন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৮০) বলেন, 'মুসলমানদের বহিষ্কার করা হলো; কিছু দিনের জন্য খ্রিস্টান স্পেন ধার করা আলো দ্বারা জ্বলজ্বল করল চাঁদের মতো; তারপর এলো গ্রহণ, আর সেই অন্ধকারে স্পেন সেই থেকে হাতড়াচ্ছে।' (হিট্টি, পৃষ্ঠা ৫৫৬)। সিরীয় লেখক আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবি তার 'উম্মুল কোরা' গ্রন্থে স্পেনে মুসলমানদের পরাজয় সম্পর্কে লেখেন, 'তুর্কি সুলতানরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন।' (পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫)। কাওয়াকেবি মন্তব্য করেন যে তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ফাতেহ স্পেনের খ্রিস্টান রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলার সঙ্গে গোপনে এ চুক্তি করে রাখেন যে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ফাতেহ আন্দালুসিয়ায় বনু আহমদের (নাসিরি বংশ) সর্বশেষ আরব রাজত্ব খতম করার জন্য এ দুজন খ্রিস্টান শাসককে পুরোপুরি সুযোগ দেবেন। এ চুক্তি অনুযায়ী সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ আন্দালুসিয়ার ৫০ লাখ মুসলমানের হত্যাযজ্ঞ এবং তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো মেনে নেন। মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সুলতান আফ্রিকার মুসলিম বাহিনীর রণপোতকে বাধা দেন। এর বিনিময়ে সুলতান সেই রণপোতের সাহায্যে প্রথমে মুসলিম দুনিয়ায় এবং পরে বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে হামলা করার এবং খ্রিস্টানদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার সুযোগ লাভ করেছেন। উর্দু লেখক মওলানা খলিল আহমদ হামেদি মন্তব্য করেন, বিস্মিত হতে হয় এ জন্য যে আবদুর রহমান কাওয়াকেবির মতো আরব নেতাও অন্ধভাবে তুর্কিদের বিরুদ্ধাচরণে এতটা কঠোর হয়ে গেলেন যে ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথাও চিন্তা করলেন না। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করেন (আর ফার্দিনান্দ ইসাবেলা বিবাহ করেন ১৪৬৯ সালে)। ১৪৮১ সালে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ মৃত্যুবরণ করেন। তখনো গ্রানাডায় ইসলামী রাজত্ব বহাল ছিল। আর ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার হাতে স্পেনের পতন হয় ১৪৯২ সালে। আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ এবং জোরপূর্বক খ্রিস্টানে পরিণত করার অভিযান শুরু হয় এরও কয়েক বছর পর। আবদুর রহমান আল কাওয়াকেবি তুর্কি সুলতানদের বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেন আরব জাতীয়তাবাদীরা পরবর্তীকালে অশিক্ষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেসব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। আল-কাওয়াকেবি তুর্কিদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও উত্থাপন করেন যে যখন স্পেনের খ্রিস্টান শাসকরা আন্দালুসিয়ায় অবশিষ্ট মুসলমানদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারছিল, তখন ওসমানি তুর্কি সুলতান সলিম মিসরে আব্বাসি (মামলুক?) শাসকদের সমূলে উৎপাটিত করছিলেন। আর এ জুলুম-নির্যাতনের সব সীমালঙ্ঘন করছিলেন। এমনকি সুলতান সলিম গর্ভবতী নারীদের হত্যা করা থেকেও নিবৃত্ত হননি। (ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিসর, পৃষ্ঠা ২৪-২৫)।

৩%
ক্যাশব্যাক

% interest
EASY BUY
Bank Asia

ক্রেডিট কার্ড আর
ঈদের চাঁদ
হরেক স্বপ্নের
বাজিমাত

নির্ধারিত
আউটলেট সমূহে
ডিসকাউন্ট প্রযোজ্য

এই ঈদে ব্যাংক এশিয়া ক্রেডিট কার্ড দিচ্ছে
একসাথে অনেকগুলো আকর্ষণীয় সুবিধা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য কল করুন:
১৬২০৫ (দিন-রাত, সপ্তাহ)

কার্ডস্ ডিপার্টমেন্ট
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
টি বোর্ড বিল্ডিং, ৩য় ও ৪র্থ তলা
৯১৯-৯২৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ই-মেইল : ba.cards@bankasia-bd.com

ব্যাংক এশিয়া

পবিত্র ঈদুল ফিতর
উপলক্ষে সিলেট মহানগর
আওয়ামী লীগের
পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই
ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিলেট মহানগর।

ঈদ মুবারক
ঘরে ঘরে ঈদের খুশী, ঘরে ঘরে
প্রাণ
লাচ্ছা সেমাই
Lachcha
স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সম্পূর্ণ মান নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক মেশিনে প্রস্তুত প্রাণ লাচ্ছা সেমাই, ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে দেবে, নিশ্চিত করবে আপনার স্বাস্থ্য আর স্বাদ। প্রাণ লাচ্ছা সেমাই মানেই পুষ্টি দিয়ে মিষ্টিমুখ।

সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার মত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে
আমরা ছিলাম, আমরা আছি ও আমরা থাকব আপনার পাশে

RUPAYAN

আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে জানাচ্ছে

ঈদ মোবারক

RUPAYAN
Kamar Uddin Tower
B/A/20 Progati Sarani
Malibagh, Dhaka

RUPAYAN
Trade Center
114, Kazi Nazrul Islam Avenue,
Banglamotor, Dhaka.

RUPAYAN
S. Baily
Dag No: 35, Mowza: Chashara
Narayanganj.

RUPAYAN
Nowfa
1103, Ibrahimpur, Kachu Khet,
Dhaka.

RUPAYAN
Housing Estate Ltd

Corporate : 02 8822526
Motijheel : 02 9556320
Narayanganj : 02 7649185

Chittagong : 0312516760
Sylhet : 08212832092

আনন্দময় মুহূর্তে -
প্রেয়সীকে কাছে পাবার জন্য
প্রেয়সী
নাইট টেলক
রোমাঞ্চকর অনুভূতির জন্য
তৃপ্তিকর প্রশান্তির জন্য
রেশমী পরশের জন্য
স্বপ্নকে কাছে পাবার জন্য
সুগন্ধ ও শিহরণের জন্য
প্রেয়সী নাইট টেলক
ব্যবহার করার পর
অতিরিক্ত সুগন্ধি ব্যবহার
নিষ্প্রয়োজন।
প্রেয়সী নাইট টেলক-এর ৩ টি কন্টেইনারের গিফট বক্স পাওয়া যাচ্ছে। আপনার প্রিয় জনকে উপহার দিন। আনন্দ উপভোগ করুন

ঈদ উপলক্ষে বসুকুঞ্জ গ্রুপে বিশাল মূল্যছাড়

Member : REHAB Member : BLDA

ISO : 9001-2008 Certified

bldl

বসুকুঞ্জ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ (BLDL)

(পূর্বাচল উপশহরের ১নং ও ২নং সেক্টর গাঁ ঘেষে)

- কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ দূরত্ব
- এককালিন মূল্য পরিশোধে কাঠা প্রতি ৫০% ছাড়
- বহু প্লট রেজিঃ ও হস্তান্তর করা হয়েছে
- বালি ভরাটের কাজ দ্রুত চলছে

ঢাকা অফিস: বাড়ী # ৪৫, ফ্ল্যাট ই-১ (৬ষ্ঠ তলা), রোড # ২৭, ব্লক # এ, বনানী, ঢাকা।
চট্টগ্রাম অফিস : হাইপেরিয়ন শাফি-শামস, ১১৪ চাঁন্দমারি রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৯১৫-৭০০২১১, ০১৭১১-১৫৯৪৩৭, ০১৭৩৬-৬৬১১৬৯
০১৬৮৩-৭৫৬৮৫৭, ০১৭১২-৬২৮৩৯০, ০১৭১১-২২৯৪৮৭, ০১৯১৭-২৮৮৫৯৬

Web Site: www.basukunjagroup.com, E-mail: basukunja@yahoo.com

কাগজপত্র যাচাই করে দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছি

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরবাসীকে জানাচ্ছি

আন্তরিক শুভেচ্ছা

ঈদ সকলের মনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ

আজিজুল আলম বেন্টু

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও
মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা
রাজশাহী।

সফলতার ১২ বছর

পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন

ট্রেডমার্ক নং-141224

কলিকাতা হারবাল লিমিটেড

প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

হেড অফিস ঃ নগর ভবনের পশ্চিম পাশে কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ 01755600100

রংপুর অফিস ঃ শাপলা চত্বর,রংপুর। মোবাইল ঃ 01750022057

দিনাজপুর অফিস ঃ লিলির মোড়, দিনাজপুর। মোবাইল ঃ 01750022056

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা হারবাল একটি লিমিটেড কোম্পানি এবং ট্রেডমার্ক প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কলিকাতা হারবাল লিমিটেড এর নাম ভাঙ্গিয়ে আমাদের সুনাম নষ্ট করে ও কু-রুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারনের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মনে রাখবেন কু-রুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রতারণার শামিল। তাই ঐসব নকল প্রতিষ্ঠান হতে সাবধান আসল কলিকাতা হারবাল লিমিটেড এর শাখা সমূহ চিনতে ও জানতে সরাসরি ফোন করুন

রাজশাহী হেড অফিসের এই নম্বরে- 01713-202222 অথবা 01919-111120

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্যই রক্ষা করে না জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তাই বেশি বেশি ঔষধী গাছ লাগান, জীবন ও পরিবেশ বাঁচান।

Export Promotion Bureau
Bangladesh
Explore Bangladesh
Market & Discover the
wide range of our
exportable products
www.epb.gov.bd

EXTRA
communication

Our Services

Success of 5 years

- Public Relation (PR)
- Press Conference Arrange
- Event Management
- TVC & Documentary
- Media Buying
- Design & Printing
- Artist or Celebrity Management
- Other Related Services

Office address : Rashul View (7th Floor), 65 Mymensingh Lane
Banglamotor, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel : 9632637, 01914 702312
E-mail : extra@extra-bd.com
Web : www.extra-bd.com

খেলা

ক্রিকেটে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও নানা চক্রান্ত

শামসুজ্জামান শামস

দিন দিন টাইগাররা তাদের জয়ের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। পাকিস্তান জয়ের পর ভারত জয় করে ক্রিকেট বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে মাশরাফি বাহিনী। একসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নাম শুনলে ক্রিকেট-কুলীনরা নাক কুঁচকাত, সেই দলটি আজ কেবল সমীহই আদায় করছে না, বিশ্ব ক্রিকেটকে ভাবিয়ে তুলেছে। ক্রিকেট আজ বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্য এক উচ্চতায়। বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এখন কেউ আর করুণা করে না, সমীহ করে।। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতার মধ্য দিয়ে নিজেদের ১৮তম সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতকে ৭৯ রানে হারানোর পর ২১ জুন সফরকারীদের ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারায় টাইগাররা। বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে খেলে ১৯৮৬ সালে। এক যুগ পেরিয়ে ১৯৯৮ সালে সবুজের প্রতিনিধিরা কেনিয়ার বিপক্ষে প্রথম জয়। আরো প্রায় দেড় যুগ পর ২০১৫ সালের মধ্য জুনে ভারতের বিপক্ষে ২-১ ম্যাচে ওয়ানডে সিরিজ জয়ে যেন পূর্ণতা পায় সেই সাফল্যচক্র। ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়ার পর বাংলাদেশ দল প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে ১৯৯৯ সালে। ঢাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ১৫২ রানে হার মানে বাংলাদেশ। এরপর বাংলাদেশ প্রথম সিরিজ জয় করে ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে। সেবার

TCL
Technology Changes Life
ঈদ শুভেচ্ছা
শাহনুর ইলেকট্রনিক্স
৬৯ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (২য় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৫২৩৩, ৯৫৫২৩৪৩, সিম্বা ফোন: ০১৭১৯-০৩৩৩০৭, ০১৭১৯-০৩৩৩০৮, ০১৭১৯-০৩৩৩০৯
সার্ভিস হট লাইন: ০১৮৭৯-৯৪৯০৪৩, ০১৯২৯-৯৯২২০৮, ০১৯২৯-৯৯২২০৯

পাঁচ ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ঢাকায় আসে জিম্বাবুয়ে। ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ জিতে নেয় ৩-২ ব্যবধানে। ২০০৬ সালে কেনিয়াকে ৪-০-তে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে চার ম্যাচের সিরিজ ৩-১-এ জেতে টাইগাররা। দেশের বাইরে এটিই বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়। ওই বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আসে জিম্বাবুয়ে। তবে প্রতিটি ম্যাচে হেরে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়ে দেশে ফেরে সফরকারীরা। ডিসেম্বরে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ।

সব মিলিয়ে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ দল দেশ ও দেশের বাইরে তিনটি সিরিজ জেতে। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিল। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ (৩-০) করে। প্রতিটি ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জেতে স্বাগতিকরা। ২০০৯ সালেও তিনটি সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে দুটি সিরিজেই জয় পায় বাংলাদেশ। ওই বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ৩-০-তে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করে সাকিব আল হাসানের দল। ২০১১ সালে নিউজিল্যান্ডকে বাংলাওয়াশ (৪-০) করে মুশফিকবাহিনী। পরের বছর একটি সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। ক্রিস গেইলের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ হারায় ৩-২ ব্যবধানে।

২০১৩ সালের অক্টোবরে ঘরের মাঠে আবারো কিউইদের বাংলাওয়াশের লজ্জা দেয় টাইগাররা। কাইল মিলসের নিউজিল্যান্ড টাইগারদের কাছে সিরিজ হারে ৩-০ ব্যবধানে। ২০১৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়েকে ষষ্ঠবারের মতো সিরিজ হারায় বাংলাদেশ। এবার ৫-০-তে হোয়াইটওয়াশ হয় সফরকারীরা। এরপর ২০১৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানকে রীতিমতো বলে-কয়ে হোয়াইটওয়াশ (৩-০) করে বাংলাদেশ। এ বছরের ১৮ ও ২১ জুন ভারতের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জিতে নেয় মাশরাফিবাহিনী। এ নিয়ে টানা তিনটি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। আর ঘরের মাঠে শেষ ১০ ম্যাচে অপরাজিত থাকার কীর্তি দেখিয়ে নিজেদের শক্তির কথা আরো একবার জানিয়ে দিল টাইগাররা। ক্রিকেট বিশ্বে টাইগারদের অগ্রগতি দেখে অনেকেই নানা সময়ে নানা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশকে টেস্ট এরিনা থেকে বাদ দেয়ার চক্রান্ত কম হয়নি। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যখন সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ২০১৪ সালে এককভাবে টি-২০ বিশ্বকাপে সেরা আয়োজনের স্বীকৃতি পায়, ২০১১ সালে যখন যৌথভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ, তখন মাঠে এবং মাঠের বাইরে বাংলাদেশের সাফল্য দেখে একশ্রেণির হিংসুক বাংলাদেশের ক্রিকেটের গায়ে কলঙ্ক তিলক লেপনে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) স্পট ফিক্সিং, ম্যাচ ফিক্সিং ইস্যু নিয়ে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় ওঠে, বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইর কর্মকর্তাদের জড়িত হওয়ার খবর মিডিয়ার কল্যাণে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে ওই ঘটনা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের গায়ে কলঙ্ক তিলক লেপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিপিএলে স্পট ফিক্সিং, ম্যাচ ফিক্সিং ইস্যু তুলে বিপিএল বন্ধের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহল। যার ফলে দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে বিপিএল। ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটকে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এনে দেয়। জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্বকাপে প্রথম জয় আসে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে, তারপর টেস্ট প্লেয়িং দেশ পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক দেখায় টাইগাররা। এ জয়ের ওপর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস অর্জন করে। ২০০ সালে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ ভারতের মুখোমুখি হয়। প্রথম টেস্টেই বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান করে, যা টেস্ট ইতিহাসে অনন্য। অবশ্য সেই টেস্টে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে বাজেভাবে হারার পর টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ করার আবেদন উঠেছিল। সেই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশ দক্ষতার সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৩ সালে ডেভ হোয়াটমোর কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বাংলাদেশের ক্রিকেটের পুনর্জন্ম ঘটে। ২০০৩ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স চোখে পড়ে, লড়াই করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। মুলতানে পাকিস্তানের বিপক্ষে আম্পায়ারের কারণে টেস্ট জিততে জিততে হেরেছে বাংলাদেশ। টেস্টে আম্পায়ারের বেশকিছু ভুল ডিসিশনের কারণে ওই টেস্ট জিততে পারেনি টাইগাররা। সেই টেস্টেই চরম এক পরীক্ষা দেন মোহাম্মদ রফিক। উমর গুল রফিক বল করার আগেই ক্রিজ ছেড়ে বের হয়ে যান, তা দেখে রফিক বোলিং না করে আবার বোলিং মার্কে গুলকে ফিরে আসতে বলেন। অথচ রফিক গুলকে আউট করতে পারতেন এবং টেস্টটি কিন্তু বাংলাদেশ জিতে যেত, রফিক তা করেননি। ওইটা ছিল পাকিস্তানিদের মুখে বাংলাদেশের চপেটাঘাত। কারণ বেশ কয়েকবার এলবিডব্লিউর সঠিক আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। বাংলাদেশ বাজে আম্পায়ারিংয়ের শিকার হয়েছে অনেক ম্যাচে।

২০১৪ সালের শুরুতে ক্রিকেট বিশ্বের তিন মোড়ল ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন করে আবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। বাংলাদেশের অগ্রগতি দেখে টেস্ট আঙিনা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিতে দুবাইয়ে ২৮-২৯ জানুয়ারি 'বিগ-থ্রি'র প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক হয় আইসিসির। সেখানে বিগ থ্রির প্রস্তাবে বাংলাদেশকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ খেলার প্রস্তাব যখন আইসিসির আলোচনায় উপস্থাপন করা হয় তখনই বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান এর বিরোধিতা করেন।

এ ষড়যন্ত্রের পর বিশ্বকাপে আবারো নতুন করে চক্রান্তের শিকার হয় বাংলাদেশ। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে বাংলাদেশকে জোর করে হারাতেই দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই আম্পায়ার ইংল্যান্ডের ইয়ান গোল্ড ও পাকিস্তানের আলিমদার। তাদের সঙ্গে যোগ দেন থার্ড আম্পায়ার অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ডেভিসও। আম্পায়াররা একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত দেয়ায় বাংলাদেশ সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ হারায়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের বিপক্ষে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে খেলেছেন আম্পায়াররা। সুরেশ রায়নার এলবিডব্লিউ দেয়া হয়নি, রোহিত শর্মা আউট হওয়ার পরও অহেতুক 'নো' ডাকা, মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ আউট না হওয়ার পরও আউট দেয়া– এ সবই আম্পায়ারদের ভুল সিদ্ধান্ত। আর এর খেসারত দিতে হয়েছে টাইগারদের। ওই ম্যাচে ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসিও আম্পায়ারদের সঙ্গে তাল মেলায়। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা চলার সময় সাইড স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে ওঠে একটি বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা 'জিতে গারে জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা!' এটা কোনোভাবেই আইসিসি করতে পারে না। দুটি দেশের খেলা চলছে। সেখানে আইসিসির যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই মাঠে খেলা দুই দলের নির্দিষ্ট একটি দলের পক্ষে বিজ্ঞাপন প্রচার হতে পারে না। অবস্থা দেখে মনে হয়েছে আইসিসিও ভারতের পক্ষে। তারাও বাংলাদেশকে হারাতে মরিয়া। আইসিসির সভাপতি হয়ে আ হ ম মুস্তফা কামাল পুরো বিষয়টা সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ ঘটনার কঠোর প্রতিবাদ জানালেন তিনি। আর এ ঘটনা থেকেই শ্রীনিবাসন-কামাল লড়াই শুরু। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে বাজে আম্পায়ারিংয়ের কড়া সমালোচনা করেন আইসিসি সভাপতি। বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোয় কেন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হলো না, প্রশ্ন তোলেন তা নিয়েও। আ হ ম মুস্তফা কামালের অভিযোগ শুধু আম্পায়ারিং নিয়েই ছিল না, সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'মাঠে গিয়ে দেখলাম স্পাইডার ক্যামেরা নেই। মেলবোর্নের মাঠে এই প্রথম খেলা হলো স্পাইডার ক্যামেরা ছাড়া। খেলা শুরু হওয়ার পর একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত আসতে লাগল। জায়ান্ট স্ক্রিনে লেখা দেখলাম, 'জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা'। সঙ্গে সঙ্গে আইসিসির সিইওকে বললাম, এটা বন্ধ করুন। তিনি কমার্শিয়াল

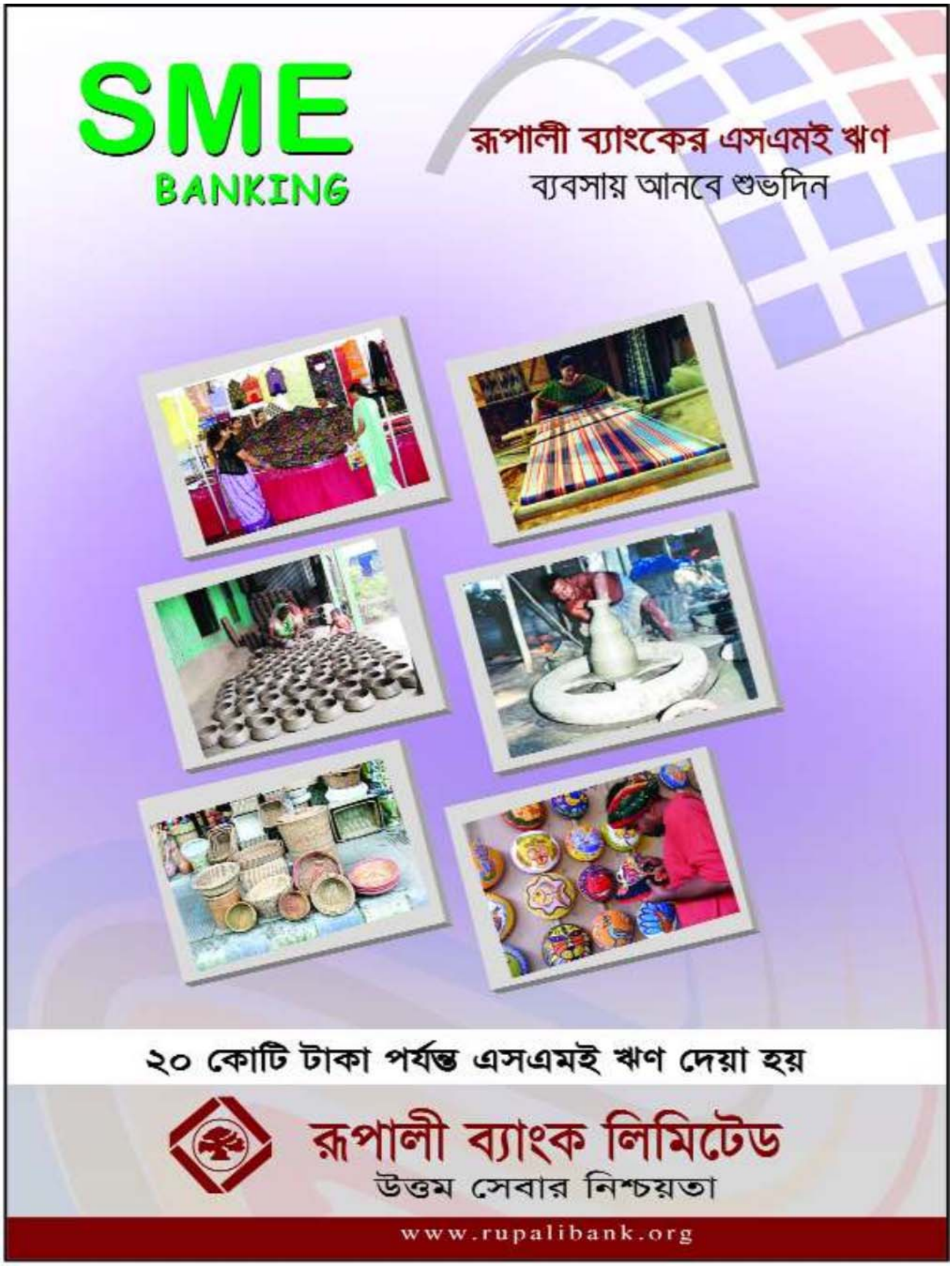
SME
BANKING
রূপালী ব্যাংকের এসএমই ঋণ
ব্যবসায় আনবে শুভদিন
২০ কোটি টাকা পর্যন্ত এসএমই ঋণ দেয়া হয়
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
www.rupalibank.org

ম্যানেজারকে বললেন। কিন্তু বন্ধ করা হলো না।'
আইসিসি সভাপতির তেতে ওঠাটা সহজভাবে নিতে পারেননি আইসিসির চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন। ফাইনালের আগের রাতে মেলবোর্নে হঠাৎ করেই 'জরুরি সভা' ডাকা হয়। সে সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাবেক হয়ে যাওয়া আইসিসি সভাপতি জানান, তাকে প্রথমে আম্পায়ারিং নিয়ে দেয়া বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন শ্রীনিবাসন। রাজি না হলে চাপ দেন বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে। আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, 'আমি বক্তব্য প্রত্যাহার করব না। সেটি ছিল বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মনের কথা। তাদের বাদ দিয়ে আমি তা প্রত্যাহার করতে পারি না। আমার কাছে আগে দেশ, তারপর আইসিসির সভাপতিত্ব। ১৬ কোটি মানুষকে ছোট করে সভাপতি থাকতে চাই না।'
'সত্যি কথা বলা তো অপরাধ নয়। আ হ ম মুস্তফা কামাল শ্রীনিবাসনের কথা না শোনাতেই কেড়ে নেয়া হয়েছে তার ট্রফি প্রদানের অধিকার। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ট্রফি প্রদানের অধিকার ছিল মুস্তফা কামালের। 'গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩.৩ (বি) ধারা অনুযায়ী আইসিসির ওয়ার্ল্ড ইভেন্টগুলোতে ট্রফি দেয়ার দায়িত্ব একমাত্র সভাপতির। সেখানে কোনোরকম বিচ্যুতির সুযোগ নেই।' এ ঘটনার পরপর আইসিসির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন আ হ ম মুস্তফা কামাল।
পদত্যাগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, একজন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত। তার সততা সব জায়গায় প্রশ্নবিদ্ধ। ২৯ মার্চ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ফাইনাল শেষে পুরস্কারদাতা হিসেবে শ্রীনিবাসনের নাম মাইকে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে স্টেডিয়াম গর্জে উঠেছিল, 'মানি না, মানি না'। সেদিন স্টেডিয়ামে তো বাংলাদেশি দর্শক ছিল না! অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক থাকলেও বেশির ভাগ দর্শক তো ভারতেরই ছিল। এখান থেকেই বোঝা যায়, যারা সত্যিকার অর্থে ক্রিকেটকে ভালোবাসেন তারা কী ভারতীয় কী অস্ট্রেলিয়ান– কেউই শ্রীনির এককাধিপত্যকে মেনে নিতে পারেননি। শ্রীনিবাসন তো ঘরে-বাইরে বিতর্কিত এক ব্যক্তি। শ্রীনি শুধু একা নন, ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত তার ফ্যামিলিও। তার জামাই মায়াপ্পন আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের দায়িত্বে থাকাকালে ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই তো আদালতের সাহায্য নিয়ে সভাপতির পদ থেকে অপমান করেই বিদায় করেছে শ্রীনিবাসনকে!
চক্রান্তের এ অধ্যায় সমাপ্তি ঘটনার পর পাকিস্তানের মতো বড় দলকে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা দিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজে তিন ম্যাচের দুটিতে জিতে সিরিজ জয় করেছে। তখনই টাইগারদের সাফল্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক জিওফ বয়কট। এই ইংরেজ ভদ্রলোক গাত্রদাহের কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রায়ই বেফাঁস মন্তব্য করেন। ক্রিকইনফোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করেছেন সাবেক এই ইংলিশ ক্রিকেটার। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে কিন্তু এটা পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে নাড়া দেয়ার মতো বিষয় নয়। বাজে মন্তব্য করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতিসম্পন্ন সাবেক এই ক্রিকেটার বলছেন, বাংলাদেশ তার দেশের মাটিতে সিরিজ জিতেছে, এতে অবাক হওয়ারই বা কী আছে। ভারতের সঙ্গে এর আগে বাংলাদেশ কখনো সিরিজ জেতেনি।
তিনি বলেন, বাংলাদেশকে বিদেশের মাটিতে জয় পেতে হবে, সিরিজ জিততে হবে, খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মতো দলের বিপক্ষে।'
ক্রিকইনফোকে বয়কট আরো বলেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট দল হাতে গোনা কয়েকটি ম্যাচে ভালো পারফর্ম করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা ছোট একটা বিষয়কে অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার মতো দলকে তারা মাঝেমধ্যে হারিয়েছে। এটা এমন কোনো বড় বিষয় নয়।'
ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পর দুনিয়াজুড়ে হৈচৈ পড়ে যাওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বয়কট বলেন, 'আমি বাংলাদেশিদের অনুভূতিতে আঘাত করছি না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব ভালো পারফরমেন্সই তাদের ঘরের মাটিতে। তাদের বিদেশের মাটিতে যেতে হবে। টেস্ট খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আফ্রিকার মতো দেশের বিপক্ষে। তাহলেই ক্রিকেট বিশ্বে তারা একটি বড় আসন পেতে পারে। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য রয়েছে। নিচের সাফল্যের যে তালিকা দেয়া হলো তা নির্বোধ বয়কট কিভাবে এড়িয়ে গেলেন ভেবে পাচ্ছেন না ক্রিকেটপ্রেমীরা।
বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ টেস্টে
* ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ২-০ তে টেস্ট সিরিজ জয়
* ২০১৩ সালে হারারে টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়
* ২০০৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সেন্ট লুসিয়া টেস্ট ড্র
* ২০০৪ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে বুলাওয়ে টেস্ট ড্র
* ২০১৩ সালে শ্রীলংকা সফরে গল টেস্ট ড্র ওয়ানডেতে
* ২০০৬ সালে কেনিয়া সফরে স্বাগতিকদের ৩-০-তে হোয়াইটওয়াশ
* ২০০৭ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে ৩-১-এ সিরিজ জয়
* ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে স্বাগতিকদের ৩-০-তে হোয়াইটওয়াশ
* ২০০৯ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে ৪-১ সিরিজ জয়
* ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে পাকিস্তান বধ
* ২০০৫ সালে কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো
* ২০০৭ সালে ক্যারিবীয় বিশ্বকাপে ভারতকে হারানো
* ২০০৭ সালে ক্যারিবীয় বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো
* ২০১০ সালে ব্রিস্টলে ইংল্যান্ডকে হারানো
* ২০১৩ সালে পাল্লেকেলেতে শ্রীলংকাকে হারানো
* ২০১৫ সালে বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডকে হারানো
ভারতকে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে হারানো এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যোগ্যতা অর্জন এই আনন্দের রেশ যখন কাটেনি বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলে, তখনই বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা নিয়ে দেখা দিয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা! এবার নতুন করে চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সপ্তম স্থান নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলুক এটা তারা মেনে নিতে পারছে না। তারা চাচ্ছে বাংলাদেশ বাদ পড়ুক। পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলুক। আর এ জন্যই তারা নিজেরা স্বাগতিক হয়ে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে ত্রি-দেশীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ঘরের মাঠে (১০, ১২ ও ১৫ জুলাই তিনটি ওয়ানডে ম্যাচে অংশ নেবে) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে অন্তত একটি জিতলেই অনিশ্চয়তার সব মেঘ কেটে যাবে। ৯৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সাতে থাকা বাংলাদেশের এ অনিশ্চয়তার কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। আগামী আগস্টে পাকিস্তান ফিরতি সফরে জিম্বাবুয়েতে খেলতে যাবে। সেখানে তাদের মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হওয়ার কথা। তবে দ্বিপক্ষীয় নয়, ক্রিকেট জিম্বাবুয়ের পরিকল্পনা একে ত্রি-দেশীয় টুর্নামেন্টে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমন্ত্রণও জানিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ আমন্ত্রণে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। তাদের আগামী ক্রিকেটীয় সূচি অক্টোবরে, শ্রীলংকার মাটিতে। আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর কোনো ওয়ানডে ম্যাচ না থাকায় নিজেদের তরফ থেকে কিছু করারও নেই ৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের আট নাম্বারে থাকা এ দলটির। বাংলাদেশ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে তাহলে রেটিং পয়েন্ট হবে ৯৯। ২-১ ব্যবধানে জিতলে হবে ৯৬। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারলে রেটিং পয়েন্ট ৯৩ থেকে ভগ্নাংশের জন্য সামান্য কমে যাবে। ৩-০ ব্যবধানে হারলে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৯০। তাতেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেটিং ৮৮ ও পাকিস্তানের রেটিং ৮৭। অতীতে কোনো চক্রান্ত যেমনি বাংলাদেশের অগ্রগতি রুখতে পারেনি এবারো চক্রান্তকারীরা সফল হবে না। চক্রান্তের সব জাল ছিন্ন করে বাংলাদেশের ক্রিকেট এগিয়ে যাবে। এটাই টাইগার সমর্থকদের প্রত্যাশা।

winmax
Experience The Difference
3G
New!
New!
12:56 PM
Chat
Music
Store
News
Organizer
Internet
Business
Help
Security
Search
Certificates
Downloads
Settings
Messages
Camera
WX14
Winmax
HD
WX14
Dual SIM Dual Standby, 2.4 inch QVGA Display
2.0MP Rotary Camera, MP3, MP4 Player
FM Radio, Auto Call Recorder, GPRS/WAP
Mobile Tracker, 1500mAh Battery
XC14
Dual SIM Dual Standby, 5.0 Inch HD IPS with OGS
1.3GHz Quad Core, Android 4.4.2 KitKat
RAM: 1GB, ROM: 8GB, Rear: 8.0MP, Front: 5.0MP
Gesture Sensor, 1900mAh Battery
Free Flip Cover
www.winmaxmobile.com
/winmaxmobilebd
1 YEAR WARRANTY

সুস্বাস্থ্যে দীর্ঘদিন
সম্পূর্ণ আপোষহীন

৪৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিকভাবে মান নিশ্চিত করা হয় বিশ্বের ৬০টি দেশে বাজারজাত হচ্ছে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে: Chicken, Shrimp (Tom Yum), Masala, Hot & Spicy এবং Tandoori Flavour আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিকভাবে পরীক্ষিত, এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত

MAMA

Oriental style instant noodles

কল্লোল থাই প্রেসিডেন্ট ফুডস্ বিডি লিঃ-এর একটি পণ্য